শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান

A TEXT BOOK ON EDUCATIONAL PSYCHOLOGY IN BENGALI

শ্যামাপ্রসাদ চট্টরাজ, এম. এস-সি., (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত),
বি. টি. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম)
বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ
ফকির চাঁদ কলেজ, ডায়মণ্ড হারবার
২৪ পরগণা

বুক হাউস
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
২৭, সূর্য সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রকাশক॥
শ্রীবিনয় কুমার ঘোষ
বুক হাউসের পক্ষে
২৭, সূর্য সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৬২

॥ মুদ্রক ॥
শ্রীঅবনীমোহন রায়
তারকনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১২, বিনোদ সাহা লেন,
কলিকাতা-৬

॥ উৎসর্গ ॥

আমার শিক্ষাজগতের

বড়-ছোট

খ্যাত-অখ্যাত

জীবিত ও মৃত

জ্ঞাত ও অজ্ঞাত—

সকল স্তরের গুরুকে

এই গ্রন্থখানি শ্রদ্ধার সঙ্গে

নিবেদন করলাম।

॥ সূচীপত্র ॥

প্রথম খণ্ড

বিষয়		পৃষ্ঠা
এক ॥	শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ ... ... [মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, শিক্ষার স্বরূপ, শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ, শিক্ষার ব্যাপক অর্থ, সব আচরণ কিন্তু শিক্ষা নয়, শিক্ষামনোবিজ্ঞানের স্বরূপ, মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার সম্পর্ক, শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞানের পরিধি, শিক্ষক-শিক্ষণ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা]	১—১৬
দুই ॥	শিক্ষামনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি ... ... [অন্তর্দর্শন, পরীক্ষণ, জীবনেতিহাস সংগ্রহ, ক্রমবিকাশ পদ্ধতি, ব্যাধি-নিরূপণ বা চিকিৎসামূলক পদ্ধতি, পরিসংখ্যান পদ্ধতি, অন্যান্য পদ্ধতি]	১৭—২৬
তিন ॥	সহজাত প্রবৃত্তি ... ... [ম্যাকডুগালের তত্ত্ব, প্রবৃত্তির তালিকা, সহজাত প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য, ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তি মতবাদের সমালোচনা, সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি, সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ, প্রবৃত্তি ও অভ্যাস, অনিত্যতার সূত্র, পরিবর্তন বা নিরোধের সূত্র, প্রবৃত্তি ও শিক্ষা, শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব, প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব, অবদমন, বিবেচন, উন্নীতকরণ, প্রবৃত্তি শিক্ষাযোগ্য কি না ?]	২৭—৪৮

॥ চার ॥ বুদ্ধি ... ... ৪৮—৯৩

[বুদ্ধির স্বরূপ ও পরিমাণ, বুদ্ধির সংজ্ঞা, বুদ্ধির সাধারণ বৈশিষ্ট্য, বুদ্ধি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তত্ত্ব, স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উৎপাদন তত্ত্ব, দ্বি-উৎপাদন তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা, টমসনের বাছাই তত্ত্ব বা বহুশক্তি তত্ত্ব, থার্স্টোনের বহু উৎপাদন তত্ত্ব, বিনে-সিমন স্কেল, ১৯১১ সালের সংস্করণ, স্ট্যানফোর্ডে-বিনে বুদ্ধি অভীক্ষা, স্ট্যানফোর্ড-বিনে স্কেল, ১৯৩৭, মানসিক বয়স ও বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়, বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়, স্ট্যানফোর্ড-বিনে সংস্করণ, ১৯৬০, বিচ্যুতি বুদ্ধ্যঙ্ক, বুদ্ধির অভীক্ষার বিষয়বস্তু, বিনে-সিমন স্কেলের বৈশিষ্ট্য, বুদ্ধির অভীক্ষা এবং অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা, বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির সুবিধা-অসুবিধা, শিক্ষাগত বয়স, বিভিন্ন জাতীয় বুদ্ধির অভীক্ষা, ভাষা বর্জিত ব্যক্তিগত অভীক্ষা, কার্যসম্পাদনী অভীক্ষার সঙ্গে বিনে-সিমনের অভীক্ষার সহ-সম্বন্ধ, যৌথ অভীক্ষা, বা দলগত অভীক্ষা, থর্নডাইক বুদ্ধির অভীক্ষা, টারম্যান-ম্যাকনেমার মানসিক ক্ষমতার অভীক্ষা, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপ, বুদ্ধির যৌথ এবং ব্যক্তিগত অভীক্ষার তুলনা, বুদ্ধ্যঙ্কের শ্রেণীবিন্যাস, বুদ্ধির বৃদ্ধি, বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা, বুদ্ধির উপকারিতা, বুদ্ধ্যঙ্কের মাত্রা হিসাবে শ্রেণী-বিভাগ, ক্ষীণ বুদ্ধিদের শিক্ষা, উন্নত বুদ্ধিদের শিক্ষা, বুদ্ধি এবং বৃত্তি]

॥ পাঁচ ॥ স্মরণ ও বিস্মরণ ... ... ৯৪—১১৭

[স্মৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা, স্মৃতির আধুনিক সংব্যাখ্যান, শারীরবৃত্তীয় মতবাদ, মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ, মস্তিষ্কের স্মরণচিহ্নগুলি উদ্দীপিত

হওয়ার প্রধান নিয়মাবলী, চেনা বা পরিজ্ঞান, উত্তম স্মরণ-শক্তি, স্মৃতি এক না বহু? বার্গসোঁর শ্রেণী-বিভাগ, স্মৃতি প্রখরতার অনুকূল শর্তাবলী, দৃঢ় সংকল্প, বিস্মৃতি, স্মৃতির উন্নতি সম্ভব কিনা, স্মৃতির বিস্তার]

॥ ছয় ॥ মনোযোগ ও আগ্রহ ... ... ১১৮—১৪৪

[মনোযোগের স্বরূপ, মনোযোগের বৈশিষ্ট্য, মনোযোগের নির্ধারক, বস্তুগত নির্ধারক, ব্যক্তিগত নির্ধারক, মনোযোগের শ্রেণী-বিভাগ, শিশুর মনোযোগের বিকাশ, আগ্রহ, আগ্রহ ও মনোযোগ, শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহ, কিভাবে আগ্রহ ও মনোযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে? অমনোযোগ ও বিকর্ষক, মনোযোগের পরিসর, মনোযোগের বিচলন বা অস্থিরতা, মনোযোগের বিনোদন, মনোযোগের বিভাজন]

॥ সাত ॥ সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ ... ... ১৪৫—১৭৪

[সংবেদনের বৈশিষ্ট্য, সংবেদনের ধর্ম, প্রত্যক্ষ কাকে বলে? প্রত্যক্ষের স্তর বিভাগ, প্রত্যক্ষের স্বরূপ, সংবেদন ও প্রত্যক্ষের সম্বন্ধ, ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ, অলীক প্রত্যক্ষণ, ব্যক্তিগত ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ ঘটে কেন? সর্বজনীন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ, সর্বজনীন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ ঘটে কেন? অলীক প্রত্যক্ষণ, অলীক প্রত্যক্ষণ কেন ঘটে? স্থান প্রত্যক্ষণ, সময় প্রত্যক্ষ, দূরত্ব, ঘনত্ব ও গভীরতা প্রত্যক্ষণ, ওয়েবার-ফেক্‌নার সূত্র, শিক্ষামূলক দিক]

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

॥ এক ॥ শিক্ষণ ... ... ১—৫৩

[শিখনের স্বরূপ, শিখনের সংজ্ঞা, শিখনের স্তর বিন্যাস, শিখনের উপাদান, পরিনমন ও বিশেষ শিক্ষণ, প্রেষণা, শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণার কাজ, শক্তি সঞ্চার ক্রিয়া, নির্বাচনী ক্রিয়া, পরিচালন ক্রিয়া, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রেষণার অবদান, শিখনের শ্রেণী-বিভাগ, শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব, অনুষঙ্গবাদ ও গেস্টাল্ট বা সামগ্রিকতাবাদ, থর্নডাইকের সংযোজনবাদ, প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতি, প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণা, থর্নডাইকের শিখনের সূত্র, থর্নডাইকের মতবাদের উপযোগিতা, শিক্ষাক্ষেত্রে থর্নডাইকের মতবাদের উপযোগিতা, গেস্টাল্ট মতবাদ, গেস্টাল্টবাদীদের শিক্ষণ সম্বন্ধে গবেষণা, শিক্ষাক্ষেত্রে গেস্টাল্টবাদ, গেস্টাল্ট মতবাদের ত্রুটি, অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া মতবাদ, অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া কাকে বলে? প্যাভ্‌লভের সেই বিখ্যাত কুকুর, অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া কিভাবে সৃষ্ট হয়? প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে অনুবর্তন, অপানুবর্তন, পুনঃস্থাপনের সূত্র, শিক্ষাক্ষেত্রে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার উপযোগিতা, শিখনের বিভিন্ন তত্ত্বের সমন্বয়ন, শিক্ষার উন্নতি, মানসিক ক্ষমতা, ইতর প্রাণী ও মানুষের শিক্ষণের তুলনামূলক আলোচনা, কার্যকরী শিখনের শর্তাবলী, শিখনের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বা মুখস্তকরণের পরিমিতত্তা]

॥ দুই ॥ শিখনের সঞ্চালন ... ... ৫৪—৭০

[মানসিক শক্তিবাদ, মানসিক শৃঙ্খলাবাদ, শিখন সঞ্চালনের তত্ত্ব, শিখন সঞ্চালনের উপর

পরীক্ষণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, সঞ্চারণ সম্পর্কে গবেষণাগুলির সিদ্ধান্ত, স্কুলপাঠ্য বিষয়ে সঞ্চালন, সঞ্চালন কিভাবে ঘটে? বিভিন্ন মতবাদের সমালোচনা, সঞ্চালনের শিক্ষামূলক দিক]

। তিন । প্রক্ষোভ ... ... ৭১—৮৮

[প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্য, প্রক্ষোভ জাগে কেন? প্রক্ষোভের বিভিন্ন তত্ত্ব, জেমস্‌-ল্যাংগ মতবাদের সমালোচনা, ক্যানন-বার্ডের থ্যালামিক তত্ত্ব, প্রাথমিক ও মিশ্র প্রক্ষোভ, প্রক্ষোভের নিয়ন্ত্রণ, প্রক্ষোভ ও শিক্ষা]

। চার । রস ... ... ৮৯—১০৩

[সেন্টিমেন্ট বা রস কাকে বলে? সেন্টিমেন্ট ও প্রক্ষোভ, সেন্টিমেন্ট ও প্রবৃত্তি, রসের বৈশিষ্ট্য, সেন্টিমেন্ট ও কমপ্লেক্স, কমপ্লেক্সের প্রকৃতি ও প্রকার, রসের বিকাশ, শিক্ষা ও চরিত্র গঠনে রস, আত্মবোধের রস, নৈতিক সেন্টিমেন্ট বা নীতিবোধের রস, দেশাত্মবোধের রস]

। পাঁচ । ব্যক্তিত্ব ... ... ১০৪—১২৮

[ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা, ব্যক্তিত্বের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্বের উপাদান, ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ, ব্যক্তিসত্তার টাইপ, ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা ও পরিমাপ, ব্যক্তিসত্তা নির্ণায়ক প্রশ্নাবলী, অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, পৃথককরণ, সমন্বয়ন]

। ছয় । চরিত্র ... ... ১২৯—১৩৮

[চরিত্রের স্বরূপ, সুচরিত্রের স্বরূপ, চরিত্রের বিকাশ, শিক্ষা ও চরিত্র গঠন, সুচরিত্র গঠনের উপায়]

॥ সাত ॥ কল্পনা ... ... ১৪০—১৫২

[কল্পনার স্বরূপ, কল্পনার বৈশিষ্ট্য, স্মৃতি ও কল্পনা, কল্পনার শ্রেণী-বিভাগ, স্মরণমূলক কল্পনা, স্বতঃস্ফূর্ত ও চেষ্টাপ্রসূত কল্পনা, বিশ্লেষণী কল্পনা, বিশ্বাসযুক্ত ও বিশ্বাস-বিযুক্ত কল্পনা, শিক্ষাক্ষেত্রে কল্পনার স্থান, কল্পনার বিকাশ সাধনে শিক্ষকের ভূমিকা]

॥ আট ॥ অভ্যাস ... ... ১৫৩—১৬৮

[অভ্যাসের বৈশিষ্ট্য, অভ্যাস ও প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সম্পর্ক, সহজাত ক্রিয়া বা প্রকৃতির উপর অভ্যাসের প্রভাব, জেম্‌স-এর অভিমত, ম্যাক্‌ডুগালের অভিমত, সু-অভ্যাস গঠনের নিয়মাবলী, কু-অভ্যাস বর্জনের নিয়ম, অভ্যাস গঠনের দৈহিক ভিত্তি, শিক্ষা ও অভ্যাস]

॥ নয় ॥ অবসাদ ... ... ১৬৯—১৮৬

[অবসাদ, ক্লান্তি বা অবসাদের শ্রেণীবিভাগ, অবসাদের কারণ, অবসাদ পরিমাপের বিভিন্ন উপায়, পাদপূরণ বা অপূর্ণ অংশ পূর্ণ করার পরীক্ষা, অক্ষর কাটা বা মুছে দেওয়ার পরীক্ষা, দেখা বা মুখস্থ করার পরীক্ষা, হিসাব দিয়ে পরীক্ষা, এস্‌থিসিওমিটার, ডায়নামোমিটার, আরগোগ্রাফ, টোকা দেওয়ার পদ্ধতি, কাজের বক্ররেখা, বিদ্যালয়ে অবসাদ, অবসাদের কুফল, শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে কুফল, শিক্ষকের ক্ষেত্রে কুফল, অবসাদের প্রয়োজনীয়তা, অবসাদ দূরীকরণের উপায়]

॥ দশ ॥ মনঃসমীক্ষণ ... ... ১৮৭—২১৯

[ফ্রয়েডের মতে মানসিক সংগঠন, তিনটি স্তরের বৈশিষ্ট্য, মনের অধিবাসী, প্রাণশক্তি ও

মরণশক্তি, লিবিডো, সংবন্ধন, প্রাত্যবৃত্তি, ঈডিপাস কমপ্লেক্স, মানসিক কৌশল, অনুকল্পন, অবদমন, নেতিবাচক মনোভাব, উদ্গমন বা বিকল্প আচরণ, প্রতিক্রিয়া সংগঠন, দিবাস্বপ্ন, অভেদীকরণ, প্রক্ষেপণ, অপব্যাখ্যা, পলায়ন-প্রবৃত্তি, তীব্র অন্তর্মুখিতা, শিক্ষা ও অবচেতন মন]

। এগার । মানসিক স্বাস্থ্য ও অপসঙ্গতি ... ২২০—২৫৫

[মানসিক স্বাস্থ্য কাকে বলে ? মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পরিধি, মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্য, শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য এবং গৃহ বা পরিবার, মানসিক স্বাস্থ্য ও বিদ্যালয়, মানসিক স্বাস্থ্যবিধির তিনটি দিক, ব্যক্তির আচরণ ধারা, বিজ্ঞানমূলক চাহিদা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব, আক্রমণাত্মক মনোভাব, অপরাধের অনুভূতি, অপসংগতির বিভিন্ন রূপ, তথ্য সংগ্রহ, সংব্যাখ্যান, চিকিৎসা, যৌনাতিত্তিক চিকিৎসা, অপসংগতি নিবারণ ও নিরাময়ের উপায়]

। বার । অপরাধ-প্রবণতা ... ... ২৫৪—২৬৭

[অপরাধ-প্রবণতা কেন ঘটে ? অপরাধ প্রবণতার শ্রেণীবিভাগ, অপরাধ প্রবণতা দূরীকরণের উপায়, প্রতিরোধমূলক উপায়, ব্যক্তিগত প্রতিরোধমূলক উপায়, নিরাময়মূলক উপায়, শিক্ষকের কর্তব্য]

। তের । যৌনশিক্ষা ... ... ২৬৮—২৭৮

[যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, যৌনশিক্ষার প্রকৃতি, যৌনশিক্ষা কিভাবে দেওয়া যেতে

পারে, বাল্যকালের যৌনশিক্ষা, কৈশোর-কালে যৌনশিক্ষা, যৌবনপ্রাপ্তির স্তরে যৌন-শিক্ষা]

॥ চৌদ্দ ॥ শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পরিচালন ২৭৯—২৯২

[পরিচালনা কাকে বলে ? বিভিন্ন জাতীয় সুপরিচালনা, শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পরিচালনা, পরিচালনার মূলনীতি]

॥ পনর ॥ ব্যক্তিগত বৈষম্য ... ... ২৯৩—৩০৮

[বিভিন্ন জাতীয় বৈষম্য, দৈহিক দিক থেকে বৈষম্য, মনঃপ্রকৃতি বা মেজাজ-মর্জিগত বৈষম্য, নৈতিক চরিত্রগত বৈষম্য, প্রাক্ষেতিক বৈষম্য, শিক্ষাগত বৈষম্য, ব্যক্তিত্বের টাইপ অনুযায়ী বৈষম্য, বংশগত বৈষম্য, পরিবেশগত বৈষম্য, মনোভাবগত বৈষম্য, বিদ্যার্জনে সামর্থ্যগত বৈষম্য, লিঙ্গভেদে বৈষম্য, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কারণ, ব্যক্তিগত বৈষম্য পরিমাপের উপায়, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্য, গুরুত্ব]

॥ ষোল ॥ বংশধারা ও পরিবেশ . ৩০৯—৩২৯

[বংশধারা ও তার প্রকৃত, বংশধারার ধারা, বংশ-ধারার শ্রেণীবিভাগ, বংশধারার সূত্রাবলী, বংশ-গতি কি ভাবে নির্ধারিত হয়, বংশধারা সম্বন্ধে আরো কয়েকটি তথ্য, পরিবেশ কাকে বলে ? বংশ-গতির পক্ষে বক্তব্য ও যুক্তি, বংশগতির গুরুত্ব, পরিবেশের পক্ষে বক্তব্য ও যুক্তি, বংশগতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত, শিক্ষাক্ষেত্রে বংশগতি ও পরিবেশ এবং শিক্ষকের কর্তব্য]

॥ সতের ॥ জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর ৩৩০-৩৮৯

দৈহিক বিকাশ, পিতামাতা ও শিক্ষকের কর্তব্য, মানসিক বিকাশ, প্রাক্ষোভিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ, জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর, স্তর বা বিভাগ, প্রাথমিক শৈশবকাল—দৈহিক বৈশিষ্ট্য, মানসিক বৈশিষ্ট্য, প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক বৈশিষ্ট্য, প্রান্তীয় শৈশব কাল, দৈহিক বৈশিষ্ট্য মানসিক বৈশিষ্ট্য, প্রক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক বৈশিষ্ট্য, শৈশব কালের শিক্ষা, বাল্যকাল, দৈহিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক বৈশিষ্ট্য, প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য, বাল্যকালের শিক্ষা, কৈশোর ও যৌবনাগমের কাল, কিশোর দৈহিক পরিবর্তন, মানসিক পরিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন, কৈশোরের চাহিদা, স্বাধীনতা ও সক্রিয়তার চাহিদা, সামাজিক চাহিদা, আত্মনির্ভরতার চাহিদা, আত্ম অভিব্যক্তির চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা নতুন জ্ঞানের চাহিদা, দুঃসাহসিকার চাহিদা নীতিবোধের চাহিদা, যৌনতৃপ্তির চাহিদা, জীবন দর্শনের চাহিদা, কৈশোরের সমস্যা, স্বাধীনতার ও সক্রিয়তার চাহিদার সমস্যা, সামাজিক চাহিদার সমস্যা, আত্মনির্ভরতার সমস্যা, আত্ম অভিব্যক্তির চাহিদার সমস্যা, নিরাপত্তার চাহিদার সমস্যা, নতুন জ্ঞানের চাহিদার সমস্যা, দুঃসাহসিকার চাহিদার সমস্যা, নীতিবোধের চাহিদার সমস্যা, যৌন তৃপ্তির চাহিদার সমস্যা, জীবন দর্শনের চাহিদার সমস্যা, কিশোরে শিক্ষা ব্যবস্থা।

॥ আঠারো ॥ মানসিক জীবনের দৈহিক ভিত্তি......৩৯০ ৪১৭

দেহ যন্ত্রের ভাগ, স্নায়ু তন্ত্র, স্নায়ু পথ, স্নায়ু কেন্দ্র, স্নায়ু সূত্র ও স্নায়ু শাখা স্নায়ু গুল্ম বা স্নায়ু কোশ, প্রান্ত গুচ্ছ, স্নায়ুকর্ষ বা স্নায়ু সন্ধি, স্নায়ু তন্ত্রের বিভাগ, স্নায়ু তন্ত্রের বিবর্তন, সুষুম্না কাণ্ড। দেহ ও মনের সম্বন্ধ, মস্তিষ্ক ও মনের সম্পর্ক, সুষুম্নাশীর্ষের কাজ, মধ্যমস্তিষ্কের কাজ, থ্যালামাসের কাজ, লঘুমস্তিষ্কের কাজ, অপসারণ পদ্ধতি, উদ্দীপন পদ্ধতি, রোগী পরীক্ষা পদ্ধতি গুরু মস্তিষ্কের কাজ ও গুরু মস্তিষ্কের আঞ্চলিকতা, সংবেদন স্থান কর্মস্থান, মস্তিষ্কেরআঞ্চলিকতা।

। উনিশ । গ্রন্থিতত্ত্ব ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি·········৪১৮-৪২৭

পিটুই টারী গ্রন্থী, সম্মুখ ভাগ, পশ্চাৎ ভাগ, পিনিয়াস গ্রন্থী, থাইরেয়ড গ্রন্থী. প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থী, থাইমাস গ্রন্থী, অ্যাড্রনাল গ্রন্থী, অ্যাড্রেনিনের কাজ, যৌনগ্রন্থী, সর্বশেষ সিদ্ধান্ত।

। কুড়ি । মনের চাহিদা··························· ৪২৮-৪৩৯

মানব চাহিদার প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ, জৈবিক চাহিদা গৌন বা মনস্তত্ত্বমূলক চাহিদা, দৈহিক নিরাপত্তার চাহিদা, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের চাহিদা, সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা, নূতনত্বের চাহিদা, সক্রিয়তার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা, প্রাথমিক নিরাপত্তার চাহিদা, যৌন তৃপ্তির চাহিদা, শিক্ষা ও চাহিদা।

। একুশ । ব্যক্তির পরিমাপ ও আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষা···৪৪০ ৪৪৮

ব্যক্তির পরিমাপ, পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য, রচনামূলক পরীক্ষার সুবিধা-অসুবিধা, সুবিধা অসুবিধা, আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষা, প্রশ্নধরনের, বিবৃতি ধরনের, উদ্দীপক শব্দ বা phrase জাতীয়, সম্পূর্ণ করণ অভীক্ষা বহুনির্বাচনী প্রশ্নোত্তর, সত্য মিথ্যা জাতীয়, হ্যাঁ-না জাতীয়, মিলন করণ অভীক্ষা, উন্নত মানসিক প্রক্রিয়া পরিমাপক অভীক্ষা, উপমান অভীক্ষা, শ্রেণী করণ অভীক্ষা, বিষয়াত্মক পরীক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচনের কতকগুলি নিয়ম, বিষয়াত্মক প্রশ্নের সুবিধা অসুবিধা, সিদ্ধান্ত।

॥ তৃতীয় খণ্ড ॥

॥ এক ॥ ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্ট্রিবিউশ্যান ... ১—১০

[সারি বিন্যাস, স্কোর, স্কেল, অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন সারি, ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের চিত্র, ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন, হিস্টোগ্রাম]

॥ দুই ॥ কেন্দ্রীয় প্রবণতা ... ... ১১—১৬

[মিন বা গড় নির্ণয়ের নিয়ম, মিডিয়ান নির্ণয়ের নিয়ম, মোড নির্ণয়ের নিয়ম, মিন নির্ণয়ের সংক্ষিপ্ত পন্থা]

॥ তিন ॥ বিষমতার পরিমাপ ... ... ১৭—২৮

[বিষমতার শ্রেণীবিভাগ—রেঞ্জ, মিন বিচ্যুতি, সম্যক বা আদর্শ বিচ্যুতি, চতুর্থাংশ বিচ্যুতি, বিষমতার পরিমাপগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ, সমষ্টি-গত মিন এবং S. D নির্ণয় করার সূত্র]

॥ চার ॥ ক্রম-সমষ্টিমূলক কিউমুলেটিভ বণ্টন ও অন্যান্য পদ্ধতি ... ... ২৯—৪৩

[ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা রেখাচিত্র বা ওজাইভ, শতাংশ বিন্দু, শতাংশ সারি, শ্রেণীবদ্ধ তালিকা বা তথ্য থেকে P. R. নির্ণয়, ওজাইভের ব্যবহার, রেখাচিত্র, বারচিত্র, পাইচিত্র]

॥ পাঁচ ॥ স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র ... ৪৪—৫৪

[সম্ভাবনার মৌলিক নীতি, স্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রফল, স্বাভাবিক থেকে বিচ্যুতি, কার্টোসিস, তির্যকতার তাৎপর্য, অস্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের প্রয়োগ]

॥ ছয় ॥ সহ-পরিবর্তন ... ... ৫৫—৬৭

[সহগাঙ্ক, সহ-পরিবর্তনের মান বা 'r' নির্ণয়, Scattergram থেকে 'r' করা, Product

Moment পদ্ধতির আরো কয়েকটি উদাহরণ, সারি পার্থক্যের পদ্ধতি, Biserial correlation]

॥ সাত ॥ অভীক্ষার স্কেল নির্ণয় ... ... ৬৭—৭৬

[Standard Score Scale, T-scale T-scale নির্ণয় করার পদ্ধতি, Percentile Scale]

॥ আট ॥ বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা সমাধানের সূত্র ৭৪—৯২

[মিন নির্ণয়, মিডিয়ান নির্ণয়, মোড নির্ণয়, রেঞ্জ নির্ণয়, গড় বিচ্যুতি নির্ণয়, আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়, চতুর্থাংশ বিচ্যুতি, বিস্তৃতির সহগ, শতাংশ বিন্দু, শতাংশ সারি, তির্যকতা, কার্টোসিস, স্বাভাবিক বণ্টনের সমীকরণ, স্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রফল, গুরাইভ ব্যবহার না করে Overlapping নির্ণয় করা, সহগাঙ্ক, Standard Errors of Measurements, আদর্শ স্কোর, Questions and Answers]

॥ এক ॥

শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ

(Nature of Educational Psychology)

[কতকগুলি সংজ্ঞা :—

1. Psychology is the positive science of human experience and behaviour.
R. H. Thouless.

2. Psychology is a positive Science of conduct and behaviour—*Mc. Dougall.*

3. Psychology is the science of the activities of the individual in relation to the environments—*Woodworth.*

4. Educational Psychology deals with the behaviour of human beings in educational situations.—*Skinner.*

5. Educational Psychology is the study of the Psychological aspects of educational situation.—*Trow.*]

মনোবিজ্ঞান কথাটির সঙ্গে বিজ্ঞান কথাটি যুক্ত হ'লে আমরা মনোবিজ্ঞানকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে ধরে নিতে পারি। কিন্তু এই বিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত নবীন। বিভিন্ন বিজ্ঞানের আবির্ভাবের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—জ্যোতির্বিদ্যাই বোধ হয় প্রথম বিজ্ঞান। তারপর আসে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, তারও পরে জীব বিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞানের আবির্ভাব অনেক পরে এবং সম্ভবতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৮৭৯ সালে লিপ্‌জিগ সহরে মিঃ ভুণ্ড কর্তৃক প্রথম মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।

এক একটি বিজ্ঞান এক একটি বিশেষ জাতীয় বিষয় বা বস্তুর সম্বন্ধে আলোচনা করে। পৃথক বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞানেরও একটি পৃথক বিষয়-ক্ষেত্র থাকা স্বাভাবিক। এখন দেখা যাক্ এই বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কি? মনোবিজ্ঞানের ইংরেজী প্রতিশব্দটি হল—Psychology, দুটি গ্রীক্ শব্দ নিয়ে Psychology কথাটির উৎপত্তি। একটি হ'ল 'Psyche' যার অর্থ হল 'soul' বা আত্মা; আর অপরটি হ'ল—'logos' বা science যার অর্থ হ'ল বিজ্ঞান। সুতরাং এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল—আত্মার বিজ্ঞান। কিন্তু এই সংজ্ঞাটি দর্শন-শাস্ত্রের উপর ভিত্তি ক'রে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়2

মাহের (Maher) যা বলেছেন, তা হ'ল—"মনোবিজ্ঞান হল দর্শনের সেই শাখা যা মানুষের মন বা আত্মা নিয়ে আলোচনা করে।" এই জাতীয় দার্শনিক-মনোবিজ্ঞানীদের কাজ আত্মার উৎপত্তি, স্বরূপ ও পরিণতি নিয়ে আলোচনা করা।

পরবর্তী মনোবিজ্ঞানীরা কিন্তু উপরোক্ত সংজ্ঞাটি মেনে নিতে পারলেন না। মনোবিজ্ঞানকে আত্মার বিজ্ঞান হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে না ব'লেই তাঁরা মনে করলেন এবং তার সপক্ষে তাঁরা কতকগুলি যুক্তি দেখালেন। মোটামুটি ভাবে তাদের বক্তব্য ছিল—

(১) আত্মার বিজ্ঞান বললে মনোবিজ্ঞানকে দর্শন ও অধিবিদ্যার (Metaphysics) শাখা বা অংশ হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু মনোবিজ্ঞান একটি পৃথক বিজ্ঞান।

(২) আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে দার্শনিকেরা একমত নন। যা সর্বজনীন নয়, তা দিয়ে কোন বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে না।

(৩) মনোবিজ্ঞান হল বিষয়নিষ্ঠ ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক বিজ্ঞান। বিজ্ঞান হলেই তা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল হবে। কিন্তু আত্মা অতীন্দ্রিয়। তাই তাকে নিয়ে কোন পর্যবেক্ষণ চালানো অসম্ভব। কাজেই আত্মার বিজ্ঞান কথাটিই সম্পূর্ণ ভুল।

মধ্যযুগে মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দেওয়া হ'ল **মনের বিজ্ঞান**। এই সময় মনোবিদ্‌গণ মনে করতেন মনোবিদ্যায় থাকবে মন সম্বন্ধে নানা বৈজ্ঞানিক আলোচনা। কিন্তু এখানেও নানা রকম অসুবিধা দেখা গেল। মন কথাটিও তো আত্মার মতই ব্যাপক। তাছাড়া ম্যাকডুগাল বলেন—"মন হল ব্যর্থক শব্দ, এরই সংজ্ঞা দেবার প্রয়োজন আছে।" কাজেই যে জিনিষ সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণাই গড়ে ওঠে নি, তাকে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু করা যেতে পারে না। আবার তর্কশাস্ত্র, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতিও "মন" নিয়ে আলোচনা করে। এই "মন" আর মনোবিজ্ঞানের "মন"—এই দুটির মধ্যে কি পার্থক্য, তা সুস্পষ্ট ভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার মনের পরিবর্তে চেতনা কথাটি ব্যবহার করে মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে চেয়েছিলেন **চেতনার বিজ্ঞান** হিসাবে। এঁরা কিন্তু 'মন' ও 'চেতনা' দুটি শব্দকেই এক অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু এখানেও অনেক অসুবিধা দেখা দিল, যেমন—চেতনা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত জিনিষ,

কাজেই একজনের চেতনাকে কেবলমাত্র সে-ই প্রত্যক্ষ করতে পারে। কোন একজন লোকের চেতনাকে অনেকে মিলে পর্যবেক্ষণ করতে পারে না। চেতনা সম্বন্ধে কোন সর্বজনীন মতে পৌছানো যায় না। মন বলতে কেবল মাত্র চেতনাকেই বোঝায় না; মনের মধ্যে যে সমস্ত ধারণা, বাসনা, অনুভূতি ইত্যাদি আছে, তারা মাঝে মাঝে চেতনার মধ্যে আসে ঠিকই, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তারা চেতনার বাইরেই থাকে।

মনোবিজ্ঞান যখন 'আত্মার' বিজ্ঞান ছিল তখন কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণা করা সম্ভব ছিল না। কল্পনা, অনুমান প্রভৃতির উপর ভিত্তি করেই গবেষণা চালিয়ে যেতে হত। যখন মনোবিজ্ঞানকে 'মন' বা 'চেতনা'র বিজ্ঞান বলে ধরে নেওয়া হ'ল, তখন গবেষণার পদ্ধতি হ'ল—**অন্তর্নিরীক্ষণ** (Introspection)। নিজের মনের প্রক্রিয়াগুলিকে যখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিজে নিজেই পরীক্ষা করা হয়, তখনই তাকে অন্তর্নিরীক্ষণ বলে। যাই হোক এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই মনোবিজ্ঞানীরা অনেক নূতন তথ্য ও তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে একদল মনোবিজ্ঞানী এই পদ্ধতিটিকে এবং পূর্ববর্তী মনোবিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত তথ্য ও তত্ত্বগুলিকে অপ্রমাণিত ও অনুমান-ভিত্তিক বলেই সেগুলি স্বীকার করে নিলেন না। এঁরা হলেন আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানী।

এই সমস্ত মনোবিজ্ঞানী বললেন মনোবিজ্ঞান হবে **আচরণের বিজ্ঞান**। প্রধানতঃ দুটি কারণে এঁরা আচরণকে মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু বলে ধরে নিয়েছিলেন। প্রথমতঃ আচরণ চেতনার মত ব্যক্তিগত নয়, অর্থাৎ কোন একজনের আচরণকে অনেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ কোন একজনের আচরণ দেখেই আমরা তার চেতন ও চেতনাতিরিক্ত মনের পরিচয় পেতে পারি। কেউ যখন রাগ করে, বা খুশী হয়, তখন সে যে রাগ করেছে বা সে যে খুশী হয়েছে, তা কি করে বুঝতে পারা যায়? এক্ষেত্রে তাদের রাগ বা খুশীর অনুভূতি দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তার আচার-আচরণ, কথাবার্তা, দৈহিক পরিবর্তন (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ) ইত্যাদি লক্ষ্য করেই ঠিক করে নিতে হয় সে রাগ করেছে, না, খুশী হয়েছে! কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—আচরণ কাকে বলব? ওয়াটসন বলেন—কোন উদ্দীপক (Stimulus) মানুষের শরীরের উপর সক্রিয় হবার ফলে দেহে যে সাড়া বা প্রতিক্রিয়া (Response) দেখা দেয়—তাকেই আচরণ বলা যেতে পারে। আবার এই

মতবাদটি মেনে নিলে-মনোবিজ্ঞানকে বলা যেতে পারে **উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত বিজ্ঞান**।

আপাতঃ দৃষ্টিতে আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীরা যে সংজ্ঞা দিয়েছেন বা যে যুক্তি দেখিয়েছেন, সেটি বেশ ভাল বলেই মনে হয়। কিন্তু এর বিরুদ্ধেও কতকগুলি যুক্তি আছে। যেমন—মানুষের আচরণ তার চেতন মনেরই বাহ্য প্রকাশ ; সুতরাং আচরণ বলতে কেবলমাত্র দৈহিক পরিবর্তনই বোঝায় না—চেতনার পরিবর্তনকেও বুঝায়। তাছাড়া চেতন মনকে বাদ দিলে আমরা উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে পারি না। আবার কোন একটি উদ্দীপক জীবদেহে কিরকম প্রতিক্রিয়া ঘটাবে তা নির্ণয় করে দেয় মন। সবচেয়ে বড় কথা হল আচরণবাদীরা আচরণের ব্যাখ্যা করতে যেয়ে মানুষকে একটি দেহবিশিষ্ট যন্ত্রে পরিণত করে ফেলেছেন।

মনোবিজ্ঞানের বার বার সংজ্ঞা পরিবর্তিত হ'তে দেখে Woodworth একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন—First, Psychology lost its soul, and then it lost its mind, then it lost consciousness. It still has behaviour of a kind.

যাই হোক, বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে আমরা বলতে পারি—দেহগত ও চেতনাগত উভয় প্রকার আচরণই হল মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। এক কথায় বলা যেতে পারে, সম্পূর্ণ মানুষটিই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। ম্যাকডুগালের মতে, মনোবিজ্ঞান হল জীবের আচরণ সম্বন্ধীয় বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান (Positive Science)। উড্‌ওয়ার্থের মতে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কীয় বিজ্ঞানই হল মনোবিজ্ঞান।

পরিশেষে বলা যেতে পারে—মনোবিজ্ঞান একটি বাস্তবধর্মী, আচরণ সম্বন্ধীয় বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান। কোন্ পরিস্থিতিতে প্রাণী কিভাবে আচরণ করে থাকে, এই বিজ্ঞানে সে সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়ে থাকে। কোন একটি বিশেষ আচরণ ভাল না মন্দ, কি পরিস্থিতিতে কি রকম আচরণ করা উচিত এ সবের আলোচনা করা মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়। প্রাণীর আচরণের ভিত্তিতে মানসিক প্রক্রিয়াগুলির বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিন্যাস, গতি প্রকৃতি, নিয়ম, কারণ ও পরিণাম ব্যাখ্যা করা এবং মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যে সমস্ত দৈহিক প্রক্রিয়া যুক্ত আছে, সেগুলির বর্ণনা করাই হল মনোবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য।

ROBERT S. WOODWORTH

1869—

মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা :—অন্যান্য অনেক বিজ্ঞানের মতো মনোবিজ্ঞানকেও প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই দুটি ভাগ হল—(১) **সাধারণ বা বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞান** (Pure) এবং (২) **ব্যবহারিক** বা **ফলিত মনোবিজ্ঞান** (Applied)। বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞানে প্রাণীর বিভিন্ন ধরনের আচরণগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়। ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানে কিভাবে ঐ সমস্ত নিয়মকে আশ্রয় করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাণীর আচরণ নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। এই দুটি প্রধান ভাগের উপর ভিত্তি করে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব হয়েছে। কতকগুলি শাখা হল প্রাণী মনোবিজ্ঞান (Animal), শিশু-মনোবিজ্ঞান (Child), অস্বাভাবিক মনের বিজ্ঞান (Abnormal), সমাজ-মনোবিজ্ঞান (Social), শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান (Educational), শ্রম-মনোবিজ্ঞান (Industrial), পরিসংখ্যান-মনোবিজ্ঞান (Statistical) প্রভৃতি। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান। এই শাখাটি মনোবিজ্ঞানের ব্যাবহারিক রূপ। এতে শিক্ষার্থীর আচরণ সম্বন্ধেই প্রধানতঃ আলোচনা করা হয়ে থাকে। আমরা কেমন করে শিখে থাকি, কি ভাবে মনে করি ও ভুলে যাই, কিভাবে শিক্ষার্থীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়, শিক্ষার সাফল্য কিসের উপর নির্ভর করে, কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করলে শিক্ষা সহজ ও স্থায়ী হয়, এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করা হয় শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান যখন প্রথম গড়ে ওঠে তখন সাধারণ মনোবিজ্ঞানের (General) যথেষ্ট সাহায্য নিতে হয়েছিল সত্য, কিন্তু পরবর্তী কালে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান একটি পৃথক ও স্বয়ং সম্পূর্ণ বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর জন্য বলা হয়—শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান তার উৎপত্তির জন্য সাধারণ মনোবিজ্ঞানের নিকট যে ঋণ গ্রহণ করেছিল তা সম্পূর্ণ পরিশোধ করেও সাধারণ মনোবিজ্ঞানকে আবার কিছু ঋণ দিতেও সক্ষম হয়েছে। যাই হোক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান যখন শিক্ষার সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত, তখন প্রথমে আমাদের শিক্ষার স্বরূপটি কি, তা জানতে হবে।

শিক্ষার স্বরূপ (Nature of Education) :—শিক্ষার ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Education' এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Educere' থেকে। শব্দটির অর্থ হল কোন কৌশল আয়ত্ত করা বা কোন তথ্য সংগ্রহ করা। সভ্যতার প্রথম প্রভাতে

মানুষ সার্থক ভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে তথ্য আহরণ করত, তাকেই বলা হত শিক্ষা। সাধারণ মানুষ শিক্ষা বলতে যা বোঝে তা হল বিদ্যালয় বা অনান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থ-লব্ধ বিদ্যা। কিন্তু এটিকে শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ বলা যেতে পারে। এই সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার অর্থ হল কোন বিশেষ সামাজিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য ব্যক্তিকে প্রস্তুত করা। বলা বাহুল্য এ শিক্ষা সমগ্র জীবন-ব্যাপী নয় এ মানুষের জীবনের বিশেষ বিশেষ স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ :—এই সংকীর্ণ অর্থ থেকেই শিক্ষিত-অশিক্ষিতের জাতিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। যে সমস্ত লোক লিখতে-পড়তে জানে, যাদের বই পড়ার অভ্যাস আছে তাদের আমরা শিক্ষিত বলে থাকি। আর যারা লিখতে পড়তে জানে না, যাদের বই পড়ার অভ্যাস নেই তাদের বলে থাকি অশিক্ষিত। তাহলে দেখা যাচ্ছে—এই অর্থে শিক্ষা আক্ষরিক জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নয়।

শিক্ষার ব্যাপক অর্থ :—প্রকৃত যে শিক্ষা—তার পরিসীমা অনেক বড়। শিক্ষা ও জীবন সমপর্যায় ভুক্ত। শিক্ষা হল সমগ্র জীবন-ব্যাপী একটি প্রক্রিয়া। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা কোন বিশেষ ব্যক্তির বা জীবনের কোন বিশেষ স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। যে কোনও নূতন অভিজ্ঞতা বা শুধু মানুষ কেন, যে কোন প্রাণীর বর্তমান আচরণকে পরিবর্তিত করে নূতন আচরণের সৃষ্টি করতে পারে, তাকেই শিক্ষা বলা যেতে পারে। এক কথায় বলা যেতে পারে, আচরণের পরিবর্তনই হল শিক্ষা। এই অর্থে শিক্ষার শুরু জন্ম থেকেই। সারা জীবন ধরে চলে এর বিকাশ মৃত্যুতে হয় এর শেষ। এই অর্থে আমরা বলতে পারি, প্রতিটি মানবসন্তানই শিক্ষার্থী, বিশ্ব-প্রকৃতি হ'ল শিক্ষক, পাঠশালা হ'ল উদার উন্মুক্ত প্রকৃতি, আর শিক্ষার সময় হ'ল সমগ্র জীবন।

সব আচরণ কিন্তু শিক্ষা নয় :—সব আচরণকেই কিন্তু শিক্ষা বলা যায় না। আচরণের পরিবর্তন যদি অবাঞ্ছিত হয়, তবে তাকে শিক্ষা বলা যাবে না। যে সমস্ত পরিবর্তন নীতিশাস্ত্র-সম্মত, মানুষের জীবনে বাঞ্ছনীয় ও সামাজিক আদর্শ লাভের পক্ষে সহায়ক, সেই সমস্ত পরিবর্তনকেই আমরা 'শিক্ষা' বলব। পক্ষান্তরে, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজও জীবনে পরিবর্তন আনে। কিন্তু এই সমস্ত

আচরণ অবাঞ্ছিত, অসামাজিক ও নীতিশাস্ত্র বহির্ভূত বলে আমরা এগুলিকে 'শিক্ষা' বলতে পারব না।

পরিশেষে এ কথা বলা যেতে পারে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তির ও সমাজের অস্তিত্বের সংরক্ষণ এবং তাদের উভয়েরই উন্নয়ন। ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে ব্যক্তি ও সমাজের যৌথ আদর্শের আলোকে। কাজেই ব্যক্তি ও সমাজ, এই দুটির অস্তিত্ব ও অগ্রগতির জন্য যে সমস্ত সুনির্বাচিত, সুনির্দিষ্ট ও সমাজ-স্বীকৃত আচরণ প্রতিটি সমাজের শিশু অর্থাৎ ভবিষ্যৎ নাগরিকদের আয়ত্ত করতে সাহায্য করা হয়, সেই সমস্ত আচরণই হল 'শিক্ষা'। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই এই বিশেষ আচরণগুলি শেখাবার জন্য কতকগুলি সমাজ অনুমোদিত সংস্থা থাকে। সাধারণ অর্থে এগুলিকেই আমরা স্কুল-কলেজ প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে থাকি।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ :—(Nature of Educational Psychology) :—শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ কিন্তু সাধারণ মনোবিজ্ঞান থেকে খুব একটা পৃথক নয়। আমরা আগেই জেনেছি—শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলি বিশেষভাবে প্রয়োগের ফলেই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান নামে একটি পৃথক অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে। আসলে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সাধারণ মনোবিজ্ঞানেরই একটি শাখা। শিক্ষা বলতে আমরা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর আচরণগুলি আয়ত্ত করা বুঝি। আবার মনোবিজ্ঞানকে বলি—আমাদের আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞানের কাজ হল—মনের বিভিন্ন আচরণ বা প্রক্রিয়ার প্রকৃতি, স্বরূপ, গতি ও নীতি নৈর্ব্যক্তিকভাবে আলোচনা করা। শিক্ষাদান কর্মটিকে সহজ ও সরল করার জন্য শিক্ষা-ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলির প্রয়োগ এবং শিক্ষাদানের সময় যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয়, সেগুলির সমাধানের জন্যই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। এদিক থেকে দেখলে বলা যায়—শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধি সাধারণ মনোবিজ্ঞানের চেয়ে সংকীর্ণ। মানব মনে যে সমস্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ঘটে থাকে, সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে পাওয়া যায় না। এই মনোবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল—শিক্ষামূলক আচরণ।

সাধারণ মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কতকগুলি পার্থক্য আছে। এর মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্য হ'ল :—সাধারণ মনোবিজ্ঞান মানব

আচরণের গতি প্রকৃতি এবং গবেষণালব্ধ সূত্র বা নিয়ম আবিষ্কার করে। কিন্তু শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজ হ'ল কেমন করে নতুন আচরণ করা যায় বা কেমন করে কম পরিশ্রমে বেশী জিনিষ শেখানো যায় তা স্থির করা। এজন্য অনেকে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানকে সাধারণ মনোবিজ্ঞানের 'ফলিত-শাখা' বলে বর্ণনা করে থাকেন। কিন্তু এটি কেবলমাত্র একটি ফলিত-শাখাই নয়, তার চেয়েও বেশী কিছু। সাধারণ মনোবিজ্ঞানের সূত্র বা নিয়মগুলিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এর কাজ শেষ হয় না, বরং সুরু হয়। এই সমস্ত সূত্র বা নিয়ম প্রয়োগ করার সময় শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। তাছাড়া শিখনেরও বিভিন্ন প্রকারভেদ দেখা দেয়। এ সমস্ত সমস্যার সমাধান ও শিখনের প্রকারভেদের সংব্যাখ্যানের জন্য ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন। এই গবেষণাই হ'ল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের মূলকথা। এদিক থেকে দেখলে বলতে হয়, সাধারণ মনোবিজ্ঞান থেকে মাল-মশলা সংগ্রহ করে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান যে সৌধটি নির্মাণ করেছে তার নির্মাণ কৌশল যেমন নূতন, পরিধিও তেমনি ব্যাপক। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করে দেয় শিক্ষামুখী দর্শন। কিন্তু সেই লক্ষ্যকে কিভাবে সহজে বাস্তবায়িত করা যায়, কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে তা আনন্দদায়ক হয়, শিখনের কার্যকরী পরিস্থিতি কোনটি, কেমন করে শেখা জিনিষ অনেকদিন ধরে মনে রাখা যায়, ভুলে যায় কেন, মনোযোগ কিভাবে দেওয়া সম্ভব, এই সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হ'ল শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কাজ।

প্রায় প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রমে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানকে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসাবেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর কারণ হ'ল—শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। এখন দেখা যাক্ —মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার সম্পর্কটি কি রকম!

মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার সম্পর্ক:—মনোবিজ্ঞান কাকে বলে, আর শিক্ষার স্বরূপই বা কি, তা আমরা আলোচনা করেছি। শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—যে সমস্ত অভিজ্ঞতা কোন না কোন প্রকারে আমাদের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে তার মধ্যে একটা পরিবর্তন আনতে পারে—সে সমস্ত অভিজ্ঞতাই হ'ল শিক্ষা। মনোবিজ্ঞান হল আমাদের আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। আমরা কেন বিশেষ বিশেষ আচরণ করে থাকি, কোন্ পরিস্থিতিতে কি রকম আচরণ ঘটতে পারে, বিভিন্ন আচরণের ক্ষেত্রে কোন সাধারণ বা সর্বজনীন সূত্র পাওয়া যায় কি না, সে সমস্ত নির্ণয় করাই হ'ল মনোবিজ্ঞানের কাজ।

শিক্ষা বা শিক্ষাতত্ত্বকে বলা যেতে পারে আচরণের ব্যবহারিক বা প্রয়োগমূলক দিক। শিক্ষাতত্ত্ব যেমন মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, মনোবিজ্ঞানও তেমনি শিক্ষাতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষাতত্ত্ব যখন মনোবিজ্ঞানের নিকট থেকে আচরণের মূল সূত্রগুলি গ্রহণ করে নূতন আচরণ সৃষ্টি করে বা আচরণের পরিবর্তন ঘটায় তখন শিক্ষাতত্ত্বকে মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল বলা যেতে পারে। আবার মনোবিজ্ঞান যে সমস্ত সূত্র নির্ণয় করে দেয়, সেগুলি যথার্থ কি না বা গ্রহণ যোগ্য কি না—তা বিচার করা যায় শিক্ষাতত্ত্বের সাহায্যে এ দিক থেকে বিচার করলে বলা যেতে পারে মনোবিজ্ঞান শিক্ষাতত্ত্বের নিকট ঋণী।

শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা :—শিক্ষাদান কার্যটি সহজ ও সার্থক করে তুলতে হলে মনোবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রতি শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য থাকলেই সু-শিক্ষক হওয়া যায় না। অথচ প্রাচীনকালে শিক্ষকেরা পাণ্ডিত্য বা পুঁথিগত বিদ্যার উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করতেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে যদি শিক্ষক, বিষয়বস্তু ও শিক্ষার্থীর স্থান আলোচনা করা যায়, তবে দেখা যাবে—পূর্বে শিক্ষক ও বিষয়বস্তুর প্রাধান্যই ছিল বেশী। কিন্তু যাকে শিক্ষা দেওয়া হবে, তার সম্বন্ধে কোনরকম বিবেচনাই করা হ'ত না। এই প্রসঙ্গে Adams এর বিখ্যাত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন-'The teacher teaches John Latin'—এই বাক্যে দুটি কর্ম আছে। একটি হল "জন" এবং অপরটি হ'ল-"ল্যাটিন"। শিক্ষকের ল্যাটিন সম্বন্ধে অর্থাৎ শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা যেমন প্রয়োজন, 'জন' সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাও তেমনি প্রয়োজন। এক কথায়, তাঁকে 'জনকে' জানতে হবে। 'জনকে' জানার অর্থ হ'ল—জনের মানসিক গঠন, আগ্রহ, মনোযোগ, বুদ্ধি, মেজাজ, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা। এই জ্ঞান আহরণে সাহায্য করতে পারে একমাত্র মনোবিজ্ঞান।

কতকগুলি বিশেষ বিশেষ আচরণ আয়ত্ত করাকেও আমরা শিক্ষা আখ্যা দিতে পারি। কোন বিশেষ আচরণ শিক্ষা দিতে হলে সেই আচরণটির স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। যাকে আচরণটি শেখাতে হবে, সে কিভাবে স্বল্পতম প্রয়াসে আচরণটি আয়ত্ত করতে পারবে; কি করলে আচরণটির অনুশীলন তার নিকট তৃপ্তিকর হবে, কোন্ পরিবেশ শেখার অনুকূল,

এ সমস্ত জানা থাকলে শেখা এবং শেখানোর কাজ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের নিকট সহজ হতে বাধ্য। প্রাচীনকালে শিক্ষাদান পদ্ধতি মোটেই মনোবিজ্ঞানসম্মত ছিল না বলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা প্রায়ই নিষ্ফল হ'ত। বর্তমান যুগে মনোবিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে যেরকম পরিবর্তন নিয়ে এসেছে সে রকম অন্য কোন বিজ্ঞান পারে নি। মনোবিজ্ঞান তার সতর্ক দৃষ্টি শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রসারিত করেছে। শিক্ষার পদ্ধতি, মনে রাখা, ভুলে যাওয়া, মনোযোগ, আগ্রহ, শাস্তি ও পুরস্কার, অসঙ্গতি ইত্যাদি বহুবিধ শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান নূতন ভাবে আলোকপাত করায় আমরা আমাদের প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গী বদলে নূতন দৃষ্টি লাভ করেছি। এতদিন যে শিক্ষার ভিত্তি ছিল অলীক কল্পনা ও মিথ্যা বিশ্বাস—এখন তার ভিত্তি হ'ল সজীব ও গতিশীল বিজ্ঞান।

সামগ্রিক শিক্ষাকে তিনটি বিভিন্ন দিক থেকে দেখা যেতে পারে :—**লক্ষ্য, বিষয়বস্তু** ও **পদ্ধতি**। শিক্ষার লক্ষ্য কি হবে, বা কি হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে আলোচনা করে শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন। শিক্ষাই জীবন—আবার জীবনই শিক্ষা। বিভিন্ন যুগে মানুষের জীবন সম্বন্ধে অনুভূতি ও ধারণাই শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করে এসেছে। বিভিন্ন দার্শনিক জীবন ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন, সেই দৃষ্টিভঙ্গীই শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করে দেয়। শিক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে তা নির্ভর করে শিক্ষার লক্ষ্যের উপর। অর্থাৎ বিষয়বস্তুও পরোক্ষভাবে শিক্ষাশ্রয়ী দর্শনের উপর নির্ভরশীল। **"কি পড়ানো হবে"**—এর উত্তর যদিও শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন দিচ্ছে, তবুও সেটি **"কেমন করে পড়ানো হবে"**—তার উত্তর দিতে পারে একমাত্র শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞান উদ্দেশ্যের চেয়ে উপায়ের দিকেই মনোযোগ দেয় বেশী করে। অবশ্য এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে শিক্ষার লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু নির্ধারণে মনোবিজ্ঞানের একেবারে করণীয় কিছু নেই। শিক্ষার লক্ষ্যটি কেবলমাত্র স্থির করে দিলেই শিক্ষার কাজ সম্পূর্ণ হল না। সেটিকে কার্যে পরিণত না করতে পারলে লক্ষ্যের কোন মূল্যই থাকে না। ঐ লক্ষ্যকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে সাহায্য করে—মনোবিজ্ঞান। আবার দর্শন বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে দিলেও মনোবিজ্ঞানই বলতে পারে—ঐ বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর কতটা প্রয়োজনে আসবে, তা তার মানসিক বিকাশের অনুকূল কি না, ঐ বিষয়বস্তু শেখানোর উপযুক্ত পরিবেশ কোন্‌টি—ইত্যাদি। তবে লক্ষ্য ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে

মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হলেও পদ্ধতির ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের একাধিপত্য আজ অনস্বীকার্য। শ্রেণীতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই পৃথক সত্তা: একের সঙ্গে অপরের কোন মিল নেই। সেখানে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষকের অগও জ্ঞান থাকলেও তা তাঁকে শ্রেণীকক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে না। প্রত্যেক শিক্ষককেই জানতে হবে—শিক্ষার্থী কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে; কি করলে শিক্ষাদান কার্যটি আরো সহজ ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, কেমন করে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়, কি করে তার ভুলে যাওয়ার হার কমানো যেতে পারে—ইত্যাদি আরো নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়। শিক্ষাব সার্থকতা নির্ভর করে মূলতঃ শিক্ষা প্রক্রিয়ার কার্যকরিতার উপর। একমাত্র কার্যকরী পদ্ধতিই সার্থক শিক্ষাদানে সাহায্য করতে পারে।

কেবলমাত্র এই তিনটি ক্ষেত্রেই নয়, আরো নানাদিকে মনোবিজ্ঞান শিক্ষাকে সার্থক, প্রাণবন্ত ও কার্যকরী করে তোলার চেষ্টা করেছে ও করছে। এগুলিকে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের অবদান হিসাবে আখ্যা দিতে পার। ✗ শিক্ষাতত্ত্ব এগুলির উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল। এগুলির সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :—

১। **ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি** :—প্রত্যেক মানুষ একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শিক্ষার্থীরাও তাই। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর দৈহিক মানসিক, প্রক্ষোভিক ইত্যাদি বিভিন্ন পার্থক্যের কোন প্রকার বিবেচনা করা হত না। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হল—শিক্ষার্থীদের বিভিন্নতা ও বৈষম্য অনুযায়ী পৃথক পৃথক শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যবস্থা করা, এর জন্য শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতিকে পরিবর্তনশীল ও বহুমুখী করা হচ্ছে—এবং সেই শিক্ষাকেও ব্যক্তিমুখী করে তোলা হচ্ছে।

২। **শিক্ষা গ্রহণের নিয়ম** :—সব বিষয় একই নিয়মে শিক্ষা দেওয়া যায় না, আবার সকল শিক্ষার্থী:কও একই নিয়মে শিক্ষা দেওয়া যায় না। আধুনিক মনোবিজ্ঞান থেকেই জানা গেল শিক্ষার বিষয়বস্তুর পার্থক্য অনুযায়ী শিক্ষাদান পদ্ধতিও পৃথক হবে। শিক্ষাদানের বিভিন্ন নিয়ম জানা না থাকলে শিক্ষকের পক্ষে কার্যকরী শিক্ষাদান করা সম্ভব নয়।

৩। **ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ** :—শিক্ষা হল শিশুর অভ্যন্তরীণ সুপ্ত সম্ভাবনাগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ। এই অর্থে শিক্ষা জীবন-বিকাশের সামগ্রিক

রূপ। জীবনের বিকাশ আবার একটি স্তরেই পূর্ণতা লাভ করে না; বিভিন্ন স্তরে তা পূর্ণতা লাভ করে। শিক্ষা এই বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী পরিকল্পিত হবে। ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকের বিকাশের ধারা এক নয়; তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ধারা ও পথ আছে। শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৪। **বুদ্ধি** :—শিশু কিভাবে শিক্ষাগ্রহণ করবে—তা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির উপর। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষিপ্রতা এবং সাফল্য দুই-ই নির্ভর করে বুদ্ধির উপর। এই জন্য শিক্ষার্থীর বুদ্ধির প্রকৃতি জানা যেমন প্রয়োজন —তা পরিমাপ করাও সমান প্রয়োজন। আধুনিক মনোবিজ্ঞান থেকে আমরা বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পেরেছি।

৫। **সহজাত প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, বংশধারা প্রভৃতি** :—শিক্ষা নির্ভর করে সহজাত প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, বংশধারা, পরিবেশ ইত্যাদির উপর। শিক্ষা একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষার যেমন ব্যক্তির উপর প্রতিক্রিয়া আছে, তেমনি প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, বংশধারা, পরিবেশ ইত্যাদিও শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করে। মনোবিজ্ঞান এই সমস্ত তথ্য আলোচনা করে শিক্ষাকে সহজ ও সার্থক করে তুলেছে।

৬। **মনোযোগ দেওয়া, ভুলে যাওয়া, মনে রাখা** :—মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে মনোযোগ দেওয়া, ভুলে যাওয়া, মনে রাখা ইত্যাদি বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া গেছে। এইগুলির সহায়তায় শিক্ষণ পদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত করে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

৭। **দলগত মনোবিজ্ঞান** :—দলগত মনোবিজ্ঞান বা গণ-মনোবিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষার্থী একক সত্তা হলেও সে কোন একটি দলের সভ্য। তাছাড়া তার আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়— তার চারদিকে যে সমস্ত ব্যক্তি আছে তাদের আচরণের দ্বারা। বর্তমান শিক্ষাদানের প্রথাও দলগত। সেই জন্য এই শাখাটির প্রয়োগ শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন প্রায় অপরিহার্য।

৮। **মনোবিজ্ঞানসম্মত পরিমাপ পদ্ধতি** : কেবলমাত্র বুদ্ধি পরিমাপ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেই মনোবিজ্ঞানের কাজ শেষ হয়ে যায়নি। বুদ্ধি

ছাড়া আরো অনেক মানসিক শক্তি ও প্রক্রিয়া পরিমাপ করার প্রয়োজন—শিক্ষা কার্যটিকে সহজ করার জন্য। তাছাড়া কোন একজন শিক্ষার্থী কতটা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারল, ভবিষ্যতে আর কতটা গ্রহণ করতে পারবে—এ সমস্তও জানা প্রয়োজন। অধীত শিক্ষা কতটা আয়ত্ত করতে শিক্ষার্থী পারল তার পরীক্ষা, ভবিষ্যৎ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতার পরীক্ষা, ব্যক্তিসত্তা, আগ্রহ, প্রবণতা বা ঝোঁক, মনোভাব ইত্যাদি পরিমাপ করার বিজ্ঞানসম্মত উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছে এই মনোবিজ্ঞান। এই সমস্ত পরিমাপ-পদ্ধতি যে শিক্ষাব্যবস্থাকে যথেষ্ট উন্নত করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৯। **আচরণমূলক সমস্যা:** মানুষের প্রত্যেকটি আচরণই হ'ল সঙ্গতি বিধানের প্রচেষ্টা। কিন্তু অনেক সময় মানুষের আচরণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার অপসঙ্গতি দেখা যায়। শিশুদের আচরণও বাদ দেওয়া যায় না। যে সমস্ত শিশু পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে সঙ্গতি সাধন করতে পারে না, তাদের বলা হয় অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশু। এই অপসঙ্গতির কারণ, ও তা দূর করার উপায় সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করে মনোবিজ্ঞান।

এইজন্যই আমরা বলতে পারি, শিক্ষার এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে মনোবিজ্ঞানের পদক্ষেপ হয় নি। বিদ্যালয়ে, বিদ্যালয়ের বাইরে, গৃহে প্রত্যেক স্থানে যে কোন শিক্ষামূলক পরিস্থিতিতে মনোবিজ্ঞান তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান এককভাবে শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করতে পারে না। মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য কতকগুলি শাখা—যেমন শিশু মনোবিজ্ঞান, পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞান, প্রয়োগমূলক মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসামূলক মনোবিজ্ঞান, দলগত মনোবিজ্ঞান, অ-স্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান, সামাজিক মনোবিজ্ঞান প্রভৃতিও শিক্ষামনোবিজ্ঞানকে প্রভূতভাবে সাহায্য করে এবং শিক্ষাপদ্ধতিকে সহজ ও সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞানের পরিধি (Scope): শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞানের সামগ্রিক পরিসর ও তার আলোচ্য বিষয়বস্তুকেই তার পরিধি বলা যেতে পারে। এই মনোবিজ্ঞানের কর্মপদ্ধতি শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার দিকে লক্ষ্য রেখেই গড়ে ওঠে। শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ করতে যেয়ে যে সমস্ত আচরণ ঘটে থাকে এবং তার জন্য যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করাই হ'ল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজ। সুবিধার জন্য আমরা মনোবিজ্ঞানের

পরিধিকে দুটি পৃথক শাখায় ভাগ করতে পারি। **একটি হ'ল**-মানুষের মৌল প্রকৃতির আলোচনা (Original nature of man) আর **অপরটি হ'ল**—শিক্ষণ পদ্ধতির আলোচনা (Psychology of Learning)। শিশু জন্মের সময় কি কি সহজাত গুণ বা ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সে সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা করাই হ'ল প্রথম শাখাটির কাজ। ঐ সমস্ত গুণ বা ক্ষমতাকে শিক্ষা-সৌধের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় শাখাটির কাজ হ'ল-শিক্ষক কি ভাবে স্বল্পতম সময়ে সহজভাবে সার্থক শিক্ষা দিবার জন্ম পরিবেশটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, সে সম্বন্ধে কার্যকরী পথের সন্ধান দেওয়া। অবশ্য এই দুটি শাখা ছাড়াও আরো অনেক দিকেই শিক্ষা পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান সাহায্য করে থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ অপরিহার্য বলে আজকাল প্রায় সমস্ত শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথমে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্ :—

১। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রথম কাজ হ'ল শিশু মনের আলোচনা করা। তার মনের প্রকৃতি, তার উপর বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব, তার সহজাত সুপ্ত গুণাবলীর সন্ধান, অভিজ্ঞতালব্ধ বৈশিষ্ট্য ও গুণের সন্ধান, তার মানসিক অবস্থা ও বিকাশ, তার সুস্থ ও স্বাভাবিক মানসিক গঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে মনোবিজ্ঞান।

২। শিশুর প্রবৃত্তি ও তার সহগামী প্রক্ষোভ, কল্পনা আবেগ ও ইচ্ছা, তার মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে মনোবিজ্ঞান।

৩। আচরণের শরীর তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যাও করে থাকে মনোবিজ্ঞান। প্রবৃত্তিজাত আচরণ, প্রক্ষোভজনিত আচরণ, রিফ্লেক্স জাতীয় আচরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে এই মনোবিজ্ঞান। মানসিক জীবনের দৈহিক ভিত্তিও মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

৪। শিশুর বুদ্ধি ও ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার আগ্রহ, মনোভাব ইত্যাদি বিবেচনা করে শিক্ষার বিষয়বস্তু কিভাবে নির্ধারিত হবে, কিভাবে শিক্ষাদান করতে হবে—সে সম্বন্ধেও আলোচনা করে মনোবিজ্ঞান।

৫। ইন্দ্রিয়গুলিই হচ্ছে আমাদের অভিজ্ঞতা আহরণের পথ। শিক্ষাদানের সহায়ক হ'ল এই সমস্ত ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের স্বরূপ কি ও ইন্দ্রিয়ের অনুশীলনকে কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যায়, সে সম্বন্ধেও আলোচনা করে মনোবিজ্ঞান।

৬। শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করাই হ'ল মনোবিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষাদানের সার্থকতা নির্ভর করে শিক্ষাপদ্ধতির উপর। শিক্ষার প্রণালী, সূত্র (Law), গতি ও সীমা, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রেষণা, ক্লান্তি, অবসাদ, বিরক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় মনোবিজ্ঞানে। তা ছাড়া মনে রাখা, ভুলে যাওয়া, মনোযোগ দেওয়া, শিক্ষা-সঞ্চালন ইত্যাদিও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

৭। শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। শিক্ষার্থীর লব্ধজ্ঞানের পরিমাপও তাকে করতে হবে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সার্থক পরীক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভাবন করে বহু দিনের একটি সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষের আচরণ বহুমুখী ও পরিবর্তনশীল। এই বহুমুখী আচরণ ধারা ব্যাখ্যা করার জন্য শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষা-পরিসংখ্যান নামে একটি নূতন শাখার উদ্ভাবন করেছে। তাছাড়া বিভিন্ন জাতীয় অভীক্ষার প্রচলন সম্ভব হয়েছে একমাত্র মনোবিজ্ঞানের জন্য।

৮। শিক্ষার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। যে আজ শিশু, সে আগামীকালের ভাবী নাগরিক। বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে তাকে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা শিক্ষার কাজ। এর জন্য সামাজিক মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানকে সঙ্গতি বজায় রেখে চলতে হয়। আবার উপযুক্ত বৃত্তি নির্ধারণ করার ব্যাপারেও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অবদান কম নয়।

শিক্ষক-শিক্ষণ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা :—আগেকার দিনে শিক্ষাদান কার্যে মনোবিজ্ঞানের বিশেষ স্থানে আছে বলে মনে করা হ'ত না। বিষয়বস্তুতে পাণ্ডিত্য থাকলেই আর ভালোভাবে বক্তৃতা করতে পারলেই শিক্ষাদান ভালো হবে বলে মনে করা হ'ত। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানকে শিক্ষার প্রতিকূল বলেই মনে করা হত। পেষ্টালৎসী প্রথম এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান সম্মত করতে চান। আজকের যুগ হল শিশুশিক্ষার যুগ। শিক্ষা পদ্ধতি হ'ল সেই পদ্ধতি যা শিশুর স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে করে আনন্দময়, মনকে দেয় স্ফূর্তি, শিশুকে করে সমাজ ও রাষ্ট্রের সুযোগ্য নাগরিক। শিক্ষা আর এখন চাপিয়ে দেওয়া বোঝা নয়। শিক্ষকের প্রধান কাজ হল শিশুমনকে জানা। শিক্ষার্থীর স্থান এখন সর্বাগ্রে, শিক্ষক শুধু সুপরিচালক। শিক্ষকের জন্য শিক্ষা নয়—শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যই শিক্ষা, তবে শিক্ষকের

ভূমিকা এতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। তিনি শিক্ষার্থীকে কেবলমাত্র জ্ঞানলাভেই সাহায্য করবেন না, তাদের মনে পাঠ্যবিষয়ে অনুরাগ ও আগ্রহের সৃষ্টি করবেন। শিশুদের বিকাশ কি ভাবে ঘটে, শিক্ষায় শিশুদের ইচ্ছা কিরূপ, তাদের প্রকৃতি, প্রক্ষোভ, বুদ্ধি ও অন্যান্য মানসিক শক্তি সম্বন্ধে শিক্ষকের জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন, এ ছাড়া শিক্ষক নিজে শিক্ষাদান কার্যে কতদূর সফল এবং কতটা যোগ্য তা জানারও প্রয়োজন আছে। এই সমস্ত কারণে শিক্ষামনোবিজ্ঞান প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠক্রমে বিশেষ স্থান পেয়েছে। এটি শিক্ষককে কিভাবে শিক্ষাদান কার্যে সাহায্য করে, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল :-

১। অল্প সময়ে কিভাবে শিক্ষাদান করলে শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হবে ও শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে শিক্ষক তা জানতে পারেন।

২। শিক্ষার লক্ষ্যে কিভাবে স্বল্পতম প্রয়াসে পৌছান যায় সে সম্বন্ধে পথনির্দেশ করে।

৩। শিক্ষক ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে প্রভেদের কথা জানতে পারেন।

৪। শিক্ষক তাঁর নিজের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারেন।

৫। শিক্ষার নূতন নূতন পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষককে অবহিত করে।

৬। শিক্ষার্থী সম্বন্ধে শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের পরিবর্তন ঘটায়।

৭। শিক্ষকের নিজের মানসিক সঙ্গতি বিধানে সাহায্য করে।

৮। মনোবিজ্ঞান সম্মত পরিমাপ পদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষককে পরিচিত করে।

পরিশেষে এক কথায় বলা যেতে পারে শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই জন্যই এটিকে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থায় (প্রাথমিক হতে স্নাতকোত্তর) আবশ্যিক বিষয় বলে গণ্য করা উচিত।

প্রত্যেক শিক্ষকই 'শিক্ষার' সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বলতে গেলে, তাঁদের সমস্ত আচরণ শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। মনোবিজ্ঞান কিভাবে তাঁদেরকে শিক্ষাদান কার্যে সাহায্য করে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল। এ ছাড়াও শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্কের কথাটি আমরা নীচে আলোচনা করছি :—

(১) শিক্ষা ব্যবহারমূলক, মনোবিজ্ঞানও তাই।

(২) শিক্ষার একটি লক্ষ্য থাকবেই যে লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করে মনোবিজ্ঞান।

(৩) শিক্ষামূলক পরিস্থিতিতে যে সমস্ত বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা দেখা যায়, সেই জাতীয় সমস্যা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও দেখা যায় এবং মনোবিজ্ঞানই ঐ সমস্ত সমস্যার কারণ ও সমাধানের ব্যাখ্যা করে দেয়।

(৪) শিক্ষক ও মনোবিজ্ঞানীদের কাজের প্রকৃতি প্রায় এক রকমের।

এর জন্য অনেকে বলে থাকেন, শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলে। শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান যেন একই পাখীর দুটি ডানা, একই মুদ্রার দুটি পিঠ। একটিকে বাদ দিয়ে আর একটি অসম্পূর্ণ ও অক্ষম।

এখন শিক্ষা যে যে বিষয়ে মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, সেগুলির কথা উল্লেখ করা হল —

(১) ব্যক্তিগত বৈষম্য, (২) শিখনের সূত্র ও নিয়মাবলী, (৩) ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ, (৪) বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ, (৫) স্মৃতি, বিস্মৃতি ও মনোযোগ, (৬) প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ, (৭) দলগত মনোবিজ্ঞান বা শ্রেণীতে ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় সম্পর্কের পরিচয় দেয়, (৮) অসঙ্গতির কারণ নির্ণয় ও তার সমাধান (৯) মনোবিজ্ঞানমূলক পরিমাপ, (১০) বৃত্তিমূলক নির্দেশনা ইত্যাদি। মনোবিজ্ঞানের কর্মধারা ও পরিধি লক্ষ্য করে Mc-Dougall মন্তব্য করেছেন : The aim of psychology is to render our knowledge of human nature more exact and more systematic in order that we may control ourselves more wisely and influence our fellowmen more effectively. মনোবিজ্ঞানী ড্রেভারের মতে শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান হ'ল শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। এই বিষয়টির সাহায্য ছাড়া শিক্ষামূলক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য : আগেই বলা হয়েছে মনোবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান এবং অস্তিবাচক (Positive) বিজ্ঞান। কিন্তু তা ছাড়াও অন্যান্য ভৌত বিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। বিজ্ঞান হ'ল তথ্যের সুসমঞ্জস পর্যবেক্ষণ। এরজন্যও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়, সেগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয় এবং বিভিন্ন পরীক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। মনোবিজ্ঞান এ সমস্ত শর্ত ঠিকমত পালন করে। আমাদের বিভিন্ন জাতীয় অভিজ্ঞতাই দু'রকমের হ'তে পারে। যখন কোন একটি অভিজ্ঞতা সকলে একই ভাবে অর্জন করে তখন তাকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ অভিজ্ঞতা বলা হয় কিন্তু যখন একই অভিজ্ঞতা বিভিন্ন জনে

বিভিন্ন ভাবে অর্জন করে তখন তাকে ব্যক্তি নির্ভর অভিজ্ঞতা বলে (Dependent of the experiencing person)। ভৌত বিজ্ঞানে স্থান, কাল, পাত্র সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় হলেও মনোবিজ্ঞানে তা হয় না। বেলা ৩টা থেকে ৬টা ও সন্ধ্যে ৬টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত কাল ব্যবধান ৩ ঘণ্টা করে এবং ভৌত বিজ্ঞান বলবে এই ব্যবধান সমান। কিন্তু দুটির মধ্যে কাল ব্যবধান এক হ'লেও আসলে দুটি ব্যবধান কিন্তু একই নয়। তেমনি ধরা যাক ৩ ঘণ্টা সময় সিনেমা হলে বসে কাটানো হ'ল আর তিন ঘণ্টা সময় একটি নির্জন ছোট স্টেশনে ট্রেন ফেল করে পরের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে হ'ল। ভৌত বিজ্ঞান যদিও বলবে দুটি সময়ের পরিমাণ একই, তবুও আমাদের মনে হবে সিনেমা হলে সময়টা তাড়াতাড়ি কেটে গেল, কিন্তু স্টেশনে সময় যেন কাটছে না। সুখের রাত তাড়াতাড়ি পোহায় দুখনিশি বুঝি কাটে না। কিন্তু দু'টি রাতের পরিমাণ এক হ'লেও এক রকম মনে হবে না। দিনের বেলায় একটি বটগাছকে সকলেই বটগাছ হিসাবেই দেখছে (ব্যক্তি-নিরপেক্ষ)। কিন্তু রাত্রে ঐ বটগাছকে আমি দেখছি কাবুলীওয়ালা, আমার বন্ধু দেখছে বাউল একতারা বাজাচ্ছে (ব্যক্তি-নির্ভর)। তেমনি আকাশে কালো মেঘে কেউ দেখে হাতী, কেউ ভালুক, কেউ দৈত্য দানা, রাক্ষস খোক্কস আবার কেউ বা দেখে বিরহিনী শ্রীরাধার আলুলায়িত কুন্তলভার। অভিজ্ঞতাগুলি যখন ব্যক্তি নিরপেক্ষ হয় তখন সেগুলি ভৌতবিজ্ঞানের আওতার মধ্যে পড়ে। আর যখন সেগুলি ব্যক্তি-নির্ভর হয় তখন তা মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষণ অধ্যায়ে এ জাতীয় বহু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

মনোবিজ্ঞানমূলক অভীক্ষারও একটা বৈশিষ্ট্যও আছে। এর কোন পূর্ব নির্ধারিত উত্তর নেই। ব্যক্তি যে উত্তর দেয় সেইটিকে সঠিক বলে ধরে নিয়ে তার থেকেই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে বের করতে হয়।

সবশেষে শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে H. R. Bhatia-র বক্তব্য দিয়ে আলোচনা শেষ করছি : Educational Psychology is regarded as a branch of applied Psychology and most text books describe facts and principles of General Psychology and then show how they can be used by the School. But this is too vague. Educational Psychology is a science in its own right and thought. It draws most of its material from General Psychology, it has its own standpoint and scope.

॥ দুই ॥

। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি ।

(Methods of Educational Psychology)

মনোবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে যে রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ আছে মনোবিজ্ঞানেও সেই রকম আছে। তবে মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ বিজ্ঞানের একটা বড় তফাৎ আছে। সাধারণ বিজ্ঞান সাধারণতঃ জড় পদার্থ নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষণের বিষয়বস্তু হ'ল মানুষ—তার আচরণ ও মন। মানুষ তো যন্ত্র নয়। তার মনের গতি বিচিত্র আচরণ-ধারা আরো বিচিত্র, কাজেই কোন একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে মানুষের মন ও আচরণের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। মনকে ভিতর ও বাহির—দু'দিক থেকেই দেখতে হবে এবং তার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। আগেই বলা হয়েছে—১৮৭৯ সালে জার্মান মনোবিদ্ ভুণ্ড লিপ্‌জিগে প্রথম মনোবিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপন করেন এবং তখন থেকেই মনোবিজ্ঞানে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়। ভুণ্ড এবং তাঁর ছাত্রগণ মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানারকম গবেষণা করে অনেক নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মনোবিজ্ঞান অনেক নতুন নতুন শাখাতে বিভক্ত হয়ে যায়। এদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি দ্রুত উন্নত হয়। ফ্রয়েড্ (Freud) তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতির সাহায্যে মনোবিজ্ঞানকে আরো উন্নত করেন। সবশেষে আসে—পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্য সত্যই যুগান্তর এনেছে। এখন বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে :—

১। **অন্তর্দর্শন (Introspection) :** অন্তর্দর্শন হ'ল এক প্রকার পরীক্ষণ। কিন্তু সাধারণ পরীক্ষণের সঙ্গে এর পার্থক্য হ'ল—এতে বাইরের জিনিস পর্যবেক্ষণ না করে ভিতরের জিনিস পর্যবেক্ষণ করা হয়। কোন একজন লোক তার মনের খবর নিজেই সবচেয়ে বেশী জানতে পারে। ব্যক্তি নিজেই যখন তার নিজের মানসিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতি ও কাজ বৈজ্ঞানিকসুলভ দৃষ্টিতে

পর্যবেক্ষণ করে, তখনই তাকে **অন্তর্দর্শন** বলে। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকেও অন্তর্দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। যখন আমরা বলি 'খিদে পেয়েছে' বা 'তেষ্টা পেয়েছে'—তখন কি করে তা বলি? নিশ্চয়ই নিজের মনের দিকে তাকিয়ে। অন্তর্দর্শনের সাহায্যে প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ মনে কি ঘটছে তা প্রত্যক্ষ ভাবে জানতে পারে। রাগ, দুঃখ, ভয়, আনন্দ বা ঘৃণা হ'লে মনে কি রকম অনুভূতি হয়; কিংবা সমস্যার কোন সমাধান করতে হ'লে মনে কি জাতীয় চিন্তার উদ্রেক হয়, তার খবর পাওয়া যেতে পারে একমাত্র অন্তর্দর্শনের সাহায্যে। তবে অন্তর্দর্শন কেবলমাত্র মনের কথা সাধারণ ভাবে বর্ণনা করা বা গল্পের ছলে অভিজ্ঞতা আলোচনা করা নয়; বিজ্ঞানসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মনের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াকে সুনির্দিষ্ট ও সুসংবদ্ধ রূপে পর্যবেক্ষণ করে তার বাস্তব বিবরণ দেওয়াই হ'ল প্রকৃত অন্তর্দর্শন। একথা বলা যেতে পারে—নিজের চেতনার সাহায্যে নিজেরই চেতনাগত পরিবর্তনগুলিকে পর্যবেক্ষণ করার নাম অন্তর্দর্শন (Introspection)।

বিগত শতাব্দীতে অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান যখন বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হয়নি, তখন অন্তর্দর্শনই ছিল মনোবিজ্ঞানের একমাত্র পদ্ধতি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীরা অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রবল যুক্তি খাড়া করলেন। যেমন **প্রথমতঃ**, এই পদ্ধতিটির উপর ব্যক্তির নিজস্ব প্রভাব অত্যন্ত বেশী। ব্যক্তি যা বলে, তাই মেনে নিতে হয়, ফলে বক্তব্যের সত্যতা অনেকাংশে খর্ব হতে পারে। **দ্বিতীয়তঃ**, অশিক্ষিত ব্যক্তি বা শিশুদের পক্ষে অন্তর্দর্শন করা সম্ভব নয়; ফলে পদ্ধতিটি সর্বজনীন নয়। **তৃতীয়তঃ**, যেটিকে আমরা অন্তর্দর্শন বলছি, সেটি প্রকৃতপক্ষে **অনুস্মরণ** বা **পুনর্ভাবন** (Retrospection)। যে মুহূর্তে কোন চেতনাগত পরিবর্তনকে পর্যবেক্ষণ করতে যাই, সেই মুহূর্তেই সেটি অন্তর্হিত হয়ে যায়, সেটি অন্তর্হিত হয়ে যাবার পর আমরা তার কথা স্মরণ করতে পারি। **চতুর্থতঃ**, অন্তর্দর্শন করতে বসলে যে পরিবর্তনের জন্য অন্তর্দর্শন করা হচ্ছে—সেই চেতনাগত পরিবর্তনটি লুপ্ত হয়ে যায়। আমার রাগ হয়েছে, কিন্তু সেই রাগটি কেমন—তার প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্বন্ধে চিন্তা করতে বসলে আর রাগটি থাকবে না। এইজন্যই James[1] বলেছেন—"অন্তর্দর্শনের বিশ্লেষণ হ'ল একটা ঘুরন্ত লাটিমের ঘুরণ কেমন তা দেখবার জন্য হাতে করে সেটা তুলে নেওয়ার মত; অথবা

1. William James—Principles of Psychology, Vol—1.

অন্ধকার কেমন তা দেখবার জন্য আলোটা জেলে দেওয়ার মতো।" পঞ্চমতঃ, অন্তর্দর্শনের সাহায্যে চেতনার সম্বন্ধে সর্বজনীন কোন সত্যের উদ্‌ঘাটন সম্ভব নয়—কারণ যে কোন চেতনাগত পরিবর্তনকে আমরা একবারের বেশী পর্যবেক্ষণ করতে পারি না। অন্যান্য বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণের বস্তুটিকে যতবার খুশী পর্যবেক্ষণ করতে পারেন ; কিন্তু মনোবিজ্ঞানী চেতনাগত পরিবর্তন একাধিক বার পর্যবেক্ষণ করার কোন সুযোগই পান না। তবে বিশেষ একটি চেতনাগত পরিবর্তনকে একাধিকবার পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব না হলেও বিভিন্ন সময়ে বহুবার একই রকম চেতনাগত পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব।

এ সমস্ত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও অন্তর্দর্শনকে কিন্তু বাদ দেওয়া যায় না। মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও চেতনার বিবিধ পরিবর্তন জানার একমাত্র উপায়ই হ'ল অন্তর্দর্শন। অন্তর্দর্শনের সাহায্যে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য না হ'লেও—এগুলি যে মনোবিজ্ঞানীর গবেষণায় যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে যদি অন্তর্দর্শন করা যায়, তবে চেতনার সম্বন্ধে নানাপ্রকার সর্বজনীন সত্য উদ্‌ঘাটন করা সহজ হয়। তাছাড়া উপরে যে সমস্ত অসুবিধার কথা বলা হয়েছে, চেষ্টা করলে সেগুলি অনেকাংশে কম করা সম্ভব। মানসিক প্রক্রিয়ার সঠিক জ্ঞান পেতে হ'লে অন্তর্দর্শনই হ'ল সহজ ও অধিকতর নির্ভরযোগ্য উপায়। [অন্তর্দর্শন হ'ল ব্যক্তিমুখী পদ্ধতি (Subjective)। এখানে মনকে জানার চেষ্টা করা হয় কতকগুলি আভ্যন্তরিণ লক্ষণের সাহায্যে। পরিদর্শন (Inspection) হ'ল বস্তুমুখী পদ্ধতি (Objective)। এখানে মনকে জানার চেষ্টা করা হয় কতকগুলি বাহ্যিক লক্ষণের সাহায্যে]

অন্তর্দর্শনের অসুবিধা সম্বন্ধে আর একটি কথা বলতে হয়। এই পদ্ধতিতে মন নিজেই একাধারে দর্শক ও দৃশ্য (Observed)। এতে মনকে একই সঙ্গে মনের প্রক্রিয়া ও মনের বিষয়, এই দু'ভাগে ভাগ করতে হয়। আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াগুলি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ও দ্রুত পরিবর্তনশীল। সুতরাং এগুলির দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। যে প্রক্রিয়াগুলি অপেক্ষাকৃত মন্থর, আমরা সেগুলি সম্বন্ধে বেশী তথ্য পরিবেশন করতে পারি। Stout-এর মত হ'ল[1]—"যদিও অন্তর্দর্শন পদ্ধতি কঠিন, তবুও তা অসম্ভব নয় এবং এর ত্রুটিগুলি দুরারোগ্য নয়।"

1. Stout—Manual of Psychology.

২। **পরীক্ষণ (Experiment) ঃ** আধুনিক যুগ হ'ল বিজ্ঞানের যুগ। মনোবিজ্ঞান একটি গবেষণামূলক বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের পদ্ধতি হ'ল—পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পরীক্ষণ হ'ল পর্যবেক্ষণেরই উপায়। কোন ঘটনা বা প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা ও তার সঙ্গে অন্য কোন ঘটনা বা প্রক্রিয়ার কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে পরীক্ষণই হ'ল সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি। কোন একটি ঘটনা ঘটার জন্য কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শর্তের অধীনে কোন একটি ঘটনা ঘটে থাকে, আর ঐ বিশেষ শর্তের যদি পুনরাবির্ভাব ঘটানো যায়, তবে ঘটনাটিরও পুনরাবৃত্তি হয়। আমাদের আচরণও তো এক ধরনের প্রাকৃতিক ঘটনা। এই ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। পরীক্ষণ পদ্ধতিতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শর্ত সৃষ্টি করে একটি ঘটনা ঘটানো হয়। তারপর তার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা হয়। এইবার ঐ বিশেষ বিশেষ শর্তগুলির মধ্যে যে ঘটনাটি ঘটার পক্ষে অপরিহার্য, সেটি খুঁজে বের করা হয়। এই অপরিহার্য শর্তটি অনাবশ্যক শর্তগুলির মধ্যে এমন ভাবে মিশে থাকে যে সেটিকে সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই বিশেষ শর্তটিকে খুঁজে বার করার জন্য বিশেষ একটি পন্থা অবলম্বন করা হয়, এর নাম হ'ল—পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন সাধন (Varying the circunstances)। এই পদ্ধতিতে একটি ছাড়া অপর সব শর্তগুলিকে অপরিবর্তিত রেখে ঐ বিশেষ শর্তটিকে পরিবর্তিত বা অপসারিত করে দেখা হয় সেটিই ঘটনাটি ঘটার প্রকৃত কারণ কি না। এইভাবে প্রত্যেকটি শর্তকে একে একে পরীক্ষা করে প্রকৃত কারণটি খুঁজে বার করা হয়। যে শর্তটির পরিবর্তন করে ফলাফল লক্ষ্য করা হয়, তাকে পরীক্ষার independent variable বলে। বিজ্ঞানী এ অবস্থাকে স্বাধীন ভাবে পরিবর্তন করতে পারেন। অবস্থা পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে dependent variable বলে। একসঙ্গে কিন্তু একটি মাত্র শর্তের পরিবর্তন করা চলে।

একটি উদাহরণের সাহায্যে পরীক্ষণ পদ্ধতির উদাহরণ দেওয়া যাক্। মনে করা যাক্—পুরস্কার দান দ্রুত ও সন্তোষজনক পাঠ শিক্ষার সহায়ক কি না—তা জানতে হবে। এর জন্য দু-দল শিক্ষার্থীকে বেছে নিতে হবে যাদের শিখনের ক্ষমতা, বুদ্ধি ইত্যাদি একই। এবার তাদের একই পরিবেশের মধ্যে একই পাঠ্য বিষয় একই পদ্ধতিতে শেখান হ'ল। কিন্তু একটি দলকে পুরস্কার দেওয়া হ'ল, অপর দলকে হ'ল না। যে দলটিকে পুরস্কার দেওয়া হ'ল—তারা হ'ল

পরীক্ষণমূলক দল (Experimental Group)—কারণ পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এই দলটিকে সচেষ্ট শক্তিপ্রয়োগ দ্বারা পরিবর্তিত করার চেষ্টা করা হ'ল। এই দলকে যাদের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে—অর্থাৎ যারা পুরস্কার পেল না—তারা হচ্ছে **নিয়ন্ত্রিত দল** (Control Group)। ঘটনাটা হ'ল নিম্নরূপ—

পরীক্ষণমূলক দল → নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয় + নির্দিষ্ট পরিবেশ + নির্দিষ্ট শিখন ক্ষমতা + নির্দিষ্ট পদ্ধতি + **পুরস্কার** = পাঠশিক্ষা

নিয়ন্ত্রিত দল → নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয় + নির্দিষ্ট পরিবেশ + নির্দিষ্ট শিখন ক্ষমতা + নির্দিষ্ট পদ্ধতি + O = পাঠশিক্ষা

এখন যদি দেখা যায় প্রথম দল অর্থাৎ পরীক্ষণমূলক দল দ্বিতীয় দল অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত দলের চেয়ে সহজে ও ভাল ভাবে পাঠ শিখেছে তবে বুঝতে হবে পুরস্কার দান পাঠশিক্ষার সহায়ক। আবার যদি দেখা যায় নিয়ন্ত্রিত দলের পাঠের গতি পরীক্ষণমূলক দলের চেয়ে ভাল, তবে বুঝতে হবে পুরস্কার দান পাঠশিক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর। আর যদি দেখা যায় পাঠশিক্ষাব ক্ষেত্রে দু-দলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তবে বুঝতে হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরস্কার দেওয়া না দেওয়া দুই-ই সমান।

এই পদ্ধতির সাফল্যের জন্য তিনটি বস্তুর প্রয়োজন। **এক**, যে ঘটনা নিয়ে পরীক্ষা চালানো হবে তার পুনরাবৃত্তি (এখানে পাঠশিক্ষা); **দুই**, যে শর্তটি নিয়ে পরীক্ষণ করা হচ্ছে, তার উপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা (এখানেই পুরস্কার দান) এবং **তিন**, পরীক্ষার বিষয়গুলি পরিবর্তনশীল হওয়া চাই।

সহজেই বোঝা যাচ্ছে, এরকম পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন। এ পরীক্ষার জন্য এমন দুটি দলের প্রয়োজন—যারা সবদিক থেকেই সমান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ রকম দল সংগ্রহ করা সহজ নয়। কয়েক জোড়া যমজ শিশু (identical twins) নিয়ে তাদের দুটি সমান দলে ভাগ করা যেতে পারে। কিন্তু এ রকম শিশুর সংখ্যাও অত্যন্ত কম। কাজেই মোটামুটি একই সমাজের, একই অবস্থার, একই বয়সের এবং প্রায় সমান বা সমান বুদ্ধ্যঙ্ক-বিশিষ্ট দুই দল ছেলে নিয়ে পরীক্ষা চালাতে হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে—কঠোর বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা অনুযায়ী পরীক্ষার ব্যবস্থা করা মনোবিজ্ঞানে অত্যন্ত কঠিন। উচ্চতর মানসিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

৩। **জীবনেতিহাস সংগ্রহ** (Case Study): কোন একজন লোকের

বা শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে হলে সেই আচরণটি সম্বন্ধে যত বেশী তথ্য জানো যায়, ততই ভাল। আচরণটি কখন ও কিভাবে ঘটতে শুরু করল তা সঙ্গে সঙ্গে জানা যায় না। আমেরিকার গেসেল্ ইনস্টিটিউট শিশুর বুদ্ধি ও আচরণের বিকাশের সর্বজনীন সূত্র খুঁজে বের করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার শিশুর জীবন ইতিহাস সংগ্রহ করে সেগুলির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিভাগ করেন। এই জীবন ইতিহাস সংগ্রহ করার মাধ্যমে আচরণের তথা মনের গতি ও পরিণতি জানার পদ্ধতিকে **Case-study Method** বলা হয়। বর্তমানে এই পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এতে সাফল্যের পরিমাণও অনেক বেশি। মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, অপরাধপ্রবণ বালক বা অসামান্য কৃতী পুরুষের বর্তমান অবস্থার জন্য তাদের অতীত ইতিহাস কতটা দায়ী, তা জানা একান্ত প্রয়োজন। তবে এই ইতিহাস সংগ্রহের কাজটা প্রত্যক্ষ ভাবে না করে পরোক্ষ ভাবে করা হয়। বিভিন্ন ভাবে এই ইতিহাসের তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হয়—যেমন কিছুটা ব্যক্তির নিজের কথাবার্তা থেকে, কিছুটা তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা প্রতিবেশীর নিকট থেকে, কিছুটা ব্যক্তির পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে, কিছুটা তার পারিবারিক ইতিহাস ও কিছুটা ব্যক্তির ডায়েরী ইত্যাদি থেকে। কেস্-স্টাডিতে সাধারণতঃ যে সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তার একটা তালিকা এখানে দেওয়া হ'ল—

[এক] ব্যক্তির পরিচিতি সম্বন্ধীয় তথ্য (Identifying data)।

[দুই] সমস্যা (যেটি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে) সম্বন্ধীয় বিবরণ।

[তিন] পারিবারিক ইতিহাস।

[চার] ব্যক্তির বিভিন্ন দিকের বৃদ্ধিমূলক তথ্য (বুদ্ধি, প্রক্ষোভ, সামাজিক ইত্যাদির বিকাশ-সম্বন্ধীয়)।

[পাঁচ] ব্যক্তির শিক্ষার ক্রমবিকাশ।

[ছয়] ব্যক্তির অভ্যাস, সঙ্গতিসাধক আচরণ, হবি, ভালো লাগা, মন্দ লাগা ইত্যাদি।

[সাত] স্বাস্থ্য ও অন্যান্য শারীরিক বৈশিষ্ট্য।

এই পদ্ধতিতে জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে সেগুলিকে একত্রিত করে ব্যক্তি-জীবনের ক্রমবিকাশের একটা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস খাড়া করা যেতে পারে।

৪। **ক্রমবিকাশ পদ্ধতি** (Genetic Method): **জন্মের অব্যবহিত**

পরেই শিশুর জীবনে ধারাবাহিক বিকাশের কাজ শুরু হয়ে যায়। তার দেহে ও মনেও ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হয়। এই সমস্ত পরিবর্তনের সময় তার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার উদ্ভব ঘটে। এই সমস্ত ক্ষমতা যদি অবিচ্ছিন্ন ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়, তা হ'লে তার আচরণ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। শিশুর জন্ম থেকে পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্যন্ত বিকাশমান বিভিন্ন দিক এতে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এর জন্য অবশ্যই দীর্ঘ সময় ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। পর্যবেক্ষণ যদি সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হ'য়ে যেতে পারে। নবজাত শিশুর মধ্যে বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, সামাজিকতা ইত্যাদি নিতান্ত অঙ্কুরাবস্থায় থাকে। এগুলি শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কি ভাবে পরিবর্তিত হয় ও ক্রমশ জটিল হ'তে থাকে, সে সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করা সম্ভব—এই পদ্ধতিটির সাহায্যেই।

এই পদ্ধতিটিকে অনেক মনোবিজ্ঞানী দু'ভাগে ভাগ করে থাকেন। এক, তাড়াতাড়ি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Cross sectional) এবং দুই, দৈর্ঘ্য বরাবর পর্যবেক্ষণ (Longitudinal)। প্রথম পদ্ধতিতে বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন বয়সের বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একটা সাধারণ ও সর্বজনীন সূত্রে উপনীত হওয়া যায়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে একটি বিশেষ দলকে বিভিন্ন বয়সে ও বিভিন্ন সময়ে পর্যবেক্ষণ করে তাদের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা হয়। প্রথম পদ্ধতিতে সময় কম লাগে, কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যগুলি ততটা নির্ভরযোগ্য হয় না; আবার দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সময় অনেক বেশী লাগে, কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যগুলি অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

৫। **ব্যাধি-নিরূপণ বা চিকিৎসামূলক পদ্ধতি (Clinical):** মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের রোগের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করার জন্য মনোবিদ্‌গণ কেবলমাত্র রোগীকেই পর্যবেক্ষণ করেন না, সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তার সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। এই পদ্ধতিটির নাম চিকিৎসামূলক পদ্ধতি। মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মনশ্চিকিৎসায় শাস্ত্র বা Psychiatry-র দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে। ইয়ুং, এ্যাড্‌লার, ফ্রয়েড্‌ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানী-চিকিৎসকের অক্লান্ত গবেষণার ফলে একটি নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছে। বিশেষতঃ ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ বা Psycho-analysis থেকে

মানসিক ব্যাধির স্বরূপ সম্বন্ধে যে সমস্ত মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেছে, সেগুলি মানসিক ব্যাধির চিকিৎসাকে অনেকখানি নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত করেছে। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড়। শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের উপর। যে শিক্ষার্থী মনের দিক দিয়ে অসুস্থ, সে শিক্ষাক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত ফলেরই সৃষ্টি করে থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে বাঞ্ছিত ফললাভের জন্যই বর্তমানে এই পদ্ধতিটি বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে মনশ্চিকিৎসার শাস্ত্রে প্রচলিত যে সমস্ত পদ্ধতি ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয় সেগুলি হ'ল—

অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি (Free Association Method): এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে বলা হয়—"আপনার মনে যে সমস্ত কথা বা চিন্তার উদয় হচ্ছে, (সেগুলি যতই অসংস্কৃত বা অমার্জিত হোক না কেন) আপনি সেগুলি বলে যান।" অর্থাৎ বিনা বাধায় ব্যক্তিকে তার মনের কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়। দেখা গেছে, এইভাবে ব্যক্ত করার ফলে মনের গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন তলদেশে যে সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে তার মানসিক রোগের উদ্ভব হয়েছিল, সেগুলির প্রকৃত স্বরূপ চিকিৎসকের কাছে ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং চিকিৎসকের পক্ষে চিকিৎসা করার কাজটিও সহজ হয়।

প্রতিফলন অভীক্ষা (Projective Tests): প্রতিফলন অভীক্ষা হ'ল ব্যক্তির অপ্রকাশিত ব্যক্তি-সত্তাটি জানার জন্য অভীক্ষা। এই অভীক্ষাগুলির মাধ্যমে ব্যক্তির ঐ অপ্রকাশিত ব্যক্তি-সত্তাটি বাইরে প্রতিফলিত হয় বলেই এগুলিকে প্রতিফলন অভীক্ষা বলা হয়। রর্সার ইঙ্কব্লট অভীক্ষা (Rorschach Inkblot Test), কাহিনী সংবোধন অভীক্ষা (Thematic Apperception Test বা T. A. T), শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা (Word Association Test) প্রভৃতি এই জাতীয় অভীক্ষা। এইগুলি সম্বন্ধে 'ব্যক্তি-সত্তা' অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আবার প্রশ্নগুচ্ছ (Questionnaire), ব্যক্তি-সত্তা নির্ণায়ক প্রশ্নাবলী (Personality Inventory) ইত্যাদিও চিকিৎসামূলক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

৬। **পরিসংখ্যান পদ্ধতি** (Statistical Method): পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে পরিসংখ্যান পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়েছে। শিক্ষাশ্রয়ী পরিসংখ্যান নামে একটি পৃথক শাখাই গড়ে উঠেছে। বর্তমান কালে এই পদ্ধতি যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ

করেছে। যেখানেই সম্ভাব্যতার পরিমাণ ও গড় নির্ণয়ের প্রশ্ন আছে, সেখানেই এই পদ্ধতি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে মানসিক কার্যের বিভিন্ন দিকগুলিকে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন মানসিক শক্তির প্রকৃত স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব। তাছাড়া এই পদ্ধতির সাহায্যে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে প্রভেদ জানা সম্ভব, প্রশ্ন করার নূতন ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি জানা এবং পরীক্ষার ফল যথাযথ ভাবে ব্যাখ্যা করাও সম্ভব।

৭। **অন্যান্য পদ্ধতি :** উন্নততর প্রাণীর (শিম্পাঞ্জী, বানর) ক্রমবিকাশ ও বিশেষ বিশেষ আচরণের সঙ্গে মানবশিশুর ক্রমবিকাশ ও বিশেষ বিশেষ আচরণের তুলনা করলে শিখন, মনে রাখা, ভুলে যাওয়া, রাগ, ভয়, আনন্দ ইত্যাদি সম্বন্ধে ও শিশুর আচরণের মৌলিক প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা সম্ভব। এই পদ্ধতিটির নাম—**সাদৃশ্য নিরূপণ বা তুলনামূলক পদ্ধতি** (Comparative method)। কোন একজন লোক সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করার জন্য তার সঙ্গে (প্রয়োজন বোধ হ'লে অন্যান্য ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে) মুখোমুখি বসে সরাসরি কথাবার্তা বা আলাপ আলোচনা করার নাম—**সাক্ষাৎকার পদ্ধতি** (Interview)।

প্রত্যেক শিক্ষকই 'শিক্ষার' সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। বলতে গেলে, তাঁদের সমস্ত আচরণ শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। মনোবিজ্ঞান কিভাবে তাঁদেরকে শিক্ষাদান কার্যে সাহায্য করে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল। এ ছাড়াও শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্কের কথাটি আমরা নীচে আলোচনা করছি—

(১) শিক্ষা ব্যবহারমূলক, মনোবিজ্ঞানও তাই।

(২) শিক্ষার একটি লক্ষ্য থাকবেই যে লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করে মনোবিজ্ঞান।

(৩) শিক্ষামূলক পরিস্থিতিতে যে সমস্ত বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা দেখা যায়, সেই জাতীয় সমস্যা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও দেখা যায় এবং মনোবিজ্ঞানই ঐ সমস্ত সমস্যার কারণ ও সমাধানের ব্যাখ্যা করে দেয়।

(৪) শিক্ষক ও মনোবিজ্ঞানীদের কাজের প্রকৃতি প্রায় এক রকমের।

এর জন্য অনেকে বলে থাকেন, শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলে। শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান যেন একই পাখীর দুটি ডানা, একই

মুদ্রার দুটি পিঠ। একটিকে বাদ দিয়ে আর একটি অসম্পূর্ণ ও অক্ষম। শেষ করার আগে শিক্ষা যে যে বিষয়ে মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, সেগুলির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে—

(ক) ব্যক্তিগত বৈষম্য, (খ) শিখনের সূত্র ও নিয়মাবলী, (গ) ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ, (ঘ) বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ, (ঙ) স্মৃতি, বিস্মৃতি ও মনোযোগ, (চ) প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ, (ছ) দলগত মনোবিজ্ঞান—যা শ্রেণীতে ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় সম্পর্কের পরিচয় দেয়, (জ) অসঙ্গতির কারণ নির্ণয় ও তার সমাধান, (ঝ) মনোবিজ্ঞানমূলক পরিমাপ, (ঞ) বৃত্তিমূলক নির্দেশনা ইত্যাদি। মনোবিজ্ঞানের কর্মধারা ও পরিধি লক্ষ্য করে Mc. Dougall মন্তব্য করেছেন: The aim of psychology is to render our knowledge of human nature more exact and more systematic in order that we may control ourselves more wisely and influence our fellowmen more effectively.

॥ তিন ॥

সহজাত প্রবৃত্তি

(Instincts)

[An instinct is an innate disposition which determines the organism to perceive (to pay attention) any object of a certain class and to experience in its presence or certain emotional excitement and an impulse to action which find expression in a specific mode of behaviour in relation to that object—Mc. Dougall.

An emotion is a tendency to fell and an instinct is a tendency to act —James.

An instinct is more a tendency or disposition to act, to behave—Bhatia.

Directly or indirectly the instincts are the prime moves of all human activity—Mc. Dougall

An instinct is an impulse toward a certain mode of behaviour—Ross.]

প্রত্যেক প্রাণীকেই কোন না কোন আচরণ করতে হয়। পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সার্থক ভাবে সঙ্গতিবিধান করে প্রাণীকে বেঁচে থাকতে হয়। এই সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টাগুলিকেই আচরণ বলে। কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে আচরণগুলি সব এক প্রকার নয়। মোটামুটি এগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। কতকগুলি আচরণ হ'ল—**অর্জিত বা শিক্ষাজাত** (Learned বা Acquired), আর বাকীগুলি হ'ল **সহজাত বা অনার্জিত** (Unlearned বা Inherited)। প্রথম শ্রেণীর আচরণ হ'ল সেইগুলি, যেগুলি প্রাণী তার জন্মের পর পারিবেশিক শক্তির চাপে বা নিজের কোন চাহিদা পূরণের জন্য অর্জন করে থাকে। এটা পরিকল্পিত। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর আচরণ হ'ল সেইগুলি যেগুলি কোন প্রকার শিক্ষাপ্রসূত নয়। প্রাণী এগুলি উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করে থাকে এবং যখনই প্রয়োজন হয়, তখনই কোন রকম পূর্ব-অনুশীলন ছাড়াই সেগুলি সম্পাদন করতে পারে। এগুলি বংশগত ভাবে একই শ্রেণীর প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই একভাবে বর্তমান থাকে।

সহজাত আচরণগুলিকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়—রিফ্লেক্স ও শরীর

তন্ত্রমূলক আচরণ এবং প্রবৃত্তিমূলক আচরণ। রিফ্লেক্স ও শরীরতন্ত্রমূলক আচরণ সম্বন্ধে স্নায়ুতন্ত্রের অধ্যায়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখন প্রবৃত্তিমূলক আচরণ ও সহজাত প্রবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক—

সহজাত প্রবৃত্তির স্বরূপ ও কাজ কি তা ঠিক করতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা বহুদিন একমত হতে পারেননি। সাধারণত এটিকে আমরা লৌকিক বা প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করি এবং যে কোন প্রকার কাজ করার শক্তি বা প্রবণতাকেই সহজাত প্রবৃত্তি বলে থাকি। আবার অনৈচ্ছিক ক্রিয়াকেও সহজাত প্রবৃত্তি বলা হয়। অন্ধ আবেগকেও একই নাম দিয়ে থাকি। একথা সত্য যে সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে আবেগ থাকবেই ; কিন্তু দুটিকে অভিন্ন মনে করাও যুক্তিযুক্ত নয়। জেমস্ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন—'আবেগ হ'ল অনুভূতি-প্রবণতা, আর সহজাত প্রবৃত্তি হ'ল কর্ম-প্রবণতা'। তবে একথা ঠিক যে সহজাত প্রবৃত্তি জন্মগত। এদের মধ্যে কতকগুলি জন্মের অব্যবহিত পরেই দেখা যায়, আবার কতকগুলি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়।

প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যে বিভিন্ন জাতীয় মতবাদ পাওয়া যায় সেগুলিকে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়—প্রাচীন ও আধুনিক মতবাদ। প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে ম্যাক্‌ডুগালের মতবাদ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি যেমন সমস্ত প্রাচীন মতবাদের প্রতিনিধি, তেমনি আবার শিক্ষাক্ষেত্রে সহায়ক।

ম্যাক্‌ডুগালের তত্ত্ব ঃ ম্যাক্‌ডুগালের মত অনুযায়ী মানুষের মনে এমন কতকগুলি জন্মগত সূত্রে প্রাপ্ত প্রবণতা আছে যেগুলি তার সমস্ত ভাবনা, চিন্তা ও কাজের অপরিহার্য উৎস। এইগুলি থেকেই সে প্রেরণা লাভ করে। এই জন্মগত সূত্রে প্রাপ্ত প্রবণতাগুলিই হ'ল Instinct.

তিনি তাঁর Social Psychology গ্রন্থে প্রবৃত্তির স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এগুলি হ'ল কতকগুলি সহজাত বিশেষধর্মী মানসিক সংগঠন ; এগুলি কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যেই দেখা যায় ; এগুলি কতকগুলি জাতিগত বৈশিষ্ট্য যেগুলি প্রাণীর পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের প্রচেষ্টার ফলে ধীরে ধীরে আবির্ভূত হয়েছে এবং এগুলি মনোপ্রকৃতির জন্মগত উপাদান বলে কখনই মন থেকে মুছে ফেলা যায় না বা প্রাণী কোন উপায়েই এগুলি তার জীবনকালে অর্জন করতে পারে না।

তাঁর এই ব্যাখার উপর ভিত্তি ক'রে তিনি প্রবৃত্তির সংজ্ঞা দিলেন এইরূপ—প্রবৃত্তি হ'ল এমন একটি সহজাত বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জৈব-মানসিক প্রবণতা (Psycho-physical disposition) যা তার অধিকারীকে প্রবৃত্ত করে—(ক) কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত বস্তু প্রত্যক্ষ করতে বা তাতে মনোযোগ দিতে, (খ) সেই বস্তুটি প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গে কোন বিশেষ একটি প্রক্ষোভ বা আবেগ অনুভব করতে এবং (গ) সেই বস্তুটি সম্বন্ধে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে কাজ করতে বা অন্তত সেইভাবে কাজ করার একটা প্রেরণা অনুভব করতে।

ম্যাকডুগালের দেওয়া এই পদ্ধতির সংজ্ঞা থেকে প্রবৃত্তিজাত কার্যপ্রণালীর চারিটি বিভিন্ন স্তর দেখা যায়। সেগুলি হ'ল—

প্রথম স্তর : আচরণটি জাগাতে সক্ষম এমন কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করা বা তাতে মনোযোগ দেওয়া। এটি হ'ল প্রবৃত্তির **জ্ঞানমূলক বা Cognitive দিক।**

↓

দ্বিতীয় স্তর : বস্তুটি (উদ্দীপক) প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ প্রক্ষোভের জাগরণ। এটি হ'ল প্রবৃত্তির **অনুভূতিমূলক বা Affective দিক।**

↓

তৃতীয় স্তর : প্রক্ষোভ জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে কাজ করার তীব্র তাড়না অনুভব করা। এটি হ'ল প্রবৃত্তির **প্রচেষ্টামূলক বা Conative দিক।**

↓

চতুর্থ স্তর : যেটি নিছক প্রচেষ্টার আকারে ছিল, সেইটির বাস্তবে আচরণের রূপ নিয়ে প্রকাশ। এটি হ'ল প্রবৃত্তির **আচরণমূলক বা Active দিক।**

একটা দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। মনে করা যাক একজন লোক বনে গেছে। সে সেখানে দেখতে পেল একটা বাঘ দূরে আসছে। এখন তার মনোযোগ বাঘের দিকেই কেন্দ্রীভূত হবে। এটিই হ'ল আচরণের প্রত্যক্ষণমূলক বা জ্ঞানমূলক স্তর। বাঘকে আসতে দেখেই তার মনে ভয় জাগলো। এই স্তর হ'ল আচরণের অনুভূতিমূলক স্তর। ভয় জাগার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে তীব্র ইচ্ছা হবে বাঘের হাত থেকে নিস্তার পেতে। সে এমন কোন আচরণ করতে চাইছে (পলায়ন বা গাছে চড়া) যাতে বাঘ তার কোন ক্ষতি করতে না পারে। এটি হ'ল আচরণের

প্রচেষ্টামূলক স্তর। এরপর সে সত্য সত্যই দৌড়াবে কিংবা গাছে চড়ে আত্মরক্ষা করবে। এটি হ'ল আচরণমূলক স্তর এবং এই স্তরেই সত্যকার প্রবৃত্তিমূলক আচরণটি সংঘটিত হ'ল। এখানে বর্ণিত প্রবৃত্তিটির নাম হ'ল—পলায়ন প্রবৃত্তি আর এর কেন্দ্রগত প্রক্ষোভটি হ'ল ভয়। আচরণ হ'ল—পালানো কাজটি বা গাছে চড়া কাজটি।

ম্যাক্‌ডুগালের মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থলে একটি করে বিশেষ জাতীয় প্রক্ষোভ থাকবেই এবং কোন প্রবৃত্তিমূলক আচরণ ঘটার পক্ষে এই কেন্দ্রগত প্রক্ষোভটির জাগরণ অপরিহার্য। এই প্রক্ষোভটিই প্রবৃত্তিমূলক আচরণের পশ্চাতে শক্তি জোগায়। আবার প্রবৃত্তিমূলক আচরণ ঘটার পক্ষে উপরে বর্ণিত প্রত্যেকটি স্তরই অপরিহার্য। মাঝখানে যে কোন একটি স্তর বাদ গেলে সেইখানেই প্রবৃত্তির কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। বাঘ না দেখলে ভয় জাগবে না, ভয় না জাগলে পালাবার তাড়না অনুভূত হবে না, আবার পালাবার তাড়না অনুভূত না হ'লে পালানো কাজটিও হবে না। যে প্রবৃত্তির যে প্রক্ষোভ, সেই প্রক্ষোভটি জাগরিত না হ'লে সেই বিশেষ প্রবৃত্তিটি সক্রিয় হবে না। ভয় ছাড়া পালানো হবে না, বিস্ময় ছাড়া কৌতূহল জাগ্রত হবে না।

ম্যাক্‌ডুগাল এ কথাও বলেন—যে সহজাত আচরণটির সমাপ্তি হ'তে পারে দু'ভাবে। যদি প্রবৃত্তিজাত আচরণটি বাধাপ্রাপ্ত না হয় তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে, তবে একটা পরিতৃপ্তি ও সুখের আনন্দজনক অভিজ্ঞতা অনুভূত হবে। কিন্তু সেটি কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হ'লে অতৃপ্তির দুঃখজনক অভিজ্ঞতা অনুভূত হবে।

॥ প্রবৃত্তির তালিকা ॥

ম্যাক্‌ডুগাল যখন প্রথম মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির তালিকা প্রস্তুত করেন, তখন তিনি মোট চৌদ্দটি সহজাত প্রবৃত্তি ও তাদের অনুগামী চৌদ্দটি প্রক্ষোভের উল্লেখ করেছেন। সেগুলির তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল—

মৌলিক আবেগ (Instinct)	সহজাত প্রবৃত্তি (Primary Emotion)
১। পলায়ন (Escape)	১। ভয় (Fear)
২। যুযুৎসা (Combat)	২। ক্রোধ (Anger)

মৌলিক আবেগ (Instinct)	সহজাত প্রবৃত্তি (Primary Emotion)
৩। ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা (Repulsion)	৩। বিরক্তি (Disgust)
৪। বাৎসল্য (Parental)	৪। স্নেহ বা মমতা (Tender feeling)
৫। অনুনয় (Appeal)	৫। দুঃখবোধ (Distress)
৬। যৌন প্রবৃত্তি (Sex)	৬। কাম (Lust)
৭। কৌতূহল (Curiosity)	৭। বিস্ময় (Wonder)
৮। খাদ্যান্বেষণ (Food-seeking)	৮। ক্ষুধা (Gusto)
৯। যৌথ প্রবৃত্তি (Gregarious)	৯। নিঃসঙ্গতা (Loneliness)
১০। আত্মপ্রতিষ্ঠা (Self-assertion)	১০। আত্মগরিমা (Superiority)
১১। বশ্যতা (Submission)	১১। হীনমন্যতা (Inferiority)
১২। সঞ্চয় (Acquisition)	১২। অধিকারবোধ (Ownership)
১৩। সংগঠন বা নির্মাণ (Construction)	১৩। সৃষ্টি (Creativeness)
১৪। হাস্য (Laughter)	১৪। আনন্দবোধ (Amusement)

এই চৌদ্দটি প্রধান সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়াও ম্যাক্‌ডুগাল আরো কয়েকটি অপ্রধান প্রবৃত্তির উল্লেখ করেছেন। যেমন—কাশি, নিঃশ্বাস ফেলা, মলমূত্র ত্যাগ ইত্যাদি। পরবর্তিকালে তিনি পূর্বোক্ত চৌদ্দটি সহজাত প্রবণতার সঙ্গে আরো তিনটি সহজাত প্রবণতাকে যুক্ত করে মোট সতরটি সহজাত প্রবৃত্তির উল্লেখ করেছেন। এই নতুন তিনটি প্রবণতা এবং তার সহগামী মৌলিক আবেগগুলি হ'ল—

১। বিশ্রাম (Rest)	১। ক্লান্তিবোধ (Fatigue)
২। আরাম (Ease)	২। দুঃখ বিমুখতা (Aversion to Pain)
৩। আবিষ্কার (Exploration)	৩। ভ্রমণ স্পৃহা (Desire to travels)

ম্যাক্‌ডুগালের মতে এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলি মানুষ ও অন্যান্য ইতর প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু ইতর প্রাণীরা তাদের প্রবৃত্তিগুলির সামান্যতম পরিবর্তন ঘটাতেও সক্ষম নয়। পক্ষান্তরে সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে জ্ঞানমূলক

উপাদান থাকার জন্ম মানুষ এগুলিকে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার দ্বারা নানা ভাবে পরিবর্তিত করতে পারে। যখন একসঙ্গে একাধিক সহজাত প্রবৃত্তি কাজ করে, তখন আমরা একটি মিশ্র আবেগগত উত্তেজনা অনুভব করি। এই মিশ্র আবেগের মধ্যে কিন্তু মৌলিক আবেগের গুণগুলি কিছু পরিমাণে অনুভব করা যায়।

সহজাত প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্যঃ সহজাত প্রবৃত্তির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল—

[এক] প্রবৃত্তিগুলি হ'ল জন্মগত বা বংশগত অর্জিত নয়। প্রাণী জন্মগত সূত্রে এই সব প্রবৃত্তির অধিকারী হয়। এগুলি শিক্ষার দ্বারা অর্জন করা যায় না।

[দুই] সহজাত প্রবৃত্তি জন্মগত হ'লেও সব প্রবৃত্তিই জন্মের সময় থেকেই কাজ করে না। পাখীর বাসা বাঁধার প্রবৃত্তি বা ডিমে তা দেওয়ার প্রবৃত্তি কিংবা মানুষের যৌন প্রবৃত্তি জন্মের পরই নিজেকে ব্যক্ত করে না। উপযুক্ত সময়ে এগুলি আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু স্তন্যপানের প্রবৃত্তি বা খাবার ঠুকরে খাবার প্রবৃত্তি জন্মের পরই নিজেকে ব্যক্ত করে।

[তিন] প্রবৃত্তিমূলক কাজগুলি শিক্ষাপ্রসূত না হ'লেও এগুলিতে দক্ষতার অভাব হয় না। প্রথম প্রচেষ্টাতেই পাখী নিখুঁত ভাবে বাসা নির্মাণ করে, মৌমাছি মৌচাক তৈরী করে।

[চার] প্রবৃত্তিজাত আচরণের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর উদ্দেশ্যমূলক দিকটি। প্রবৃত্তিজাত আচরণ উদ্দেশ্য হীন তো নয়ই, বরং একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যই এর উদ্ভব।

[পাঁচ] সহজাত প্রবৃত্তি যদিও প্রাণীর কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধন করে, তবুও সেই উদ্দেশ্যটি সম্বন্ধে প্রাণীর মধ্যে পূর্ব থেকে কোন সুস্পষ্ট চেতনা থাকে না। এগুলি প্রাণীর জৈবিক চাহিদা মেটায় ও আত্মরক্ষা এবং স্বজাতি রক্ষায় সহায়তা করে। বলা যেতে পারে, প্রবৃত্তিগুলি হ'ল কতকগুলি প্রকৃতি-দত্ত অস্ত্র যার সাহায্যে প্রাণী পৃথিবীতে টিঁকে থাকার প্রাথমিক চাহিদাগুলি অন্য কারো সাহায্য ছাড়াই মিটিয়ে ফেলে।

[ছয়] সহজাত প্রবৃত্তি কোন ব্যক্তিবিশেষ বা প্রাণী বিশেষের সম্পত্তি নয়, একটি জাতিগত সম্পত্তি। এগুলি কোন একটি জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই সর্বজনীন ভাবে বিদ্যমান থাকে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বাৎসল্য, যৌনপ্রবৃত্তি ইত্যাদি প্রবৃত্তি যে কোন জাতির প্রত্যেকের মধ্যেই বর্তমান।

WILLIAM Mc. DOUGALL

1871-1938

[সাত] প্রবৃত্তি সারাজীবন ধরেই কার্যকরী থাকে যদিও কিছু কিছু প্রবৃত্তি সারাজীবন সক্রিয় থাকে না এবং থাকলেও অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে না। স্তন্যপান প্রবৃত্তি বড় হ'লে থাকে না।

[আট] সহজাত প্রবৃত্তি জন্মগত এবং বংশানুক্রমিক, একই প্রবৃত্তি একই ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এইজন্য প্রবৃত্তিজাত আচরণের মধ্যে কিছুটা যান্ত্রিকতা লক্ষ্য করা যায়।

[নয়] সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির মধ্যে বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। বুদ্ধিজাত আচরণ পরিবর্তনধর্মী, কিন্তু প্রবৃত্তিজাত আচরণ পূর্ব নির্ধারিত ও অপরিবর্তনীয়।

[দশ] সহজাত প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া কিন্তু দেহের কোন একটি বিশেষ অংশের প্রতিক্রিয়া নয়, সমগ্র দেহযন্ত্রের প্রতিক্রিয়া।

[এগার] সমগ্র পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটে।

[বার] প্রাণীর শারীরিক সংগঠনের সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তির বিশেষ সংযোগ আছে।

[তের] সহজাত প্রবৃত্তি প্রধানত কর্মপ্রবণতা। এই কারণে আবেগের সঙ্গে প্রবৃত্তির উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। আবেগ হ'ল একপ্রকার অনুভূতি, কিন্তু প্রবৃত্তি হ'ল কর্মপ্রবণতা। আবেগ অন্তর্মুখী, প্রবৃত্তি বহির্মুখী। কিন্তু ম্যাকডুগালের মতে, প্রত্যেক প্রবৃত্তির একটি কেন্দ্রগত প্রক্ষোভ আছে। এই প্রক্ষোভটি কার্যকরী না হ'লে প্রবৃত্তি আচরণটি সংঘটিত হয় না। তবে এই প্রবৃত্তি প্রক্ষোভ সম্পর্কটি অবিচ্ছেদ্য কি না, সে বিষয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়।

। ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তি-মতবাদের সমালোচনা ।

১। ম্যাকডুগাল সহজাত প্রবৃত্তিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। হাঁচি, কাশি, নিঃশ্বাস ফেলা প্রভৃতি প্রক্রিয়াকেও তিনি সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অনেক মনোবিজ্ঞানী কিন্তু এই জাতীয় প্রক্রিয়াকে সহজাত প্রবৃত্তির বলে মেনে নিতে রাজী নন।

২। ম্যাকডুগাল প্রবৃত্তির সাহায্যে মানুষের অনেক জটিল আচরণকে

অত্যন্ত সহজভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মানব-আচরণ এত জটিল ও বৈচিত্র্যময় যে সরল প্রবৃত্তির সাহায্যে তার ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

৩। তাঁর মতবাদে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন কর্ম-প্রবণতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মানব-আচরণ কিন্তু কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার সমষ্টি নয়। এর সম্পূর্ণ রূপটি কেবলমাত্র প্রবৃত্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

৪। ম্যাক্‌ডুগালের মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির সহগামী প্রক্ষোভ থাকবেই কিন্তু ড্রেভার, জেমস্‌, গিনস্‌বার্গ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানী এ কথা স্বীকার করেন না।

৫। প্রবৃত্তিজাত আচরণ সর্বজনীন নয়। মানুষের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সমাজে প্রবৃত্তিজাত আচরণ বিভিন্ন। এমন অনেক মানব-সমাজ আছে, যেখানে বাৎসল্য বলে কোন সুনির্দিষ্ট প্রবৃত্তি নেই। শোনা যায়, এস্কিমোরা নাকি রাগ করে না বা ঝগড়া করতে জানে না। তার অর্থ—তাদের যুযুৎসা প্রবৃত্তি নেই।

৬। প্রবৃত্তির সাহায্যে মানব আচরণকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা বিজ্ঞানসম্মত নয়, কারণ প্রবৃত্তি মানব আচরণের কোন বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দেশ করতে পারে না, কেবলমাত্র বর্ণনা করতে পারে।

৭। প্রবৃত্তিজাত আচরণ যান্ত্রিক ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু মানুষের কোন আচরণই তো যান্ত্রিক ও অপরিবর্তনশীল নয়। তাহ'লে কি করে বলা যায় যে মানব আচরণ প্রবৃত্তিজাত ?

৮। ম্যাক্‌ডুগালের মতে সহজাত প্রবৃত্তি শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ। কিন্তু কতকগুলি প্রবৃত্তি কেবলমাত্র জন্মগত সূত্রে প্রাপ্ত নয়, সামাজিক পরিবেশ থেকেও প্রাপ্ত।

৯। ফ্রয়েডের মন সমীক্ষণের সহায়তায় আমরা জানতে পেরেছি যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলিকে পূর্বে সহজাত মনে করা হ'ত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি অর্জিত। তাহ'লে ম্যাক্‌ডুগাল যে সমস্ত সহজাত প্রবৃত্তির কথা বলেছেন, তাদের সংখ্যা অনেক কমে যাবে।

১০। ম্যাক্‌ডুগাল সহজাত প্রবৃত্তি ও সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে কোন সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানেননি। সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগের মধ্যে তিনি একটা পার্থক্যের কথা স্বীকার করেছেন।

১১। প্রবৃত্তির সংখ্যা নির্ণয়ের ব্যাপারে মনোবিজ্ঞানীরা একমত নন।

১২। ম্যাক্‌ডুগাল যে সমস্ত প্রবৃত্তির কথা বলেছেন, সেগুলি সবগুলিই সরল ও অমিশ্র নয়, বরং বেশ জটিল ও একাধিক আচরণের মিশ্র রূপ।

১৩। ম্যাকডুগালের মতে প্রাণীর সমস্ত কাজের পিছনে একমাত্র প্রবৃত্তিই প্রেষণা-শক্তি জোগায় এবং প্রবৃত্তি ছাড়া আচরণের প্রেষণা-শক্তি সংগ্রহ করার আর কোন উৎস নেই। কিন্তু বহু মনোবিজ্ঞানী একথা স্বীকার করেন না। অলপোর্টের বিখ্যাত Theory of Functional Autonomy of Motives হ'তে আমরা জানতে পারি যে কোন অর্জিত আচরণ বা অভ্যাস নিজে থেকেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে পরিণত হতে পারে এবং আচরণের পশ্চাতে প্রেষণা-শক্তি জোগাতে পারে। উড্‌ওয়ার্থ একে 'উপকরণের উদ্দেশ্যে পরিণত হওয়া' বলে বর্ণনা করেছেন।

১৪। মানুষের আচরণের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তি কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে খুব একটা উপযোগী নয়। শৈশব অতিক্রম করার পর মানুষ সমস্ত কাজই কেবলমাত্র সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নাতে করে না। তার কাজ বুদ্ধির দ্বারাও পরিচালিত হয়। অনেকে আবার সহজাত প্রবৃত্তিকে বংশগত অপরিবর্তনীয় কতকগুলি মৌলিক প্রবৃত্তি অর্থে গ্রহণ করেন এবং মনে করেন এই অর্থ গ্রহণ করলে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি আদৌ আছে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এইজন্য অনেক মনোবিজ্ঞানী সহজাত প্রবৃত্তির বদলে প্রেষণা (Motive), নোদনা (Drive), চাহিদা (Need) প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করার পক্ষপাতী।

সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি : আগেই বলা হয়েছে যে প্রবৃত্তিজাত আচরণ এবং বুদ্ধিপ্রসূত আচরণ এই দু'য়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির মধ্যে তুলনা করলে নীচের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়—

প্রথমতঃ বুদ্ধি ও সহজাত প্রবৃত্তি উভয়ই সহজাত।

দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধি একটি মানসিক শক্তি, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি হ'ল এক-প্রকার কর্ম-প্রবণতা।

তৃতীয়তঃ বুদ্ধি নিজেই একটি শক্তি, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি নিজে একটি শক্তি নয় ; এর শক্তির উৎস হ'ল কেন্দ্রগত প্রক্ষোভ।

চতুর্থতঃ বুদ্ধি গতিশীল বা পরিবর্তনধর্মী, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি অপরিবর্তনধর্মী। বুদ্ধিজাত আচরণ বৈচিত্র্যে ভরা, কিন্তু প্রবৃত্তিজাত আচরণ বৈচিত্র্যহীন ও যান্ত্রিক।

পঞ্চমতঃ বুদ্ধি অতীত শিক্ষাকে বর্তমান ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু প্রবৃত্তিজাত আচরণ পূর্ব নির্ধারিত ও অতীত শিক্ষার প্রভাব মুক্ত। অতীত শিক্ষার সাহায্য নেয় বলেই বুদ্ধিজাত আচরণ বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়; কিন্তু শিক্ষার সাহায্য না নেওয়ার জন্যই প্রবৃত্তিজাত আচরণ যান্ত্রিক হয়।

ষষ্ঠতঃ প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি, দুটিকেই যদি পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর যুদ্ধ করার হাতিয়ার বলা হয়, তবে প্রবৃত্তিকে বলতে হবে আদিমতম অস্ত্র, আর বুদ্ধিকে বলতে হবে আধুনিকতম অস্ত্র।

সপ্তমতঃ বুদ্ধিজাত আচরণে অভিজ্ঞতার মাত্রা বেশী, কিন্তু প্রবৃত্তিজাত আচরণে অভিজ্ঞতার মাত্রা কম।

ম্যাক্‌ডুগাল প্রবৃত্তিজাত আচরণ ও বুদ্ধিজাত আচরণের মধ্যে এইরূপ প্রভেদের কথা বলেছেন—প্রবৃত্তিজাত আচরণ হ'ল উদ্দেশ্যমূলক, কিন্তু ঐ জাতীয় পরিবেশের কোন রকম পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই প্রাণী ঐ আচরণটি করে থাকে। বুদ্ধিজাত আচরণের লক্ষণ হ'ল—প্রাণী পূর্ব অভিজ্ঞতার সাহায্যে লাভবান হতে পারে এবং এর সাহায্যে বর্তমান কাযকেও পরিচালিত করতে পারে। সহজাত প্রবৃত্তি হ'ল উদ্দেশ্যমূলক কাজ করার একটা জন্মগত ক্ষমতা, কিন্তু বুদ্ধি হ'ল পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সহজাত ক্ষমতার উন্নতি সাধনের একটা ক্ষমতা।

সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য যেমন আছে, সাদৃশ্যও তেমন আছে। অনেক ক্ষেত্রেই সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোন সীমারেখা টানা সম্ভব হয় না। মনুষ্যেতর প্রাণীর আচরণ লক্ষ্য করলে বুদ্ধি ও সহজাত প্রবৃত্তির পারস্পরিক সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে প্রবৃত্তিজাত আচরণের সংখ্যাই বেশী। মানুষের মধ্যেও সহজাত প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রবৃত্তি-জাত তাড়না অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ সেগুলিকে ইতর প্রাণীদের মত চরিতার্থ করতে উদ্যত হয় না। তাছাড়া মানুষ তার বুদ্ধির সাহায্যে প্রবৃত্তি-জাত আচরণের উদ্দেশ্যের মূল্য নিরূপণ করে থাকে, তাই মানুষের প্রবৃত্তিজাত আচরণ পরিমার্জিত ও সংস্কৃত। উপসংহারে বলা যেতে পারে, সহজাত প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ বুদ্ধি বিবর্জিত নয়। তবে এই বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাণ মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে একই নয়।

সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ: সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের মধ্যে

কোনরূপ সম্পর্ক আছে কি না, আর যদি থাকে, তবে সেই সম্পর্কের প্রকৃতি কি, এ বিষয়টিকে কেন্দ্র ক'রে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। আগেই বলা হয়েছে প্রবৃত্তি হ'ল এজাতীয় কর্মপ্রবণতা; কিন্তু প্রক্ষোভ হ'ল—এক ধরনের জটিল অনুভূতি। অনেকে মনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক বর্ত্তমান। প্রকৃতপক্ষে দৈনন্দিন জীবনে এই দুটির মধ্যে সম্পর্ক এত নিবিড় যে অনেক ক্ষেত্রেই কোন একটি কাজ সহজাত প্রবৃত্তি, না আবেগ, কোনটির বহিঃপ্রকাশ তা বলা অত্যন্ত শক্ত। ম্যাকডুগাল তো বলেন—এই দুটির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান। তিনি আরো বলেন, প্রক্ষোভ হ'ল সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্নিহিত অংশ, যেখানে প্রবৃত্তি আছে সেখানে প্রক্ষোভও আছে। পলায়নের সঙ্গে ভয়, সংগ্রামের সঙ্গে ক্রোধ, বাৎসল্যের সঙ্গে মমতা সব সময় থাকে। কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ সম্পন্ন করে তার কেন্দ্রগত প্রক্ষোভটি। এই প্রক্ষোভটি না জাগলে সেই প্রবৃত্তিজাত আচরণটি সম্পন্ন হ'তে পারে না।

কিন্তু অনেক মনোবিজ্ঞানী সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন না। ড্রেভার তো মনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে ঠিকই, তবে তা অনিবার্য বা অবিচ্ছেদ্য নয়। প্রক্ষোভ অনুপস্থিত থাকলেও প্রবৃত্তিজাত আচরণ ঘটতে পারে। তার মতে কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ ঘটার জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন হয়—(১) একটি মানসিক তাড়না (Impulse), (২) একটি পরিস্থিতি বা প্রত্যাক্ষিত কোন বস্তু এবং (৩) আগ্রহ (Interest) বা সার্থকতা বোধের অনুভূতি যার পরিণতি হ'ল প্রাণীর সন্তুষ্টি বা পরিতৃপ্তি। তিনি বললেন যখন প্রবৃত্তিজাত আচরণটি ঘটার পথে কোন রকম বাধার সম্মুখীন হয় না এবং প্রাণীর সার্থকতাবোধের অনুভূতিটি পরিতৃপ্ত হয়, তবে কোন প্রক্ষোভ দেখা দেবে না। কিন্তু ঐ আচরণ বাধাপ্রাপ্ত হ'লে একটা মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় যার থেকে জন্ম নেয় প্রক্ষোভ। প্রবৃত্তিজাত আচরণ ঘটার সময় যে তাড়না অনুভূত হয় তা কিন্তু প্রক্ষোভ নয়। মানসিক তাড়না বাধাপ্রাপ্ত হ'লেই প্রক্ষোভ জাগে, তার আগে নয়। এই প্রক্ষোভ বাধাপ্রাপ্ত তাড়নার পিছনে শক্তি জোগায় এবং আচরণের তীব্রতার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে বাধা অতিক্রম করার ব্যবস্থা করে দেয়। তিনি এর একটা ব্যাখ্যাও দিলেন। যখন কোন আচরণ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন সেটি যে সেই পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি-

বিধানের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাই প্রমাণিত হয়। তখনই সাময়িক ভাবে প্রাণীর প্রাথমিক তাড়নাটি বাধাপ্রাপ্ত হয় যাতে প্রাণী এই ফাঁকে নতুন কোন উন্নত ধরনের আচরণ উদ্ভাবন করতে পারে। তাড়নাটির বাধা-প্রাপ্তির ফলে আচরণের যে সাময়িক বিরতি, তার থেকেই জন্মায় প্রক্ষোভ। এথেকে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে, প্রাণীর সঙ্গতিবিধানের নতুন নতুন প্রচেষ্টার উদ্ভাবনের সঙ্গেই প্রক্ষোভের ক্রমবিকাশ জড়িয়ে আছে। যে প্রাণীর আচরণ ধারা যত বিচিত্র, তার প্রক্ষোভের মাত্রা ও সংখ্যাও তত বেশী।

স্টাউটের মতামতও ড্রেভারের অনুরূপ। তাঁর মতে প্রবৃত্তি প্রক্ষোভের উপর নির্ভরশীল নয়, প্রক্ষোভই প্রবৃত্তির উপর নির্ভরশীল। প্রক্ষোভ হ'ল পরগাছা জাতীয়। হেড,মার্শাল প্রভৃতি মনোবিদ্ মনে করেন যে, জীবনের ক্রমবিকাশের পথে প্রথমে আবির্ভূত হয়েছে প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের সহাবস্থান অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেলেও দুটির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বা নিয়ত সম্পর্ক বর্তমান নেই। জেমস্ তো বলেন যে প্রক্ষোভ হ'ল অনুভূতিপ্রবণতা, আর প্রবৃত্তি হ'ল কর্ম-প্রবণতা। প্রবৃত্তিজাত আচরণ হ'ল বহির্মুখী, কিন্তু প্রক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ থাকলেও তা অন্তর্মুখী। ওয়াটসনের মতে উদ্দীপকজনিত অভিযোজন যখন আভ্যন্তরিণ ও ব্যক্তির দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তখন পাই প্রক্ষোভ। আর যখন উদ্দীপকটি বস্তুর সঙ্গে অভিযোজনের জন্য সমস্ত দেহকেই পরিচালিত করে, তখন পাই সহজাত প্রবৃত্তিকে। তিনি আরও বলেন প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে ক্রিয়াটি হ'ল প্রচ্ছন্ন ও ব্যাপক; সহজাত প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে ক্রিয়াটি সুপরিব্যক্ত, সুনির্দিষ্ট ও বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ।

ড্রেভার অবশ্য কতকগুলি প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে ম্যাক্‌ডুগালের প্রক্ষোভ-তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রক্ষোভকে বাদ দিয়ে প্রবৃত্তিজাত আচরণ ঘটতে পারে না। এইজন্য ড্রেভার প্রবৃত্তিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করেছেন—বিশুদ্ধ (Pure) ও প্রক্ষোভধর্মী (Emotional)। বিশুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলি প্রক্ষোভ ছাড়াই কাজ করতে পারে, যেমন ব্যক্তির সঙ্গতিসাধক, মনোনিবেশক, সঞ্চালক, বাচন-সংক্রান্ত ইত্যাদি আচরণ। প্রক্ষোভধর্মী প্রবৃত্তি হ'ল—ভয়, ক্রোধ, কৌতুহল, যূথ-প্রবৃত্তি ইত্যাদি দশটি প্রবণতা।

প্রক্ষোভের সঙ্গেও যে সব সময় প্রবৃত্তি-জাত আচরণ থাকবেই, এমন কোন কথা নেই। আমরা অনেক সময় প্রক্ষোভ অনুভব করি, কিন্তু কোন প্রকার আচরণ করি না। যে লোকটি ঈশ্বর চিন্তায় বিভোর, সে বিশেষ একটা

প্রক্ষোভ অনুভব করে, কিন্তু তার সঙ্গে কোন প্রবৃত্তি-জাত আচরণ লক্ষ্য করা যায় না। আমরা ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন মুনি-ঋষিদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা অন্যান্য প্রবৃত্তি-জাত আচরণের সম্পূর্ণ পরিহারের কথাও শুনেছি।

প্রবৃত্তি ও অভ্যাস : প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে সম্পর্ক নিয়েও মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী জেমস্ (Wm. James) প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের সম্পর্ক বর্ণনা করতে প্রায় দু'টি সূত্রের উল্লেখ করেছেন। সে দু'টি হ'ল—প্রবৃত্তির অনিত্যতার সূত্র (Law of Transitoriness) এবং প্রবৃত্তির পরিবর্তনের সূত্র (Law of Inhibition)।

অনিত্যতার সূত্র : "If during the time of such an instinct's vivacity, objects adequate to arouse it are met with, habit of acting on them is formed—but if no such objects are met with, then no habit will be formed."

জেমস্ বলেন যে, প্রবৃত্তি বিশেষ একটা সময়ে ব্যক্তির মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে তারপর হীনশক্তি হতে থাকে এবং শেষে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে বিলুপ্ত হয়ে যাবার আগে তা থেকে একটি বিশেষ অভ্যাসের সৃষ্টি হতে পারে। ব্যক্তির মধ্যে পরে যা দেখা যায়, তা এই অভ্যাসটিই, প্রবৃত্তিটি নয়। আবার যে প্রবৃত্তি থেকে কোন কারণে কোন অভ্যাসের সৃষ্টি হয়নি, সেই প্রবৃত্তিটি কোন রকম চিহ্ন না রেখেই একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়, যেমন শিশুর স্তন্যপান প্রবৃত্তি। জেমস্ প্রবৃত্তিকে অভ্যাস গঠনের সোপান বলে মনে করেছেন এবং তার মতে অভ্যাস গঠন হয়ে গেলেই প্রবৃত্তির কাজ শেষ হয়ে যায়।

পরিবর্তন বা নিরোধের সূত্র : "A habit once grafted on an instinctive tendency, restricts the range of the tendency itself and keeps us from reaching on any but the habitual object.

এই সূত্রে বলা হচ্ছে যে, অভ্যাসের দ্বারা বিশেষ কোন প্রবৃত্তিকে পরিবর্তিত এমন কি রুদ্ধ পর্যন্ত করা যেতে পারে। বাঘ-ভালুক দেখলে পলায়ন করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, কিন্তু সার্কাসে যাঁরা বাঘ-ভালুকের খেলা দেখান, তাঁরা পলায়ন করেন না। প্রবৃত্তি-জাত আচরণের এই নিরোধ বা পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে অভ্যাসের জন্যই।

ম্যাক্‌ডুগাল কিন্তু জেমসের সঙ্গে একমত নন। তিনি বলেন, জেমস্

ব্যবহারিক জীবনে অভ্যাসের উপর অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন বলে সহজাত প্রবৃত্তির গুরুত্ব তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তিনি অবশ্য একথা স্বীকার করেন যে, অভ্যাস সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশকে কিছুটা দৃঢ় করে এবং কতকগুলি প্রবৃত্তি ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু প্রধান প্রধান প্রবৃত্তিগুলি আজীবন স্থায়ী। বিপরীত অভ্যাস সৃষ্টি করে তাদের প্রকাশকে আংশিক ভাবে বা সম্পূর্ণ ভাবে অবরুদ্ধ করা যায়,কিন্তু সম্পূর্ণ লুপ্ত করা সম্ভব নয়। জোর করে লুপ্ত করতে গেলে তার ফল প্রাণীর নিকট মারাত্মক হতে পারে, এমন কি তার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। তাছাড়া সহজাত প্রবৃত্তিগুলির প্রকাশকে জোর করে রুদ্ধ করে রাখলেও সুযোগ পাওয়া মাত্রই সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে। ম্যাক্‌ডুগাল তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেন যে বুনো হাঁসের জন্মের পরই যদি ডানা কেটে দেওয়া হয় এবং সাময়িক ভাবে তাদের উড়ে বেড়ানোর সহজাত প্রবৃত্তিটি নষ্ট করে দেওয়া হয়, তবুও দেখা যাবে ডানা গজানোর সঙ্গে সঙ্গে তারা উড়তে শুরু করেছে। সুতরাং ম্যাক্‌ডুগালের মতে সহজাত প্রবৃত্তির কাছে অভ্যাস নিতান্তই শক্তিহীন। অভ্যাস সহজাত প্রবৃত্তিরই বশবর্তী।

অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে কোন পার্থক্যের কথা স্বীকার করেন না। তাঁরা অভ্যাসকে এক ধরনের প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তিকে জাতিগত অভ্যাস (racial habit) বলে বর্ণনা করে থাকেন।

যাই হোক, মোটামুটি ভাবে অভ্যাস ও প্রবৃত্তির মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়—

সহজাত প্রবৃত্তি জন্মগত, কিন্তু অভ্যাস অর্জিত। প্রবৃত্তি-জাত আচরণ স্বতঃপ্রণোদিত, প্রচেষ্টাবর্জিত ও সহজ, কিন্তু অভ্যাস ইচ্ছানির্ভর, প্রচেষ্টা-প্রসূত ও জটিল। প্রবৃত্তি-জাত আচরণ সর্বজনীন, অভ্যাস ব্যক্তিগত। প্রবৃত্তি-জাত আচরণ দূর করা যায় না, অভ্যাসমূলক আচরণ দূর করা সম্ভব। প্রবৃত্তি থেকেই অভ্যাসের সৃষ্টি, সুতরাং প্রবৃত্তি হ'ল প্রভু অভ্যাস হ'ল ভৃত্য।

প্রবৃত্তি ও শিক্ষা: প্রবৃত্তির স্বরূপ ও কাজ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ থাকলেও প্রবৃত্তি ও শিক্ষার মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, সে বিষয়ে সকলে একমত। প্রবৃত্তিগুলিকে বলা হয় আমাদের চরিত্রের কাঁচামাল (raw materials)। জেমস্ তো বলেন—"It is the duty of every educator to detect the moment of instinctive readiness and to seige the wave of pupils' interest in each

successive subject, before its ebb has come so that knowledge may be got and a habit of skill acquired." শিক্ষা ও প্রবৃত্তির সম্পর্কটিকে দু'টি বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে বিচার করা যায়। একটি হ'ল—শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব; অপরটি হ'ল—প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব।

শিক্ষার ওপর প্রবৃত্তির প্রভাবঃ প্রাচীন শিক্ষাদর্শন শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির কোন প্রভাব যে থাকতে পারে, তা স্বীকার করত না। প্রবৃত্তিকে ইতর প্রাণীর অপরিহার্য ধর্ম বলে মনে করা হ'ত। মানুষের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির প্রভাব স্বীকার করা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে মনে করা হ'ত। শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল প্রবৃত্তির নিরোধ, প্রাচীনপন্থী প্রবৃত্তিবাদীরা কিন্তু মানুষের জীবনে প্রবৃত্তির অপরিসীম প্রভাবের কথা স্বীকার করতেন। তাঁরা বলতেন শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে প্রবৃত্তির ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর প্রাথমিক আচরণগুলির উপর প্রবৃত্তির প্রভাব যেমন, পরিণত জীবনের জটিল ও বিচিত্র আচরণের উপরও তেমন। শৈশবের কৌতূহল প্রবৃত্তিই পরিণত জীবনে শিক্ষা ও গবেষণার মূলাধার।

ম্যাক্‌ডুগাল প্রধানত প্রবৃত্তিবাদীদের মতামতই সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন প্রবৃত্তি একা কাজ করে না, প্রত্যেক প্রবৃত্তির মূলে আছে বিশেষ একটি প্রক্ষোভ। ব্যক্তিসত্তার বিকাশে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ যৌথভাবে কাজ করে। শিশুর প্রাথমিক আচরণে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ পাশাপাশি বর্তমান থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভ থেকে জন্ম নেয় সেন্টিমেন্ট, সেন্টিমেন্ট থেকে ব্যক্তিত্ব ও তার থেকে গড়ে উঠে চরিত্র।

প্রাচীন শিক্ষাদর্শনের প্রবৃত্তি পরিহারের তত্ত্বটি যেমন পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি প্রবৃত্তিবাদীদের সংব্যাখ্যানটিও যুক্তিযুক্ত নয়। প্রবৃত্তি মানব জীবনে সহজাত ও সক্রিয় এবং মানুষের উন্নততর আচরণের মূলেও আছে প্রবৃত্তি। কিন্তু মানুষের সমস্ত আচরণের মূলেই যে প্রবৃত্তি থাকবে এ কথাও ঠিক নয়।

শিক্ষা ব্যাপক অর্থে ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সমার্থক। ব্যক্তিসত্তা হ'ল এমন কতকগুলি বিশেষধর্মী সংগঠন যে গুলি এক ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্যের নির্দেশ দিয়ে থাকে। অনেক সময় চরিত্র কথাটিও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশ—দুটি

উপাদানেরই প্রয়োজন। বংশগতিই ব্যক্তিত্ব বিকাশের একমাত্র নির্ণায়ক নয়। বংশগতি ও পরিবেশ উভয়ের যৌথক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে। প্রবৃত্তি বংশগতির একটি উপাদান। সুতরাং শিক্ষাকে যদি ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ বলে বর্ণনা করা যায়, তবে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবৃত্তির ভূমিকা যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু মানুষের পরিবেশও প্রবৃত্তির উপর একটা প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এই পরিবেশ ও সহজাত প্রবৃত্তির যৌথ-ক্রিয়ার ফলে শিশুর জীবনে সৃষ্টি হয় নানাবিধ চাহিদা (Need)। এই চাহিদাগুলি বা এগুলির পরিতৃপ্তির উপর নির্ভর করছে শিশুর ব্যক্তিত্বের সংগঠন। সহজাত চাহিদাগুলি সীমাবদ্ধ ও সাধিক, কিন্তু পরিবেশগত চাহিদা সীমাহীন, পরিবর্তনশীল, জটিল ও বিবিধ। জীবনায়নের প্রথম দিকে শিশুর জীবনে সহজাত চাহিদার আধিপত্যই বেশী। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশগত চাহিদার আধিপত্যও বাড়তে থাকে। শিশুর ব্যক্তিসত্তার পরিণতি নির্ভর করে এইসব পারিবেশিক বা অর্জিত চাহিদাগুলির তৃপ্তি ও অতৃপ্তির উপর।

পরিবেশগত চাহিদার প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলেও শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শিক্ষা সম্পূর্ণ প্রবৃত্তিনির্ভর নয়, একথা ঠিক হলেও শিক্ষা প্রবৃত্তিকেন্দ্রিক না হ'লে অবাস্তব ও জীবনবিরোধী হতে পারে। প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করেই শিক্ষক শিক্ষাদানে অগ্রসর হবেন। (The educator must work with the grain, not against it)। তবেই শিক্ষা সার্থক, সক্রিয় ও ফলপ্রসূ হবে। শিক্ষা যদি প্রবৃত্তিমুখী না হয়, তবে তা কৃত্রিম, যান্ত্রিক ও জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। প্রকৃতিবাদীরা (Naturalist) শিক্ষাকে যখন স্বাভাবিক পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে চান, তখন প্রবৃত্তির উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। রুশোও শিশুর প্রবৃত্তির উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে, যেগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত সাহায্য করতে পারে। সার্থক শিক্ষাদানে-আগ্রহ, মনোযোগ ইত্যাদির একটা বিশেষ স্থান আছে। শিশুর কৌতূহল প্রবৃত্তিকে যদি সুপরিচালিত করা যায়, তবে শিশুর নানা বস্তুর প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ স্বাভাবিক ভাবেই বর্ধিত হবে। যৌথ প্রবৃত্তিকে শিক্ষায় যথোপযুক্ত স্থান দিলে শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক বোধ ও সামাজিক চেতনা উদ্বুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও পরিবেশের প্রভাবে সহজাত প্রবৃত্তিমূলক আচরণের

পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্জন সম্ভব। এর ফলে শিশুর ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের পথটিও সুগম করা সম্ভব। যথা, সঞ্চয় প্রভৃতি প্রবৃত্তিকে শিক্ষক অবাঞ্ছিত পথ থেকে বাঞ্ছিত পথে সুপরিচালিত করতে পারেন।

তাহ'লে দেখা গেল শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব তিন ভাবে কার্যকরী হ'তে পারে। প্রথমতঃ, শিক্ষা হবে প্রবৃত্তিমুখী। দ্বিতীয়তঃ, শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে শিক্ষাকে অধিকতর সহজ ও কার্যকরী করা সম্ভব। তৃতীয়তঃ, কতকগুলি প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত গুণাবলী সৃষ্টি করা সম্ভব। প্রবৃত্তি বাধা পেলেই প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। শিশুকে প্রথমে যে সমস্ত কাজ দেওয়া হয়, সেগুলি যেন তার ক্ষমতার মধ্যে থাকে। কারণ তার ক্ষমতার বাইরে, এমন কোন কাজ দিলে প্রথমেই ব্যর্থতা দেখা দেবে যার ফলে শিশুর মনে বিরূপ প্রক্ষোভের সৃষ্টি হবে। শিক্ষার্থীকে তার ক্ষমতার জন্য নিন্দা বা বিদ্রূপ করাও উচিত নয়, কারণ সে ক্ষেত্রেও বিরূপ প্রক্ষোভের সৃষ্টি হবে। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে, শিশুর মধ্যে যেন বিরূপ প্রক্ষোভ না জাগে, পরিবেশটি যেন এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়, যাতে অনুকূল প্রক্ষোভ জাগে, প্রক্ষোভের মাত্রা যেন সীমা না ছাড়ায়।

প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব : শিক্ষায় সহজাত প্রবৃত্তিগুলির একটি বিশেষ স্থান আছে। এইগুলি নিয়েই শিক্ষার কাজ শুরু করা হয়। তবে সমস্ত প্রবৃত্তিই আগাগোড়া মার্জিত থাকে না। এগুলিকে কিছুটা অবদমিত, পরিবর্জিত ও পরিমর্জিত করে নিতে হয়, আর তা সম্ভব শিক্ষার সাহায্যেই। শিক্ষা প্রবৃত্তির উপর নানাপ্রকার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। আগেই আলোচনা করা হয়েছে শিক্ষার সাহায্যে সহজাত প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ, পরিবর্তন এমন কি বিলোপ সাধনও সম্ভব। অনেক মনোবিদ্ এই চরম মত গ্রহণ না করলেও সহজাত প্রবৃত্তি যে পরিবর্তনশীল এবং প্রয়োজন ও পরিবেশের চাপে তা বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সহজাত প্রবৃত্তিগুলি যাতে বাঞ্ছনীয় পথে পরিচালিত হ'তে পারে, সেদিকে নজর দিতে হবে। এখন দেখা যাক্ শিক্ষার সাহায্যে কেমন করে সহজাত প্রবৃত্তিগুলির পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারে—

অবদমন (Repression) : অবদমন হ'ল প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের প্রথম উপায়। অবদমনের অর্থ হ'ল প্রবৃত্তির প্রকাশকে জোর করে বন্ধ করে

দেওয়া। প্রাচীন শিক্ষাদর্শনেও প্রবৃত্তিনিরোধকে সমর্থন করা হয়েছিল। মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বও বলে, যখন কোন প্রবৃত্তির প্রকাশ অবাঞ্ছিত বলে মনে করা হয়, তখন সেই প্রবৃত্তিটিকে দমন করা উচিত। এর জন্য বল প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিটি মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং প্রায়ই শেষ পর্যন্ত কোন সুফল পাওয়া যায় না। অবদমিত প্রবৃত্তিটি নানাপ্রকার মানসিক জটিলতার সৃষ্টি করে এবং শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশের পথে একটা বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমরা বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণতঃ শাস্তি ও পুরস্কারের সাহায্যে প্রবৃত্তিগুলির অবদমন করে থাকি। অবদমন যত কম করা যায়, ততই মঙ্গল।

বিরেচন (Catharsis): বিরেচন হ'ল অবদমনের ঠিক বিপরীত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে প্রবৃত্তিকে তার সহজ ও বাসনার পথে যথাযথ ভাবে প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়। ফ্রয়েডের মতে প্রবৃত্তির অবদমনের ফলে যদি মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, তবে সেই প্রবৃত্তিটির বহিঃপ্রকাশ দ্বারা তার মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা যায়। ফ্রয়েড এই পদ্ধতিটির নাম দিয়েছেন **এ্যাব্রিকশান** (abreaction)। কিন্তু এই পদ্ধতিটিকেও বিভিন্ন কারণে গ্রহণ করা যায় না। পদ্ধতিটি থেকে সব সময় সুফল পাওয়া যায় না। প্রবৃত্তিগুলির অনিয়ন্ত্রিত অসংযত প্রকাশ ঘটতে যদি দেওয়া হয়, তবে ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে অনেক রকমের অবাঞ্ছিত ও নিকৃষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে; উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত যুযুৎসা বা যৌনপ্রবৃত্তির অবাধ প্রকাশ ঘটার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে সমাজজীবনে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ও অনভিপ্রেত অসামাজিক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। এর ফলে মানব সভ্যতা এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়বে। সেইজন্য এই পদ্ধতিটি সব সময় ও সর্বত্র প্রয়োগ করা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। বিরেচন পদ্ধতিটিকে অনেকে 'মানসিক জোলাপ' দেওয়ার পদ্ধতি বলে থাকেন।

উন্নীতকরণ (Sublimation): উন্নীতকরণ পদ্ধতিটি হ'ল অবদমন ও বিরেচনের মধ্যবর্তী পদ্ধতি। উন্নীতকরণের মতবাদ যেমন অবদমনকে সমর্থন করে না, তেমনি বিরেচনের মতবাদেও বিশ্বাসী নয়। এই মতবাদ বিশ্বাস করে যে অবদমনের অর্থ হ'ল প্রবৃত্তির জৈবিক দিকটিকে অস্বীকার করা, আর বিরেচনের অর্থ হ'ল মানুষের বুদ্ধিগত যুক্তিসম্মত দিকটিকে অস্বীকার

করা। সেইজন্য এই পদ্ধতিতে প্রবৃত্তির গতিধারাকে অবাঞ্ছিত পথ থেকে সরিয়ে এনে সমাজ ও ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলজনক বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করার কথা বলা হয়েছে। 'উন্নীতকরণ'—এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ফ্রয়েডপন্থী মনোবিজ্ঞানীরা। তারা অবশ্য কেবলমাত্র যৌন-প্রবৃত্তির ক্ষেত্রেই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন এবং মনে করতেন এই প্রবৃত্তিটির তাড়নাকে উন্নততর সামাজিক ধারায় প্রবাহিত করতে হলে প্রবৃত্তির উন্নীতকরণ করা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে কিন্তু এটি সকল প্রবৃত্তির ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হচ্ছে। ম্যাকডুগাল'এর মতে, উন্নীতকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে সহজ প্রবৃত্তিমূলক শক্তিগুলিকে বিভিন্ন সেন্টিমেন্টে রূপান্তরিত করে সমাজ-সংস্কৃতিমূলক উন্নততর কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন অসামাজিক প্রবৃত্তি উদ্গতি লাভ করতে পারে। কয়েকটা উদাহরণ দিলেই প্রবৃত্তির উদ্গমনের কাজটা বুঝতে পারা সহজ হবে। যুযুৎসু প্রবৃত্তির প্রভাবে শিশু অন্যান্যদের সঙ্গে ঝগড়া করে, মারামারি করে। এটা বাঞ্ছনীয় নয়, অথচ এটাই হ'ল ঐ প্রবৃত্তির স্বাভাবিক পথ। নানাপ্রকার খেলাধুলা, বক্সিং, কুস্তি ইত্যাদি স্বাস্থ্যকর খেলার ব্যবস্থা করে দিতে পারলে শিশু আর অকারণে অন্য সকলের সঙ্গে মারামারি করবে না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নানাপ্রকার আজে বাজে জিনিস সংগ্রহ করে একটা অদ্ভুত 'মিউজিয়াম' গড়ে তোলে। এটা তার সঞ্চয় প্রবৃত্তির জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ শিশুকে যদি ডাক-টিকিট বা বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা সংগ্রহ করতে উৎসাহিত করা হয়, তবে প্রবৃত্তিটি অবাঞ্ছিত পথ থেকে সরে বাঞ্ছিত পথে উদ্গতি লাভ করে। তেমনি সাহিত্য, সংগীত, একসঙ্গে খেলাধুলা, অভিনয়, নাচ ইত্যাদির সাহায্যে যৌনপ্রবৃত্তির উদ্গতি ঘটানো সম্ভব। শিশুর অবাঞ্ছিত কৌতূহলকে বাঞ্ছিত শিক্ষা-জিজ্ঞাসায় উন্নীত করা যেতে পারে। তার বিরক্তি ও ঘৃণাকেও যা মন্দ বা কাম্য নয় তার প্রতি পরিচালিত করা যেতে পারে। তেমনি বাৎসল্য প্রবৃত্তিটি পরোপকার, দয়া, সহানুভূতি ইত্যাদিতে পরিণত হতে পারে। নিঃসন্তানা ধনী মহিলার বাৎসল্য প্রবৃত্তি শিশুদের প্রতি স্নেহে পরিণত করা সম্ভব। শিক্ষায় আমরা আচরণের যে বাঞ্ছিত পরিবর্তন কামনা করি, সেই পরিবর্তন কিন্তু বেশীর ভাগই উন্নীতকরণের ফল। সমাজ, সংস্কৃতি, কৃষ্টি এ সমস্তই প্রবৃত্তিগুলির উন্নততর প্রকাশ। এইজন্য সকল প্রকার শিক্ষাকেই সহজাত

প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের শিক্ষা বলা হয়ে থাকে। (All education consists in the eduction of instincts and emotions)

অন্যান্য পন্থা: উপরোক্ত তিনটি প্রধান পদ্ধতি ছাড়াও প্রবৃত্তির উপর শিক্ষা কার্যকরী করার আরো কয়েকটি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। একরকম পদ্ধতি হ'ল—প্রবৃত্তিটির বহিঃপ্রকাশের কোন সুযোগ না দেওয়া। এটি অবদমন প্রক্রিয়ার নামান্তর মাত্র, যদিও অবদমনের মত জোর করে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রবৃত্তি-জাত আচরণটিকে দমন করা হয় না। এক্ষেত্রে প্রবৃত্তিটির প্রকাশের কোন সুযোগই দেওয়া হয় না। যে ছেলে সব সময় মারামারি করে, তাকে মারামারি করার কোন সুযোগ না দিলে ঐ প্রবৃত্তিটি কার্যকরী হবে না। আর একটি পদ্ধতি হ'ল পরিবেশের পরিবর্তন। বিশেষ বিশেষ পরিবেশে বিশেষ বিশেষ প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়। এখন ঐ পরিবেশটি পরিবর্তিত করে দিলেই প্রবৃত্তিটি কার্যকরী হবে না। আর একটি পদ্ধতি হ'ল—বিপরীতধর্মী প্রবৃত্তির বিকাশ সাধন করা। শিশুর মধ্যে কোন অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়ে উঠলে অন্য আর একটি বাঞ্ছিত কিন্তু অধিকতর শক্তিশালী প্রবৃত্তির বিকাশ সাধন করলে পূর্বের প্রবৃত্তিটি শক্তিহীন হয়ে পড়বে। যে শিশুর মধ্যে বশ্যতা প্রবৃত্তির প্রভাব বেশী, তার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিটি বিকশিত করে তুলতে হবে।

প্রবৃত্তি শিক্ষাযোগ্য কি না? আমরা আগেই দেখেছি যে প্রবৃত্তি হ'ল সহজাত কিন্তু শিক্ষা অর্জিত। সুতরাং প্রশ্ন উঠতে পারে প্রবৃত্তি শিক্ষাযোগ্য কি না?—অর্থাৎ শিক্ষার সাহায্যে প্রবৃত্তির মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন আনা সম্ভব কি না? প্রবৃত্তিগুলি সহজাত হলেও মানুষের ক্ষেত্রে নমনীয়। প্রবৃত্তি-গুলি মানুষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অন্ধও নয়। শিক্ষা যেমন প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বিনাশ কামনা করে না তেমনি প্রবৃত্তির অসংযত ও অবাধ প্রকাশও সমর্থন করে না। প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটানো বাঞ্ছনীয় নয়। প্রবৃত্তির নিরোধ বা অবলুপ্তি জৈবিক দিক থেকে অসঙ্গত ও জীবন বিকাশের পথে অন্তরায়। আগেই আলোচনা করা হয়েছে—প্রবৃত্তিগুলির অবদমন বা বিবেচন পদ্ধতির চেয়ে উন্নীতকরণ পদ্ধতি সুফলদায়ক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রবৃত্তিগুলি শিক্ষাযোগ্য এবং শিক্ষার সাহায্যে প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনা সম্ভব। ইতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ যান্ত্রিক, বৈচিত্র্যহীন ও এক প্রকার হ'লেও মানুষের ক্ষেত্রে নয়। মানুষের প্রবৃত্তি শিক্ষার আলোকে

তার বিকাশের জন্য নানাপ্রকার পথ খুঁজে নেয় এবং অমার্জিত ও অসংস্কৃত স্বরূপ পরিত্যাগ ক'রে একটা মার্জিত ও সংস্কৃত রূপ পরিগ্রহ করে মানবজীবনকে বিচিত্র প্রবণতা ও রসের ধারায় অভিসিঞ্চিত ক'রে তাকে সুন্দর, সার্থক ও সফল করে তোলে। তাই আমরা বলতে পারি প্রবৃত্তি সহজাত হলেও তার সার্থক পরিণতি ঘটে শিক্ষার হাতেই। এখানে প্রবৃত্তি ও শিক্ষা পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন, এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

বুদ্ধি

(Intelligence)

[An individual is intelligent in proportion as he is able to carry on abstract thinking—*Terman*

An individual prossesses intelligence in so far as he has learned, or can learn to adjust himself to environment—*Colvin.*

Intelligence is the capacity to learn or to profit by experience—*Dearbon*

We may define intellect in general as the power of good responses from the point of view of truth or fact—*Thorndike*

Intelligence means intellect put to use—*Woodworth.*

Intelligence is the tendency of thought, to take and maintain a definite direction, the capacity to make adoptations for the purpose of attaining the desired end and the power of self-criticism—*Binet.*

Intelligence is the capacity to learn—*Buckingham.*

Intelligence is the power of readjustment to relatively novel situations —*Burt.*

Intelligence is the general mental, adaptability to new problems and conditions of life—*Stern*

Intelligence is the ability to observe one's own mental processes, the ability to discover essential relations between items of knowledge either perceived or thought of and the ability to educe correlates—*Spearman* (Noe-genetic Laws)

Intelligence is the capacity for relational constructive thinking directed towards the attainment of some end or goal—*Rex and Knight.*

Intelligence is acquiring capacity or a capacity to acquire capacity —*Woodrow.*]

বুদ্ধির স্বরূপ ও পরিমাপ (Nature and Measurement of Intelligence) : বুদ্ধি একটি এমন জিনিস যার সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বুদ্ধির সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। বুদ্ধিকে অনেকে বিভিন্ন সহজাত ক্ষমতার সমষ্টি বলেছেন। তা সত্ত্বেও এর প্রকৃত স্বরূপ এখনও সঠিক ভাবে জানা যায়নি। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধিকে একটা শক্তি বা বস্তু হিসেবে দেখেন না। তারা

বুদ্ধিকে ক্রিয়া বা ব্যবহারের একটা গুণগত উৎকর্ষের সূচক হিসেবেই দেখেছেন। যাই হোক আমরা বুদ্ধি সম্বন্ধে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা আলোচনা করব এবং এই সংজ্ঞাগুলির সত্যতা বা যথার্থতা বিচার করব।

বুদ্ধির সংজ্ঞা (Definition) :

(১) স্টার্ন (Stern) বলেছেন, নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সচেতন ভাবে চিন্তার সামঞ্জস্য সাধনের জন্য ব্যক্তির সাধারণ ক্ষমতাই হ'ল বুদ্ধি।

(২) উডওয়ার্থ (Woodworth) বলেন, বুদ্ধি হ'ল বুদ্ধি-বৃত্তিকে কাজে লাগান। কোন কাজ সম্পাদন করার জন্য বা কোন পরিস্থিতি সামলাবার জন্য মানসিক শক্তির প্রয়োগ।

(৩) ডিয়ারবর্ণ (Dearborn) বলেন, বুদ্ধি হ'ল অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষা বা কোন কিছু লাভ করবার ক্ষমতা।

(৪) টারম্যান (Terman) বলেন, বুদ্ধি হ'ল অমূর্ত চিন্তা করবার শক্তি।

(৫) বিনে (Binet) বলেন, বুদ্ধি হ'ল বোধশক্তির সম্পূর্ণতা, উদ্ভাবন-পটুতা, কোন কাজে অধ্যবসায় এবং সমালোচনামূলক বিচার-শক্তি।

(৬) বার্ট (Burt) বলেন, নতুন অবস্থায় খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতাই হ'ল বুদ্ধি।

(৭) থর্ণডাইক (Thorndike) বলেন, অনুষঙ্গ বা বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংযোগ সাধনের ক্ষমতাই বুদ্ধি। উপরে যে সমস্ত বুদ্ধির সংজ্ঞা পাওয়া গেল সেগুলিকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একটি হ'ল মানসিক শক্তি হিসেবে বুদ্ধির সংজ্ঞা, অপর একটি হ'ল—শিখনের ক্ষমতা হিসেবে বুদ্ধির সংজ্ঞা এবং তৃতীয়টি হ'ল--অভিযোজন বা সঙ্গতি সাধনের সহায়ক হিসেবে বুদ্ধির সংজ্ঞা। প্রকৃতপক্ষে এই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত সংজ্ঞাটিই বহুল ব্যবহৃত যদিও অপর দুই শ্রেণীর সংজ্ঞাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা যায় না।

বুদ্ধির সংজ্ঞা হিসেবে যে দুটি সংজ্ঞাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ সংজ্ঞা হিসেবে ধরা যেতে পারে, সে দুটি হ'ল—**স্পীয়ারম্যান ও রেক্স নাইটের** দেওয়া সংজ্ঞা।

স্পীয়ারম্যানের (Spearman) মতে বুদ্ধি হ'ল নিজের মনের প্রক্রিয়াগুলিকে লক্ষ্য করার ক্ষমতা, জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ আবিষ্কারের ক্ষমতা, পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে কোনটি অনুরূপ বা কোনটি বিপরীত তা বলতে পারার ক্ষমতা। এই তিনটি ক্ষমতাকে তিনি জ্ঞানলাভের সূত্র বা Noegenetic Laws বলে বিবৃত করেছেন।

রেক্সনাইটের মতে বুদ্ধি হ'ল কোন লক্ষ্যে পৌছানোর সহায়ক হিসেবে সম্বন্ধমূলক এবং সৃজনমূলক চিন্তন। (Relational constrcutive thinking directed towards the attainment of some end or goal)

পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে কোন সংজ্ঞাই বুদ্ধির স্বরূপের যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বুদ্ধির সংজ্ঞা নির্দেশ করার জন্য সংজ্ঞাগুলি বুদ্ধির কোন একটি বিশেষ লক্ষণের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছে।

বুদ্ধির সাধারণ বৈশিষ্ট্য : বুদ্ধির সংজ্ঞা একটি মাত্র বাক্যে দেবার চেষ্টা না করে আমরা বুদ্ধির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ ক'রে বুদ্ধির স্বরূপটি বুঝে নেবার চেষ্টা করব।

প্রথমতঃ, বুদ্ধি হ'ল মৌলিক মানসিক শক্তি বা ক্ষমতা। দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধি আমাদের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে সাহায্য করে। তৃতীয়তঃ, বুদ্ধি কোন বস্তুর বা অবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নিরূপণ করে। চতুর্থতঃ, অমূর্ত চিন্তন-শক্তির এবং চিন্তন-শক্তির উন্নত ব্যবহার বুদ্ধির পরিচায়ক। পঞ্চমতঃ, বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয় বুদ্ধির সাহায্যে। ষষ্ঠতঃ, মানসিক কাজ দ্রুত সম্পাদন করা বুদ্ধির জন্যই সম্ভব হয়।

বুদ্ধি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তত্ত্ব (Theories) : বুদ্ধি এক না বহু, এ নিয়ে প্রধানতঃ দু'রকমের মত আছে। একটা হচ্ছে স্পীয়ারম্যান আর তাঁর অনুগামীদের, আর একটা হচ্ছে থর্নডাইক, থার্স্টোন প্রভৃতি আমেরিকান মনোবিজ্ঞানীদের। এঁদের মতগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উৎপাদন তত্ত্ব (Spearman's Two Factor Theory) : প্রসিদ্ধ বৃটিশ মনোবিজ্ঞানী স্পীয়ারম্যান ১৯০৩ খৃঃ অব্দে তাঁর দুই উপাদান তত্ত্বটি সাধারণের কাছে উপস্থাপিত করেন। তাঁর এই মতবাদ সম্পূর্ণ ভাবে গণিতিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে ব্যক্তির কোন কাজ করার পেছনে দু'টি ভিন্ন জাতীয় ক্ষমতা আছে। একটি হ'ল সাধারণ ক্ষমতা g এবং অপরটি হ'ল বিশেষ ক্ষমতা s। তিনি আরও বলেন যে এই g ব্যক্তির সব কাজের মধ্যেই সাধারণ। কিন্তু এর পরিমাণ এক এক ব্যক্তির এক এক রকম। s কিন্তু সাধারণ নয় এবং বিভিন্ন কাজের জন্য s বিভিন্ন অর্থাৎ

কোন কাজ করবার সময় ব্যক্তি তার g-এর ভাণ্ডার থেকে কিছুটা g নেয় আর সেই কাজটির জন্য যে s দরকার তা নিয়ে কাজটি শেষ করে। যেমন,

পড়া = কিছুটা g + পড়ার s

অঙ্ক করা = কিছুটা g + অঙ্ক করার s ইত্যাদি,

অবশ্য তিনি এ কথাও বলেছেন যে, সব কাজে g-এর পরিমাণ এক নয়। বিভিন্ন কাজে g-এর গুণের দিক থেকে সমান হলেও পরিমাণের দিক থেকে সমান নয়। তিনি এই g-কে জন্মগত এবং s-কে অর্জিত বলেছেন। তাঁর মতে এই g হ'ল সাধারণ বুদ্ধি। প্রতি কাজে কিভাবে g এবং s জোট বাঁধে তার একটি চিত্ররূপ দেওয়া হ'ল।

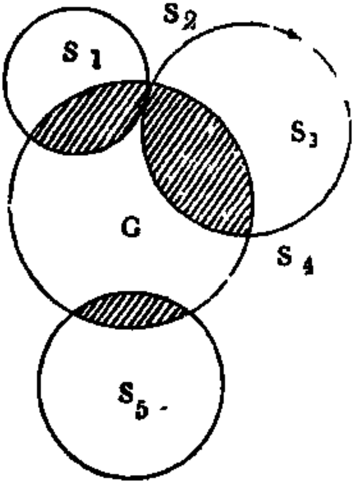

যেহেতু g-এর পরিমাণ সকল কাজে সমান নয়, সেইজন্য সকল অভীক্ষা ব্যক্তির সমপরিমাণ g পরিমাপ করতে পারে না। যে অভীক্ষা যত বেশী g পরিমাপ করতে পারবে, সেই অভীক্ষা তত বেশী বুদ্ধির অভীক্ষা বলে প্রমাণিত হবে। যেমন, যদি প্রশ্ন করা হয়, কয়লা কালো, বরফ কেমন? এই প্রশ্নের উত্তর সাধারণ বুদ্ধি বা g-এর সাহায্যে দেওয়া যায়। কিন্তু যদি বলা হয় 16-এর সঙ্গে 8-এর যে সম্বন্ধ, 8-এর সঙ্গে সে সম্বন্ধ কার? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে s-এর প্রয়োজন।

স্পীয়ারম্যান বহু অঙ্ক কষে g এবং s-এর সম্বন্ধকে বীজগণিতের একটি সমতার সূত্রে প্রকাশ করেন। তিনি বলেন $s = \sigma_1 g + \sigma_2 s$ যেখানে 'the letters σ_1 and σ_2 represent the "weight" or "loads of the

two factors g and s respectively। তিনি কতগুলি বিশেষ ক্ষমতা এবং তাদের মধ্যে মিলের পরিমাণ ছক কেটে সাজান। একে বলা হয় Correlation Matrix।

	(8) a. Definition	(7) b. Problem	(6) c. Classification	(5) d. Antonym	(4) e. Inferences	
a. Definition	-	56	48	·40	·32	(8)
b. Problem	·56	-	42	·35	·28	(7)
c. Classification	48	42	—	·30	·24	(6)
d. Antonym	40	35	30	—	·20	(5)
e. Inferences	32	28	24	20	·	(4)

স্পীয়ারম্যান লক্ষ্য করলেন যে, এই তালিকার পাশাপাশি আর উপর নীচ চারটি ছক নিয়ে যে সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্রটি তৈরী হ'ল তার কোণাকুনি ছকগুলির গুণফল সমান। যেমন—

·40	·35
·32	·28

$$\cdot 40 \times \cdot 28 = \cdot 35 \times \cdot 32 \text{ বা,}$$
$$(\cdot 40 \times \cdot 28) - (\cdot 35 \times \cdot 32) = 0$$

এই সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্রকে তিনি বলেছেন tetrad আর তাদের কোণাকুণি ছকগুলির গুণফলের সমতাকে তিনি বলেছেন Tetrad Equation। বীজগণিতের ভাষায়—

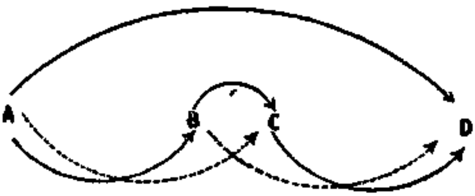

চারটি বিভিন্ন জাতীয় ক্ষমতা হয়, তবে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহ-সম্বন্ধের (correlation) মাধ্যমে tetradটি দাঁড়াবে এইরূপ—

$$r_{ad}.\ r_{cd} - r_{ad}.\ r_{bc} = 0$$

তিনি আরও বললেন যে, বুদ্ধি যদি g এবং s এই দুই উপাদানের মিলিত গুণফল হয় অর্থাৎ যদি $s = \sigma_1 g + \sigma_2 s$ এই সম্বন্ধটি সত্য হয় তবে tetrad

equation $r_{ab}.\ r_{cd} - r_{ad}.\ r_{bc} = 0$, এটা সত্য হবে। আর বিপরীত ক্রমে যদি a, b, c, d, এই রকম চারিটি বিশেষ ক্ষমতা সম্পর্কে Tetrad equation-টি সত্য হয়, তবে equation $s = a_1g + a_2s$ ও সত্য হবেই।

দ্বি-উপাদান তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা : স্পীয়ারম্যানের মতে মানসিক শক্তি দু'প্রকারের। একটি হল g, যা সব কাজের পিছনে থাকে আর একটি হ'ল s যা কেবলমাত্র একটি বিশেষ কাজের পিছনে থাকে। এর মাঝামাঝি কিছু আছে বলে তিনি প্রথমে স্বীকার করেননি। কিন্তু পরে ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হ'ল যে এমন কতকগুলি শক্তি আছে যা g-এর মত সর্বজনীন নয়, আবার s-এর মতো বিশেষধর্মীও নয়। এককথায় এরা g এবং s-এর মাঝামাঝি এক ধরনের শক্তি। যেহেতু এই শক্তিগুলিকে বিশেষ এক শ্রেণীর (Group) কাজ সম্পন্ন করার সময় দেখা যায়, সেইজন্য এগুলিকে শ্রেণীগত শক্তি বা Group Factor বলা হয়। (Group factor is a single factor which is common to a group of activities)। একটা ছবি দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো হচ্ছে—

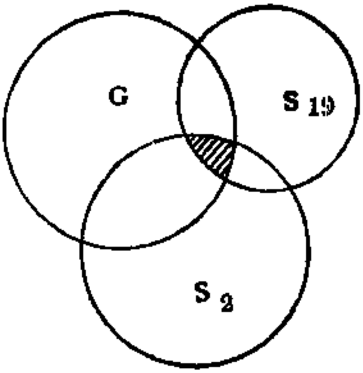

টমসনের বাছাই তত্ত্ব বা বহুশক্তি তত্ত্ব (Sampling Theory) : টমসনের মতে সব কার্যাবলীতে যে একই g থাকবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তিনি বললেন এই সাধারণ উপাদান g যেটিকে স্পীয়ারম্যান 'একক' বলে বর্ণনা করেছেন, তা এক নয় বহু। এক এক দলের মধ্যে এই সাধারণ উপাদানটি থাকে। কাজেই যতগুলি দল থাকবে ততগুলি g থাকবে। এইগুলিকে আমাদের মানসিক শক্তির একক বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। আমরা যখন কোন মানসিক কাজ করি তখন এই অসংখ্য শক্তির কতগুলি

জোট বাঁধে এবং ঐ কাজটি সম্পন্ন করতে আমাদের সাহায্য করে। তবে এই জোট বাঁধা কাজটা নির্ভর করে কাজটির প্রকৃতির উপর এবং শক্তিগুলির ক্ষমতার উপর।

থার্স্টোনের বহু উপাদান তত্ত্ব (Multiple factor Theory): থার্স্টোনের মতে, আমরা যাকে বুদ্ধি বলি, তা হ'ল কতকগুলি মৌলিক শক্তির সম্মিলিত রূপ। তিনি বলেন ব্যক্তির কতকগুলি কাযের মধ্যে এক সাধারণ মৌলিক উপাদান বা Primary Factor থাকে। এই উপাদানের জন্য মানসিক কার্যাবলীর মধ্যে বিভিন্নতা দেখা যায়। বিভিন্ন কার্যাবলীর মাধ্যমে বিভিন্ন উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। এই উপাদান বা শক্তিগুলির মধ্যে কখনও বিশেষ কয়েকটি শক্তি একত্রিত হয়ে বিশেষ একটি কাজ করে আবার আর কয়েকটি শক্তি একত্রিত হয়ে অন্য আর একটি কাজ করে। এ রকম মৌলিক উপাদান যে কতকগুলি আছে তা এখনও নিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব হয়নি। থার্স্টোন এ রকম সাতটি মৌলিক উপাদান বা শক্তির কথা বলেছেন। সেগুলি হ'ল—

(১) ভাষাবোধ (Verbal Comprehension বা V)

(২) সংখ্যা ব্যবহার (Number facility বা N)

(৩) স্মৃতি-সম্বন্ধীয় উপাদান (Memory বা M)

(৪) বিচারকরণ (Inductive Reasoning বা R)

(৫) উপলব্ধিমূলক শক্তি (Perceptual Ability বা P)

(৬) অবস্থানমূলক ধারণা (Space-factor বা S)

(৭) ভাষা উৎকর্ষ (Word fluency বা W)

বর্তমানে দুই উপাদান-তত্ত্ব ও বহু উপাদান-তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্যের মাত্রা ক্রমশঃ কমে আসছে। যদি বহু-উপাদান তত্ত্বের উপর ভিত্তি ক'রে বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী করতে হয়, তবে মনে রাখতে হবে যে অভীক্ষাটিতে এমন কতকগুলি পৃথক পৃথক অংশ রাখতে হবে যার মাধ্যমে পৃথক পৃথক মৌলিক উপাদানের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। উপাদানগুলি কিন্তু একে অন্যের উপর নির্ভরশীল হবে না। আর একটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তা হ'ল প্রতিটি উপাদানে যেন সমগ্র অভীক্ষার ফলের সঙ্গে উচ্চ সহ-সম্বন্ধ থাকে।

যদিও বুদ্ধির যথার্থ এবং সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন এবং বুদ্ধির

স্বরূপ সম্পর্কে যদিও বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী একমত নন, তবুও বুদ্ধি পরীক্ষার বা পরিমাপের জন্য বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা প্রস্তুত করেছেন এবং বর্তমানে শিক্ষা, জীবিকা, বৃত্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই অভীক্ষা বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। যদিও বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞান অত্যন্ত তরুণ, তবুও বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হবার আগে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বুদ্ধি পরিমাপের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা অনেক নতুন জিনিসের সন্ধান পাই। প্রথমেই এই ইতিহাসের **প্রাচীন যুগের** কথা ধরা যাক্। তখন মনোবিজ্ঞান বলে পৃথক কোন শাস্ত্র বা বিজ্ঞান ছিল না। কিন্তু উপনিষদ, মহাভারত, রামায়ণ বা বেদে আমরা বুদ্ধি পরীক্ষার পরিচয় পাই। নচিকেতার উপাখ্যান, ইন্দ্র ও বৃহস্পতির কথোপকথন বা যুধিষ্ঠির ও বকরূপী ধর্মের প্রশ্নোত্তরগুলি এক ধরনের বুদ্ধির অভীক্ষা বলা যেতে পারে। এর পর আসে **মধ্যযুগ**। এই যুগে বুদ্ধির মাপ করা হ'ত নিম্নলিখিত উপায়ের সাহায্যে—

(১) দৈহিক আকৃতি, (২) মস্তিষ্কের বা খুলির গঠন, (৩) মুখ দেখে, (৪) হাতের লেখা, (৫) হাতের রেখা ইত্যাদি।

সব শেষে আসে **আধুনিক যুগ**। ১৮৭৯ সালের পর থেকে মনোবিজ্ঞানের জগতে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। তখন থেকেই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বুদ্ধি পরিমাপের প্রচেষ্টা দেখা যায়। এর মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হ'ল—

১। ১৮৭৯ সালে লিপজিগ শহরে ভুণ্টের (Wundt) মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার স্থাপন।

২। ১৮৮৫ সালে ফ্রান্সিস গ্যাল্টনের প্রচেষ্টা।

৩। ১৮৯০-৯৬ সালের মধ্যে ক্যাটেল-এর কলম্বিয়া কলেজের ছাত্রদের উপর বুদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ।

৪। ১৮৯৬ সালে এবিংহজের বুদ্ধির অভীক্ষা-প্রস্তুত করণ।

৫। ১৮৯৭ সালে পেন্সিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবৈজ্ঞানিক ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬। ১৯০৪-০৬ সালে স্পীয়ারম্যান ৫০০০ ছাত্রের উপর তাঁর নিজস্ব অভীক্ষা প্রয়োগ করেন।

৭। ১৯০৮ সালে বিনে মানসিক বয়স নির্ণয় করার চেষ্টা করেন।

৮। ১৯০৯ সালে থর্নডাইক একটি অভীক্ষা প্রস্তুত করেন যার ভিত্তি ছিল হাতের লেখা।

৯। ১৯১০ সালে কটিশ-এর বুদ্ধির অভীক্ষা প্রস্তুত করণ।

১০। ১৯১১ সালে বিনে-সিমন বুদ্ধির অভীক্ষার আত্মপ্রকাশ।

১১। ১৯১৫-১৬ সালে টারম্যান এবং সিরিল বার্ট, বিনের প্রশ্নগুলির সংস্কার সাধন করেন।

১২। ১৯১৭-১৮ সালে প্রথম যৌথ অভীক্ষা প্রকাশিত হয়।

১৩। ১৯৩৭ সালে টারম্যান-মেরিলের নতুন অভীক্ষা প্রস্তুত করণ।

১৪। ১৯৬০ সালে বিনের অভীক্ষার নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

এই সমস্ত অভীক্ষার মধ্যে বিনের অভীক্ষা (পরবর্তী কালে বিনে-সিমন, বা স্ট্যানফোর্ড-বিনে স্কেল নামে সুপরিচিত)-টিকে বুদ্ধির আদর্শীকৃত অভীক্ষা বলে ধরা হয়। বুদ্ধির অভীক্ষার বিষয়বস্তু বা আকৃতি আলোচনা করার পূর্বে অভীক্ষাগুলির শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে একটা ধারণা দেওয়া যাক।

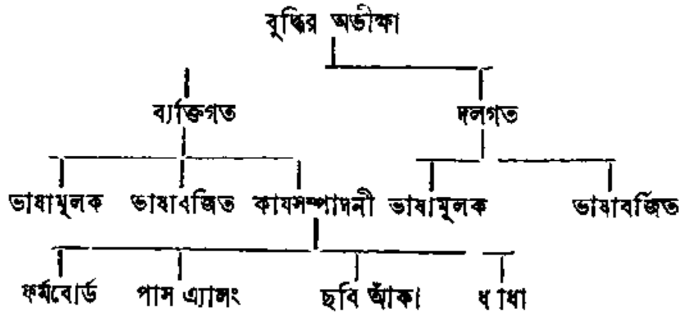

বিনে-সিমন স্কেল (Binet-Simon Scale): বিনে এবং তাঁর সহকর্মীরা বুদ্ধির ব্যক্তিগত অভীক্ষা প্রস্তুত করার জন্য দীর্ঘ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই অভীক্ষার প্রথম স্কেল তৈরীর সমস্ত কৃতিত্ব **বিনে** এবং তাঁর সহকর্মী **সিমনের**। ১৯০৫ সালে এই ফরাসী মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধির মান নির্ণয় করার জন্য সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য একটি স্কেল পরিমাপক অভীক্ষা তৈরী করেন। এতে প্রশ্ন বা সমস্যা (Problem) ছিল মাত্র ৩০টি। প্রশ্নগুলি কাঠিন্যের ক্রমানুসারে সাজানো ছিল বলে অভীক্ষাটিকে স্কেল বলা হ'ত। বিভিন্ন প্রশ্নের কাঠিন্যমাত্রা নির্ণয় করা হয়েছিল ৩ থেকে ১১ বছরের ৫০ জন স্বাভাবিক ছেলেমেয়ে, কিছু অনগ্রসর এবং কিছু ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়ের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে। অভীক্ষাটিতে নানা ধরনের প্রশ্ন ছিল কিন্তু বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল বোধশক্তি (Comprehension), বিচারকরণ (Judgment) এবং যৌক্তিকতার (Reasoning) উপর। এ

ছাড়া বিভিন্ন বস্তুর নাম জিজ্ঞাসা করা, সম্বন্ধ নির্ণয় করা, ছবি দেখে বর্ণনা করতে বলা, কোন কিছু দেখে নকল করতে পারা—এ সমস্তও ছিল। এই অভীক্ষাটি অবশ্য বুদ্ধির অভীক্ষার একটা প্রাথমিক রূপ এবং তখনও নৈর্ব্যক্তিক উপায়ে নম্বর দানের কোন ব্যবস্থা হয়নি।

বিনে বুঝতে পেরেছিলেন যে, বয়স অনুযায়ী একটা সঠিক 'নর্ম' (Norm) ঠিক করতে না পারলে অভীক্ষাকে ঠিক স্কেল বলা চলে না। একটা বিশেষ বয়সের ছেলেমেয়েদের দলের উপর অভীক্ষা প্রয়োগ ক'রে তাদের 'নর্ম' ঠিক করতে হবে। বুদ্ধির মাত্রা স্থির হবে সেই নর্মের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করে। ইতিমধ্যে বিনের অভীক্ষাটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অনেক ভাষাতে এর অনুবাদ করাও হচ্ছিল। কিন্তু অভীক্ষাটিকে আরো কার্যকরী করার জন্য বিনে এবং সিমন ১৯০৮ সালে প্রশ্নগুলির পরিবর্তন এবং সংশোধন করেন এবং শিশুদের বয়স অনুযায়ী প্রশ্নগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করেন। ৩ বৎসর থেকে ১৩ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের বুদ্ধি এর দ্বারা মাপা যাবে। প্রশ্নগুলি এমন ভাবে থাকত যাতে যে বছরের জন্য প্রশ্ন, সেই বয়সের একজন স্বাভাবিক শিশু সবগুলির উত্তর দিতে পারে। তিন বছরের জন্য যে প্রশ্ন তা একটি ৩ বছর বয়সের শিশুর পক্ষে উপযোগী। অর্থাৎ সে সবগুলির উত্তর দিতে পারবে। এই অভীক্ষাতে বিনে প্রথম মানসিক বয়সের (Mental age) প্রচলন করেন অর্থাৎ ১৯০৮ সালের অভীক্ষাটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা গেল।

প্রথমতঃ, এটি একটি বয়স-স্কেল (Age Scale) এবং
দ্বিতীয়তঃ, মানসিক বয়সের প্রথম প্রচলন।

১৯১১ সালের সংস্করণ ঃ বিনের ১৯০৮ সালের অভীক্ষাটির কয়েকটি ক্ষেত্রে কঠোর সমালোচনা করা হয়। কেউ কেউ বললেন যে, স্কেলটির নিম্ন প্রান্ত খুবই সহজ এবং উচ্চতর প্রান্ত অত্যন্ত কঠিন। আবার কেউ কেউ বললেন, এতে মাত্র বিশেষ একটা বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি পরিমাপ করা সম্ভব। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধি এর সাহায্যে মাপ করা যায় না। ফলে ১৯১১ সালে বিনেকে আবার তার স্কেলটির সংস্কার সাধন করতে হয়। বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে বুদ্ধির পরিমাপ করার জন্য বিনে বয়স অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান দুরূহতার নীতিতে কতকগুলি প্রশ্নের একটি তালিকা রচনা করেন। মূলতঃ এটি ১৯০৮ সালের অভীক্ষাটির নতুন রূপ। নতুন অভীক্ষাতে প্রশ্ন-সংখ্যা

হ'ল ৫৪টি। এই অভীক্ষাটি ৩ বছর বয়স থেকে পূর্ণবয়স্ক পর্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল। বিনে এই অভীক্ষাটিকে আর একটি সংযোজন করেন। তা হ'ল পরিমাপের ব্যাখ্যাব দিক থেকে। কোন শিশুর মানসিক বয়স (Mental age) যদি তার সময়গত বয়সের (Chronological age) সমান হয়, তবে তার বুদ্ধি স্বাভাবিক (Normal); যদি কম হয়, তবে অল্পবুদ্ধি (Retarded) এবং যদি বেশী হয়, তবে অগ্রগামী (Advanced)। বুদ্ধির পরিমাপ করা হ'ত ঐ দুই বয়সেব পার্থক্য থেকেই। ১৯১১ সালেই বিনে পরলোক গমন করেন।

॥ ১৯১১ সালের সংস্করণের কয়েকটি উদাহরণ ॥

(১) **তিন বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন**

(ক) নাক, চোখ, মুখ দেখাতে বলা।

(খ) নিজের পদবী বলতে বলা।

(গ) কোন ছবির বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা করতে বলা ইত্যাদি।

(২) **ছয় বৎসরের উপযোগী**

(ক) সকাল এবং বিকালের মধ্যে পার্থক্য করতে বলা।

(খ) একখণ্ড হীরক দেখে তার আকার নকল করতে বলা ইত্যাদি।

(৩) **পনর বৎসরের উপযোগী**

(ক) সাত অঙ্কের একটি সংখ্যা শুনে পুনর্বার বলতে বলা।

(খ) প্রদত্ত ঘটনার ব্যাখ্যা করতে বলা।

(গ) ছবির ব্যাখ্যা করতে বলা।

(ঘ) তারিখ, মাস এবং বছর বলতে বলা ইত্যাদি।

স্ট্যানফোর্ড বিনে বুদ্ধি অভীক্ষা (Stanford-Binet Intelligence Test): ১৯১৬ সালে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টারম্যান (Terman) বিনের প্রশ্নতালিকা সংশোধিত ক'রে একটি নতুন তালিকা প্রস্তুত করেন। এটিকে **স্ট্যানফোর্ড-বিনে পরীক্ষা বা স্ট্যানফোর্ড সংস্করণ** (Terman's Stanford Revision Test) বলা হয়। এটিকে স্ট্যানফোর্ডের প্রথম সংস্করণও বলা হয়। এই অভীক্ষায় এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী প্রশ্ন নতুন। পুরাতন প্রশ্নগুলির অনেক বাতিল হয়, অনেক আবার সংশোধিত হয়। অভীক্ষাটি শুরু হয় ৩ বৎসর থেকে। তারপর এক বছর করে

বাড়ে দশ বছর পর্যন্ত। তারপর আছে ১২, ১৪, সাধারণ পূর্ণবয়স্কদের জন্ত অভীক্ষা। মোট প্রশ্ন সংখ্যা হ'ল ৯০টি। প্রশ্নগুলির বয়স অনুযায়ী সংখ্যা হ'ল—

৩ বৎসর থেকে ১০ বৎসর পর্যন্ত @	৬টি = ৬ × ৮ বা	৪৮টি
১২ বৎসরের জন্ত	৮টি =	৮টি
১৪ " "	৬টি =	৬টি
সাধারণ পূর্ণবয়স্কদের জন্ত	৬টি =	৬টি
উন্নত বয়স্কের "	৬টি =	৬টি
বিভিন্ন বয়সের জন্য অতিরিক্ত	১৬টি	১৬টি
		৯০টি

॥ এই স্কেলের কয়েকটি নমুনা ॥

(১) তিন বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন

(ক) দেহের বিভিন্ন অংশ দেখাতে বলা।

(খ) পরিচিত বস্তুর নাম বলতে বলা।

(গ) ছেলে না মেয়ে বলতে বলা ইত্যাদি।

(২) আট বৎসরের উপযোগী

(ক) বল এবং মাঠের পরীক্ষা (Ball and Field Test)

(খ) ২০ থেকে ১ পর্যন্ত উল্টো দিক দিয়ে গণনা করা।

(গ) ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য না রেখে সংজ্ঞা দিতে বলা ইত্যাদি।

(৩) চৌদ্দ বৎসরের উপযোগী

(ক) ইংরেজী শব্দ তালিকা থেকে পঞ্চাশটি শব্দের অর্থপ্রদান।

(খ) বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে তুলনা করা।

(গ) ঘড়ির কাঁটা স্থান পরিবর্তন করলে কটা বেজেছে তা বলা ইত্যাদি।

এই সংস্করণের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল এতে প্রথম বার বুদ্ধ্যঙ্ক বা IQ ব্যবহার করা হয়। বুদ্ধ্যঙ্ক হ'ল মানসিক বয়স ও সময়গত বয়সের অনুপাত। মানসিক বয়সকে MA এবং সময়গত বয়সকে CA বললে, বুদ্ধ্যঙ্ক $IQ = \frac{MA}{CA}$ হয়। কিন্তু এই অনুপাত প্রায়ই ভগ্নাংশ হ'ত। এই ভগ্নাংশ এড়াবার জন্ত টারম্যান তাকে 100 দিয়ে গুণ করলেন। ফলে দাঁড়াল—

$$IQ = \frac{MA}{CA} \times 100$$

অবশ্য প্রথমে MA এবং CA-র অনুপাতকে IQ না বলে বলা হ'ত Mental Ratio বা MR। এই স্কেলটিকে তখনকার দিনে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগত স্কেল বলে ধরা হ'ত। কিন্তু খুব শীঘ্রই এর বিপক্ষেও অনেক সমালোচনা হ'ল। তার মধ্যে প্রধান প্রধান সমালোচনা ছিল অভীক্ষাটির সত্যতা, নির্ভরযোগ্যতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা সম্বন্ধে। অর্থাৎ অনেকে এই অভীক্ষাটিকে বুদ্ধির আদর্শীকৃত অভীক্ষা বলে স্বীকার করে নিতে চাইলেন না। তারই ফলে এই অভীক্ষাটির পুনরায় সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হ'ল এবং ১৯৩৭ সালে এই স্কেলের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল।

স্ট্যানফোর্ড-বিনে স্কেল, ১৯৩৭ঃ বিনের ১৯১১ ও ১৯১৬ সালের প্রকাশিত বুদ্ধির অভীক্ষাকে ভিত্তি করেই এই নতুন অভীক্ষাটি গঠিত হয়েছে। অবশ্য নতুন সংস্করণটি পূর্বতন সংস্করণ দু'টি থেকে অনেক দিক থেকেই পৃথক। নতুন সংস্করণটিকে আরো ভালোভাবে আদর্শীকৃত করা হয়েছে এবং আরো বেশী কার্যকরী ক'রে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। মূল বিনে-সিমন স্কেলটি শুরু হয়েছিল সর্বনিম্ন ৩ বৎসর বয়স থেকে এবং শেষ হয়েছিল সর্বোচ্চ ১৫ বৎসর বয়সে। নতুন সংস্করণে শুরু করার বয়স ২ বৎসর এবং শেষ করার বয়স হ'ল উন্নতবয়স্ক (৩) বা Superior Adult III। বিনের মূল স্কেলে প্রশ্ন বা সমস্যা ছিল ৫৪টি; টারমানের প্রথম স্ট্যানফোর্ড সংস্করণে এই সংখ্যা হয় ৯০; নতুন সংস্করণে প্রশ্নসংখ্যা আরো বেড়ে দাঁড়ায় ১২৯টি। এই নতুন সংস্করণে দু'টি সমজাতীয় ফরম L এবং M আছে। প্রতি ফরমেই অবশ্য প্রশ্নসংখ্যা ১২৯। পূর্বের অভীক্ষার কিছু কিছু প্রশ্ন বাদ দিয়ে তার বদলে নতুন প্রশ্ন যোগ করা হয়। পাঁচ বৎসরের নীচে এবং চৌদ্দ বৎসরের উপরের প্রশ্নগুলি বিচক্ষণতার সঙ্গে বাছাই করা হয়েছিল এবং সেগুলিকে যথার্থতার সঙ্গে আদর্শীকৃত করা হয়েছিল। এই অভীক্ষাতে নির্দেশনাকে সহজ করা হয়েছিল এবং নম্বর-দান পদ্ধতি আরো বেশী নৈর্ব্যক্তিক করা হয়েছিল। ২ বছর থেকে ৫ বৎসরের জন্য প্রতি ৬ মাস করে এক একটি স্তর ঠিক করা হ'ল। এর কারণ এই, যে অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছিল, এই সময়ে শিশুর মানসিক বৃদ্ধি দ্রুত হয়। এই স্কেলটিতে বাচনিক অভীক্ষার সংখ্যা বেশী; তা হ'লেও অন্য জাতীয় অভীক্ষা, যেমন, কার্যসম্পাদনী অভীক্ষা ও অবাচনিক অভীক্ষাও এই স্কেলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই স্কেলের প্রশ্নগুলির বিভাগ হ'ল এইরূপ—

২, ২½, ৩, ৩½, ৪, ৪½, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ ও ১৪—এর প্রত্যেকটি বয়সের জন্য ৬টি করে প্রশ্ন :————————৬ × ১৬ = ৯৬টি প্রশ্ন।
সাধারণ বয়স্ক (Average Adult) স্তরের জন্য———১ × ৮ = ৮টি প্রশ্ন।
উন্নত বয়স্ক (১), উন্নত বয়স্ক (২) ও উন্নত বয়স্ক (৩)
-এর প্রত্যেকটি বয়সের জন্য ৬টি করে প্রশ্ন :———৩ × ৬ = ১৮টি প্রশ্ন।
প্রথম সাতটি বয়সের জন্য ১টি করে বিকল্প প্রশ্ন :———৭ × ১ = ৭টি প্রশ্ন।

মোট—১২৯টি প্রশ্ন।

অভীক্ষাটির প্রয়োগ (Administration) : এই অভীক্ষা প্রয়োগ করার জন্য একটি নির্দেশনামা বা Manual এবং একটি নম্বর দানের নির্দেশনা (scoring guide)—এই দু'টির সাহায্য নিতে হয়। এই অভীক্ষা প্রয়োগ করার জন্য অভিজ্ঞ অভীক্ষক নিযুক্ত করা হয়। এই প্রয়োগের নিয়ম হ'ল এই রকম—

অভীক্ষার্থীর সময়গত বৎসরের (C/A) ২।১ বৎসর নীচ থেকে অভীক্ষাটির প্রয়োগ শুরু করতে হয় এবং দেখতে হয় স্কেলের কোন বয়স পর্যন্ত প্রশ্নের সবগুলির উত্তর সে দিতে পারছে। যে বয়সের অভীক্ষাতে এসে সে ভুল করতে শুরু করে তার ঠিক উপরের বয়স (অর্থাৎ যে স্তর পর্যন্ত সে সবগুলি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে, একটিও ভুল করে না)-কে বলা হয় মৌলিক মানসিক বয়স বা Basal Mental Age। এই বয়সের উপরেও অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে যেতে হবে যতক্ষণ না এমন একটা স্তর আসে যে স্তরে অভীক্ষার্থী আর একটি প্রশ্নেরও নির্ভুল উত্তর দিতে পারছে না। এই নিয়মকে বলে—**"সব পাস থেকে সব ফেল" (All pass to No pass)**। এর পর আর অভীক্ষা প্রয়োগ করা হবে না। অভীক্ষার্থীকে নম্বর দেওয়া হয় মানসিক বয়সের হিসেবে। এর গণনা করা হয় 'মাসের' হিসেবে। কোন্ বয়সের প্রশ্নের জন্য কত মানসিক বয়স প্রাপ্য হবে, তার একটা হিসেব আছে। তা হ'ল—

২ বৎসর থেকে ৫ বৎসর পর্যন্ত—প্রতি অভীক্ষার জন্য	—১ মাস।
৬ " " ১৪ " " " " "	—২ মাস।
সাধারণ বয়স্ক —" " "	—২ মাস।
উন্নত বয়স্ক (১) —" " "	—৪ মাস।
উন্নত বয়স্ক (২) —" " "	—৫ মাস।
উন্নত বয়স্ক (৩) —" " "	—৬ মাস।

মানসিক বয়স ও বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় (Determination of MA and IQ) :

অভীক্ষার্থীর Basal Mental Age-এর সঙ্গে অন্যান্য বয়সের অভীক্ষার উত্তরের জন্য প্রাপ্য নম্বর (মাসের হিসেবে) যোগ করলে "মানসিক বয়স" পাওয়া যায়। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে—

বৎসর	সঠিক উত্তরেব সংখ্যা	অভীক্ষা-প্রতি নম্বর (মাসে)	মোট নম্বর বৎসর	মাস
		॥ ৬ বৎসরের ছেলে ॥		
4	6	Basal age	4	0.
4—6	5	1	0	5.
5	3	1	0	3.
6	3	2	0	6.
7	2	2	0	4.
8	1	2	0	2.
9	0	Ceiling Age	0	0.

4 বৎ+20 মাস বা
5 বৎসর 8 মাস

$$I.Q=\frac{M.A}{C.A}\times 100 \text{ বা } \frac{5 \text{ বৎ } 8 \text{ মাস}}{6 \text{ বৎ}}\times 100$$

$$=\frac{68}{72}\times 100 \;\; 94=(\text{ প্রায় })$$

বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় (I.Q of Adults)

বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক হিসেব করার নিয়ম একটু পৃথক। দেখা গেছে যে একটা বিশেষ বয়সের পর বুদ্ধির আর বিশেষ উন্নতি হয় না। ঠিক কোন্ বয়স থেকে বুদ্ধি আর বাড়ে না, মনোবিজ্ঞানীরা সে বিষয়ে একমত নন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই বয়সটিকে ধরা হয়েছিল ১৪ বৎসর বলে। স্ট্যানফোর্ডের 1916 সংস্করণে টারম্যান এই বয়সটিকে 16 বৎসর বলে ধরেন। 1937-এর সংস্করণে এই বৎসরকে ধরা হয় ১৫ বলে। অতএব কোন বয়স্কের বুদ্ধির মান গণনা করার সময় ১৫ বৎসরকেই সর্বোচ্চ বয়স হিসেবে ধরা হয় (C.A), তার সত্যকার বয়স যতই হোক না কেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্—

বৎসর	সঠিক উত্তরের সংখ্যা	অভীক্ষা প্রতি নম্বর (মাসে)	মোট নম্বর বৎ মাস
॥ ৩৫ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি ॥			
13.	6	Basal age,	13 – 0
14.	2.	2	0 – 10
AA.	6	2	0 – 12
SA 1.	3.	4.	0 – 12
SA II,	2.	5.	0 – 10
SA III.	0.	Ceiling age	0 – 0
			13yrs + 44 mos
			বা 16 বৎ 8 মাস

$$I.Q = \frac{M.A}{C.A} \times 100 = \frac{16 \text{ বৎ } 8 \text{ মাস}}{15 \text{ বৎ}} \times 100 = 111 \text{ (প্রায়)}$$

স্ট্যানফোর্ড স্কেলে সর্বোচ্চ মানসিক বয়স হ'তে পারে ২২ বৎসর ১০ মাস এবং সর্বোচ্চ বুদ্ধ্যঙ্ক সেই হিসেবে হ'তে পারে ১৭১।

স্ট্যানফোর্ড বিনে সংস্করণ, ১৯৬০

এই সংস্করণটি পূর্বের সংস্করণ (১৯৩৭)-এর অত্যন্ত সদৃশ। কয়েকটি বিষয়ে এটি নতুনত্ব দাবি করতে পারে। সেগুলি হ'ল—

(১) কয়েকটি অভীক্ষার স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে।

(২) প্রতি স্তরের জন্য একটি করে বিকল্প প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে।

(৩) L এবং M দুটি ফরম থেকে বাছাই করে প্রশ্ন নিয়ে একটি একক অভীক্ষা তৈরী করা হয়েছে।

(৪) চিরাচরিত বুদ্ধ্যঙ্কের (Conventional 1.Q) পরিবর্তে বিস্তৃতি বুদ্ধ্যঙ্কের (Deviation 1.Q) ব্যবহার করা হয়েছে।

(৫) বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় করার ক্ষেত্রে তার সর্বোচ্চ বয়স (C.A) 18 বৎসর ধরা হয়েছে।

বিস্তৃতি বুদ্ধ্যঙ্ক (Deviation 1.Q)

বিস্তৃতি বুদ্ধ্যঙ্ক হ'ল এমন একটি আদর্শ স্কোর (Standard Score) যার গড় Mean হ'ল 100 আর সমক পার্থক্য (Standard Deviation) হল 16. এই জাতীয় বুদ্ধ্যঙ্কের সুবিধা হ'ল এই যে, এর সাহায্যে প্রতি বয়সের স্কোরের অত্যন্ত সহজেই তুলনা করা সম্ভব। হিসেবের সুবিধার জন্য Pinnean কেবল

মাত্র M.A এবং C.A (বৎসর ও মাসে) দেখেই বিস্তৃতি বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় করার একটি তালিকা প্রস্তুত করেন এবং সেই তালিকা স্ট্যানফোর্ড-বিনে স্কেলের নির্দেশনামাতে (mannual) উদ্ধৃত থাকে।

বুদ্ধির অভীক্ষার বিষয়বস্তু (Contents)

আগেকার মনোবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, কোন একটি একক অভীক্ষার দ্বারা বুদ্ধির নির্ভেজাল একটি সূচক (Index) পাওয়া যাবে। কিন্তু বিনের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বুদ্ধির একটি সূচকের পরিবর্তে অনেকগুলি সূচক নির্ণয় করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, সাধারণ বুদ্ধি বিবিধ কার্যাবলীর ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়। বুদ্ধি প্রকাশিত হয় অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা এবং কার্যাবলীর মাধ্যমে।

কিন্তু সমস্যা হ'ল এই যে, বুদ্ধির অভীক্ষাতে অর্জিত জ্ঞানের প্রভাব থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, আবার অর্জিত জ্ঞানের সাহায্য ছাড়া বুদ্ধি পরিমাপ করাও সম্ভব নয়। আবার অর্জিত জ্ঞানের অভীক্ষা এবং বুদ্ধির অভীক্ষা সমজাতীয় হ'তে পারে না। তাই বুদ্ধির অভীক্ষার মধ্যে এমন ধরনের দক্ষতা ও অর্জিত জ্ঞানের অভীক্ষা দেওয়া থাকে, যা সাধারণ শিশু তার গৃহ পরিবেশ ও দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উত্তর করতে সক্ষম হয়। আধুনিক বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে বিপরীতার্থক ও সমার্থক শব্দ বলা, বাক্যের অর্থ নির্ণয়, সংখ্যাঘটিত প্রশ্ন প্রভৃতি নানা অর্জিত জ্ঞাননির্ভর সমস্যা পাওয়া যায়। বিনে স্কেলের বুদ্ধির অভীক্ষার সমস্যাবলীর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল—

১। বস্তু, ছবি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতির নাম বলা (Naming or identifying Objects by Name):

যেমন, একটা কুকুরের ছবি দেখিয়ে বলা হল, এটা কি বলত ?

২। স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা (Memory)

যেমন, একটি বাক্য বা গল্প ব'লে অভীক্ষার্থীকে সেটি বলতে বলা হয় বা তার থেকে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

৩। অঙ্কের পুনরাবৃত্তি (Repeating Digits)

যেমন, মন দিয়ে শোন ও ঠিক করে পর পর অঙ্কগুলি বল— ৯-৪-১-৭।

৪। পার্থক্য নির্ণয় (Differences)

যেমন, পাখী ও কুকুরের মধ্যে তফাৎ কি ?

ALFRED BINET
1857-1911

৫। **বোধ শক্তি** (**Comprehension**)

যেমন, কোন লোক যদি বাড়ী এসে দেখে যে তার বাড়ীতে চুরি হ'য়ে গেছে তাহ'লে তার কি করা উচিৎ।

৬। **তুলনা** (**Comparison**)

যেমন: বড় বল ও ছোট বলের মধ্যে তুলনা করা।

৭। **অসম্ভবতা নির্ণয়** (**Verbal Absurdity**)

যেমন, একজনের দুইবার জ্বর হয়েছিল। প্রথম বার সে মারা যায়, কিন্তু দ্বিতীয় বারে সে শীঘ্র ভাল হয়ে ওঠে। এই উক্তির মধ্যে অসঙ্গত, অসম্ভব, বোকামী বা ভুল কি আছে ?

৮। **সমস্যামূলক পরিস্থিতি** (**Problem Situation**)

যেমন: একদল ছেলে সাজগোজ করে পরাণের বাড়ী এল ও তার সঙ্গে কোলাকুলি করল। সে দিন কি ছিল ?

৯। **উপমান** (**Opposite Analogies**)

যেমন: খরগোস ভীরু, সিংহ কি ? বুদ্ধি সহজাত, শিক্ষা কি ?

১০। **চাতুর্য** (**Ingenuity**)

যেমন: মা তাঁর ছেলেকে নদী থেকে ঠিক দুই সের জল আনতে বললেন। তিনি ছেলেটিকে একটি ৫ সেরা পাত্র ও আর একটি ৩ সেবা পাত্র দিলেন। ছেলেটি এই দুই পাত্র ছাড়া আর কোন পাত্র ব্যবহার না করে এবং আন্দাজ না কবে কি উপায়ে ঠিক ২ সেব জল আনবে ?

১১। **শব্দ সত্তার পরীক্ষা** (**Abstract Words**)

যেমন: সংযোগ, তুলনা করা, বাধ্যতা, প্রতিশোধ বলতে কি বোঝায় ?

১২। **বিচার করণ** (**Reasoning**)

যেমন: লোকে চশমা পরে কেন ?—সুন্দর দেখাবে বলে, চোখ খারাপ বলে, ফ্যাসানেব জন্য, দাম কম বলে।

১৩। **বিচ্ছিন্ন বাক্য** (**Dissected Sentences**)

যেমন: বাগানের ছেলেটি ঐ খেলা ভিতরে করিতেছে। এই কথাগুলিকে এমন ভাবে সাজাও যেন অর্থযুক্ত একটি বাক্য হয়।

১৪। **প্রবাদ বিশ্লেষণ** (**Proverbs**)

যেমন: যে জেগে ঘুমায় তাকে কে জাগাবে ? এই প্রবাদটির অর্থ কি ?

১৫। **শ্রেণীভুক্ত করণ** (**Classification**)

যেমন : রুটি, মাংস, কুকুর, মাখন—এই ৪টি বস্তুর মধ্যে কোনটির এই শ্রেণীতে থাকার কথা নয় ?

১৬। **নাম বলা** (**Word Naming**)

যেমন : আমি দেখতে চাই যে, এক মিনিটে তুমি কতগুলি বিভিন্ন জন্তুর নাম করতে পার।

১৭। **দিক্ নির্ণয়** (**Orientation Direction**)

যেমন : কোন দিকে মুখ করে দাঁড়ালে তোমার ডান হাত উত্তর দিকে থাকবে ?

১৮। **সংখ্যা সারি** (**Number Series**)

যেমন : শূন্যস্থানগুলিতে ঠিক মত সংখ্যা বসাও—

ক) ১, ৩, ৫, ৭, ৯——

খ) ৯, ১২, ১০, ১৩, ১১——

১৯। **শূন্যস্থানে শব্দ বসান** (**Minkus Completion**)

যেমন : খালি জায়গায় উপযুক্ত কথা বসাইয়া বাক্য পূরণ কর :

আমরা ভাত রাঁধিব—আগুনে কাঠালের বীচি পোড়াইব।

২০। **ব্যবহারঘটিত কার্যাবলীর সমস্যা** (**Practical Problem**)

যেমন : ফর্ম বোর্ড, পুঁতির মালা গাঁথা, গোলক ধাঁধায় ঠিক পথ বার করা, টুকরো ছবি জুড়ে সম্পূর্ণ ছবি তৈরী করা, ছবি আঁকা, রেখা টানা প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যা।

বিনে-সিমন স্কেলের বৈশিষ্ট্য (**Specialities**) : বিনে-সিমন স্কেলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য বুদ্ধি পরিমাপের ক্ষেত্রে এই স্কেলটির জনপ্রিয়তা ও কার্যকারিতা অত্যন্ত বেশী। এই স্কেলটি পৃথিবীর বহু ভাষায় অনুদিত হয়েছে। তাছাড়া এর আদর্শে ও নীতিতে নতুন স্কেল প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরী করাও হয় (Admission Tests Competitive Tests ইত্যাদি)। যাই হোক্ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা যাক্।

(১) অভীক্ষাটি বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে গঠিত। বুদ্ধি একটি সাধারণ শক্তি, বিশেষ শক্তি নয়। সেইজন্য যদি অভীক্ষাটির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা ও কাজ দেওয়া থাকে, তবেই সকলের বুদ্ধিকে পূর্ণ প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়।

(২) অভীক্ষাটিকে একটি স্কেল (Scale) বলা হয়। এতে কতকগুলি একক বা (Unit) ক্রমবর্ধমান ধারায় সাজানো আছে। অভীক্ষার্থীর বয়স অনুযায়ী এইগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত।

1 2 3 4 5

ইঞ্চির স্কেল

২বং 2½ 3 3½ 4½ ****** AA SAI SAII SAIII

বয়স স্কেল (Age Scale)

(৩) অভীক্ষাটির প্রশ্নগুলির একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, সেগুলি ক্রমবর্ধমান কাঠিন্যের (Graded difficulty) নীতি অনুযায়ী সাজানো। প্রথম প্রশ্নটি সবচেয়ে সহজ এবং সর্বশেষ প্রশ্নটি সবচেয়ে শক্ত। মধ্যবর্তী প্রশ্নগুলি তাদের কাঠিন্যের মান অনুযায়ী পর পর সাজানো।

(৪) এই অভীক্ষাতে মানসিক বয়স (M. A.) ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কেবলমাত্র মানসিক বয়সের সাহায্যে বুদ্ধির সঠিক পরিমাপ পাওয়া যায় না বলে এবং বিভিন্ন শিশুর বুদ্ধির তুলনা করা সম্ভব হয় না বলে বুদ্ধ্যঙ্ক IQ ব্যবহার করা হয়।

(৫) এই অভীক্ষাতে যে কোন বয়সেই ১০ বুদ্ধ্যঙ্কে ১০০ সেই বয়সের গড় (Average) ব্যক্তির বুদ্ধির মানের সূচক। কারো বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০-এর কম হ'লে বুঝতে হবে যে সেই বয়সের গড় ব্যক্তির চেয়ে তার বুদ্ধি কম। আবার ১০০-এর বেশী হ'লে বুঝতে হবে যে, সেই বয়সের গড় ব্যক্তির চেয়ে তার বুদ্ধি বেশী।

(৬) এই অভীক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, এর প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি এমন ধরনের হবে যা সমাধান করতে কোন অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োজন হবে না। বুদ্ধি সহজাত মানসিক শক্তি, অর্জিত বৈশিষ্ট্য নয়।

বুদ্ধির অভীক্ষা এবং অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা (Intelligence Test and Scholastic Achievement Test) : বুদ্ধির অভীক্ষা এবং অর্জিত জ্ঞানের অভীক্ষা এক নয়। আগেই বলা হয়েছে, বুদ্ধি সহজাত কিন্তু অর্জিত জ্ঞান— অর্জিত। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রদের যে পরীক্ষা নেওয়া হয়, সেগুলি হ'ল অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা। এই সব পরীক্ষা থেকে কোন একটি বিষয়ে ছাত্র কতখানি জ্ঞান অর্জন করছে তা জানা যায়। আবার জ্ঞানের

বিভিন্ন শাখাতে সে কতখানি জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছে তাও পরিমাপ করা যায়। এই সব পরীক্ষাতে যে সমস্ত প্রশ্ন দেওয়া হয় সেগুলি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক থেকেই দেওয়া হয়।

কিন্তু অর্জিত জ্ঞানের অভীক্ষার সাহায্যে বুদ্ধি পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। অর্জিত জ্ঞানের অভীক্ষার পরিধি খুবই সীমাবদ্ধ। বিদ্যালয়ে যে সমস্ত বিষয় শেখান হয়, কেবলমাত্র সেই বিষয়ের অর্জিত জ্ঞান এই অভীক্ষার সাহায্যে জানা যায়। কিন্তু বিদ্যালয়ের বাইরে যে বৃহত্তর পরিবেশ আছে, সে সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা সাধারণতঃ অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষায় করা যায় না। তাছাড়া যে সব ছাত্র একটু বেশী পড়াশুনা করে বা যাদের মুখস্থ করার ক্ষমতা বেশী, তারা অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষায় বেশ ভাল ফল দেখাতে পারে (বুদ্ধির অভীক্ষায় তত ভালো ফল নাও হ'তে পারে)। আর যারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন, তারা তাদের বুদ্ধির উপযোগী পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী শিক্ষালাভ করার সুযোগ পায় না। সে সব ক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের মানসিক শক্তির ঠিক-মত বিচার করা সম্ভব হয় না।

বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে ছাত্রের সহজাত মানসিক সক্রিয়তা এবং বৃহত্তর পরিবেশ সম্পর্কে তার সাধারণ জ্ঞানের পরিমাপ করা হয়। অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির সহায়তায় একটা নতুন পরিস্থিতিকে সে কত-খানি অনুধাবন করতে পারে, তা খুব সহজে জানা যায়। সেইজন্য বুদ্ধির অভীক্ষায় এমন কোন প্রশ্ন রাখা চলবে না যার উত্তর দেবার জন্য অর্জিত জ্ঞানের সাহায্য প্রয়োজন। 'কুতবমিনারকে তৈরী করেছিলেন,' বা 'ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি কত'—এ জাতীয় প্রশ্ন হ'ল অর্জিত জ্ঞানের অভীক্ষার প্রশ্ন। বুদ্ধির অভীক্ষার প্রশ্নগুলি এমন হবে যেন সে মানসিক শক্তির সাহায্যেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারে।

বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে একেবারে অর্জিত জ্ঞান-নিরপেক্ষ করে তৈরী করা কঠিন। বেশী বয়সের জন্য যে সমস্ত প্রশ্ন থাকে, সেগুলিতে সাধারণতঃ কোন জটিল সমস্যার সমাধান করতে হলা হয়। এর জন্য অর্জিত জ্ঞানের সাহায্য নিতেই হয়। তবে ধরে নেওয়া হয়, যে বয়সের জন্য অভীক্ষা, সেই বয়সের সাধারণ সভ্যসমাজের সব ছেলেরই ঐটুকু অর্জিত জ্ঞান আছে।

বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির সুবিধা-অসুবিধা (Uses and Limitations of Intelligence Tests): বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে বর্তমানে জীবনের

বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এতে অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া গেলেও সব সময় বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না। এই অভীক্ষার সুবিধা এবং অসুবিধা দুই-ই আছে। প্রথমে **সুবিধাগুলির** কথাই আলোচনা করা যাক্।

(১) রস (Ross) তাঁর "Groundwork of Educational Psychology" বই-এ বুদ্ধির অভীক্ষা প্রসঙ্গে বলেছেন —এই বুদ্ধি অভীক্ষাগুলি মানুষের মনোপ্রকৃতি এবং তার ক্রমোন্নতি সম্পর্কে কতকগুলি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে সাহায্য করছে। টারম্যান তাঁর "The Measurement of Intelligence" বই-এ বলেছেন—"এগুলির (বুদ্ধি অভীক্ষা) আর একটি প্রয়োজনীয় উপকারিতা হ'ল—যে সব উপাদান মানসিক বিকাশকে প্রভাবিত করে, সেগুলি আলোচনা করা।"

(২) এই অভীক্ষার সাহায্যে একই বুদ্ধ্যঙ্ক-সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের শ্রেণীভুক্ত করতে পারা যায়। ফলে পৃথক্ বুদ্ধ্যঙ্ক-সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক ক্লাসের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

(৩) বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয় নির্বাচনে বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি যথেষ্ট সাহায্য করে। এই অভীক্ষার সাহায্যে জানা যাবে বুদ্ধ্যঙ্কের সঙ্গে ক্লাসের ফলাফলের সামঞ্জস্য আছে কি না।

(৪) এই অভীক্ষাগুলির সাহায্যে ছাত্রদের মানসিক ক্ষমতা, আগ্রহ, অনুরাগ প্রভৃতি জানা যায়।

(৫) ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নির্বাচনে বুদ্ধি অভীক্ষা বিশেষ কার্যকরী।

এই অভীক্ষাগুলির সাহায্যে জানা যায় ছেলেমেয়েরা তাদের পূর্ণ সামর্থ্যানুযায়ী কাজ করছে কি না।

(৬) যারা স্বল্পবুদ্ধি বা বিকারগ্রস্ত, তাদের স্বল্পবুদ্ধি বা বিকারের লক্ষণ নির্ণয় করার জন্য, যারা সামাজিক বা শিক্ষামূলক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে পারে না, তাদের মধ্যে এই অসঙ্গতির কারণ কি, তা নিরূপণ করার জন্য বুদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যায়।

(৭) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ছাত্র ভর্তি করার জন্য, শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মী-নির্বাচনের জন্য, সৈন্যবাহিনীতে সৈন্য ভর্তি করার জন্য এই সব বুদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয়। উপযুক্ত বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও অভীক্ষাগুলি বিশেষ ভাবে সহায়তা করে। এবার দেখা যাক **অসুবিধে-গুলি** কি প্রকারের—

[এক] এই অভীক্ষার সাহায্যে সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির যথাযথ পরিমাপ সম্ভব হয় না। শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ না থাকলে বুদ্ধির পারস্পরিক তুলনা কাযকরী হয় না।

[দুই] বাচনিক বা ভাষামূলক বুদ্ধি অভীক্ষার সাহায্যে অনেক সময় বুদ্ধির ঠিকমত পরিমাপ হয় না। শিক্ষার্থী ভাষা ব্যবহারে নানারকম অসুবিধা ভোগ করতে পারে।

[তিন] এই অভীক্ষা ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করতে পারে না।

[চার] এই অভীক্ষাব একটি প্রধান অসুবিধা হ'ল যে, অভীক্ষাগুলি যে বুদ্ধির পরিমাপ করে, সেই বুদ্ধিব স্বরূপ সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীরা একমত নন। যে মানসিক শক্তিব পরিমাপেব চেষ্টা করা হচ্ছে, তার সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীরা একমত নন। যে মানসিক শক্তিব চেষ্টা করা হচ্ছে, তার সম্পর্কে যদি কোন সুস্পষ্ট জ্ঞান বা ধারণা না থাকে, তাহ'লে সে শক্তি পরিমাপের কোন অর্থ হয় না। তবে এই অভিযোগ টেকে না। বুদ্ধিব একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব না হলেও অভীক্ষাগুলির প্রয়োজনীযতা অস্বীকাব করা চলে না।

[পাঁচ] বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি আদর্শীকৃত (Standardization) করা না হ'লে শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন বা কর্মজীবন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না। তাছাড়া এমন অনেক কাজ আছে, যেখানে বুদ্ধিই সফলতা আনতে পারে না (Rex and Knight—Intelligence and Intelligence Tests)। মানুষের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করতে হ'লে তার সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিমাপের প্রয়োজন।

[ছয়] অনেক সময় দেখা গেছে দ্রুত চিন্তা করার ক্ষমতা বুদ্ধির অভীক্ষার সাফল্যাঙ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তবে এটাকে ঠিক অসুবিধা বলা চলে না। কারণ দ্রুত চিন্তা নিঃসন্দেহে উন্নত বুদ্ধির লক্ষণ।

[সাত] অভীক্ষাগুলির অন্যতম অসুবিধা হ'ল এই যে, সেগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। পরীক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান তার যথার্থ বুদ্ধির পরিমাপের পথে প্রধান বাধা।

[আট] বুদ্ধি যদিও সহজাত, তবুও বংশগতি অনুসারে একজন ব্যক্তি বুদ্ধির যে সর্বোচ্চ স্তরে আবোহণ করতে পারে, তা করার জন্য একটা উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন। এইজন্য কেবল বুদ্ধি জানালে ব্যক্তির সাফল্য আসবে

না—যতক্ষণ পর্যন্ত না তার পরিবেশটি নিয়ন্ত্রিত করা যায়।—[Rex and Knight]

[নয়] অভীক্ষাগুলির আর একটি অসুবিধা হ'ল, আবেগ বা মেজাজ (Emotional Mood) অভীক্ষাগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

যাই হোক্ বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির কিছু অসুবিধা বা দোষত্রুটি থাকলেও এ গুলিকে বাতিল করে দেওয়া হোক্—বা এগুলির প্রয়োজনীয়তা নেই এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয়। বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে আদর্শীকৃত করে অনেকে দোষত্রুটি দূর করা সম্ভব। তাছাড়া পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর মধ্যে একটা সহজ বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির সম্পর্ক (Rapport) প্রতিষ্ঠিত হ'লে অভীক্ষাগুলি আরো সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হ'তে পারে। বুদ্ধির অভীক্ষাকে শিক্ষাজগতে ঠিক ভাবে কাজে লাগতে পারলে শিক্ষার্থীর "শিক্ষামূলক প্রবণতা" নির্ধারণ করা অত্যন্ত সহজ হয়। শিক্ষামূলক প্রবণতা (Educational Aptitude) এই কথাই জানায় যে, ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে, বিশেষ করে বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেলে শিক্ষার্থী কতটা উন্নতি করতে পারবে। এই প্রবণতা নির্ধারণ করার জন্য অভীক্ষা প্রস্তুত করা সম্ভব। তাকে শিক্ষামূলক প্রবণতার অভীক্ষা বলা চলতে পারে। এই অভীক্ষা পূর্বাভাসসূচক।

শিক্ষাগত বয়স (Educational Age) : কোন শিক্ষার্থীর কয়েকটি বিভিন্ন বিষয়ের গড় মান (বয়স হিসেবে)-কে শিক্ষাগত বয়স বলে। শিক্ষার্থী যে সব সময় তার সময়গত বয়স অনুযায়ী সাফল্যাঙ্ক অর্জন করে, তা নয়। কোন বিষয়ে হয়তো সে তার বয়সের প্রশ্নের অনুপযুক্ত আবার কোন ক্ষেত্রে তার বয়সের চেয়ে বেশী বয়সের প্রশ্নের উত্তর দিতেও সক্ষম হয়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক—

একজন শিক্ষার্থীর পঠনের পরীক্ষাতে সাফল্যের মনে হল—৯ বছরের মাত্রা

সহজ গণিতের	"	"	"	" ১০	"	"
বানানের	"	"	"	" ৯	"	"
ভাষা ব্যবহারের	"	"	"	" ১০	"	"

এই শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত বয়স (E.A) হবে—

$$\frac{৯+১০+৯+১০}{৪}$$ বৎসর বা ৯'৫ বৎসর।

শিক্ষার্থীর কোন একটি বিষয়ে বয়স হিসেবে সাফল্যের মানকে অর্জিত বয়স (Achievement Age বা A A) বা গুণগত বয়স বলে।

শিক্ষা সূচক (Educational Quotient) : শিক্ষাসূচক হ'ল শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত বয়স ও সময়গত বয়সের অনুপাত।

$$E.\,Q=\frac{E\,A}{C.\,A}\times 100$$

সাফল্য সূচক (A.Q) : সাফল্য সূচককে কখনও কখনও গুণগত সূচক (Accomplishment Quotient) বা অর্জিত জ্ঞানের সূচকও বলা হ'য়ে থাকে। এই সূচকের সাহায্যে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত বয়স ও মানসিক বয়সের একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করা যেতে পারে। এই সূচকের সূত্র (Formula) হ'ল—

$$AQ=\frac{E.A}{MA}\times 100 \text{ অথবা } \frac{E\,Q}{I.Q}\times 100$$

[যদি $E.Q=\frac{E.A}{C.A}\times 100$ এবং $I.Q=\frac{M\,A}{C\,A}\times 100$ ধরা যায়,

$$\text{তবে } AQ=\frac{\frac{E.A}{C.A}}{\frac{MA}{C.A}}\times 100 \text{ হয়]}$$

যদি শিক্ষার্থীর সাফল্য তার শিখনের ইচ্ছা এবং ক্ষমতার সঙ্গে সমান তালে চলে অর্থাৎ যদি তার শিক্ষাগত বয়স, মানসিক বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে, তবে তার সাফল্যসূচক হবে 100 ; যদি A. Q 100 থেকে কম হয়, তবে বুঝতে হবে শিক্ষার্থী তার ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করছে না। A. Q 100 থেকে বেশী হতে পারে না।

বিভিন্ন জাতীয় বুদ্ধির অভীক্ষা
(Different kind of Intelligence Tests)

[ক] **ভাষাভিত্তিক ব্যক্তিগত বুদ্ধির অভীক্ষা (Verbal Individual Test) :** যে সব বুদ্ধির পরীক্ষায় ভাষার প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ পরীক্ষার্থীকে উত্তর দেবার জন্য বা সমস্যা সমাধানের জন্য ভাষার ব্যবহার করতে হয়, সেগুলি ভাষামূলক বুদ্ধি অভীক্ষা। এই জাতীয় অভীক্ষা ব্যক্তিগত (Individual) এবং দলগত (Grouped)—এই দুই রকমের হ'তে পারে। বিনে-সিমনের অভীক্ষা হ'ল শিশুদের জন্য ভাষামূলক ব্যক্তিগত অভীক্ষা। ডঃ ডেভিড ওয়েক্সলের (Dr. David Wechsler) Wechsler-Bellevue Intelligence Scale হ'ল পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য ব্যক্তিগত বুদ্ধি অভীক্ষা।

[খ] **ভাষাভিত্তিক দলগত অভীক্ষা** (**Group Test, Verbal**) : এক সঙ্গে যাতে একটি বড় দলকে পরীক্ষা করা যায়, তার জন্য এক জাতীয় অভীক্ষার প্রবর্তন করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনীতে বিভিন্ন কর্মে লোক নিযুক্ত করার সময় তাদের বুদ্ধি পরিমাপ করার জন্য এক জাতীয় দু'টি অভীক্ষার প্রবর্তন করা হয়। একটি হ'ল "আর্মি আল্‌ফা অভীক্ষা" [Army Alpha (x) Test] এবং অপরটি হ'ল "আর্মি বিটা অভীক্ষা" (Army [B] Beta Test)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই অভীক্ষা দু'টির সংস্কার সাধন ও সমন্বয় করে একটি নতুন অভীক্ষা প্রস্তুত করা হয়। এটির নাম হ'ল—Army General Classification Test (A G C T)। এই অভীক্ষাতে ভাষাগত, সংখ্যাগত, ব্লক গণনা সংক্রান্ত এবং অবস্থানমূলক জ্ঞান সম্পর্কে ক্ষমতার পরীক্ষা করা হয়। দলগত অভীক্ষা সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

[গ] **কার্যসম্পাদনী অভীক্ষা** (**Performance Test**) : বিনে-সিমনের বুদ্ধি অভীক্ষা প্রধানতঃ ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা। কিন্তু শিশু সব সময় তার মনের ভাবকে ভাষার মাধ্যমে সুপরিস্ফুট করতে পারে না। সেক্ষেত্রে শিশুর বুদ্ধির যথার্থ পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। এই সমস্ত শিশুদের জন্য, কিংবা যারা মূক, বধির বা যারা বিদেশী অপরের ভাষা জানে না, তাদের বুদ্ধি পরিমাপের জন্য এই জাতীয় অভীক্ষা প্রস্তুত করা হয়। এই অভীক্ষাগুলিও আবার ব্যক্তিগত এবং দলগত দুই প্রকারের হ'তে পারে।

। কয়েকটি কার্যসম্পাদনী স্কেল।

এই জাতীয় অভীক্ষা প্রস্তুত করার কাজে প্রথম হাত দেন—সেগুইন, হিলি, নক্স, ফারন্যান্ড প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানী। কিন্তু এই জাতীয় অভীক্ষার প্রথম আদর্শীকৃত স্কেল বলতে বোঝায়—পিণ্টনার পেটারসন স্কেলটিকে (Pintner Paterson Performance Scale)। এই অভীক্ষাটিতে অবশ্য সেগুইন, হিলি প্রভৃতির অভীক্ষার কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সমগ্র স্কেলটিতে মোট ১৫টি অভীক্ষা আছে। আবার ১০টি অভীক্ষাবিশিষ্ট এই স্কেলটির একটি ক্ষুদ্র সংস্করণও আছে। ভাষামূলক বুদ্ধি অভীক্ষার পরিপূরক হিসেবে এই অভীক্ষাটি বিশেষ কার্যকরী। এই অভীক্ষাটিতে আছে—

১। সেগুইন (Seguin) ফরম বোর্ড।
২। হিলির ছবি সম্পূর্ণকরণ (Healy Picture Completion)
৩। ক্যাজুইষ্ট (Casuist) ফরম্ বোর্ড।

৪। ঘোটকী এবং তার বাচ্চার অভীক্ষা (Mare and Foal Test)

৫। পাঁচ চিত্রের বোর্ড।

৬। দুই চিত্রের বোর্ড।

৭। ত্রিভুজের অভীক্ষা।

৮। কর্ণসম্বন্ধীয় অভীক্ষা।

৯। হিলির ধাঁধা (Healy's Puzzle)।

১০। ম্যনিকিন অভীক্ষা (Manikin Test)।

১১। ফিচার প্রোফাইল অভীক্ষা (Feature Profile Test)।

১২। জাহাজ অভীক্ষা (Ship Test)।

১৩। ঘন আয়তনের অভীক্ষা (Cube Test)।

১৪। অনুকল্প অভীক্ষা (Substitution Test)।

১৫। সঙ্গতিসাধক অভীক্ষা (Adaptation Test)।

অভীক্ষার বয়ঃসীমা হ'ল—৪ থেকে ১৫ বৎসর পর্যন্ত।

এই অভীক্ষা ছাড়াও আরো অনেক কার্যসম্পাদনী স্কেল প্রচলিত আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—

(১) ডিয়ারবর্ণের (Dearborn) ফরম্ বোর্ড।

(২) আলেকজাণ্ডারের (Alexander) পাস এ্যালং অভীক্ষা (Pass Along Test)।

(৩) গুড এনাফের মানুষ আঁকা অভীক্ষা (Goodenough's Man drawing Test)।

(৪) পোর্টিয়াসের ধাঁধা (Porteus Maze)।

(৫) কর্ণেল-কক্সে সম্পাদনী দক্ষতা স্কেল (The Cornell-Coxe Performance Ability Scale)।

(৬) আর্থার সম্পাদনী স্কেল (Arthur Performance Scale)।

(৭) কোহার ব্লক ডিজাইন অভীক্ষা (Koh's Block Design Test)।

(৮) কার্ল হলোস্কোয়ার অভীক্ষা (Carl Hollow Square Scale)।

(৯) লেটার ইন্টারন্যাশনাল পারফরম্যান্স স্কেল (Letter International Performance Scale) ইত্যাদি।

এখন দু-একটি অভীক্ষার বর্ণনা দেওয়া যাক—

ভাষা বর্জিত ব্যক্তিগত অভীক্ষা

(Non-Verbal Individual Test)

[A] **ফর্মবোর্ড অভীক্ষা (Form Board Test) :** ডিয়ারবর্ণ কর্তৃক প্রবর্তিত অভীক্ষাটিই এ ব্যাপারে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত। অভীক্ষার্থীর সম্মুখে একটি এমন কাঠের বোর্ড রাখা হয় যেটিতে নানা আকৃতির ঘর বা খোপ কাটা আছে (groove)। অভীক্ষার্থীকে ঐ আকারের এবং মাপের কতকগুলি কাঠের টুকরো দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে ঠিক ঠিক খোপে ঠিক ঠিক টুকরোটি বসাতে বলা হয়। কোন খোপে ভুল আকৃতির টুকরো বসানোও চলবে না।

[B] **পাস এ্যালং অভীক্ষা (Pass Along Test) :** আলেকজাণ্ডার নামক একজন মনোবিজ্ঞানী এই অভীক্ষাটির প্রবর্তন করেন। এই অভীক্ষায় কয়েকটি ছোট ছোট চৌকা ও আয়তাকার কাঠের টুকরো এবং একটি ট্রের প্রয়োজন। ট্রের একটি প্রান্ত লাল এবং অপর প্রান্ত নীল। কাঠের টুকরো (আজকাল প্লাষ্টিকেরও পাওয়া যাচ্ছে)-গুলিরও কতকগুলি লাল, কতকগুলি নীল। অভীক্ষার্থীকে ট্রের উপর টুকরোগুলি এমন ভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয় যেন লাল টুকরোগুলি নীল প্রান্তে এবং নীল টুকরোগুলি লাল প্রান্তে থাকে। অভীক্ষার্থীকে টুকরোগুলি না তুলে ঘষে ঘষে (slide করে) লালগুলিকে লালপ্রান্তে এবং নীলগুলিকে নীলপ্রান্তে নিয়ে আসতে হবে। টুকরোগুলি কি ভাবে সাজাতে হবে সে সম্বন্ধে অভীক্ষার্থীর বিচার ও যুক্তি-শক্তি, চিন্তনের ক্ষমতা এবং সহ-সম্বন্ধের জ্ঞান সম্বন্ধে একটা ধারণা অর্জন করা যায়।

[C] **ছবি সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা (Picture Completion Test) :**

গুড-এনাফ এই অভীক্ষার প্রবর্তন করেন। এই অভীক্ষাটি চার থেকে দশ বছর বয়সের ছেলে মেয়েদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। একে অভীক্ষার্থীকে নিজের মন থেকে পেন্সিল দিয়ে মানুষের একটি ছবি আঁকতে বলা হয়। ছবি দেখে একটা নম্বর দেওয়া হয়। তবে এই নম্বর দেবার সময় কার ছবি কত সুন্দর হয়েছে তা দেখে নম্বর দেওয়া হয় না। ছবিটির সামঞ্জস্য দেখে বা কে ছবিটি কতখানি সম্পূর্ণ করতে পেরেছে তা দেখে নম্বর দেওয়া হয়।

[D] **ধাঁধা-অনুসন্ধান (Maze Exploration) :** এস. ডি. পোর্টিয়াস এই অভীক্ষাটির প্রবর্তন করেন—বার থেকে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্ত। এতে ধাঁধার পথ খুঁজে বের করতে হয়। অভীক্ষাগুলি এক প্রকারের হয় না। একটি কাগজের উপর বৃত্তাকার বা আয়তাকার একটি ধাঁধা

আঁকা থাকে। অভীক্ষার্থীকে একটি বিশেষ স্থান থেকে শুরু করে বন্ধ পথের ভিতর না ঢুকে খোলামুখে বেরিয়ে আসতে বলা হয়। অভীক্ষার্থীকে সংক্ষিপ্ততম পথটি চিহ্নিত করতে বলা হয়। অভীক্ষার্থী কত কম ভুল করে এবং কত কম সময়ে পথটি খুঁজে বের করতে পারে তার উপর নির্ভর করেই নম্বর দেওয়া হয়।

[E] ভাষাবর্জিত দলগত বুদ্ধি অভীক্ষা (Non-Verbal Gronnd Test) : বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈন্যদের জন্য যে A G C. T ও আর্মি বিটা অভীক্ষা প্রবর্তিত হয়েছিল সে সমস্ত অভীক্ষা এই দলভুক্ত। এই জাতীয় অভীক্ষাতে অভীক্ষার্থীকে কোন প্রকার ভাষা ব্যবহার করতে হয় না। ধাঁধার পথ খুঁজে বের করা, অসম্পূর্ণ ছবি সম্পূর্ণ করা, জ্যামিতিক চিত্র গঠন করা প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যা থাকে এই জাতীয় অভীক্ষাতে।

এ জাতীর অভীক্ষার ব্যবহার (Uses) :

আগেই বলা হয়েছে, যে সমস্ত শিশু ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে অক্ষম, যারা মূক বা বধির, যারা বিদেশী অপরের ভাষা বোঝে না তাদের

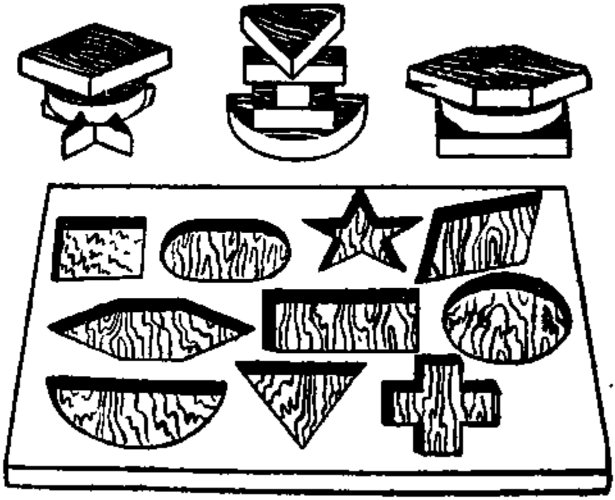

ক্ষেত্রে এই অভীক্ষা বিশেষ কার্যকরী। তাছাড়া যে সমস্ত শিশু খুব লাজুক, বা আরো আবেগপ্রবণতার জন্য লেখার ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হয় তাদের ক্ষেত্রেই এই অভীক্ষা বিশেষ কার্যকরী।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। সম্পাদনী অভীক্ষাগুলিকে স্বাধীন ও পৃথক অভীক্ষা হিসেবে প্রয়োগ করে যে সুফল পাওয়া যায় তা থেকেও বেশী সুফল পাওয়া যায় যদি এই অভীক্ষা বাচনিক অভীক্ষার পরিপূরক

হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। একই বয়সের অভীক্ষার্থীর উপর যদি এই দুই ধরনের অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয় তবে তাদের ফলের সহসম্বন্ধের সহগ (r) হবে ৫০।

এই অভীক্ষার কার্যকারিতার সীমা (Limitations) :

কার্যসম্পাদনী অভীক্ষাগুলি অনেক দিক থেকেই কার্যকরী ব'লে প্রমাণিত হলেও এর কিছু কিছু দোষক্রটি আছে। একটা নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যেই এই অভীক্ষা সবচেয়ে কার্যকরী হয়। এখন দেখা যাক্ এই অভীক্ষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়—

প্রথমতঃ অভীক্ষাগুলিকে ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা খুব ছোট দলের উপর প্রয়োগ করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, অভীক্ষার কোন একটি বিশেষ অংশ যদি প্রয়োগ করা হয় তবে তার ফল নির্ভরযোগ্য হবে না।

তৃতীয়তঃ, অভ্যাস বা পূর্বজ্ঞান ফলাফলকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে।

চতুর্থতঃ, বাচনিক বুদ্ধির অভীক্ষার সঙ্গে এর অনুবন্ধ খুব উচ্চ নয়। এর থেকে বলা যেতে পারে যে বুদ্ধি বলতে আমরা যা বলি, ঠিক সেই জিনিসটি এর সাহায্যে যথাযথ ভাবে পরিমাপ করা যায় না।

পঞ্চমতঃ, পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে এই স্কেল বিশেষ কার্যকরী নয়। কম বয়সের অভীক্ষার্থী, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশু বা যে সকল শিশু ভাষা ব্যবহারে বেশ পারদর্শী নয়, তাদের জন্য এই স্কেল বিশেষ কার্যকরী।

কার্যসম্পাদনী অভীক্ষার সঙ্গে বিনে-সিমনের অভীক্ষার সহ-সম্বন্ধ : গডফ্রে টমসন বিনের অভীক্ষাটি এবং ৮ প্রকার কার্যসম্পাদনী অভীক্ষা ৯ ১২ বছরের এক হাজার ছেলেমেয়ের উপর খুব কম সময়ের ব্যবধানে প্রয়োগ করেন। বিনে-সিমন অভীক্ষাতে ভাষার ব্যবহার হয়, কিন্তু ব্যবহারিক গুণ বা ক্ষমতার ব্যবহার হয় না। ঐ গুণটি পরিমাপ করার জন্যই কার্য-সম্পাদনী অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয়েছিল। দুটি অভীক্ষাতে যে সহ-সম্বন্ধের মান পাওয়া গেল (co-efficient of correlation) তা হ'লে ছেলেদের ক্ষেত্রে 70° এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে 73°। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে এমন একটি সাধারণ ক্ষমতা আছে যা দুটি অভীক্ষার ক্ষেত্রেই কাজ করছে। কতকগুলি কার্য-সম্পাদনীর অভীক্ষা কেবলমাত্র কায়িক ক্ষমতাই পরিমাপ করে এবং অভ্যাসের ফলে উৎকর্ষের একটা ইঙ্গিত দেয়।

আবার অনেক কার্যসম্পাদনী অভীক্ষা—অভীক্ষাটির আকৃতি ও স্বরূপ

সম্বন্ধে চিন্তা করতে বা স্থান সম্বন্ধে চিন্তা করতে প্রবৃত্ত করেন। অর্থাৎ এক কথায় এই জাতীয় অভীক্ষা একটা সাধারণ ক্ষমতা পরিমাপ করার ক্ষমতা রাখে।

যৌথ অভীক্ষা বা দলগত অভীক্ষা (Group Tests): দলগত অভীক্ষার কথা এই অধ্যায়েই বলা হয়েছে। এখন বাচনিক ও অবাচনিক —এই উভয় শ্রেণীর দলগত অভীক্ষার কিছু উদাহরণ দেওয়া হ'ল। প্রথমে বাচনিক যৌথ অভীক্ষার উদাহরণ দেওয়া যাক্—

লর্জ থর্ণডাইক বুদ্ধির অভীক্ষা (Lorge Thorndike Intelligence Tests Level 3)

১। **বাক্য সম্পূর্ণ করণ (Sentence Completion):**

There's no Book so—●—but something good may be found in it.

A. good B. true. C. beautiful. D. bad E. excellent.

A, B, C, D এবং E-র মধ্যে যেটি সঙ্গত, সেটি শূন্যস্থানে বসাতে হবে।

২। **বাচনিক শ্রেণী বিন্যাস (Verbal Classification):**

Cotton Wool Silk

A- Dress; B- Sew; C- Fibre; D- Linen; E- Cloth, উপরের শ্রেণীভুক্ত হবে এমন একটি শব্দ A B. C. D এবং E হ'তে নির্বাচন করতে হবে।

৩। **গাণিতিক যুক্তি (Arithmetic Reasoning):**

A man has to take a 300-mile trip by car. If he goes 4 -miles each hour, how many miles does he still have to travel after driving 5½ hours?

A. 180 mi. B- 100 mi, C- 60 mi, D-2 mi E none of these.

৪। **ভাষাজ্ঞান (Vocabulary):**

Javelin—A-bleach. B-coffee. C- jacket. D- rifle, E-spear.

বামদিকের শব্দের সমার্থক বা প্রায় সমার্থক শব্দ A, B, C, D, এবং E থেকে নির্বাচন করতে হবে।

টারম্যান-ম্যাকনেমার মানসিক ক্ষমতার অভীক্ষা (Terman Mc Nemar test of mental ability) :

Selective Service College Qualification Test (SSCQT); School and College Ability Test (SCAT) ইত্যাদি অভীক্ষা এই জাতীয় দলগত অভীক্ষা। এ ছাড়া আরো একটি অভীক্ষা হ'ল—Wesman Personnel Classification Test.

এবার অবাচনিক অভীক্ষার উদাহরণ দেওয়া যাক—

এ জাতীয় অভীক্ষা প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে ওটিস্, টারম্যান প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীর নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯.৮ থেকে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই জাতীয় বহু অভীক্ষা তৈরী হয়েছে। তার পরেও আরো অনেক নতুন অভীক্ষা তৈরী হয়েছে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—AGCT, Aviation Cadet Qualifying Examination, The Navy General Classification Test of World War II ইত্যাদি। এ ছাড়া আরো আছে—Pintner-Cunningham Primary Test, Lorge-Thorndike Intelligence Tests—Level-3, Nonverbal Battery; Otis Quick Scoring Mental Ability Tests; Kuhlmann-Anderon Intelligence Tests; California Tests of Mental Maturity ইত্যাদি।

এইবার কয়েকটি অভীক্ষার কয়েকটি করে উদাহরণ দেওয়া হইল।

Pintner-Cunningham Primary Test-এর উদাহরণ—

Test 2.

সবচেয়ে সুন্দর ঘর কোন্‌টি

Lorge Thorndike Intelligence Test (Non-Verbal)-এর উদাহরণ—

1. ছবির শ্রেণী বিন্যাস—

বামদিকের ছবি তিনটি কোন একটির দিক দিয়ে এক রকমের। ডানদিকের ছবি পাঁচটির মধ্যে কোন্‌টি সেই রকমের হতে পারে?

2 সংখ্যা সারি—

2 4 3 5 4→A 2 B 3 C.4 D 5 E 6

সারিতে 4-এর পর কোন্ সংখ্যাটি বসবে ?

3. ছবির মিল—

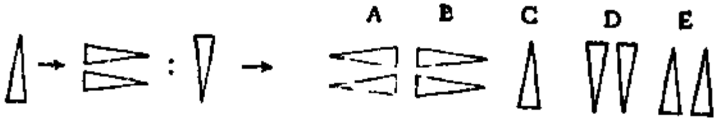

Terman Mc. Nemar Test of Mental Ability-এর উদাহরণ :

Test 1. Information

Sample : Our first president was—

1. Adams 2. Washington 3. Lincoln 4. Jefferson 5. Monroe.

Test 2. Synonyms

Sample : Correct means. 1. nest. 2. fair 3. right 4. poor 5. good.

Test 3. Logical Selection

Sample : A cat always has,

1. kittens. 2 spots. 3. milk. 4. mouse 5. hair. ইত্যাদি।

Sample Block Counting Items from the AGCT

How many blocks ?

2
4
3
1

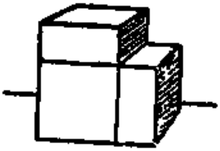

How many blocks ?

5
4
3
6

SCAT (Level I) থেকে উদাহরণ

Part 1. **Sentence understanding**

A knowledge of history is an antidote for sectionalliam

and narrow nationalism leading one instead to realize the eternal (   ) of peoples.

A. Differences. B. Struggle. C. Self-consciousness. D. Interdependence. E. Evolution.

Part 3. **Word Meanings :**

Pick the word or phrase whose meaning is closest to the word in capital letters.

R E T A L I A T E

A. buy and sell profitably. B. whisper insults, C. repay evil with evil. D. recheck items in a list. E. return damaged merchandise.

Wesman Personnonel Classification Test থেকে উদাহরণ

Example 3. ·········is to night as break fast is to···········

1. flow 2. gentle 3. supper 4. door

A. include. B morning, C. enjoy. D. corner.

Pintner Non-Language Test থেকে উদাহরণ

Figure drawing

বামদিকের ছবিটিতে কোন লাইনটি বা লাইনগুলি ব্যবহার করলে ডানদিকের ছবি দুটি পাওয়া যাবে ?

5. **Manikin.**

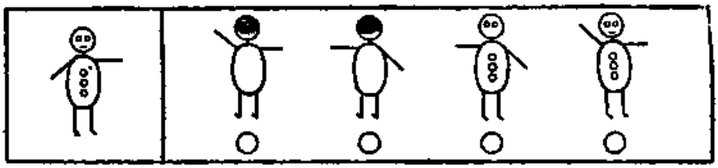

বামদিকের লোকটি যে ভাবে হাত দেখাচ্ছে, ডানদিকের কোন্ লোকটি ঠিক সেইভাবে হাত দেখাচ্ছে ?

S R A Non-verbal Test এর উদাহরণ

যে ছবিটি বাকীগুলি থেকে পৃথক, তার নীচের চৌকা ঘরটিতে x চিহ্ন দাও।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধি-পরিমাপ (**Measurement of Adult Intelligence**): পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপের প্রথম অভীক্ষা হ'ল Wechsler Bellevue Intelligence Scale (1939)। বর্তমানে এটি সংশোধিত, পরিবর্তিত হয়েছে এবং এই নতুন সংস্করণ ১৯৫৫ সালে Wechsler Adult Intelligence Scale নামে প্রকাশিত হয়। এই নতুন অভীক্ষাতে এগার রকমের বিভিন্ন প্রশ্ন আছে। এগুলির মধ্যে ছয় রকমের প্রশ্ন হ'ল ভাষামূলক এবং পাঁচ রকম হ'ল কার্যসম্পাদনী প্রস্তুতির। ভাষামূলক অভীক্ষার মধ্যে আছে—

১) জ্ঞানমূলক প্রশ্ন (Information): এই বিভাগে ২৯টি প্রশ্ন থাকে। প্রশ্নগুলি সাধারণতঃ সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক দিক থেকে সংগ্রহ করা হয়। এগুলি প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির জানা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং এগুলির উত্তর দিতে কোন শিক্ষাগত জ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

২) বোধশক্তি (Comprehension): এই বিভাগের প্রশ্নসংখ্যা ১৪টি। 'বিশেষ পরিস্থিতিতে কি করা উচিত'—এই জাতীয় প্রশ্ন থাকে এই বিভাগে।

৩) সাধারণ গণিত (Arithmetic): কাগজ কলম ব্যবহার না করেও করা যেতে পারে এমন ১৪টি সহজ অঙ্ক থাকে এই বিভাগে।

৪) সামঞ্জস্য নির্ণয় (Similarities): ১৩টি বিভিন্ন প্রশ্ন থাকে। কোন্ কোন্ দিক দিয়ে দু'টি জিনিস সমজাতীয় তা নির্ণয় করতে হয়।

৫) অঙ্ক বা সংখ্যাসারি (Digit span): মুখে মুখে ৩ থেকে ৯ অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা পুনরাবৃত্তি করতে হয়। আবার ২ থেকে ৮ অঙ্ক-বিশিষ্ট সংখ্যা উল্টো দিক থেকে পুনরাবৃত্তি করতে হয়।

৬) ভাষাজ্ঞান (Vocabulary): ৪০টি শব্দ থাকে। ক্রমশঃ সহজ থেকে কঠিন শব্দ। অভীক্ষার্থীকে এগুলির অর্থ বলতে বলা হয়।

ভাষাবিহীন বা কার্যসম্পাদনী অভীক্ষার মধ্যে থাকে—

৭) অঙ্ক প্রতীক (Digit symbol): এই অভীক্ষাতে প্রতি অঙ্কের জন্য এক একটি প্রতীক থাকে। প্রতীক দেখে অঙ্কটি বলতে হয়। এরূপ ৯টি প্রতীক আছে ৯টি অঙ্কের জন্য।

৮) ছবি সম্পূর্ণকরণ (Picture completion): ২১টি কার্ডে ছবি আঁকা থাকে যার কোন একটি অংশ লুপ্ত থাকে। অভীক্ষার্থীকে লুপ্ত অংশটি খুঁজে বের করতে হয়।

৯) ব্লক ডিজাইন (Block design): সাদা, লাল এবং সাদাতে—লালে রং করা কয়েকটি কিউব দেওয়া থাকে। প্রদত্ত নক্সা (design) অনুযায়ী কিউবগুলি সাজিয়ে নক্সাটি প্রস্তুত করতে হয়।

১০) পর্যায়ক্রমে ছবি সাজানো (Picture arrangement): কতকগুলি কার্ডে বিভিন্ন ছবি আঁকা থাকে যেগুলি ঠিক পর্যায়ক্রমে সাজালে একটি গল্প বা অর্থযুক্ত কোন বিবৃতি হয়।

১১) বিভিন্ন বস্তুর সমন্বয় (Object assembly): এই অভীক্ষাটি Pintner-Paterson Manikin and Feature profile-এর অনুরূপ।

এ ছাড়াও বিশেষ বুদ্ধির অভীক্ষা, যথা প্রবণতা পরিমাপক অভীক্ষা, ক্ষিপ্রতা পরিমাপক অভীক্ষা এবং উপাদান-তত্ত্বমূলক বুদ্ধির অভীক্ষাও প্রচলিত আছে।

বুদ্ধির যৌথ এবং ব্যক্তিগত অভীক্ষার তুলনা (Group Vs Individual tests of Intelligence): বুদ্ধির ব্যক্তিক অভীক্ষা এবং যৌথ অভীক্ষা—উভয়েরই কিছু সুবিধা এবং অসুবিধা আছে। ব্যক্তিক অভীক্ষার চেয়ে যৌথ অভীক্ষার কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। প্রথমতঃ যৌথ অভীক্ষার প্রয়োগে অনেক সময় এবং পরিশ্রম বাঁচে। একটি ব্যক্তিক অভীক্ষা প্রয়োগ করতে কম করেও ২।৩ ঘণ্টা সময় লাগে। ফলে ব্যক্তিক অভীক্ষার সাহায্যে একটা ৪০ জন ছাত্রের বুদ্ধি পরিমাপ করতে অনেক সময় লেগে যাবে। কিন্তু যৌথ অভীক্ষার সাহায্যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাদের সকলের বুদ্ধি পরিমাপ করা সম্ভব হয়।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিক অভীক্ষা প্রয়োগের সময় যথেষ্ট শিক্ষণপ্রাপ্ত অভীক্ষক না হলে অভীক্ষাটি ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যৌথ অভীক্ষার নির্দেশ দান সহজ ও সুনির্দিষ্ট। এগুলি প্রয়োগ করার সময় অভিজ্ঞ বা বিশেষ রূপে শিক্ষণপ্রাপ্ত অভীক্ষকের প্রয়োজন হয় না।

যদিও যৌথ অভীক্ষাতে বিধিমত ও নৈর্ব্যক্তিক ভাবে নম্বর দান করা সম্ভব, নির্ভরশীলতার দিক দিয়ে কিন্তু ব্যক্তিক অভীক্ষার দাবী বেশী। অভীক্ষা প্রয়োগের সময় অভীক্ষার্থী তার পরিবেশের সঙ্গে কতখানি সঙ্গতি সাধন করেছে তার উপর অভীক্ষাটির সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। যৌথ অভীক্ষাতে অভীক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকে অবহেলা করা হয়। কিন্তু ব্যক্তিক অভীক্ষায় অভীক্ষক অভীক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকেন বলে তার মানসিক ও প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়াগুলির সুবিচার করা সম্ভব হয়।

যৌথ অভীক্ষার প্রশ্নগুলি সাধারণতঃ ব্যক্তিক অভীক্ষার চেয়ে সহজ। ব্যক্তিক অভীক্ষাতে অভীক্ষার্থী সহজেই ক্লান্ত হয়ে যায়, কিন্তু যৌথ অভীক্ষাতে তা হয় না। ব্যক্তিক অভীক্ষাতে খরচ অত্যন্ত বেশী, কিন্তু যৌথ-অভীক্ষাতে খরচ খুবই অল্প। ব্যক্তিক অভীক্ষাতে ভাষা, জ্ঞান, ব্যবহারমূলক দিক ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তার একটা প্রভাব থেকে যায় শিক্ষার্থীর ফলাফলের উপর। কিন্তু যৌথ অভীক্ষাতে এ সমস্ত অসুবিধা থাকে না। ব্যক্তিক অভীক্ষাতে অভীক্ষক একেবারে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকেন বলে অভীক্ষার্থী সংকোচবোধ করতে পারে, কিন্তু যৌথ পরীক্ষাতে সে নিজেকে অনেকটা স্বাধীন বলে ভাবতে পারে। ব্যক্তিক অভীক্ষার জন্য প্রশ্ন তৈরী করা অত্যন্ত শক্ত, কিন্তু যৌথ অভীক্ষার প্রশ্ন তৈরী করা অত শক্ত নয়। অভীক্ষার ফলাফলের দিক দিয়ে বিচার করলে কিন্তু যৌথ অভীক্ষার চেয়ে ব্যক্তিক অভীক্ষার সাফল্যই বেশী। এ সম্বন্ধে Rorschach বলেছেন—

It is possible to apply these (Group) tests and get preliminary results at least in a short time, but we are warned that the only safe and short method is that of the individual tests.

বুদ্ধ্যঙ্কের শ্রেণীবিন্যাস (Classification of the I. Q)

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী টারম্যান অসংখ্য শিশুর পরীক্ষণের পর নিম্নরূপ বুদ্ধ্যঙ্ক বিস্তৃতির একটা হিসেব দিয়েছেন।

—: বুদ্ধ্যঙ্ক :—	—: শ্রেণী :—	—: শতকরা হার :—
১৪০ এবং উপরে	অতিমানব	১
১২০ থেকে ১৪০	অতি প্রতিভাবান	৬
১১০ থেকে ১২০	প্রতিভাবান	১৩
৯০ — ১১০	স্বাভাবিক বুদ্ধিমান	৬০
৮০ — ৯০	স্বল্পবুদ্ধি	১৩
৭০ — ৮০	(Border-line)	৬
৭০ এর নীচে	ক্ষীণবুদ্ধি	১
৫০—৭০	মোরোন	·৭৫
২০—৫০	ইম্‌বেসাইল	·১৯
২০ এর নীচে	ইডিয়ট।	·০৬

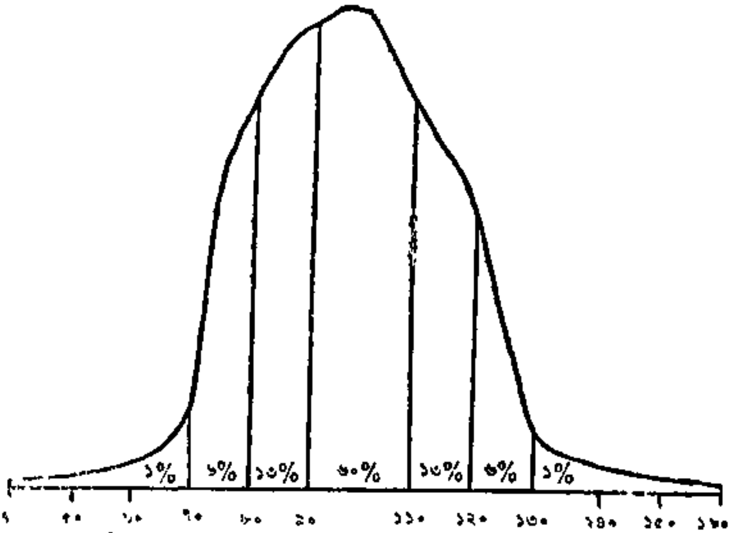

বুদ্ধির বৃদ্ধি (Growth of Intelliigence)

বয়সের সঙ্গে বুদ্ধির উন্নতির একটা যোগসূত্র আছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও বাড়ে, কিন্তু সেটারও একটা সীমা আছে। দেখা গেছে ৫।৬ বছরের পর থেকে বুদ্ধি দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। কিন্তু এই বৃদ্ধি হয় ১৩।১৪ বৎসর পর্যন্ত। তারপর অধিকাংশেরই ১৬ বৎসরের পর বুদ্ধি প্রায় স্থির থাকে বা খুব সামান্যই বাড়ে। ১৬ বৎসর মানসিক পরিণতিই (M A) হচ্ছে সাধারণ সুস্থ মানুষের বুদ্ধির শেষ সীমা। অবশ্য এই শেষ সীমার ব্যাপারে যে মনোবিজ্ঞানীরা একমত নন, তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। বুদ্ধির বৃদ্ধির একটা রেখাচিত্র নীচে দেওয়া হ'ল—

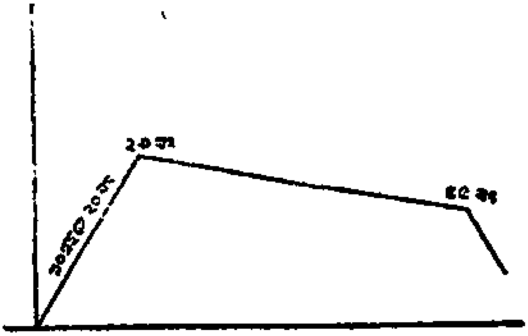

আমরা মোটামুটি ভাবে ধরে নিতে পারি যে ২০ থেকে ২৩ বৎসর বা তার

কাছাকাছি বয়সে বুদ্ধির বৃদ্ধি থেমে যায়। অনেক মনোবিজ্ঞানীর ধারণা প্রতিভাবানদের বুদ্ধির বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত বেশী এবং তাদের শেষ সীমাও বেশী। স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্নদের এই বৃদ্ধির হার কম এবং তাদের শেষ সীমাও কম।

অনেকে আবার বুদ্ধির হু'রকমের বৃদ্ধির কথা বলেছেন—উচ্চতা এবং বিস্তারে বৃদ্ধি। বুদ্ধির গুণগত পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব না হ'লেও পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটানো নিশ্চয়ই সম্ভব। এই বৃদ্ধিকেই Sandiford বলেছেন Horizontal growth। যে ছেলের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০, অনেক চেষ্টা করলেও তার বুদ্ধ্যঙ্ক হয়তো ১১০ বা ১২০ করা সম্ভব নয়, তবে তার বুদ্ধির বিস্তার নিশ্চয় বাড়ানো যাবে। অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার উচ্চতা ও বিস্তার এই হুটি কথার বদলে বুদ্ধির পরিপক্কতা (maturation) কথাটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী।

বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা (Constancy of the I Q.)

সাধারণতঃ বুদ্ধ্যঙ্ককে অপরিবর্তনীয় বলে ধরা হয়। অর্থাৎ যে ছেলে শৈশবে বোকা, সে পরবর্তী জীবনে বোকা থাকবে। আর যে প্রথম থেকেই বুদ্ধিমান সে পরবর্তী জীবনেও বুদ্ধিমানই থাকবে। বুদ্ধির বৃদ্ধির হার সকলের ক্ষেত্রে সমান নয়। বুদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ করলে একটি ছেলের বিভিন্ন বয়সে বুদ্ধির মানও বিভিন্ন হবে। কিন্তু তার মানসিক বয়সও সময়গত বয়সের অনুপাত একই থাকবে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বুদ্ধ্যঙ্কের মধ্যে পরিবর্তনও দেখা গেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বুদ্ধ্যঙ্ক বেড়েছে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা কমে গেছে। যার বুদ্ধ্যঙ্ক ছিল ৯৫ তার বুদ্ধ্যঙ্ক যদি পরিবর্তিত হয়ে ৯২ বা ৯৮ হয়ে যায়, তবে সে পরিবর্তন লক্ষণীয় নয়। স্ট্যানফোর্ড-বিনে স্কেলটি এক বছর পরে পুনঃ প্রয়োগ করলে বুদ্ধ্যঙ্ক ৫ থেকে ১০ পয়েন্ট পর্যন্ত কমবেশী হ'তে পারে। মূল বুদ্ধ্যঙ্ক (Original I. Q) থেকে ৫ কমবেশী হবার সম্ভাবনা—৫০% এবং ১০ কমবেশী হবার সম্ভাবনা ২৫% মাত্র। কম সময়ের ব্যবধানে অভীক্ষা পুনঃ প্রয়োগ করলে পরিবর্তন কম হয়, সময় বেশী হলে পরিবর্তনও বেশী হয়। অভীক্ষাটি যখন প্রথম প্রয়োগ করা হয় তখন যদি শিক্ষার্থীর সময়গত বয়স বেশী হয় তা হ'লে পরে বুদ্ধ্যঙ্কের পরিবর্তন কম হয়।

এই পরিবর্তনের কারণ বিভিন্ন হতে পারে। যেমন—

(১) শারীরিক কারণ, (২) পারিবেশিক পরিবর্তন, (৩) প্রক্ষোভের মাত্রা, (৪) পরীক্ষকের প্রভাব (৫) অভীক্ষাটি প্রয়োগের শর্তাবলী (Testing conditions) এবং (৬) অভীক্ষাটির পরিমাপের ভ্রান্তি।

বুদ্ধির অভীক্ষার উপকারিতা (Uses of Intelligence Tests)

বুদ্ধির অভীক্ষা বর্তমান যুগে বিভিন্ন ভাবে আমাদের কাজে লাগে। তবে এই অভীক্ষাটি ঠিকমত প্রয়োগ করা চাই এবং ফলের যথাযথ মূল্যায়ন করা দরকার। যেমন তেমন করে প্রয়োগ করলে বুদ্ধির অভীক্ষাতে সুফল থেকে কুফল পাবার সম্ভাবনাই বেশী।

যাই হোক্ বুদ্ধির অভীক্ষার কয়েকটি উপকারিতার কথা নীচে আলোচনা করা হ'ল—

[এক] **মানসিক বিকৃতি নির্ণয়** (Diagnosis of mental dificiency)

যে সমস্ত লোকের মানসিক বিকৃতি থাকে তাদের বুদ্ধাঙ্ক সাধারণ লোকের বুদ্ধাঙ্কের চেয়ে অনেকটা কম হয়। তাছাড়া বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে যেমন মোট বুদ্ধিব পরিমাণ পরিমাপ করা যায় তেমনি নানারকম কাজে দক্ষতাও মাপ করা যায়। কাজেই যাদের মানসিক বিকৃতি আছে, তাদের কোন্ কোন্ দিকে বিশেষ রকমের অক্ষমতা আছে তাও জানা যায়। তাদের চিকিৎসার জন্য এটা জানা একান্ত প্রয়োজনীয়।

[দুই] **ছাত্রদের শ্রেণী বিভাগ** (The grading of puplis)

ছাত্র-ছাত্রীদের সকলের বুদ্ধি একরকম নয়। বিভিন্ন বুদ্ধি-বিশিষ্ট শিক্ষার্থীকে শ্রেণীকক্ষে এক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা খুবই ক্ষতিকর এবং অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীকে মোটামুটি তিন দলে ভাগ করা যায়—ভালো, মন্দ এবং মাঝারি (bright, medium and dull)। বুদ্ধি অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণীবিভাগ করলে সমমেধা বা সমক্ষমতাবিশিষ্ট এক একটি দল পাওয়া সম্ভব। বিভিন্ন দলের জন্য শিক্ষার বিষয়বস্তু পদ্ধতি ইত্যাদি বিভিন্ন হ'লে সুফল পাওয়া যায়।

[তিন] **শিশু পরিচালনা** (Child guidance): শিশুকে ঠিকমত পরিচালনা করতে গেলে তার বুদ্ধির সঠিক মাপটাও জানা প্রয়োজন। বুদ্ধির স্বল্পতা বা অসাধারণ বুদ্ধি উভয়ই অন্যায় ব্যবহার বা সমস্যামূলক ব্যবহারের কারণ হতে পারে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে তার প্রতিকূল পরিবেশ এবং কোন সংঘাতও এর কারণ হতে পারে। যাই হোক সব ক্ষেত্রেই মূল কারণটি জানা থাকলে ত্রুটি সংশোধনের সম্ভাবনা থাকে এবং বুদ্ধির মাপ এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করে।

[চার] **ভবিষ্যত জীবিকা নির্বাচনে সহায়তা** (Vocational guidance) : বৃত্তিমূলক পরিচালনায় ক্ষেত্রেও' বুদ্ধির অভীক্ষার ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সব কাজেই বুদ্ধি চাই তবে সব কাজে সমান বুদ্ধিও দরকার নেই। আবার সব কাজেও একই রকম বুদ্ধির প্রয়োজন নেই। এমন অনেক বৃত্তি আছে যেগুলির সাফল্য বুদ্ধির উচ্চমানের উপর নির্ভরশীল। বৃত্তিমূলক পরিচালনার মূল কথা হ'ল Fitting the job to the man and fitting man to the job। বিশেষ কোন ব্যক্তির কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত সে সম্বন্ধে মূল্যবান এবং কার্যকরী নির্দেশ দিতে হ'লে বুদ্ধি অভীক্ষার সাহায্য নিতেই হবে। অবশ্য একমাত্র বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যেই ঠিক নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয় ; অভীক্ষার্থীর আগ্রহ, মনোপ্রকৃতি ইত্যাদির স্বরূপও জানা প্রয়োজন।

এ ছাড়াও বুদ্ধির অভীক্ষার আরো কতকগুলি প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়। যেমন—

(ক) ছাত্র-ভর্তি করার ব্যাপারে সহায়তা।
(খ) শিশুকে ব্যক্তিগত ভাবে জানা।
(গ) শিক্ষার্থীর অসুবিধার কারণ নির্ণয়।
(ঘ) উচ্চ শিক্ষার জন্য নির্বাচন।
(ঙ) দায়িত্বপূর্ণ চাকুরীতে লোক নির্বাচন।
(চ) অভিভাবককে খবর দান।
(ছ) শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক বিচার করা।
(জ) Child Guidance Clinic-এ নির্দেশ দান।

বুদ্ধ্যঙ্কের মাত্রা হিসেবে শ্রেণীবিভাগ (Classification according to the degree of I.Q) : সাধারণতঃ সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন যারা, তাদের I.Q. I ধরা হয় 100 থেকে বেশী, তাদেরকে ধরে নেওয়া হয় সাধারণের চেয়ে বুদ্ধিমান, আর যাদের I. Q 100 থেকে কম, তাদেরকে ধরে নেওয়া হয় সাধারণের চেয়ে কম বুদ্ধিমান বলে। আমরা বুদ্ধ্যঙ্কের শ্রেণীবিন্যাসে দেখেছি শতকরা 60 জনের বুদ্ধি মাঝারী প্রকৃতির, শতকরা 20 জন সাধারণের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান এবং শতকরা 20 জন সাধারণের চেয়ে কম বুদ্ধিমান। উপরের দিকের শতকরা 20 জনকে বলা হয় উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন (Gifted) এবং নীচের দিকে শতকরা 20 জনকে বলে ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন (Feeble minded)। এই ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্নদের আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন,

(১) **মোরণ** বা **স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন** (Moron): এদের সংখ্যা হ'ল শতকরা '75 জন, অর্থাৎ প্রতি 400 জনে 3 জন। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক হ'ল 50-70-এর মধ্যে। এদের মানসিক বয়স সাত থেকে বারো বছরের বেশী হয় না। এরা কোন রকমে দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে নিতে পারে, চেষ্টা করলে এরা কিছু লেখাপড়া করতে পারে। তবে নূতন অবস্থার সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান করতে বা জটিল সমস্যার সমাধান এরা করতে পারে না। যান্ত্রিক ভাবে কাজ করতে পারে বলে গৃহভৃত্যের কাজ এরা মোটামুটি চালিয়ে নেয়।

(২) **মন্দধী** বা **বোধহীন** (Imbeciles): এদের সংখ্যা হ'ল শতকরা 19 জন। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক হ'ল 20 থেকে 50-এর মধ্যে এবং মানসিক বয়স 3 থেকে 7 বছরের বেশী হয় না। এরা নিজেদের মনোভাব বা কথাবার্তা ভালো ভাবে প্রকাশ করতে পারে না। কোন কাজ দিলে এরা তা নিজে নিজে করতে পারে না। এদের আবেগের মাত্রার কোন স্থিরতা থাকে না। অনেক চেষ্টা করলে সহজ কোন কাজে এরা অভ্যস্ত হতে পারে। স্বাধীন ভাবে জীবিকা-অর্জন করা এদের ক্ষমতার বাইরে।

(৩) **জড়ধী** (Idiots): এদের সংখ্যা শতকরা '06 জন। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক হ'ল 20-এর নীচে আর মানসিক বয়স হ'ল 2 থেকে 3 বছরের মধ্যে। এরা ভালোভাবে কথাই বলতে পারে না, আর বোধ শক্তি একেবারে নেই বললেই হয়। এদের মধ্যে প্রায়ই কোন না কোন প্রকার শারীরিক ত্রুটি দেখা যায়। এরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে না ; ভালো মন্দ বিচার করতেও জানে না, এদেরকে সারাজীবন অপরের গলগ্রহ হয়ে থাকতে হয়। এদেরকে খাইয়ে দিতে হয়, স্নান করিয়ে দিতে হয়, পোশাক পরিয়ে দিতে হয় কারণ এরা নিজেরা কিছুই করতে পারে না। সাধারণতঃ অতি শৈশবেই এই জাতীয় শিশু মারা যায়।

ক্ষীণ বুদ্ধিদের শিক্ষা (Education of the feeble minded): এই সমস্ত ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুরা স্বাভাবিক শিশুদের মত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। এতদিন পর্যন্ত এদের শিক্ষার জন্য কোন পৃথক ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাধারা এদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এদের জন্য পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করেছে।

সাধারণতঃ এরা ভাষা বা বিষয় জ্ঞানে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে না। বিশেষ বিশেষ শিক্ষার দ্বারা এদের বিশেষ ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধন

করে কোন ফল হবে না, বরং এদেরকে কতকগুলি প্রয়োজনীয় আচরণে অভ্যস্ত করা উচিত। এর জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ের (Special Schools) প্রয়োজন। অবশ্য এতে অনেকে বলতে পারেন বিশেষ কোন বিদ্যালয়ে পৃথক ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে স্বাভাবিক ছেলেদের সঙ্গে এদের সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে না। এজন্য সাধারণ বিদ্যালয়েই এদের জন্য পৃথক ভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা উচিত।

ক্ষীণবুদ্ধির সঙ্গে অপরাধ প্রবণতার প্রত্যক্ষ না হ'লেও পরোক্ষ একটা সম্বন্ধ আছে। এরা পরনির্ভর ও বিচারবুদ্ধিহীন বলে সহজেই দুষ্কৃতকারী বা সমাজবিরোধীদের শিকার হয়ে এদের হাতের অস্ত্রে পরিণত হয়ে যায়। এই-জন্য এদের শিক্ষাব্যবস্থায় সামাজিক দিকটির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। কিণ্ডারগার্টেন ও মণ্টেস্বরী পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে ক্ষীণবুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুরা যথেষ্ট উপকৃত হয়। কতকগুলি কায়িক কাজ এদের পক্ষে খুব উপযোগী বলে এদের ছুতার মিস্ত্রীর কাজ, বাগান করা, পোলট্রী করা ইত্যাদি কাজ শেখান হয়। তবে জীবিকা অর্জনের জন্য শিক্ষা মোরণ ও মন্দধীদের দেওয়া চলতে পারে—জড়ধীদের নয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় অন্তঃ-ক্ষরা গ্রন্থির কম-বেশী হর্মোন নিঃসরণের জন্যও শিশুরা ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন হয়। সমস্ত ক্ষেত্রে ডাক্তারী চিকিৎসাতে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

কলকাতা বা তার কাছাকাছি এই জাতীয় শিশুদের শিক্ষার জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে। যেমন, শিল্পায়ন ভবন, বিদ্যাপীঠ, বোধায়ন ইত্যাদি।

উন্নত বুদ্ধিদের শিক্ষা (Education of the gifted Children) : যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক স্বাভাবিক বা সাধারণ শিশুদের চেয়ে বেশী আমরা তাদের উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু বলে থাকি। এদেরও কয়েকটি স্তর আছে এবং সেগুলি সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এখন তাদের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক—

যেহেতু এই সমস্ত শিশু সাধারণ শিশুদের চেয়ে বেশী বুদ্ধির অধিকারী, সেইজন্য এদের মানসিক ক্ষমতা, চাহিদা, উপলব্ধি করার ক্ষমতা মনে রাখার ক্ষমতা—এ সমস্তও বেশী। এদের যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা সাধারণ বিদ্যালয়ে করা যায় না। উন্নত মানের শিক্ষার জন্য এদের পৃথক ও বিশেষ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। আমাদের দেশে কতকগুলি Public School এখনও আছে। এগুলি ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের জন্যই প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল। কিন্তু এতেও অসুবিধা আছে। কারণ পৃথক স্কুলে বিশেষ ভাবে শিক্ষার সুযোগ পেয়ে এই সমস্ত শিশুর অহং বোধ অতিমাত্রায় জাগরিত হবে এবং তখন তারা সাধারণ শিশুদের ঘৃণার চোখে না হ'লেও অনুকম্পার চোখে দেখবে। এতে সামাজিক দূরত্বটা ক্রমশঃ বেড়েই যাবে। এরজন্য অনেকে সাধারণ বিদ্যালয়ের মধ্যেই এদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বলেছেন। কতকগুলি বিষয়ে এরা সাধারণ শিশুদের সঙ্গে এক সঙ্গেই শিখবে আর কতক-গুলির জন্য পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। তেমনি বিদ্যালয়ের অন্যান্য সহপাঠক্রমিক কাজে সকলে একসঙ্গে যোগদান করবে। তাছাড়া এই সমস্ত শিশুদের উন্নত ধরনের পাঠ্যপুস্তক, লাইব্রেরী প্রভৃতির ব্যবস্থা করে তাদের চিন্তাধারা ও মানসিক ক্ষমতার দিগন্ত বিস্তৃত করার সুযোগ দিতে হবে।

বুদ্ধি এবং বৃত্তি (Intelligence and Occupation) : প্রায় সকল মনোবিজ্ঞানীই এ বিষয়ে একমত যে, বুদ্ধির সঙ্গে বৃত্তির একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে। বৃত্তিমূলক নির্দেশনার মূল কথাই হ'ল—Fitting the man to the job and fitting the job to the man। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, সব লোকই সব বৃত্তির উপযোগী হয় না। যাদের বুদ্ধি খুবই কম তারা কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হলেও দিনে দিনে নিজেদের অক্ষমতাই প্রকাশ করে থাকেন। ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষে শাসন-সংক্রান্ত বা বিচার-বিভাগীয় কাজ করা সম্ভব নয়। আবার যারা জড়ধী তারা তো কোন কাজেরই উপযুক্ত নয়। যারা সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন স্বাভাবিক লোক তারা স্বাভাবিক বৃত্তিতে উপযুক্ত হবেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। যারা উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতিভাবান তারা যে সমস্ত বৃত্তিতে কল্পনাশক্তি বা মৌলিকতার প্রয়োজন সেই সমস্ত বৃত্তির উপযুক্ত। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, তিনি সমস্ত প্রকার বৃত্তির পক্ষে উপযুক্ত একজন প্রতিভাবান লোক হ'লেও শিক্ষা-কৃষি-বাণিজ্য-রাজনীতি আইন প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তির পক্ষে উপযুক্ত হবেন এমনটা আশা করা ভুল।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বুদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, বুদ্ধি ও বৃত্তির মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এর থেকে মনোবিদগণ এই সিদ্ধান্তেই আসতে পেরেছেন যে, কোন প্রকার বৃত্তিতে সাফল্য অর্জন করতে হ'লে সেই বৃত্তির জন্য প্রয়োজন এমন কিছুটা বুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তির বুদ্ধির মান যদি ঐ বৃত্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় বুদ্ধির সর্বনিম্ন মানের থেকে

নীচে হয়, তবে ঐ ব্যক্তি ঐ বৃত্তির পক্ষে উপযুক্ত নয় এ কথা বলা যেতে পারে। এই সর্ব নিম্ন মানটি মনোবিদ্‌গণ বিভিন্ন বৃত্তির পক্ষে বিভিন্ন বলে স্বীকার করেছেন।

বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী **উডওয়ার্থ** বিভিন্ন পক্ষে কি রকম মানসিক বয়সের প্রয়োজন তার একটা তালিকা দিয়েছিলেন। তার মতে নিম্নস্তরের সাধারণ কেরানীর পক্ষে নিম্নতম দশ বৎসর বয়সই যথেষ্ট। উচ্চস্তরের কেরানী, শিক্ষক, আইনজীবি প্রভৃতির মানসিক উৎকর্ষ অ.কর্ষ বিবেচনা না করেই তার সম্বন্ধে একটা উচ্চাশা পোষণ করেন। কিন্তু যদি বুদ্ধ্যঙ্ক কম হয় তবে সে হাজার চেষ্টা করেও মাতাপিতার প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারবে না। নিজের ক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচন করলে বৃত্তির সঙ্গে বুদ্ধিগত সামর্থ্যের একটা সঙ্গতি থাকে এবং সে ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের পথে বিশেষ কোন বাধা আসে না। তবে কেবলমাত্র বুদ্ধিই সাফল্যের একমাত্র কারণ নয়। অধ্যবসায়, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা ইত্যাদি আরো অনেক রকম গুণের প্রয়োজন। **বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে**, 'Genius is one percent inspiration and ninety nine percent perspiration.' আবার **রেক্স-নাইটের** মতে, "যে কোন প্রকার বৃত্তির জন্য কতটা বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করছে কেবলমাত্র সেই বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার উপরই নয়, কোন একটা বিশেষ সময়ে সেই বৃত্তিতে কতখানি প্রতিযোগিতা আছে তার উপরেও।

বিভিন্ন বৃত্তিতে বুদ্ধির পরিমাণ ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী উড্‌ওয়ার্থ বলেন "On the average, to be sure, professional men score the highest in intelligent test, book keepers and clerks rather high, mechanics fairly high unskilled labourers the lowest." (Woodworth—Psychology. pp. 129)

আবার এ ব্যাপারে **Rex and Knight**-এর বক্তব্য হ'ল: "In repsect of average intelligence, the professions were at the top and unskilled manual occupations at the bottom.

আমেরিকাতে **টারম্যান** এবং **মেরিল** বিভিন্ন পেশাতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সন্তানদের মধ্যে 3,757 জনকে বেছে নিয়ে তাদের বুদ্ধ্যঙ্কের গড় নির্ণয় করে

গড় বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় করেন। তাঁর তালিকাটি নিম্নরূপ—

(Garrelt—Expts. in Psychology, Pp. 256, table xxviii)

পিতার বৃত্তি	সন্তানের গড় বুদ্ধ্যঙ্ক
(১) পোশাকার (স্বাধীন ব্যবসায়ী, Professional)	116·2
(২) আধাপেশাদার বা পরিচালক (Semi-professional or Managerial)	111·9
(৩) কেরানী, দক্ষ ব্যবসায়ী, খুচরা ব্যবসাদার (Clerical, skilled trades, retail business)	107·5
(৪) অর্ধদক্ষ, সামান্য কেরানী ও ব্যবসায়ী (Semi-skilled minor, clerical and business)	105·0
(৫) যৎসামান্য দক্ষ ও অদক্ষ (Slightly skilled and unskilled)	97·2
(৬) গ্রাম্য মালিকানা (Rural owners)	95·2

বৃত্তি নির্বাচনের ব্যাপারে বংশধারা এবং পরিবেশ দুই-ই কিন্তু সমান প্রভাব বিস্তার করে থাকে। একটা বৃত্তিতে সাফল্যের কতখানি বুদ্ধিনির্ভর, কতখানি বংশধারার জন্য আর কতটাই বা পরিবেশের জন্য তা সঠিক ভাবে বলা সম্ভব নয়। যাই হোক বুদ্ধি বৃত্তির মধ্যে যে একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। কোন ব্যক্তি যখন একটা বৃত্তিতে নিযুক্ত হয়, তখন তার মধ্যে সেই বৃত্তির উপযোগী বুদ্ধি থাকলে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। কাজেই বৃত্তির জন্য ব্যক্তি সময় নির্বাচনের সময় দেখতে হবে ব্যক্তির মধ্যে সেই উপযোগী বুদ্ধি আছে কিনা। কোন্ ব্যক্তি কোন বৃত্তির উপযোগী তা জানতে হ'লে সাধারণ বুদ্ধি পরীক্ষা, বিশেষ বুদ্ধি পরীক্ষা, আগ্রহের পরিমাপ, প্রবণতার পরিমাপ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তির বিভিন্ন গুণের সন্ধান নিতে হবে। এইগুলির ভিত্তিতে ব্যক্তির বৃত্তি নির্ধারিত হবে। এর ফলে বৃত্তির উপর ব্যক্তি এবং ব্যক্তির উপযুক্ত বৃত্তির সঠিক সন্ধান পাওয়া যাবে।

॥ পাঁচ ॥

স্মরণ ও বিস্মরণ

(Memory and Forgetting)

[Memory is the ideal revival in which the objects of the past experience are re-instated as far as possible in the order and manner of their original occurrence—*Stout*

It is a complex process involving the establishment of disposition, their retention and recalling of experience that have left the disposition behind them—*Ross.*

আমরা যখন অতীতের কোন অভিজ্ঞতাকে বর্তমান চেতনার মধ্যে নিয়ে আসি, তখন তাকে স্মরণ করা বলে। যখন অতীতে দেখা কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা ভাবি, অতীতে শোনা কোন গানের সুর মনে করি কিংবা অতীতে শেখা কোন কবিতা মুখস্থ বলি, তখন আমরা স্মরণ করে থাকি। সাধারণতঃ স্মরণ করার বস্তুটিকে স্মৃতি বলে।

স্মৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা : স্মৃতি বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায় বা এর স্বরূপ কি তা স্থির করতে গিয়ে প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁরা স্মৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। কেউ বলেছিলেন স্মৃতি একটি মানসিক শক্তি, কেউ বললেন এটি একটি মানসিক প্রক্রিয়া, আবার কেউ কেউ বললেন স্মৃতি হ'ল আমাদের অতীত অভিজ্ঞতাগুলি জমা করে রাখার একটি ভাণ্ডার। এর সবগুলিই কাল্পনিক হ'লেও স্মৃতির শক্তিতত্ত্বটি প্রাচীনকালে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল।

এই মতবাদ অনুযায়ী মনোবিজ্ঞানীরা কল্পনা করতেন যে, মন হ'ল চিন্তা করা, কল্পনা করা, মনোযোগ দেওয়া, বিচার করা ইত্যাদি জাতীয় কতকগুলি বিশেষ সুনির্দিষ্ট শক্তির সমষ্টি মাত্র। চর্চা করলে এই শক্তিগুলি পুষ্ট হয় এবং চর্চার অভাবে এগুলি হীনবল হয়ে যায়। স্মৃতিও এই জাতীয় একটি মানসিক শক্তি। যাঁরা এই শক্তি মতবাদে বিশ্বাসী, সেই সমস্ত মনোবিজ্ঞানীকে শক্তিবাদী (Faculty Psychologists) বলা হোতো। কিন্তু বর্তমানে এই

শক্তি মতবাদটি পরিত্যক্ত হয়েছে। আধুনিক কালে যে সমস্ত মনোবিজ্ঞানী উপাদান বিশ্লেষণের (Factor Analysis) উপর জোর দিয়ে থাকেন, তাঁরাও অবশ্য শক্তিবাদীদের মত মনের কতকগুলি শক্তির কল্পনা করেছেন। আমরা আগেই দেখেছি (বুদ্ধির অধ্যায়ে) মনের সাতটি মৌলিক শক্তি VNMRP SW'র মধ্যে M বা স্মৃতিও একটি মৌলিক শক্তি। কিন্তু এই শক্তিগুলির সঙ্গে প্রাচীন শক্তিগুলির ভিত্তি হ'ল জল্পনা কল্পনা, কিন্তু আধুনিক শক্তিগুলির ভিত্তি হ'ল বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ। প্রাচীন শক্তিগুলিকে সুনির্দিষ্ট মানসিক শক্তি বলে ধরে নেওয়া হত এবং এগুলির কর্মপরিধি ছিল সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। কিন্তু আধুনিক শক্তিগুলিকে মনের এক ধরনের উপাদান বলে ধরে নেওয়া হয়েছে এবং এগুলির কর্ম-পরিধিও অত্যন্ত ব্যাপক বলে ধরা হয়েছে। এগুলি আমাদের বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার পিছনে কাজ ক'রে সেগুলি সুসম্পন্ন করতে সাহায্য করে।

স্মৃতির আধুনিক সংব্যাখ্যান : স্মৃতি হ'ল অতীত অভিজ্ঞতাকে ঠিকমত পুনরুদ্রেক করা। সেই হিসেবে স্মৃতি হ'ল একটি মানসিক প্রক্রিয়া। বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী উড্‌ওয়ার্থ স্মরণ করার কাজটিকে চারটি পৃথক পৃথক অথচ ধারাবাহিক প্রক্রিয়াতে বিশ্লেষণ করেছেন। সেগুলি হ'ল—

(১) **শিখন** (**Registration**) (২) **ধারণ বা সংরক্ষণ** (**Retention**) (৩) **উজ্জীবন বা পুনরুদ্রেক** (**Recall**) এবং (৪) **চেনা বা পরিজ্ঞান** (**Recognition**) [সংক্ষেপে **4R's**]

এখন প্রত্যেকটি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে—

[এক] **শিখন :** স্মৃতির প্রথম স্তরেই আসে শিখন। যখন আমরা কিছু দেখি বা শুনি, কিংবা আঘ্রাণ বা আস্বাদন করি অথবা স্পর্শ করি, তখন তার একটি প্রতিচ্ছবি বা Image পড়ে আমাদের মনে। পূর্বে শিখন না হ'লে তার প্রতিচ্ছবি পড়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কাজেই যা শেখা হয়নি, তা মনে রাখার কোন কথাই উঠতে পারে না। আমাদের প্রত্যক্ষণের প্রত্যেকটি জিনিসই আমাদের মস্তিষ্কে একটা ছাপ এঁকে দেয় যেটিকে বলা হয় **স্মরণ চিহ্ন** বা Memory Trace। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন এগুলি অনেকটা গ্রামোফোন রেকর্ডের মত। রেকর্ডের উপর অনেক দাগ আছে, কিন্তু সেই দাগে কান পাতলে কিছু শোনা যায় না। অথচ এই দাগগুলির উপর পিনের আঘাত লাগলেই তার থেকে গান বা শব্দ

শোনা যায়। আমাদের মস্তিষ্কের স্মরণ চিহ্নগুলিও উপযুক্ত উদ্দীপকের সংস্পর্শে এলে যে উত্তেজকের জন্য স্মরণচিহ্নটি অঙ্কিত হয়েছিল, সেই উত্তেজনাটিকে বা তার অভিজ্ঞতাটিকে আমাদের মনে পুনরায় সঞ্চারিত করে দেয়। আমাদের মস্তিষ্কে বিভিন্ন জাতীয় স্মরণচিহ্ন আছে (যেমন শোনার, দেখার, ঘ্রাণ নেওয়ার, স্পর্শ করার, আস্বাদন করার) বলে আমরা বিভিন্ন জাতীয় জিনিস মনে করতে পারি।

শিখন আবার অনেকগুলি উপাদানের উপর নির্ভরশীল। যেমন—শিখনের বিষয়বস্তু (Kind of material), বিভিন্ন জাতীয় ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার (Sense modality), শিক্ষার্থীর বয়স (Age of the learner), শিক্ষার্থীর লিঙ্গ (Sex of the learner), প্রেষণা (Motivation), শিখনে পরিতৃপ্তি ও অতৃপ্তি (Pleasantness and unpleasantness), শিখনের হার ও গতির সম্বন্ধে জ্ঞান (Knowledg of progress) ইত্যাদি।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, শিখন হ'ল স্মরণ প্রক্রিয়ার একটি পূর্ববর্তী শর্ত (antecedent condition)। শিখন হ'ল কোন একটি ঘটনাকে এমন ভাবে পর্যবেক্ষণ করা বা কোন একটি কাজ এমন ভাবে সম্পাদন করা, যাতে অব্যবহিত পরে সেটিকে মনে করা যেতে পারে। অনেকে এই অর্থে শিখনকে স্মরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ধরতে চান না। তাঁরা বলেন স্মরণ প্রক্রিয়া হ'ল শিখনের কষ্টি পাথর কারণ এটির সাহায্যেই শিখনের যাচাই হয়। শিখন আবার অনৈচ্ছিক ও ঐচ্ছিক দু'রকমেরই হতে পারে। যে ছেলের সংগীতের প্রতি সহজাত অনুরাগ বা আগ্রহ আছে, সে কোন একটি গান একবার শোনার পরই নিখুঁত ভাবে গাইতে পারে। এটা অনৈচ্ছিক শিখন। আবার যখন কোন নূতন জায়গায় বেড়াতে যাই কিংবা বাজারে যাই, তখন আমাদের অজ্ঞাতসারেই অনেকগুলি দোকানের নাম তাদের সাইনবোর্ড থেকে শেখা হয়ে যায়। এটাও কিন্তু অনৈচ্ছিক শিখন। কিন্তু ঐচ্ছিক শিখন হ'ল—যা আমরা চেষ্টা করে শিখি। একটি কবিতা মুখস্থ করতে হ'লে বার বার পড়তে হয়, চেষ্টা করতে হয়। তবেই তা স্মৃতিতে ধরে রাখা সম্ভব হয়। এই রকম ঐচ্ছিক শিখনের ক্ষেত্রেই আমরা স্মৃতির সংরক্ষণের কথা বলে থাকি।

[দুই] **ধারণ বা সংরক্ষণ ঃ** স্মৃতির দ্বিতীয় স্তর হ'ল ধারণ বা সংরক্ষণ। যা শিখলাম, সেটিকে মনের মধ্যে ধরে রাখাই হল সংরক্ষণ। শেখার বিষয়টি কিন্তু আমাদের মনের চেতনা স্তর থেকে অবচেতন স্তরে চলে আসে। অতীত

অভিজ্ঞতাগুলি প্রতিরূপের আকারে অবচেতন মনে সংরক্ষিত হয়। এই প্রতিরূপ যদি মনের মধ্যে সংরক্ষিত না হ'ত, তাহ'লে অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক সম্ভব হ'ত না। নদীর ধারে যখন বক এসে কাদার উপর বসে, তখন কাদার উপর তার পায়ের দাগ পড়ে। বকটি উড়ে গেলেও তার পায়ের দাগটি কাদার উপর থেকে যায়। উত্তেজকের সংস্পর্শে এলে মস্তিষ্কের উপরও স্মরণ চিহ্ন আঁকা হয়ে যায়। উত্তেজক চলে গেলেও স্মরণচিহ্নটি থেকে যায়। সকল মস্তিকের কিন্তু ধারণ-ক্ষমতা সমান নয়। মস্তিকের গঠন ও প্রকৃতির উপর ধারণ করার ক্ষমতাটি নির্ভর করে। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, কোন স্মরণচিহ্নই একবারে নষ্ট হয়ে যায় না।

শেখা বস্তুটি কি ভাবে মনের মধ্যে সংরক্ষিত হয়, সে সম্পর্কে দু'টি মতবাদ আছে। একটি হ'ল—**শারীরবৃত্তীয় মতবাদ** (Physiological Theory) আর অপরটি হ'ল—**মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ** (Psychological Theory)।

শারীরবৃত্তীয় মতবাদ : জেমস্, কার্পেন্টার, মিল প্রমুখ মনোবিদ এই মতবাদের প্রবক্তা। মিল ও কার্পেন্টারের মতে যখন আমরা কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি তখন মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি উদ্দীপিত হয় ও সেগুলি কম্পিত হতে থাকে। প্রত্যক্ষণ শেষ হলেও এই কম্পন মৃদুভাবে চলতেই থাকে।

এই কম্পনকে যত দ্রুত ও তীব্র করা যায়, তত অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতি স্পষ্ট হয়। জেমস্ বলেন, আমাদের অভিজ্ঞতাগুলি মস্তিকের কিছু পরিবর্তন ঘটায়। অভিজ্ঞতার এই সংরক্ষণ কিন্তু দৈহিক প্রক্রিয়া। জেমস্ এই অভিজ্ঞতার সংরক্ষণকে মস্তিষ্কে স্মৃতিরেখা অঙ্কিত হওয়া বলে ব্যাখ্যা করেছেন। মূলার বললেন, স্মৃতিছাপের (memory trace) কথা ; স্মৃতিরেখা ও স্মৃতিছাপ সমজাতীয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্মৃতিরেখা ও স্মৃতিছাপ পরীক্ষণ দ্বারা সমর্থিত হয়। আমরা বলতে পারি, মস্তিষ্কে যা সংরক্ষিত হয়, তা একটি বিশেষ সংগঠন (brain structure)। হোয়াগল্যাণ্ড এটিকে তারযন্ত্রের বার্তা গ্রহণের সঙ্গে তুলনা করেছেন অর্থাৎ এই সংগঠন বা তার পরিবর্তন পারমাণবিক প্রকৃতির।

মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ : এই মতবাদ স্মৃতিকে দৈহিক প্রক্রিয়া বলে মনে করে না, একটি মানসিক প্রক্রিয়া বলেই মনে করে। অতীত অভিজ্ঞতাগুলির প্রতিরূপ মনের অবচেতন স্তরে রক্ষিত হয়। অবচেতন মনের স্থায়ী

পরিবর্তনটিই হ'ল প্রতিরূপ। কিন্তু মনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের সংগঠনের কিছুটা পরিবর্তন হবেই। প্রতিরূপগুলির অবচেতন স্তর থেকে চেতনের স্তরে আত্মপ্রকাশ করাকেই অভিজ্ঞতার স্মরণ বলা হয়। আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু বা প্রতিরূপগুলিকে ছাপজট (engram complex) বলা হয়। ছাপজটগুলি প্রথমে অসংযত ও বিশৃঙ্খল থাকে। সেগুলিকে ঠিকমত সাজানোই হ'ল মনের কাজ। এই ঠিকমত সাজানোটি হয় সংরক্ষণ স্তরেই।

সংরক্ষণ যে হয়, তার প্রমাণ কি? শেখা বিষয়ের পুনরুদ্রেকই সংরক্ষণের সবচেয়ে ভালো প্রমাণ। কিন্তু পুনরুদ্রেক করতে না পারলে সংরক্ষণর হয়নি, একথা জোর করে বলা চলে না। চিনতে পারা বা পরিজ্ঞানও সংরক্ষণের প্রমাণ। যে বিষয়টি একবার সংরক্ষিত হয়, তার ক্ষেত্রে যদি ভুলে গিয়ে পুনরায় শিখতে হয়, তবে নতুন শিখতে যে সময় লাগে, তার চেয়ে সময় কম লাগবে।

সংরক্ষণ আবার কতকগুলি উপাদানের উপর নির্ভর করে। প্রধান প্রধান উপাদানগুলি হ'ল: সুস্থ দেহ ও সজীব মস্তিষ্ক, সতেজ মন, আগ্রহ, চিন্তন, উদ্দীপকের তীব্রতা, সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট উদ্দীপক, উদ্দীপকের স্থায়িত্ব, উদ্দীপকের পুনবাবৃত্তি, উদ্দীপকের সাম্প্রতিকতা, মনোযোগ, বিষয়বস্তুর উপলব্ধি, সংরক্ষণের ইচ্ছা ইত্যাদি।

[তিন] **মনে করা বা উজ্জীবন:** আমরা অতীতে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। সেগুলির প্রতিরূপ মনের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এই প্রতিরূপগুলিকে ব্যক্ত করার মানসিক-ক্রিয়াকে মনে করা বা উজ্জীবন বলে। পূর্ব অভিজ্ঞতাকে জাগিয়ে তোলা বা মনে করাকে পুনরুদ্রেক বলে। আমাদের অভিজ্ঞতা তো অনেক। কিন্তু বর্তমানে যখন কিছু স্মরণ করা হয়, তখন অতীত অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে মাত্র একটিকেই মনে করা হয়। কোন একটি উপযুক্ত উদ্দীপকের সংস্পর্শে এসে যখন একটি স্মরণচিহ্ন উজ্জীবিত হয়, তখন তার মধ্যে চিহ্নিত অভিজ্ঞতাটি আবার আমাদের চেতনার আয়নাতে ফুটে ওঠে।

মস্তিষ্কের স্মরণ চিহ্নগুলি উদ্দীপিত হয় কি ভাবে? আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুগুলি বিচ্ছিন্ন নয়। আমরা একটির সঙ্গে আর একটিকে

যুক্ত করে নিই। সেইজন্যই একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়লে তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য অভিজ্ঞতাগুলির কথাও মনে পড়ে যায়। যে সমস্ত নিয়মে অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়, সেগুলিকে প্রধানতঃ দু'ভাবে ভাগ করা হয়—**প্রধান ও অপ্রধান** নিয়মাবলী।

॥ প্রধান নিয়মাবলী ॥

[এক] **সান্নিধ্য স্থান ও সময়** (**Law of Contiguity**)**:** আমরা যখন দু'টি বস্তুকে পাশাপাশি দেখি, কিংবা দু'টি ঘটনাকে একসঙ্গে অথবা পর পর ঘটতে দেখি, তখন আমাদের মনের মধ্যে সেই দু'টি বস্তু বা ঘটনার সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়। ফলে ভবিষ্যতে একটি বস্তু বা ঘটনার কথা মনে পড়লে অন্য বস্তু বা ঘটনাটির কথা মনে পড়ে যায়। এই কারণেই চেয়ারের কথা মনে পড়লে টেবিলের কথা, কালি বললেই কলম, বিদ্যুৎ বললে বজ্র, রোগী বললে ডাক্তার, শান্তিনিকেতন বললেই রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে।

[দুই] **সাদৃশ্য** (**Similarity**)**:** অভিজ্ঞতাগুলি যদি একই ধরনের হয়, তবে সেগুলির মধ্যে একটি সংযোগ বা সমন্বয় সাধিত হয়। আম বললেই জামের কথা মনে পড়ে, গোলাপ বললে জুঁই আর গরু বললেই ঘোড়ার কথা মনে আসে।

[তিন] **বৈপরীত্য** (**Contrast**)**:** দুটি অভিজ্ঞতা যদি সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী হয়, তবে সেগুলির মধ্যেও একটি সংযোগ সাধিত হয়। সুখের দিনেই দুঃখের দিনের কথা বেশি করে মনে পড়ে, গরমকালে শীতকালকে মনে পড়ে, কালো জিনিস সাদা জিনিসকে মনে করিয়ে দেয়।

[চার] **আগ্রহ ও মনোযোগ** (**Interest and Attention**)**:** একই উদ্দেশ্য নিয়ে যখন আমরা কতকগুলি বিষয় বা বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকি, তখন অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে একটা সমন্বয় সাধিত হয়। আমাদের যে যে বিষয়ে আগ্রহ আছে, আমরা সেই সেই বিষয়ের প্রতিই মনোযোগ দিয়ে থাকি। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, ধরা যাক একজন শিক্ষাবিদ, একজন ভূতাত্ত্বিক ও একজন মৎস্য-ব্যবসায়ী ডায়মণ্ডহারবার বেড়াতে এলেন। শিক্ষা-বিদ্ লক্ষ্য করবেন—সেখানে স্কুল কটি, ছাত্রসংখ্যা কত ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি। ভূতাত্ত্বিক লক্ষ্য করবেন সেখানের মাটির প্রকৃতি, নদী, খাল, বিল ইত্যাদি।

মৎস্য-ব্যবসায়ী লক্ষ্য করবেন, মাছের আড়তগুলো, তার বেচা-কেনা, মাছ ভর্তি নৌকা ইত্যাদি। এই তিনজন তাঁদের আগ্রহ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন, এবং যে যে বিষয়ে তাঁরা মনোযোগ দিয়েছিলেন, সেই সেই বিষয়ের কথা নিখুঁত ভাবে তাদের মনে পড়বে।

। অপ্রধান নিয়মাবলী।

[এক] **প্রাথমিকতা (Primacy)**: একটি অভিজ্ঞতার সঙ্গে সর্বপ্রথম যে অভিজ্ঞতাটির সংযোগ সাধিত হয়, সেই সংযোগ সহজে বিচ্ছিন্ন হয় না। স্কুল বা কলেজের প্রথম দিনটির কথা আমরা সহজে ভুলি না। আবার প্রথম শেখা কোন শব্দ বা অর্থও আমরা সহজে ভুলি না।

[দুই] **সাম্প্রতিকতা (Recency)**: যে অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে সাম্প্রতিক কালে সমন্বয় সাধিত হয়েছে, সেগুলি যত সহজে মনে করা যায়, বহুপূর্বে সমন্বিত অভিজ্ঞতাগুলি তত সহজে মনে করা যায় না। মাঝে মাঝে চর্চা করার এইজন্যই দরকার। যে ছাত্র সম্প্রতি 'গীতাঞ্জলি' পড়েছে, রবি ঠাকুরের নাম বললেই সে 'গীতাঞ্জলির' কথা আগে মনে করবে।

[তিন] **পৌনঃপুনিকতা (Frequency)**: দু'টি অভিজ্ঞতা যখন বার বার একসঙ্গে ঘটে থাকে, তখন তাদের মধ্যে সংযোগ দৃঢ় হয়। কোন জিনিস ভালোভাবে মনে রাখতে হলে বার বার পড়তে হয়। ধোঁয়া আর আগুন বার বার দেখা হয় বলে ধোঁয়া দেখলেই আগুনের কথা মনে পড়ে। সাম্প্রদায়িকতা ও পৌনঃপুনিকতা কিন্তু এক নয়। সাম্প্রতিকতা সাম্প্রতিক বা অধুনা সমন্বয়ের কথা বুঝিয়ে থাকে।

[চার] **তীব্রতা (Vividness)**: দু'টি অভীজ্ঞতার মধ্যে সংযোগ যত তীব্র হবে, ততই একটির কথা মনে পড়লে আর একটির কথা মনে পড়ার সম্ভাবনা বেশী থাকবে। যিনি ট্রেনে বা বাসে প্রচণ্ড রকমের কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে বাসের বা ট্রেনের কথা মনে পড়লেই দুর্ঘটনার কথা মনে পড়াটা খুবই স্বাভাবিক।

বাইরের কোন উদ্দীপক কিংবা দেহের ভিতরের কোন বিশেষ অবস্থার দ্বারা একটি নির্দিষ্ট স্মরণচিহ্ন উজ্জীবিত হতে পারে। আবার একটি স্মরণচিহ্ন উজ্জীবিত হলে স্বাভাবিক ভাবেই তার সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য কতকগুলি স্মরণচিহ্নও উজ্জীবিত হয়। অবশ্য কোন্ কোন্ স্মরণচিহ্ন উজ্জীবিত হবে তা নির্ভর করে সেই সময়কার মানসিক অবস্থা ও উদ্দেশ্যের উপর।

উজ্জীবনই হ'ল শিখন ও সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। তবে উজ্জীবনের অভাব একথা জোর করে বলতে পারে না যে শিখন ও সংরক্ষণ হয়নি। যে বিষয়টি ভুলে গেছি, সেটি আবার শিখতে গিয়ে (re-learning) দেখা যায় আগের তুলনায় সময় অনেক বেঁচেছে। এর থেকে বলা যায়—যা কিছু শেখা যায়, তার কিছু কোন না কোন রকম ভাবে মনে সংরক্ষিত হয়।

Jost's Lawতেও বলা হয়েছে :—Of two impressions of equal strength in the brain, the older of the two will gain more by the same amount of further exercise.

উজ্জীবন অনেকগুলি শর্তের উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে কতকগুলি শর্তের নীচে উল্লেখ করা হ'ল—

উদ্দীপকের পরিপূর্ণতা, 'মানসিক প্রস্তুতি, মনে করার প্রয়াস, প্রক্ষোভ-জনিত প্রতিরোধ, ভালো লাগা-মন্দ লাগা, অভিভাবন ও অনুষঙ্গ, ঘটনা-প্রসঙ্গ, অনুরাগ ও আগ্রহ ইত্যাদি।

কত শৈশবের অভিজ্ঞতা আমরা মনে করতে পারি? বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে সাড়ে তিন বছর বয়সের আগের কোন অভিজ্ঞতা আমরা মনে করতে পারি না। আবার এও দেখা গেছে সুখজনক অভিজ্ঞতার চেয়ে দুঃখজনক অভিজ্ঞতাই বেশী মনে থাকে।

চেনা বা পরিজ্ঞান : স্মরণ প্রক্রিয়ার শেষ স্তর হ'ল পরিজ্ঞান। পরিজ্ঞান কথাটির আক্ষরিক অর্থ (Recognition) হ'ল—পুনরায় জানা (knowing again)। ধরা যাক, ২৪ পরগণা জেলার একটি স্বাস্থ্যকর জায়গার নাম আপনি স্মরণ করতে চেষ্টা করছেন। জায়গাটির নাম আপনি আগে পড়েছেন। নামটি সম্বন্ধে একটা ধারণাও আছে। ধারণাটি মনের মধ্যেই আছে। আপনি সেটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছেন। তার ফলে একটি নাম আপনার মনে পড়ল। নামটি হ'ল—ডায়মণ্ডহারবার। কিন্তু এই নামটিই যে আপনি চাইছেন, সে সম্বন্ধে যতক্ষণ না নিশ্চিত হচ্ছেন, ততক্ষণ স্মরণ করার কাজটি সম্পূর্ণ হচ্ছে না। আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে যে, এইটিই সেই

1. সময় সময় বাইরের কোন উদ্দীপক ছাড়াই কোন অভিজ্ঞতা উজ্জীবিত হতে পারে। একটা গানের কলি বা সুর বার বার মনে আসছে, এর জন্য চেষ্টা করতে হচ্ছে না। এ রকম ঘটনাকে বলা হয়—Perseveration. এক্ষেত্রে উদ্দীপক পরিপূর্ণ বা সম্পূর্ণ না হলেও উজ্জীবন হয়।

নাম যা আপনি স্মরণ করতে চেয়েছিলেন। এই রকম উপলব্ধির নামই হ'ল পরিজ্ঞান। আবার অনেক সময় এমন হয়, ঠিক নামটি আমরা স্মরণ করতে পারি না। কিন্তু কেউ যদি অনেকগুলি ভুল নামের সঙ্গে ঠিক নামটি আমাদের শোনায়, তাহ'লে আমরা ঠিক নামটি খুব সহজেই চিনতে পারি। উজ্জীবন বা মনে করার বিষয়বস্তু ব্যাপক, কিন্তু পরিজ্ঞান বা চেনার বিষয়বস্তু সংকীর্ণ। উজ্জীবনের বেলাতে ঠিক নামটি নিজেকে চেষ্টা করে মনে করতে হয়, কিন্তু পরিজ্ঞানের বেলাতে ঠিক নামটি নিজে চেষ্টা করে মনে করতে না পারলেও চলে। এইজন্য কেউ কেউ বলে থাকেন, মনে করার চেয়ে চেনা কাজটি অপেক্ষাকৃত সহজ। আমরা যখন পূর্বের শেখা কোন ঘটনা বা বিষয় মনে করার চেষ্টা করি—তখন মনে করা নাম দিই। এখানে একটি উদ্দীপক থাকে বটে কিন্তু তার সঙ্গে মনে করার বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ থাকে না। কিন্তু চেনার ক্ষেত্রে মনে করার বস্তুটিকে আরও কতকগুলি বস্তুর সঙ্গে ব্যক্তির সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং ঠিক বস্তুটিকে চিনতে বলা হয়। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্—

মনে করা ঃ শাজাহানের পিতার নাম কি ?

চেনা ঃ হুমায়ন, আকবর, জাহাঙ্গীর—এঁদের মধ্যে শাজাহানের পিতা কে ?

চেনার ভুল ঃ সময় সময় চেনার ক্ষেত্রে ভুল হয়ে থাকে। দু'রকম ভুল সচরাচর হয়ে থাকে। একটি হ'ল —পরিচিতকে চিনতে না পারা, আর অপরটি হল —অপরিচিতকে পরিচিত বলে চেনা। পরিচিত জিনিসের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটলে বা সেটিকে অন্য পরিস্থিতির মধ্যে দেখলে আমরা চিনতে ভুল করি। আবার অপরিচিত কোন জিনিসের সঙ্গে পরিচিত জিনিসের সাদৃশ্য থাকলে অপরিচিতকে পরিচিত বলে মনে হয়। সাদৃশ্যের মাত্রা যত বেশী হবে—চেনার ভুলও তত বেশী হবে।

উত্তম স্মরণ-শক্তি ঃ স্মৃতি কি, বা স্মরণ করা কাকে বলে তা নিয়ে আলোচনা করা হ'ল। স্মরণ করার ক্ষমতা সকলের সমান নয়। সাধারণতঃ স্মৃতি ও বিস্মৃতির হার অনুযায়ী সমস্ত লোককে চারভাগে ভাগ করা যায়—**চিরচিরা, চিরবেগা, বেগচিরা, বেগবেগা**। মনোবিজ্ঞানীরা উত্তম স্মরণ শক্তির কয়েকটি লক্ষণের কথা বলেছেন। সেগুলি হ'ল—(১) সহজে শেখা

যায়, (২) শেখাটা এমন হয় যে চর্চা না করলেও দীর্ঘদিন মনে থাকে, (৩) মনে করতে চেষ্টা করলে শেখা জিনিসটি তাড়াতাড়ি মনে পড়ে, (৪) শেখা জিনিসটি নির্ভুল ভাবে মনে পড়ে, (৫) যে সময়ে ঠিক যে কথাটি মনে পড়া দরকার, ঠিক সেই কথাটিই আপনা আপনি মনে পড়ে যায়, (৬) অপ্রয়োজনীয় জিনিস মনে পড়ে না এবং (৭) স্মরণ-শক্তির সদ্ব্যবহার করা হয়।

স্মৃতি এক, না, বহু? (**Is there a memory or memories?**): স্মৃতি এক না বহু, এ নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়ে গেছে। স্মৃতি কোন একটি বিশেষ শক্তি নয়। এটিকে বরং একটি বিশেষ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াটি যে সব জায়গাতে একই ভাবে কাজ করবে—তার কোন অর্থ নেই। সংরক্ষণ প্রক্রিয়াটি কখনও ভালো আবার কখনও মন্দ হয়। কেউ ইতিহাস ভালোভাবে মনে রাখতে পারেন, কেউ বা অঙ্ক। কারো নাম মনে থাকে ভালো, কেউ 'মুখ' মনে রাখতে পারেন ভালোভাবে। চোখে দেখা জিনিস কানে শোনা জিনিসের চেয়ে ভালো মনে থাকে। এই সমস্ত কারণে বলা হয়, স্মৃতি এক নয়, বহু। স্মৃতির এই যে বৈষম্য—এর কারণ অবশ্য এই নয় যে, স্মরণের প্রক্রিয়াটি মস্তিষ্কে কখনও কম আবার কখনও বেশী হয়। শিক্ষণীয় বিষয়টির প্রকৃতি ও শিক্ষাদানের পদ্ধতির জন্যই সংরক্ষণের মাত্রা কম-বেশী হয়ে থাকে।

স্মৃতির এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই মনোবিজ্ঞানীরা স্মৃতিকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করেছেন। এর মধ্যে কতকগুলির কথা নীচে উল্লেখ করা হ'ল—

[এক] **ব্যক্তিগত স্মৃতি** (**Personal memory**): যখন আমরা ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনার কথা মনে করি, তখন তাকে ব্যক্তিগত স্মৃতি বলে। স্কুল বা কলেজের প্রথম দিনের স্মৃতিটি এই পর্যায়ের।

[দুই] **অব্যক্তিগত স্মৃতি** (**Impersonal memory**): যখন স্মৃতির বিষয়বস্তুগুলির ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনার সঙ্গে কোন যোগাযোগ থাকে না তখন সেটিকে অব্যক্তিগত স্মৃতি বলে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া অন্যান্য প্রায় সকল অভিজ্ঞতার স্মৃতিই এই পর্যায়ের।

[তিন] **তাৎক্ষণিক স্মৃতি** (**Immediate memory**): শেখার অব্যবহিত পরেই সেটিকে মনে করা (বা মুখস্থ বলা) যদি সম্ভব হয়, তবে তাকে তাৎক্ষণিক স্মৃতি বলে। তবে এতে ভুল হবার সম্ভাবনাও বেশী থাকে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিক স্মৃতিও বাড়ে এবং প্রায় ২৫ বৎসর বয়সে এটি সবচেয়ে বেশী হয়।

[চার] **চিরস্থায়ী স্মৃতি (Permanent memory) :** শেখার অনেকদিন পরেও (এমন কি চর্চা না করেও) কোন জিনিস মনে করাকে চিরস্থায়ী স্মৃতি বলে। এই জাতীয় স্মৃতিতে শেখা জিনিসটি চিরদিনই মনে থাকে।

[পাঁচ] **সক্রিয় স্মৃতি (Active memory) :** যখন কোন পূর্বে শেখা জিনিস চেষ্টা করে মনে করতে হয়, তখন তাকে সক্রিয় স্মৃতি বলে। পরীক্ষার হলে প্রশ্নের উত্তর মনে করা এই জাতীয় স্মৃতি।

[ছয়] **নিষ্ক্রিয় স্মৃতি (Passive memory) :** যখন কোন চেষ্টা না করেই পূর্বের কোন অভিজ্ঞতা আমরা মনে করতে পারি, তখন তাকে নিষ্ক্রিয় স্মৃতি বলে। এতে অভিজ্ঞতাটি আপনা আপনি মনে পড়ে যায়। রসগোল্লা দেখলেই চেষ্টা না করেও এর মিষ্টতার কথা আমরা মনে করতে পারি ; বরফ দেখলেই তার শীতলতার কথা মনে করতে পারি।

[সাত] **যান্ত্রিক স্মৃতি (Rote memory) :** যখন আমরা কোন জিনিসের বা বিষয়ের অন্তর্নিহিত অর্থ বা সম্বন্ধ না বুঝেই সেটি মনে রাখি এবং সেইভাবে মনে করার চেষ্টা করি, তখন তাকে যান্ত্রিক স্মৃতি বলে। যে সমস্ত জিনিস বার বার পড়ে মুখস্থ করতে হয়, সেগুলি মনে করা এই পর্যায়ের স্মৃতি। টেলিফোন নম্বর, বাড়ীর নম্বর, নামতার তালিকা, অর্থহীন শব্দ তালিকা ইত্যাদি মনে করা এই জাতীয় স্মৃতির দৃষ্টান্ত।

[আট] **যুক্তিযুক্ত স্মৃতি (Logical memory) :** যান্ত্রিক স্মৃতির বিপরীত হ'ল যুক্তিযুক্ত স্মৃতি। যখন বিষয়টির অন্তর্নিহিত অর্থ ও সম্বন্ধ উপলব্ধি করে এবং বিচারশক্তির সাহায্যে সেটিকে যাচাই করে মনে রাখা হয় এবং পরে মনে করা হয়, তখন তাকে যুক্তিযুক্ত স্মৃতি বলে। এই জাতীয় স্মৃতিই সহজ ও চিরস্থায়ী। কোন গদ্যাংশ বা পদ্যাংশ সম্যকভাবে উপলব্ধি করে মনে রাখা এই জাতীয় স্মৃতির উদাহরণ।

[নয়] **ইন্দ্রিয়জাত স্মৃতি (Sense-impression memory) :** যখন আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করি ও সেগুলি মনে রাখি, তখন তাকে ইন্দ্রিয়জাত স্মৃতি বলে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা আমরা আহরণ করি, সেগুলির

স্মৃতিকে যথাক্রমে **চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, স্বাদজ ও স্পর্শজ** স্মৃতি বলে। কোন একটি দৃশ্য, একটি স্বর, একটি সুগন্ধ, একটি বিশেষ স্বাদ বা একটি বিশেষ স্পর্শ আমরা সহজেই মনে করতে পারি।

[দশ] **অভ্যাস স্মৃতি** (**Habit memory**): এটিকেও যান্ত্রিক স্মৃতি বলা যেতে পারে। বার বার পুনরাবৃত্তির ফলে বিশেষ চেষ্টা না করেও অনেক বিষয় মনে করা যায়। ছেলেদের নামতা-তালিকা বা বর্ণ পরিচয়, পুরোহিতদের মন্ত্রোচ্চারণ বা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা-বিশিষ্ট শিক্ষকদের পাঠদান এই পর্যায়ভুক্ত।

[এগার] **শারীরবৃত্তীয় স্মৃতি** (**Physiological memory**): যখন বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ কোন মনোযোগ না দিয়ে কোন কাজ করা সম্ভব হয়, তখন তাকে শারীরবৃত্তীয় স্মৃতি বলে। টাইপ্ করা, সাঁতার কাটা, সাইকেল চড়া এই জাতীয় স্মৃতির উদাহরণ। এগুলিকে সঞ্চালক স্মৃতিও (motor) বলা যেতে পারে।

[বার] **মনস্তাত্ত্বিক স্মৃতি** (**Psychological memory**): যখন কোন বিষয় বা ঘটনা খুব কম সময়ে নিয়মানুগ পদ্ধতিতে ঠিকমত মনে করা সম্ভব হয়, তখন তাকে মনস্তাত্ত্বিক স্মৃতি বলে। মনোবিদ্‌গণ এই জাতীয় স্মৃতিকেই প্রকৃত স্মৃতি বলে থাকেন।

বার্গসোঁর শ্রেণীবিভাগ : বিখ্যাত দার্শনিক বার্গসোঁর মতে স্মৃতি হ'ল দু'প্রকারের— (ক) **অভ্যাসমূলক স্মৃতি** (Habit memory) এবং (খ) **প্রতিরূপ স্মৃতি** (Image memory)। অভ্যাসমূলক স্মৃতি হ'ল কোন বিষয় বার বার চর্চা বা অনুশীলন করা ও নিছক মুখস্থ বলা। এটি সম্পূর্ণ দেহ-নির্ভর ও যান্ত্রিক। এই জাতীয় স্মৃতির মধ্যে বিশেষ কোন ইচ্ছামূলক প্রচেষ্টা থাকে না। অভ্যাসমূলক স্মৃতির সঙ্গে প্রতিরূপের কোন সম্পর্ক থাকে না। এটি সম্পূর্ণ দৈহিক প্রক্রিয়া। কিন্তু প্রতিরূপ স্মৃতি হ'ল—

মানসিক প্রক্রিয়া। অভ্যাসমূলক স্মৃতিতে স্মৃতির বিষয়বস্তুটি টুক্‌রো টুক্‌রো ভাবে মনে আসে, কিন্তু প্রতিরূপ স্মৃতিতে বিষয়বস্তুটির প্রতিরূপ একসঙ্গে তার মনে ভেসে উঠে। এই জাতীয় স্মৃতিতে কোন কিছুর উপর নির্ভর না করে স্বাধীনভাবে বিষয়বস্তুটিকে মনে করা সম্ভব। অভ্যাসমূলক স্মৃতি সম্পূর্ণ যান্ত্রিক বলে তা ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু প্রতিরূপ স্মৃতিতে অতীতের ঘটনা ঠিকমত মনে জাগিয়ে তোলার জন্য ব্যক্তির নিজস্ব প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এইজন্যই বার্গসোঁ এই জাতীয় স্মৃতিকে আসল বা প্রকৃত স্মৃতি

(true) বলেছেন। এই জাতীয় স্মৃতির উপযোগিতাও অনেক বেশী। এই জাতীয় স্মৃতির বিকাশ সাধনে অনুষঙ্গের নিয়মাবলীর (Laws of Association) সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে।

প্রায় সকলেই বার্গসোঁর এই শ্রেণীবিভাগ মেনে নিয়েছেন। দু-একজন যে তার সমালোচনা করেননি, তা নয়। মনোবিজ্ঞানী মান (Munn) বার্গসোঁর শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন বার্গসোঁ উপরোক্ত ভাবে স্মৃতির শ্রেণীবিভাগ করে পরোক্ষ ভাবে মনকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। মনোবিজ্ঞানী **রসের** (Ross) মতে উভয় প্রকার স্মৃতির মধ্যে যে পার্থক্য, সে পার্থক্য হ'ল মাত্রাগত, স্বরূপগত নয়।

স্মৃতি-প্রখরতার অনুকূল শর্তাবলী (Favourable Conditions of Good Memory) : আমরা স্মরণ করতে পারি বলেই আমাদের পক্ষে জ্ঞান অর্জন করা, পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করা, শিক্ষা করা, চিন্তা করা, কল্পনা করা বা উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়। স্মরণ করার ক্ষমতাটিকে ঠিকমত ব্যবহার করতে হ'লে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়। দেখা গেছে কোন কাজ বারবার করলে, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করলে, আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে কাজটি সম্পন্ন করলে, কাজটি শেখার পরও মাঝে মাঝে তার আলোচনা করলে এবং বিষয়টির অন্তর্নিহিত অংশগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করলে স্মরণ করার কাজটি সুষ্ঠু ও সহজ হয়। আবার এও দেখা গেছে, বিশেষ বিশেষ কতকগুলি অবস্থা ও পরিস্থিতিতে সংরক্ষণের কাজটি ভাল হয়, আবার কতকগুলি অবস্থা ও পরিস্থিতি সংরক্ষণের প্রতিকূল। যে বিশেষ পরিস্থিতিতে ও অবস্থাতে সংরক্ষণের কাজটি ভালো হয়, সেই পরিস্থিতি ও অবস্থাগুলিকে সুষ্ঠু স্মরণের শর্তাবলী বলা হয়। অবশ্য একথা ভাবলে ভুল হবে যে, ঐ বিশেষ বিশেষ শর্তগুলির উপস্থিতিতে সংরক্ষণের মাত্রা বা ক্ষমতা বেড়ে যায়। সংরক্ষণের ক্ষমতা সবসময় একই থাকে ; ঐ বিশেষ বিশেষ শর্তগুলির উপস্থিতিতে সংরক্ষণ প্রক্রিয়াটি অধিকতর কার্যকরী হয়ে উঠে। সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে, শর্তগুলি উপস্থিত থাকলে সংরক্ষণের মাত্রা বেড়ে যাবে, আর শর্তগুলি অনুপস্থিত থাকলে সংরক্ষণ আশানুরূপ হবে না।

এই শর্তগুলিকে আমরা নিম্নলিখিত কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যথা—১। শারীরিক (Physical), ২। মানসিক (Mental), ৩। প্রক্ষোভমূলক (Emotional), ৪। পদ্ধতিমূলক (Methodical) এবং

৫। পরিবেশমূলক (Environmental)। এখন এই শর্তগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে—

[এক] **শারীরিক :** সুষ্ঠু স্মরণের জন্য শারীরিক অবস্থা ভাল থাকা দরকার। শরীরের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড়। শরীর অসুস্থ বা রুগ্ন থাকলে মস্তিষ্কও দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে সংরক্ষণ ক্ষমতাও কমে যেতে পারে।

[দুই] **মানসিক :** মানসিক অবস্থাও সুষ্ঠু স্মরণের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। মানসিক অবস্থার মধ্যে পড়ে প্রেষণা (Motivation), আগ্রহ (Interest), মনোযোগ (Attention), সংবোধন (Comprehension) ইত্যাদি।

[তিন] **প্রক্ষোভমূলক :** প্রাক্ষোভিক সমতা সুষ্ঠু স্মরণের আর একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। প্রক্ষোভ অতিরিক্ত হ'লে বা কোন বিরূপ প্রক্ষোভের সৃষ্টি হ'লে স্মরণ ক্রিয়ার কাজটি ব্যাহত হয়। প্রক্ষোভজনিত প্রতিরোধ ভুলে যাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

[চার] **পদ্ধতিমূলক :** পদ্ধতিমূলক শর্তও সুষ্ঠু স্মৃতির সবিশেষ সহায়ক। পদ্ধতিমূলক শর্তগুলি সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে দৃঢ় করে। দেখা গেছে, উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারলে স্মৃতি সহজ ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করলে স্মরণ করা কাজটি ভালোভাবে সম্পন্ন হতে পারে, সেগুলি সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হ'ল—

(১) **সামগ্রিক পদ্ধতি (Whole Method) :** এই পদ্ধতিতে কোন একটি বিষয় পুরোপুরি শিখে বা আগাগোড়া বার বার পড়ে মুখস্থ করে তারপর মনে করা হয়। একসঙ্গে সমস্ত অংশটি পড়তে হয় বলে একে সামগ্রিক পদ্ধতি বলে। মনে করা যাক্ একটি কবিতা মুখস্থ করতে হবে। কবিতাটি খুব বড় না হলে এবং সেটি অর্থপূর্ণ হলে প্রথমে কয়েক ছত্র, তারপর আবার কয়েক ছত্র, এভাবে মুখস্থ না করে বার বার পুরো কবিতাটিই পড়তে হবে। এতে কবিতাটির অন্তর্গত সম্পূর্ণ ভাবটি সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা গড়ে উঠবে। ছত্রগুলি সেই সম্পূর্ণ ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারা যাবে। ফলে শেখা কাজটিও দ্রুত হবে। কবিতাটি মুখস্থ করতে গিয়ে কতকগুলি যোগসূত্র স্থাপন করতে হয় (Bond)। এই পদ্ধতিতে যোগসূত্রের সংখ্যা কম হবে। একটা উদাহরণ দিই, ধরা যাক্ এই কবিতাটি মুখস্থ করতে হবে—

"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন যেন আমি ভাল হয়ে চলি।

আদেশ করেন যাহা মোর গুরু জনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে।"

কবিতাটি মুখস্থ করতে গিয়ে (১) বলির সঙ্গে সারাদিন, (২) চলির সঙ্গে আদেশ, (৩) গুরুজনের সঙ্গে আমি ও (৪) মনের সঙ্গে সকালের—এই মোট চারটি যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। অতএব সময়ও অনেক কম লাগবে। কিন্তু পদ্ধতিটির কয়েকটি ত্রুটিও আছে। কেবলমাত্র বুদ্ধিমান ছেলেরাই এই পদ্ধতিটি অবলম্বন করতে পারে, বড় বা শক্ত কবিতা বা বিষয়ের ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি কাজ করে না, অর্থহীন বিষয়বস্তু বা কৌশল প্রভৃতি শিখনের ক্ষেত্রেও পদ্ধতিটি কাজ করে না।

(২) **অংশ পদ্ধতি** (**Part Method**): এই পদ্ধতিতে শিক্ষণীয় বিষয়-বস্তুটিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে এক একটি ভাগ পৃথক পৃথক করে মুখস্থ করা হয়। সাধারণতঃ বিষয়বস্তুটি যদি বড়, অর্থহীন বা পরস্পর সম্বন্ধ শূন্য হয়, তখন এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এতে সময় সামগ্রিক পদ্ধতির চেয়ে বেশী লাগে এবং যোগসূত্রের সংখ্যাও বেশী নয়। পূর্বোক্ত কবিতাটি যদি অংশ পদ্ধতিতে মুখস্থ করতে হয়, তবে প্রথম দু'ছত্র ও শেষ দু'ছত্র পৃথক ভাবে মুখস্ত করতে হবে। এতে (১) বলিব সঙ্গে সারাদিন, (২) চলির সঙ্গে সকালে, (৩) গুরুজনের সঙ্গে আমি, (৪) মনের সঙ্গে আদেশ, (৫) চলির সঙ্গে আদেশ ও (৬) মনের সঙ্গে সকালে—অর্থাৎ মোট ৬টি সূত্র স্থাপন করতে হচ্ছে। বয়স্কদের তুলনায় শিশুদের পক্ষে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা অধিকতর ফলপ্রসূ কারণ শিশুদের বুঝবার ক্ষমতা ততটা পুষ্ট নয় এবং খুব বেশীক্ষণ তারা দীর্ঘ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে না। কৌশলশিক্ষা বা দক্ষতা অর্জনে অংশ পদ্ধতি অধিকতর কাযকরী। তবে এর একটা বড় ত্রুটি হ'ল একটি অংশ মুখস্থ করার সময় অপর অংশটি ভুলে যাবার সম্ভাবনা বেশী।

(৩) **মধ্যগ পদ্ধতি** (**Mixed Mediatoin or Maximum Method**): এই পদ্ধতিটি হ'ল সামগ্রিক ও অংশ পদ্ধতির একটি সম্মিলিত রূপ। যখন সামগ্রিক পদ্ধতিতে শিখন কঠিন মনে হয়, আবার অংশ পদ্ধতিও কার্যকরী হয় না, তখন এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এতে শুরু করা হয় সামগ্রিক পদ্ধতি দিয়ে, তারপর অংশ পদ্ধতিতে যাওয়া হয়। সামগ্রিক পদ্ধতিতে শিখন হ'লে বিষয়বস্তুটির প্রথম ও শেষের দিকটি ভাল করে শেখা হয়, কিন্তু মাঝামাঝি দিক্‌টি অবহেলিত থেকে যায়। আবার

অপেক্ষাকৃত কঠিন জায়গাগুলিও শেখা হয় না। মধ্যগ পদ্ধতিতে সেই কঠিন অংশগুলি অংশ পদ্ধতিতে শেখান হয়। পদ্ধতিটি প্রধানতঃ সামগ্রিক পদ্ধতির প্রকারভেদ, তবে এর বৈশিষ্ট্য হ'ল এতে অংশ বিশেষের জন্য অংশ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। বিষয়বস্তু যখন দীর্ঘ হয়, তখন এই পদ্ধতিটি বেশ কার্যকরী হয়।) এটিকে আর একভাবে নেওয়া যেতে পারে। সমগ্র বিষয়টিকে একবার সম্পূর্ণ পড়ে নিয়ে সেটিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে নেওয়া হয়। তারপর প্রথমে প্রথম অংশ, তারপর প্রথম ও দ্বিতীয়। তারপর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এইভাবে ক্রমবর্ধিত হারে এগিয়ে যেতে হয়। এতে অবশ্য প্রথম দিকের অংশগুলিতে যত বেশী মনোযোগ দেওয়া হয় ও সেগুলির যত পুনরাবৃত্তি হয়, শেষের দিকের অংশগুলিতে ততটা হয় না।

(৪) **আবৃত্তি পদ্ধতি (Recitation):** কোন একটি বিষয় একবার কিংবা দু'বার পড়ার পর সেটি আবার পড়া ভাল, না, বই বন্ধ করে মুখস্থ বলার চেষ্টা করা ভাল? পরীক্ষা করে দেখা গেছে, শেষের পদ্ধতিটিই ভালো। মুখস্থ করার অর্থ হ'ল—কারো সাহায্য না নিয়ে, বই না দেখে যেমনটি পড়া হয়েছে, ঠিক তেমনটি বলা। যতক্ষণ না সেটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত হচ্ছে, ততক্ষণ সেটি বার বার পড়াকে বলে পঠন পদ্ধতি (Reading)। কিন্তু বিষয়বস্তুটি কিছুক্ষণ পড়ার পর বই বন্ধ করে আবৃত্তি করার চেষ্টাকে বলে আবৃত্তি পদ্ধতি (Recitation)। অনেক পরীক্ষণ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, পঠন পদ্ধতির চেয়ে আবৃত্তি পদ্ধতি অনেক বেশী কার্যকরী। পদ্ধতিটির উৎকর্ষের কতকগুলি কারণ আছে। সেগুলি হ'ল—

(ক) শিখন কোন্ কোন্ জায়গায় দুর্বল হচ্ছে, তা প্রথম অবস্থাতেই ধরা পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়।

(খ) ভুল শেখাগুলি দৃঢ়বদ্ধ হবার কোন সুযোগই পায় না।

(গ) শিক্ষার্থী নিজের পাঠের গতি ও শিখনের হার সম্বন্ধে একটা প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করে। এটি তার নিকট প্রেষণাশক্তি জোগায়।

(ঘ) একই সঙ্গে অনেক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করা হয় বলে শিখন দ্রুত ও সহজ হয়।

(ঙ) বস্তুটির শিখন ও প্রয়োগ একই সঙ্গে ঘটে বলে ভবিষ্যতে ঐ জ্ঞান প্রয়োগ করার সময় কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় না।

(চ) এতে সময় ও শ্রম অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় অনেক কম লাগে।

(৫) **স-বিরাম ও অ-বিরাম পদ্ধতি** (**Spaced or Distributed and Massed or Undistributed Methods**) **:** কোন কিছু একটানা পড়ে তারপর কিছুক্ষণ বিরতি, আবার পড়া, আবার বিরতি এইভাবে শিখন হ'লে তাকে বলে স-বিরাম পদ্ধতি। এতে শেখাটা সুদৃঢ় হয়, কারণ ধারণাগুলি মনের মধ্যে দানা বাঁধবার সুযোগ পায়। একদিনে একটা কবিতা একটানা দশ ঘণ্টা না পড়ে যদি রোজ এক ঘণ্টা করে দশ দিন পড়া যায়, তাহ'লে শেখাটা ভালো হয়। আবার শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটি যদি আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম পড়ে যাওয়া হয়—কোন বিরতি না দিয়ে, তখন তাকে অ-বিরাম পদ্ধতি বলে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে স-বিরাম পদ্ধতি অ-বিরাম পদ্ধতির চেয়ে অনেক কার্যকরী। এর উৎকর্ষের কারণ হ'ল—

(ক) স-বিরাম পদ্ধতিতে মাঝে মাঝে বিরতি দেওয়া হয় বলে পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধ (পরে আলোচনা করা হয়েছে) কম হয়।

(খ) স-বিরাম পদ্ধতিতে বিরতির ফাঁকে ফাঁকে আবৃত্তি ও রিহার্সাল দেবার সুযোগ থাকে।

(গ) বিরতি থাকে বলে ক্লান্তি কম হয়; মস্তিষ্কও সতেজ থাকে।

(ঘ) বিরতির সময় শিক্ষণীয় বস্তুগুলি মনে মনে পর্যালোচনা করে মনের মধ্যে অনুরূপ যে সমস্ত ধারণা আগে থেকে আছে, তাদের সঙ্গে নবলব্ধ ধারণাগুলি সমন্বিত করা যেতে পারে।

(ঙ) বিরতির সময় চেষ্টা না করলেও যা শেখা হয়ে গেছে তা মাঝে মাঝে মনে ভেসে উঠতে পারে (Perseveration)।

(৬) **অতিশিক্ষা** (**Overlearning**) **:** একটি বিষয়বস্তু শেখা হয়ে যাবার পরও যদি সেটিকে আবার কিছুক্ষণ শিখে যাওয়া হয়, তবে তাকে অতিশিক্ষা বা অতিশিখন বলে। নির্ভুল ভাবে মুখস্থ বলার জন্য যতবার শিক্ষা করা দরকার, তার চেয়ে বেশী যে কোন শিক্ষণই হ'ল অতিশিক্ষা। অতিশিখনে শেখা দৃঢ়তর ও দীর্ঘতর হয় কারণ এতে স্মরণচিহ্নগুলি গভীরতর হয়। তাছাড়া এইভাবে শেখা বিষয়বস্তু যান্ত্রিক স্মৃতির রূপ গ্রহণ করে। অতিশিখনের সঙ্গে মাঝে মাঝে পাঠ্যবিষয়ের পর্যালোচনা করলে মনে করার কাজটি সহজ হয়।

(৭) **বুদ্ধিগত শিক্ষা** (**Intelligent Learning**) **:** যখন কোন কিছু শিখতে হবে, তখন যদি পাঠ্য বস্তুর অন্তর্নিহিত বিভিন্ন ধারণাগুলির অর্থ ভালো করে বুঝে নিয়ে পড়া যায়, একটি ধারণার সঙ্গে অন্য আর একটি ধারণার

সম্পর্কটি ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায় এবং বুদ্ধি দিয়ে বিষয়বস্তুটিকে বিচার করা যায়, তাহ'লে শেখার কাজটি যেমন সহজ হয়, শিখনও তেমনি দীর্ঘস্থায়ী হয়। এটিকে অনেকে অন্তর্দৃষ্টিমূলক পদ্ধতি (Insightful Method)-ও বলেন কারণ এই জাতীয় শিখনের জন্য অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয়। পদ্ধতিটি যান্ত্রিক পদ্ধতির বিপরীত।

(৮) **উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা** (**Purposive Learning**): কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু মুখস্থ করলে মুখস্থ করার কাজটি সহজ হয় এবং শিখনও দীর্ঘস্থায়ী হয়। অবশ্য উদ্দেশ্য বিভিন্ন জাতীয় হ'তে পাবে। যেমন, পরীক্ষাতে সাফল্য অর্জন, শ্রেণীকক্ষে প্রশংসা অর্জন, শিক্ষকের স্বীকৃতি ইত্যাদি।

(৯) **মানস-ছবি** (**Image**): কোন কিছু পড়ার সময় বিষয়টির একটি মানস-ছবি যদি এঁকে নেওয়া যায়, তাহ'লে মনের মধ্যে সহজে সেটি গাঁথা হয়ে যায়। চোখে দেখা জিনিস কানে শোনা জিনিসের চেয়ে বেশী মনে থাকে। নানারূপ চিত্র, মানচিত্র, প্রদীপন ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষা দিলে ভালোভাবে শেখা সম্ভব।

(১০) **ছন্দ** (**Rhythm**): অনেক ছেলেমেয়েই পড়ার সময় বেশ সুর করে টেনে টেনে পড়ে। এর কারণ হ'ল ছন্দের সাহায্যে পড়লে সহজে মুখস্থ হয়, দীর্ঘদিন মনেও থাকে। হুগলীতে যখন বি.টি পড়ি তখন অধ্যাপক ডঃ রমেশ দাস তাঁর এক হেড্‌মাস্টার মশায়ের কথা বলতেন। তিনি ছাত্রদের 'বিয়োগ করা'র ইংরাজীটি এভাবে শিখিয়েছিলেন:

S–U–B–T– R–A–C–T

বলতো ভাই কি-জিনিসটি?

বিয়োগটি।

(১১) **অনুষঙ্গ** (**Association**): অনুষঙ্গের কথা আগেই বলা হয়েছে। কোন নতুন বিষয় শিখবার সময় যদি পুরাতন বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যায়, তাহ'লে শিখনের কাজ সহজ ও দ্রুত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা মনে রাখতে হ'লে সিপাহী বিদ্রোহের সাল মনে রাখলেই চলবে।

(১২) **শ্রেণীকরণ পদ্ধতি** (Classification): শিক্ষণীয় বিষয়টিকে কোন প্রকারে বিশেষ কোন শ্রেণীভুক্ত করতে পারলে শিখন সহজ হয়। একই

দলের বা শ্রেণীর বিষয় মনে রাখা যত সহজ, ভিন্ন দলের বা শ্রেণীর বিষয় মনে রাখা তত সহজ নয়।

(iv) **স্মৃতি সংকেত** (Mnemoric Device): কোন প্রতীক, চিহ্ন, শব্দ বা সংখ্যার সাহায্যে বিশেষ বিশেষ বিষয় মনে রাখা সম্ভব হয়। রামধনুতে ক'টি রং, তা আমরা মনে রাখি VIBGYOR-এর সাহায্যে। রাজনৈতিক হত্যার ইংরাজী মনে রাখতে হবে? মনে রাখতে হবে গাধার পরে গাধা। তারপর আমি, তারপর জাতি: Association.

দৃঢ় সংকল্প (**Will to learn**): কোন কিছু শিখতে হ'লে একটা দৃঢ় সংকল্প থাকা চাই। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু শেখা যায় না। বরং ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিখতে গেলে ফল খাবাপই হয়।

বিস্মৃতি (**Forgetting**): স্মৃতি যেমন একটি স্বাভাবিক ঘটনা, বিস্মৃতিও তেমনি। বিস্মৃতি বা ভুলে যাওয়াটা হ'ল মনে রাখার বিপরীত। আমরা যা শিখি, তার অনেক কথা যেমন মনে থাকে, সেই রকম অনেক কথা আবার আমারা ভুলেও যাই। মস্তিষ্কে অভিজ্ঞতার সংরক্ষণকে বলে স্মৃতি, আর সংরক্ষণের অভাবকে বলে বিস্মৃতি। তবে স্মৃতির যে রকম প্রয়োজন আছে, বিস্মৃতিরও তেমনি প্রয়োজন আছে। রিবোর্ট (Ribbort) বলেন—শেখার জন্যই ভুলে যাওয়া প্রয়োজন। আমাদের মানসিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। অনেক কিছু মনে রাখা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়! আবার যা শিখছি, তার সবগুলিই সঠিক নয় বা সমান প্রয়োজনীয় নয়। অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় জিনিস না ভুলে গেলে আবশ্যক ও প্রয়োজনীয় জিনিস শেখা হবে কেমন করে? তেমনি ভুল জিনিসগুলি ভুলে না গেলে শুদ্ধ জিনিস শেখা হবে কেমন করে? আবার আমাদের জীবনের সব অভিজ্ঞতা সমান তৃপ্তিদায়ক নয়। কতকগুলি অভিজ্ঞতা যথেষ্ট বেদনাদায়ক। এই সমস্ত অভিজ্ঞতা মনে থাকলে মনোকষ্ট বাড়ে বই কমে না। এরজন্যও তো ভুলে যাওয়া প্রয়োজন। এক কথায়, বিস্মৃতি মানব-জীবনকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুলতে সাহায্য করে।

এর পর প্রশ্ন হ'ল—আমরা ভুলে যাই কেন? এক কথায় উত্তর দিতে গেলে বলতে হয়,মনে রাখতে সাহায্য করে যে সমস্ত উপায়, শিখবার সময় যদি সেগুলি ঠিকমত না মেনে চলা হয়, তাহ'লে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। ভুলে যাওয়ার দুটি বিখ্যাত তত্ত্ব আছে। এদের মধ্যে একটি হ'ল—চর্চার

অভাবের তত্ত্ব (Atrophy Theory)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী চর্চা বা অনুশীলনের অভাবের জন্যই বিস্মৃতি ঘটে। আর একটি হ'ল—প্রতিরোধ তত্ত্ব (Interference Theory)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী নতুন অভিজ্ঞতা, পুরাতন অভিজ্ঞতাকে মুছে দেয় বলে বিস্মৃতি ঘটে।

ভুলে যাওয়ার উপর অনেক পরীক্ষণ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এবিংহসের (Ebbinghaus) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সংরক্ষণ ও বিস্মৃতির হার, বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ও বিস্মরণের হার, বিষয়বস্তুর পরিমাণ ও মুখস্থ-করণের সময় ও প্রচেষ্টা, শিখনের মাত্রা ও সংরক্ষণ, বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে সংরক্ষণের হার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষণ চালিয়ে যান। স্মৃতি এবং বিস্মৃতি সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানা যায় তাঁর পরীক্ষণ থেকে। এখন ভুলে যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। কারণগুলি কখনও পৃথকভাবে, আবার কখনও যৌথ ভাবে কাজ করে। প্রধান প্রধান কারণগুলি হ'ল—

১। **বিষয়বস্তুর প্রকৃতি** (Kind of the material): বিষয়বস্তুর প্রকৃতির উপর মনে রাখা এবং ভুলে যাওয়া অনেকাংশে নির্ভরশীল। পরীক্ষা করে দেখা গেছে অর্থহীন শব্দতালিকা, গদ্য, কবিতা ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শেখা বিষয়—এই চার রকমের জিনিসের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শেখা বিস্মৃতির পরিমাণ সবচেয়ে কম। তারপর আসে কবিতা। অর্থহীন শব্দ-তালিকার ক্ষেত্রে বিস্মৃতির মাত্রা সবচেয়ে বেশী।

২। **শিখনের মাত্রা** (Degree of learning): শেখা হয়ে গেলেও আবার চর্চা করলে অতিশিখন হয়—এ কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রত্যেক বিষয় শেখার একটা সর্বনিম্ন মানে আছে যেখানে পৌছালে আমরা বলতে পারি শিখন হয়েছে। এই সীমারেখার উপরের স্তর হ'ল—অতিশিখনের স্তর (over-learning), আর নীচের স্তর হ'ল—ন্যূন স্তর হ'ল—ন্যূনশিখনের স্তর (under-learning)। অতিশিখনের ক্ষেত্রে বিস্মৃতির পরিমাণ কম হয়, ন্যূনশিখনের ক্ষেত্রে বেশী হয়। আমাদের নাম, নামতা তালিকা বা ছড়ার ক্ষেত্রে অতিশিখন হয় বলে পুনরায় না শিখেও বা চর্চা না করলেও তা আমরা ভুলে যাই না।

৩। **আঘাত** (Shock Amnesia): সংরক্ষণ নির্ভর করে মস্তিষ্কের উপর। কাজেই মস্তিষ্কে কোনপ্রকার আঘাত লাগলে সংরক্ষণ ঠিক মত নাও হতে পারে। ফলে বিস্মৃতির পরিমাণ বেশী হতে পারে। মস্তিষ্কে আঘাত

লাগার ফলে যে বিস্মরণ হয় তাকে আঘাতজনিত বিস্মরণ বলে। কোন প্রকার দুর্ঘটনা, খেলাধূলা, মারামারি বা যুদ্ধের সময় এই জাতীয় বিস্মরণ সচরাচর দেখা যায়।

৪। **নেশাকারক বস্তু** (Drugs) : মদ, আফিং, কোকেন ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে মস্তিষ্কে স্মরণ চিহ্নগুলির ছাপ অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। খুব বেশি দিন ধরে এগুলি ব্যবহার করলে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে ও বিস্মৃতি ঘটে।

৫। **প্রতিরোধ** (Inhibition) : একাধিক বিষয় শিখতে হ'লে প্রত্যেকটি বিষয় শেখার পর নূতন বিষয় শেখার আগে কিছুটা বিরতি দেওয়া প্রয়োজন। কোন একটি বিষয় শেখার পরই যদি বিরতি না দিয়ে আর একটি বিষয় শেখা হয়, তবে দু'রকম ঘটনা ঘটতে পারে। এক, প্রথম বিষয়টির কিছু কিছু অংশ ভুলে যেতে পারি; দুই, দ্বিতীয় বিষয়টির কিছু অংশ ভুলে যেতে পারি। প্রথম ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথম বিষয়টি মনে রাখার পক্ষে বাধার সৃষ্টি করছে এবং সেটি পিছন দিকে পিছিয়ে যাচ্ছে। পরবর্তী-কালে যে বিষয় শেখা হ'ল, সেটি যদি পূর্ববর্তী কালে শেখা বিষয়ের স্মৃতিপথে আসার পথে বাধার সৃষ্টি করে, তখন তাকে **পশ্চাদমুখী প্রতিরোধ** (Retroactive Inhibition) বলে। আর পূর্ববর্তী কালে যে বিষয় শেখা হ'ল, সেটি যদি পরবর্তী কালে শেখা বিষয়ের স্মৃতিপথে আসার পথে বাধার সৃষ্টি করে, তখন তাকে **অগ্রগামী প্রতিরোধ** (Proactive Inhibition) বলে। কারণ এক্ষেত্রে প্রথম বিষয়টি এগিয়ে এসে দ্বিতীয় বিষয়টি মনে রাখার পক্ষে বাধার সৃষ্টি করছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, দুটি বিষয়ের মধ্যে আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত মিল যত বেশী হয়, প্রতিরোধের পরিমাণও তত বেশী হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যত বিস্মৃতি ঘটে, তার অধিকাংশের জন্য প্রতিরোধই দায়ী।

৬। **ঘুম** (Sleep) : ঘুমের সঙ্গে সংরক্ষণের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। কোন বিষয় শেখার পর যদি ঘুমান যায়, তবে সংরক্ষণ ভাল হয়। ঘুমের মধ্যে অন্তর্পুর্তি (consolidation) ঘটে। তাছাড়া ঘুমের জন্য কোন প্রকার প্রতিরোধও ঘটছে না। এইজন্য ঘুমের আগে যা শেখা হয়, তা ভালোভাবে মনে থাকে। পরীক্ষার আগের রাত্রে না ঘুমিয়ে পড়ার চেয়ে ঘুমিয়ে পড়া অনেক ভালো।

৭। **আবেগজনিত প্রতিরোধ** (Emotional blocking) : তীব্র আবেগজনিত পরিস্থিতিতে খুব ভালো করে শেখা জিনিসও ভুলে যাওয়া সম্ভব। খুব বেশী মাত্রায় ভয়, রাগ, আনন্দ, দুঃখ, ঘৃণা, লজ্জা ইত্যাদি প্রক্ষোভ জাগরিত হ'লে ভুলের মাত্রা বেড়ে যায়। David Copperfield-এ David-এর কথা নিশ্চয়ই মনে আছে।

৮। **পরিবর্তিত পরিবেশ** (Altered environment) : কোন কিছু শেখবার সময় আমরা একটা বিশেষ পরিবেশে শিখি। পরিবেশের মধ্যে যে সমস্ত উপাদান থাকে, সেগুলি আমাদের স্মৃতির সহায়ক। অনেক সময় দেখা গেছে—পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে আমরা বিষয়টি মনে করতে পারি না। এইজন্যই শ্রেণীতে বা বাড়িতে ভালো করে পড়া তৈরী করলেও পরীক্ষার হলে আমরা তা ভুলে যাই।

৯। **চর্চার অভাব** (Disuse) : শেখা বিষয়টি মনে রাখতে হলে মাঝে মাঝে আলোচনা করা দরকার। আমরা যখন কোন বস্তু ভুলে যাই, তখন ধরে নিই যে চর্চার অভাবে সেটি আমরা ভুলে গেছি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে চর্চা না করেও অনেক বিষয় আমরা ভালোভাবে মনে রাখতে পারি, আবার চর্চা করা সত্ত্বেও অনেক বিষয় আমরা ভুলে যাচ্ছি। চর্চা না করেও যে মনে থাকা, তাকে বলা হয় **স্মৃতি রেশ** (Reminiscence)। অনেকে আবার বলেন, আলোচনার অভাবে সময়ের অতিবাহনে বিষয়টি ভুলে যাচ্ছি। এখানে 'সময়'কে ভুলে যাঁওয়ার একটি কারণ বলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু সময় কোন ঘটনার সঙ্গত কারণ নয়। এটি হ'ল সমস্ত ঘটনার একটা সাধারণ পটভূমিকা।

১০। **অবদমন** (Repression) : ভুলে যাওয়াকে অনেকে দু'ভাগে ভাগ করেন—ঐচ্ছিক (Active) ও অনৈচ্ছিক (Passive)। ফ্রয়েড্ এবং তার অনুগামীরা মনে করেন ভুলে যাওয়াটা একটা ইচ্ছাকৃত মানসিক প্রক্রিয়া। স্মরণ করার অনিচ্ছা থেকেই বিস্মৃতির উৎপত্তি। ফ্রয়েড বলেন, আমরা যা ভুলতে চাই, সেগুলি আমরা ভুলি। অবশ্য এই ভুলতে চাওয়ার ইচ্ছা সচেতন মনের নয়, অচেতন মনের। ফ্রয়েডের মতে কোন কিছু ভুলে যাওয়ার অর্থ হ'ল সেটিকে চেতন মন থেকে অচেতন মনে নির্বাসিত করা—যার বিশেষ নাম হ'ল **অবদমন**। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়—যদি ভুলে যাওয়াটা ইচ্ছাকৃতই হয়, তবে অনেক দরকারী কাজের কথা, পরীক্ষার

পড়া (যা আমরা ভুলতে চাই না) আমরা ভুলে যাই কেন? আবার যা ভুলতে চাই (যেমন শোক, দুঃখ, লজ্জা) তা আমরা ভুলি না কেন? এক্ষেত্রে ফ্রয়েড্ বলছেন—আমরা কি ভুলতে চাই আর কি ভুলতে চাই না—তা নির্ণয় করে আমাদের অহং সত্তা (Ego) যার কিছুটা চেতন, কিছুটা অচেতন। কাজেই 'চেতন আমি' ঠিক করতে পারে না কি ভুলতে হবে, আর কি মনে রাখতে হবে। তাছাড়া শোক, দুঃখ, লজ্জাজনক ঘটনা বার বার মনে ফিরে আসে বলে সেগুলির অতিশিখন হয়ে যায়। ফলে অহংসত্তা ভুলতে চাইলেও আমরা সেগুলি ভুলতে পারি না। আর একটা কথা। ভুলে যাওয়াটা অনেকটা পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার। আমরা আমাদের পাওনাগুলি ঠিক মনে রাখি, কিন্তু দেনার কথা বেমালুম ভুলে যাই। ১৮.৭.

স্মৃতির উন্নতি সম্ভব কি না? (Can memory be improved): প্রশ্নটি সঙ্গে সঙ্গে চারটি প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে যায়। শিখনের উন্নতি সম্ভব কি না? সংরক্ষণের উন্নতি সম্ভব কি না? উজ্জীবনের উন্নতি সম্ভব কি না? পরিজ্ঞানের উন্নতি সম্ভব কি না? মনোবিদ্ জেমসের মতে অভিজ্ঞতাটিকে সংরক্ষিত করার ক্ষমতা মানুষের সহজাত। এর কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাঁর মতে অনুশীলনের সহায়তায় স্মরণক্রিয়াকে উন্নততর করা সম্ভব নয়। অবশ্য তিনি এ কথা স্বীকার করেন যে, মনোযোগ ও অনুরাগ বাড়িয়ে দিলে বিষয়বস্তুটি আয়ত্ত করা সহজ হয়। স্টাউট-এর মতে অনুশীলনের দ্বারা সামগ্রিক স্মৃতির উন্নতি না হলেও বিশেষ কোন একটি দিকে স্মরণক্রিয়ার উন্নতি সম্ভব। সংরক্ষণ মস্তিষ্কের একটি প্রক্রিয়া। আমরা বাইরে থেকে মস্তিষ্কের মধ্যে কোনপ্রকার পরিবর্তন ঘটিয়ে সংরক্ষণের মাত্রা বাড়াতে পারি না। তবে সুস্থ দেহ, পুষ্টিকর খাদ্য, উপযুক্ত বিশ্রাম ইত্যাদি সংরক্ষণের সহায়ক। উজ্জীবন ও পরিজ্ঞানের কতকগুলি শর্তের কথা আগেই বলা হয়েছে যেগুলির জন্য এগুলির উন্নতি সম্ভব। শিখন প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে উন্নততর করা সম্ভব। একমাত্র ভালো শিখন হলেই সংরক্ষণ তথা স্মরণ প্রক্রিয়া ভালো হবে। যে সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করলে শিখন সহজ ও দ্রুত হয়, সে সমস্ত পদ্ধতির কথা আগেই আলোচনা করা হইয়াছে।

স্মৃতির বিস্তার (Memory Span): একবার শুনে কোন একজন লোক যতটুকু আবৃত্তি করতে পারে বা মনে করতে পারে, তাকেই স্মৃতির বিস্তার বলে। প্রত্যেক ব্যক্তিই একবার শুনে বিশেষ দৈর্ঘ্যসম্পন্ন সংখ্যা

বা অক্ষরের সারি ঠিকমত পুনরাবৃত্তি করতে পারে। কিন্তু এই সারিটির দৈর্ঘ্য যদি ক্রমশঃই বাড়ানো হয়, তবে এমন একটি সময় আসে যখন একবার শুনে আর পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব হয় না। এর থেকে অবশ্য একথাও প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেকেরই স্মৃতির ক্ষমতার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে এই সীমা হ'ল ৬ কিংবা ৭। সাধারণতঃ কতকগুলি অর্থহীন বর্ণসমষ্টি বা সংখ্যা পরীক্ষণ পাত্রের কাছে উপস্থাপিত করা হয়। স্মৃতির বিস্তার নির্ণয় করতে হ'লে সংখ্যা বা অক্ষরের সারি ক্রমশঃ বাড়িয়ে যাওয়া হয়। স্মৃতির বিস্তার সম্বন্ধে মনোবিদ্ Munn-এর একটি উক্তি দিয়ে বক্তব্য শেষ করছি— "Memory span differs with age and with the type of material used. For example, the average span to auditory presentation and vocal recall of digits is four between four and five years, five between six and eight years, six between nine and twelve years and seven beyond twelve years."

॥ ছয় ॥

মনোযোগ ও আগ্রহ

(Attention and Interest)

[Attention is merely conation or striving, considered from the point of view of its effect on cognitive process—*Mc. Dougall.*

It is the concentration of conscience upon one object rather than upon another.

It is the essentiel element in all creative activities —*Dumville.*

Attention is a process of getting an object of thought clearly before the mind—*J. H. Ross.*

Attention is conation, determined cognition—*Stout.*

The process of selection of what one is going to observe goes by the name of attention—*Guilford.*

Interest is latent attention and attention is interest in action—
Mc. Dougoll.

মনোযোগের স্বরূপ (Nature of Attention): মনোযোগ দেওয়ার অর্থ হ'ল মন দিয়ে কোন জিনিসকে লক্ষ্য করা,অর্থাৎ সেই জিনিসটির সঙ্গে নিজের মনের একটা সংযোগ স্থাপন করা। আমাদের চেতনার প্রবাহ নদীপ্রবাহের মতই সদা গতিশীল। আমাদের চারিদিকে প্রতিনিয়ত অজস্র বস্তু থাকে। কিন্তু সব বিষয়ের প্রতি একই সঙ্গে আমরা আমাদের মন নিবিষ্ট করতে পারি না। আমরা মনোযোগের জন্য একটি বিশেষ বিষয় নির্বাচিত করে নিই। এই নির্বাচিত বিষয়টিকে চেতনার কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসার নামই মনোযোগ। বিষয়টিকে যখন চেতনার কেন্দ্রস্থলে আনা হয়, তখন অন্যান্য বিষয়গুলি থেকে আমাদের মনোযোগ দূরে সরে যায়। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, মনোযোগ হ'ল অসংখ্য বিষয়বস্তুর থেকে দু'একটি বিশেষ বিষয়ের নির্বাচন এবং নির্বাচনের পর তার উপর মনকে নিবিষ্ট করা ও অন্যান্য বিষয় থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে আসা।

মনোযোগ শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। সাধারণ ভাবে

এটিকে একটি মানসিক শক্তি বলেই ধরা হয়—কারণ মনোযোগ হ'ল কোন বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট একটা চেতনা। দ্বিতীয়তঃ, মনোযোগ হ'ল মনের একটি কাজ বা প্রক্রিয়া। তৃতীয়তঃ, মনোযোগ বলতে কেবলমাত্র মনের কাজই বুঝায় না, মনের কাজ ও বস্তু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট চেতনা উভয়কেই বোঝাতে পারে। এই মতবাদ অনুযায়ী চেতনা হ'ল মনোযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাধারণতঃ এই অর্থেই মনোযোগ কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি এমন একটি মানসিক প্রক্রিয়া যার সাহায্যে আমরা কোন একটি বিশেষ বিষয়ে আমাদের মনকে নিবিষ্ট করি—যার ফলে ঐ বিষয়বস্তুটি সম্বন্ধে আমরা আগের চেয়ে অধিকতর পরিষ্কার ও স্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে পারি। এই বিষয়বস্তুটি চেতনার কেন্দ্রস্থল অধিকার করে থাকে যদিও অন্যান্য বিষয়গুলিও চেতনার ক্ষেত্রের মধ্যে থাকে। যখন খুব মনোযোগ দিয়ে কেউ কোন বই পড়েন, তখন ঐ বইটি বা বই পড়া ঘটনাটি তাঁর চেতনার কেন্দ্রস্থলে থাকে। বই পড়ার বাইরে কি ঘটছে—সে সম্বন্ধে তাঁর একটা অস্পষ্ট ও ক্ষীণ ধারণা থাকবে কারণ সেগুলিও চেতনার ক্ষেত্রের মধ্যেই থাকে।

মনোযোগের বৈশিষ্ট্য (Characteristics): মনোযোগের বিভিন্ন সংজ্ঞা পর্যালোচনা করলে এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল—

(১) মনোযোগ এক প্রকারের আচরণ। মনের অন্যান্য অনেক কাজ মনোযোগের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। (২) যে জিনিসটিতে আমরা মনোযোগ দিয়ে থাকি, সেই জিনিসটি ধীরে ধীরে আমাদের কাছে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট চেতনার কারণই হ'ল মনোযোগ। মনোযোগের বিষয়টি চেতনার কেন্দ্রে থাকে, অন্যান্য বিষয়গুলি থাকে চেতনার ক্ষেত্রেই—কিন্তু কেন্দ্র হ'তে দূরে। (৩) আমরা একসঙ্গে একটিমাত্র জিনিসের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি—কারণ মনোযোগের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ। (৪) মনোযোগ স্থির নয় বলে কোন একটি জিনিসের প্রতি অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে থাকা যায় না। মনোযোগের বিষয়বস্তুকে অন্যান্য অনেক বিষয় থেকে পৃথক করে নিতে হয়। মনোযোগ হ'ল একটি নির্বাচনী প্রক্রিয়া (Selective)। (৬) মনোযোগের দুটি দিক আছে—অস্ত্যর্থক (Positive) ও নাস্ত্যর্থক (Negative)। যে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হোলো সেটা অস্ত্যর্থক দিক, আর যে বিষয় থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেওয়া

হ'ল সেটা নাস্ত্যর্থক দিক। (৭) মনোযোগের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে। (৮) মনোযোগকে অনুসন্ধানী বলা হয়। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বৈচিত্র্য খুঁজে বেড়ানোই হ'ল মনোযোগের ধর্ম। এই প্রসঙ্গে Woodworth বলেন—Attention is mobile because it is exploratory, it continually seeks something fresh for examination। (৯) মনোযোগ বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনে সহায়তা করে। (১০) মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া হলেও এটিকে বিশ্লেষণমূলক ও সংশ্লেষণমূলক প্রক্রিয়ার সমন্বয় বলা যেতে পারে। (১১) মনোযোগ দেবার সময় শরীরের মধ্যে কতকগুলি অনুকূল পরিবর্তন ঘটে—যেমন সঞ্চালনমূলক (Motor), ইন্দ্রিয়ঘটিত (Sensory) ও স্নায়ুঘটিত পরিবর্তন (Nervous)। এইগুলি মনোযোগ দেবার জন্যই প্রয়োজন হয় এবং এর ফলে মনোযোগ দেওয়ার কাজটি সহজ হয়।

মনোযোগের নির্ধারক (Conditions of Attention): কোন একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে একটি বিশেষ বস্তুর প্রতি আমরা মনোযোগ দিই কেন? আমাদের মনোযোগ নির্ধারিত হয় কোন্ কোন্ বিষয়ের দ্বারা? প্রশ্নটি সাধারণ ভাবে যেমন প্রয়োজনীয়, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। আগেই বলা হয়েছে মনোযোগ নির্ধারিত হয় বস্তুটির নিজের এবং যিনি মনোযোগ দিচ্ছেন, তাঁর কতকগুলি বিশেষধর্মী গুণাগুণের দ্বারা। বস্তুটির গুণাগুণগুলিকে আমরা মনোযোগের বাহ্যিক বা বস্তুগত নির্ধারণ (Objective-determiners) এবং ব্যক্তিটির গুণাগুণগুলিকে আমরা মনোযোগের আভ্যন্তরিণ বা ব্যক্তিগত নির্ধারক (Subjective determiners) বলে থাকি। এই দু'রকমের নির্ধারককে একত্রে মনোযোগের শর্তাবলী (Conditions of attention) বলা হয়।

বস্তুগত নির্ধারক (External Determiners):

[এক] **আয়তন** (Size): কোন বড় জিনিসের প্রতি আমাদের মনোযোগ যত সহজে আকৃষ্ট হ'ল, ছোট জিনিসের প্রতি তত সহজে হয় না। আমাদের সামনে একটা হাতি আর একটা পিঁপড়ে থাকলে আগেই আমরা হাতিটাই দেখি। খবরের কাগজে বড় অক্ষরে ছাপা হেড্‌লাইনগুলি আগে নজরে পড়ে। এর কারণ হ'ল উদ্দীপক বড় হলে অধিকসংখ্যক ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়, তাই সেটির প্রতি মনোযোগ আগে আকৃষ্ট হয়।

[দুই] তীব্রতা (Intensity): উদ্দীপকগুলির মধ্যে যেটি বেশী তীব্র, সেটি সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে। উজ্জ্বল আলো, তীব্র শব্দ, অসহ্য বেদনা আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। একই আকাশে নক্ষত্র ও চন্দ্র থাকলেও ম্লান নক্ষত্রের দিকে আমরা আগে দৃষ্টি দিই না ; উজ্জ্বল চন্দ্রের দিকেই আগে মনোযোগ দিয়ে থাকি।

[তিন] পরিবর্তন (Change): পরিবর্তন সব সময় আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে চলছে। এতক্ষণ যেদিকে কোন মনোযোগ দিইনি। কিন্তু হঠাৎ যদি ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যায়, তবে মনোযোগ তৎক্ষণাৎ সেদিকে ধাবিত হবে।

[চার] গতি (Movement): গতিশীল বস্তু স্থির বস্তুর চেয়ে সহজে এবং দ্রুত আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। গাছে একটা টিয়ে পাখী বসে আছে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। সেটা যেমনি একটু নড়ে উঠল, অমনি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হ'ল। একটা ঘোড়ার চলার পথে এক টুকরো সাদা কাগজ পড়ে ছিল। সেটা যতক্ষণ নড়েনি, ততক্ষণ ঘোড়া ঠিক চলছিল। কিন্তু যেমনি সেটা বাতাসে নড়ে উঠল, অমনি ঘোড়া ভয় পেয়ে দারুণ জোরে ছুটতে লাগল।

[পাঁচ] নতুনত্ব (Novelty): যা কিছু নতুন, অভিনব, অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক, তা সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। নতুন বই পুরানো বই-এর চেয়ে বেশী ভালো লাগে। নতুন লোক, নতুন বাড়ী, নতুন খবর আমাদের মনোযোগ কেড়ে নেয়। আবার অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত জিনিসও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। আজকাল পাড়াগাঁয়ে চক্‌চকে মোটর গাড়ী দেখতে সকলে ভীড় জমায়। হিপিদের বিচিত্র সাজ-পোশাক সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

[ছয়] পুনরাবৃত্তি (Repetition): একই উদ্দীপককে যদি বার বার আমাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়, তবে তা সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এইজন্য শিক্ষকমশায় একই জিনিস বার বার ছাত্রদের কাছে ব্যাখ্যা করেন, বিজ্ঞাপনদাতারা বার বার একই বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন, এর কারণ হ'ল প্রথম দু'এক বার তা আমাদের মনোযোগ এড়িয়ে গেলেও পুনরাবৃত্তির জন্য একবার না একবার মনোযোগ আকর্ষণ করবেই।

[সাত] **অবস্থিতি** (Location): কোন একটা বিশেষ অবস্থিতিও আবার মনোযোগের কারণ হতে পারে। খবরের কাগজের একেবারে উপরের দিক, বইয়ের মলাট ইত্যাদি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

[আট] **সুসম্বদ্ধতা** (Symmetry): যে বস্তুটি যত বেশী সুসম্বদ্ধ, তার প্রতি মনোযোগ তত সহজে আকৃষ্ট হয়। একটা সুন্দর ছবি, আর একটা ছবির নামে কালির ছোপ যদি পাশাপাশি থাকে, তবে ছবির দিকেই মনোযোগ আগে যাবে।

[নয়] **স্পষ্টতা** (Clarity): যে জিনিসটি যত স্পষ্ট, তার দিকে মনোযোগ তত সহজে যায়। ক্লাসে সহজ করে পাঠ দিলে ছাত্ররা যতটা মনোযোগী হয়, খুব কঠিন করে পাঠ দিলে তার চেয়ে কম মনোযোগী হয়।

[দশ] **প্রকৃতি** (Kind): বস্তুর প্রকৃতিগত কারণও মনোযোগের অন্যতম কারণ। সাদা জিনিসের চেয়ে রঙীন্ জিনিস সহজে মনোযোগ আকর্ষণ করে, আবার রঙীন্ জিনিসের মধ্যে কমলা, হলুদ ও লাল রঙ সহজে মনোযোগ আকর্ষণ করে।

[এগার] **বিচ্ছিন্নতা** (Isolation): উদ্দীপকের ভীড় থেকে যদি একটি বিশেষ উদ্দীপককে সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহ'লে সেটি সহজে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেক বিজ্ঞাপনের ভীড়ে একটি বিশেষ বিজ্ঞাপন চোখে নাও পড়তে পারে। কিন্তু সেটি যদি সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে দেওয়া হয়, তবে নজরে পড়বেই।

[বার] **আকস্মিকতা** (Suddenness): উদ্দীপকের আকস্মিক আবির্ভাব সহজে মনোযোগ আকর্ষণ করে। মোটর গাড়ীর টায়ার ফাটার শব্দ, হঠাৎ বাজের শব্দ বা বিদ্যুতের ঝলক সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে।

[তের] **স্থায়িত্ব** (Duration): উদ্দীপক যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে মনোযোগ আকৃষ্ট হবেই। কেউ আমার নাম ধরে একবার ডাকলে হয়তো শুনতেই পেলাম না। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করলে না শুনে উপায় নেই।

[চোদ্দ] **বৈসাদৃশ্য** (Contrast): বৈসাদৃশ্যই মনোযোগের একটি কারণ। খুব ফর্সা, খুব লম্বা লোকের পাশে খুব বেঁটে লোক বা খুব রোগা লোকের পাশে খুব মোটা লোক সহজে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

[পনর] **গোপনতা** (Secrecy): গোপন জিনিসের প্রতি আমাদের মনোযোগ সহজে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ফিস্. ফিস্. করে কথা বললে আমাদের মনোযোগ সেই দিকেই ধাবিত হয়।

ব্যক্তিগত নির্ধারক (Internal Determiners): মনোযোগের ব্যক্তিগত নির্ধারক বলতে সেই সমস্ত বস্তুকেই বোঝায় যেগুলি থাকে ব্যক্তির মধ্যে। এগুলির সংখ্যা অনেক। এক কথায় এই সমস্ত নির্ধারককে বলা হয় **মানসিক প্রস্তুতি** (Mental Set)। মানসিক প্রস্তুতিই নির্ধারণ করে দেয় কোন্ উদ্দীপকের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হবে। এই মানসিক প্রস্তুতি সকলের ক্ষেত্রে এক নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তির অর্জিত আগ্রহ মনোযোগের কারণ। যাই হোক, মনোযোগের কয়েকটি প্রধান ব্যক্তিগত নির্ধারক সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল—

[এক] **ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা** (Desrise or will): কোন জিনিসের প্রতি বিশেষ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা থাকলে তার দিকে মনোযোগ ধাবিত হয়। যে ব্যক্তি অর্থ উপার্জন করতে চায়, তার মনোযোগ থাকে অর্থের দিকে; যে পরীক্ষায় ভালো ফল করতে চায়, তার মনোযোগ থাকে ভালো বই ও নোটের দিকে।

[দুই] **আগ্রহ** (Interest): আগ্রহ হ'ল মনোযোগের প্রধান অবধারক। মনোযোগ ও আগ্রহ মূলতঃ একই জিনিস। যা ভেতরে আগ্রহ, তা বাহিরে মনোযোগ। আগ্রহের দু'টি অবস্থা—অবচেতন ও চেতন। সহজাত প্রবৃত্তি ও সেন্টিমেন্টগুলি আগ্রহের অবচেতন অবস্থা আর মনোযোগ হ'ল তার চেতন অবস্থা। যার যে বিষয়ে আগ্রহ তার সেই বিষয়ে মনোযোগ বেশী। খবরের কাগজে কে কোন্ পৃষ্ঠাতে মনোযোগ দেন—তার থেকেই তাদের আগ্রহের কথা বোঝা যায়।

[তিন] **জৈবিক চাহিদা** (Organic drives): আমাদের জৈবিক চাহিদাগুলিও মনোযোগের নির্ধারক, জৈবিক চাহিদাগুলির মধ্যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌন লিপ্সা ও মাতৃত্বই সবচেয়ে বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে।

[চার] **ভয়** (Fear): ভয়ের দ্বারা আমাদের মনোযোগ নির্ধারিত হয়। এর কারণ, আত্মরক্ষা ও যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি লাভ। যে সাপকে ভয় করে সব জায়গাতেই তার মনোযোগ থাকে সাপের দিকে।

[পাঁচ] **কৌতূহল** (Curiosity): অ্যারিস্টটল বলেছেন—All

men by nature desire to know. নতুনকে জানার আগ্রহ, নতুন কিছু সৃষ্টি করার স্পৃহা ইত্যাদি কৌতুহলের জন্ত সব সময় আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

[ছয়] **মানসিক প্রেষণা** (Social motives): মানুষের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রেষণা মনোযোগের একটি প্রধান কারণ। মানুষ নিজে সামাজিক প্রাণী বলে যেখানে সে সামাজিকতার সামান্ত আভাষ পায়, সেখানেই দৃষ্টি দেয়। বিজ্ঞাপনদাতারা এইজন্ত বিজ্ঞাপনে মানুষের ছবি দিয়ে থাকেন—যাতে মানুষ মানুষের দিকেই নজর দেয়।

[সাত] **প্রক্ষোভ** (Emotion): প্রক্ষোভও মনোযোগ নির্ধারিত করে দেয়। যা ভালো লাগে, তার দিকে মনোযোগ দিই ; যা ভালো লাগে না তা এড়িয়ে চলি। যাকে ভালবাসি, তার গুণগুলি চোখে পড়ে, আর যাকে অপছন্দ করি, তার দোষগুলিই নজরে পড়ে।

[আট] **অভিজ্ঞতা** (Experience): অভিজ্ঞতার জন্ত মনোযোগ নির্ধারিত হয়। যে ব্যক্তি পূর্বে কোন জায়গায় বেড়িয়ে এসেছেন তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতার জন্ত সেখানকার বিশেষ বিশেষ স্থান অত্যন্ত সহজে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

[নয়] **অভ্যাস ও শিক্ষা** (Habit and Education): মনোযোগ নির্ধারিত হয় অভ্যাস ও শিক্ষার দ্বারাও। ঘুম থেকে উঠেই আমার এক কাপ চা খাওয়ার অভ্যাস আছে। তাই ঘুম ভাঙলেই মনোযোগ দিই রান্নাঘরে—চা হচ্ছে কিনা দেখার জন্ত, তেমনি শিক্ষার জন্ত বৈজ্ঞানিক মনোযোগ দেন বিজ্ঞান-সম্পর্কীয় বিষয়ে, শিক্ষক মনোযোগ দেন শিক্ষা সম্পর্কীয় বিষয়ে ইত্যাদি।

[দশ] **মানসিক প্রবণতা** (Mental disposition): জন্মগত মানসিক প্রবণতাও মনোযোগের অন্ততম কারণ। যে শিল্পী তার মনোযোগ শিল্পকলার দিকে, যে দক্ষ গায়ক তার মনোযোগ সংগীতের দিকে, যে যন্ত্রবিদ্ তার মনোযোগ যন্ত্রপাতির দিকে। মনোযোগের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিণ নির্ধারকগুলির কথা এতক্ষণ আলোচনা করা হ'ল। এগুলি ছাড়াও মনোযোগ দেওয়ার কাজটি আবার দেহ, মন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। এগুলিকে আমরা মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করতে পারি—শারীরিক অবস্থা, মানসিক অবস্থা ও পরিপার্শ্বিক অবস্থা।

শারীরিক অবস্থা : শারীরিক অবস্থার মধ্যে আসে ইন্দ্রিয়ের কর্মক্ষমতা ও অবস্থান, শারীরিক সুস্থতা, দেহের অবস্থান ইত্যাদি। Dynamogenesis-এর সূত্র থেকে জানা যায় অনুকূল শারীরিক অবস্থান মনোযোগ সুদৃঢ় করে।

মানসিক অবস্থা : এর মধ্যে আসে মনের সুস্থতা, মনের পরিপুষ্টি ইত্যাদি। কোন একটা বিষয়ে মনোযোগ দিতে হলে তার জন্য মনের প্রস্তুতি যেমন প্রয়োজন, মনের পরিপুষ্টিও তেমন প্রয়োজন। যে ছেলে সবে লিখতে বা পড়তে শিখছে, তাকে শব্দ-কল্প-দ্রুম শেখান বা উচ্চাঙ্গ সাহিত্য পাঠ করালে তার মনোযোগ আকর্ষণ করা যাবে না।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা : পারিপার্শ্বিক অবস্থাও আবার মনোযোগের অন্যতম প্রধান কারণ। পড়ার সময় যদি চারপাশে খুব গোলমাল হতে থাকে, তবে পড়ায় মন দেওয়া যায় না। তেমনি অসহ্য গরম বা কন্‌কনে ঠাণ্ডা, আলো-বাতাসের অভাব ইত্যাদির জন্যও মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। অনেকের মতে পরিবেশটি একেবারে নিস্তব্ধ হলেও মনোযোগ দেওয়া কঠিন হয়। খুব সামান্য গোলমাল থাকলে মনোযোগ বেশী করে দেওয়া সম্ভব হয়।

মনোযোগের শ্রেণীবিভাগ (Types of attention) : মনোযোগের বিষয়বস্তু, স্থায়িত্ব, প্রকৃতি ইত্যাদির দিক থেকে পরীক্ষা করলে মনোযোগকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা—

[এক] **ইচ্ছাকৃত (Voluntary) :** যখন কোন উদ্দীপকের প্রতি আমরা ইচ্ছা ক'রে (অর্থাৎ জোর করে) মনোযোগ দিই, তখন তাকে বলা হয় ইচ্ছাকৃত মনোযোগ। এই জাতীয় মনোযোগ হ'ল স্বতঃপ্রসূত, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও সক্রিয়। এই জাতীয় মনোযোগের প্রয়োজন হয় তখনই যখন অপেক্ষাকৃত অধিকতর আকর্ষণীয় কোন উদ্দীপকের দাবী অগ্রাহ্য ক'রে কম আকর্ষণীয় উদ্দীপকের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়। বাইরে রেডিওতে গান চলছে, তবুও যখন কেউ নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে পরীক্ষার পড়াতে মন দেয়— তখনই ইচ্ছাকৃত মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে বলা যেতে পারে।

[দুই] **অনিচ্ছাকৃত (Non-voluntary) :** এ হ'ল স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা নিরপেক্ষ মনোযোগ। উদ্দীপক বা পরিস্থিতি নিজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে; এর জন্য আমাদের কোন চেষ্টা করতে হয় না। একে

নিষ্ক্রিয় মনোযোগও বলা হয়। যে কোন তীব্র উদ্দীপক যেমন জোর শব্দ, উজ্জ্বল আলো, তীব্র গন্ধ, অসহ্য ব্যথা ইত্যাদি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

[তিন] **অভ্যাসমূলক** (Habitual) : যখন মনোযোগ দেওয়াটা একটা অভ্যাসের পর্যায় চলে আসে, তখন তাকে অভ্যাসমূলক মনোযোগ বলে। উদ্দীপকের নিজস্ব কোন আকর্ষণ না থাকলেও ব্যক্তি কোনরূপ ইচ্ছা বা প্রয়াস ছাড়াই তাতে মনোযোগ দিচ্ছেন—এ হ'ল অভ্যাস-মূলক মনোযোগ। মোটর চালক হর্ণ শোনে, প্রুফ্-রীডার ভুল বানান লক্ষ্য করেন স্বাভাবিক ভাবেই—কোন চেষ্টা না করেই। এই জাতীয় মনোযোগের সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত মনোযোগের বেশ মিল আছে। তবে অনিচ্ছাকৃত মনোযোগের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের আকর্ষণীয় ক্ষমতা থাকে, অভ্যাসমূলক মনোযোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অভ্যাসটি থাকে। এমন অনেক বিষয় থাকে, যেগুলি মনোযোগ দিতে হ'লে প্রথম প্রথম ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন হ'ত। কিন্তু অভ্যাসে পরিণত হ'লে আর ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন হয় না। ইচ্ছাকৃত মনোযোগই পরবর্তিকালে অভ্যাসমূলক মনোযোগে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

[চার] **আরোপিত ও স্বাভাবিক** (Enforced and spontaneous) : অনিচ্ছাকৃত মনোযোগকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়—আরোপিত ও স্বাভাবিক। স্বাভাবিক অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ প্রবৃত্তি, সেন্টিমেন্ট ইত্যাদি থেকে সৃষ্ট হয়। স্বাভাবিক প্রবণতা থাকার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই তাতে আমরা মনোযোগ দিই। ক্ষুধা পেলে খাদ্যে, তৃষ্ণা পেলে জলে মনোযোগ দেওয়া এই জাতীয় মনোযোগ। কিন্তু উদ্দীপকের কোন বিশেষ গুণ বা তীব্রতার জন্য যখন তাতে মনোযোগ দেওয়া হয়, তখন তা হ'ল আরোপিত মনোযোগ। আমরা বেদনাদায়ক ঘটনা বা তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা ভুলি না। প্রায়ই তাতে আমরা মনোযোগ দিই বলে সেগুলি বার বার মনে আসে। এই মনোযোগ কিন্তু বাইরের থেকে চাপানো—সুতরাং আরোপিত।

[পাঁচ] **অবিভক্ত ও বিভক্ত** (Implicit and Explicit) : ইচ্ছাকৃত মনোযোগকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়—অবিভক্ত ও বিভক্ত। যখন মনোযোগ দেবার পশ্চাতে একটি মাত্র ও অবিভক্ত একটি ইচ্ছাশক্তির প্রভাব বর্তমান থাকে, তখন তা হ'ল অবিভক্ত মনোযোগ। কিন্তু যখন এই

মনোযোগটি বজায় রাখার জন্য বার বার একাধিক ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হয়, তখন তা হয়ে যায় বিভক্ত মনোযোগ। বিভক্ত মনোযোগের তুলনায় অবিভক্ত মনোযোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী ও অধিকতর কার্যকরী।

[ছয়] **তীব্র ও বিভাজক** (Intensive and Distributive) : যখন একটি বিশেষ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হয় এবং তার মাত্রাও বেশ তীব্র হয়, তখন তাকে তীব্র মনোযোগ বলা হয়। কিন্তু যখন অনেকগুলি বিষয়ে অল্প অল্প করে মনোযোগ দেওয়া হয়, তখন তাকে বিভাজক মনোযোগ বলে।

[সাত] **নিশ্চিত ও অনিশ্চিত** (Fixating and Fluctuating) : নিশ্চিত মনোযোগের ক্ষেত্রে যা দেখা হচ্ছে—সেইটিতে ঠিকমত মনোযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু অনিশ্চিত মনোযোগে কিছুটা কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়। যেমন হয়তো খবরের কাগজে লেখা আছে—জলে ডুবিয়া দুইটি যুবকের মৃত্যু—। নিশ্চিত মনোযোগ-বিশিষ্ট লোক ঠিক ঐ জিনিসই পড়বে। কিন্তু যাদের অনিশ্চিত মনোযোগ তারা পড়বে PSYCOHLOGY ? যুবকের মৃত্যু! কি লেখা আছে ?

[আট] **অটল ও সচল** (Static and Dynamic) : অটল মনোযোগে কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না বিষয়টি আয়ত্ত হয়, ততক্ষণ মনোযোগ থাকে। কিন্তু সচল মনোযোগের ক্ষেত্রে মনোযোগটি বার বার নষ্ট হয়, আবার জোর করে মনোযোগ আকর্ষণ করতে হয়।

[নয়] **বস্তুবিষয়ক ও ভাববিষয়ক** (Sensory and Ideational) : যখন কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর দিকে আমরা মনোযোগ দিই—তখন তাকে বস্তুবিষয়ক মনোযোগ বলা হয়। আর যখন কোন ধারণা, ভাব বা অনুভূতির প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়, তখন তাকে বলা হয় ভাববিষয়ক মনোযোগ।

[দশ] **প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ** (Direct and Indirect) : উদ্দীপকটি আকর্ষণীয় হলেই যখন তার দিকে মনোযোগ দিই, তখন তা প্রত্যক্ষ মনোযোগ। রাস্তায় চলতে চলতে একটি সুন্দর বাড়ী দেখলেই যদি তাতে মনোযোগ দিই—তবে তা প্রত্যক্ষ মনোযোগ। কিন্তু কম আকর্ষণীয় উদ্দীপক অন্য একটি আকর্ষণীয় উদ্দীপকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যখন মনোযোগ আকর্ষণ করে, তখন তা পরোক্ষ মনোযোগ। ছোট একটি ঘর হয়তো মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। কিন্তু যেই শুনলাম ঐ ঘরে একজন বিখ্যাত লোক বাস করেন—অমনি তা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল।

[এগার] **বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষণাত্মক** (Analytical and Synthetical): যখন কোন বিষয়কে সামগ্রিক ভাবে না দেখে তার পৃথক পৃথক অংশগুলি বিশ্লেষণ করে তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়, তখন তাকে বিশ্লেষণাত্মক মনোযোগ বলে। আবার যখন বিষয়টিকে সামগ্রিক ভাবে দেখে তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় তখন তাকে সংশ্লেষণাত্মক মনোযোগ বলে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই দু'রকমের মনোযোগ একই সঙ্গে কাজ করে।

[বার] **তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক** (Theoretical and Practical): যখন কেবলমাত্র তত্ত্বমূলক জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়, তখন তাকে তত্ত্বগত মনোযোগ বলে। নিছক জ্ঞান অর্জনের জন্য যে কোন প্রকার মনোযোগ এই জাতীয়। কিন্তু যখন কেবল তত্ত্বগত জ্ঞানই নয়, কার্যকরী ফল লাভ করার জন্য বা ব্যবহারিক দিকে প্রয়োগের জন্য মনোযোগ দেওয়া হয়, তখন তাকে ব্যবহারিক মনোযোগ বলা হয়।

শিশুর মনোযোগের বিকাশ (Development of attention in Children): শিশুর মনোযোগ বিকশিত হয় তিনটি স্তরের মাধ্যমে। প্রথম অবস্থাতে অর্থাৎ শৈশবে শিশুর মনোযোগ থাকে অনিচ্ছাকৃত। এই সময় উদ্দীপক নিজেই শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করে নেয়। শিশু নিজে ইচ্ছা করে কোন জিনিসে মনোযোগ দিতে পারে না। এই অবস্থায় শিশুকে এমন কোন বিষয় বা তথ্য শেখান উচিত নয় যাতে শিশুকে ইচ্ছাকৃত মনোযোগ দিতে হবে। তাকে এমন সমস্ত বিষয় শেখাতে হবে যাতে সে স্বাভাবিক ভাবে, ইচ্ছা প্রয়োগ না করেও মনোযোগী হতে পারে। রঙিন ছবি ও ছড়ার বই, খেলনা ইত্যাদি সহজেই শিশুর মনোযোগ কেড়ে নেয়। এইজন্য শৈশবকালে ঐ সমস্ত জিনিসের সাহায্যেই শিক্ষা দেওবা উচিত।

শিশু যখন আর একটু বড় হয়, তখন সে ইচ্ছাকৃত মনোযোগ দিতে সক্ষম হয়। যে সমস্ত বিষয়ে স্বাভাবিক ভাবে মনোযোগ যায় না বা যে সমস্ত বিষয় কম আকর্ষণীয়, এই স্তরে শিশু সে সমস্ত বিষয়েও ইচ্ছাকৃত ভাবে মনোযোগ দিতে পারে। ছাত্রজীবনে স্কুল-কলেজে পড়াশোনার ব্যাপারে নীরস বিষয়-বস্তু উপলব্ধি করার জন্য শিশু জোর করে মনোযোগ দিয়ে থাকে। এটা হ'ল মনোযোগের দ্বিতীয় অবস্থা।

তৃতীয় অবস্থাতে বা পরিণত বয়সে তার মধ্যে অভ্যাসমূলক মনোযোগ

দেখা যায়। অভ্যাসমূলক মনোযোগও স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগ। এককালে যে সমস্ত বিষয়ে তাকে জোর করে মনোযোগ দিতে হ'ত—এখন সে সমস্ত বিষয়ে সে বিনা চেষ্টাতে মনোযোগ দিতে পারে। উদ্দীপকটি তেমন আকর্ষনীয় না হ'লেও সে মনোযোগী হয়। মনোযোগী হওয়ার ব্যাপারটা অনেকটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম, বৃত্তি ও পেশার চাপে পারিবেশিক চাহিদা ইত্যাদি থেকেই নানাপ্রকার অভ্যাসমূলক মনোযোগের সৃষ্টি হয়।

আগ্রহ (Interest): মনোযোগের আভ্যন্তরিণ নির্ধারকগুলির কথা বলার সময় আগ্রহের কথা বলা হয়েছে। আমরা আমাদের চারপাশে যে সমস্ত লোক দেখতে পাই—ওরা আগ্রহ অনুযায়ী একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন দিক লক্ষ্য করে। ডায়মণ্ডহারবারে বেড়াতে এসে কেউ দেখেন হুগলী নদী, কেউ যান সাগরিকাতে, কেউ দেখেন মাছ ধরা ও মাছের কেনবেচা, কেউ যান কলেজে-স্কুলে তথ্য সংগ্রহ ক'রতে, আবার কেউ বা স্থানীয় লোকদের সঙ্গে আলাপ জমান। আসল কথা হ'ল—যার যে বিষয়ে আগ্রহ থাকে, সে সেই বিষয়েই আগ্রহ দেখায়। এখন প্রশ্ন হ'ল—আগ্রহের অর্থ কি? আগ্রহের অর্থ বিভিন্ন হতে পারে। **প্রথমতঃ**, আগ্রহ হ'ল বাইরের জগতের এমন একটা বস্তু যাতে ব্যক্তি আগ্রহ প্রকাশ করছে। **দ্বিতীয়তঃ**, আগ্রহ হ'ল একটা বিশেষ পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া যা মানুষের কাজের প্রকৃতিটি বুঝিয়ে দেয়। **তৃতীয়তঃ**, আগ্রহ হ'ল মনের একটা স্থায়ী প্রবণতা। ম্যাকৃডুগাল বলেন, আগ্রহ হ'ল সুপ্ত মনোযোগ (latent attention)। ড্রেভার বলেন, মনোভাবের গতিশীল অবস্থা হ'ল আগ্রহ। হার্বার্ট বলেন, নূতন জ্ঞান আহরণের জন্য মনের যে প্রস্তুতি, তাই হ'ল আগ্রহ। ডিউই-এর মতে ব্যক্তির বিকাশ প্রক্রিয়ার দিকে ব্যক্তি-সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত অগ্রগতিই হ'ল আগ্রহ। এর পর প্রশ্ন হ'তে পারে—আগ্রহের উৎস কি? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, আমাদের সমস্ত আগ্রহের প্রাথমিক উৎস হ'ল—আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি, প্রবণতা, তাড়না ইত্যাদি। আগ্রহ আবার দু'প্রকারের হতে পারে—(১) স্বাভাবিক বা প্রত্যক্ষ এবং (২) অর্জিত বা পরোক্ষ। স্বাভাবিক বা প্রত্যক্ষ মনোযোগ আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিগুলির উপর নির্ভরশীল। আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি আমাদের অনেক বিষয়ে আগ্রহী করে তোলে। যে সমস্ত আগ্রহ অভ্যাস, সেন্টিমেন্ট, কমপ্লেক্স

ইত্যাদি থেকে অর্জিত হয়, সেগুলিকে অর্জিত বা পরোক্ষ আগ্রহ বলে। এই জাতীয় আগ্রহ আমাদের অর্জিত মনোভাবের উপর নির্ভরশীল। এই অর্জিত আগ্রহও কিন্তু তার উদ্ভবের জন্য স্বাভাবিক আগ্রহের নিকট ঋণী। এগুলি অবশ্য বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। শিক্ষার সাহায্যেও ব্যক্তি নানাপ্রকার প্রবণতা অর্জন করে। এই প্রবণতাগুলিই তাকে আবার বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহী করে তোলে। এক কথায় বলা যেতে পারে মানুষের আগ্রহ তার অর্জিত প্রবণতা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

আগ্রহ ও মনোযোগ : আগ্রহের সঙ্গে মনোযোগের সম্পর্কটা কিরূপ? ম্যাক্‌ডুগাল বলেন, আগ্রহ হ'ল সুপ্ত মনোযোগ আর মনোযোগ হ'ল আগ্রহের সক্রিয় অবস্থা (Interest is latent attention and attention is interest in action)। এ কথাও বলা হয়েছে, যা ভিতরে আগ্রহ, তাই বাইরে মনোযোগ। কোন বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহই আমাদের সেই বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগী করে তুলতে পারে। আগ্রহ একটি বিশেষ মনোভাব—যার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, অনুভূতি ইত্যাদি সংযুক্ত থাকে। আগ্রহের জন্যই আমরা সক্রিয় হই। আগ্রহ আবার ক্ষণস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী দু'প্রকারের হ'তে পারে। কেবলমাত্র বি. টি. পাস করার জন্য পড়ার প্রতি যে আগ্রহ, তা হ'ল ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়ার প্রতি যে আগ্রহ তা হ'ল দীর্ঘস্থায়ী। এই আগ্রহ আবার অর্জিত ও জন্মগতও হয়—যার কথা আগেই বলা হয়েছে। আমাদের বিভিন্ন আগ্রহ সৃষ্টির জন্য জৈবিক চাহিদা, মানসিক চাহিদা, শিক্ষা, অভ্যাস, কৌতূহল, মনোভাব, অনুকরণ, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি কারণ হিসেবে কাজ করে। আগ্রহ একবার সৃষ্ট হয়ে গেলে তার থেকে একটি বিশেষধর্মী মানসিক সংগঠন তৈরী হয়ে যায়।

আগ্রহ ও মনোযোগ, উভয়ের প্রধান ও মৌলিক শর্ত হ'ল আমাদের সহজাত ও অর্জিত মনোভাব ও বিশেষ বিশেষ বস্তু কর্তৃক সৃষ্ট উত্তেজনা। অবশ্য ম্যাক্‌ডুগালের মতে এগুলিই যে মনোযোগের একমাত্র নির্ধারক, তা নয়। তেমনি সুখ বা দুঃখকেও আগ্রহের শর্ত বলা যেতে পারে। আবার আমাদের উদ্দেশ্যগুলিও আগ্রহের শর্ত।

মনোযোগের প্রধান ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শর্ত হ'ল আগ্রহ। স্টেভারের কথা আগেই বলেছি। তাঁর মতে আগ্রহ হ'ল মনোভাবের

গতিশীল অবস্থা। যে বিষয়বস্তু আমাদের মনে আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারে আমরা তাতেই মনোযোগ দিই। যে বিষয় আগ্রহ নির্ধারণ করবে, সে বিষয়ে মনোযোগও নির্ধারণ করবে। আবার মনোযোগ হ'ল নির্বাচনধর্মী। আমাদের আগ্রহই মনোযোগকে নির্বাচনধর্মী করে তোলে। অসংখ্য বিষয়-বস্তুর থেকে মাত্র দু-একটি বিষয় নির্বাচন করে আমরা তাতে মনোযোগ দিই। কিন্তু আমরা এমন বিষয়ই নির্বাচন করি—যার সঙ্গে আগ্রহ জড়িত আছে।

মনোযোগের উদ্দীপকের মনোযোগ আকর্ষণ করার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকলে মনোযোগ সহজেই আকৃষ্ট হয়। আবার আমরা ইচ্ছা করে যখন কোন কাজ করি, তখন আগ্রহই আমাদের মনোযোগ নির্ধারণ করে দেয়। মনোযোগের মাত্রা ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে আগ্রহের প্রকৃতির উপর। আগ্রহ যত বেশী হবে, মনোযোগও তত বেশী হবে। এভাবে দেখলে আগ্রহকে দীর্ঘস্থায়ী একটি মনোভাব বলা যেতে পারে।

ম্যাকডুগালের আগ্রহ ও মনোযোগ সম্বন্ধে অভিমতটি সব সময় যথার্থ নয়। আগ্রহ থাকলে মনোযোগ থাকবে ঠিকই. কিন্তু মনোযোগ থাকলেই যে সব সময় আগ্রহ থাকবে, এমন কোন কথা নেই। একমনে বই লিখছি। এতে আগ্রহ ও মনোযোগ দুই-ই রয়েছে। হঠাৎ বাইরে মন্দিরে খোল-করতাল সহ প্রবলবেগে হরিনাম সংকীর্তন শুরু হ'ল। বই লেখা থেকে মনোযোগ চলে গেল ঐদিকে অথচ কোন আগ্রহ ছিল না, এখনও নেই। প্রহারের ভয়ে ছেলে পড়াশুনাতে মনোযোগ দিচ্ছে, মাইনের লোভে কেরাণী তার হিসেবের খাতায় মনোযোগ দিচ্ছে—অথচ কোন ক্ষেত্রেই আগ্রহ নেই। অতএব একথা বলা যেতে পারে, **আগ্রহ থাকলেই মনোযোগ থাকবে; কিন্তু মনোযোগ থাকলেই সব সময় আগ্রহ থাকবে এমন নিশ্চয়তা নেই।**

শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহ ঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিছু শিখতে গেলে মনোযোগের প্রয়োজন। আবার আগ্রহ না থাকলে মনোযোগ দেওয়া সহজ হয় না। আগ্রহ ও মনোযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সেইজন্যই শিক্ষার সঙ্গে আগ্রহের সম্পর্কও অত্যন্ত নিবিড়। প্রত্যেক শিক্ষাবিদ্ শিশুর আগ্রহের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা আগ্রহকেই শিক্ষার শুরু ও শেষ বলে বর্ণনা করেছেন।

শিশুদের আগ্রহের মনস্তত্ত্বই শিক্ষাতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। ব্যবহারিক দিক্ থেকে দেখলে, শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ কিভাবে সঞ্চার করা হবে—তা নির্ণয় করাই হ'ল শিক্ষার কাজ। শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করে গড়ে তোলাটা হ'ল আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার থেকেই বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ এই নীতিটির উপর জোর দিয়ে আসছেন। হার্বার্ট বলছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করাই হ'ল শিক্ষকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। ডিউই বলেন, ব্যক্তির বাঞ্ছিত ক্রমবিকাশের পথে ব্যক্তি-সত্তার স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এগিয়ে যাওয়ার নামই হ'ল আগ্রহ। এই আগ্রহই হ'ল শিক্ষাব্যবস্থার পথ প্রদর্শক ও নিয়ন্ত্রণকারী। তিনি বলেন, শিশুর মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা যায় না; আগ্রহ আপনা আপনি সৃষ্ট হয় কারণ তা হ'ল ব্যক্তি-সত্তার বিকাশ লাভের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা। শিক্ষক এই আগ্রহকে ঠিকপথে পরিচালিত করতে পারেন মাত্র।

আগ্রহের জন্যই আমরা কাজে সক্রিয়তা ও উদ্দীপনা অনুভব করতে পারি। কোন কাজে আগ্রহ থাকলে সে কাজটি না করে আমরা থাকতে পারি না। আগ্রহই শিক্ষার লক্ষ্য ও উপায় নির্ধারণ করে দেয়। শিক্ষার্থীর নিকট আগ্রহ হ'ল উপায়, কারণ আগ্রহ থাকলেই বিষয়বস্তু যত কঠিনই হোক না কেন, সে মনোযোগ দেবেই। শিক্ষকের নিকট আগ্রহ হ'ল লক্ষ্য কারণ শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করে দিতে পারলেই শিক্ষার্থী নিজে নিজে মনোযোগ দিতে পারবে।

শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করে গড়ে তুলতে হ'লে তাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। কিন্তু অনেকে এই আকর্ষণীয় করে তোলাটার ভুল অর্থ করে থাকেন। তাঁরা মনে করেন, আকর্ষণীয় করে তোলার অর্থ হ'ল পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে যা কঠিন বা শ্রমসাপেক্ষ তা বাদ দিতে হবে এবং তার বদলে সহজ ও চিত্তাকর্ষক বস্তু দিয়ে পাঠ্যবিষয়টি খাড়া করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে তাঁরা 'কোমল শিক্ষাব্যবস্থা' (soft pedagogy) বলে সমালোচনা করেন এবং বলেন ওই ধরনের শিক্ষানীতি শিক্ষার মানের বিশেষ অবনতি ঘটাবে এবং শিক্ষার্থীর চরিত্রের দৃঢ়তাকে ক্ষুণ্ণ করে তাকে অসহিষ্ণু ও অধৈর্য করে ফেলবে। তাঁদের বক্তব্য হ'ল শিক্ষা তো ভাবীজীবনেরই প্রস্তুতি মাত্র। ভাবীজীবনে অনেক বাধা-বিপত্তি, ঘাত-প্রতিঘাত আছে। বাস্তব অত্যন্ত রূঢ়। কাজেই তাকে কঠোর সংগ্রামী জীবনের সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলতে

হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকেও এইজন্য কোমল না করে গড়ে তুলতে হবে। কঠোর শাসন, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও নিয়ম নিষ্ঠার মধ্য দিয়েই শিশুর বিদ্যালয় জীবনের শিক্ষা চলবে। বিদ্যালয় জীবনেই সে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।

যাঁরা শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে গড়ে তুলতে চান তাঁরা কিন্তু এই অভিমত সমর্থন করেন না। তাঁরা নিজেদের পক্ষে যথেষ্ট যুক্ত দেখিয়েছেন। তাঁরা বলেন শিক্ষা কেবলমাত্র 'ভাবীজীবনের প্রস্তুতি' নয়—শিক্ষাই জীবন!' খেলার মধ্যে, স্বাধীন ভাবে কাজ করার মধ্যে, সংগঠনের মধ্যে বা কোন কিছু আবিষ্কার করার মধ্যে শিশুরা যে আনন্দ পায়, ঠিক সেই রকম আনন্দটি বিদ্যালয়ে পায় না। শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে তোলার অর্থ হ'ল ঐ রকম আনন্দ দানের বা লাভের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের মধ্যে সৃষ্টি করা। ঐ জাতীয় আনন্দ আগ্রহভিত্তিক। শিক্ষা ও শিক্ষণের ক্ষেত্রে ঐ আগ্রহের যথেষ্ট মূল্য আছে। তাঁদের অভিমত হ'ল শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করার অর্থ এই নয় যে, শিক্ষার মান অবনত করে দেওয়া হবে বা কঠিন বিষয়গুলি পাঠ্যসূচী থেকে বাদ দিতে হবে। এর প্রকৃত অর্থ হ'ল—শিক্ষণীয় বিষয়টির প্রকৃতি যেমনই হোক না কেন—তা শেখার জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে যেন স্বাভাবিক উদ্যম, ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা থাকে। শিক্ষার্থীকে ভয় দেখিয়েও কিছু শিখতে বাধ্য করা যেতে পারে; কিন্তু সেক্ষেত্রে তার স্বাভাবিক উদ্যম ও প্রচেষ্টা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। শিশুর মধ্যে একবার আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারলে বিষয়বস্তুটি যতই কঠিন হোক না কেন, শিশু সহজেই তা গ্রহণ করবে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, বিষয়টি যেন শিশুর মানসিক ক্ষমতার উপযোগী হয়।

তাহ'লে আমরা দু'রকমের অভিমত পেলাম। একদল বলছেন, 'কোমল শিক্ষাব্যবস্থা' শিশুর নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক উভয় দিক থেকেই অনুপযোগী। আর একদল বলছেন, শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে পাঠ্যবিষয়টিকে বিরক্তিকর ও ক্লান্তিকর করে তোলা মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক দিক থেকে অনুচিত। তবে দুটি অভিমতই একটি ভুল ধারণার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। দু'দলই মনে করছেন আগ্রহ ও প্রচেষ্টা পরস্পর বিরোধী। আগ্রহ পাঠ্যবিষয়ের কোন গুণ নয়; এ হ'ল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত একটি বিশেষ গুণ। শিক্ষার মূল কথা আগ্রহ সৃষ্টি করা নয়; শিশুর মধ্যে যে আগ্রহ

আছে, তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করাই শিক্ষার লক্ষ্য। পাঠ্যবিষয়টিকে আকর্ষণীয় করার অর্থ বিষয়টিকে সহজ সরল করা নয়, শিশুর আগ্রহ জাগিয়ে তোলা ও বিষয়টির প্রতি তার মনোযোগ চালিত করাই হ'ল এর অর্থ। আগ্রহ থাকলেই প্রচেষ্টা থাকবে; প্রচেষ্টা জন্মায় আগ্রহ থেকেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আগ্রহ ও প্রচেষ্টাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে পরিচালিত করা। আগ্রহের মূল উদ্দেশ্য হ'ল সক্রিয়তা ও কর্মপ্রচেষ্টা। প্রচেষ্টার সঙ্গে কোন কাজ শুরু করলে তার থেকেই আগ্রহ সঞ্চারিত হয়। আমরা তখনই আনন্দ লাভ করি যখন আমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়। এই আনন্দ থেকেই শিশু অনুপ্রেরণা লাভ করে ও নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে দেয়। ফলে তার মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়। তার জন্য বলা যেতে পারে আগ্রহ ও প্রচেষ্টা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্যই করে, বিরোধিতা করে না।

অনেকে বাহ্যিক উদ্বোধকের সাহায্যে শিশুর মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। এটা কিন্তু সুফলপ্রসূ নয়। এই জাতীয় আগ্রহ ক্ষণস্থায়ী। যতক্ষণ উদ্বোধক থাকে, ততক্ষণ আগ্রহ থাকে। কিন্তু উদ্বোধক নষ্ট হয়ে গেলেই আগ্রহটিও নষ্ট হয়ে যায়। পাঠ্যবিষয়ে যাতে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহের সৃষ্টি হয়, সেদিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে।

চাহিদা-বোধ থেকেও আগ্রহ জন্মায়। যে বস্তু সম্বন্ধে ব্যক্তির মধ্যে চাহিদার সৃষ্টি হয়, তা অর্জন করার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই তার মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক আগ্রহ উদ্বোধক নিরপেক্ষ। এই জাতীয় আগ্রহ সৃষ্টি করতে হ'লে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পাঠ্যবিষয়ের প্রতি শিশুর স্বাভাবিক ও প্রকৃত চাহিদার উদ্ভব হয়। এতদিন পর্যন্ত বয়স্কদের চাহিদা অনুযায়ী শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে তা ঠিক আগ্রহভিত্তিক ছিল না। কিন্তু বর্তমানে পাঠ্যবিষয় নির্ধারিত করা হয় শিশুর চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে। সেক্ষেত্রে শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করে গড়ে তোলা খুব কঠিন হয় না। তাছাড়া শিক্ষার পদ্ধতি, শৃঙ্খলা, স্বাধীনতা ইত্যাদিও শিশুর চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এইজন্যই শিশু তার পাঠ্যবিষয়ে স্বাভাবিক আগ্রহ দেখায় ও অত্যন্ত সহজেই পাঠ্যবিষয়টি আয়ত্ত করতে পারে।

তাহ'লে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, কোন বিষয়ের প্রতি শিশুর মনোযোগ আকৃষ্ট করতে হলে তার মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করতে হবে;

শিক্ষককে জানতে হবে কোন বয়সে কি জাতীয় আগ্রহ সৃষ্টি করা যেতে পারে এবং কোন একটি বিষয়ে বার বার শিশুর মনোযোগ আকৃষ্ট করে অত্যন্ত নীরস বিষয়বস্তুকেও সরস করা সম্ভব।

কিভাবে আগ্রহ ও মনোযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে? আমরা একটু আগেই আলোচনা করেছি যে আগ্রহ ও মনোযোগের মধ্যে একটা অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। কোন একটি বিষয়ে শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করতে হলে সেই বিষয়টি তার নিকট আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। আকর্ষণীয় করে তোলার অর্থ হ'ল—তার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। এখন প্রশ্ন হ'ল কিভাবে শিশুর মধ্যে আগ্রহ ও মনোযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে? এর জন্য কতকগুলি পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল—

[এক] বর্তমান শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুই হ'ল শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। শিশুর বয়স, তার মানসিক ক্ষমতা, রুচি, প্রবণতা, আগ্রহ প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ্যবিষয়টি নির্বাচিত করা উচিত। এই প্রসঙ্গে শিক্ষককে মনে রাখতে হবে শিশুর আগ্রহ স্থির ও নির্দিষ্ট নয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহের প্রকৃতি ও পরিমাণের তারতম্য ঘটে। শিশুর আগ্রহ যতদিন পর্যন্ত না আপনা আপনি সৃষ্ট হয়, ততদিন শিক্ষককে ধীরে ধীরে বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে তার মধ্যে আগ্রহ সঞ্চারিত করে যেতে হবে।

[দুই] 'কেন শিখছি?' বা শিখে কি লাভ হবে?' এ জাতীয় প্রশ্নের সদুত্তর না পেলে শিক্ষার্থী আগ্রহ অনুভব করতে পারে না। কাজেই আগ্রহ সৃষ্টি করতে হ'লে শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের একটা সুস্পষ্ট ছবি তার সামনে উপস্থাপিত করতে হবে। লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতনতা শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করে এবং তখনই বিষয়টি শেখার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই আগ্রহ প্রকাশ করে।

[তিন] বিষয়বস্তু খুব কঠিন হ'লে শিশুর পক্ষে আগ্রহ সঞ্চার করা একটু কঠিন হয়। প্রথম অবস্থাতে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সহজ ও সরল হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া শিক্ষাদান কালে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শিশুরা জানা থেকে অজানা বিষয়ে সহজে যেতে পারে। অর্থাৎ নতুন বিষয় কিছু শেখাতে হ'লে অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে হবে।

[চার] শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শ্রেণীকক্ষে একঘেয়েমী বা বৈচিত্র্যহীনতা না আসে কারণ বৈচিত্র্যহীনতা আগ্রহ নষ্ট করে দেয়।

বৈচিত্র্য হ'ল আগ্রহের রক্ষাকবচ। বিষয়বস্তুটি বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করলে, নূতন রূপে তা শিক্ষার্থীর সম্মুখে উপস্থাপিত করলে বা শিশুর কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগালে বৈচিত্র্যহীনতা দূর করা যায়।

[পাঁচ] শিক্ষকের মনোভাবও আগ্রহ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। তাঁর ব্যক্তিত্ব, চেহারা, সাজপোশাক, কথা-বার্তা, আচার আচরণ ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সঞ্চারের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। যে শিক্ষক বেশ খুশী, খুশী ভাবে ও হাসি হাসি মুখে আগ্রহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে শিক্ষা দেন—তাঁর শ্রেণীতে মনোযোগ সব সময়ই থাকে। কিন্তু রুক্ষ, বিষণ্ণ, বদমেজাজী ও অনুৎসাহী শিক্ষক কখনও আগ্রহ সঞ্চার করতে পারে না। অনেকে আগ্রহকে আমাদের সচেতন জীবনের লক্ষণ বলে বর্ণনা করেছেন। আগ্রহ আবার সংক্রামকও বটে। কাজেই একবার শ্রেণীকক্ষে আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারলে শিক্ষাদানের কাজটি অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়।

[ছয়] শিশুর সহজাত আগ্রহ উদ্দীপিত করতে পারলে তাদের পক্ষে মনোযোগ দেওয়া সহজ হয়। প্রথম অবস্থাতে তাদের আগ্রহ হ'ল সহজাত। কাজেই কৌতূহল, সৃজন, সংগঠন ইত্যাদি সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে তাদের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করতে হবে।

[সাত] শিক্ষণীয় বিষয়কে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে পাঠ্য-বিষয়ের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের সংযোগ স্থাপন করতে হবে। শিশুদের বুঝতে দিতে হবে যে জ্ঞান কেবলমাত্র পুস্তকের পৃষ্ঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে সেই জ্ঞানের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগই হ'ল প্রকৃত শিক্ষা।

এছাড়া মনোযোগ আকর্ষণ করার আরো কতকগুলি উপায় আছে। যেমন,

(ক) শান্তি পরিবেশ,

(খ) শিক্ষকের স্নেহময় ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার,

(গ) খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা,

(ঘ) উপযুক্ত অবসর ও বিশ্রামের ব্যবস্থা,

(ঙ) কর্ম-ভিত্তিক শিক্ষা-ব্যবস্থা,

(চ) বিষয়ের পরিবর্তন

(ছ) উপযুক্ত শারীরিক অবস্থা,

(জ) নির্দিষ্ট পাঠ-টীকা

(ঝ) দৃষ্টি ও শ্রুতি নির্ভর প্রদীপনের ব্যবহার ইত্যাদি।

অমনোযোগ ও বিকর্ষক (Inattention and Distractor): মনোযোগের বিপরীত হ'ল অমনোযোগ। আমরা সাধারণ অর্থে মনোযোগের অভাবকেই অমনোযোগ বলে থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ অমনোযোগী হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আমরা সব সময় কোন না কোন জিনিসে মনোযোগ দিয়েই আছি। যে একসঙ্গে একাধিক বিষয়ে বা জিনিসে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। যে জিনিসে মনোযোগ দেওয়া উচিত বা প্রয়োজন, সেই জিনিসটিতে মনোযোগ না দিয়ে যখন অন্য কোন জিনিসে মনোযোগ দেওয়া হয়, তখনই তাকে অমনোযোগ বলা হয়। কাজেই অমনোযোগের অর্থ হ'ল—স্বল্প মাত্রায় বা কম মনোযোগ দেওয়া বা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া। যে ছেলে শ্রেণীতে বসে 'আকাশে দেখিয়া ঘুড়ি, মন তার যায় উড়ি'—সেই অমনোযোগী। শ্রেণীতে তার মনোযোগ নেই, আছে অন্য কোথাও।

আমরা যতক্ষণ জেগে থাকি, ততক্ষণ কোন না কোন জিনিসে মনোযোগ দিচ্ছি। কিন্তু ঘুমের মধ্যে বা মূর্ছিত অবস্থায় সম্পূর্ণ অমনোযোগী হওয়া হয়তো সম্ভব। শিশুরা স্বভাব-চঞ্চল। তাদের ক্ষেত্রে মনোযোগ অত্যন্ত দ্রুত, এক বিষয় থেকে আর এক বিষয়ে ধাবিত হয়। তাই আমরা তাদের বলি অমনোযোগী যদিও তা বলা ঠিক নয়। শুনতে হয়তো আশ্চর্য লাগবে অমনযোগ কিন্তু মনোযোগের সহায়ক। কোন একটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হ'লে অন্য একটি বিষয় থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। কাজেই একটি বিশেষ মনোযোগই হ'ল অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে অমনোযোগ।

কিন্তু একটি বিষয়ে যখন মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে তখন সেই মনোযোগটিই কি সব সময় বজায় রাখা সম্ভব ? ঘরে বসে পরীক্ষার পড়া তৈরী করার সময় যদি পাশের বাড়ীতে বিয়ে বাড়ীর হৈ-চৈ হয় বা মাইকে গান বাজে, তবে মনোযোগ থাকে কি ? প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এমন কিছু জিনিস থাকে, যা হয় মনোযোগ নষ্ট করে দেয়, কিংবা মনোযোগের পথে বাধার সৃষ্টি করে। এগুলিকেই **বিকর্ষক** বলে। আগেই বলা হয়েছে মনোযোগের বিষয়টি থাকে চেতনার কেন্দ্রস্থলে। বিকর্ষকগুলি কেন্দ্রস্থল থেকে সেই জিনিসটি সরিয়ে দিয়ে নিজেরা সেই স্থানটি দখল করে নেয়।

বিকর্ষকগুলির সাধারণ ও বিশেষ—এই দু'রকম ধর্ম থাকতে পারে। যে বিকর্ষক সকলের মনোযোগ নষ্ট করে, সেগুলি সাধারণধর্মী। কিন্তু যে

বিকর্ষক বিশেষ বিশেষ লোকের মনোযোগ নষ্ট করে, সেগুলি বিশেষধর্মী। বিকর্ষক অনেক রকমের হ'তে পারে, যেমন—প্রেষণার অভাব, অন্য কোন তীব্র প্রেষণার উপস্থিতি, তীব্র কোন উদ্দীপক, অসন্তোষজনক শারীরিক অবস্থা, দুর্বল বা রুগ্ন শরীর, ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা ও অমীমাংসীত সমস্যা, অতৃপ্ত বাসনা ইত্যাদি। মনোযোগের উপর বিকর্ষকের প্রভাব নির্ধারণ করার জন্য মনোবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন পরীক্ষা করেছেন। দেখা গেছে বিকর্ষক যদি খুব তীব্র না হয়, তবে মনোযোগ দেওয়ার কাজটি বরং ভালো হয়। একেবারে শান্ত পরিবেশের চেয়ে কিছুটা গোলমাল মনোযোগের সহায়ক। কারণ শান্ত পরিবেশে মনোযোগের প্রতিযোগী কেউ থাকে না। কিন্তু গোলমালের মধ্যে মনোযোগের একটা প্রতিযোগী রয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে অধিকতর ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে বিষয়বস্তুর উপর মনটি নিবিষ্ট রাখা হয় বলে মনোযোগ ভালো হয়। অবশ্য এই প্রতিযোগিতা বেড়ে গেলে মনোযোগ ব্যাহত হবে। তাছাড়া তীব্র বিকর্ষকের বিরুদ্ধে বার বার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করলে মানসিক শক্তির অপচয় ঘটে এবং ক্লান্তি আসে।

মনোযোগ অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লে এই বিকর্ষকগুলি এড়িয়ে চলতে হবে। এর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। কতকগুলি পদ্ধতির কথা আলোচনা করা হ'ল—

(ক) বিকর্ষককে সহ্য করার মত একটা ক্ষমতা অর্জন করে নিতে হবে। এটা হ'ল এক ধরনের সঙ্গতি বিধান। প্রথম যখন আমার নতুন বাড়িতে এলাম, তখন সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির পাশে মন্দিরের খোল-করতালের শব্দে মনোযোগ ব্যাহত হ'ত। কিন্তু ধীরে ধীরে সেটা গা সওয়া হয়ে গেছে। এখন একদিন খোল-করতাল না বাজলে বরং সেইদিকেই মনোযোগ যায়।

(খ) বিকর্ষক খুব তীব্র হ'লে পরিবেশের পরিবর্তন করা উচিত। বিকর্ষকের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারলে তার সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত নয় কারণ তাতে মানসিক শক্তির অপচয়ই হয়।

(গ) দুশ্চিন্তা ও অমীমাংসীত সমস্যা মনোযোগের একটা মস্ত বড় বাধা। ডেপুটেশনের টাকা এখনও পাওয়া যায়নি, দেশে পরিবারবর্গের নিকট টাকা পাঠাতে হবে। বই খুলে বসলেই এই চিন্তা মাথায় আসে বলেই তো আর পড়ায় মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। এই জন্যেই শিশুদের চেয়ে বয়স্কদের

পক্ষে মনোযোগ দেওয়াটা অপেক্ষাকৃত কঠিন। সে ক্ষেত্রে দুশ্চিন্তার অবসান ঘটানোর মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) অতৃপ্ত বাসনাও মনোযোগের একটি বিকর্ষক। পড়তে বসলাম, কিন্তু ইচ্ছে হচ্ছিল একবার নদীর ধারে সাগরিকা'র সামনে ঘুরে আসার। কিংবা হয়তো সিনেমাতে একটা ভালো ছবি হচ্ছে। অথচ পরীক্ষারও আর বেশী দেরী নেই। সে ক্ষেত্রে মনের মধ্যে একটা দোটানাব ভাব দেখা দেবে যেটা থাকলে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। যখন মনের মধ্যে একাধিক বাসনা থাকে, তখন ঠিক করে নিতে হবে কোন বাসনাটির আগে তৃপ্ত হওয়া প্রয়োজন।

(ঙ) খুব ঠাণ্ডা বা খুব গরম ঘর, অপ্রচুর আলো, আরামবিহীন বসার-ব্যবস্থাও মনোযোগের বিকর্ষক। এগুলি দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

(চ) প্রেষণার অভাব মনোযোগের সবচেয়ে বড় বাধা। যে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, তার প্রতি যদি আগ্রহ না থাকে, তবে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। অনেক সময় ব্যক্তির চাহিদার সঙ্গে মনোযোগের বিষয়বস্তুর কোন মিল থাকে না বলে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্বাচনে এই 'চাওয়া-পাওয়ার' প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। আর চাওয়া পাওয়ার মধ্যে যদি ভুল হয়েই থাকে তবে যা পেলাম সেইটিকেই অপরিবর্তনীয় মনে করে নিজের 'চাওয়ার' জিনিস মনে করে নিতে হবে। ইচ্ছে ছিল বড় চাকুরী করার। কিন্তু এসে গেলাম শিক্ষকতাতে। এখন ঐ শিক্ষকতাকেই আমার চাওয়া বড় চাকুরী মনে করে নিতে পারলে তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া সহজ হয়ে যাবে।

যে সমস্ত লোক আগের থেকে একটা পরিকল্পনা করে নিয়ে কাজ করেন, তাদের পক্ষে কাজে মনোযোগ দেওয়া সহজ হয়। তাছাড়া সতর্ক দৃষ্টি, আশাজনক মনোভাব, উৎসাহ ও উদ্দীপনা, আত্মবিশ্বাস, সপ্রতিভতা ইত্যাদি মনোযোগের অনেক বিকর্ষককে ঠেকিয়ে রাখতে পারে।

মনোযোগের পরিসর (Span of attention): আমাদের মনোযোগের ক্ষেত্রটি সীমাবদ্ধ। কোন একটি পরিবেশের মধ্যে যা কিছু আছে, তার সবগুলিতেই আমরা একসঙ্গে মনোযোগ দিতে পারি না—মাত্র কয়েকটিতে মনোযোগ দিয়ে থাকি। একই সঙ্গে যে কয়টি বস্তুর প্রতি মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে সেগুলি নিয়েই মনোযোগের ক্ষেত্র

বা পরিসরটি নির্ধারিত হয়। আমাদের চোখের সামনে খুব কম সময়ের জন্য যদি কতকগুলি জিনিস উপস্থাপিত করা হয়, তাহ'লে আমরা একসঙ্গে তার সবগুলিতে মনোযোগ দিতে পারি না। এর একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত হ'ল—সিনেমার পর্দা। তাতে যখন বিভিন্ন নাম খুব কম সময়ের জন্য আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে, তখন সব নাম আমরা পড়তে পারি না। মনে হয়, নামগুলি যেন আরো কিছুক্ষণ থাকলে ভালো হ'ত।

মনোযোগের পরিসর মাপ করা হয় Tachistoscope নামক যন্ত্রের সাহায্যে। গ্রীক ভাষায় Tachistos কথাটির অর্থ হ'ল 'ক্ষিপ্র' এবং Skope কথার অর্থ হ'ল—দেখা বা দর্শন। এই যন্ত্রটিতে একটি বড় ছিদ্রের মধ্য দিয়ে খুব কম সময়ের জন্য (এক সেকেণ্ডেরও কম) ব্যক্তির সামনে একসঙ্গে অনেকগুলি একই রকমের জিনিস (বিন্দু, রেখা, বর্ণ, সংখ্যা, শব্দ, ছবি) তুলে ধরা হয়— সেই বস্তুগুলিকে ঐ অল্প সময়ের জন্য দেখেই ব্যক্তিকে বলতে হয়—সে কটি বস্তু দেখেছে। পরীক্ষণটি এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়, যাতে ব্যক্তি একবারের বেশী দু'বার মনোযোগ না দিতে পারে। সে যে ক'টি বস্তু দেখতে পাবে—তা হবে তার মনোযোগের পরিসর। খুব অল্প সময়ের মধ্যে জিনিসগুলি দেখতে দেওয়ার কারণ হ'ল—যেন একবারের বেশী সেগুলি দেখা সম্ভব না হয় এবং যে ক'টি জিনিস দেখা যাচ্ছে, চোখ ফিরিয়ে তার চেয়ে বেশী জিনিস দেখার সময় যেন না পাওয়া যায়। আলোকিত জিনিসের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে যাওয়া হয় এবং দেখা হয় সর্বোচ্চ কত সংখ্যার জিনিসে ব্যক্তি একবার মাত্র মনোযোগ দিয়ে নির্ভুল ভাবে দেখতে পায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বিভিন্ন রকম জিনিসের ক্ষেত্রে মনোযোগের পরিসরটি বিভিন্ন হয়। আবার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও পরিসরটি ভিন্ন। আবার একই জিনিসে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই ব্যক্তির পরিসর ভিন্ন হতে পারে। বিভিন্ন পরীক্ষার গড় নির্ণয় করে দেখা গেছে যে, যে সমস্ত জিনিসে মনোযোগ দিতে হবে, সেগুলি যদি যেমন তেমন করে আমাদের সামনে ছড়ানো থাকে, তবে একসঙ্গে পাঁচ-ছটির বেশী জিনিসে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু যদি সেগুলি একটা সুনির্দিষ্ট আকারে সাজানো থাকে, তবে একসঙ্গে অনেক জিনিসে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব। যেমন, কতকগুলো অক্ষর যদি এলোমেলো ভাবে ছড়ানো থাকে, তবে চার পাঁচটির বেশী অক্ষরে মনোযোগ দেওয়া যাবে না;

কিন্তু যদি অক্ষরগুলি একটা অর্থপূর্ণ শব্দের আকারে সাজানো থাকে, তবে অনেক বেশী অক্ষরে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব।

মনোযোগের বিচলন বা অস্থিরতা (Fluctuation of Attention): মনোযোগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল—যে কোন একটি বিশেষ বিষয়ে মনোযোগ অধিকক্ষণ থাকে না। মনোযোগ অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির। অবিচ্ছিন্ন মনোযোগ খুব অল্পক্ষণের জন্যই সম্ভব। আমাদের মন সব সময় চঞ্চল প্রজাপতির মত এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে বারে বারে ধাবিত হয়। কোন একটি বিষয়ে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলে দেখা যাবে যে মনোযোগ বার বার সেই বিষয় থেকে অন্যত্র চলে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। একটা কাজ করতে করতে ব্যক্তি বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। অন্যমনস্ক হওয়ার অর্থ অমনোযোগী হওয়া নয়, অন্য জিনিসে মনোযোগ দেওয়া। মনোযোগের এই জাতীয় আচরণকে অর্থাৎ বার বার চলে যাওয়া ও ফিরে আসাকে মনোযোগের বিচলন বা অস্থিরতা বলে। পরীক্ষাগারে পরিবেশকে যথাসাধ্য নিয়ন্ত্রণ করে দেখা গেছে সচরাচর চার পাঁচ সেকেণ্ড পর পর মনোযোগ বিচলিত হয়। খুব সহজেই এই বিচলনের পরীক্ষা করা সম্ভব। বিচলন পরিমাপ করতে হলে ক্ষুদ্রতম উদ্দীপক নিতে হয়। ক্ষুদ্রতম উদ্দীপকের অর্থ হ'ল উদ্দীপকটি এত ক্ষুদ্র যে তার চেয়ে ক্ষুদ্র হ'লেই তা আমাদের প্রত্যক্ষণের বাইরে চলে যাবে। আমাদের কাছ থেকে একটু দূরে একটা টেবিলের উপর একটা টেব্‌ল ঘড়ি রাখা হ'ল। ঘড়িটি এমন জায়গায় রাখা হ'ল যেখান থেকে খুব ক্ষীণভাবে ঘড়িটির টিক্ টিক্ শব্দ শোনা যায়। ঘড়িটির দিকে কান পেতে রাখলে মনে হবে শব্দটি মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে আবার মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে না। ঘড়ির গতি ঠিক থাকা সত্ত্বেও মনোযোগের বিচলনের জন্যই এরূপ ঘটনা ঘটছে।

আবার ম্যাসন ডিস্কের (Masson Disc)-এর সাহায্যেও নিখুঁত ভাবে মনোযোগের বিচলন মাপ করা সম্ভব। ম্যাসন ডিস্ক হ'ল একটি গোলাকার সাদা চাকা। চাকার একটি ব্যাসার্ধের উপর একটা মোটা কালো দাগ টানা থাকে। এই কালো দাগটির উপর আবার মাঝে মাঝে সাদা দাগ দেওয়া থাকে। একটা ইলেক্ট্রিক মটরের উপর চাকাটি বসানো থাকে। যন্ত্রের সাহায্যে চাকাটিকে ঘোরালে কালো দাগটি অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তার বদলে চাকার উপর কয়েকটি ধূসর বৃত্ত দেখা যায়। অন্য দিকে আবার আর একটি

যন্ত্রের উপর একটা গোলাকৃতি ড্রাম ঘোরে—যার গায়ে লাগানো থাকে একটি ধূমায়িত (Smoked) কাগজ। এই যন্ত্রের নাম হ'ল কিমোগ্রাফ্ (Kymograph)। পরীক্ষার্থীর হাতের কাছে একটি চাবি থাকে। চাবির সঙ্গে একটি স্টাইলাস বা লোহার কলম সংযুক্ত থাকে। চাবিটি টিপলেই স্টাইলাসটি সচল হয়ে উঠে এবং ধূমায়িত কাগজের উপর দাগ কেটে থাকে। অভীক্ষার্থীকে ম্যাসন ডিস্কের বাইরের দিকের বৃত্তটিতে মনোযোগ দিতে বলা হয়। সে লক্ষ্য করবে, বৃত্তটি একবার দেখা যাচ্ছে আবার এক একবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তার অর্থ হ'ল, অভীক্ষার্থীর মনোযোগ কিছুক্ষণ থাকছে না। প্রয়োজন মত চাবিটি টিপে এবং ছেড়ে দিয়ে বৃত্তটির আবির্ভাব ও অদৃশ্য হওয়ার একটা নিখুঁত চিত্র কিমোগ্রাফ্‌টির উপর আঁকা হয়। দেখা গেছে এই জাতীয় দৃষ্টি-নির্ভর উদ্দীপকে ৫।৬ সেকেণ্ডের বেশী মনোযোগ থাকে না।

মনোযোগের বিদোলন (Oscillation of Attention): আমাদের সামনে যদি দু'টি সমান বা প্রায় সমান শক্তিসম্পন্ন উদ্দীপক থাকে, তবে মনোযোগ সেই দুটি উদ্দীপকের মধ্যে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত ঘোরাফেরা করে। এই জাতীয় ঘটনাকে বলে মনোযোগের বিদোলন। পরীক্ষার জন্য ঘরে বসে পড়া তৈরী করছি, আবার পাশের বাড়ীর রেডিওতে ভালো গান

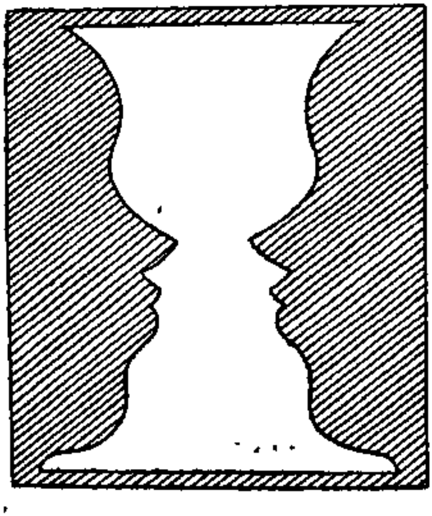

১ নং ছবি: Woodworth & Marquis-এর Psychology অনুসরণে

বাজছে। এক্ষেত্রে মনোযোগ একবার রেডিওতে আবার একবার বইয়ের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। কয়েকটি সহজ সহজ পরীক্ষার সাহায্যে মনোযোগের এই বিদোলন প্রমাণ করা যায়—

১নং ছবিটি এমন ভাবে আঁকা হয়েছে যে ভালো করে লক্ষ্য করলে একবার

মনে হবে ফুলদানীর ছবি, আবার একবার মনে হবে—দুটি মানুষের মুখের ছবি। যদি ফুলদানীতে মনোযোগ দেওয়া হয়, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনা আপনি মনোযোগ চলে যাবে মানুষের মুখে, আবার মানুষের মুখে মনোযোগ দিলে তা চলে যাবে ফুলদানীতে। এইভাবে মনোযোগ ফুলদানী ও মানুষের

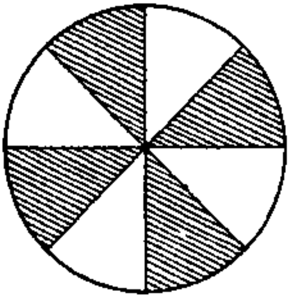

২নং ছবি : Woodworth & Marquis-এর Psychology অনুসরণে

মুখের মধ্যে বিদোলিত হবে। ২নং ছবিতে কালো অংশের মনোযোগ দিলে তা চলে যাবে সাদা অংশে; আবার সাদা অংশে মনোযোগ দিলে তা চলে যাবে কালো অংশে।

মনোযোগের বিভাজন (Division of Attention): আমরা এক-সঙ্গে ক'টি কাজের দিকে মনোযোগ দিতে পারি? একসঙ্গে যদি মাত্র একটি জিনিসেই মনোযোগ দেওয়া সম্ভব, তাহলে আমরা একই সঙ্গে একাধিক কাজ কিভাবে করতে পারি? দর্জি তো একই সঙ্গে কল চালায়, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলে। রামকৃষ্ণদেবের চিড়ে কুটনীর গল্প তো সকলেরই জানা! সার্কাসের খেলোয়াড়েরা তো একই সঙ্গে অনেক রকম কাজ করে থাকেন। জুলিয়াস সিজার ও নেপোলিয়ন একসঙ্গে নাকি চার পাঁচটি চিঠি লিখতে পারতেন। মাইকেল মধুসূদন একসঙ্গে দু-তিন খানা বইয়ের পাণ্ডুলিপি রচনা করতে পারতেন। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও এ-জাতীয় ঘটনা বিরল নয়। কারণ একাধিক হ'তে পারে।

প্রথমতঃ, মনোযোগের দ্রুত বিদোলন। দু'টি কাজ থাকলে মনোযোগ দু'টি কাজে অত্যন্ত দ্রুত সঞ্চালিত হয় বলে দু'টি কাজেই মনোযোগ দেওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ. কতকগুলি কাজ এমন যান্ত্রিক হয়ে যায় যে তার প্রতি

মনোযোগ দেবার প্রয়োজনই হয় না। সার্কাসের খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। দর্জির কল চালানো বা আমাদের সাইকেল চালানোও এই পর্যায়ের।

তৃতীয়তঃ, একাধিক কাজকে একটা ছন্দ বা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা। একই সঙ্গে পিয়ানো বা হার্মোনিয়াম বাজানো ও গান করা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে বলা যেতে পারে মনোযোগের বিষয়বস্তুগুলি বিভিন্ন না হয়ে একটি মাত্র বিষয় বা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিষয় হিসেবে দেখা হয়।

চতুর্থতঃ, শিশুদের জন্যও অনেক সময় একাধিক কাজে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়। তবে সে ক্ষেত্রে কয়েকটা কাজে খুব অভ্যস্ত হতে হয় এবং সেই সমস্ত কাজে অধিক সক্রিয়তার প্রয়োজন হয় না।

জুলিয়াস সীজার, নেপোলিয়ান, মাইকেল মধুসূদন—এঁদের ক্ষেত্রে মনোযোগের দ্রুত বিযোজনের প্রমাণই পাওয়া যায়। এঁরা নিজেদের মনোযোগ অত্যন্ত কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন বলেই মনে হ'ত যেন সব কাজেই সমান মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে।

— —

॥ সাত ॥

সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ

(Sensation and Perception)

[Sensation is a simple-psychical phenomenon resulting from the stimulation of the peripheral extremity of an afferent nerve when this is propagated to the brain—*Sully*.

Sensation is the first response aroused by a stumulus—Perception is the second response, following the sensation and being properly a direct response to the sensation and only an indirect response to the physical stimulus—*Woodworth.*

A pure sensation is a psychological myth—*Dr. Ward.*]

আমাদের ঘিরে যে বিশ্বজগত রয়েছে, তা গাছপালা, ঘরবাড়ী, লোকজন, পশুপাখী, কীটপতঙ্গ, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, ফুল-ফল, আকাশ-বাতাস, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি কত না জিনিস নিয়ে রচিত। আমাদের চারপাশে যে সমস্ত বস্তু-সামগ্রী ছড়ানো রয়েছে, তারা অবিরত আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। আমরাও সেই প্রভাবে অবিরত সাড়া দিচ্ছি। তার ফলে আমাদের মধ্যে বিচিত্র চেতনা ও অনুভূতির সৃষ্টি হচ্ছে। এই চেতনা বা অনুভূতির নামই **সংবেদন** (Sensation)। সংবেদন হ'ল উদ্দীপক সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক চেতনা বা বোধ। মনোবিজ্ঞানী সালি (Sully) সংবেদনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—"কোন অন্তর্মুখী স্নায়ুর বহিঃপ্রান্ত উদ্দীপিত হ'লে যখন এই উদ্দীপনা মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হয়, তখন তার দ্বারা সৃষ্ট সহজ মানসিক প্রক্রিয়ার নাম হ'ল সংবেদন।'

আমরা বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান আহরণ করি, তা সম্ভব হয় আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির জন্যই। এগুলিকে বলা হয় জ্ঞানের প্রবেশ-দ্বার। যে কোন ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে দুটি স্তর দেখা যায়—

[এক] বাইরের উদ্দীপক থেকে সঞ্জাত একটা অনুভূতি ও

[দুই] সেই অনুভূতিটির প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা বা বলা যেতে পারে অনুভূতিটির সংব্যাখ্যান।

একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। ধরা যাক্ ঘরের বাইরে আসতেই এক ঝলক সুগন্ধি বাতাস নাকে লাগল। ঘ্রাণেন্দ্রিয় উদ্দীপনাটিকে মস্তিষ্কে নিয়ে গেল বিভিন্ন ঘ্রাণকোষ ও আঘ্রাণ স্নায়ুর সাহায্যে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এক বিশেষ ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি হ'ল। কিন্তু এই অনুভূতিটি কিসের—অর্থাৎ সুগন্ধ কোথা থেকে আসছে, তার প্রকৃতি কি জাতীয়, সে সম্বন্ধে ঠিক পর মুহূর্তেই আমাদের জ্ঞান হ'ল যে সুগন্ধটি গোলাপ ফুলের, যেটি সামনের বাগানেই ফুটে রয়েছে। এই পরবর্তী বোধগুলি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জ্ঞানটি সম্পূর্ণ হ'ল। প্রথম স্তরে যে অভিজ্ঞতা তার নাম হ'ল **সংবেদন** (Sensation) এবং দ্বিতীয় স্তরের অভিজ্ঞতার নাম **প্রত্যক্ষণ** (Perception)। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকের প্রাথমিক বোধ হ'ল সংবেদন আর সংবেদনের সংব্যাখ্যাত রূপ হ'ল প্রত্যক্ষণ। সংবেদন ছাড়া প্রত্যক্ষণ হয় না। কিন্তু প্রত্যক্ষণ ছাড়াও সংবেদন হতে পারে। তবে প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে কেবলমাত্র বিশুদ্ধ সংবেদন সম্ভব নয়, কেননা সংবেদনের সঙ্গে সঙ্গেই তার সংব্যাখ্যানটিও এসে পড়ে। সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ এত ঘনিষ্ঠ যে একটির সঙ্গে সঙ্গে অপরটিও এসে পড়ে। সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ একই মানসিক প্রক্রিয়ার দুটি ভিন্ন রূপ, এদের পৃথক কোন সত্তা নেই। তবে আমরা নিজেদের সুবিধার জন্য দুটিকে পৃথক ভাবে ধরে নিয়ে আলোচনা করে থাকি। Dr. Ward-এর মতে বিশুদ্ধ সংবেদন মনোবিদ্যার দিক থেকে একটি অলীক বস্তু মাত্র। অনেক বলে থাকেন, একমাত্র সদ্যোজাত শিশুর ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ সংবেদন সম্ভব। কিন্তু এটিও এক প্রকার অনুমান মাত্র। শিশু তার নিজের কথা বলতেও পারে না, আবার আমাদের শৈশবের কথা মনে নেই। বয়স্ক লোকের পক্ষে বিশুদ্ধ সংবেদন একেবারে অসম্ভব। কারণ তার ক্ষেত্রে সংবেদন অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে এমন ভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে যে, সংবেদনটির সঙ্গে সঙ্গে একটি অর্থ নির্ণীত হয়ে যায় এবং সেটি প্রত্যক্ষণে পরিণত হয়। মনোবিদ স্টাউট অবশ্য বলেন যে, আমরা সময় সময় কেবল মাত্র সংবেদন অনুভব করতে পারি। সময় সময় বস্তু সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট চেতনা লাভ করে থাকি। পথ দিয়ে চলছি। অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটতে হাঁটতে দূরে কিসের যেন একটা শব্দ শুনেই চলে গেলাম। কিসের শব্দ বা কোথা থেকে আসছে তা নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না। কিছুক্ষণ পরে বুঝলাম শব্দটা আসছে পাশের বাড়ী

থেকে পিয়ানোর শব্দ। স্টাউট-এর মতে প্রথম অবস্থাটি প্রত্যক্ষণ বিহীন সংবেদন। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি বুঝলাম আমি শব্দই শুনছি—অন্য কিছু নয়, তখনই তো সংবেদনের ব্যাখ্যা করা হ'য়ে গেল। তাহ'লে তা বিশুদ্ধ সংবেদন হ'ল না। কাজেই বলা যেতে পারে বয়স্কদের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সংবেদন সম্ভব নয়। সংবেদনের একেবারে সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যক্ষণ হয়ে যায়।

আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মূলে রয়েছে সংবেদন। সংবেদনকে প্রত্যক্ষণে নিয়ে যেতে সাহায্য করে পূর্ব অভিজ্ঞতা ও বস্তুটি সম্বন্ধে পূর্ব-আহরিত বিভিন্ন তথ্য। অতীত অভিজ্ঞতা, পূর্বজ্ঞান, পরিবেশের প্রভাব—সবগুলি একসঙ্গে মিলিত হয়ে অর্থহীন সংবেদনকে অর্থপূর্ণ করে। প্রকৃত-প্রস্তাবে, সংবেদনই জ্ঞান নয়, জ্ঞানের উপাদান; প্রত্যক্ষণে ঐ উপাদান পূর্ণাঙ্গ ও অর্থপূর্ণ জ্ঞানের রূপ ধারণ করে।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই হ'ল আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়। বিশ্বজগত ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এইভাবে উদ্দীপকের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় প্রভাবিত হ'লে আমাদের মধ্যে নানা প্রকার চেতনা বা অনুভূতির সৃষ্টি হয়। আগেই বলা হয়েছে এই সমস্ত অনুভূতিই হ'ল সংবেদন। সংবেদন সাধারণতঃ পাঁচ প্রকারের—দৃষ্টিগত (দেখা), শ্রবণগত (শোনা), ঘ্রাণগত (আঘ্রাণ করা), স্বাদগত (আস্বাদ করা) ও স্পর্শগত (স্পর্শ করা) বা ত্বকগত। এই সংবেদনের ফলেই আমরা বস্তুর গুণাগুণ জানতে পারি। প্রত্যেকটি সংবেদন কিন্তু অন্যান্য সংবেদন থেকে স্বতন্ত্র। আবার এক জাতীয় সংবেদনের মধ্যেও বিভিন্ন পার্থক্য দেখা যায়। সংবেদন হওয়ার জন্য তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন, যথা— (১) **উদ্দীপক** (Stimulus), (২) **স্নায়ুতন্ত্র** (Nervous system) ও (৩) **মন** (Mind)।

সংবেদনের বৈশিষ্ট্য: সংবেদন যে অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র, তা সংবেদনের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল—

(১) সংবেদন হ'ল জ্ঞানের সরলতম উপাদান। সংবেদনকেই জ্ঞানের প্রধান প্রবেশ-দ্বার বলা যেতে পারে। এর মাধ্যমেই বিশ্বজগতকে আমরা জানতে পারি।

(২) উদ্দীপক না থাকলে সংবেদন হয় না বলে একথা বলা যেতে পারে

উদ্দীপকই সংবেদনের উৎস। উদ্দীপক অবশ্য বাহ্যিক হতে পারে, আবার আভ্যন্তরিকও হতে পারে।

(৩) সংবেদনও অনুভূতির মত একপ্রকার মানসিক অবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে অনুভূতি হ'ল ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Subjective) কিন্তু সংবেদন বস্তুকেন্দ্রিক (Objective)।

(৪) কি ধরনের সংবেদন হবে তা নির্ণয় করে বাইরের কোন বস্তু। কাজেই বলা যেতে পারে সংবেদনের ক্ষেত্রে মন নিষ্ক্রিয় থাকে। কিন্তু সংবেদন সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে মন সক্রিয় হয়ে ওঠে।

(৫) সংবেদনগুলি জোর করেই আমাদের চেতনার মধ্যে প্রবেশ করে। ইন্দ্রিয় যদি সুস্থ থাকে, তবে সংবেদনের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে উপায় থাকে না। সংবেদন জোর করেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

সংবেদনের ধর্ম (Attributes of Sensation): প্রত্যেকটি সংবেদন অন্যান্য সংবেদন থেকে পৃথক। আবার একই সংবেদনের মধ্যেও নানা প্রকার পার্থক্য দেখা যায়। সংবেদনগুলিকে পরস্পর পৃথক করার জন্য মনোবিজ্ঞানীরা সংবেদনের তিনপ্রকার ধর্ম বা গুণের কথা বলেছেন। এগুলি হ'ল—(ক) **গুণগত ধর্ম** (Quality), (খ) **পরিমাণগত ধর্ম** (Quantity) এবং (গ) **স্থানগত ধর্ম** (Local)।

এগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল—

[এক] **গুণগত ধর্ম** (Quality): একটি সংবেদন থেকে আর একটি সংবেদনের পার্থক্যকে বলা যেতে পারে গুণগত ধর্ম। মনোবিজ্ঞানী টিচেনারের (Titchener) মতে সংবেদনের গুণ হ'ল সেই বৈশিষ্ট্য যা তাকে অপর একটি সংবেদন থেকে পৃথক করে দেয়। দেখার সংবেদন শোনার সংবেদন থেকে আলাদা। আবার লাল রঙের সংবেদন ও নীল রঙের সংবেদন এক নয়। এইজন্য গুণগত ধর্মকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—(ক) **জাতিগত** (Generic) এবং (খ) **উপজাতিগত** (Specific)। দু'টি বিভিন্ন জাতীয় সংবেদনের মধ্যে পার্থক্য হ'ল জাতিগত। যেমন, দেখার সংবেদন ও শোনার সংবেদন, শোনার সংবেদন ও স্পর্শের সংবেদন। এক্ষেত্রে সংবেদনের জন্য নিযুক্ত ইন্দ্রিয়গুলিও পৃথক, উদ্দীপকও পৃথক। কিন্তু আমাদের দেখার বা শোনার সংবেদনগুলি সব হুবহু এক রকমের নয়। লাল জিনিস দেখার আর সবুজ জিনিস দেখার সংবেদন এক নয়, গোল জিনিস দেখা আর চৌকোনো

জিনিস দেখা এক নয়। এই পার্থক্য হ'ল উপজাতিগত। একই সংবেদনের মধ্যে পার্থক হ'ল এই জাতীয়।

[দুই] **পরিমাণগত ধর্ম** (Quantity): ঘরে একটা মোমবাতি জ্বলছে কারণ 'কারেন্ট অফ' হয়ে গেছে। হঠাৎ কারেন্ট অন হয়ে গেল। বাল্বের দিকে না তাকিয়েও তা বুঝতে পারলাম কারণ সারা ঘর তখন আলোয় প্লাবিত হয়ে গেছে। দু'টিই একজাতীয় সংবেদন তবুও এরা পৃথক। প্রথম ক্ষেত্রে সংবেদনটি ক্ষীণ কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তীব্র। সংবেদনের এই পার্থক্য হ'ল পরিমাণগত পার্থক্য। এই পার্থক্য আবার তিন প্রকারের হ'তে পারে; যেমন, (ক) তীব্রতা (Intensity), (খ) স্থায়িত্ব (Propensity or Duration) এবং (গ) বিস্তৃতি বা ব্যাপ্তি (Extensity)।

(ক) তীব্রতা (Intensity): সংবেদন দুটি এক জাতীয় কিন্তু একটি কম তীব্র অপরটি বেশী তীব্র। সব রকম সংবেদনেই (অর্থাৎ দেখা, শোনা, ঘ্রাণ নেওয়া ইত্যাদি) এই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মোমবাতির আলো আর উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো, ফিকে লাল রঙ আর গাড় লাল রঙ, ঢাকের শব্দ আর রেলগাড়ীর বাঁশীর শব্দ, একটি গোলাপের গন্ধ আর এক তোড়া গোলাপের গন্ধ, এক চামচ চিনির সরবৎ আর পাঁচ চামচ চিনির সরবৎ, এক কেজি বোঝা আর দশ কেজি বোঝা—এই সমস্ত হ'ল এই জাতীয় পার্থক্যের উদাহরণ। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সংবেদনের শক্তি উদ্দীপকের শক্তির উপর নির্ভরশীল।

(খ) **স্থায়িত্ব** (Propensity): প্রত্যেকটি সংবেদন কিছুক্ষণ ধরে স্থায়ী থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত একটা সংবেদন স্থায়ী থাকে তা হ'ল সংবেদনের স্থায়িত্ব বা স্থিতিকাল। একটি আলোর দিকে দু'মিনিট তাকানো আর পাঁচ মিনিট তাকনো, কারখানার অবিরাম শব্দ আর স্কুলের ঘণ্টা ধ্বনির শব্দ, এসেন্সের শিশি খুলে এক মিনিটের জন্য নাকের সামনে ধরা আর জামাকাপড়ে ছড়িয়ে রাখা, জিভের ডগায় একটু চিনি রাখা আর সমস্ত জিভে চিনি মাখানো, পিঠে এক সেকেণ্ডের জন্য হাত রাখা আর পাঁচ মিনিটের জন্য হাত রাখা—এ সমস্ত পার্থক্য হ'ল স্থায়িত্বের পার্থক্য। এ ক্ষেত্রে একটি সংবেদন অন্যটির তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী। এই স্থিতি নির্ভর করে উদ্দীপকের অবস্থান সময়ের উপর। অনেক সময় দেখা যায় উদ্দীপকটি অন্তর্হিত হবার পরও সংবেদনের একটা রেশ থেকে যায়। গান শেষ হ'লেও সুরটুকু যেন কানে বাজে, একটা সুন্দর

দৃশ্য দেখার পরই মনে হয় তা যেন এখনও সামনে ভাসছে। একে বলা হয় **উত্তর সংবেদন** বা **উত্তর প্রতিরূপ** (After sensation or After image)। এক্ষেত্রে সংবেদনটি কিন্তু ক্ষণস্থায়ী।

(গ) **বিস্তৃতি বা ব্যাপ্তি** (Extensity): কতটুকু জায়গা জুড়ে সংবেদনটি অনুভূত হচ্ছে—অর্থাৎ দেহের কতটুকু জায়গা জুড়ে উদ্দীপনা ঘটছে—তাই হ'ল সংবেদনের বিস্তৃতি বা ব্যাপ্তি। একটি লোক দেখা আর একটি ভীড় দেখা, স্লেটে লেখার কিচকিচ শব্দ শোনা, আর বাজ পড়ার শব্দ শোনা, একটি ফুলের গন্ধ নেওয়া আর একটি বাগানে সব ফুলের গন্ধ নেওয়া, জিভের ডগাতে পিঁপড়ের কামড় আর চা খেতে গিয়ে জিভ পুড়িয়ে ফেলা, কপালে একটা ডাকটিকিট এঁটে দেওয়া আব পাঁচটা ডাকটিকিট এঁটে দেওযা—এই সমস্ত হ'ল বিস্তৃতির পার্থক্য। মনোবিজ্ঞানী জেমস্ (James) বলেন,—ব্যাপ্তি হ'ল সমস্ত সংবেদনের একটা সাধারণ লক্ষণ। প্রত্যেক সংবেদনেরই ব্যাপ্তি আছে। অবশ্য টিচেনার (Titchener) এ কথা মানেন না, তিনি বলেন কেবল দৃষ্টিগত ও স্পর্শগত সংবেদনেরই এই লক্ষণ আছে—শ্রবণ, গন্ধ ও স্বাদ; সংবেদনের বিস্তৃতি নেই। কিন্তু এই মতটি পুরোপুরি মানা চলে না।

। একই সঙ্গে বিভিন্ন পার্থক্য ।

ঢাকের শব্দ আর বাঁশীর শব্দ— গুণগত, তীব্রতা।

স্কুলের ঘণ্টাধ্বনি ও কারখানার অবিরাম শব্দ— গুণগত, তীব্রতা, স্থায়িত্ব।

একজন লোকের কথাবার্তা আর ভীড়ের হট্টোগোল— গুণগত, তীব্রতা, স্থায়িত্ব, বিস্তৃতি।

একটা গোলাপের গন্ধ আর এক তোড়া গোলাপের গন্ধ— তীব্রতা, বিস্তৃতি।

জিভের ডগায় একটু চিনি আর সমস্ত জিভে চিনি মাখানো— বিস্তৃতি, স্থায়িত্ব।

স্লেটে লেখার শব্দ আর বাজ পড়ার শব্দ— তীব্রতা, স্থায়িত্ব ও বিস্তৃতি।

(গ) **স্থানগত ধর্ম** (Local character): দেহের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলির অবস্থানের বৈশিষ্ট্যের জন্য সংবেদনগুলির মধ্যেও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এগুলি হ'ল সংবেদনের স্থানগত ধর্ম। চোখ বন্ধ করে বসে আছি।

কেউ যদি এসে পিঠে হাত রাখে, চোখ না খুলেও বুঝতে পারি পিঠের কোন জায়গায় হাত রেখেছে। শরীরের অন্য কোন জায়গাতেও হাত রাখলে চোখ না খুলে বলা যায়। এর কারণ কি ? এর কারণ হ'ল ত্বকের উপর প্রত্যেকটি বিন্দুর একটি স্থানসূচক বিশিষ্টতা আছে যা অন্য কোন বিন্দুরই নেই। অর্থাৎ দেহের বিভিন্ন অংশের স্পর্শ—সংবেদনগুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের নামই হ'ল **স্থানধর্ম** (Local Sign)। দু'টি স্পর্শবিন্দু, দু'টি উষ্ণতা বিন্দু, দু'টি শৈত্যবিন্দু বা দু'টি যন্ত্রণাবিন্দুর স্থানধর্ম এক নয়। এইজন্য সচরাচর একই সময়ে দু'টি বিন্দুকে স্পর্শ করলেও আমরা স্পর্শটি এক জায়গায় অনুভব না না করে দু'জায়গায় অনুভব করি। এই স্থানধর্ম থেকেই আমাদের মনে স্থান (Space) সম্বন্ধে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

সংবেদনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল **অনুভূতি সম্পর্কীয় বৈশিষ্ট্য** (Feeling tone) বা ভালো লাগা-মন্দ লাগা। কোন কোন মনোবিজ্ঞানী বলেন, প্রত্যেক সংবেদনের সঙ্গেই একটা ভালো লাগা বা মন্দ লাগার বোধ জড়িত থাকে। এ সম্পর্কে যদিও মতবিরোধ আছে তবুও এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ সচেতন। গ্রীষ্মকালে বরফ দেওয়া সরবৎ ভালো লাগে, কিন্তু শীতকালে লাগে না। বেসুরো গান ভালো লাগে না কিন্তু সুরে গাওয়া মিষ্টি গান ভালো লাগে, পচা গন্ধ ভালো লাগে না কিন্তু সুগন্ধ ভালো লাগে, নির্জন স্টেশনে তিন ঘণ্টা ধরে ট্রেনের অপেক্ষা করতে ভালো লাগে না, কিন্তু সিনেমা হলের তিনটি ঘণ্টা বেশ ভালোই লাগে।

প্রত্যক্ষ কাকে বলে ? প্রত্যক্ষ করাটি হ'ল এক ধরনের আচরণ। সংবেদনটি যখন অর্থপূর্ণ হয়, তখন সেই সংবেদনকে প্রত্যক্ষ বলা হয়। বস্তুটি সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানটি বা চেতনা বা বোধ হ'ল সংবেদন। সংবেদনকে যখন ব্যাখ্যা করা যায় এবং তার সঙ্গে কোন একটি অর্থ যুক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ। আরো বিশদ্‌ভাবে বলা যায়, বর্তমানের সংবেদনগুলিকে অতীত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে কোন বস্তুকে বিশেষ অর্থযুক্ত একটি বস্তুরূপে বুঝতে পারাটাই হ'ল **প্রত্যক্ষ** বা **প্রত্যক্ষণ** (Perception)।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্‌। বাগানে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ শুনতে পেলাম একটা শব্দ। প্রথমে সেটা শুধু শব্দই ছিল। কিন্তু একটু সচেতন হতেই বুঝতে পারলাম—ঐ শব্দ হ'ল একটি কোকিলের কণ্ঠস্বর যেটি ভেসে আসছে এক কোণের কৃষ্ণচূড়া গাছটি থেকে। প্রথম স্তরটি হ'ল শব্দ-সংবেদনের

স্বর ; কিন্তু যখন সেটিকে কোকিলের কণ্ঠস্বর বলে বুঝতে পারলাম তখন তা আর সংবেদন রইল না ; হয়ে গেল প্রত্যক্ষণ। যা প্রথমে ছিল অর্থহীন, প্রত্যক্ষ করার ফলে তা হয়ে উঠল অর্থপূর্ণ। অবশ্য এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, যে মুহূর্তে শব্দ-সংবেদনের সৃষ্টি হ'ল—তখনই তা প্রত্যক্ষণ হয়ে গেল। কারণ আমি তো বুঝতে পারলাম যে সেটি একটি শব্দ, গন্ধ নয়, পদার্থ নয় ইত্যাদি। সংবেদন হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যক্ষণ হয়ে যায়। ঐ জন্যই তো আগেই বলা হয়েছে—Pure sensation is probably a psychological myth.

প্রত্যক্ষের স্তর-বিভাগ : এই প্রত্যক্ষকে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি স্তর পাওয়া যায়। সেগুলি হ'ল—

(১) **পৃথকীকরণ** (Discrimination) : শব্দ-সংবেদনটিকে অন্য জাতীয় সংবেদন—যথা, দৃষ্টিগত, ঘ্রাণগত ইত্যাদি সংবেদন থেকে পৃথক করা।

(২) **সদৃশকরণ** (Assimilation) : এই জাতীয় অতীত-লব্ধ শব্দ-সংবেদনের সঙ্গে বর্তমান সংবেদনটির সাদৃশ্য নির্ণয় করা।

(৩) **অনুষঙ্গ স্থাপন ও পুনরুজ্জীবন** (Association and Reproduction) : শব্দগত সংবেদনটির সঙ্গে অন্যান্য সংবেদনের সংযোগ স্থাপন করা। যেমন, আগে কোকিল দেখেছি, স্পর্শ করেছি। এখন শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে কোকিলের চেহারা, তার পালকের নরম স্পর্শ ইত্যাদি মনে পড়বে। বর্তমান সংবেদনটি অতীতের অনেক সংবেদনকে মনে পুনরুজ্জীবিত করল।

(৪) **বস্তু-চেতনা ও স্থান নির্ণয়** (Objectification and Localisation) : সংবেদনটি যে বহির্জগতের কোন বস্তু, সেটি উপলব্ধি করা ও বস্তুটি বিশেষ যে স্থানে অবস্থিত তা নিরূপণ করা। শব্দটি শুনে বুঝলাম—শব্দটি বাইরের কোন বস্তু থেকে আসছে এবং ঐ শব্দের সূত্র ধরেই কোকিলের অবস্থিতি সঠিক ভাবে নিরূপণ করলাম।

(৫) **বিশ্বাস** (Belief) : কোকিলটিই যে কৃষ্ণচূড়া গাছ থেকে ডাকছে—এই বিশ্বাস মনে জাগে বলেই সেদিকে যাই এবং কোকিলের গান শুনি।

উপরের স্তর বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষের নতুন ভাবে একটি সংজ্ঞা দেওয়া যায়। **যখন কোন একটি সংবেদকে ভিন্ন জাতীয় সংবেদন থেকে পৃথক করা হয়, সমজাতীয় সংবেদনের সঙ্গে তার সাদৃশ্য নির্ণয় করা হয়, বর্তমানে পুনরুজ্জীবিত অতীত লব্ধ সংবেদনের সঙ্গে তাকে**

সংযুক্ত করা হয়, তার সঠিক অবস্থিতি নির্ণয় করা হয় এবং ঐ অবস্থিতির বাস্তব সত্তায় বিশ্বাসী হয়ে সংবেদনটিকে ব্যাখ্যা করা হয়, তখন এই সামগ্রিক মানসিক প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ বলে।

প্রত্যক্ষের স্বরূপ (Nature) : প্রত্যক্ষকে বিশ্লেষণ করলে এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে প্রত্যক্ষের স্বরূপ সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করা সম্ভব। এগুলি হ'ল—

প্রত্যক্ষ হ'ল উপস্থাপনমূলক-পুনরুজ্জীবনমূলক প্রক্রিয়া (Presentative —Representative Process)।

প্রত্যক্ষ হ'ল জানা ও চেনার যৌথ একটি প্রক্রিয়া (Cognition-Recognition)

প্রত্যক্ষ হ'ল একটি সংশ্লেষক প্রক্রিয়া (Synthetic)

প্রত্যক্ষ হ'ল বর্তমানের সঙ্গে অতীতের, নতুনের সঙ্গে পুরাতনের সংযোগ স্থাপন।

প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে পূর্ব অভিজ্ঞতার একান্ত প্রয়োজন।

পূর্ণাঙ্গ প্রত্যক্ষ একটি অভ্যাস-সাপেক্ষ ব্যাপার।

প্রত্যক্ষের দু'টি দিক আছে—বস্তুগত দিক বা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ দিক (Objective) ও মানসিক বা ব্যক্তি-সাপেক্ষ দিক (Subjective)।

আমরা প্রতিনিয়ত অজস্র বস্তু প্রত্যক্ষ করছি। আমরা যা কিছু দেখছি, শুনছি, স্পর্শ করছি, আঘ্রাণ করছি বা আস্বাদন করছি, তার প্রত্যেকটিকেই এক একটি বিশেষ বস্তু হিসেবেই প্রত্যক্ষ করছি। আবার আমরা সকলে হয়তো একই জিনিসকে প্রত্যক্ষ করতে পারি, কিন্তু আমাদের সকলের প্রত্যক্ষ করাটা যে একই রকম হবে, এমন কোন নিশ্চয়তা বা স্থিরতা নেই। প্রকৃতপক্ষে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা জিনিসকে পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যক্ষ করে থাকি। এর প্রধান কারণ হ'ল, বস্তুটি সম্পর্কে আমাদের সকলের অতীত অভিজ্ঞতা এক রকমের নয়। বস্তুটি সম্পর্কে যার অতীত অভীজ্ঞতাটি যে রকম বা যত ব্যাপক ও গভীর, তার প্রত্যক্ষের অভিজ্ঞতাটিও সেই রকম হবে। একই লোক—তার মায়ের চোখে সন্তান, ছেলেমেয়েদের চোখে পিতা, ছাত্রের চোখে গুরু, বন্ধুর চোখে বন্ধু, স্ত্রীর চোখে স্বামী ইত্যাদি। কুক্কুটের নিকট মনির কোন দাম নেই, কিন্তু বণিকের নিকট আছে। যে কোন বস্তুকে আমরা বর্তমানে কিভাবে প্রত্যক্ষ করবো তা নির্ভর করছে সেই বস্তুটি সম্পর্কে

আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার উপর। আবার কোন একটি বস্তুর প্রতি আমরা কি রকম ভাবে সাড়া দেবো—তা নির্ভর করছে আমরা বস্তুটিকে কি ভাবে প্রত্যক্ষ করছি তার উপর। পোষা কুকুরকে আসতে দেখলে আনন্দিত হই, কিন্তু পাগলা কুকুর আসতে দেখলে দৌড়ে পালাই। রাস্তাঘাটে স্বাভাবিক কথাবার্তায় কান দিই না; কিন্তু গোলমাল হ'লে বা বিকট শব্দ শুনলে হয় শুনতে হয়, না হ'লে কানে আঙ্গুল চেপে পালিয়ে যেতে হয়। আবার দৈহিক ও মানসিক অবস্থাব পার্থক্যের জন্য একই জিনিসকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে প্রত্যক্ষ কবি। ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাদ্য যেমন আকর্ষণীয় মনে হয়, উদর পূর্ণ থাকলে তেমনটি মনে হয় না। যে লোকটির সঙ্গে বিশেষ দরকার, তাকে ভীড়ের মধ্যেও সহজে খুঁজে বার করি, কিন্তু যার সঙ্গে দরকার নেই সে পাশ দিয়ে চলে গেলেও নজরে পড়ে না।

আমরা যখন কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি, তখন সেটিকে কেবলমাত্র কতকগুলি বিচ্ছিন্ন উপাদানের সমষ্টি হিসেবে প্রত্যক্ষ না করে একটি সম্পূর্ণ, সমগ্র বস্তু হিসেবেই প্রত্যক্ষ করে থাকি। সমগ্রতাবাদী মনোবিদ্‌গণ (Gestaltists) বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন যে, বস্তু সমূহকে সামগ্রিক ভাবে প্রত্যক্ষ কবাটা আমাদের স্বভাবের একটা ধর্ম। বিশেষ অবস্থাতে বহু বিচ্ছিন্ন এককে মনে মনে সমন্বিত করে আমরা সেগুলির একটি বৃহত্তর সামগ্রিকরূপ প্রত্যক্ষ করে থাকি। এই সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত-গুলি নীচে দেওয়া হ'ল—

'গেস্টাণ্ট' (Gestalt) শব্দটি জার্মান শব্দ, যার অর্থ হল—'আকার' বা 'রূপ' (form), 'নক্‌শা' (pattern) এবং 'সংগঠন' বা 'সমগ্রতা' (structure or configuration)। কোহ্‌লার (Kohler), কফ্‌কা (Koffka) এবং ভের্থাইমার (Wertheimer)—এই তিন জনই হলেন এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা। এঁরা হলেন 'গেস্টাণ্টবাদী' (Gestaltist)।

এঁদের মতে আমাদের সব অভিজ্ঞতাই একটি সমগ্র বস্তু। সমগ্রতাটির কিছু অংশ মূর্তিরূপে এবং কিছু অংশ পটভূমিকার রূপে ফুটে উঠে। আমরা যখনই কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি, তখনই কোন একটি বিশেষ পটভূমিতে একটি মূর্তি হিসেবে সেটিকে প্রত্যক্ষ করি (a figure against a background)। এই 'মূর্তিতত্ত্ব' ও 'পটভূমি' (Figure and Ground) গেস্টাণ্টবাদীদের প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যার একটি মৌলিক সূত্র। পটভূমি যদি

পরিবর্তিত হয়, তা হ'লে মূর্তিটিরও পরিবর্তন ঘটে। আবার ক্ষেত্র বা মূর্তির পার্থক্য অনুযায়ী প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুরও পরিবর্তন ঘটে। আমরা পাহাড় দেখি আকাশের পটভূমিকায়, সূর্যাস্ত দেখি নদীর পটভূমিকায়। নবজাত শিশুর প্রথম প্রত্যক্ষের সঙ্গে পরিণত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ তুলনা করা যায় না। কিন্তু তার ঐ প্রথম প্রত্যক্ষটিও একটি বিশেষ পটভূমিকাতে একটি মূর্তি। মনোবিজ্ঞানী জেমসের মতে, 'নবজাত শিশুর চেতনাটি হ'ল একটি জট পাকানো অস্পষ্ট অব্যক্ত চেতনা' (a big blooming buzzing confusion)। অর্থাৎ নবজাত শিশুর প্রত্যক্ষের পটভূমিতে তার চেতনা কোন সুস্পষ্ট মূর্তি ধারণ করে না। গেস্টাল্টবাদীরা কিন্তু এর ঘোরতর বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেন, নবজাত শিশুর চেতনা অস্পষ্ট নয়। সেটিও একটি বিশেষ পটভূমিতে সুস্পষ্ট একটি মূর্তি।

গেস্টাল্টবাদীরা বলেন, সমগ্রতা বা সংগঠনের দিকে একটা মানসিক প্রবণতা থাকার জন্য প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর মধ্যে যদি কোন প্রকার ছেদ বা অপূর্ণতা (gap) থাকে, তাহ'লে মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব দেখা দেয় এবং মন কল্পনার সাহায্যে সেই ফাঁকটি ভরাট করে বা অপূর্ণতাকে মনে মনে দূর করে দিয়ে তাকে একটি 'সমগ্র' বা 'একক' (whole or unit) হিসেবেই দেখতে চায়। এটিকে গেস্টাল্টবাদীরা বলেছেন—

'ভগ্নতা পূরণ' (Principle of closure বা Pragnanz)। আমরা যে জন্য প্রত্যক্ষ করার বিষয়বস্তুগুলিকে সমগ্র একক হিসেবে প্রত্যক্ষ করি তার যে কারণগুলি গেস্টাল্টবাদীরা নির্দেশ করেছেন, সেগুলি হ'ল—

[এক] **সান্নিধ্য বা নৈকট্য** (Proximity): পরস্পরের সন্নিকটে যে সমস্ত বস্তু থাকে সেগুলি মিলে একটা সমগ্রতার সৃষ্টি করে বা দল গঠন করে। নিবিড় সান্নিধ্য বা নৈকট্যের জন্যই পরস্পর বিচ্ছিন্ন এককগুলিকে আমরা একই বস্তুর অংশ হিসেবে প্রত্যক্ষ করি। রাত্রিবেলা আকাশে যে সমস্ত নক্ষত্র কাছাকাছি দেখি, সেগুলিকে দলবদ্ধ করে এক একটি বিশেষ আকৃতি-বিশিষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জ হিসেবে প্রত্যক্ষ করি। কালপুরুষ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, বৃহৎ কুকুর মণ্ডল, বৃশ্চিক রাশি ইত্যাদি নৈকট্যের বেশ ভালো উদাহরণ

[দুই] **সাদৃশ্য** (Similarity): যে সমস্ত প্রত্যক্ষের বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আছে সেই সমস্ত বস্তুকে একটি সমগ্রতার মধ্যে এনে বা দল গঠন করে, সেগুলিকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। একটি বোর্ডের উপর যদি কতকগুলি

ত্রিভুজ, বৃত্ত, চতুর্ভুজ ইত্যাদি অভিজ্ঞতা থাকে, তাহ'লে সাদৃশ্য অনুযায়ী প্রত্যেকে এক একটি দল গঠন করবে এবং ঐ দলগুলি পৃথক পৃথক ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। একই মাঠে গরু ছাগল ভেড়া চরলে যদিও তারা একই সঙ্গে চরছে (একটি বড় দল হিসেবে) আমরা সাদৃশ্য অনুযায়ী সেগুলি তিনটি দলে ভাগ করে নিয়ে থাকি এবং সেইভাবে গরুর পাল, ছাগলের পাল, ভেড়ার পাল ইত্যাদি হিসেবে দেখে থাকি।

[তিন] **সংবদ্ধতা বা নিরবচ্ছিন্নতা** (Continuity): যে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করছি তার মধ্যে যদি সংবদ্ধতা থাকে তাহ'লে উপাদানগুলি খুব সহজেই চেতনার মধ্যে দলবদ্ধ হয় এবং একটি সামগ্রিক রূপ নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। কোলকাতার রাস্তার উপর নিয়ন লাইটের বিজ্ঞাপনগুলি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন উপাদানের সমষ্টি হ'লেও আমরা এদের নিরবচ্ছিন্নতার জন্য সামগ্রিক ভাবে দেখে থাকি।

[চার] **অন্তর্বেষ্টন** (Inclusiveness): কোন একটি দল বা নক্শা (Pattern) যদি সমস্ত অংশকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করে কোন একটি অংশকে দলের বাইরে রাখে তাহ'লে তার তুলনায় যে দল বা নক্শা সমস্ত অংশকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয় সেইটি সহজে একটি সামগ্রিক রূপ নিয়ে আমাদের চোখে ধরা পড়ে।

[পাঁচ] **সম্পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য** (Completeness and Symmetry): অসম্পূর্ণ ও অসমঞ্জস বস্তুর চেয়ে সম্পূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বস্তুর প্রত্যক্ষ সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়। যে সমস্ত বস্তু অসম্পূর্ণ ও অসমঞ্জস সেগুলিকে মনে মনে সমন্বিত করে কোন বৃহত্তর একক বা কোন বস্তুর অংশ হিসেবে কল্পনা করা কঠিন হয়।

[ছয়] **পরিচিতি** (Familiarity): কোন একটি বিশেষ আকৃতি বা নক্শা আমাদের সুপরিচিত হ'লে সেটি একটি সামগ্রিক রূপ নিয়ে আমাদের কাছে ধরা পড়ে।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে এবার যে কোন জিনিসের প্রত্যক্ষণকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্। মনে করি, আমি একটি মানুষ দেখছি। আমি কি মানুষটিকে হাত, পা, মাথা, বুক, পেট, চোখ, নাক, কান ইত্যাদির সমষ্টি হিসেবে দেখবো না একটি সম্পূর্ণ বস্তু মানুষ হিসেবে প্রত্যক্ষ করবো? নিশ্চয়ই একটি সম্পূর্ণ বস্তুরূপেই মানুষটিকে প্রত্যক্ষ করবো। কিন্তু তার কারণ

কি? তার কারণ, হাত, পা, নাক, মুখ, ইত্যাদি যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন উপচার নিয়ে মনুষ্যদেহ গঠিত তাদের মধ্যে সান্নিধ্য, সাদৃশ্য, সংবদ্ধতা, সম্পূর্ণতা ও

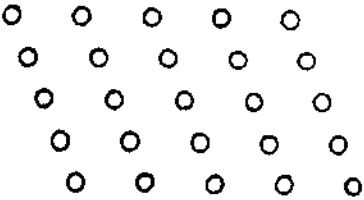

নৈকট্য
(লাইন কি ভাবে সাজানো ?)

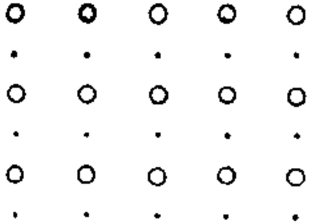

সাদৃশ্য
(লাইন কি ভাবে সাজানো ?)

নিরবচ্ছিন্নতা
(এর মধ্যে একটি শব্দ আছে, পড়া যায় কি ?)

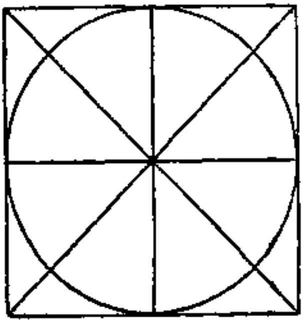

অন্তর্বেষ্টন
(দেখে মনে হবে কোন জ্যামিতিক চিত্র। কিন্তু এর মধ্যে ইংরেজী বর্ণমালার সমস্ত অক্ষর লুকিয়ে আছে)

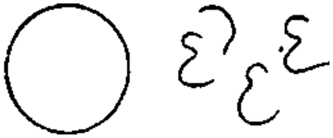

সম্পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য
(কোনটি আগে চোখে পড়ে ?)

পরিচিতি
(চিত্রটিতে কয়টি অর্থপূর্ণ বস্তুর কথা ভাবা যাচ্ছে ?)

সামঞ্জস্য বিদ্যমান, উপাদানগুলি পরস্পরের কাছাকাছি আছে। তাদের মধ্যে

সাদৃশ্যও আছে। একটির সঙ্গে আর একটির যোগাযোগ আছে। এই সংবদ্ধতার ফলে সবগুলি উপাদান মিলিয়ে একটি সম্পূর্ণ মানুষ গড়ে উঠেছে। আবার উপাদানগুলি সুসমঞ্জস ভাবে বিশেষ একটি ভঙ্গিতে সাজানো থাকে। এই কারণে মনুষ্যদেহকে কতকগুলি উপাদানের সমষ্টি হিসেবে না দেখে অর্থাৎ উপাদানগুলিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে না দেখে তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সম্পূর্ণ বস্তুরূপে দেখছি।

সংবেদন ও প্রত্যক্ষের সম্বন্ধ (Relation between Sensation and Perception): সংবেদন ও প্রত্যক্ষের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র আছে। সংবেদনের পরের স্তরই হ'ল প্রত্যক্ষ। একথাও বলা যায়, প্রত্যক্ষ হ'ল সংবেদনের সংব্যাখ্যাত রূপ। যাই হোক্, এখন এই দুটির মধ্যে কি কি বিষয়ে সাদৃশ্য ও পার্থক্য আছে তা আলোচনা করা যাক্।

সাদৃশ্য : [এক] সংবেদন ও প্রত্যক্ষ উভয়ই ইন্দ্রিয়নির্ভর। উদ্দীপক ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত ও প্রভাবিত না করলে সংবেদন বা প্রত্যক্ষ কোনটিই হবে না।

[দুই] সংবেদন ও প্রত্যক্ষ উভয়ই বহির্মুখী। বহির্জগত থেকে উদ্দীপনা এলে তবেই সংবেদন ও প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়।

পার্থক্য ঃ [এক] সংবেদন হ'ল উদ্দীপনাটির একটা প্রাথমিক বোধ বা অনুভূতি মাত্র, কিন্তু প্রত্যক্ষ হ'ল সংবেদন ও তার অর্থ বা ব্যাখ্যা। সংবেদনের সঙ্গে উদ্দীপনার অর্থ যুক্ত হয় না, কিন্তু প্রত্যক্ষে উদ্দীপনার অর্থ যুক্ত বা জ্ঞাত হয়।

[দুই] সংবেদন নিজে জ্ঞান নয়—জ্ঞানের উপাদান। কিন্তু প্রত্যক্ষ হ'ল বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান। মনোবিজ্ঞানী জেমস্ (James)-এর মতে সংবেদন হ'ল শুধুমাত্র বস্তুটির সঙ্গে নিছক পরিচয় (knowledge of acquaintance) কিন্তু প্রত্যক্ষ হ'ল বস্তুটি সম্পর্কে সম্যক্ ও সুষ্ঠু জ্ঞান বা উপলব্ধি (knowledge about subject)

[তিন] সংবেদন হ'ল কোন বস্তুর গুণবিশেষের চেতনামাত্র—গুণবিশিষ্ট বস্তুর চেতনা নয়। প্রত্যক্ষ হ'ল বস্তুটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে চেতনা।

[চার] মন বা চেতনা সংবেদনের সময় যতটা সক্রিয় থাকে, প্রত্যক্ষের সময় তার চেয়ে অনেক বেশী সক্রিয় থাকে। সংবেদনের কাজ কেবলমাত্র উদ্দীপনাটিকে গ্রহণ করা, কিন্তু প্রত্যক্ষের কাজ তাকে ব্যাখ্যা করা।

[পাঁচ] সংবেদন হল উপস্থাপনমূলক (Presentative) কিন্তু প্রত্যক্ষ হ'ল উপস্থাপনমূলক-পুনরুজ্জীবনমূলক (Presentative-Representative)। সংবেদন কেবলমাত্র বর্তমানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, কিন্তু প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বর্তমান-লব্ধ অভিজ্ঞতা অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে যা উপস্থিত নেই তার কথাও মনে জাগিয়ে দেয়।

[ছয়] সংবেদনের ক্ষেত্রে বস্তুটির পূর্ণরূপ আমরা পাই না। পাই তার কোন অংশকে, অর্থাৎ তার এক বা একাধিক গুণকে। কিন্তু প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বস্তুর পূর্ণ রূপটি আমরা পেয়ে থাকি।

[সাত] সংবেদন ও প্রত্যক্ষের সঙ্গে যুক্ত দৈহিক প্রক্রিয়ার মধ্যেও পার্থক্য আছে। সংবেদনের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়, স্নায়ু ও মস্তিষ্কের সংবেদন কেন্দ্রগুলি সক্রিয় হয়। প্রত্যক্ষের সময় এগুলি ছাড়াও সংযোগকেন্দ্রগুলি (Association areas) সক্রিয় হয়। মনোবিজ্ঞানী উডওয়ার্থ (Woodworth) বলেন, উদ্দীপকের প্রতি প্রথম প্রতিক্রিয়া হ'ল সংবেদন আর দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া হ'ল প্রত্যক্ষ।

[আট] সংবেদনের কাজ হ'ল জ্ঞানের উপাদান যোগান। প্রত্যক্ষের কাজ হ'ল সেগুলিকে সম্বন্ধযুক্ত ও অর্থ পূর্ণ করা।

[নয়] সংবেদনের মধ্যে যথেষ্ট কল্পনার ছাপ থাকে—প্রত্যক্ষ কিন্তু বাস্তব। প্রত্যক্ষ যেমন প্রত্যক্ষ হিসেবে একাকী থাকতে পারে, সংবেদন তেমনি সংবেদনের আকারে একাকী থাকতে পারে না। সংবেদনটি অত্যন্ত দ্রুত প্রত্যক্ষে পরিণতি লাভ করে। কেবলমাত্র নবজাত শিশু বা অত্যন্ত অনুন্নত মানসিকতা-বিশিষ্ট লোকের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সংবেদন থাকা সম্ভব অন্য কারো ক্ষেত্রে নয়। এইজন্য Ward বলেছেন—A pure sensation is probably a psychological myth. আবার Drever এবং Collinge এর মত হ'ল—"The perception is the immediate apprehension of an object or situation affecting any of the sense-organs by way of sensation. It is the most elementary form of cognition and in deed of experience."

ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ ও অলীক প্রত্যক্ষণ (Illusion and Hallucination): আমরা যখনই কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করি, তখনই যে বস্তুটি সঠিকভাবে প্রত্যক্ষ করি, তা নয়। অনেক সময় বস্তুটিকে যে ভাবে প্রত্যক্ষ

করি, সেটি আসলে হয়তো ঠিক সে রকম নয়। এই রকম প্রত্যক্ষণকে বলা হয় ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ (Illusion)। ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণকে আমরা সাধারণতঃ 'ভুল' বা 'ভ্রম' বলে থাকি যেমন দেখার বা শোনার ভুল বা ভ্রম। দেখা, শোনা, ঘ্রাণ নেওয়া ইত্যাদি সব কিছুর ব্যাপারেই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ হতে পারে।

ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ আবার দু'রকমের হতে পারে—**ব্যক্তিগত ও সর্বজনীন**। যখন একই বস্তুকে বিভিন্ন লোক ভুল করে বিভিন্ন বস্তু হিসেবে প্রত্যক্ষ করে, তখন সেই প্রত্যক্ষণকে ব্যক্তিগত ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বলে। অন্ধকারে দড়িকে সাপ বলে মনে করা, ন্যাড়া গাছকে দাঁড়িয়ে থাকা লোক বা ভূত বলে ভাবা, চাঁদের আলোয় কাঁচের টুকরোকে মুদ্রা বলে মনে করা ইত্যাদি হ'ল ব্যক্তিগত ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণের উদাহরণ। ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ এক ধরনের প্রত্যক্ষণ, তবে ভুল প্রত্যক্ষণ। ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণে সামনে একটি বস্তু থাকে। তবে বস্তুটি যা, ঠিক সেই ভাবে দেখা হয় না।

ব্যক্তিগত ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ কেন ঘটে? নানা কারণের জন্য ব্যক্তিগত ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ ঘটতে পারে। আমরা এখানে মোটামুটি কয়েকটি কারণ আলোচনা করব।

(ক) যখন দুটি জিনিসের মধ্যে একটা সাদৃশ্য বা মিল থাকে, তখন একটা জিনিসকে আর একটা জিনিস বলে ভুল করি। কাঁচের টুকরোর সঙ্গে মুদ্রার (আধুলির বা টাকার আকৃতি ও বর্ণের মিল আছে বলে) ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ হওয়া সম্ভব।

(খ) মানসিক কারণের জন্যও ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ ঘটে থাকে। যখন মনে মনে কোন জিনিসের খোঁজ করি তখন ওই ধরনের কোন কিছু দেখলেই হঠাৎ সেটাকে যে জিনিসটি খুঁজছি, সেইটি বলে মনে হয়। কোন লোকের পকেট থেকে আধুলি বা টাকা পড়ে গেলে—ঐ আকারের চক্চকে কোন জিনিস দেখলেই সে সেটিকে হারিয়ে যাওয়া আধুলি বলে ভাববে কোন লোকের জন্য প্রত্যক্ষ করতে থাকলে দূরে তার মত কাউকে আসতে দেখলেই মনে হবে ঐ বুঝি প্রতীক্ষিত লোকটিই আসছে। শিকারীরা জঙ্গলে বাঘের খোঁজ করতে গিয়ে ঝোপঝাপ নড়তে দেখলেই বাঘ বলে মনে করেন।

(গ) ভয়ের জন্যও ব্যক্তিগত ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ ঘটতে পারে। শহরের লোকের ধারণা গ্রামে প্রচুর সাপ থাকে। তাই তারা গ্রামে গিয়ে দড়ি বা খড়ের টুকরোকে সাপ বলে মনে করেন। কোন জায়গাতে ভূত আছে শোনা

থাকলে সন্ধ্যাবেলায় বা রাত্রিকালে সেই স্থান দিয়ে যাবার সময় গাছপালা, ঝোপঝাপ বা ছেড়া কাপড়ের টুকরোকেও ভূত বলে মনে হয়।

সর্বজনীন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ: যখন একই জিনিসকে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভুল করে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হিসেবে প্রত্যক্ষ করে না, বা, একই লোক ভিন্ন ভিন্ন

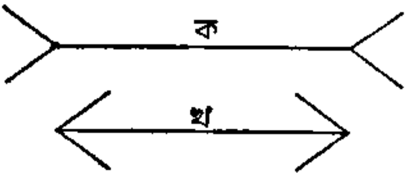

মুলার লায়ার (Muller Lyre)

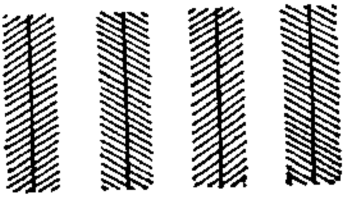

জোল্‌নার (Zollner)-এর ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ

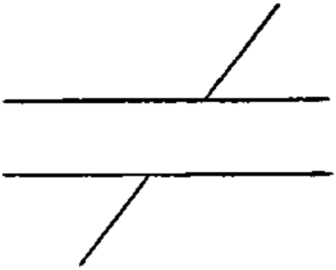

পগেনডর্ফ (Poggendorf)-এর ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ

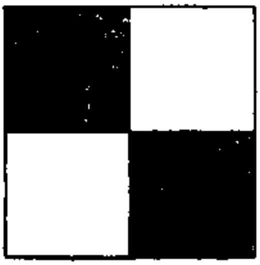

কালোর উপর সাদা রং, না
সাদার উপর কালো ?

পাখীটি উপরের দিকে উঠছে,
না নীচের দিকে নামছে ?

সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হিসেবে প্রত্যক্ষ করে না অর্থাৎ যখন সকলে একই রকম ভুল করে তখন সেই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণকে বলে সর্বজনীন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ। এগুলিকে জ্যামিতিক ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণও বলা হয়। উপরে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল—

সর্বজনীন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ কেন ঘটে ? এই জাতীয় ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণের ব্যাখ্যা দেওয়া খুব সহজ নয়। সাধারণতঃ এ ব্যপারে তিন প্রকারের ব্যাখ্যা প্রচলিত। সেগুলি হ'ল,—

(ক) **চক্ষু সঞ্চালন :** যে জিনিস দেখার জন্য চোখকে যত বেশী নড়াচড়া করতে হয়, সে জিনিসকে তত বড় মনে হয়। এইজন্য ক-রেখাকে খ-রেখার চেয়ে বড় মনে হয়।

(খ) **মানসিক অবস্থা :** চিত্রগুলির মধ্যে আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে মনের নানা প্রকার ভাব আরোপ করে থাকি। বিভিন্ন চিত্রের জন্য মনোভাব-গুলি বিভিন্ন হয় বলে চিত্রগুলিও ভিন্ন ভিন্ন মনে হয়। ক ও খ-রেখায় সঙ্গে সংযুক্ত রেখাগুলির বৈশিষ্ট্যের জন্য ক-এর মধ্যে একটা প্রসারণের ও খ-এর মধ্যে একটা সংকোচনের ভাব আমাদের মনে আসে। এইজন্যই ক-কে খ-এর চেয়ে লম্বা বলে মনে হয়।

(গ) **সামগ্রিকতা :** ক ও খ রেখার দিকে যখন আমরা তাকাই, তখন শুধু ক বা খ-কেই দেখি না, তার সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য রেখাগুলি মিলিত হয়ে যে সম্পূর্ণ চিত্রটি সৃষ্টি হয়েছে—সেই সম্পূর্ণ চিত্রটিকে দেখি। সামগ্রিক ভাবে দেখলে ক-খ এর চেয়ে বেশী লম্বা।

যাই হোক, এই ব্যাখ্যাগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা গেলেও সব সময় ও সব জায়গায় প্রয়োগ করা যায় না। আবার ব্যাখ্যাগুলি সব রকমের ভ্রান্তি প্রত্যক্ষণ বুঝবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণকে অনেকে বহিঃকরণ-জাত ও অন্তঃকরণ-জাত এই দু'ভাগে ভাগ করেন। যখন বস্তুটির বাইরে অবস্থিত বা অনুষ্ঠিত কোন কারণের জন্য ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ ঘটে তখন সেটিকে বহিঃকরণ-জাত ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বলে। যেমন, দড়িকে সাপ মনে করা। এর কারণটি কিন্তু দড়ির মধ্যে নেই, আছে দড়ির বাইরে (যেমন, অন্ধকার, ভয়, ক্ষীণ-দৃষ্টি ইত্যাদি।

কিন্তু যখন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণের কারণটি বস্তুর মধ্যেই নিহিত থাকে এবং ব্যক্তির নিজস্ব কোন ব্যক্তিগত কারণের জন্য প্রত্যক্ষণটি ঘটছে না—তখনকার প্রত্যক্ষণকে সর্বজনীন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বলে। জ্যামিতিক ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ-গুলি এই জাতীয় প্রত্যক্ষণের উদাহরণ।

ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণকে সংশোধন করা চলে। এর জন্য গভীর পর্যবেক্ষণ, অধিকতর মনোযোগ ও সতর্কতা প্রয়োজন। তা ছাড়া বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে যদি

কাজে লাগানো যায়, তাহ'লেও ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ দূর হতে পারে। চোখে দেখে যেটিকে ভূত বলে মনে হচ্ছে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে সেটি যে একটি গাছ—তা বোঝা যাবে। সঠিক সত্য নির্ধারণ করতে হ'লে একাধিক ইন্দ্রিয় ব্যবহার করাই ভালো। আবার দূরের থেকে যাকে কাবুলীওয়ালা মনে হচ্ছে কাছে গিয়ে দেখলে বোঝা যাবে সেটি কাবুলীওয়ালা নয়—গাছের পাতার ফাঁকে মাটিতে পড়ে থাকা চাঁদের আলো মাত্র।

অলীক প্রত্যক্ষণ (Hallucination) **:** কোন বস্তুতে যখন বস্তুটি যেমন ঠিক সেইভাবে প্রত্যক্ষ না করে অন্যভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়—তখন তাকে বলা হয় ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ। তবে আসল বস্তু ও ভ্রান্তভাবে প্রত্যক্ষ করা বস্তুর মধ্যে কিছু না কিছু মিল থাকে। কিন্তু অনেক সময় অনেকে এমন কিছু প্রত্যক্ষ করেন যার কোন বাস্তব অস্তিত্বই নেই। তাদের সামনে এমন কোন বস্তু থাকে না যেটিকে তারা ভুল করে অন্যভাবে প্রত্যক্ষ করছেন। এই ধরনের প্রত্যক্ষণকে বলা হয় **অলীক প্রত্যক্ষণ**। অলীক প্রত্যক্ষণের বস্তুটির যদিও কোনরূপ বাস্তব অস্তিত্ব নেই, তবুও যে লোক সেটি প্রত্যক্ষ করেছে তার কাছে কিন্তু প্রত্যক্ষণটি বাস্তবের মত সত্য বলে মনে হয়। বলা যেতে পারে কল্পনার বস্তু যখন বাস্তবের মত প্রতীয়মান হয়—তখনই অলীক প্রত্যক্ষণ ঘটে।

ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ ও অলীক প্রত্যক্ষণের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য দেখা যায় সেগুলি হ'ল :—

[এক] ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণের সময় ব্যক্তির সম্মুখে আসল বস্তুটি না থাকলেও তার অনুরূপ কিছু একটা থাকে। সাপ না থাকলেও দড়ি থাকে, ভূত না থাকলেও গাছ থাকে কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণের সময় আসল বস্তুও থাকে না। অলীক প্রত্যক্ষণের বস্তুটি সেই ব্যক্তির কল্পনার বস্তু। কিন্তু কল্পনার বস্তু হ'লেও সেটি তার কাছে বাস্তবের মতই মনে হয়। স্বপ্নের সঙ্গে অলীক প্রত্যক্ষণের অনেক মিল আছে। স্বপ্নে আমরা যা যা দেখি সেগুলি আসলে আমাদের কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তবুও যখন আমরা স্বপ্ন দেখি তখন এই সমস্ত বস্তুকে আমরা সত্য বলেই মনে করে থাকি। ঠিক তেমনি অলীক প্রত্যক্ষণের বস্তুগুলি কল্পনা না হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে সেগুলি সত্য বলেই মনে হয়। কিন্তু স্বপ্নের সঙ্গে অলীক প্রত্যক্ষণের কতকগুলি পার্থক্য আছে। যেমন, স্বপ্ন আমরা নিদ্রিত অবস্থায় দেখি কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণ ঘটে

জাগ্রত অবস্থায়। স্বপ্ন প্রায় সকলেই দেখে, অলীক প্রত্যক্ষণের অভিজ্ঞতা কিন্তু সকলের হয় না। স্বপ্ন যখন ভেঙে যায়, তখন স্বপ্নের বিষয়বস্তু যে মিথ্যা তা আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু যার অলীক প্রত্যক্ষণ হয় সে প্রত্যক্ষিত বস্তুটিকে সব সময় সত্য বলেই বিশ্বাস করে থাকে।

[দুই] স্বপ্ন যেমন প্রায় সকলেই দেখে, ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণের অভিজ্ঞতাও তেমনি প্রায় সকলেরই হয়ে থাকে। কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণের অভিজ্ঞতা সুস্থ ব্যক্তির জীবনে খুব বেশী একটা ঘটে না। এই অভিজ্ঞতা তাদের জীবনেই বেশী ঘটে থাকে—যাদের মস্তিষ্কের কিঞ্চিৎ বিকার আছে। সুস্থ মানুষেরও যে কখনো কখনো এ অভিজ্ঞতা হয় না—তা নয়। কেউ কোথাও নেই, হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন নাম ধরে ডাকল। এটা অলীক প্রত্যক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। নেশার আবেশে বা জ্বরের ঘোরেও অনেক সময় এ জাতীয় প্রত্যক্ষণ ঘটে থাকে। আবার দিবাস্বপ্ন যখন খুব গভীর হয় তখন কল্পনার বস্তুটি বাস্তবের মত সত্য বলে মনে হয়। 'শূন্যে সৌধ নির্মাণ' এই জাতীয় ঘটনার উদাহরণ। আবার ধর্মপুস্তকে বর্ণিত দৈব-বাণী বা ব্যক্তি বিশেষের দেব-দেবী দর্শনের অভিজ্ঞতাকেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গীতে অলীক প্রত্যক্ষণ বলা হয়েছে। লেডী ম্যাক্‌বেথের সামনে কল্পিত শূন্যে দোলায়মান ছোরা—অলীক প্রত্যক্ষণেরই উদাহরণ।

অলীক প্রত্যক্ষণ কেন ঘটে ? অলীক প্রত্যক্ষণ ঘটার কারণগুলিকেও সহজে নির্দেশ করা যায় না। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যথা—

(১) দেহের বিশেষ আভ্যন্তরিণ অবস্থায় কোন কোন ইন্দ্রিয় ও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত মস্তিষ্কের কোন কোন অঞ্চল আপনা আপনি উত্তেজিত হ'লে সেই সব ইন্দ্রিয়-সংক্রান্ত নানা প্রকার অলীক প্রত্যক্ষণ ঘটে। চোখে সর্ষে ফুল দেখার কারণ এইটিই। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়। এই কারণের জন্য দেখা, শোনা ইত্যাদি নানাপ্রকার সংবেদনার সৃষ্টি হ'তে পারে ঠিকই, কিন্তু আমরা কেন অন্যান্য বস্তু প্রত্যক্ষ না করে বিশেষ একটি অলীক বস্তু প্রত্যক্ষ করছি—তার ব্যাখ্যা আভ্যন্তরিণ উত্তেজনার সাহায্যে করা যায় না।

(২) নানাপ্রকার প্রক্ষোভ বা আকাঙ্খার জন্যও অলীক প্রত্যক্ষণ ঘটতে পারে। ভূতের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লে—ভূত সম্বন্ধে খুব বেশী চিন্তা

করতে করতে ভূতের কল্পিত মূর্তিটা বাস্তবের মত সত্য হয়ে ওঠে। প্রিয়জন মারা গেলে যেন সকলকে বেশী করে দেখা দিয়ে যায়! আসলে এটাও প্রক্ষোভ ও অতি-চিন্তনের ফল।

(৩) আমরা যখন আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনকে বাইরের জগত থেকে সরিয়ে এনে খুব গভীর ভাবে কোন একটি বিশেষ বস্তুর চিন্তায় নিয়োগ করি, তখন সেই বস্তুটি আমাদের কাছে বাস্তব বলে মনে হয়। এতে চিন্তা ও কল্পনায় মনের সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করা সম্ভব। মুনি ঋষি বা ধার্মিক লোক এই ভাবে ধ্যানের মাধ্যমে দেব-দেবীর দর্শন লাভ করে থাকতেন।

স্থান প্রত্যক্ষণ (Perception of space) : আমরা যখনই কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করি, তখনই সেই বস্তুটিকে কোন একটি স্থানে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু এই স্থানকে কি ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়? বাস্তবিক পক্ষে স্থান বলে কোন অস্তিত্ব-সম্পন্ন বস্তুই নেই। বরং কোনপ্রকার বস্তুর অস্তিত্বের অভাবকেই স্থান বলে। যাই হোক্ স্থানের প্রকৃত সংজ্ঞা কোন্‌টি, তা নিয়ে আলোচনা না করে মনোবিজ্ঞান-সম্মত দৃষ্টিভঙ্গীতে স্থান সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টির কৌশলটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্—

স্থান দু'রকমের—**শূন্যস্থান** (Empty space) এবং **পূর্ণস্থান** (Filled space)। পূর্ণস্থান কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্থান নয় কারণ সেখানে যে কোন এক বা একাধিক বস্তু স্থানটি অধিকার করে থাকে। শূন্যস্থানই হ'ল প্রকৃত স্থান। কিন্তু যেহেতু সেটি অভাবাত্মক সেইজন্যই সেটি প্রত্যক্ষ ভাবে আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারি না। পূর্ণস্থান হ'ল বিস্তার বা বস্তুর বিস্তৃতি (Extension)। বিস্তার বলতে কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, আকৃতি ইত্যাদিকে বুঝিয়ে থাকে। বিস্তারের প্রত্যক্ষটি বিশ্লেষণ করলে আমরা তার মধ্যে তিন প্রকার উপাদান দেখতে পাই। সেগুলি হ'ল—

(১) **ব্যাপ্তি** (Extensity),

(২) **স্থানীয় ধর্ম** (Local sign) এবং

(৩) **গতি বা সঞ্চালন** (Movement)। আমরা প্রধানতঃ দর্শন, স্পর্শন ও পৈশিক অনুভূতির সাহায্যে বস্তুর বিস্তৃতি প্রত্যক্ষ করি।

স্থান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ সৃষ্টি কি ভাবে হয়—সে সম্বন্ধে দু'রকমের মতবাদ প্রচলিত আছে—(ক) **সৃজনমূলক** (Genetic) ও (খ) **সহজননমূলক** (Nativistic)। সৃজনমূলক মতবাদ অনুযায়ী শিশু জন্মের সময় স্থান

সম্বন্ধে ধারণা অর্জন করে নেয়। সহজননমূলক মতবাদ অনুযায়ী শিশুর জন্মের সময়ই স্থান সম্বন্ধে ধারণা তার মধ্যে অপরিণত অবস্থায় নিহিত থাকে। পরে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তার এই ধারণাটি পরিণতি লাভ করে।

স্থান সম্বন্ধে ধারণার বিকাশ সাধনের প্রধান উপকরণ হ'ল—সংবেদনের ব্যাপ্তি। যখন আমরা একটি লম্বা সরলরেখা প্রত্যক্ষ করি তখন আমাদের যে চাক্ষুষ সংবেদন সৃষ্ট হয়, তার মধ্যে থাকে অনেকগুলি সমকালীন ও সহ-অবস্থানকারী কতকগুলি বিন্দুর সংবেদন। অর্থাৎ আমরা বুঝছি কতকগুলি বিন্দু একই সময়ে পাশাপাশি অবস্থান করে সরলরেখাটি সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় ধর্মের জন্য আমরা বিভিন্ন বস্তুর অবস্থিতির পার্থক্য বুঝতে পারি এবং জ্ঞান থেকে সেই স্থানটির বিস্তৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। কিন্তু বিস্তৃতি প্রত্যক্ষ করার ব্যাপারে আমরা চোখের ওপর বেশী নির্ভরশীল বলে অনুভূতির প্রভাব তত বেশী বুঝতে পারি না। অবশ্য অন্ধ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই প্রভাবটি বেশ ভালোভাবে লক্ষ্য করা যায়—কারণ দর্শন শক্তির অভাবের জন্য তারা স্পর্শন শক্তির উপরই বেশীমাত্রায় নির্ভরশীল। পৈশিক অনুভূতিও বস্তুর বিস্তৃতি প্রত্যক্ষণের ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে। আগেই গতি বা সঞ্চালনের সংবেদনের কথা বলা হয়েছে। এই সংবেদনটিও স্থান প্রত্যক্ষণে সাহায্য করে। গতি যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হয় আমরা ধরে নিই সেটি পূর্ণস্থান। গতি যেখানে অব্যাহত থাকে সেখানে শূন্যস্থানের কথা বলে থাকি। এছাড়া আমাদের চলা ফেরা, হাত-পা নাড়া, চোখ ঘোরানো ইত্যাদি থেকেও দূরত্ব ও দিক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। অন্ধ ব্যক্তিরা বস্তুর বিস্তৃতি প্রত্যক্ষণে পৈশিক অনুভূতির উপর অনেক বেশী নির্ভর করে।

সময় প্রত্যক্ষ (Perception of Time): সংবেদনের স্থিতি থেকে আমরা সময়ের প্রত্যক্ষণ পেয়ে থাকি। সময় হচ্ছে বিভিন্ন ঘটনার পূর্বাপর সম্পর্কের ভিত্তি। আমাদের প্রত্যেক সংবেদনা, চিন্তা, কল্পনা, সব কিছুরই একটা নির্দিষ্ট স্থায়িত্ব আছে। পৃথিবীতে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। পরিবর্তনশীল বিশ্বজগতে এই মুহূর্তে যা আছে, পর মুহূর্তে তা আর নেই। আবার বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে কোনটি আগে ঘটছে, কোনটি পরে ঘটছে আবার কোন কোন ঘটনা একই সঙ্গে ঘটছে। সবকিছুর স্থায়িত্ব কিন্তু সমান নয়;

কোনটির বেশী, কোনটির বা কম। স্থিতি ছাড়া পারম্পর্যও (succession) কাল প্রত্যক্ষণে সাহায্য করে। কাল যদিও এক অনন্ত প্রবাহ, তবুও আমরা বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ—এই তিনটি স্তরে কালকে ভাগ করেছি। কিন্তু আমরা শুধু বর্তমানকেই প্রত্যক্ষ করি। অতীত ও ভবিষ্যৎকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না, আমি যতক্ষণ ধরে একটা অভিজ্ঞতা লাভ করছি সেইটুকু সময় হ'ল আমার কাছে 'বর্তমান'। বর্তমানের অনুভূতি হ'ল—অভিজ্ঞতাটি ঘটছে। অভিজ্ঞতাটি যখন থেমে যায় তখন তার কথা চিন্তা করলে আমরা 'অতীত' সম্বন্ধে ধারণা লাভ করি। তখন বুঝতে পারি অভিজ্ঞতাটি এক সময় ছিল—এখন আর নেই। তেমনি যখন কোন কিছুর জন্য আমরা প্রত্যক্ষ করি অর্থাৎ কোন কিন্তু এখনো ঘটে নি, কিন্তু ঘটবে এই আশা করি তখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা জন্মে। এক কথায় বলা যায়, কোন অভিজ্ঞতা ঘটছে এই অনুভূতিটাই বর্তমানের অনুভূতি। অন্তর্হিত অভিজ্ঞতার স্মৃতি থেকে অতীত সম্বন্ধে ও প্রতীক্ষিত অভিজ্ঞতার কল্পনা থেকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা অর্জিত হয়ে থাকে।

আগেই বলা হয়েছে আমরা কেবলমাত্র বর্তমানকেই প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল—কতটুকু সময় নিয়ে বর্তমান কাল হয়? কবির ভাষায় 'সময় চলিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়'। এই স্রোতধারা প্রতিনিয়ত বর্তমান থেকে অতীতের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। আমরা কোন কিছুতে ৪।৫ সেকেণ্ডের বেশী মনোনিবেশ করতে পারি না। এই সময়টুকুকে সত্যকারের বর্তমান বলে অনুভূত হয়। এটিকে বলা হয় **অনুভূত বর্তমান** (Sensory Present) বা **আপাতঃ বর্তমান** (Immediate Present)। উইলিয়ম জেমস্ এটিকে বলেছেন **অলীক বর্তমান** (Specions Present)। বর্তমান কালটি হ'ল অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র।

সব পরিমাণ সময় কিন্তু সব সময় সমান দীর্ঘ মনে হয় না। ৬টা থেকে ৯টার পরিমাণ সব সময় তিন ঘণ্টা। কিন্তু একটি সিনেমা হলের তিনটি ঘণ্টা আর একটি জনহীন অন্ধকার ছোট রেল-স্টেশনে ট্রেনের জন্য প্রতীক্ষিত তিনটি ঘণ্টার পরিমাণ কার্যতঃ এক হ'লেও এক বলে মনে হবে না। যে সময়টি আনন্দের মধ্যে কাটে তাকে কম বলে মনে হয়। আবার যে সময়টি কষ্টের মধ্যে কাটে তাকে দীর্ঘ বলে মনে হয়। তাই আমরা বলে থাকি সুখের দিন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় আর দুঃখ-নিশি যেন পোহাতেই চায় না। এর উল্টোটাও ঘটে।

আমরা যখন অতীতের কথা চিন্তা করি, তখন কিন্তু সুখের সময়টাকেই দীর্ঘ ও দুঃখের সময়টাকে হ্রস্ব বলে মনে হয়। এর কারণ হ'ল আমরা সুখের কথাই মনে করে রাখতে চাই আর দুঃখের কথা ভুলতে চাই। তাছাড়া সুখ-স্মৃতিকে কমিয়ে দেখার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে দেখা যায়।

কোন বাহ্যবস্তু প্রত্যক্ষ করতে হলে কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু কালকে প্রত্যক্ষ করার জন্ত কোন ইন্দ্রিয় নেই। গেস্টাল্ট-বাদীরা মনে করেন, আমাদের মস্তিষ্ক সরাসরি কাল প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং এই ক্ষমতাটি হ'ল মস্তিষ্কের একটি মৌলিক ক্ষমতা।

দূরত্ব, ঘনত্ব ও গভীরতা প্রত্যক্ষণ (Perceptior of Distance, There-Dimension and Depth): আমরা যখন কোন বস্তুর দিকে তাকিয়ে থাকি, তখন সেই বস্তুটি থেকে আলো বিচ্ছুরিত হ'য়ে আমাদের চোখের মধ্যে রেটিনা বা অক্ষপটের উপর প্রতিফলিত হয়। ফলে সেখানে বস্তুটির একটি প্রতিকৃতি বা ছবির সৃষ্টি হয়। এই প্রতিকৃতিটি কিন্তু বইয়ের পাতায় ছাপা ছবির মত, দ্বি-আয়তন-বিশিষ্ট যার কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে, বোধ বা গভীরতা নেই। কিন্তু আমরা তো বস্তুটিকে ত্রি-আয়তন-বিশিষ্ট বস্তু হিসেবেই প্রত্যক্ষ করে থাকি। কাজেই প্রশ্ন উঠবে, অক্ষিপটে প্রতিফলিত ছবিব যখন কোন গভীরতা থাকে না তখন আমরা দূরত্ব, গভীরতা বা ত্রি-আয়তন প্রত্যক্ষ করি কি ভাবে? এর কারণগুলিকে আমরা মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করে নিতে পারি, যথা—

এক চক্ষুমূলক কারণ (Monocular Factors) ও
দ্বি-চক্ষুমূলক কারণ (Binocular Factors)।

এখন কারণগুলির সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক—

(ক) **একচক্ষুমূলক কারণ** (Monocular Factors): যখন আমরা একটি চোখ ব্যবহার করি তখন নীচের কারণগুলি আমাদের গভীরতা ও ত্রি-আয়তন দেখতে সাহায্য করে। এগুলিকেই এক চক্ষুমূলক কারণ বলা হয়ে থাকে। অবশ্য বলাই বাহুল্য যে, এই কারণগুলির দ্বি-চক্ষুমূলক দর্শনের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

[এক] **বস্তুর আয়তন** (Size): কোন বস্তুর স্বাভাবিক আয়তন সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই একটা ধারণা আছে। বস্তুটি যত দূরে থাকে, তার আয়তন বিশেষ করে উচ্চতা তত ছোট দেখায়। ঠিক মাথার উপরে

একটা চিল উড়লে যত বড় দেখায়, অনেক উঁচুতে উড়লে তার চেয়ে অনেক ছোট দেখায়।

[দুই] **বস্তুর বাধা** (Interposition of Objects): কোন একটি বস্তু যখন অন্য আর একটি বস্তুকে আড়াল করে রাখে, তখন যেটি সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে সেটি নিকটে এবং যেটি আংশিক ভাবে দেখা যাচ্ছে—সেটি দূরে অবস্থিত বলে ধরে নেওয়া হয়। সুতরাং কোন বস্তু যে পরিমাণ অস্পষ্ট দেখায় সেটি যে সেই পরিমাণ দূরে আছে তা আমরা বুঝতে পারি।

[তিন] **রেখামূলক অনুপাত** (Linear Perspective): দুটি সমান্তরাল সরলরেখা আমাদের থেকে যত দূরে চলে যায় ততই তাদের মাঝখানের দূরত্বটি (বস্তুতঃ এক থাকলেও) ক্রমশঃ যেন কমতে কমতে শেষে একটি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে বলে মনে হয় রেল লাইনের উপর দাঁড়ালে মনে হয় লাইনগুলি যেন দূরে গিয়ে একটি বিন্দুতে মিশে গেছে। এই ক্রমহ্রাসমান বিস্তৃতি থেকে আমরা দূরত্বের ধারণা করি।

[চার] **বায়বীয় অনুপাত** (Aerial Perspective): যে বস্তুটি আমাদের কাছে থাকে, সেটিকে স্পষ্ট দেখা যায়। তার খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য-গুলিও আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। কিন্তু বস্তুটি যত দূরে অবস্থিত হবে, ততই মধ্যবর্তী বাতাসের পরিমাণ বাড়বে আর তার ফলে ধুলো, বালি ইত্যাদিতে আমদের দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে বস্তুটি অস্পষ্ট দেখাবে। সুতরাং কোন বস্তু যে পরিমাণে অস্পষ্ট দেখায়, সেটি যে সেই পরিমাণ দূরে আছে তা আমরা বুঝতে পারি।

[পাঁচ] **আলো ছায়া** (Light and Shade): বস্তুর উপর আলো-ছায়ার বিন্যাস দেখেও আমরা তার দূরত্ব ও গভীরতা নির্ণয় করতে পারি। যে বস্তু যত কাছে থাকে, সেটি তত উজ্জ্বল দেখায়। আবার যে বস্তু যত দূরে থাকে তাকে তত বেশী অনুজ্জ্বল বা আব্‌ছা মনে হয়। এই কারণে বহুদূরে অবস্থিত গাছ-পালা বা পাহাড় পর্বত ধূসর দেখায়। আবার গর্ত বা নীচু জায়গাতে ছায়ার সৃষ্টি হয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উঁচু বা সমতল জায়গা আলোকিত দেখায়।

[ছয়] **লম্বন** (Parallax): যখন আমরা রেলগাড়ী বা মোটর-গাড়ীতে চড়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলি, তখন বাইয়ের দিকে মনে হয় পথের দু'ধারের গাছপালা, ঘরবাড়ী, লোকজন সব যেন দ্রুতগতিতে আমাদের উল্টোদিকে

ছুটে চলেছে। কিন্তু দূরের গাছপালা, ঘরবাড়ী, পাহাড়-পর্বত সমান তালে আমাদের সঙ্গে একই দিকে ছুটে চলে বলে মনে হয়। দূরত্বের মাত্রা অনুযায়ী চোখ সরানোর সঙ্গে সঙ্গে বস্তুগুলির বৈষম্যপূর্ণ সঞ্চালনকে লম্বন (Parallax) বলে। কাজেই বস্তুর সঞ্চালন লক্ষ্য করে আমরা তার অবস্থিতির দূরত্ব নির্ণয় করতে পারি।

[সাত] **বস্তুর সংখ্যা** (Number of objects): এটা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা যে, আমাদের ও একটি নিকটবর্তী বস্তুর মধ্যে যতগুলি অন্য প্রকার বস্তু থাকে, তার তুলনায় আমাদের ও একটি দূরবর্তী বস্তুর মধ্যে অনেক বেশী অন্য প্রকার বস্তু থাকে। যে কোন শহরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাছে ও দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেই ব্যাপারটি বোঝা যাবে। কাজেই আমাদের ও নির্দিষ্ট বস্তুটির মধ্যবর্তী বস্তুগুলির সংখ্যা অনুযায়ী নিকট ও দূরের ধারণা অর্জিত হতে পারে।

[আট] **সঙ্গতিবিধান** (Accommodation): আমরা যখন খুব কাছের জিনিস লক্ষ্য করি তখন চোখের মধ্যবর্তী লেন্সটি (eye-ball বা lens) বেশী গোলাকার হয়ে ওঠে। আর দূরের জিনিস লক্ষ্য করার সময় সিলিয়ারী পেশীর চাপে লেন্সটি আরো বেশী সমতল হয়ে পড়ে। চোখের এই পরিবর্তন আমাদেব নিকট ও দূর সম্বন্ধে একটা ধারণা অর্জন করতে সাহায্য করে।

দ্বি-চক্ষুমূলক কারণ (Binocular Factors): দূরত্ব, গভীরতা ও ত্রি-আয়তন প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত কারণ কেবলমাত্র দ্বি-চক্ষুমূলক প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেগুলিকে দ্বি-চক্ষুমূলক কারণ বলা হয়। সে সমস্ত কারণ হ'ল:—

[এক] **কেন্দ্রী-ভবন** (Convergence): কোন বস্তুকে ভাল করে দেখতে হলে সেটিকে আমাদের দুটি চোখের ফোভিয়ার সমরেখায় আনতে হয়। এর ফলে চোখের গোলকের মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করতে হয় যাতে বস্তুটি ফোভিয়া দুটির কেন্দ্রে আসে, কাছের বস্তু দেখার সময় চোখ দুটি ভিতরের দিকে সরে আসে, কিন্তু দূরের জিনিস দেখার সময় চোখ দুটি প্রায় সমান্তরাল হয়ে উঠে। এ ইরূপ কেন্দ্রীভবনের ফলে চোখের মধ্যে যে পরিবর্তন আসে, তা থেকে মস্তিষ্ক দূরত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেয়।

[দুই] **অক্ষিপটমূলক বৈষম্য** (Retinal Disparity): আমাদের দুটি অক্ষিপটে দু'রকমের বিন্দু দেখা যায়—(ক) সদৃশবিন্দু (Corresponding

points) এবং (খ) অসদৃশ বিন্দু (Disparate points)। কোন বস্তু হ'তে আলোক-তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়ে যখন দুটি অক্ষিপটের সদৃশবিন্দুর উপর পড়ে, তখন বস্তুটিকে আমরা একটি বস্তু হিসেবেই দেখি। কিন্তু যখন আলোক-তরঙ্গ পুরোপুরি ভাবে অক্ষিপট দুটির অসদৃশ ·বিন্দুতে পড়ে, তখন আর বস্তুটিকে আমরা একটি বস্তু হিসেবে দেখি না, অবিকল এক রকমের দুটি বস্তু প্রত্যক্ষ করি। যখন কোন বস্তু হ'তে আলোক-তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হ'য়ে দুটি অক্ষিপটের সদৃশ বিন্দুর সন্নিহিত অসদৃশ বিন্দুগুলির উপর পড়ে, তখন আমরা বস্তুটির দুটি পৃথক (অথচ অবিকল) প্রতিচ্ছবি না দেখে বস্তুটিকে একটি মাত্র বস্তু হিসেবেই প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু বস্তুটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সঙ্গে তার ঘনত্বও প্রত্যক্ষ করে থাকি। অক্ষিপট দু'টির অসদৃশ বিন্দুতে আলোক-তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়ে পড়লে অক্ষিপট দুটিতে একই বস্তুর দু'টি ভিন্ন জাতীয় প্রতিচ্ছবির সৃষ্টি হয়। পরে নব মস্তিষ্কের প্রভাবে ওই প্রতিচ্ছবি দু'টি পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত (fused) হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রতিচ্ছবি দু'টি হুবহু এক প্রকারের হয় না বলে তারা পুরোপুরি সম্পৃক্ত হতে পারে না। ফলে আমরা বস্তুটির ঘনত্ব দেখতে পাই। দু'টি ভিন্ন জাতীয় প্রতিচ্ছবিকে মিলিয়ে একটি ছবি তৈরী করার যে মানসিক প্রচেষ্টা আমাদের আছে—তাও বস্তুটির ঘনত্বের ধারণা দিতে পারে। Wheatstone উদ্ভাবিত সম্পৃক্তক (Sterescope) নামক যন্ত্রের সাহায্যে বিষয়টি প্রমাণ করা যায়। একই বস্তুর দু'টি সাধারণ দ্বি-আয়তন-বিশিষ্ট সমতল ছবি নেওয়া হয়। ডান চোখ দিয়ে দেখলে বস্তুটি যেমন দেখায় ঠিক সেই রকম একটি ছবি, আর বাম চোখ দিয়ে দেখলে যেমন দেখায় সেই রকম আর একটি ছবি। ছবি দু'টি তোলা হয় আড়াই ইঞ্চির ব্যবধানে—কারণ আমাদের দু'টি চোখের মধ্যে ব্যবধান আড়াই ইঞ্চি। এইবার ছবি দুটি ঐ যন্ত্রে এমন ভাবে রাখা হয়, যাতে ডান দিক থেকে তোলা ছবিটি ডান চোখের দৃষ্টিপথে পড়ে, আর বামদিক থেকে তোলা ছবিটি বাম চোখের দৃষ্টিপথে পড়ে। এইবার যন্ত্রটির মধ্যে তাকালে চোখের সমানে ভেসে উঠবে একটি মাত্র ছবি—যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ঘনত্ব আছে। অর্থাৎ ছবি দু'টিকে ফটোতে দেখতে যেমন লাগে, তেমন না দেখে খালি চোখে ওদের যেমন দেখায়, ঠিক সেই রকম দেখাবে। যে জায়গাটি ঢালু, তাকে ঢালু দেখাবে, যেখানে গর্ত আছে, সেখানে গর্ত দেখাবে, পুরু জিনিসকে পুরু দেখাবে। এই জাতীয় সিনেমাও আজকাল দেখানো হচ্ছে।

দু'চোখ দিয়ে না দেখে যদি একচোখ দিয়ে দেখি, তাহ'লেও বস্তুর ঘনত্ব দেখতে পাই। এর কারণ হ'ল অভ্যাস ও অক্ষিপটের বিন্দুগুলির উত্তেজনা। এক চোখ বন্ধ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে দু'চোখ দিয়ে দেখার মত কাজ হয়।

দূরত্ব প্রত্যক্ষণের ব্যাপারে অন্যান্য ইন্দ্রিয় বিশেষতঃ নাক, কান ও ত্বক ও যথেষ্ট সহায়তা করে থাকে। যখন কোন গন্ধ আমরা তীব্রভাবে অনুভব করি তখন বুঝতে পারি, গন্ধের উৎসটি কাছাকাছি কোথাও অবস্থিত। তেমনি কোন শব্দ যখন স্পষ্ট ভাবে শুনতে পাই তখন বুঝতে পারি শব্দটা খুব কাছাকাছি জায়গা থেকে আসছে। আবার খুব কাজের জিনিস আমরা স্পর্শ করতে পারি কিন্তু দূরের জিনিসকে তার কাছে না গিয়ে স্পর্শ করতে পারি না।

ঘনত্ব প্রত্যক্ষণে পৈশিক অনুভূতিও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। চোখ বন্ধ রেখেও কোন বস্তুর চারধারে (সামনে, পিছনে, ধারে, সবদিকে) যদি আমরা হাত বুলাই, তাহ'লে বুঝতে পারব বস্তুটির ঘনত্ব কি রকম। কোন্ কোন্ দিকে বা কোন্ দিক হতে কোন্ দিকে হাত ঘোরাতে হ'ল, কতটা ঘোরাতে হ'ল, কী পরিমাণ পেশী সঞ্চালন করতে হ'ল তার অনুভূতি আমাদের মনে বস্তুটির ঘনত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণার সৃষ্টি করবে।

ফাই-ঘটনা (Phi-Phenomenon): আমরা অনেক ক্ষেত্রে আপাত-গতি বা ভ্রান্তগতি প্রত্যক্ষ করি। যেমন, কলকাতার রাস্তায় নিয়ন লাইটের বিজ্ঞাপনে দেখি ফ্যানটি ঘুরছে, ব্যাটারী হাতে নিয়ে লোকটি দৌড়াচ্ছে, কেট্‌লী থেকে চা ঢালা হয়ে যাচ্ছে পেয়েলাতে ইত্যাদি। এ সমস্ত ক্ষেত্রে আসলে বস্তুগুলি স্থির বা গতিহীন। কিন্তু আমরা তাদের গতিশীল দেখি। নিশ্চল বস্তুতে গতি প্রত্যক্ষ করার ঘটনাটিকে বলা হয় আপাত গতি-প্রত্যক্ষ বা ফাই-ঘটনা। চলচ্চিত্র হ'ল এই ঘটনা বোঝানোর শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। চলচ্চিত্রে ব্যক্তি বা বস্তুর বিভিন্ন অবস্থার কতকগুলি স্থির ছবি একটি যন্ত্রের সাহায্যে পর্দার উপর অতি দ্রুত পর পর ফেলা হয় (অন্ততঃ প্রতি সেকেণ্ডে ১৬টি ছবি) তার ফলে সেই ব্যক্তি বা বস্তুকে গতিশীল বলে মনে হয়। এর কারণ হ'ল, প্রথম চিত্রের যে দৃষ্টিমূলক সংবেদন মনের মধ্যে একটি উত্তর-প্রতিরূপ বা অনুবেদন (after-image বা after-sensation) রেখে যায়, সেটি পরের চিত্রের দৃষ্টিমূলক সংবেদনের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্থির চিত্রগুলির সাহায্যে একটি অবিরাম বা নিরবচ্ছিন্ন চলমাত্র চিত্রের ধারণা নিয়ে আসে। চোখের সাহায্যে

গতি প্রত্যক্ষ করার বিষয়টি কিন্তু গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, গতি প্রত্যক্ষ অনুমান-নির্ভর নয়। এই গতি প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা মনের একটা বিশেষ মৌলিক ক্ষমতা।

ওয়েবার-ফেক্‌নার সূত্র (Webar-Fechner Law): কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করতে হ'লে সেটিকে একটি নিম্নতম তীব্রতার অধিকতর হতে হবে, যার চেয়ে কম তীব্রতা হ'লে তাকে আমরা আর প্রত্যক্ষ করতেই পারব না। এই তীব্রতাকে বলা হয় "সংবেদনার চৌকাঠ" (Threshold of Sensation)। তীব্রতার পরিমাণ বাড়তে থাকলে যে পরিমাণটির পর আমরা আর কোন প্রকার বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করতে পারি না সেই তীব্রতাকে বলা হয় "সংবেদনার সীমান্ত বা চরম বিন্দু" (Height of Sensibility)। এই সীমার বাইরে সংবেদনার কোন পরিবর্তন হয় না। এই দুই সীমার মধ্যবর্তী ক্ষেত্রকে বলা হয় "সংবেদনার সীমানা" (Range of Sensibility)। সংবেদনার সীমানার মধ্যেও তীব্রতার সব রকম বৃদ্ধি আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না। তীব্রতা কতটা বাড়লে সংবেদনা কতটা বাড়বে, সে বিষয়ে জনৈক জার্মান মনোবিদ্ ওয়েবার (Weber) প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি সূত্র আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেক সংবেদনার ক্ষেত্রে তীব্রতার বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করতে হ'লে বস্তুটির তীব্রতাকে একটি নির্দিষ্ট হারে বা অনুপাতে বাড়তে হবে। তিনি একটি নির্ভুল আংশিক সূত্র আবিষ্কার করেন, যেটি হ'ল : The stimuli increase in G.P. while the sensations, the Psychical Series, increase in A.P.

$S = C \log R$, [when S = Sensation, R = Stimuli, C = Constant.]

একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে।

উদ্দীপক —		বোধ
16 গ্রাম	—	বো
17 "	—	-ঐ-
18 "	—	-ঐ-
19 "	—	-ঐ-
20 "	—	বো+1. (তীব্রতা বাড়ল)।
21 – 24 "	—	বো+1
25 "	—	বো+1+1 (তীব্রতা বাড়ল)।

প্রথমে বারে তীব্রতা বাড়ল $16 \times \frac{5}{4}$ বা 20 গ্রামে। দ্বিতীয় বারে তীব্রতা বাড়ল $20 \times \frac{5}{4}$ বা 25 গ্রামে। এখানে অনুপাতটি $\frac{5}{4}$ সকল প্রকার সংবেদনায় ক্ষেত্রে তীব্রতা বৃদ্ধির এই অনুপাত বা হার সমান নয়।

শিক্ষামূলক দিক : শিশুর শিক্ষার ব্যাপারে সংবেদন ও প্রত্যক্ষের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এই দু'টিই হ'ল শিশুর শিক্ষার প্রাথমিক সোপান স্বরূপ বা জ্ঞানের প্রবেশ-পথ। সেইজন্য আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সংবেদন ও প্রত্যক্ষের যথাযথ শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফ্রয়েবেল, মণ্টেসরী প্রভৃতি ইন্দ্রিয় শিক্ষণের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আবার Dalton Plan, Project Method, Laboratory Method, Activity Principle প্রভৃতির সাহায্যে প্রত্যক্ষ বা পর্যবেক্ষণের শিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই সবের উদ্দেশ্যই হ'ল, শিশুর পর্যবেক্ষণ শক্তিকে উন্নততর করা। আধুনিক যুগে প্রতিটি শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীর কর্তব্য হ'ল ইন্দ্রিয়-শিক্ষণের মাধ্যমে শিশুর সংবেদন ও প্রত্যক্ষকে উন্নততর শক্তিশালী করা—যাতে সে একজন যোগ্য নাগরিক হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। প্রত্যক্ষের ভিত্তিই হ'ল অভিজ্ঞতা। কাজেই শিশুর অভিজ্ঞতা যাতে বাস্তবধর্মী ও তৃপ্তিদায়ক হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত।

———

শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ
(Nature of Educational Psychology)

[কতকগুলি সংজ্ঞা :—

1, Psychology is the positive science of human experience and behaviour.
R. H. Thouless.

2. Psychology is a positive Science of conduct and behaviour—*Mc. Dougall.*

3. Psychology is the science of the activities of the individual in relation to the environments—*Woodworth.*

4. Educational Psychology deals with the behaviour of human beings in educational situations.—*Skinner.*

5. Educational Psychology is the study of the Psychological aspects of educational situation.—*Trow.*]

মনোবিজ্ঞান কথাটির সঙ্গে বিজ্ঞান কথাটি যুক্ত ব'লে আমরা মনোবিজ্ঞানকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে ধরে নিতে পারি। কিন্তু এই বিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত নবীন। বিভিন্ন বিজ্ঞানের আবির্ভাবের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—জ্যোতির্বিদ্যাই বোধ হয় প্রথম বিজ্ঞান। তারপর আসে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, তারও পরে জীব বিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞানের আবির্ভাব অনেক পরে এবং সম্ভবতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৮৭৯ সালে লিপ্‌জিগ সহরে মিঃ ভুণ্ড কর্তৃক প্রথম মনো-বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।

এক একটি বিজ্ঞান এক একটি বিশেষ জাতীয় বিষয় বা বস্তুর সম্বন্ধে আলোচনা করে। পৃথক বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞানেরও একটি পৃথক বিষয়-ক্ষেত্র থাকা স্বাভাবিক। এখন দেখা যাক্ এই বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কি? মনোবিজ্ঞানের ইংরেজী প্রতিশব্দটি হল—Psychology, দুটি গ্রীক্ শব্দ নিয়ে Psychology কথাটির উৎপত্তি। একটি হ'ল 'Psyche' যার অর্থ হল 'soul' বা আত্মা; আর অপরটি হ'ল—'logos' বা science যার অর্থ হ'ল বিজ্ঞান। সুতরাং এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল—আত্মার বিজ্ঞান। কিন্তু এই সংজ্ঞাটি দর্শন-শাস্ত্রের উপর ভিত্তি ক'রে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়2

মাহের (Maher) যা বলেছেন, তা হ'ল—"মনোবিজ্ঞান হল দর্শনের সেই শাখা যা মানুষের মন বা আত্মা নিয়ে আলোচনা করে।" এই জাতীয় দার্শনিক-মনোবিজ্ঞানীদের কাজ আত্মার উৎপত্তি, স্বরূপ ও পরিণতি নিয়ে আলোচনা করা।

পরবর্তী মনোবিজ্ঞানীরা কিন্তু উপরোক্ত সংজ্ঞাটি মেনে নিতে পারলেন না। মনোবিজ্ঞানকে আত্মার বিজ্ঞান হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে না ব'লেই তাঁরা মনে করলেন এবং তার সপক্ষে তাঁরা কতকগুলি যুক্তি দেখালেন। মোটামুটি ভাবে তাদের বক্তব্য ছিল—

(১) আত্মার বিজ্ঞান বললে মনোবিজ্ঞানকে দর্শন ও অধিবিদ্যার (Metaphysics) শাখা বা অংশ হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু মনোবিজ্ঞান একটি পৃথক বিজ্ঞান।

(২) আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে দার্শনিকেরা একমত নন। যা সর্বজনীন নয়, তা দিয়ে কোন বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে না।

(৩) মনোবিজ্ঞান হল বিষয়নিষ্ঠ ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক বিজ্ঞান। বিজ্ঞান হলেই তা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল হবে। কিন্তু আত্মা অতীন্দ্রিয়। তাই তাকে নিয়ে কোন পর্যবেক্ষণ চালানো অসম্ভব। কাজেই আত্মার বিজ্ঞান কথাটিই সম্পূর্ণ ভুল।

মধ্যযুগে মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দেওয়া হ'ল **মনের বিজ্ঞান**। এই সময় মনোবিদ্‌গণ মনে করতেন মনোবিদ্যায় থাকবে মন সম্বন্ধে নানা বৈজ্ঞানিক আলোচনা। কিন্তু এখানেও নানা রকম অসুবিধা দেখা গেল। মন কথাটিও তো আত্মার মতই ব্যাপক। তাছাড়া ম্যাক্‌ডুগাল বলেন—"মন হল দ্ব্যর্থক শব্দ, এরই সংজ্ঞা দেবার প্রয়োজন আছে।" কাজেই যে জিনিষ সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণাই গড়ে ওঠে নি, তাকে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু করা যেতে পারে না। আবার তর্কশাস্ত্র, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতিও "মন" নিয়ে আলোচনা করে। এই "মন" আর মনোবিজ্ঞানের "মন"—এই দুটির মধ্যে কি পার্থক্য, তা সুস্পষ্ট ভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার মনের পরিবর্তে চেতনা কথাটি ব্যবহার করে মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে চেয়েছিলেন **চেতনার বিজ্ঞান** হিসাবে। এঁরা কিন্তু 'মন' ও 'চেতনা' দুটি শব্দকেই এক অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু এখানেও অনেক অসুবিধা দেখা দিল, যেমন—চেতনা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত জিনিষ,

কাজেই একজনের চেতনাকে কেবলমাত্র সে-ই প্রত্যক্ষ করতে পারে। কোন একজন লোকের চেতনাকে অনেকে মিলে পর্যবেক্ষণ করতে পারে না। চেতনা সম্বন্ধে কোন সর্বজনীন মতে পৌঁছানো যায় না। মন বলতে কেবল মাত্র চেতনাকেই বোঝায় না; মনের মধ্যে যে সমস্ত ধারণা, বাসনা, অনুভূতি ইত্যাদি আছে, তারা মাঝে মাঝে চেতনায় মধ্যে আসে ঠিকই, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তারা চেতনার বাইরেই থাকে।

মনোবিজ্ঞান যখন 'আত্মার' বিজ্ঞান ছিল তখন কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণা করা সম্ভব ছিল না। কল্পনা, অনুমান প্রভৃতির উপর ভিত্তি করেই গবেষণা চালিয়ে যেতে হত। যখন মনোবিজ্ঞানকে 'মন' বা 'চেতনা'র বিজ্ঞান বলে ধরে নেওয়া হ'ল, তখন গবেষণার পদ্ধতি হ'ল—**অন্তর্নিরীক্ষণ** (Introspection)। নিজের মনের প্রক্রিয়াগুলিকে যখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিজে নিজেই পরীক্ষা করা হয়, তখনই তাকে অন্তর্নিরীক্ষণ বলে। যাই হোক্ এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই মনোবিজ্ঞানীরা অনেক নূতন তথ্য ও তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে একদল মনোবিজ্ঞানী এই পদ্ধতিটিকে এবং পূর্ববর্তী মনোবিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত তথ্য ও তত্ত্বগুলিকে অপ্রমাণিত ও অনুমান-ভিত্তিক বলেই সেগুলি স্বীকার করে নিলেন না। এঁরা হলেন আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানী।

এই সমস্ত মনোবিজ্ঞানী বললেন মনোবিজ্ঞান হবে **আচরণের বিজ্ঞান**। প্রধানতঃ দুটি কারণে এঁরা আচরণকে মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু বলে ধরে নিয়েছিলেন। প্রথমতঃ আচরণ চেতনায় মত ব্যক্তিগত নয়, অর্থাৎ কোন একজনের আচরণকে অনেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ কোন একজনের আচরণ দেখেই আমরা তার চেতন ও চেতনাতিরিক্ত মনের পরিচয় পেতে পারি। কেউ যখন রাগ করে, বা খুশী হয়, তখন সে যে রাগ করেছে বা সে যে খুশী হয়েছে, তা কি করে বুঝতে পারা যায়? এক্ষেত্রে তাদের রাগ বা খুশীর অনুভূতি দেখতে পাওয়া যায় না। 'কিন্তু তার আচার-আচরণ, কথাবার্তা, দৈহিক পরিবর্তন (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ) ইত্যাদি লক্ষ্য করেই ঠিক করে নিতে হয় সে রাগ করেছে, না, খুশী হয়েছে! কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—আচরণ কাকে বলব? ওয়াট্‌সন বললেন—কোন উদ্দীপক (Stimulus) মানুষের শরীরের উপর সক্রিয় হবার ফলে দেহে যে সাড়া বা প্রতিক্রিয়া (Response) দেখা দেয়—তাকেই আচরণ বলা যেতে পারে। আবার এই

মতবাদটি মেনে নিলে-মনোবিজ্ঞানকে বলা যেতে পারে **উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত বিজ্ঞান।**

আপাতঃ দৃষ্টিতে আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীরা যে সংজ্ঞা দিয়েছেন বা যে যুক্তি দেখিয়েছেন, সেটি বেশ ভাল বলেই মনে হয়। কিন্তু এর বিরুদ্ধেও কতকগুলি যুক্তি আছে। যেমন—মানুষের আচরণ তার চেতন মনেরই বাহ্য প্রকাশ; সুতরাং আচরণ বলতে কেবলমাত্র দৈহিক পরিবর্তনই বোঝায় না—চেতনার পরিবর্তনকেও বুঝায়। তাছাড়া চেতন মনকে বাদ দিলে আমরা উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে পারি না। আবার কোন একটি উদ্দীপক জীবদেহে কিরকম প্রতিক্রিয়া ঘটাবে তা নির্ণয় করে দেয় মন। সবচেয়ে বড় কথা হল আচরণবাদীরা আচরণের ব্যাখ্যা করতে যেয়ে মানুষকে একটি দেহবিশিষ্ট যন্ত্রে পরিণত করে ফেলেছেন।

মনোবিজ্ঞানের বার বার সংজ্ঞা পরিবর্তিত হ'তে দেখে Woodworth একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন—First, Psychology lost its soul, and then it lost its mind, then it lost consciousness. It still has behaviour of a kind.

যাই হোক, বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে আমরা বলতে পারি—দেহগত ও চেতনাগত উভয় প্রকার আচরণই হল মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। এক কথায় বলা যেতে পারে, সম্পূর্ণ মানুষটিই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। ম্যাকৃডুগালের মতে, মনোবিজ্ঞান হল জীবের আচরণ সম্বন্ধীয় বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান (Positive Science)। উড্ওয়ার্থের মতে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কীয় বিজ্ঞানই হল মনোবিজ্ঞান।

পরিশেষে বলা যেতে পারে—মনোবিজ্ঞান একটি বাস্তবধর্মী, আচরণ সম্বন্ধীয় বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান। কোন্ পরিস্থিতিতে প্রাণী কিভাবে আচরণ করে থাকে, এই বিজ্ঞানে সে সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়ে থাকে। কোন একটি বিশেষ আচরণ ভাল না মন্দ, কি পরিস্থিতিতে কি রকম আচরণ করা উচিত এ সবের আলোচনা করা মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়। প্রাণীর আচরণের ভিত্তিতে মানসিক প্রক্রিয়াগুলির বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিন্যাস, গতি প্রকৃতি, নিয়ম, কারণ ও পরিণাম ব্যাখ্যা করা এবং মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যে সমস্ত দৈহিক প্রক্রিয়া যুক্ত আছে, সেগুলির বর্ণনা করাই হল মনোবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য।

ROBERT S. WOODWORTH

1869—

মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা :—অন্যান্য অনেক বিজ্ঞানের মতো মনোবিজ্ঞানকেও প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই দুটি ভাগ হল—(১) **সাধারণ** বা **বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞান** (Pure) এবং (২) **ব্যবহারিক** বা **ফলিত মনোবিজ্ঞান** (Applied)। বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞানে প্রাণীর বিভিন্ন ধরনের আচরণগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়। ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানে কিভাবে ঐ সমস্ত নিয়মকে আশ্রয় করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাণীর আচরণ নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। এই দুটি প্রধান ভাগের উপর ভিত্তি করে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব হয়েছে। কতকগুলি শাখা হল প্রাণী মনোবিজ্ঞান (Animal), শিশু-মনোবিজ্ঞান (Child), অস্বাভাবিক মনের বিজ্ঞান (Abnormal), সমাজ-মনোবিজ্ঞান (Social), শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান (Educational), শ্রম-মনোবিজ্ঞান (Industrial), পরিসংখ্যান-মনোবিজ্ঞান (Statistical) প্রভৃতি। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান। এই শাখাটি মনোবিজ্ঞানের ব্যাবহারিক রূপ। এতে শিক্ষার্থীর আচরণ সম্বন্ধেই প্রধানতঃ আলোচনা করা হয়ে থাকে। আমরা কেমন করে শিখে থাকি, কি ভাবে মনে করি ও ভুলে যাই, কিভাবে শিক্ষার্থীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়, শিক্ষার সাফল্য কিসের উপর নির্ভর করে, কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করলে শিক্ষা সহজ ও স্থায়ী হয়, এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করা হয় শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান যখন প্রথম গড়ে ওঠে তখন সাধারণ মনোবিজ্ঞানের (General) যথেষ্ট সাহায্য নিতে হয়েছিল সত্য, কিন্তু পরবর্তী কালে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান একটি পৃথক ও স্বয়ং সম্পূর্ণ বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর জন্য বলা হয়—শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান তার উৎপত্তির জন্য সাধারণ মনোবিজ্ঞানের নিকট যে ঋণ গ্রহণ করেছিল তা সম্পূর্ণ পরিশোধ করেও সাধারণ মনোবিজ্ঞানকে আবার কিছু ঋণ দিতেও সক্ষম হয়েছে। যাই হোক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান যখন শিক্ষার সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত, তখন প্রথমে আমাদের শিক্ষার স্বরূপটি কি, তা জানতে হবে।

শিক্ষার স্বরূপ (Nature of Education) :—শিক্ষার ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Education' এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Educere' থেকে। শব্দটির অর্থ হল কোন কৌশল আয়ত্ত করা বা কোন তথ্য সংগ্রহ করা। সভ্যতার প্রথম প্রভাতে

মানুষ সার্থক ভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে তথ্য আহরণ করত, তাকেই বলা হত শিক্ষা। সাধারণ মানুষ শিক্ষা বলতে যা বোঝে তা হল বিদ্যালয় বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থ-লব্ধ বিদ্যা। কিন্তু এটিকে শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ বলা যেতে পারে। এই সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার অর্থ হল কোন বিশেষ সামাজিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য ব্যক্তিকে প্রস্তুত করা। বলা বাহুল্য এ শিক্ষা সমগ্র জীবন-ব্যাপী নয়, এ মানুষের জীবনের বিশেষ বিশেষ স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ :—এই সংকীর্ণ অর্থ থেকেই শিক্ষিত-অশিক্ষিতের জাতিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। যে সমস্ত লোক লিখতে-পড়তে জানে, যাদের বই পড়ার অভ্যাস আছে তাদের আমরা শিক্ষিত বলে থাকি। আর যারা লিখতে পড়তে জানে না, যাদের বই পড়ার অভ্যাস নেই তাদের বলে থাকি অশিক্ষিত। তাহলে দেখা যাচ্ছে—এই অর্থে শিক্ষা আক্ষরিক জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নয়।

শিক্ষার ব্যাপক অর্থ :—প্রকৃত যে শিক্ষা—তার পরিসীমা অনেক বড়। শিক্ষা ও জীবন সমপর্যায় ভুক্ত। শিক্ষা হল সমগ্র জীবন-ব্যাপী একটি প্রক্রিয়া। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা কোন বিশেষ ব্যক্তির বা জীবনের কোন বিশেষ স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। যে কোনও নূতন অভিজ্ঞতা যা শুধু মানুষ কেন, যে কোন প্রাণীর বর্তমান আচরণকে পরিবর্তিত করে নূতন আচরণের সৃষ্টি করতে পারে, তাকেই শিক্ষা বলা যেতে পারে। এক কথায় বলা যেতে পারে, আচরণের পরিবর্তনই হল শিক্ষা। এই অর্থে শিক্ষার সুরু জন্ম থেকেই। সারা জীবন ধরে চলে এর বিকাশ মৃত্যুতে হয় এর শেষ। এই অর্থে আমরা বলতে পারি, প্রতিটি মানবসন্তানই শিক্ষার্থী, বিশ্ব-প্রকৃতি হ'ল শিক্ষক, পাঠশালা হ'ল উহার উন্মুক্ত প্রকৃতি, আর শিক্ষার সময় হ'ল সমগ্র জীবন।

সব আচরণ কিন্তু শিক্ষা নয় :—সব আচরণকেই কিন্তু শিক্ষা বলা যায় না। আচরণের পরিবর্তন যদি অবাঞ্ছিত হয়, তবে তাকে শিক্ষা বলা যাবে না। যে সমস্ত পরিবর্তন নীতিশাস্ত্র-সম্মত, মানুষের জীবনে বাঞ্ছনীয় ও সামাজিক আদর্শ লাভের পক্ষে সহায়ক, সেই সমস্ত পরিবর্তনকেই আমরা 'শিক্ষা' বলব। পক্ষান্তরে, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজও জীবনে পরিবর্তন আনে। কিন্তু এই সমস্ত

আচরণ অবাঞ্ছিত, অসামাজিক ও নীতিশাস্ত্র বহির্ভূত বলে আমরা এগুলিকে 'শিক্ষা' বলতে পারব না।

পরিশেষে এ কথা বলা যেতে পারে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তির ও সমাজের অস্তিত্বের সংরক্ষণ এবং তাদের উভয়েরই উন্নয়ন। ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে ব্যক্তি ও সমাজের যৌথ আদর্শের আলোকে। কাজেই ব্যক্তি ও সমাজ, এই দুটির অস্তিত্ব ও অগ্রগতির জন্য যে সমস্ত সুনির্বাচিত, সুনির্দিষ্ট ও সমাজ-স্বীকৃত আচরণ প্রতিটি সমাজের শিশু অর্থাৎ ভবিষ্যৎ নাগরিকদের আয়ত্ত করতে সাহায্য করা হয়, সেই সমস্ত আচরণই হল 'শিক্ষা'। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই এই বিশেষ আচরণগুলি শেখাবার জন্য কতকগুলি সমাজ অনুমোদিত সংস্থা থাকে। সাধারণ অর্থে এগুলিকেই আমরা স্কুল-কলেজ প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে থাকি।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ :—(Nature of Educational Psychology) :—শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ কিন্তু সাধারণ মনোবিজ্ঞান থেকে খুব একটা পৃথক নয়। আমরা আগেই জেনেছি—শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলি বিশেষভাবে প্রয়োগের ফলেই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান নামে একটি পৃথক অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে। আসলে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সাধারণ মনোবিজ্ঞানেরই একটি শাখা। শিক্ষা বলতে আমরা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর আচরণগুলি আয়ত্ত করা বুঝি। আবার মনোবিজ্ঞানকে বলি—আমাদের আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞানের কাজ হল—মনের বিভিন্ন আচরণ বা প্রক্রিয়ার প্রকৃতি, স্বরূপ, গতি ও নীতি নৈর্ব্যক্তিকভাবে আলোচনা করা। শিক্ষাদান কর্মটিকে সহজ ও সরল করার জন্য শিক্ষা-ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলির প্রয়োগ এবং শিক্ষাদানের সময় যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয়, সেগুলির সমাধানের জন্যই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। এদিক থেকে দেখলে বলা যায়—শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধি সাধারণ মনোবিজ্ঞানের চেয়ে সংকীর্ণ। মানব মনে যে সমস্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ঘটে থাকে, সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে পাওয়া যায় না। এই মনোবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল—শিক্ষামূলক আচরণ।

সাধারণ মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কতকগুলি পার্থক্য আছে। এর মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্য হ'ল :—সাধারণ মনোবিজ্ঞান মানব

আচরণের গতি প্রকৃতি এবং গবেষণালব্ধ সূত্র বা নিয়ম আবিষ্কার করে। কিন্তু শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজ হ'ল কেমন করে নতুন আচরণ করা যায় বা কেমন করে কম পরিশ্রমে বেশী জিনিষ শেখানো যায় তা স্থির করা। এজন্য অনেকে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানকে সাধারণ মনোবিজ্ঞানের 'ফলিত-শাখা' বলে বর্ণনা করে থাকেন। কিন্তু এটি কেবলমাত্র একটি ফলিত-শাখাই নয়, তার চেয়েও বেশী কিছু। সাধারণ মনোবিজ্ঞানের সূত্র বা নিয়মগুলিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এর কাজ শেষ হয় না ; বরং সুরু হয়। এই সমস্ত সূত্র বা নিয়ম প্রয়োগ করার সময় শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। তাছাড়া শিখনেরও বিভিন্ন প্রকারভেদ দেখা দেয়। এ সমস্ত সমস্যার সমাধান ও শিখনের প্রকারভেদের সংব্যাখ্যানের জন্য ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন। এই গবেষণাই হ'ল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের মূলকথা। এদিক থেকে দেখলে বলতে হয়, সাধারণ মনোবিজ্ঞান থেকে মাল-মশলা সংগ্রহ করে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান যে সৌধটি নির্মাণ করেছে তাও নির্মাণ কৌশল যেমন নূতন, পরিধিও তেমনি ব্যাপক। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করে দেয় শিক্ষামূখী দর্শন। কিন্তু সেই লক্ষ্যকে কিভাবে সহজে বাস্তবায়িত করা যায়, কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে তা আনন্দদায়ক হয়, শিখনের কার্যকরী পরিস্থিতি কোন্‌টি, কেমন করে শেখা জিনিষ অনেকদিন ধরে মনে রাখা যায়, ভুলে যায় কেন, মনোযোগ কিভাবে দেওয়া সম্ভব, এই সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হ'ল শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কাজ।

প্রায় প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রমে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানকে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসাবেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর কারণ হ'ল—শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। এখন দেখা যাক —মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার সম্পর্কটি কি রকম।

মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার সম্পর্ক :—মনোবিজ্ঞান কাকে বলে, আর শিক্ষার স্বরূপই বা কি, তা আমরা আলোচনা করেছি। শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—যে সমস্ত অভিজ্ঞতা কোন না কোন প্রকারে আমাদের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে তার মধ্যে একটা পরিবর্তন আনতে পারে—সে সমস্ত অভিজ্ঞতাই হ'ল শিক্ষা। মনোবিজ্ঞান হল আমাদের আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। আমরা কেন বিশেষ বিশেষ আচরণ করে থাকি, কোন্‌ পরিস্থিতিতে কি রকম আচরণ ঘটতে পারে, বিভিন্ন আচরণের ক্ষেত্রে কোন সাধারণ বা সর্বজনীন সূত্র পাওয়া যায় কি না, সে সমস্ত নির্ণয় করাই হ'ল মনোবিজ্ঞানের কাজ।

শিক্ষা বা শিক্ষাতত্ত্বকে বলা যেতে পারে আচরণের ব্যবহারিক বা প্রয়োগমূলক দিক। শিক্ষাতত্ত্ব যেমন মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, মনোবিজ্ঞানও তেমনি শিক্ষাতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষাতত্ত্ব যখন মনোবিজ্ঞানের নিকট থেকে আচরণের মূল সূত্রগুলি গ্রহণ করে নূতন আচরণ সৃষ্টি করে বা আচরণের পরিবর্তন ঘটায় তখন শিক্ষাতত্ত্বকে মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল বলা যেতে পারে। আবার মনোবিজ্ঞান যে সমস্ত সূত্র নির্ণয় করে দেয়, সেগুলি যথার্থ কি না বা গ্রহণ যোগ্য কি না—তা বিচার করা যায় শিক্ষাতত্ত্বের সাহায্যে এ দিক থেকে বিচার করলে বলা যেতে পারে মনোবিজ্ঞান শিক্ষাতত্ত্বের নিকট ঋণী।

শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা :—শিক্ষাদান কার্যটি সহজ ও সার্থক করে তুলতে হলে মনোবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রতি শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য থাকলেই সু-শিক্ষক হওয়া যায় না। অথচ প্রাচীনকালে শিক্ষকেরা পাণ্ডিত্য বা পুঁথিগত বিদ্যার উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করতেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে যদি শিক্ষক, বিষয়বস্তু ও শিক্ষার্থীর স্থান আলোচনা করা যায়, তবে দেখা যাবে—পূর্বে শিক্ষক ও বিষয়বস্তুর প্রাধান্যই ছিল বেশী। কিন্তু যাকে শিক্ষা দেওয়া হবে, তার সম্বন্ধে কোনরকম বিবেচনাই করা হ'ত না। এই প্রসঙ্গে Adams এর বিখ্যাত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন-'The teacher teaches John Latin'—এই বাক্যে দুটি কর্ম আছে। একটি হল "জন" এবং অপরটি হ'ল-"ল্যাটিন"। শিক্ষকের ল্যাটিন সম্বন্ধে অর্থাৎ শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা যেমন প্রয়োজন, 'জন' সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাও তেমনি প্রয়োজন। এক কথায়, তাঁকে 'জনকে' জানতে হবে। 'জনকে' জানার অর্থ হ'ল—জনের মানসিক গঠন, আগ্রহ, মনোযোগ, বুদ্ধি, মেজাজ, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা। এই জ্ঞান আহরণে সাহায্য করতে পারে একমাত্র মনোবিজ্ঞান।

কতকগুলি বিশেষ বিশেষ আচরণ আয়ত্ত করাকেও আমরা শিক্ষা আখ্যা দিতে পারি। কোন বিশেষ আচরণ শিক্ষা দিতে হলে সেই আচরণটির স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। যাকে আচরণটি শেখাতে হবে, সে কিভাবে স্বল্পতম প্রয়াসে আচরণটি আয়ত্ত করতে পারবে; কি করলে আচরণটির অনুশীলন তার নিকট তৃপ্তিকর হবে, কোন্ পরিবেশ শেখায় অনুকূল,

এ সমস্ত জানা থাকলে শেখা এবং শেখানোর কাজ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের নিকট সহজ হতে বাধ্য। প্রাচীনকালে শিক্ষাদান পদ্ধতি মোটেই মনোবিজ্ঞানসম্মত ছিল না বলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা প্রায়ই নিফল হ'ত। বর্তমান যুগে মনোবিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে যেরকম পরিবর্তন নিয়ে এসেছে সে রকম অন্য কোন বিজ্ঞান প্যরে নি। মনোবিজ্ঞান তার সতর্ক দৃষ্টি শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রসারিত করেছে। শিক্ষার পদ্ধতি, মনে রাখা, ভুলে যাওয়া, মনোযোগ, আগ্রহ, শাস্তি ও পুরস্কার, অসঙ্গতি ইত্যাদি বহুবিধ শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান নূতন ভাবে আলোকপাত করায় আমরা আমাদের প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গী বদলে নূতন দৃষ্টি লাভ করেছি। এতদিন যে শিক্ষার ভিত্তি ছিল অলীক কল্পনা ও মিথ্যা বিশ্বাস—এখন তার ভিত্তি হ'ল সজীব ও গতিশীল বিজ্ঞান।

সামগ্রিক শিক্ষাকে তিনটি বিভিন্ন দিক থেকে দেখা যেতে পারে :—**লক্ষ্য, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি**। শিক্ষার লক্ষ্য কি হবে, বা কি হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে আলোচনা করে শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন। শিক্ষাই জীবন—আবার জীবনই শিক্ষা। বিভিন্ন যুগে মানুষের জীবন সম্বন্ধে অনুভূতি ও ধারণাই শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করে এসেছে। বিভিন্ন দার্শনিক জীবন ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন, সেই দৃষ্টিভঙ্গীই শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করে দেয়। শিক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে তা নির্ভর করে শিক্ষার লক্ষ্যের উপর। অর্থাৎ বিষয়বস্তুও পরোক্ষভাবে শিক্ষাশ্রয়ী দর্শনের উপর নির্ভরশীল। **"কি পড়ানো হবে"**—এর উত্তর যদিও শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন দিচ্ছে, তবুও সেটি **"কেমন করে পড়ানো হবে"**—তার উত্তর দিতে পারে একমাত্র শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞান উদ্দেশ্যের চেয়ে উপায়ের দিকেই মনোযোগ দেয় বেশী করে। অবশ্য এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে শিক্ষার লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু নির্ধারণে মনোবিজ্ঞানের একেবারে করণীয় কিছু নেই। শিক্ষার লক্ষ্যটি কেবলমাত্র স্থির করে দিলেই শিক্ষার কাজ সম্পূর্ণ হল না। সেটিকে কার্যে পরিণত না করতে পারলে লক্ষ্যের কোন মূল্যই থাকে না। ঐ লক্ষ্যকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে সাহায্য করে—মনোবিজ্ঞান। আবার দর্শন বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে দিলেও মনোবিজ্ঞানই বলতে পারে—ঐ বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর কতটা প্রয়োজনে আসবে, তা তার মানসিক বিকাশের অনুকূল কি না, ঐ বিষয়বস্তু শেখানোর উপযুক্ত পরিবেশ কোন্‌টি—ইত্যাদি। তবে লক্ষ্য ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে

মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হলেও পদ্ধতির ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের একাধিপত্য আজ অনস্বীকার্য। শ্রেণীতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই পৃথক সত্তা: একের সঙ্গে অপরের কোন মিল নেই। সেখানে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষকের অখণ্ড জ্ঞান থাকলেও তা তাঁকে শ্রেণীকক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে না। প্রত্যেক শিক্ষককেই জানতে হবে—শিক্ষার্থী কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে; কি করলে শিক্ষাদান কার্যটি আরো সহজ ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, কেমন করে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়, কি করে তার ভুলে যাওয়ার হার কমানো যেতে পারে—ইত্যাদি আরো নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়। শিক্ষার সার্থকতা নির্ভর করে মূলতঃ শিক্ষা প্রক্রিয়ার কার্যকরিতার উপর। একমাত্র কার্যকরী পদ্ধতিই সার্থক শিক্ষাদানে সাহায্য করতে পারে।

কেবলমাত্র এই তিনটি ক্ষেত্রেই নয়, আরো নানাদিকে মনোবিজ্ঞান শিক্ষাকে সার্থক, প্রাণবন্ত ও কার্যকরী করে তোলার চেষ্টা করেছে ও করছে। এগুলিকে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের অবদান হিসাবে আখ্যা দিতে পারি। শিক্ষাতত্ত্ব এগুলির উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল। এগুলির সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :—

১। **ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি** :—প্রত্যেক মানুষ একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শিক্ষার্থীরাও তাই। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর দৈহিক মানসিক, প্রক্ষোভিক ইত্যাদি বিভিন্ন পার্থক্যের কোন প্রকার বিবেচনা করা হত না। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হল—শিক্ষার্থীদের বিভিন্নতা ও বৈষম্য অনুযায়ী পৃথক পৃথক শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যবস্থা করা, এর জন্য শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতিকে পরিবর্তনশীল ও বহুমুখী করা হচ্ছে—এবং সেই শিক্ষাকেও ব্যক্তিমুখী করে তোলা হচ্ছে।

২। **শিক্ষা গ্রহণের নিয়ম** :—সব বিষয় একই নিয়মে শিক্ষা দেওয়া যায় না, আবার সকল শিক্ষার্থীকেও একই নিয়মে শিক্ষা দেওয়া যায় না। আধুনিক মনোবিজ্ঞান থেকেই জানা গেল শিক্ষার বিষয়বস্তুর পার্থক্য অনুযায়ী শিক্ষাদান পদ্ধতিও পৃথক হবে। শিক্ষাদানের বিভিন্ন নিয়ম জানা না থাকলে শিক্ষকের পক্ষে কার্যকরী শিক্ষাদান করা সম্ভব নয়।

৩। **ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ** :—শিক্ষা হল শিশুর অভ্যন্তরীণ সুপ্ত সম্ভাবনাগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ। এই অর্থে শিক্ষা জীবন-বিকাশের সামগ্রিক

রূপ। জীবনের বিকাশ আবার একটি স্তরেই পূর্ণতা লাভ করে না; বিভিন্ন স্তরে তা পূর্ণতা লাভ করে। শিক্ষা এই বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী পরিকল্পিত হবে। ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকের বিকাশের ধারা এক নয়, তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ধারা ও পথ আছে। শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৪। **বুদ্ধি :**—শিশু কিভাবে শিক্ষাগ্রহণ করবে—তা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির উপর। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষিপ্রতা এবং সাফল্য দুই-ই নির্ভর করে বুদ্ধির উপর। এই জন্য শিক্ষার্থীর বুদ্ধির প্রকৃতি জানা যেমন প্রয়োজন—তা পরিমাপ করাও সমান প্রয়োজন। আধুনিক মনোবিজ্ঞান থেকে আমরা বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পেরেছি।

৫। **সহজাত প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, বংশধারা প্রভৃতি :**—শিক্ষা নির্ভর করে সহজাত প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, বংশধারা, পরিবেশ ইত্যাদির উপর। শিক্ষা একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষার যেমন ব্যক্তির উপর প্রতিক্রিয়া আছে, তেমনি প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, বংশধারা, পরিবেশ ইত্যাদিও শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করে। মনোবিজ্ঞান এই সমস্ত তথ্য আলোচনা করে শিক্ষাকে সহজ ও সার্থক করে তুলেছে।

৬। **মনোযোগ দেওয়া, ভুলে যাওয়া, মনে রাখা :**—মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে মনোযোগ দেওয়া, ভুলে যাওয়া, মনে রাখা ইত্যাদি বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া গেছে। এইগুলির সহায়তায় শিক্ষণ পদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত করে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

৭। **দলগত মনোবিজ্ঞান :**—দলগত মনোবিজ্ঞান বা গণ-মনোবিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষার্থী একক সত্তা হলেও সে কোন একটি দলের সভ্য। তাছাড়া তার আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়—তার চারদিকে যে সমস্ত ব্যক্তি আছে তাদের আচরণের দ্বারা। বর্তমান শিক্ষাদানের প্রথাও দলগত। সেই জন্য এই শাখাটির প্রয়োগ শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন প্রায় অপরিহার্য।

৮। **মনোবিজ্ঞানসম্মত পরিমাপ পদ্ধতি :** কেবলমাত্র বুদ্ধি পরিমাপ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেই মনোবিজ্ঞানের কাজ শেষ হয়ে যায়নি। বুদ্ধি

ছাড়া আরো অনেক মানসিক শক্তি ও প্রক্রিয়া পরিমাপ করার প্রয়োজন—শিক্ষা কার্যটিকে সহজ করার জন্ত। তাছাড়া কোন একজন শিক্ষার্থী কতটা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারল, ভবিষ্যতে আর কতটা গ্রহণ করতে পারবে—এ সমস্তও জানা প্রয়োজন। অধীত শিক্ষা কতটা আয়ত্ত করতে শিক্ষার্থী পারল তার পরীক্ষা, ভবিষ্যৎ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতার পরীক্ষা, ব্যক্তিসত্তা, আগ্রহ, প্রবণতা বা ঝোঁক, মনোভাব ইত্যাদি পরিমাপ করার বিজ্ঞানসম্মত উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছে এই মনোবিজ্ঞান। এই সমস্ত পরিমাপ-পদ্ধতি যে শিক্ষাব্যবস্থাকে যথেষ্ট উন্নত করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৯। **আচরণমূলক সমস্যা:** মানুষের প্রত্যেকটি আচরণই হ'ল সঙ্গতি বিধানের প্রচেষ্টা। কিন্তু অনেক সময় মানুষের আচরণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার অপসঙ্গতি দেখা যায়। শিশুদের আচরণও বাদ দেওয়া যায় না। যে সমস্ত শিশু পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে সঙ্গতি সাধন করতে পারে না, তাদের বলা হয় অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশু। এই অপসঙ্গতির কারণ, ও তা দূর করার উপায় সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করে মনোবিজ্ঞান।

এইজন্তই আমরা বলতে পারি, শিক্ষার এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে মনোবিজ্ঞানের পদক্ষেপ হয় নি। বিদ্যালয়ে, বিদ্যালয়ের বাইরে, গৃহে প্রত্যেক স্থানে যে কোন শিক্ষামূলক পরিস্থিতিতে মনোবিজ্ঞান তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান এককভাবে শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করতে পারে না। মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য কতকগুলি শাখা—যেমন শিশু মনোবিজ্ঞান, পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞান, প্রয়োগমূলক মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসামূলক মনোবিজ্ঞান, দলগত মনোবিজ্ঞান, অ-স্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান, সামাজিক মনোবিজ্ঞান প্রভৃতিও শিক্ষামনোবিজ্ঞানকে প্রভূতভাবে সাহায্য করে এবং শিক্ষাপদ্ধতিকে সহজ ও সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞানের পরিধি (Scope): শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞানের সামগ্রিক পরিসর ও তার আলোচ্য বিষয়বস্তুকেই তার পরিধি বলা যেতে পারে। এই মনোবিজ্ঞানের কর্মপদ্ধতি শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার দিকে লক্ষ্য রেখেই গড়ে ওঠে। শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ করতে যেয়ে যে সমস্ত আচরণ ঘটে থাকে এবং তার জন্ত যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করাই হ'ল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজ। সুবিধার জন্ত আমরা মনোবিজ্ঞানের

পরিধিকে দুটি পৃথক শাখায় ভাগ করতে পারি। একটি হ'ল-মানুষের মৌল প্রকৃতির আলোচনা (Original nature of man) আর অপরটি হ'ল—শিক্ষণ পদ্ধতির আলোচনা (Psychology of Learning)। শিশু জন্মের সময় কি কি সহজাত গুণ বা ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সে সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা করাই হ'ল প্রথম শাখাটির কাজ। ঐ সমস্ত গুণ বা ক্ষমতাকে শিক্ষা-সৌধের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় শাখাটির কাজ হ'ল-শিক্ষক কি ভাবে স্বল্পতম সময়ে সহজভাবে সার্থক শিক্ষা দিবার জন্য পরিবেশটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, সে সম্বন্ধে কার্যকরী পথের সন্ধান দেওয়া। অবশ্য এই দুটি শাখা ছাড়াও আরো অনেক দিকেই শিক্ষা পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান সাহায্য করে থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ অপরিহার্য বলে আজকাল প্রায় সমস্ত শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথমে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্ :—

১। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রথম কাজ হ'ল শিশু মনের আলোচনা করা। তার মনের প্রকৃতি, তার উপর বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব, তার সহজাত সুপ্ত গুণাবলীর সন্ধান, অভিজ্ঞতালব্ধ বৈশিষ্ট্য ও গুণের সন্ধান, তার মানসিক অবস্থা ও বিকাশ, তার সুস্থ ও স্বাভাবিক মানসিক গঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে মনোবিজ্ঞান।

২। শিশুর প্রবৃত্তি ও তার সহগামী প্রক্ষোভ, কল্পনা আবেগ ও ইচ্ছা, তার মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে মনোবিজ্ঞান।

৩। আচরণের শরীর তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যাও করে থাকে মনোবিজ্ঞান। প্রবৃত্তিজাত আচরণ, প্রক্ষোভজনিত আচরণ, রিফ্লেক্স জাতীয় আচরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে এই মনোবিজ্ঞান। মানসিক জীবনের দৈহিক ভিত্তিও মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

৪। শিশুর বুদ্ধি ও ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার আগ্রহ, মনোভাব ইত্যাদি বিবেচনা করে শিক্ষার বিষয়বস্তু কিভাবে নির্ধারিত হবে, কিভাবে শিক্ষাদান করতে হবে—সে সম্বন্ধেও আলোচনা করে মনোবিজ্ঞান।

৫। ইন্দ্রিয়গুলিই হচ্ছে আমাদের অভিজ্ঞতা আহরণের পথ। শিক্ষা-দানের সহায়ক হ'ল এই সমস্ত ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের স্বরূপ কি ও ইন্দ্রিয়ের অনুশীলনকে কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যায়, সে সম্বন্ধেও আলোচনা করে মনোবিজ্ঞান।

৬। শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করাই হ'ল মনোবিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষাদানের সার্থকতা নির্ভর করে শিক্ষাপদ্ধতির উপর। শিক্ষার প্রণালী, সূত্র (Law), গতি ও সীমা, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রেষণা, ক্লান্তি, অবসাদ, বিরক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় মনোবিজ্ঞানে। তা ছাড়া মনে রাখা, ভুলে যাওয়া, মনোযোগ দেওয়া, শিক্ষা-সঞ্চালন ইত্যাদিও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

৭। শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। শিক্ষার্থীর লব্ধজ্ঞানের পরিমাপও তাকে করতে হবে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সার্থক পরীক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভাবন করে বহু দিনের একটি সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষের আচরণ বহুমুখী ও পরিবর্তনশীল। এই বহুমুখী আচরণ ধারা ব্যাখ্যা করার জন্য শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষা-পরিসংখ্যান নামে একটি নূতন শাখার উদ্ভাবন করেছে। তাছাড়া বিভিন্ন জাতীয় অভীক্ষার প্রচলন সম্ভব হয়েছে একমাত্র মনোবিজ্ঞানের জন্য।

৮। শিক্ষার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। যে আজ শিশু, সে আগামীকালের ভাবী নাগরিক। বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে তাকে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা শিক্ষার কাজ। এর জন্য সামাজিক মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানকে সঙ্গতি বজায় রেখে চলতে হয়। আবার উপযুক্ত বৃত্তি নির্ধারণ করার ব্যাপারেও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অবদান কম নয়।

শিক্ষক-শিক্ষণ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা :—আগেকার দিনে শিক্ষাদান কার্যে মনোবিজ্ঞানের বিশেষ স্থানে আছে বলে মনে করা হ'ত না। বিষয়বস্তুতে পাণ্ডিত্য থাকলেই আর ভালোভাবে বক্তৃতা করতে পারলেই শিক্ষাদান ভালো হবে বলে মনে করা হ'ত। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানকে শিক্ষার প্রতিকূল বলেই মনে করা হত। পেষ্টালৎসী প্রথম এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান সম্মত করতে চান। আজকের যুগ হল শিশুশিক্ষার যুগ। শিক্ষা পদ্ধতি হ'ল সেই পদ্ধতি যা শিশুর স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে করে আনন্দময়, মনকে দেয় স্ফূর্তি, শিশুকে করে সমাজ ও রাষ্ট্রের সুযোগ্য নাগরিক। শিক্ষা আর এখন চাপিয়ে দেওয়া বোঝা নয়। শিক্ষকের প্রধান কাজ হল শিশুমনকে জানা। শিক্ষার্থীর স্থান এখন সর্বাগ্রে, শিক্ষক শুধু সুপরিচালক। শিক্ষকের জন্য শিক্ষা নয়—শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যই শিক্ষা, তবে শিক্ষকের

ভূমিকা এতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। তিনি শিক্ষার্থীকে কেবলমাত্র জ্ঞানলাভেই সাহায্য করবেন না, তাদের মনে পাঠ্যবিষয়ে অনুরাগ ও আগ্রহের সৃষ্টি করবেন। শিশুদের বিকাশ কি ভাবে ঘটে, শিক্ষায় শিশুদের ইচ্ছা কিরূপ, তাদের প্রকৃতি, প্রক্ষোভ, বুদ্ধি ও অন্যান্য মানসিক শক্তি সম্বন্ধে শিক্ষকের জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন, এ ছাড়া শিক্ষক নিজে শিক্ষাদান কার্যে কতদূর সফল এবং কতটা যোগ্য তা জানারও প্রয়োজন আছে। এই সমস্ত কারণে শিক্ষামনোবিজ্ঞান প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠক্রমে বিশেষ স্থান পেয়েছে। এটি শিক্ষককে কিভাবে শিক্ষাদান কার্যে সাহায্য করে, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল :-

১। অল্প সময়ে কিভাবে শিক্ষাদান করলে শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হবে ও শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে শিক্ষক তা জানতে পারেন।

২। শিক্ষার লক্ষ্যে কিভাবে স্বল্পতম প্রয়াসে পৌছান যায় সে সম্বন্ধে পথনির্দেশ করে।

৩। শিক্ষক ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে প্রভেদের কথা জানতে পারেন।

৪। শিক্ষক তাঁর নিজের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারেন।

৫। শিক্ষার নূতন নূতন পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষককে অবহিত করে।

৬। শিক্ষার্থী সম্বন্ধে শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের পরিবর্তন ঘটায়।

৭। শিক্ষকের নিজের মানসিক সঙ্গতি বিধানে সাহায্য করে।

৮। মনোবিজ্ঞান সম্মত পরিমাপ পদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষককে পরিচিত করে।

পরিশেষে এক কাথায় বলা যেতে পারে শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই জন্যই এটিকে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থায় (প্রাথমিক হতে স্নাতকোত্তর) আবশ্যিক বিষয় বলে গণ্য করা উচিত।

প্রত্যেক শিক্ষকই 'শিক্ষার' সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বলতে গেলে, তাঁদের সমস্ত আচরণ শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। মনোবিজ্ঞান কিভাবে তাঁদেরকে শিক্ষাদান কার্যে সাহায্য করে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল। এ ছাড়াও শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্কের কথাটি আমরা নীচে আলোচনা করছি :—

(১) শিক্ষা ব্যবহারমূলক, মনোবিজ্ঞানও তাই।

(২) শিক্ষার একটি লক্ষ্য থাকবেই যে লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করে মনোবিজ্ঞান।

শেখার চেষ্টা করে। প্রচেষ্টা ও ভুলের পথে যেন সে সময় ও শ্রমের অপব্যয় না করে। আবার কৌশলমূলক শিখনেও যাতে সে প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনমত অন্তদৃষ্টি প্রয়োগ করতে পারে—সেদিকের সবিশেষ লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। মনোবিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করেছেন এমন শিক্ষকই এ ব্যাপারে সুপরিচালনার দ্বারা শিক্ষার্থীকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করতে পারেন।

শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব (Theories of Learning): এতক্ষণ আমরা শিখন কাকে বলে, শিখনের স্বরূপটি কি ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। শিখনের স্বরূপ সম্বন্ধে মোটামুটি আমরা একটা সর্বজনগ্রাহ্য মতবাদ বা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি। এ বিষয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে খুব একটা মত-বিরোধ দেখা যায়নি। কিন্তু শিখন কি ভাবে ঘটে—অর্থাৎ শিখন প্রক্রিয়াটি কি ভাবে সম্পন্ন হয়—এ বিষয়ে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। যে মনোবিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানের যে তত্ত্বে বিশ্বাসী (School of Psychology) তিনি সেই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই শিখনের নতুন তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। শিখন প্রক্রিয়ার উপর প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশটি বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচলিত আছে। এর মধ্যে যেগুলি প্রধান, সেগুলি সম্বন্ধে এখানে বিশদভাবে আলোচনা করা হ'ল।

অনুষঙ্গবাদ ও গেস্টাল্ট বা সামগ্রিকতাবাদ (Associationism and Gestalt): শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব জানার আগে অনুষঙ্গবাদ ও সামগ্রিকতাবাদ সম্বন্ধে একটা ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন। মনোবিজ্ঞানের জন্ম থেকেই অনুষঙ্গবাদ তত্ত্বটি মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য ও প্রক্রিয়ার সংব্যাখ্যান, সংগঠন ও সূত্র নির্ণয়ের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে এসেছে। (সমস্ত ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর একটা বড় অংশ জুড়ে মনোবিজ্ঞান বলতে এই অনুষঙ্গবাদকেই বোঝাত। কিন্তু বিংশ শতকের দ্বিতীয় অংশে অনুষঙ্গবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি মতবাদ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এই মতবাদকে গেস্টাল্ট বা সামগ্রিকতা মতবাদ বলা হয়। অনুষঙ্গবাদের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে থর্নডাইক (Thorndike) ও হুইলার (Wheeler)-এর নাম বিখ্যাত। আর গেস্টাল্টবাদের জনক হলেন—কোহ্লার (Kohler), কফ্কা (Koffka) এবং ভের্থাইমার (Wertheimer)। মূল নীতির দিক দিয়ে গেস্টাল্টবাদ কিন্তু অনুষঙ্গবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। অনুষঙ্গ-

বাদীরা বলেন—কোন শিখন পরিস্থিতিতে আমরা বিভিন্ন উদ্দীপককে বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সাড়া দিই। কিন্তু গেস্টাল্টবাদীরা বলেন আমরা শিখন পরিস্থিতিটিকে সামগ্রিক ভাবে প্রত্যক্ষ করি এবং সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটিকে সামগ্রিক ভাবে সাড়া দিই—বিভিন্ন উদ্দীপককে বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিই না। শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচনা করার সময় এগুলি সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হবে।

শিখনের যে সমস্ত তত্ত্ব বর্তমানে প্রচলিত আছে তার মধ্যে প্রধান চারটি তত্ত্ব হ'ল :—

(১) থর্নডাইকের সংযোজনবাদ (Thorndike's connectionism)

(২) গেস্টাল্টবাদীদের অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন (Insightful Learning of the Gestaltists)

(৩) প্যাভ্‌লভের সাপেক্ষীকরণ বা অনুবর্তনবাদ (Pavlov's conditioning)

(৪) ফিল্ড বা ক্ষেত্রসম্বন্ধীয় মতবাদ (Field Theory)

উপরোক্ত চারটি মতবাদের মধ্যে প্রথম মতবাদটি সম্পূর্ণরূপে প্রাচীন অনুষঙ্গ মতবাদের মৌল নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু এটিতে যান্ত্রিক অনুষঙ্গবাদের উপব বেশী করে জোর দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ও চতুর্থ তত্ত্ব দুটি সম্পূর্ণরূপে গেস্ট্যল্ট মতবাদের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় ও চতুর্থ মতবাদের মধ্যে দ্বিতীয়টি আধুনিক। তবে এটি আধুনিক মতবাদ হ'লেও এর ভিত্তি কিন্তু প্রাচীন গেস্টাল্ট মতবাদ।

১। থর্নডাইকের সংযোজনবাদ (Thorndike's connectionism)

থর্নডাইকের মতে শিখন হ'ল উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নির্ভুল সংযোগ স্থাপন। (যে সমস্ত বস্তু আমাদের কোন না কোন প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতি জাগাতে পারে তাই হ'ল উদ্দীপক। আর কোন বিশেষ উদ্দীপক বা ইন্দ্রিয়ানুভূতির উত্তরে আমরা যে সাড়া দিয়ে থাকি, তাই হ'ল প্রতিক্রিয়া) থর্নডাইকের মতে এই উদ্দীপক ও তার উত্তরে দেওয়া সাড়া বা প্রতিক্রিয়া এই দুটির মধ্যে যখন একটি নির্ভুল যোগসূত্র বা সংযোগ স্থাপিত হয়, তখনই তাকে শিখন বলে।) মনে করা যাক্ আমার সামনে একটি ঘরে একটি বন্ধ তালা ঝুলছে আর আমার হাতে একটি গোছাতে চারটি চাবি

আছে। আমি প্রথম চাবি ঘুরিয়ে তালাটি খুলতে পারলাম না। দ্বিতীয়টিতে তালাটি খুলল না। কিন্তু তৃতীয়টি ঘোরাতেই তালাটি খুলে গেল। এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শিখন হয়নি কারণ সেখানে উদ্দীপকের (তালা) সঙ্গে ঠিক প্রতিক্রিয়া (চাবি ঘোরানো)-টির সংযোগ সাধন করা হয়নি। কিন্তু তৃতীয় বারে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সঠিক সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে বলে সেক্ষেত্রে শিখন হয়েছে বলা যেতে পারে। অবশ্য এটি হ'ল শিখনের একটি সরলতম উদাহরণ। তেমনি কোন ছেলে যখন বীজগণিতের অঙ্ক কষে বা জ্যামিতির 'এক্সট্রা' কষে, তখন সে তার জানা ফরমুলাগুলি একের পর এক প্রয়োগ করে যায়। এইভাবে প্রয়োগ করতে করতে যখনই ঠিক ফরমুলাটি প্রয়োগ করা হয়, তখনই সমস্যাটির সমাধান হয়ে যায়। এটি শিখনের জটিল একটি দৃষ্টান্ত। ছাত্রটি যতক্ষণ ঠিক ফরমুলাটি প্রয়োগ করতে পারেনি, ততক্ষণ তার উদ্দীপক (সমস্যাটি) ও প্রতিক্রিয়ার (ফরমুলা প্রয়োগ) মধ্যে নির্ভুল যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি। যে মুহূর্তে সে সঠিক ফরমুলাটি প্রয়োগ করল, তখনি উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নির্ভুল যোগসূত্র স্থাপিত হ'ল এবং তার শিখনও সম্পূর্ণ হ'ল। কাজেই দেখা গেল শিখন তখনই সম্ভব হয়, যখন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সঠিক বা নির্ভুল যোগসূত্র স্থাপিত হয়। আর যতক্ষণ এই নিভুল যোগসূত্র স্থাপিত না হবে, ততক্ষণ শিখন হবে না। এইজন্যই থর্নডাইকের মতে শিখন হ'ল—**উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন (Stimulus Response বা S—R Bond)**।

থর্নডাইকের এই উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোগ স্থাপন মতবাদটি নিঃসন্দেহে অনুষঙ্গবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।) অনুষঙ্গবাদের মূল নীতি হ'ল যে সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, কল্পনা, প্রতিরূপ ইত্যাদি বিভিন্ন মানসিক এককের সংযোগের ফলেই আমাদের প্রত্যেক মানসিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে। অর্থাৎ (মানসিক প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে আমরা বিভিন্ন জাতীয় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন এককের বা উপাদানের সন্ধান পাই। থর্নডাইক তার মতবাদে শিখনকেও এই জাতীয় এক ধরনের মানসিক এককের সংযোগের ফলে সৃষ্ট একটি ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর এই মতবাদ ও শিখনের পূর্বোক্ত সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে তাঁর শিখন পদ্ধতির নাম দিলেন—**প্রচেষ্টা ও ভুলের (Trial and Error Method) পদ্ধতি**।

প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতি (Trial and Error Method) : এই পদ্ধতিটিকে আবার 'সফল বিকল্প নির্বাচনের সহায়তায় শিখন'ও বলা হয়ে থাকে (Learning by selection of the successful variant)। (যখন কোন সমস্যার আগে থেকে তৈরী কোন সমাধান জানা থাকে না, তখন শিক্ষার্থীকে এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। শিক্ষার্থী প্রথমে একটি সমাধান খুঁজে বের করে এবং সেটি প্রয়োগ করে। যদি তাতে কোন কাজ না হয় তবে সে তা বর্জন করে এবং নতুন আর একটি সমাধান খুঁজে বার করে সেইটি প্রয়োগ করে। এইভাবে সে একের পর এক প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী ভুল বর্জন করতে শেখে এবং যে সমস্ত অপ্রাসঙ্গিক প্রতিক্রিয়া তার উদ্দেশ্য সাধনের প্রতিকূল, সেগুলি পরিহার করতে শেখে। এইরূপ ভাবে চলতে চলতে সে শেষ পর্যন্ত নির্ভুল সমাধানটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় এবং তখনই তার শিখন সম্পূর্ণ হয়। (এই পদ্ধতির বিশেষত্ব হ'ল বার বার ভুল প্রচেষ্টার মাধ্যমে নির্ভুলভাবে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া। উপায় ও উদ্দেশ্যের (Means and Ends) মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বোধটি শিক্ষার্থীর মধ্যে হয় একেবারে থাকে না, নয়তো খুব অস্পষ্ট ভাবে থাকে।) শিক্ষার্থী অন্ধভাবে বার বার প্রচেষ্টা করলেও সবগুলিই যে নিরর্থক হবে, এমন কোন কথা নেই। এ পদ্ধতিতে তার প্রচেষ্টাকে আমরা এলোমেলো বা খেয়াল-খুশীমত বলতে পারি না। (শিক্ষার্থীর একটা বিশেষ লক্ষ্য থাকে এবং বিশেষ একটি পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত হয়েই সে প্রচেষ্টা করে। সেইজন্যই তার প্রচেষ্টাগুলি একেবারে উদ্দেশ্যবিহীন বা লক্ষ্যহীন হয় না।' থর্নডাইক ও হল্ (Hall) এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা। আমরা আগেই দেখেছি থর্নডাইকের মতে উদ্দীপকের সঙ্গে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার সংযোগ স্থাপনই হ'ল শিখন। বার বার প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে এবং ভুল-ত্রুটি সংশোধনের মাধ্যমেই এই উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সঠিক সংযোগ স্থাপিত হয়। নির্ভুল প্রতিক্রিয়া সংখ্যায় মাত্র একটি। কিন্তু সেটি অন্যত্র ভুল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। এই নির্ভুল প্রতিক্রিয়াটি খুঁজে বার করতে হলে শিক্ষার্থীকে বার বার চেষ্টা করতে হবে এবং তার বার বার ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। এইভাবে চেষ্টা করতে করতে এবং ভুল করতে করতে সে যখনই নির্ভুল প্রতিক্রিয়াটি খুঁজে বার করতে পারবে তখনই তার শিখন

সম্ভব হবে। থর্ণডাইক মনে করেন প্রত্যেক শিখনই প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে—কারণ শিখন প্রক্রিয়া হ'ল একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং কতকগুলি বিভিন্ন জাতীয় দৈহিক ক্রিয়ার পারস্পরিক সমন্বয় মাত্র। আকস্মিক ভাবে বা কোন প্রচেষ্টা না করে কিছু শেখা সম্ভব নয়।

প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণা : থর্ণডাইক তাঁর এই পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে মানুষ ও নিম্নতর প্রাণী উভয়বিধ ক্ষেত্রেই একাধিক পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তিনি মাছ, মোরগছানা, কুকুর, বিড়াল ও বানরের উপর বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষাকার্য চালান। কিন্তু তাঁর ক্ষুধার্ত বিড়াল ও খাঁচার (cat and the puzzle-box) পরীক্ষণটিকে প্রচেষ্টাও ভুল পদ্ধতির মাধ্যমে শিখনের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

থর্ণডাইক একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে একটি খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে রেখে বাইরে এমন ভাবে এক টুকরো মাছ রাখলেন, যাতে সেটি বিড়ালের চোখে পড়ে। খাঁচার দরজাটি এমনভাবে একটি 'লিভার' দিয়ে আটকান ছিল যাতে বিড়ালের পায়ের সামান্য চাপ লাগলেই দরজাটি খুলে যায়। বিড়ালটি দরজা খুলতে পারলেই মাছের টুকরোটি সে খেতে পারবে। বিড়ালটি প্রথমে খাঁচার ভিতর থেকেই মাছটির নাগাল পাবার চেষ্টা করল। কিন্তু না পেয়ে সে খাঁচার মধ্যেই ছুটোছুটি শুরু করে দিল, খাঁচাটি আঁচড়াতে কামড়াতে লাগল। এক কথায়, সে এলোমেলো ও বিশৃঙ্খল ভাবে দরজাটি খোলার চেষ্টা করতে লাগল। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ লিভারের উপর চাপ পড়াতে দরজাটি খুলে গেল এবং বিড়ালটি খাঁচা থেকে বার হয়ে মাছের টুকরোটি পেয়ে গেল। দ্বিতীয় দিনে একই বিড়ালের উপর একই ভাবে ঐ পরীক্ষণটিই আবার করা হ'ল। কিন্তু এইদিন পূর্ব দিনের চেয়ে কম প্রচেষ্টায় ও কম সময়ে বিড়ালটি খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল। তৃতীয় দিনেও ঐ একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি করা হ'ল। তৃতীয় দিনে তার ব্যর্থ প্রচেষ্টার সংখ্যা আরো কমে গেল এবং পূর্ব দিনের তুলনায় সময়ও অনেক কম লাগল। এইভাবে দেখা গেল তার ব্যর্থ প্রচেষ্টা বা ভুলের সংখ্যা ক্রমশঃ যেন কমে আসছে। অবশেষে এমন একদিন এল—যেদিন বিড়ালটিকে খাঁচায় বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে সে কোন রকম ভুল বা ব্যর্থ প্রচেষ্টা না করে প্রথম বারেই দরজাটি খুলে বেরিয়ে এল। ঐদিন বিড়ালটি বার বার প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে উত্তীর্ণক

ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নির্ভুল একটি যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হ'ল অর্থাৎ তার শিখনটিও ঐদিন সমাপ্ত হ'ল। থর্ণডাইক বিড়ালটির ২৪টি ক্রমিক প্রচেষ্টার সময় নির্ধারণ করে নিম্নরূপ রেখাচিত্র অঙ্কন করেন—

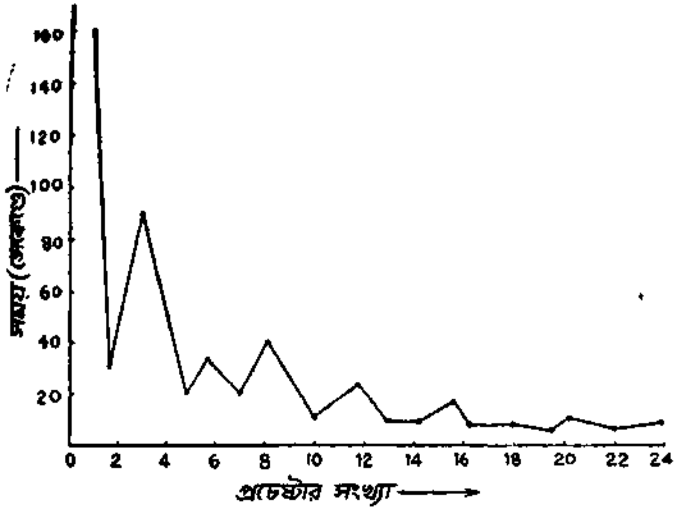

ক্ষুধার্ত বিড়ালের শিখনের রেখাচিত্র। এটি থেকে বোঝা যাবে প্রতি প্রচেষ্টার জন্য বিড়ালটির কত সময় লেগেছে।

থর্ণডাইক প্রদত্ত রেখাচিত্রে দেখা যায় বিড়ালটির প্রথম প্রচেষ্টাতে সময় লেগেছিল ১৬০সেকেণ্ড। কিন্তু পরবর্তী প্রচেষ্টাতে সে সময় ক্রমশঃ কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত ৭ সেকেণ্ডে এসে দাঁড়িয়েছে। থর্ণডাইকের মতে শিখন একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া যার মধ্যে বিচারকরণ, চিন্তা বা যুক্তির কোন অবকাশ নেই। আবার শিখন প্রক্রিয়ার মধ্যে উদ্দেশ্য বা উপায়ের সার্থক সঙ্গতি বিধানের সম্পর্কেও প্রাণীর মধ্যে কোনপ্রকার সচেতনতা থাকে না। অন্যভাবে বলা যায় সমস্যাটির সামগ্রিক রূপটিকে কল্পনার সাহায্যে মনের সামনে উপস্থিত করে কিভাবে সমস্যা ও তার সমাধানের মধ্যে একটা কার্যকরী সংযোগ স্থাপন করা যাবে, তার কোন পূর্বকল্পনা প্রাণী করার কোন সুযোগ পায় না। (শিক্ষার অর্থ হ'ল—অনুশীলনের মাধ্যমে ভুল প্রক্রিয়াগুলি বর্জন করে যথাযথ প্রক্রিয়া করার ক্ষমতা অর্জন করা। এজন্য এই পদ্ধতিটিকে অনেক সময় প্রচেষ্টা ও সাফল্যের (Trial and success) পদ্ধতিও বলা হয়।) কেবলমাত্র ইতর প্রাণীরাই যে এ পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করে, তা নয়, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও এই পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করে থাকে।

থর্নডাইকের শিখনের সূত্র (**Thorndike's Laws of Learning**) : শিখন সম্পর্কীয় দীর্ঘগবেষণা ও তার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে থর্নডাইক শিখনের কতকগুলি সূত্র আবিষ্কার করেছেন। এই সূত্রগুলি সংখ্যায় আটটি। এগুলির মধ্যে তিনটি হ'ল **প্রধান সূত্র** (Major Laws) এবং পাঁচটি **অপ্রধান সূত্র** (Minor Laws)। প্রধান সূত্র তিনটি হ'ল—(১) **ফললাভের সূত্র** (The Law of Effect) (২) **অনুশীলনের সূত্র** (The Law of Exercise) এবং (৩) **প্রস্তুতির সূত্র** (The Law of Readiness)। সূত্রগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল—

[এক] **ফললাভের সূত্র** (**Law of Effect**) : থর্নডাইকের মতে যখন একটি উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটি পরিবর্তনযোগ্য (Modifiable) সংযোগ স্থাপিত হয় এবং সেই সংযোগ স্থাপনের ফল যদি প্রাণীর নিকট সন্তোষজনক বা তৃপ্তিদায়ক হয়, তবে ঐ সংযোগটি তার মনে রেখাপাত করে (stamped in) ; আর যদি সংযোগ স্থাপনের ফলটি প্রাণীর নিকট সন্তোষজনক না হয়, তবে ঐ সংযোগটি শিথিল হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায় (stamped out)। বিড়ালটির ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে সমস্ত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে নাই, সেগুলি তার মনে রেখাপাত করে নাই বা সে সেগুলি শিখে নাই। কিন্তু যে আচরণ বা প্রতিক্রিয়ার জন্য সে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছিল অর্থাৎ যে আচরণটি তার নিকট সন্তোষজনক ছিল, সেই আচরণটিই সে শিখেছিল। ইতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে বলা যায়, যে সমস্ত আচরণ ইতর প্রাণীর জৈবিক চাহিদা মেটাবার পক্ষে সহায়ক, সেই আচরণগুলিই তার পক্ষে তৃপ্তিজনক। গ্যারেট এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দিয়েছেন। ধরা যাক্ পাঁচটি বিড়ালকে ডাকলেই আসতে শেখান হয়েছে। এখন প্রথম বিড়ালটি আসতেই তাকে এক টুকরো মাছ দেওয়া হ'ল, আবার তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করাও হ'ল ; দ্বিতীয় বিড়ালটিকে কেবল একটুখানি আদর করা হ'ল ; তৃতীয় বিড়ালটিকে কিছুই করা হ'ল না, চতুর্থ বিড়ালটির গায়ে একটুখানি জল ছিটিয়ে দেওয়া হ'ল ; আর পঞ্চম বিড়ালটিকে বেশ করে জলে ভিজিয়ে দেওয়া হ'ল। এরপরই যখন বিড়ালগুলিকে আবার ডাকা হবে, তখন কোন্ কোন্ বিড়াল আসবে ? প্রথম বিড়ালটি ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আসবে, দ্বিতীয়টিও আসবে তবে অত তাড়াতাড়ি নয় ; তৃতীয়টি অনিচ্ছাসত্ত্বেও আসবে ; চতুর্থটি

হয়তো আর একবার আসার চেষ্টা করবে, কিন্তু জল দেখলেই পালাবে; আর পঞ্চমটি তো আসবেই না বরং ডাকলে অন্যদিকে ছুটে পালাবে। এখানে বিড়ালগুলির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করছে—পূর্ব অভিজ্ঞতার ফল। এই সূত্রটিকে আবার পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কীয় নিয়মও (The Law of Reward and Punishment) বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সূত্রটি অনুশীলনের সূত্রের আগে আসে, কারণ এই সূত্রটিই ব্যাখ্যা করে—প্রাণী কোন সকল প্রক্রিয়া কেন ও কিভাবে নির্বাচন করে।

[দুই] **অনুশীলনের সূত্র (The Law of Exercise)**: থর্ণডাইকের মতে একটি উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যদি বার বার সংযোগ স্থাপন করা হয়, তবে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে সেই সংযোগটি দৃঢ়তর হয়; কিন্তু যদি দীর্ঘদিন কোন সংযোগ স্থাপন না করা হয়, তবে সংযোগটি শিথিল হয়ে যায়। এককথায় বলা যায়—অনুশীলনই সংযোগটি দৃঢ় করে। সূত্রটিকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করেও দেখতে পারি—**ব্যবহারের সূত্র** (Law of Use) এবং **অ-ব্যবহারের সূত্র** (Law of Disuse)। প্রথম উপ-সূত্রটি বলে যখন একটি উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঘন ঘন সংযোগ স্থাপন করা হয়, তখন সেই সংযোগ দৃঢ় হবে। দ্বিতীয়টি বলে, যখন একটি উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন কোন সংযোগ স্থাপন করা হয় না—তখন সেই সংযোগটি শিথিল হয়ে যায়। মানুষের শিখনের ক্ষেত্রে অনুশীলনের প্রভাব অত্যন্ত বেশী দেখা যায়। টাইপ করতে শেখা, মোটর গাড়ী বা সাইকেল চালান, ভাষা শিক্ষা করা, কবিতা মুখস্থ করা ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় কাজে অনুশীলনই কাজটিকে যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করে।

থর্ণডাইক পরবর্তিকালে সূত্রটির আরো তিনটি উপসূত্র যোগ করেছিলেন। সেগুলি হ'ল—**তীব্রতার সূত্র** (Law of Vividness or Intensity); **সাম্প্রতিকতার সূত্র** (Law of Recency) এবং **পৌনঃপৌনিকতার সূত্র** (Law of Frequency)। তীব্রতা বলতে তিনি উদ্দীপকের তীব্রতা এবং সাম্প্রতিকতা ও পৌনঃপৌনিকতা বলতে শিখনের সাম্প্রতিকতা ও পৌনঃপৌনিকতা বোঝাতে চেয়েছিলেন।

[তিন] **প্রস্তুতির সূত্র (The Law of Readiness)**: এই সূত্র অনুযায়ী যখন একটি উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার জন্য

শিক্ষার্থী প্রস্তুত থাকে তখন তাকে সংযোগ স্থাপন করতে দিলে সে সন্তোষলাভ করবে এবং সংযোগ স্থাপন করতে না দিলে সে বিরক্তি বোধ করবে। পক্ষান্তরে, যখন সে প্রস্তুত থাকে না—তখন কোন অবস্থাতেই সে সংযোগ স্থাপন করতে চায় না; আবার জোর করে সংযোগ স্থাপন করতে দিলেও তা ফলপ্রসূ হয় না। অর্থাৎ উদ্দীপক ও তার উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ প্রস্তুতিরই প্রয়োজন—যে প্রস্তুতি থাকলে শিখন প্রক্রিয়াটি শিক্ষার্থীর নিকট তৃপ্তিদায়ক বলে মনে হবে এবং না থাকলে প্রক্রিয়াটি তার নিকট বিরক্তিজনক বলে মনে হবে।

অপ্রধান সূত্র পাঁচটি হ'ল :—

[এক] **বিবিধ বা বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Multiple Response) :** নির্ভুল প্রতিক্রিয়াটিকে অনেকগুলি ভুল প্রতিক্রিয়ার মধ্য থেকে খুঁজে বের করে দিতে হয়। এরজন্য প্রাণীকে একটি বিশেষ উদ্দীপকের উত্তরে নানরকম ভাবে প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। (প্রতিক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রে যত বেশী বৈচিত্র্য আসবে, শিখন প্রক্রিয়াটিও তত সহজ হবে) প্রাণীর সামনে হঠাৎ কোন সমস্যা উপস্থিত হ'লে যদি তার পূর্ব সমাধান প্রাণীর জানা না থাকে, তবে সে তার সহজাত প্রবৃত্তি বা অর্জিত অভিজ্ঞতা যত গুলি জানা আছে সেগুলি একের পর এক প্রয়োগ করতে থাকে যতক্ষণ না সমস্যাটির একটা সুষ্ঠু সমাধান হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এই প্রক্রিয়াই হ'ল প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতি।

[দুই] **প্রস্তুতি, মনোভাব বা মানসিক অবস্থার সূত্র (Law of Set, Attitude or Disposition) :** এটি হ'ল প্রাণীর আভ্যন্তরিণ একটি প্রেষণা (drive) বা কোন পরিস্থিতিতে প্রাণীকে কতকগুলি আচরণ বর্জন করে একটি বিশেষ আচরণ নির্বাচন করতে সাহায্য করে। কোন একটি বিশেষ অবস্থায় একটি বিশেষ উদ্দীপকের উত্তরে প্রাণী কিভাবে প্রতিক্রিয়া করবে—তা নির্ভর করছে তার প্রস্তুতি, মনোভাব ও মানসিক অবস্থার উপর। বিড়ালটি ক্ষুধার্ত ছিল বলেই খাঁচার বাইরে আসার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যদি ভরপেট খাওয়াবার পর তাকে খাঁচায় বন্ধ করা হ'ত, তাহ'লে হয়তো সে সেখানে ঘুমিয়েই পড়ত—বাইরে আসার কোন চেষ্টাই করত না।

[তিন] **আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Partial or Piecemeal Activities)**: শিখন প্রক্রিয়া যত অগ্রসর হতে থাকে ততই প্রাণী অপ্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়াগুলি বর্জন করতে শেখে এবং যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া সন্তোষজনক, সেগুলির দিকেই বেশী করে মনোযোগ দেয়। শিখন পরিস্থিতিটি-কেও সে আর সামগ্রিক ভাবে না দেখে তার বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি দেখেই সমগ্র পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটা ধারণা অর্জন করে নেয়। অর্থাৎ সামগ্রিক অবস্থা উপস্থিত না থাকলেও অবস্থার অংশবিশেষের জন্য সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি হতে পারে।

[চার] **সাদৃশ্য বা উপমানের সূত্র (Law of Assimilation or Analogy)**: প্রাণীকে যখন কোন নতুন শিখন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলা হয়, তখন সে অনুরূপ শিখন পরিস্থিতিতে যে রকম আচরণ করে সুফল লাভ করেছিল, সেই রকম আচরণ ঐ নতুন পরিস্থিতিতেও করবে। বিড়াল যখন খাঁচা খুলে বাইরে আসতে শিখে গেল, তখন তাকে যদি অন্য একটি খাঁচাতে বন্ধ করা হয়—যার দরজা খোলার কৌশলটি একটু অন্য রকমের, তবুও সে পূর্বে খাঁচা খুলে বাইরে আসার জন্য যে রকম আচরণ বা প্রতিক্রিয়া করেছিল এখানে সেই রকমই করবে।

[পাঁচ] **অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র (Law of Associative Shifting)**: অনেক ক্ষেত্রে একটি উদ্দীপকের উত্তরে যে প্রতিক্রিয়া হয়, সেই প্রতিক্রিয়াটি তার আসল বা প্রথম উদ্দীপক থেকে সরে গিয়ে অন্য কোন উদ্দীপকের উত্তরেও হতে পারে। কোন একজন লোক একটি কুকুরকে রোজ খাবার দেয়। খাবার পেলেই আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা যাবে লোকটিকে দেখলেই কুকুরের খাবার পাবার মত আনন্দ হচ্ছে এবং খাবার পেলে তার যা প্রতিক্রিয়া হ'ত (লালাক্ষরণ)—লোকটিকে দেখলে ঠিক একই প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। তেমনি শিক্ষকের উপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া —শিক্ষণীয় বিষয় বা বিদ্যালয়ের উপর সঞ্চালিত হয়ে যেতে পারে।

থর্নডাইকের মতবাদের সমালোচনা: থর্নডাইকের অনুষঙ্গবাদ বা সংযোজনবাদ এবং তার শিখনের সূত্রগুলি মনোবিজ্ঞানী কর্তৃক তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে। তাঁরা এই সূত্রগুলিকে শিখনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট এবং যথাযথ বলে মনে করেন না এবং বলেন যে যদিও আপাতদৃষ্টিতে শিখনের

সূত্রগুলিকে শিখনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে হয়—তবুও এগুলির মধ্যে যথেষ্ট অসম্পূর্ণতা এবং ফাঁক থেকে গেছে। সমালোচনার প্রধান প্রধান কিছু বক্তব্য নীচে দেওয়া হ'ল—

প্রথমে ধরা যাক **ফললাভের সূত্রটি**। এই সূত্রটি বলে, আচরণের ফল তৃপ্তিজনক হ'লে (satisfying) শিখন হবে, আর বিরক্তিজনক (annoying) হ'লে শিখন হবে না। ওয়াট্‌সন প্রমুখ আচরণবাদীদের বক্তব্য হ'ল এই সূত্রটি ব্যক্তির বা প্রাণীর নিজস্ব অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত (subjective)। আচরণবাদীরা মানসিক অনুভূতির সাহায্যে কোন কিছুর ব্যাখ্যা করতে রাজী নন। তাছাড়া কোন্ আচরণটি তৃপ্তিজনক হবে, আর কোন্‌টি বিরক্তিজনক হবে, তা সঠিকভাবে জানার আগে সে সম্বন্ধে আমরা আগের থেকেই একটা ধারণা গড়ে নিই। যেমন বিড়ালটির খাঁচায় থাকা তার নিকট বিরক্তি-জনক হবে এটা ধরে নিয়েই সেই মত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। খাঁচায় বন্ধ করার পর যদি বিড়ালটি ঘুমিয়ে পড়ত, তা হ'লে ঐ পরীক্ষাটি আর গ্রহণ করাই চলত না। আচরণবাদীরা প্রধানতঃ অনুশীলনের সূত্র ও আচরণের সাম্প্রতিকতার সাহায্যে শিখনের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন।

এই সূত্রটির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে সমালোচনা করা যায়। কার্য ও কারণের মধ্যে কোন্‌টি আগে? নিশ্চয় কারণ। বিড়ালের খাঁচা থেকে বাইরে আসার কারণ কি? মাছ পাওয়া অর্থাৎ তৃপ্তি পাওয়া। এখানে কি হচ্ছে? আগেই তো আচরণটি হয়ে যাচ্ছে তারপর সে ফললাভ করছে। অর্থাৎ কার্যটি আগে হচ্ছে, কারণটি পরে যাচ্ছে। সুখ বা দুঃখের অনুভূতি যদি কোন আচরণের শিখন বা অবলুপ্তির কারণ হয়, তাহ'লে ঐ বিশেষ অনুভূতিটি নিশ্চয় আচরণ ঘটার আগেই ঘটবে। তেমনি আচরণ শেষ হবার আগে, এমন কি শুরু হ'লেই অনেক সময় আচরণ শেষ হ'লে যেমন অনুভূতি হওয়া উচিত ঠিক তেমনি অনুভূতির সৃষ্টি হয়। কোন এক দূর জায়গাতে যাবার জন্ত ট্রেনে উঠে আরাম করে বসলেই মনে হয়—যাক্ শেষ পর্যন্ত পৌঁছানো যাবে। এখানে পৌঁছানোর আগেই পৌঁছানোর একটা তৃপ্তিজনক অনুভূতির সৃষ্টি হয়।

এ ছাড়া বলা যায় আমরা বিরক্তিজনক সবকিছুই কি ভুলে যাই? দুঃখের অনুভূতি কি সব সময় আচরণের বিলোপ ঘটাতে পারে? যে ছেলেটি ভুলে

অঙ্ক না হওয়ার জন্ত বা না করার জন্ত বার বার মার খেয়েছে, বকুনি খেয়েছে বা অপমানিত হয়েছে সেই ছেলেই আবার অঙ্কের অধ্যাপক হয় কি করে? ফুটবল খেলতে যেয়ে যে বার বার আঘাত খেয়েছে সেই আবার নামী খেলোয়াড় হয়। কাজেই আমরা বলতে পারি সুখ দুঃখের অনুভূতির সঙ্গে শিখনের যদিও একটা সম্পর্ক আছে, তবু এই দু'টির মধ্যে বিশেষ কার্য-কারণ সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব নয়।

এরপর ধরা যাক্ **অনুশীলনের সূত্রের** কথা। অনুশীলনের সূত্র বলে বার বার অভ্যাস বা চর্চা করলে তবেই কোন কিছুর শিখন সম্ভব হয়। এটিও সম্পূর্ণ সত্য নয়। কেবল মাত্র অভ্যাস করলেই শিখন স্থায়ী হবে, আর অনভ্যাসে শিখন দুর্বল হবে এটি ভুল। দু'টি ঘটনার উল্লেখ করা হ'ল। একটি ছেলে সব সময় 'I have went' লিখত। এটি শোধরাবার জন্ত তার শিক্ষক একদিন তাকে একশ বার 'I have gone' লিখতে বললেন। ছেলেটি বাধ্য ছেলের মত তাই লিখে শিক্ষককে দেখাতে গেল। কিন্তু তখন তিনি চলে গেছেন। ছাত্রটি তখন তার খাতাতে লিখল—"I have written 'I have gone' one hundred times and since you are not here, I have went home"; লিখে সে খাতাটি শিক্ষকের টেবিলে রেখে চলে গেল। Dunlap ইংরেজী the কথাটি লিখতে গেলেই hte লিখে ফেলতেন। বিরক্ত হয়ে তিনি একদিন পাঁচশ বার কেবল hte টাইপ করলেন। তারপর থেকে তাঁর আর The লিখতে ভুল হ'ত না। প্রথম ক্ষেত্রে অনুশীলন করেও শিখন হ'ল না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনুশীলন করে যে জিনিসটির অনুশীলন করা হ'ল সেটিই বিরক্তিজনক মনে হওয়াতে পরিত্যক্ত হ'ল। এই সূত্রটিকে অনেক মনোবিজ্ঞানী যান্ত্রিক বলে বর্ণনা করেছেন এবং শিখনের প্রয়োজনীয় অন্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যথা আগ্রহ, চাহিদা, পছন্দ-অপছন্দ, মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি এই সূত্রে উপেক্ষিত হয়েছে। আমরা রোজ তো অনেকবার ঘড়ি দেখি। কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে ঘড়ির ডায়ালটি কি রঙের বা ঘড়ির সংখ্যাগুলি রোমান্ না অন্তকিছু তা আমরা বলতে পারি না। অনুশীলনের ফলেও এসব ক্ষেত্রে শিখন হয়নি। অনুশীলনের সাফল্যের সঙ্গে আরো অন্যান্ত হাজার রকমের জিনিস জড়িয়ে থাকে। আবার অনুশীলন বা চর্চা না করেও বহু অভিজ্ঞতা আমাদের মনে স্থায়ী একটা ছাপ রেখে যায়। আনন্দ, শোক বা উত্তেজনায় কোন ঘটনার

অভিজ্ঞতার অনুশীলন বা চর্চা ছাড়াই মনে থাকে। তেমনি অর্থপূর্ণ কিছু শেখার সময় কোনপ্রকার অনুশীলন বা চর্চার প্রয়োজন হয় না। কাজেই বলা যায় অনুশীলন শিক্ষার পক্ষে যে অপরিহার্য তা নয়। দক্ষতা বা কৌশল অর্জনে অনুশীলনের প্রয়োজন ঠিকই, তবে সেখানেও অনুশীলনের সঙ্গে মনোযোগ, আগ্রহ, প্রয়োজন ইত্যাদি জড়িত থাকে।

এরপর প্রস্তুতির সূত্র। শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর প্রস্তুতির প্রয়োজন ঠিকই, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রস্তুতি ছাড়াই শিখন সম্ভব। যে সমস্ত শিখন-পরিকল্পিত (planned), সেখানে মানসিক, দৈহিক বা প্রাক্ষোভিক প্রস্তুতি প্রয়োজন। কিন্তু অপরিকল্পিত (incidental) শিখনে প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দু'পাশের দোকানের কত নামই তো শেখা হয়ে যায়। তার জন্য তো আমরা প্রস্তুত থাকি না। তেমনি একটা গান শুনে তার কয়েকটা লাইন এমনভাবে মনে গেথে গেল যে বার বার সেই লাইনগুলো মনে ফিরে আসছে (Perseveration)। এখানেও প্রস্তুতি ছিল না। কাজেই বলা যায়—প্রস্তুতি থাকলে শিখন হয় ঠিকই কিন্তু প্রস্তুতি না থাকলে শিখন হবে না—একথা জোর করে বলা চলে না।

এবার অন্যান্য সমালোচনার কথা আলোচনা করা যাক। থর্নডাইকের সংযোজনবাদ হ'ল—মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীতে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি স্নায়ুর মধ্যে সংযোগ স্থাপন। এ ব্যাখ্যাটি হ'ল শরীরতত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা। যেটি উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ (S-R Bond), সেটি হ'ল থর্নডাইকের মতে দুটি নিউরনের মধ্যে সংযোগস্থাপন। অনুশীলনের ফলে নিউরনের মধ্যের ফাঁকটি (Synapse) ভরাট হয়ে যায় এবং শিখন ঘটে। এই ব্যাখ্যাটি কিন্তু ল্যাসলে (Lashley), ফ্রান্জ (Franz), ক্যামেরন (Cameron) ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানী মানতে রাজী নন এবং তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, স্নায়ুমূলক সংযোজনের সাহায্যে শিখনের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর মতে থর্নডাইকের সূত্রগুলি কেবল যে অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ তা নয়; শিখনের অনেক প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য এতে অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়েছে। থর্নডাইকের শিখন পরিস্থিতিটি হ'ল—এক বদ্ধ ও যান্ত্রিক (blind and mechanical) পরিস্থিতি। এখানে শিক্ষার্থীকে শিখনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত করা হয় না। শিখন প্রক্রিয়াতে যে প্রক্ষোভের একটা বিশেষ স্থান আছে সে কথা থর্নডাইক একবারও ভাবেননি।

পরবর্তিকালে থর্নডাইক তাঁর নিজের সূত্রের অসম্পূর্ণতার কথা বুঝতে পেরেছিলেন বলে আরো একটি সূত্র তাঁর শিখনের সূত্রগুলির সঙ্গে যোগ করেছিলেন। সেটি হ'ল—**অন্তর্ভুক্তির সূত্র** (Law of Belongingness)। এই সূত্র বলে যখন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটা পারস্পরিক অন্তর্ভুক্তির সম্বন্ধ থাকবে অর্থাৎ যখন দুটি ঘটনাই কোন একটি বিশেষ সম্বন্ধের অন্তর্ভুক্ত তখনই শিখন সম্ভব হবে। কিন্তু সূত্রটিও খুব নির্দিষ্ট বা স্পষ্ট নয়।

সামগ্রিকতাবাদী মনোবিজ্ঞানীরা (Gestaltists) অন্য কারণে থর্নডাইকের সূত্রগুলির সমালোচনা করেছেন। থর্নডাইকের মতে আমরা শিখন পরিস্থিতিটিকে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশে ভাগ করে নিই, সেই বিচ্ছিন্ন অংশগুলিতে পৃথক পৃথক ভাবে মনোযোগ দিই এবং সেগুলির প্রতি বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রতিক্রিয়া বা সাড়া দিয়ে থাকি। এই ভাবে সাড়া দিতে দিতে কোন একটি উদ্দীপকের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়াবদলে সংযোগ সাধন আকস্মিক ভাবেই ঘটে যায় এবং তখনই শিখন সম্ভব হয় (S—R Bond)। গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা এটিকে বলেছেন—মনোবৈজ্ঞানিক আণবিকতা (Psychological Atomism)। তাঁরা বলেন আমরা সব সময় শিখন পরিস্থিতিটিকে সামগ্রিক ভাবেই দেখি এবং তার উত্তরে সামগ্রিক ভাবেই সাড়া দিয়ে থাকি। শুধু তাই নয় সাড়া দেবার সময় পরিস্থিতিটি লক্ষ্য করে তার অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলির সমস্ত পরিস্থিতির সঙ্গে সম্বন্ধটি নির্ণয় করি (Parts in relation to the whole) এবং তাদের আভ্যন্তরিণ প্রকৃতি অনুযায়ী সেগুলি সংগঠন করে নিই। এই আভ্যন্তরিণ সম্বন্ধ নিরূপণ ও উদ্দীপকের সংগঠন সাধনের মাধ্যমেই প্রকৃত শিখন সম্ভব হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে থর্নডাইকের মতবাদের উপযোগিতা : থর্নডাইকের সূত্রগুলি তীব্রভাবে সমালোচিত হ'লেও সেগুলির যে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগিতা আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃত পক্ষে ঐ মতবাদগুলি থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযোজ্য কতকগুলি মূল্যবান সিদ্ধান্ত গঠন করতে পারি।

প্রস্তুতির সূত্রটি শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়। শিখন নির্ভর করে শিক্ষার্থীর প্রস্তুতির উপর। প্রস্তুতি বলতে তার শারিরীক, মানসিক, আবেগমূলক প্রভৃতি কথাই বুঝিয়ে থাকে। যে শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন প্রস্তুতি থাকে তা সফল হবেই। কিন্তু যার জন্য শিক্ষার্থী প্রস্তুত নয় তা সফল হবেই একথা বলা যায় না। অনেকে প্রস্তুতিকে আবার দু'টি ভাগে ভাগ

করেছেন—জ্ঞানমূলক ও প্রক্ষোভমূলক। জ্ঞানমূলক প্রস্তুতি হ'ল শিক্ষণীয় বিষয়ের পূর্বজ্ঞান থাকা, আর প্রক্ষোভমূলক প্রস্তুতি হ'ল শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও অনুরাগ।

ফললাভের সূত্রটির মূল্যও কম নয়। সেই শিখনই স্থায়ী হয় যার ফল শিক্ষার্থীর নিকট সন্তোষজনক বা তৃপ্তিকর। শিখনকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে তার ফল শিক্ষার্থীর নিকট সন্তোষজনক হয়। বিষয়বস্তু দীর্ঘ হ'লে তার সাফল্যের জন্ত শিক্ষার্থীকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। এ ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুকে কয়েকটি ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে নিয়ে শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টাজনিত সাফল্যকে ত্বরান্বিত করতে হবে। এই সূত্রের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করার জন্ত পুরস্কার, মেডেল, প্রমোশন ইত্যাদি দেবার রীতি বিদ্যালয়ে প্রচলন করা হয়েছে।

এরপর **অনুশীলনের** সূত্র। এটির মূল্য শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। শিক্ষণীয় বিষয়টি বার বার চর্চা বা অনুশীলনের মাধ্যমেই শিশুর মনে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে যায়। অনুশীলনের অভাব ঘটলে, শিশুমনে বিষয়বস্তুটির ছাপ ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যেতে পারে। শিক্ষণীয় বিষয়টিকে এমনভাবে ভাগ করে নিতে হবে যাতে শিশুর পক্ষে অনুশীলন করার কোন অসুবিধা না হয়। অবশ্য এই অনুশীলনের পিছনে শিশুর আগ্রহ ও সাফল্য সম্বন্ধে তৃপ্তিবোধটিও বিশেষভাবে কাজ করে থাকে। বিখ্যাত উক্তি—Try and try boys you will succeed at last—নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্য ও বিবিধতাও শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। নতুন, বৈচিত্র্যময় ও নানাপ্রকার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে শিখন হয়, তা গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিখনের চেয়ে অধিকতর সহজ ও কার্যকরী হয়।

শিখন পরিস্থিতির অন্তর্গত **বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক** জানাটিও শিশুর শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই জ্ঞান থাকলে শিক্ষার্থী পরিস্থিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেখেই সমগ্র পরিস্থিতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এই জ্ঞান তাকে সহজে সমস্যাটি সমাধান করতে সাহায্য করে।

উপমানের সূত্রটিও শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্য বহন করে। শিক্ষার্থী তার সমস্যার সমাধানে অতীতলব্ধ অনুরূপ জ্ঞান যদি প্রয়োগ করতে পারে তবে শিখন সহজ হবেই।

অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনও শিক্ষার ক্ষেত্রে সমভাবে উপকারী। বিদ্যালয়ে থাকার সময় শিশু যে সমস্ত অভ্যাস, আচরণ, আগ্রহ, অনুরাগ প্রভৃতি গড়ে তোলে, সেগুলিই ভবিষ্যতে তার পরিণত বয়সের জীবনকে প্রভাবিত করবে। স্কুলে কোনপ্রকার বিরূপ মনোভাবের ফলে তার সমগ্র জীবন নষ্ট হয়ে যেতে পারে এটা ভেবে নিয়ে শিক্ষককে সেই ভাবে অনুকূল অনুষঙ্গ স্থাপনের চেষ্টা করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় কর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার ক্ষেত্রে (Learning by doing) এই সূত্রগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী। এই জাতীয় শিক্ষা অত্যন্ত বাস্তবমুখী হয়ে থাকে। শিশু নিজে কাজের মাধ্যমে শেখে বলে শিক্ষাটিও তার মনে একটা সুস্পষ্ট ও স্থায়ী ছাপ রেখে যায়। বড় বড় আবিষ্কার ও সাফল্যের গোড়ার কথা কিন্তু 'প্রচেষ্টা ও ভুল।' আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সমস্ত আবিষ্কারের কথা জানি তা একবারের প্রচেষ্টায় আবিষ্কৃত হয়নি। অনেক বার প্রচেষ্টা করে অনেক ভুল সংশোধন করে তবেই সে আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতি শিশুকে নিজে নিজে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে শিখিয়ে স্ব-নির্ভর করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। স্কুলপাঠ্য এমন কতকগুলি বিষয় আছে যেখানে প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতিকে বাদ দেওয়া যায় না। অঙ্ক করা, নামতা মুখস্থ করা, কবিতা মুখস্থ করা, ব্যাকরণের নিয়ম জানা বা যুক্তি তর্ক-সমস্ত বিষয়বস্তু জানার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অপরিহার্য। অঙ্ক, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের শিখনের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতিকে বাদ দেওয়া যায় না। তবে এ ব্যাপারে শিক্ষকের সহযোগিতা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ শিক্ষা কর্মটিকে সহজ করে ও সময় এবং পরিশ্রমের অপচয় নষ্ট করে। এটি না হলেই R. P. Bhatnagar-এর ভাষায় বলতে হবে "There is much wastage of time and energy in learning by this method."

গেস্টাল্ট মতবাদ (Gestalt Theory) : গেস্টাল্ট কথাটি হ'ল একটি জার্মান শব্দ যার অর্থ হ'ল—কাঠামো, গঠন বা সম্পূর্ণ আকার (Structure, Form or Configuration। কোহ্‌লার, কফ্‌কা ও ভের্থাইমার হলেন এই মতবাদের স্রষ্টা। গেস্টাল্টবাদী বা সমগ্রতাবাদীদের মতে আমরা যখন কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি, তখন সেটিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যক্ষ করি না, সেটিকে সমগ্র ভাবে প্রত্যক্ষ করি। আবার বিভিন্ন

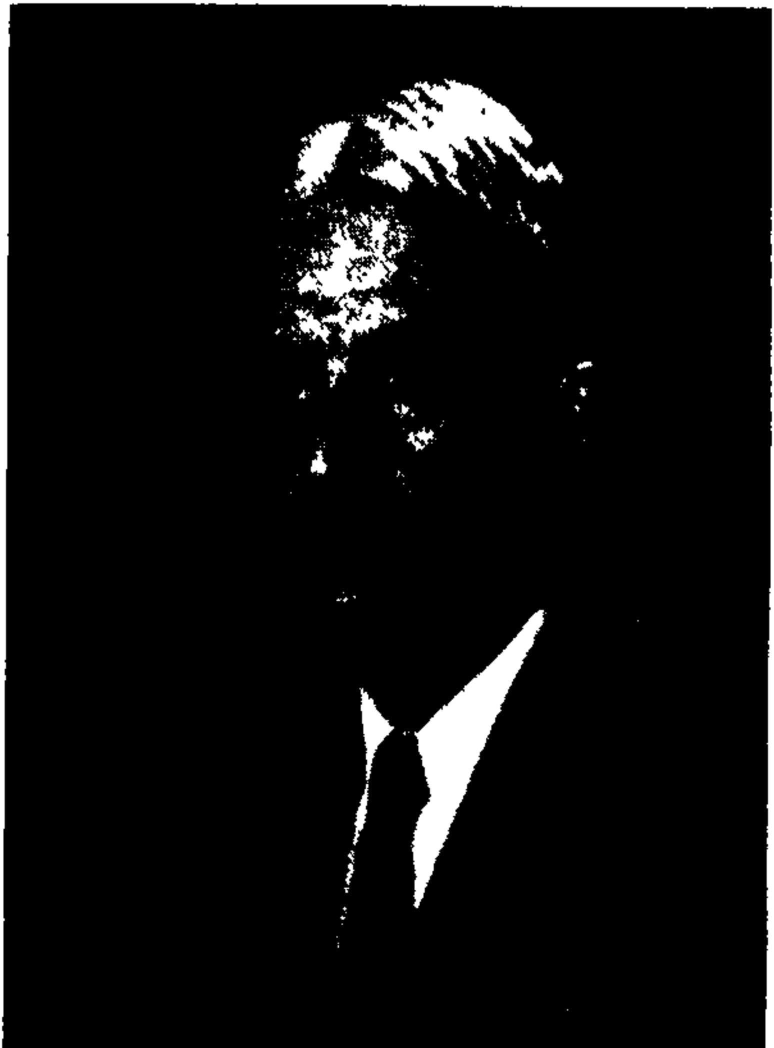

WOLFGANG KOHLER
1887—

জাতীয় বস্তু যদি পরস্পরের কাছাকাছি থাকে, আর তাদের মধ্যে যদি কোন সাদৃশ্য থাকে, তাহ'লে সেগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে না দেখে একটি সমগ্র (whole) বা একক (unit) হিসেবেই প্রত্যক্ষ করি। বিভিন্ন ফুল দিয়ে মালা গাঁথা হলেও আমরা ফুলগুলিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে না দেখে মালাটিকেই সামগ্রিক ভাবে দেখি।) সা-রে-গা-মা ইত্যাদি সুর সমন্বয়ে যে গান গাওয়া হয় আমরা সামগ্রিক ভাবে সেই গানটিই শুনি ; সা রে গা মা ইত্যাদি পৃথক ভাবে শুনি না। (সমগ্র বস্তুটির যে বৈশিষ্ট্য তা অংশগুলির বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আবার অংশগুলির বৈশিষ্ট্য যোগ করলেই সমগ্র বস্তুটির বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ সমগ্রের বৈশিষ্ট্যটি কেবলমাত্র অংশগুলির যোগফল নয় তার উপরে আরও কিছু। গেস্টাল্টবাদীরা বলেন, বিভিন্ন অংশের সংগঠন ও পারস্পরিক সম্পর্কের ফলেই সমগ্র বস্তুটির এই অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়।)

গেস্টাল্টবাদীরা বলেন আমাদের অভিজ্ঞতা কেবলমাত্র কতকগুলি সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, অনুভূতি বা প্রক্ষোভের নিছক যোগফল নয়। কতকগুলি মানসিক একককে যোগ করলেই যে একটি পূর্ণ মানসিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যায় —এটা তাঁরা বিশ্বাস করেন না। (তাঁদের মতে শিখনও কোন যান্ত্রিক বা অন্ধ প্রক্রিয়া নয়।) থর্নডাইকের প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতির ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে তাঁরা রাজী নন। তাঁরা বলেন একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রাণী যখন কোন উদ্দীপকের উত্তরে সাড়া বা প্রতিক্রিয়া দেয়, তখন তার এই সাড়া বা প্রতিক্রিয়াগুলি কতকগুলি পরস্পর সম্পর্কবিহীন অন্ধ প্রতিক্রিয়া নয়। (প্রাণী তার সমস্ত পরিস্থিতিটিকে সামগ্রিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং সামগ্রিক ভাবেই সাড়া দেয়। তাঁরা বলেন প্রাণীর শিখন হয় অন্তর্দৃষ্টির (Insight) মাধ্যমে। সাধারণ ভাবে বলা যায় অন্তর্দৃষ্টি হ'ল সমস্যাটির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সমগ্র সমস্যাটির সম্পর্ক সামগ্রিক ভাবে উপলব্ধি করা।) যখন কোন একটি সমস্যার মধ্যে ফাঁক থাকে, তখন সেই ফাঁকটিকে সমগ্র সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষণ করার নাম হ'ল অন্তর্দৃষ্টি এবং সেই ফাঁকটি পূরণ করাকে বলে অন্তর্দৃষ্টিমূলক আচরণ বা শিখন।) (When a problem amounts to a gap in the present situation, insight amounts to perceiving the gap and insightful behaviour or learning is nothing but closing the gap)। (অন্তর্দৃষ্টি কোন একটি সহজাত ক্ষমতা নয় ; এটি হ'ল

(এক অভিজ্ঞতালব্ধ ক্ষমতা।) (অন্তর্দৃষ্টির জন্য পশ্চাৎ দৃষ্টি (অতীত অভিজ্ঞতা) ও সম্মুখ-দৃষ্টি (ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা)—উভয়েরই প্রয়োজন হ'য়ে থাকে (Insight=Hindsight For sight)।)

(গেস্টাল্টবাদীরা বলেন অন্তর্দৃষ্টির জাগরণের জন্য **পৃথকীকরণ** (Abstraction) ও **সামান্যীকরণ** (Generalisation)—এই দু'রকমের মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।) পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রাণী শিখন পরিস্থিতির অন্তর্গত অপ্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বর্জন করে কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করে এবং সামান্যী-করণ প্রক্রিয়ায় সেই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে কোন একটি সামান্য তৈরী করে। অন্তর্দৃষ্টি তখনই জাগে যখন শিক্ষার্থী এই দুটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে শিখন পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত সাধারণ সূত্রগুলি উপলব্ধি করতে পারে। শিখন-প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটি স্তর বা সোপানের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়ে থাকে।

(১) শিক্ষার্থী সমস্যামূলক পরিস্থিতিটি সামগ্রিক ভাবে প্রত্যক্ষ করে;

(২) সে সমস্যাটির উদ্দেশ্যে সামগ্রিক ভাবেই সাড়া দেয়;

(৩) সমস্যাটির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের মধ্যে সে সংগঠন সাধন করে। এই স্তরে শিক্ষার্থী পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী স্বয়ং—তাঁর লক্ষ্য ও এই দুটির মাঝখানে যে বাধা—এই তিনটি বস্তুর মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক শিক্ষার্থী খুঁজে বার করে।

(৪) পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে শিক্ষার্থী সমস্যাটির অন্তর্নিহিত মৌলিক সূত্রগুলি উপলব্ধি করে। এই স্তরটিতেই সমস্যা সমাধানের উপায়টি শিক্ষার্থীর মধ্যে হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত দেখা দেয় এবং এটিকেই গেস্টাল্টবাদীরা অন্তর্দৃষ্টি বলেছেন।) সংক্ষেপে,(সমগ্রতাবাদ অনুযায়ী শিখনের নীতিগুলি হ'ল :—

(ক) অন্তর্দৃষ্টির নীতি (Principle of Insight)

(খ) সামগ্রিকতার নীতি (Principle of Whole) এবং

(গ) সমাধানের আকস্মিক আবির্ভাবের নীতি (Principle of sudden appearance of the solution).

গেস্টাল্টবাদীদের শিখন সম্বন্ধে গবেষণা : (কোহ্‌লার (Kohler) ইতর প্রাণী, যেমন মুরগী, কুকুর, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতির উপর বিভিন্ন জাতীয়

পরীক্ষণকার্য চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে প্রাণী কোন অন্ধ বা যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শেখে না। থর্নডাইকের বিড়ালের শিখন-সম্বন্ধীয় পরীক্ষণে পরিস্থিতিটি ছিল এমন ভাবে বন্ধ (closed) যাতে বিড়ালের সমগ্র সমস্যা-মূলক পরিস্থিতিটি লক্ষ্য করা সম্ভব হয়নি। ফলে সে অন্ধ, যান্ত্রিক ও উদ্দেশ্যহীন প্রচেষ্টা করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতিটি যদি উন্মুক্ত বা খোলা (open) হয়, তবে প্রাণী অন্ধ বা উদ্দেশ্যহীন প্রচেষ্টা করবে না। তার পরিবর্তে প্রচেষ্টাটি হবে লক্ষ্যের প্রতি উদ্দিষ্ট ও অর্থপূর্ণ।

কোহ্‌লার ১৯১৩-১৭ সালের মধ্যে ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের টেনেরিফ্‌ (Tenerife) দ্বীপে বানর ও শিম্পাঞ্জীদের উপর শিখন সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা চালিয়ে যান। তাঁর একটি পরীক্ষাতে একটি বড় খাঁচাতে একটি বানরকে রেখে খাঁচার উপরে একছড়া কলা বেঁধে দেওয়া হয়। খাঁচার রড বেয়ে উপরে ওঠার কোন ব্যবস্থা ছিল না—আর খাঁচার মেঝেতে দাঁড়িয়ে কলার নাগাল পাওয়া যাবে না। এরপর তিনি একটি কাঠের বাক্স খাঁচার মধ্যে রেখে দিলেন। এই বাক্সের উপর দাঁড়ালেই বানর কলার নাগাল পাবে। কিন্তু বানরটি বাক্সটিকে কোন কাজেই লাগাল না ফলে কলাও পেল না। এরপর কোহ্‌লার নিজে বাক্সটি কলার নীচে রেখে তার উপর দাঁড়িয়ে কলা-গুলিকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে বাক্সটিকে খাঁচার এক কোণে রেখে বাইরে চলে এলেন। তিনি বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বানরটি বাক্স এনে, তার উপর দাঁড়িয়ে কলা পেড়ে নিল। কোহ্‌লার বললেন—যতক্ষণ বানরটি তার পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারেনি, ততক্ষণ সে কলার নাগাল পায়নি। সম্বন্ধ নির্ণয় করার পর বাক্সটি আর বাক্স থাকছে না—সেটি শিখন সহায়ক একটি উপকরণ বা যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে।

কোহ্‌লারের অধিকাংশ পরীক্ষণে শিম্পাঞ্জীদের এই জাতীয় যন্ত্র যথা গাছের শুকনো ডাল, লাঠি, টুল ইত্যাদি ব্যবহার বা যাধার অপসারণ করতে হয়েছিল। তাঁর শিখন-সম্বন্ধীয় বিখ্যাত পরীক্ষণটি ছিল এই প্রকার—

সুলতানকে একটি বড় খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে রাখা হ'ল এবং খাঁচার মধ্যে দুটি বাঁশের লাঠি রাখা হ'ল। খাঁচার বাইরে এমন একটি জায়গাতে কয়েকটি কলা রাখা হ'ল যাতে সুলতান হাত বাড়িয়ে বা যে কোন একটি লাঠির সাহায্যে তার নাগাল না পায়। কিন্তু লাঠি দু'টির মধ্যে এমন ভাবে

গর্ত করা ছিল যাতে একটি লাঠি আর একটির মধ্যে ঢুকে যেতে পারে যার ফলে একটি লম্বা লাঠি তৈরী হ'তে পারে। ঐ লম্বা লাঠির সাহায্যে কিন্তু কলার নাগাল পাওয়া সম্ভব। শিম্পাঞ্জীটি প্রথমে হাত বাড়িয়ে এবং পরে লাঠি দুটি পৃথক ভাবে ব্যবহার করে কলার নাগাল পাবার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কলার নাগাল পেল না। তখন সে একটি লাঠি কলার দিকে যতদূর যায় ততদূর প্রসারিত ক'রে অন্য লাঠিটি দিয়ে আগের লাঠিটি ঠেলতে লাগল। এর ফলে লাঠি দুটি কলা স্পর্শ করল কিন্তু সে কলা পেল না। কোহ্‌লার বলছেন—এই ঘটনা কিন্তু শিম্পাঞ্জীকে অন্তর্দৃষ্টির ধারণা অর্জনে সাহায্য করল। এইবার সুলতান বাঁশের লাঠি দুটি নিয়ে নানাভাবে নাড়াচাড়া করতে লাগল। এইভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটি লাঠি আর একটি লাঠির মধ্যে ঢুকে গেল। দুটিতে মিলে একটি বেশ বড় লাঠি তৈরি হয়ে গেল। এইবার সুলতান আর বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত না করে, কালক্ষেপ না করে এবং উদ্দেশ্যহীন ভাবে চেষ্টা না করে খুব সহজেই সেই নতুন লাঠিটির সাহায্যে কলাগুলি নিজের দিকে টেনে নিল।

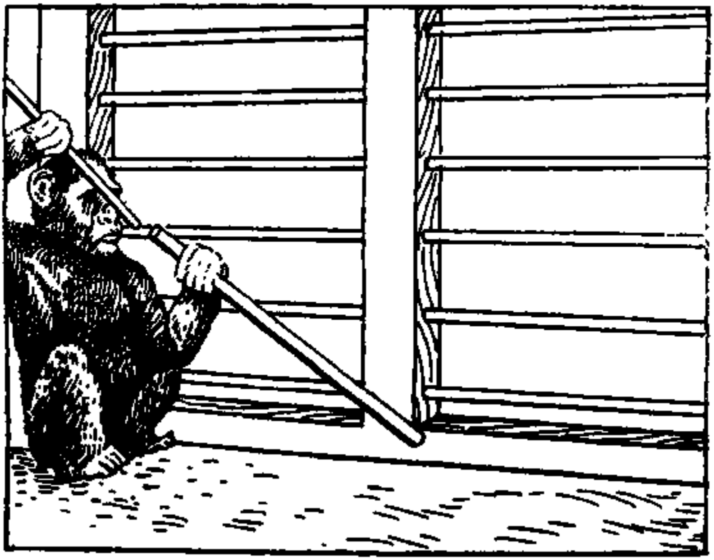

গেস্টাল্টবাদীদের মতে শিম্পাঞ্জীর এই শিখন প্রচেষ্টা ও ভুলের প্রক্রিয়ায় হয়নি, হয়েছে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে। উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্বন্ধ ও তাদের পারস্পরিক তাৎপর্য সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক ধারণা যখনই প্রাণীর

মধ্যে জাগরিত হয়, তখনই অন্তর্দৃষ্টির সঞ্চার হয়। অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হলেই প্রাণী আকস্মিক ভাবেই সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পায়। লাঠি দু'টি যতক্ষণ পর্যন্ত একটি লাঠিতে পরিণত হয়নি ততক্ষণ কোনরূপ সমগ্রতার সৃষ্টি হয়নি কিন্তু যে মুহূর্তে লাঠি দুটি মিলিত হয়ে একটি লাঠিতে পরিণত হ'ল সেই মুহূর্তেই একটি নতুন সংগঠনের সৃষ্টি হ'ল এবং সমস্যামূলক পরিস্থিতির অন্তর্গত ছেদ বা ফাঁকটি পূরণ হয়ে গেল।) গেস্টাল্টবাদীদের মতে শিখন হ'ল—সমগ্রের সঙ্গে অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করা এবং তা সম্ভব হয় একমাত্র অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই।)

প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে গেস্টাল্টবাদীরা বলেন এর ধর্ম হ'ল ভরাতা, ছেদ বা ফাঁক পূরণ করা। এই সমস্ত কারণে প্রত্যক্ষণের মধ্যে দেখা দেয় নূতন সংগঠন। যখন আমরা সমগ্রের সঙ্গে অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রত্যক্ষণ করি, তখন প্রত্যক্ষণের মধ্যেও নতুন সংগঠনের সৃষ্টি হয়। (শিখন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি জাগে তখনই যখন সে পরিস্থিতি ও তার উপযোগী প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে ফাঁক (gap) থাকে তা পূরণ করে এবং পরিস্থিতিটিকে সামগ্রিক ভাবে প্রত্যক্ষণ করার জন্ত সমগ্র পরিস্থিতি ও তার অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি ক'রে তার প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রটিকে নতুন ভাবে গড়ে তোলে। গ্যারেট-এর মতে "The solution of a problem or the attainment of a goal brings closure and ends the active search of the learner." এই অন্তর্দৃষ্টি সঞ্জাত প্রতিক্রিয়া প্রাণীকে ভবিষ্যতে অনুরূপ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সাহায্য করে।)

শিক্ষাক্ষেত্রে গেস্টাল্টবাদ: শিক্ষাক্ষেত্রে গেস্টাল্টবাদ অত্যন্ত মূল্যবান। এই শিক্ষা-নীতি মুখস্থ করার পদ্ধতি গ্রহণ করতে চায় না। আবার প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতিতে যে সময় ও শ্রমের অপচয় হয়, এক্ষেত্রে তা হয় না। এই পদ্ধতিতে শিক্ষণীয় বিষয়, তার সংগঠন, সংগতি ও অর্থপূর্ণ উপলব্ধির দিকেই সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই প্রক্রিয়াতে শিক্ষার্থীর কল্পনা-শক্তি, বিচার-করণের ক্ষমতা ও চিন্তার সামর্থ্য উন্নততর হয়। তাছাড়া এই শিখন প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীর সহজাত ও স্বাভাবিক প্রাথমিক অন্তর্দৃষ্টির উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করে। যাই হোক্ গেস্টাল্ট মতবাদ বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে, সে সম্বন্ধে পর পৃষ্ঠায় বিশদ ভাবে আলোচনা করা হ'ল—

* এতদিন পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হ'ত। এই পদ্ধতিতে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটিকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে এক একটি অংশ শিক্ষার্থীদের শেখানো হ'ত। ফলে তারা সমগ্র বিষয়টি সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ধারণা অর্জন করতে পারত না। এইজন্য তার শিক্ষা হ'ত শিক্ষক পরিচালিত, অন্ধ ও যান্ত্রিক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, সমগ্র একটি কবিতার মধ্যে যে ভাব থাকে, তা না বুঝিয়ে কবিতাটির বিভিন্ন অংশ শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরলে সামগ্রিক ভাবে ভাব উপলব্ধি বা রসাস্বাদন করা সম্ভব হয় না। গেস্টাল্ট নীতি অনুযায়ী শিক্ষাক্ষেত্রে সংশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে প্রথমেই শিক্ষার্থীকে সমগ্র বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটা ধারণা অর্জন করতে সাহায্য করা হয়, তারপর প্রয়োজন অনুযায়ী অংশগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। আগের পদ্ধতি ছিল—

বিশ্লেষণ→সংশ্লেষণ

আর এখানকার পদ্ধতি হ'ল :

সংশ্লেষণ→বিশ্লেষণ→সংশ্লেষণ।

এখন চেষ্টা করা হয়, কোন কিছু শেখাবার সময় প্রথমেই পাঠ্যবস্তুর একটা সামগ্রিক রূপ শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন হ'লে ঐ সমগ্র বিষয়টিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করতে হবে, কিন্তু ঐ অংশগুলি থেকে আবার সমগ্র বিষয়ে যেতে হবে।

* গেস্টাল্ট মতবাদ বলে, শিখন আসে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে এবং অন্তর্দৃষ্টির জন্য সমগ্র সমস্যাটির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্কটি জানা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর মধ্যে এই সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতাটি যাতে সুষ্ঠুভাবে জন্মায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সম্বন্ধ বা সম্পর্ক স্থাপনের কৌশলটি শিক্ষার্থী আয়ত্ত করতে পারলেই তার শিখনও দ্রুত হবে।

* অন্তর্দৃষ্টি জাগরণের জন্য সম্পর্ক স্থাপন ছাড়াও পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণ—এই দুটি মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। কাজেই শিক্ষার্থীর মধ্যে এই দুটি মানসিক প্রক্রিয়া যাতে উপযুক্ত ভাবে স্পষ্ট হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

* শিখন কোন অন্ধ বা যান্ত্রিক প্রচেষ্টা নয়। অন্তর্দৃষ্টির জন্যও অকারণ উদ্দেশ্যহীন অন্ধ বা যান্ত্রিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। কাজেই শিক্ষার্থী

যাতে অহেতুক অপ্রয়োজনীয় আচরণ ক'রে সময় ও শ্রমের অপচয় না করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

• শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যদি শিক্ষার্থীর জানা না থাকে এবং শিখন পরিস্থিতি যদি বদ্ধ থাকে, তাহ'লেই শিখন অন্ধ ও যান্ত্রিক হয়। গেস্টাল্ট মতবাদ শিখন পরিস্থিতি উন্মুক্ত রাখে এবং শিক্ষার্থীকেও তার শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্ণভাবে অবহিত করে। কাজেই শিক্ষাক্ষেত্রে এদিকেও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

• শিক্ষা-গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীর যেন বুদ্ধিগত ও প্রাক্ষোভিক প্রস্তুতি থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিখনের সাফল্য নির্ভর করে সমস্যামূলক পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের উপর। শিখন প্রক্রিয়াটি এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে এবং তার গতি এমন হবে—যাতে শিক্ষার্থীর নিকট এই পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের কাজটি সহজ ও সম্ভব হয়। অর্থাৎ শিখন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি যেন শিক্ষার্থীব বোধশক্তি ও গ্রহণ ক্ষমতার মধ্যে সুষম ভাবে সংহতিবদ্ধ থাকে। শিক্ষণীয় বিষয়টি গ্রহণ করাব মত অন্তদৃষ্টি-মূলক প্রস্তুতি যেন শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

• অন্তদৃষ্টি মূলক শিখনে সাফল্য অর্জন করতে হ'লে শিক্ষকের সহায়তা একান্ত প্রয়োজনীয়। শিক্ষকের সুপরিচালনা ও সু-নিয়ন্ত্রণ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা-ক্ষেত্রে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

• গেস্টাল্ট নীতি সৃজনমূলক কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধনে সহায়তা করে। সৃজনমূলক আচরণ সম্পাদনের ক্ষেত্রেও নীতিটি সবিশেষ উপযোগী।

• অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের ফলে শিক্ষার্থীদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

• নূতন কিছু আবিষ্কার করার ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি যথেষ্ট সাহায্য করে।

গেস্টাল্ট মতবাদের ত্রুটি : গেস্টাল্ট মতবাদ, বিশেষতঃ তাদের শিখন-নীতি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। সমালোচকেরা বলেন, অন্তদৃষ্টি শব্দটি বর্ণনামূলক। এর দ্বারা কিছু ব্যাখ্যা করা যায় না। তাছাড়া অন্তদৃষ্টি জাগ্রত হবার আগে শিক্ষার্থী মনে মনে অসংখ্য বার প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। আর কোহ্লার প্রাণীদের নিয়ে যে সমস্ত পরীক্ষণ করেছেন তাতে অনেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষকের উপস্থিতি, তার নির্দেশদান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষণকে

প্রভাবিত করেছে। খুব নির্দোষ পরীক্ষকও কিছু না কিছু ইঙ্গিত দিয়ে ফেলেন। আবার এই সমস্ত পরীক্ষণের ফলাফল পরিসংখ্যানের দ্বারা প্রমাণিত বা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি।

॥ প্রচেষ্টা ও ভুল এবং অন্তর্দৃষ্টি-মূলক শিখনের তুলনা ॥

প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতি	অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন
১। শিখন পরিস্থিতিতে উদ্দীপকগুলিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখে প্রাণী বিচ্ছিন্ন ভাবে সাড়া দেয়।	১। শিখন পরিস্থিতিটিকে প্রাণী সামগ্রিক ভাবে দেখে সামগ্রিক ভাবেই সাড়া দেয়।
২। উদ্দীপকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার নির্ভুল যোগসূত্র স্থাপিত হলেই শিখন হয় (S-R Bond)।	২। শিখন পরিস্থিতির উপযুক্ত সংগঠন থেকেই শিখন সম্ভব হয়।
৩। প্রাণীর প্রচেষ্টাগুলি অন্ধ, যান্ত্রিক ও উদ্দেশ্যবিহীন।	৩। প্রাণীর প্রচেষ্টাগুলি সুপরিকল্পিত, অর্থপূর্ণ ও লক্ষ্যের প্রতি উদ্দীষ্ট।
৪। শিখন পরিস্থিতিটি থাকে বদ্ধ অবস্থায়।	৪। শিখন পরিস্থিতিটি থাকে উন্মুক্ত অবস্থায়।
৫। উন্নততর মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। বারবার প্রচেষ্টা ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিখন ঘটে থাকে।	৫। উন্নততর মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয় এবং শিখন ঘটে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে।
৬। সময় অনেক বেশী লাগে।	৬। সময় অনেক কম লাগে।
৭। শিক্ষার্থীকে বেশী পরিশ্রম করতে হয়।	৭। শিক্ষার্থীকে কম পরিশ্রম করতে হয়।
৮। শিখনের জন্য প্রচেষ্টাগুলি প্রধানতঃ শারীরিক স্তরের।	৮। শিখনের প্রচেষ্টাগুলি প্রধানতঃ মানসিক স্তরের।
৯। নিম্নশ্রেণীর প্রাণী বা স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী।	৯। উচ্চশ্রেণীর প্রাণী বা উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী।

অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া মতবাদ (Theory of Conditioned Response): (এই মতবাদের মূল কথা হ'ল উদ্দীপকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার সংযোগ স্থাপন করা। বিখ্যাত রুশ শরীরতত্ত্ববিদ প্যাভ্‌লভ (Pavlov) এবং আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী ওয়াটসন্ (Watson) এই মতবাদের সমর্থক। প্যাভ্‌লভকে এই মতবাদের জনক বলা যেতে পারে।) থর্নডাইকের 'অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র'-টির এবং এই মতবাদের মূলনীতি দুটি একই। প্যাভ্‌লভেরও পূর্বে ভ্লাডিমির বেক্‌টেরেভ (Bechterev) নামে একজন রাশিয়ান মনোবিজ্ঞানী এই অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেছিলেন। প্যাভ্‌লভই প্রথম অনুবর্তনের সূত্র ও তত্ত্বগুলি সমন্বিত করে সেগুলির একটি সার্থক রূপ দেন।

(আচরণবাদীদের মতে শিখন হ'ল একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। প্যাভ্‌লভ বলেন অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে সব রকম শিখন পদ্ধতির ব্যাখ্যা করা সম্ভব। জটিল শিখন প্রক্রিয়াকে তিনি একাধিক অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ার দীর্ঘ শিকল বলে ব্যাখ্যা করেছেন (Long chain of conditioned reflexes)। ওয়াটসন বা অন্যান্য আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীও প্যাভ্‌লভের এই মতবাদটি সমর্থন করেছেন।

অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া কাকে বলে? প্যাভ্‌লভ বিভিন্ন গবেষণার সাহায্যে দেখালেন যে, স্বাভাবিক উদ্দীপক বা নিরপেক্ষ উদ্দীপক (Natural Stimulus) প্রয়োগ করার জন্য স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কিন্তু ঐ স্বাভাবিক উদ্দীপকটির সঙ্গে সঙ্গে যদি কোন বিকল্প উদ্দীপক (Artificial or Substitute stimulus) বার বার উপস্থাপিত করা হয়, তাহ'লে কিছুদিন পরে ঐ বিকল্প উদ্দীপকটি প্রয়োগ করেই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা যাবে। বিকল্প উদ্দীপক প্রয়োগ করে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার ঘটনাকে অনুবর্তন বা অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া বলা হয় (Conditioned Reflex)। প্যাভ্‌লভ Conditioned Reflex কথাটিই ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু আজকাল এর পরিবর্তে Conditioned Response কথাটি ব্যবহার করা হয়।)

[Any response brought about by something other than its original biologically adequate stimulus is called a Conditioned Reflex.]

অনুবর্তন প্রতিক্রিয়াটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হ'ল—

স্বাভাবিক উদ্দীপক (উঃ ১)-এর উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (প্রঃ ১) দেখা দেয়—যেমন বিদ্যুৎ চমকালেই চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায়, তেমনি

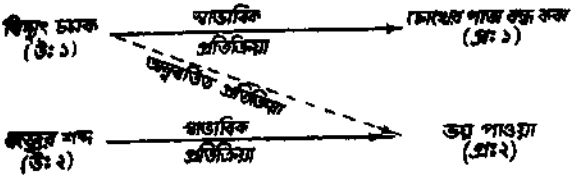

(উঃ ২)-এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হ'ল (প্রঃ ২)—যেটি হ'ল বজ্রের শব্দ শুনলে ভয় পাওয়া। কিন্তু বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে সঙ্গে বার বার বজ্রের শব্দ শোনার ফলে অবস্থাটি এমন দাঁড়িয়েছে যে বিদ্যুৎ চমকালেই আমরা ভয় পাই। এখন ভয় প্রতিক্রিয়াটি বজ্রের শব্দ থেকে বিদ্যুৎ চমকে অনুবর্তিত হয়ে গেছে।

প্যাভ্‌লভের সেই বিখ্যাত কুকুর: কুকুরের লালাক্ষরণ সম্বন্ধে প্যাভ্‌লভ প্রতিক্রিয়া সঞ্চালনের উপর যে গবেষণাকার্যটি সম্পন্ন করেন, তার জন্য তিনি মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে খাদ্য একেবারে জিভের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এলে কুকুরের যেমন লালাক্ষরণ হয়—খাদ্য জিভের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে না এলেও খাদ্যবস্তু দেখতে পাওয়া মাত্র, যে পাত্রে খাদ্য সরবরাহ করা হয়, সেটি দেখা মাত্র বা যে লোকটি কুকুরটিকে রোজ খাদ্য দেয় তাকে দেখা মাত্র কুকুরের তেমনি লালাক্ষরণ হয়। খাদ্য হ'ল কুকুরের স্বাভাবিক উদ্দীপক। খাদ্য ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত উদ্দীপক কুকুরের লালাক্ষরণ ঘটাতে পারে—তিনি তাদের নাম দিলেন বিকল্প উদ্দীপক (Conditioned Stimulus), আর এই বিকল্প উদ্দীপক প্রয়োগ করে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—তার নাম দিলেন অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া। এরপর তিনি দেখলেন স্বাভাবিক উদ্দীপকটির সঙ্গে সঙ্গে একটি কৃত্রিম উদ্দীপক যদি বার বার উপস্থাপিত করা হয়, তবে ঐ কৃত্রিম উদ্দীপকটিই স্বাভাবিক উপদ্দীকের উত্তরে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হয়, সেই একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। খাদ্য দেখলেই কুকুরের স্বাভাবিক লালাক্ষরণ হ'তে থাকে। ঘণ্টার শব্দ সম্বন্ধে কুকুরটিকে উদাসীন বলা যেতে পারে বা তার মধ্যে একটা চঞ্চলতা বা অস্থিরতা দেখা যেতে পারে। এখন

যদি কুকুরটিকে খাবার দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজান হয়, তাহ'লে কিছুদিন পরে দেখা যাবে, খাবার না দিয়ে শুধু ঘণ্টা বাজালেই কুকুরের লালাক্ষরণ হতে শুরু করেছে। এখানে লালাক্ষরণ—যেটি ছিল স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, সেটি তার স্বাভাবিক উদ্দীপকটি ছেড়ে, একটা কৃত্রিম উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেল। স্বাভাবিক উদ্দীপক থেকে কৃত্রিম উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়ার এই সঞ্চালনকেই 'অনুবর্তন' (conditioning) বলে এবং যে প্রাণীর ক্ষেত্রে এই জাতীয় পরিবর্তন ঘটে সেই প্রাণীকে 'অনুবর্তিত' (conditioned) প্রাণী বলা হয়।

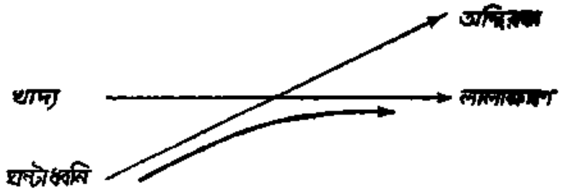

অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া কি ভাবে সৃষ্ট হয় ? : অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট করার সহজ পদ্ধতি হ'ল স্বাভাবিক উদ্দীপকের একেবারে সঙ্গে, বা অব্যবহিত পূর্বে বা অব্যবহিত পরে (৩ সেকেণ্ডের মধ্যে) বিকল্প বা কৃত্রিম উদ্দীপকটিকে উপস্থাপিত করা। প্যাভ্‌লভ তাঁর পরীক্ষণে সব সময় খাদ্যকেই স্বাভাবিক উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহার করতেন (Biologically adequate stimulus), আর দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ-সম্পর্কীয় উদ্দীপককে কৃত্রিম উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহার করতেন। কুকুরের উপর পরীক্ষণে তিনি যে কেবল 'ঘণ্টা'ই ব্যবহার করেছিলেন, তা নয়, কখনও কর্পূরের গন্ধ, কখনও আলো আবার কখনও বা কুকুরটির গা ঘষে প্রতিক্রিয়া ঘটানো হ'ত। এই সমস্ত পরীক্ষণ থেকেই তিনি প্রমাণ করেন যে বিকল্প উদ্দীপকগুলি এবং প্রতিক্রিয়া (লালাক্ষরণ)—এই দুটির মধ্যে একটা অনুবন্ধ স্থাপিত হয়।

প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে অনুবর্তন : আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীরা অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ার সাহায্যেই সব রকম শিখন-প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করে থাকেন। তাঁদের মতে কোন ব্যক্তির অভ্যাস, পছন্দ-অপছন্দ, মনোভাব, ভয়-ঘৃণা ইত্যাদি জাতীয় প্রক্ষোভ সব কিছুই কোন না কোন অনুবর্তনের ফল। শিশুর মধ্যে যে সমস্ত সরল প্রক্ষোভ থাকে, সেগুলি যে ক্রমশঃ জটিল প্রক্ষোভে পরিণত হয়,

তার মূলেও এই অনুবর্তন প্রক্রিয়া। প্রক্ষোভ যে অনুবর্তিত হয়, সে সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা করেন প্রসিদ্ধ আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানী ওয়াটসন। তিনি তাঁর নানা গবেষণা থেকে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসেন যে নবজাত শিশুর ভয় জাগাতে পারে এমন মাত্র দু'টি উদ্দীপক আছে। উচ্চশব্দ এবং হঠাৎ অবলম্বন হারানো (পড়ে যাওয়া)। কিন্তু সে যত বড় হয় তত সে আরো বেশী জিনিসকে ভয় করে। অর্থাৎ তার ভয়টি আরো বহু উদ্দীপকে সঞ্চালিত হয়ে যায়। অনুবর্তন প্রক্রিয়াই তার এই প্রক্ষোভকে জটিলতর ও বিস্তৃত করে।

অনুবর্তন প্রক্রিয়ার জন্যই যে শিশুর মধ্যে ভয় জাগে তা প্রমাণ করার জন্য ওয়াটসন একটি পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। অ্যালবার্ট নামে এগারো মাসের একটি শিশু ছিল তাঁর পরীক্ষণ পাত্র। লোমওয়ালা জন্তু, যেমন খরগোস, কুকুর, ইঁদুর প্রভৃতি দেখে অ্যালবার্ট ভয় পেত না। কিন্তু অন্যান্য শিশুদের মতই কোন জোরালো শব্দ শুনলে সে ভয় পেত। অ্যালবার্টের কাছে ওয়াটসন একটি সাদা ইঁদুর নিয়ে আসেন। অ্যালবার্ট যেমনি ইঁদুরের কাছে এসে সেটিকে স্পর্শ করল, অমনি তার পিছন থেকে বেশ জোরে শব্দ করা হ'ল। শব্দটি শোনামাত্র অ্যালবার্ট ভয় পেয়ে গেল। এই রকম বার বার ইঁদুর ও জোর শব্দ একসঙ্গে উপস্থাপিত করার পর দেখা গেল অ্যালবার্ট কেবলমাত্র ইঁদুর দেখলেই ভয় পাচ্ছে। এখানে জোর শব্দের জন্য যে ভয়—তা সঞ্চালিত হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, ইঁদুরের প্রতি যে ভয় তা লোমওয়ালা বিভিন্ন জন্তুতেও অনুবর্তিত হ'তে পারে।

পরীক্ষা করে আরো দেখালেন যে অনুবর্তন প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে ভয়টি মন থেকে দূর করাও সম্ভব। যে উদ্দীপকের জন্য ভয়ের সঞ্চার হয়, সেই উদ্দীপককে যদি শিশুর পক্ষে সন্তোষজনক বা তৃপ্তিকর কোন উদ্দীপকের সঙ্গে যুক্ত করা যায়—তাহ'লে তার মন থেকে ভয়টি দূর হয়ে যাবে। একটি শিশু খরগোস দেখলেই ভয় পেত। শিশুটি যখন আনন্দজনক অবস্থায় ছিল অর্থাৎ যখন সে তার মায়ের সঙ্গে খেলা করছে বা খাবার খাচ্ছে, তখন খরগোসটিকে তার কাছে নিয়ে আসা হতে লাগল। এইভাবে খরগোসটিকে পর পর কয়েকদিন শিশুটির কাছে তার আনন্দজনক অবস্থায় আনা হ'ল। শিশুর আনন্দ যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। কিছুদিন পর দেখা গেল—শিশুর মন থেকে খরগোস সম্বন্ধে ভয়টি চলে গেছে।

ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি বস্তু থেকে বহু বিভিন্ন জাতীয় বস্তুতে ভয় ছড়িয়ে পড়ে। ছোট শিশু প্রথমে অন্ধকার সম্বন্ধে উদাসীন থাকে। কিন্তু অন্ধকারে কোন জোর শব্দ শুনে হঠাৎ বিছানা থেকে পড়ে গিয়ে সে ভয় পায় এবং সেই ভয়টি অন্ধকারে সঞ্চালিত বা অনুবর্তিত হয়ে যায়।

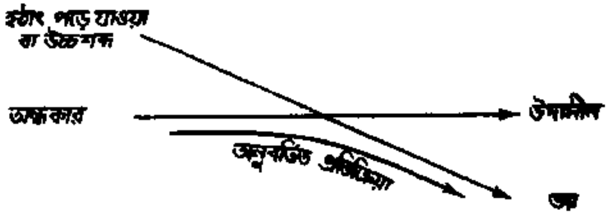

একটি অনুবর্তিত বস্তু থেকে আবার অনেক নতুন বস্তুতে ভয় অনুবর্তিত হতে পারে। যেখান থেকে আবার অন্য কোন নতুন বস্তুতে এইভাবে অনেক শিশুর প্রক্ষোভগুলি অনুবর্তিত হয়ে যায়। স্কুলপাঠ্য বিষয়ে শিশুদের অনুরাগ বা বিরাগও অনুবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। অধিকাংশ ছাত্রই অঙ্ক-বিষয়টিকে ভয় পায়। এর কারণ হয়তো অঙ্ক শিখনের পদ্ধতি বা অঙ্ক শিক্ষকের আচরণ ছাত্রের নিকট বিরক্তিকর। এই পদ্ধতি বা শিক্ষকের প্রতি বিরাগটিই অঙ্কের প্রতি বিরাগ বা ভয়ে পরিণত হয়ে যায়। তেমনি শিশুর পছন্দ অপছন্দ, আনন্দ, ভালবাসা প্রভৃতিও এক বস্তু হতে আর এক বস্তুতে সঞ্চালিত হয়ে যায়। শিশু মা-বাবাকে ভালবাসে। মা-বাবা যে সমস্ত কাজ করতে ভালবাসেন, শিশুও সেই সমস্ত কাজ করতে ভালবাসে। ছাত্রেরা যে সমস্ত শিক্ষককে ভালোবাসে, সেই সমস্ত শিক্ষকের আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতেও ছাত্রদের ভালো লাগাটি সঞ্চালিত হ'য়ে যায়।

অপানুবর্তন (**Deconditioning**): অনুবর্তন প্রক্রিয়া কতকগুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতির বা নীতির উপর নির্ভরশীল। এ পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে এই নীতিগুলির উপর। নীতিগুলি হ'ল –

(ক) **সময়ের নীতি** (**Principle of Time**): কৃত্রিম উদ্দীপক ও স্বাভাবিক উদ্দীপক—এই দুটি উদ্দীপক উপস্থাপনের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান যেন খুব বেশী না হয়।

(খ) **তীব্রতার নীতি** (Principle of Intensity): স্বাভাবিক উদ্দীপকটি তীব্র হওয়া প্রয়োজন ঠিকই, কিন্তু কৃত্রিম উদ্দীপকটির তীব্রতা তার চেয়ে কম হলে আর প্রাণীর মধ্যে বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না।

(গ) **সামঞ্জস্যের নীতি** (Principle of Consistency): পদ্ধতিগুলির কোনপ্রকার পরিবর্তন না করে বেশ কয়েকদিন সেগুলির পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

(ঘ) **পরিস্থিতি-সম্বন্ধীয় নীতি** (Principle of Situation): যে পরিস্থিতিতে অনুবর্তন প্রক্রিয়াটি ঘটবে বা ঘটানো হবে, সেই পরিস্থিতিতে এমন কিছু থাকা চলবে না যাতে মনোযোগ ব্যাহত হ'তে পারে বা চিত্তচাঞ্চল্য ঘটতে পারে।

(ঙ) **পুনরাবৃত্তির নীতি** (Principle of Repetition): উদ্দীপকগুলিকে (স্বাভাবিক ও কৃত্রিম) বার বার উপস্থাপিত করলে তবেই অনুবর্তন সম্ভব হয়।

এই নীতিগুলি অনুপস্থিত থাকলেই অনুবর্তন ঘটার কাজটি বন্ধ হয়ে যাবে, অনুবর্তন ঘটার পর সেটি বন্ধ হয়ে যাওয়াকে **অপানুবর্তন** বলে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে স্বাভাবিক উদ্দীপকটিকে যদি দীর্ঘদিন কৃত্রিম উদ্দীপক থেকে সরিয়ে রাখা হয়, তাহ'লে অনুবর্তন ক্রমশঃ শিথিল হয়ে যেতে পারে। কুকুরের লালাক্ষরণটি যখন ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে অনুবর্তিত হয়ে যায়, তখন যদি দীর্ঘকাল খাবার না দিয়ে কেবলমাত্র ঘণ্টা বাজানোই হয়, তবে দেখা যাবে লালাক্ষরণের পরিমাণ ক্রমশঃ কমে আসছে এবং এমন একটা সময় আসবে যখন আর ঘণ্টা বাজালেও লালাক্ষরণ হবে না। এখন বলা যাবে প্রতিক্রিয়াটির অনুবর্তন লুপ্ত হয়ে গেছে বা সেটি অপানুবর্তিত হয়ে গেছে।

পুনরুস্থাপনের সূত্র (Law of Re-inforcement): কুকুরের লালাক্ষরণ যখন ক্রমশঃ কমে আসছে, সেই সময় যদি মাঝে মাঝে খাবার দেওয়া যায় তাহ'লে দেখা যাবে, আবার আগের মতই লালাক্ষরণ শুরু হয়েছে—অর্থাৎ অনুবর্তন প্রক্রিয়াটি আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে অনুবর্তন সম্পূর্ণ লুপ্ত হবার আগে যদি কৃত্রিম উদ্দীপকটির সঙ্গে মাঝে মাঝে স্বাভাবিক উদ্দীপকটিকে উপস্থাপিত করা হয়, তবে অনুবর্তনটি নষ্ট হয়ে যায় না। অনুবর্তনটি বজায় রাখার জন্য কৃত্রিম উদ্দীপকের সঙ্গে

মাঝে মাঝে স্বাভাবিক উদ্দীপকের এই উপস্থাপনকে প্যাভ্‌লভ বলেছেন—পুনরুস্থাপন প্রক্রিয়া। এর সঙ্গে থর্ণডাইকের ফললাভের সূত্রের অনেক মিল আছে। দুটি সূত্রের মূল বক্তব্যই হ'ল—শিখনের স্থায়িত্ব প্রাণীর তৃপ্তিবোধের উপর নির্ভর করে।)

শিক্ষাক্ষেত্রে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার উপযোগিতা: শিক্ষাক্ষেত্রে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। বিশেষতঃ শিশুর ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশে এই প্রক্রিয়াটির যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে।

এখন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটির উপযোগিতার কথা আলোচনা করা যাক্। শিশু প্রথম অবস্থায় ভাষা ব্যবহার করতে জানে না কিন্তু সে যত বড় হয়, ততই বেশী করে ভাষা আয়ত্ত করে। এই ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার প্রভাব প্রচুর। আমরা যখন আমাদের প্রথম ভাষা শেখাই, তখন বিশেষ একটি শব্দের সঙ্গে বিশেষ একটি ব্যক্তি বা বস্তু সংযুক্ত করে নিই। যেমন, মুখে 'কুকুর' শব্দটিও বলি আর বিশেষ একটি চতুষ্পদ জন্তুও তাকে দেখাই। তেমনি সে 'মা' বললেই বিশেষ একজনই তার কাছে আসেন। শিশুর এই জাতীয় অভিজ্ঞতা থেকে স্বাভাবিক ভাবে একটি বিশেষ শব্দের সঙ্গে একটি বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তি অনুবর্তিত হয়ে যায়। আবার এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সে ভাষার অন্যান্য দিক, ব্যাকরণ যথা বিশেষণ, ক্রিয়া ইত্যাদি অন্যান্য শব্দের অর্থগুলিও শিখে যায়।

এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যেগুলি স্বতঃস্ফূর্ততা ছাড়া শেখা যায় না। ধারাপাতের নামতা, বীজগণিতের সূত্র, সংস্কৃত ব্যাকরণের সুবন্ত প্রকরণ ইত্যাদি কতকগুলি হ'ল এ জাতীয় বিষয়। অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু এগুলিতে দক্ষতা অর্জন করে। আবার পড়া, লেখা, বানান, শুদ্ধ করে লেখা এগুলিও অনুবর্তনের ফল।

শিশুর অনেক আচরণের মূলে থাকে অনুবর্তন। ভোরে ঘুম থেকে ওঠা, দাঁত মাজা, বিশেষ সময়ে খাওয়া, পড়তে বসা, গুরুজনদের শ্রদ্ধা দেখানো, ঠাকুর-দেবতাকে নমস্কার করা এ সবই অনুবর্তনের ফল। আবার সামাজিক রীতি-নীতি, শিষ্টাচার এ সবও শিশুরা অনুবর্তনের মাধ্যমেই শেখে।

প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে যে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার ফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা আমরা আগেই ওয়াটসনের পরীক্ষণ থেকে দেখেছি। অনেক ক্ষেত্রেই শিশুর পছন্দ-

অপছন্দ, রাগ, ভয়, ঘৃণা, আনন্দ, অনুরাগ ইত্যাদি সৃষ্ট হয় অনুবর্তনের জন্য। ছেলেদের স্কুলপাঠ্য বিষয়ে অনুরাগ বা বিরাগ ও অনুবর্তনের জন্য ঘটে থাকে। শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষক বা সহপাঠী ইত্যাদির প্রতি শিক্ষার্থীর যাতে প্রতিকূল প্রক্ষোভ না জন্মায় এবং অনুকূল প্রক্ষোভ জন্মায় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। স্কুলে বা ক্লাসে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনার জন্য সমগ্র বিদ্যালয়টির উপরই শিশুর বিরাগ সৃষ্টি হতে পারে।

মন্দ অভ্যাসও অনুবর্তনের ফল হতে পারে। বানান ভুল, থুথু দিয়ে পাতা উল্টানো, অসতর্কতা, অমনোযোগ ইত্যাদির মূলে অনুবর্তনের উপস্থিতি একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। বানান ভুল হলে তিরস্কার করলে বা বড় বড় করে লাল কালি দিয়ে কেটে গেলে শিশু সেগুলিকে অপছন্দই করবে—(অনুবর্তনের জন্য) এবং এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে। ফলে সে বানানটি তার শুদ্ধ করে শেখা হবে না। শিশুর মধ্যে যাতে অবাঞ্ছিত অনুবর্তনের সৃষ্টি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। শিক্ষকই পরিবেশটিকে উপযুক্ত ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত অনুবর্তনের সৃষ্টি করতে পারেন। সং-অভ্যাস, সং-মনোভাব, ভদ্রতা, লৌকিকতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ভালোভাবে ও সহজে শেখা যায়। অনুবর্তনের প্রভাব সারাজীবনই থেকে যায়। শাস্তি ও পুরস্কার দানও অনুবর্তন প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। পরিবেশের সঙ্গে সার্থক ভাবে সঙ্গতি সাধনে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মত সহায়ক আর কেউ নেই।

শিখনের বিভিন্ন তত্ত্বের সমন্বয়ন : শিখনের যে তিনটি বিভিন্ন জাতীয় তত্ত্বের আলোচনা করা হ'ল—সেগুলির সমর্থকেরা প্রত্যেকে তাঁদের তত্ত্বটিকেই শিখনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা বলে মনে করেন এবং দাবী করেন—ঐ পদ্ধতি ছাড়া অন্য ভাবে শিখন সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিখন তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমেই হয়ে থাকে। কিন্তু কখন কোন্ পদ্ধতি অনুযায়ী শিখন সংঘটিত হবে, তা নির্ভর করছে প্রধানতঃ তিনটি বস্তুর উপর। সেগুলি হ'ল—শিখনের বিষয়বস্তুর স্বরূপ, শিখন পরিস্থিতির প্রকৃতি এবং শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা।

বিষয়বস্তু : প্রাথমিক, সহজ শিখন সম্ভব হয় অনুবর্তনের মাধ্যমে। অনুবর্তন প্রক্রিয়াটি যান্ত্রিক, স্বতঃপ্রবৃত্ত ও প্রাণীর ইচ্ছা নিরপেক্ষ। এর

IVAN P. PAVLOV
1849-1936

সাহায্যে প্রাণী নতুন আচরণ, অভ্যাস ইত্যাদি আয়ত্ত করে। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যেখানে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয় না, সেখানে প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতি আর যেখানে বিষয়বস্তুটির একটা সামগ্রিক রূপ পাওয়া যায় সেখানে অন্তর্দৃষ্টিমূলক পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

পরিস্থিতি: যেখানে শিখন পরিস্থিতিটি শিক্ষার্থীর কাছে বদ্ধ থাকে, সেটি অনির্দিষ্ট প্রকৃতির হয় ও তার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর নিকট স্পষ্ট নয়—তখনই শিক্ষার্থীকে প্রচেষ্টা ও ভুলের পথটি বেছে নিতে হবে। কিন্তু যখন পরিস্থিতিটি শিক্ষার্থীর নিকট উন্মুক্ত থাকে এবং তার লক্ষ্যটি শিক্ষার্থীর জানা থাকে, তখন শিক্ষার্থী শেখে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে। কৌশল শিখনের ক্ষেত্রে প্রাণীকে প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমেই অগ্রসর হতে হয়। টাইপ করা, মোটরগাড়ী চালান, সাইকেল চড়া, সাঁতার কাটা এ সবই কৌশল—যেগুলি প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে আয়ত্ত করতে হয়। তবে অনেক আগেই বলা হয়েছে প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতি আর অন্তর্দৃষ্টিমূলক পদ্ধতির মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। প্রথম ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভুলের প্রক্রিয়াটি মূর্ত ও বাহ্যিক, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভুলের প্রক্রিয়াই হয়ে থাকে, তবে তা অমূর্ত, অপ্রকাশিত, আভ্যন্তরিণ ও মানসিক স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে।

মানসিক ক্ষমতা: যে সমস্ত প্রাণীর মানসিক ক্ষমতা (যেমন, বুদ্ধি) বেশী, তারা অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কাজটি সম্পন্ন করে। কিন্তু যাদের মানসিক ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম—তারা কাজটি করবে প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতিতে। মানসিক ক্ষমতা যত উন্নততর হয়, ততই প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতিতে অন্তর্দৃষ্টিমূলক পদ্ধতির ব্যবহার বেশী করে দেখা যায়।

বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ওয়াসবার্ণ (Washburne) শিখনের তিনটি বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা যদি শিখন প্রক্রিয়াটিকে তার উদ্ভব বা সৃষ্টির দিক থেকে বিচার করি—তাহ'লে আমরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কতকগুলি পর্যায়ক্রমে সাজানো ঘটনা বা স্তর দেখতে পাই। সেগুলি হল—OEEASAR

(১) Orientation বা সম্পর্ক স্থাপন (সমস্যাটির স্বরূপ পর্যবেক্ষণ),

(২) Exploration বা পরিবেশ পর্যবেক্ষণ (সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য পন্থা ও উপায় উদ্ভাবন),

(৩) Elaboration বা সম্প্রসারণ (সমস্যা সম্বন্ধে জ্ঞানকে সম্প্রসারিত করণ ও সমাধানের পদ্ধতি উন্নীতকরণ),

(৪) Articulation বা পরিস্ফুটন (লক্ষ্যে পৌছানোর উপায়টিকে সুনির্দিষ্ট ও সুশৃঙ্খল করণ),

(৫) Simplification বা সরলীকরণ (অবান্তর বা অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলির বর্জন),

(৬) Automatisation বা যান্ত্রিকীকরণ (সমস্যা সমাধানের উপযোগী আচরণটির অনুশীলন ও আয়ত্তীকরণ),

(৭) Re-orientation বা পুনঃ সম্পর্ক স্থাপন (সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে সাধারণ সূত্র বা তত্ত্ব আহরণ)।

সম্পর্ক স্থাপনের স্তরে শিখনের শুরু হয় ও পুনঃ সম্পর্ক স্থাপন স্তরে শিখনের সমাপ্তি ঘটে। ওয়াসবার্ণ বলেন, যদিও শিখন সম্পূর্ণ হয় উপরের সাতটি স্তর বা সোপানের মধ্য দিয়ে, তবুও বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর ধারণা শিখন ঘটে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে। যে সমস্ত মনোবিজ্ঞানী দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সোপানের উপর জোর দেন, তাঁরা বলেন শিখন ঘটে প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতিতে। আবার যে সমস্ত মনোবিজ্ঞানী পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তরের উপর জোর দেন, তাঁরা বলেন শিখন ঘটে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

ইতর প্রাণী ও মানুষের শিক্ষণের তুলনামূলক আলোচনা: শিখনের বিভিন্ন পরীক্ষণে দেখা গেছে মনোবিজ্ঞানীরা ইতর প্রাণীর শিখন পদ্ধতি সম্বন্ধেই অধিকতর আগ্রহী। ইতর প্রাণীর শিখনের মধ্যেই শিখন প্রক্রিয়ার বীজটি (rudiment) লুকিয়ে থাকে। বিভিন্ন পরীক্ষণ ও গবেষণা থেকে ইতর প্রাণী ও মানুষের শিখনের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রধান প্রধান পার্থক্যগুলির কথা আলোচনা করা হ'ল—

(১) ইতর প্রাণীর তুলনায় মানুষ বেশী বিচার বুদ্ধি-সম্পন্ন। তাছাড়া মানুষ ভাষা ব্যবহার করতে পারে। অতীত বিষয়কে স্মৃতির সাহায্যে পুনরুজ্জীবন করে এবং তার পুনরুদ্রেকের ফলে মানুষের শিখন-প্রক্রিয়াটি সহজ হয়ে যায়।

(২) মানুষের শিখনের ক্ষেত্রে অধিকতর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ইতর প্রাণীর অধিকাংশ শিখন ঘটে প্রচেষ্টা ও ভুল-পদ্ধতিতে। মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা ও ভুল-পদ্ধতির ব্যবহার কম হলেও সেটা মানসিক স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে।

(৩) মানুষের স্মৃতিশক্তি উচ্চস্তরের বলে মানুষ কোন সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত সহজে ও কম সময়ে অতীত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করতে পারে। ফলে তার সময় ও শ্রমের সাশ্রয় হয়। কিন্তু ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে তা হয় না।

(৪) মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা আছে। ইতর প্রাণীর নেই। অমূর্ত

চিন্তন সম্বন্ধ-ঘটিত চিন্তন ইত্যাদি বিভিন্ন উন্নত মানসিক প্রক্রিয়া মানুষের শিখনকে সহজ ও ত্বরান্বিত করে।

(৫) ইতর জীবের তুলনায় মানুষ অনুকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সহজে অধিক শিক্ষা লাভ করতে পারে।

(৬) ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতার জন্যও মানুষ তাড়াতাড়ি ও কম পরিশ্রমে অধিক শিক্ষা লাভ করে। মানুষ অপরের অভিজ্ঞতার বিবরণ পাঠ ক'রে যেমন শিক্ষা লাভ করে, তেমনি অপরের শিক্ষার জন্য নিজের অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারে।

(৭) ইতর প্রাণীর তুলনায় মানুষের নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা বেশী। মানুষ নিজের প্রেষণাগুলিকে যে ভাবে সংগঠিত করে ইতর প্রাণী তেমন পারে না।

(৮) উড্‌ওয়ার্থের মতে মানুষ অধিকতর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার অধিকারী (better observer)। মানুষ তার পরিবেশ, অন্যান্য ব্যক্তি, বৈশিষ্ট্য, বিষয় বা ঘটনা যেমন ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে ইতর প্রাণী তেমন ভাবে পারে না।

শিক্ষার উন্নতি (Improvement in Learning) : শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি হয় কিনা বা কতটা উন্নতি হয় তা নির্ভর করে কতকগুলি শর্তের উপর। সেই শর্তগুলি হ'ল—আগ্রহ, মনোযোগ অনুশীলন, শিখন-পদ্ধতি, পূর্বজ্ঞান, শিক্ষার্থীর বয়স, তার পরিনমন, বংশগতি ও পরিবেশ, দৈহিক ও মানসিক অবস্থা, অবসাদ ও ক্লান্তি, সফলতা-বিফলতা, বিভিন্ন জাতীয় প্রক্ষোভ ইত্যাদি। আবার সকলের শিখনের উন্নতির মাত্রা এক প্রকার হয় না, শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে বিভিন্ন গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে, শিক্ষার্থীর শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি সমগতিতে চলে না। কখনও দেখা যায় শিখনের উন্নতির মাত্রা বেশ দ্রুত আবার কখনও বা অত্যন্ত মন্থর। আবার অনেক সময় বিশেষ একটা স্তরে এসে উন্নতিটি থেমে যায়। এই অচল অবস্থা বা স্থিতাবস্থাকে শিক্ষার উন্নতি রেখার উপত্যকা (Plateau of Learning) বলা হয়। শিক্ষার অগ্রগতি বা উন্নতি নিয়ে যে রেখাচিত্র আঁকা হয় তাকে শিখনের বক্ররেখা বা Learning curve বলে। এই বক্ররেখার কয়েকটি অংশ থাকে। সেগুলি হ'ল—প্রারম্ভিক উন্নতি (Initial spurt), উপত্যকা ও অন্তিম উন্নতি (End spurt)। এর চিত্ররূপটি পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হ'ল—

অচলাবস্থার পর শিক্ষার যে অগ্রগতি তাকেই উন্নতি (spurt) বলা হয়। আবার শিক্ষার্থীর উন্নতির পথে বার বার যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তাকেই শিক্ষার উন্নতির উপত্যকা বলা হয়। টেলিগ্রাফ্ প্রেরণের উপর গবেষণা

চালানোর সময় ব্রায়ান ও হার্টার (Bryan and Hartar) প্রথম শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন। অচলাবস্থা বা উপত্যকা সৃষ্টি হবার পরও মাঝে মাঝে উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থা আসে যার পর আর উন্নতি সম্ভব হয় না। টাইপ করা সম্বন্ধে গবেষণা করেও অনুরূপ ফলাফল পাওয়া গেছে। শিক্ষার্থীর প্রথম অচলাবস্থা দেখে তার শিখনের শেষ

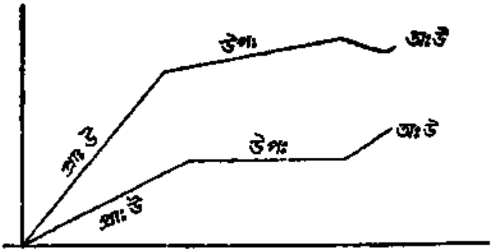

সীমায় সে পৌঁছে গেছে এ ধারণা করা খুবই ভুল হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় কেন এবং তা কিভাবে দূর করা যায় শিক্ষকের সে সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি মোটেই অসম্ভব নয়। যে যে কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে অচলাবস্থা বা উপত্যকার সৃষ্টি হ'তে পারে সংক্ষেপে সেগুলি হ'ল—

শিক্ষার্থীর আগ্রহের অভাব, শিক্ষণীয় বিষয়ের জটিলতা, শিখন পদ্ধতির পরিবর্তন, অমনোবৈজ্ঞানিক শিখন পদ্ধতি। বদ অভ্যাস, শিক্ষণীয় বিষয়ের কোন একটি অংশের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া, এক অংশের ভুল অন্য অংশে স্থানান্তরিত করা, অনুশীলনের অভাব, দৈহিক অবস্থা, সামগ্রিক ভাবে প্রতিক্রিয়া করতে না পারা ইত্যাদি। উপত্যকা গঠনের কারণ সম্বন্ধে W. W. Cruz-এর মত হ'ল আগ্রহের অভাব, উপলব্ধি করতে না পারা, ভুল পদ্ধতি, অভ্যাসের (বিশেষতঃ মন্দ অভ্যাসের) প্রভাব ও ক্লান্তি।

Hallingworth-এর মত হ'ল

* শিক্ষার্থীর পরিশ্রমের অভাব ও কাজে মনোযোগের অভাব।
* ভুল শিখনের পদ্ধতি অবলম্বন।
* শিক্ষার্থীর উৎসাহ ও উদ্যমের অভাব।
* শিক্ষার অগ্রগতি এত কম যে শিক্ষার্থীর পক্ষে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না।

অচলাবস্থা দূরীকরণের উপায়ঃ শিক্ষাক্ষেত্রে অচলাবস্থা দূর করার কতকগুলি উপায় আছে। সেগুলি সংক্ষেপে হ'ল—

শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক প্রস্তুতি, প্রক্ষোভমূলক প্রস্তুতি, পরিনমন, দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, বয়সানুসারে পাঠক্রম, ছাত্রদের শ্রেণীকরণ, উপযুক্ত পরিবেশ, সাফল্য সম্বন্ধে জ্ঞান, সক্রিয়তা-ভিত্তিক শিক্ষা-প্রণালী, মনোযোগের কেন্দ্রীভবন

শিখনের আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা, শাস্তি ও পুরস্কারের প্রভাব, নিয়ন্ত্রিত চর্চা বা অনুশীলন, স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

কার্যকরী শিখনের শর্তাবলী : সব রকম শিখন-প্রচেষ্টা যে সব সময় সমভাবে হয়, তা নয়। শিখনের কার্যকারিতা নানাপ্রকার শর্তের উপর নির্ভরশীল। ঐ সমস্ত শর্ত উপস্থিত থাকলে শিখন কার্যকরী হয় আর শর্তগুলি উপস্থিত না থাকলে শিক্ষা সার্থক হয় না, সময় ও শ্রমের অযথা অপচয় ঘটে। যে সমস্ত শর্ত শিখনকে কার্যকরী করে বলে মনে করা হয়, সেগুলি হ'ল—

শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক, অনুভূতিমূলক ও দৈহিক প্রস্তুতি, প্রেষণা, সুপরিচালনা, কার্যকরী প্রচেষ্টা সম্পাদন, অনুশীলন ও বার বার প্রচেষ্টা, সাফল্য সম্বন্ধে জ্ঞান, শিখন সঞ্চালন, উপযুক্ত মানসিক অবস্থা ও সুষম মানসিক স্বাস্থ্য।

উপরোক্ত শর্তগুলি যে শিক্ষা ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দান করেই শিক্ষকের কাজ শেষ হ'য়ে যায় না। সে শিক্ষা শিক্ষার্থী কতদূর গ্রহণ করতে পারল বা কতটা কার্যকরী হ'ল—তা লক্ষ্য করাও শিক্ষকের বিশেষ কর্তব্য। শিক্ষার্থীর শিখনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত শর্তগুলি ঠিকমত পালিত হচ্ছে কি না সে বিষয়েও শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। যে কোন বিষয়ের সুষ্ঠু শিখনের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক প্রস্তুতি। তারপরই প্রয়োজন শিক্ষার্থীর মানসিক ও প্রাক্ষোভিক প্রস্তুতি। এর পর লক্ষ্য রাখতে হবে বিষয়-বস্তুটি শেখার জন্য শিক্ষার্থী কোন প্রেষণা বা আগ্রহ অনুভব করছে কি না! তার পরের স্তর হ'ল—শিক্ষাক্ষেত্রে সু-পরিচালনা। শিক্ষার্থীর বার বার প্রচেষ্টা ও অনুশীলনের প্রয়োজনও কম নয়। নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে শিক্ষার্থীর সাফল্যের আনন্দটিও শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া শিখন সঞ্চালনও শিখনকে কার্যকরী করতে সাহায্য করে। শিখনের সার্থকতার জন্য শিক্ষার্থীর মানসিক সুস্থতা, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিশ্বাস এবং সুস্থ মনোভাবও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিখনের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বা মুখস্থকরণের পরিমিতিতা (Effective methods of Learning or Economy of memorisation) : এ প্রসঙ্গে স্মৃতির অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মুখস্থ করাও শিখন প্রক্রিয়ার একটি ভিন্ন রূপ মাত্র। কাজেই এই দুই পদ্ধতি একই প্রকারের হবে।

———

॥ দুই ॥

শিক্ষণের সঞ্চালন
(Transfer of Training)

[When we speak of transfer of training, we mean the effect which some particular course of training has on learning or execution of a second performance—K. Lovell.

The improvements of one mental or motor function, by the systematic training of another allied function ; a highly controversial field in which much experimental research has been carried out.—Dictionary of Psychology.]

কোন একটি বিষয় শিখনের পর যখন অন্য আর একটি বিষয় শেখা হয়, তখন অনুগামী শিখন পরিস্থিতিতে পূর্বগামী শিখনের ফলাফল বা প্রভাবই হ'ল —শিক্ষনের সঞ্চালন। এই মতবাদ অনুযায়ী একটি বিষয়ের শিখনের ফলাফল পরবর্তী আর একটি বিষয় শিখনের ক্ষেত্রে সঞ্চালিত হয়। শিক্ষার সঞ্চালন কি ভাবে হয়, সে সম্পর্কে দু'টি প্রাচীন মতবাদ প্রচলিত আছে— মানসিক শক্তিবাদ (Mental Faculty) এবং মানসিক শৃঙ্খলাবাদ (Formal Discipline)।

মানসিক শক্তিবাদ (Mental Faculty) : প্রাচীন গ্রীকদের ধারণা ছিল মন একটি অখণ্ড সত্তা, এর কোন অংশের উন্নতি হ'লে সমগ্র মনেরও কিছু উৎকর্ষ সাধিত হয়। মধ্যযুগে এই অখণ্ড মনকে কতকগুলি খণ্ডিত মনোবৃত্তির সমষ্টি বলে মনে করা হ'ত। এক একটি মানসিক বৃত্তিকে বলা হত ফ্যাকাল্টি (Faculty)। স্মৃতি বিচারকরণ, অনুমান, ইচ্ছা, কল্পন, বুদ্ধি ইত্যাদি হ'ল এক একটি ফ্যাকাল্টি। ফ্যাকাল্টিগুলি প্রথম থেকেই সুনির্দিষ্ট পরস্পর নিরপেক্ষ এবং সংখ্যাতেও নির্দিষ্ট বলে ধরা হ'ত। যে কোন বিষয়-বস্তুর সাহায্যে এগুলির বার বার চর্চা বা অনুশীলন করলে একক ভাবে এদের উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব। কোন একটি ফ্যাকাল্টির একবার উৎকর্ষ সাধন করা হ'লে তা সমভাবে কার্যকর থাকে। ফ্যাকাল্টিবাদী মনোবিজ্ঞানীরা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়কে কতকগুলি বিশেষ ফ্যাকাল্টির উৎকর্ষ সাধনের পক্ষে সহায়ক বলে ধরেই নিয়েছিলেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত হ'ল কোন একটি বিষয় শিক্ষার ফলে কোন একটি ফ্যাকাল্টির উৎকর্ষ সাধন হয় বলেই ঐ শিক্ষার ফল অন্য বিষয়ে সঞ্চালিত হয়। শিক্ষার ফল সঞ্চালিত হওয়ার মূলে আছে ফ্যাকাল্টির উৎকর্ষ সাধন। বর্তমানে এই মতবাদটি কিন্তু গ্রহণ

করা হয় না কারণ মন যে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তির সমষ্টি, তা প্রমাণিত হয়নি। তাছাড়া যেগুলিকে ফ্যাকাল্টি বা মানসিক বৃত্তি বলা হয়েছে, সেগুলির অনেকগুলিই মানসিক প্রক্রিয়া।

মানসিক শৃঙ্খলাবাদ (Formal discipline) : মানসিক শৃঙ্খলাবাদের তত্ত্বটি মানসিক শক্তিবাদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই তত্ত্ব বলে, বিশেষ বিশেষ বিষয় পাঠের ফলেই বিশেষ বিশেষ ফ্যাকাল্টির উৎকর্ষ সাধিত হয়। সবচেয়ে প্রধান যে ফ্যাকাল্টি—যুক্তি (reason), তার উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজন ল্যাটিন, অঙ্ক ও ব্যাকরণের চর্চা করা। স্মৃতি ও কল্পনার উৎকর্ষ সাধনের জন্য কবিতা পাঠের প্রয়োজন। প্লেটো, লক্ প্রভৃতি দার্শনিক এই মতবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন। এই মতবাদ প্রচারিত হওয়ার পর উপযোগিতা-নীতির ভিত্তিতে পাঠক্রমে নানাপ্রকার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হ'তে লাগল। সবগুলি যে প্রয়োজনীয় ছিল, তা নয়। কিন্তু আমরা যে মুহূর্তে শক্তিবাদের অসারতা মেনে নিয়েছি, সেই মুহূর্তেই শৃঙ্খলাবাদের তত্ত্বটিও অসার হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া দেখা গেছে, বিভিন্ন বিষয় শেখার জন্যই যে বিশেষ বিশেষ ফ্যাকাল্টির উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে, তাও নয়।

শিখন সঞ্চালনের তত্ত্ব (Theory of Transfer of Training) : মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বটির সঙ্গে সঙ্গে আসে শিখন সঞ্চালনের তত্ত্বটি। এই তত্ত্বের মূল কথা হ'ল পূর্ববর্তী শিখন পরিস্থিতির শিখন পরবর্তী পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয়। ধরা যাক্ আমি প্রথমে 'শিক্ষাতত্ত্বের' বই পড়ে তারপর 'মনোবিজ্ঞান' পড়লাম। এই তত্ত্ব বলছে মনোবিজ্ঞানের শিখনে শিক্ষাতত্ত্বে যা শিখেছি, তা আমাকে সাহায্য করবে। অর্থাৎ শিক্ষাতত্ত্বের শিখন মনোবিজ্ঞানের শিখনকে প্রভাবিত করবে। কিন্তু এই যে প্রভাব, এ আমার প্রকৃতিতে বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যখন পূর্ববর্তী শিখন পরবর্তী শিখনকে সাহায্য করে, তখন তাকে **অস্তিবাচক সঞ্চালন** (Positive Transfer) বলে। কিন্তু যদি পূর্ববর্তী শিখন পরবর্তী শিখনে কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করে, তখন তাকে **নাস্তিবাচক সঞ্চালন** (Negative Transfer) বলে। আর যদি সাহায্য বা বাধা কোনটিরই অস্তিত্ব না থাকে তখন তাকে **শূন্য বা অনির্দিষ্ট সঞ্চালন** (Indefinite Transfer) বলা হয়।

মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বটি পরিত্যক্ত হয়েছে, কিন্তু শিখন সঞ্চালনের তত্ত্বটি পরিত্যক্ত হয়নি। পূর্বে ধারণা ছিল, শিখন সঞ্চালন একটি সঠিক ঘটনা এবং

সবক্ষেত্রেই সমান ভাবে ঘটে থাকে। কিন্তু নানা পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি সর্বজনীন কোন ঘটনা নয় এবং সবক্ষেত্রে সমান ভাবে ঘটেও না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ বিশেষ শর্তাধীনে শিখনের সঞ্চালন ঘটে যার মাত্রাও সবক্ষেত্রে সমান নয়।

শিখন সঞ্চালনের উপর পরীক্ষণ (Experiments on Transfer of Training): বহু প্রাচীনকাল হ'তেই মনোবিজ্ঞানে সঞ্চারণ-তত্ত্ব ও শিক্ষাক্ষেত্র মানসিক উৎকর্ষ-সাধনবাদ প্রভাব বিস্তার করে আসছিল। মনোবিজ্ঞানীরাও সাধারণ ভাবে সঞ্চারণ-তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু এই বিশ্বাসের মূলে প্রথম কুঠারাঘাত করলেন বিখ্যাত আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী **উইলিয়াম্ জেমস্** (William James)। ১৮৯০ সাল থেকে তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন এই মতবাদটিকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করার জন্য। তিনি নিজের উপরই পরীক্ষা পরিচালনা করেন। চর্চা বা অনুশীলনের ফলে নিজের স্মৃতিশক্তিকে কি পরিমাণে বাড়ানো যায় তার পরীক্ষার জন্য তিনি প্রথমে Victor Hugo-এর কাব্যগ্রন্থ Satyr থেকে ১৫৮ লাইন মুখস্থ করলেন। এতে তাঁর সময় লাগল প্রায় ১৩২ মিনিট। এইবার মুখস্থ শক্তির উন্নতি সাধনের জন্য তিনি রোজ ২০ মিনিট ধরে Milton-এর Paradise Lost থেকে কিছু কিছু অংশ মুখস্থ করতে লাগলেন। এই রকম চর্চা চলল ৩৮ দিন ধরে। এতে তাঁর স্মৃতিশক্তির যথেষ্ট অনুশীলন হ'ল। স্মৃতির উৎকর্ষণ যদি হ'য়ে থাকে, তাহ'লে এবার তিনি অনেক সহজেই সব কিছু মুখস্থ করতে পারবেন—এইটাই আশা করা যায়। এই উৎকর্ষণ হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য তিনি Satyr কাব্যগ্রন্থ থেকেই ভাব ও ভাষার দিক থেকে আগেকার অংশের চেয়ে কঠিন নয় এমন ১৫৮টি অন্য ছত্র মুখস্থ করতে লাগলেন। এবার কিন্তু তাঁর সময় লাগল ১৩৬ মিনিট, আগের চেয়ে বেশী। ফলাফলে বিস্মিত হ'য়ে তিনি তাঁর ৪ জন ছাত্রের উপর অনুরূপ পরীক্ষা করলেন। দু'টি ক্ষেত্রে সময় কিছু কম লাগল, কিন্তু বাকী দুটি ক্ষেত্রে সময় বেশীই লাগল। এতে তিনি এই সিদ্ধান্তেই এলেন যে, শিখনের কোন সঞ্চালন হয় না এবং মুখস্থ চর্চা করলেই মুখস্থ শক্তি বাড়ে না। মানসিক শৃঙ্খলার মতবাদটি এই ভাবে অসার বলে প্রতিপন্ন হ'ল।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা: জেম্সের এই সিদ্ধান্ত মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করল। অনেক মনোবিজ্ঞানী

এগিয়ে এলেন শিক্ষাফল সঞ্চারণ সম্বন্ধে ব্যাপক ভাবে তথ্যানুসন্ধান করার জন্য। একথা ঠিক যে, বিজ্ঞানের দিক দিয়ে জেমস-এর পদ্ধতি ছিল খুবই কাঁচা। মনোবিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় খুব কম সময়ের মধ্যেই এ বিষয়ে গবেষণা করার জন্য নির্ভরযোগ্য, বিজ্ঞানসম্মত ও উন্নততর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হ'ল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কুড়ি পঁচিশ বছরে শিক্ষাফল সঞ্চালনের উপর অজস্র পরীক্ষণ ও গবেষণা চালানো হয়েছে। তার পরেও গবেষণা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এখন কয়েকটি প্রধান প্রধান গবেষণা ও সেই গবেষণা-লব্ধ সিদ্ধান্তের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল—

স্মৃতি-ঘটিত শিক্ষণের সঞ্চালন সম্বন্ধে জেমস-এর পরীক্ষার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কবিতা, ওজন ও অন্যান্য পরিমাপের আর্যা মুখস্থ করলে গদ্য প্রভৃতি বিষয়ে কোন প্রকার সঞ্চালন হয় কি না তা নিয়ে পরীক্ষা করেছেন স্লেট (Sleight) ১৯১১ সালে। স্মৃতির সঞ্চারণ সম্বন্ধে **ইবার্ট** (Ebert) ও **ময়ম্যানও** (Meumann) গবেষণা করেন। পারকিন্‌স (Perkins) পরীক্ষা করেন, ল্যাটিন শিক্ষার ফল ইংরেজী শিক্ষায় সঞ্চারিত হয় কি না তা জানার জন্য। রচনার উপর ব্যাকরণ-শিক্ষার প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করেন **হয়েট** (Hoyt)। গাণিতিক বিচার-করণের সঞ্চারণ সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন **ওয়েব** (Webb), জ্যামিতির ক্ষেত্রে **রাগস্‌** (Ruggs), প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে মিস্‌ **হেউইন্স** (Hewins), পাটীগণিতে **স্টার্চ** (Starch)। এক হাতের কাজ অন্য হাতে কি-ভাবে সঞ্চারিত হয় সে সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন **উডওয়ার্থ** (Woodworth-Bi-lateral Transfer)। সঞ্চারণ-তত্ত্বে সবচেয়ে বেশী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন অবশ্য **থর্নডাইক** (Thorndike)। তিনি প্রথমে উড্‌ওয়ার্থের সহযোগিতায় পরীক্ষা কার্য চালান, কিন্তু পরে একা একা প্রায় ১৩০০ শিক্ষার্থীর উপর গবেষণা চালিয়ে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের উৎকর্ষণ মূল্য (disciplinary value) নির্ণয় করার চেষ্টা করেন। অবশ্য এগুলির সবগুলিই হ'ল আগেকার গবেষণা। পরবর্তিকালের গবেষকদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হলেন **উড্রো** (Woodrow), **কক্স** (Cox), **হার্লো** (Harlow), **জাফ্রান ও ওয়েলফোর্ড** (Szafran and Welford), **ব্রুস** (Bruce), **মুর** (Moor) এবং **উইলিয়াম্‌স** (Williams)। নির্দেশনাবিহীন মুখস্থকরণ ও উপযুক্ত পদ্ধতিমূলক মুখস্থকরণের মধ্যে সঞ্চারণের তারতম্য সম্বন্ধে গবেষণা করেন **উড্রো**। **কক্স** পরীক্ষা করেছেন কারিগরী দক্ষতা অর্জনে সাধারণ

বা কলা-কৌশল সম্পর্কে ব্যক্তির ক্রমবর্ধমান পারদর্শিতা তার মনোবলকে এমন ভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে যে, সে অন্য কোন বিষয়ের শিক্ষণে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে।

সঞ্চালন সম্পর্কে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত যে সমস্ত গবেষণা ও পরীক্ষণ-কার্য চালানো হয়েছিল, ওরাটা (Orata) তার একটি সংক্ষিপ্তসার সংকলন করেন। এই সংকলন থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে,

* সঞ্চালন কিছু পরিমাণ হবেই, এইটাই হ'ল নিয়ম; সঞ্চালন হওয়াটাই একটা ব্যতিক্রম নয়।
* সঞ্চালনের পরিমাণ নির্ভর করে শিখনের প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর।
* সহজাত বুদ্ধির উপর সঞ্চালন যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভরশীল।
* সঞ্চালন প্রেষণাও চাহিদার উপরও নির্ভরশীল।
* কতকগুলি স্কুল পাঠ্য বিষয়ের কিছু কিছু সঞ্চালন-মূল্য আছে ঠিকই, কিন্তু কোনটিরই এই মূল্য বা পরিমাণ খুব একটা বেশী নয়।

॥ ওরাটার সংকলন ॥

প্রচুর সঞ্চালন............	শতকরা	৩২টি	ক্ষেত্রে
মাঝামাঝি সঞ্চালন.....	„	৫৯	„ „
খুব কম সঞ্চালন.........	„	৮	„ „
ঋণাত্মক সঞ্চালন.........	„	৩	„ „
অনির্দিষ্ট সঞ্চালন.........	„	৮	„ „

স্কুলপাঠ্য বিষয়ে সঞ্চালন: স্কুলপাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে সঞ্চালন হয় কি না এবং হলেও কি প্রকৃতির, তা নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে বহু গবেষণা করা হয়েছে। মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে পূর্বে পাঠক্রমে এমন অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যেগুলির অসারতা এখন প্রমাণিত হয়ে গেছে। স্কুলপাঠ্য বিষয়ের উপর গবেষণা-লব্ধ কয়েকটি সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা হ'ল—

প্রায় সব দেশেই প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ব্যাকরণ পাঠের একটা বিশেষ মূল্য দেওয়া হ'ত কারণ এই কথাটা প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছিলেন যে, মানসিক শৃঙ্খলা সৃষ্টির ব্যাপারে ব্যাকরণের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। কিন্তু ব্রিগ্‌স-এর

(Briggs) শিখন সঞ্চালনের উপর গবেষণা থেকে জানা গেল যে, একমাত্র সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ধরতে পারার ক্ষমতা ছাড়া অন্য আর কোন গুণ ব্যাকরণ পাঠ থেকে সঞ্চালিত হয় না।

গণিত শিক্ষা করলেই গাণিতিক বিচারকরণের ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে, এই ছিল বহুদিনের প্রচলিত ধারণা। কিন্তু উইঞ্চের (Winch) পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, গাণিতিক বিচারকরণের ক্ষমতা কেবলমাত্র গণিত শিক্ষার উপরই নির্ভরশীল নয়, আরো অন্যান্য অনেক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। কাজেই এক্ষেত্রে সঞ্চালনটিকে বলা যেতে পারে অনির্দিষ্ট প্রকৃতির।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিভিন্ন জাতীয় স্কুলপাঠ্য বিষয় পড়ালে মানসিক যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় কি না, সে বিষয়েও গবেষণা করা হয়েছে। পরীক্ষালব্ধ ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, মানসিক যোগ্যতা বৃদ্ধির ব্যাপারে স্কুলপাঠ্য বিষয়গুলির খুব একটা অবদান নেই; এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির প্রভাবই বেশী করে কাজ করে।

স্কুলপাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ের সঞ্চালন সম্বন্ধে থর্নডাইক ১৯২৪ সালে ব্যাপক ভাবে পরীক্ষাকার্য চালান। তাঁর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল স্কুলে ল্যাটিন শিক্ষার কোনরূপ সঞ্চালন-মূল্য আছে কি না তা নির্ণয় করা এবং যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী ল্যাটিন শিক্ষা ক'রে বুদ্ধির অভীক্ষায় তাদের সাফল্যাঙ্ক বেশী হয় কিনা তা নির্ণয় করা। তাঁর পরীক্ষণের ফলাফল থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ল্যাটিন শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের বুদ্ধ্যঙ্ক ল্যাটিন শেখেনি এমন ছেলেমেয়েদের বুদ্ধ্যঙ্কের তুলনায় বেশী। তবে এর কারণ যে ল্যাটিন শিক্ষাই তাদের বুদ্ধির উৎকর্ষ নয়, এমন কথাও জোর করে বলা যায় না। যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী ল্যাটিন শিখেছে, তারা ল্যাটিন না জানা ছাত্র-ছাত্রীর চেয়ে উন্নত হ'লেও এ সঞ্চালন খুব বেশীদিন স্থায়ী হয় না। কিছুদিন পরেই দেখা যায় ল্যাটিন জানা আর ল্যাটিন না জানা ছেলেমেয়ে সব বিষয়ে এক রকমেরই দক্ষতা দেখাচ্ছে। আমাদের দেশের স্কুল পাঠক্রমে সংস্কৃত সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যেতে পারে। অন্যান্য বিষয়ের সঞ্চালন-ক্ষমতা সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এই সমস্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসা যেতে পারে যে, শিখন সঞ্চালন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সত্যই ঘটে থাকে। তবে আগেই বলা হয়েছে এটি একটি সার্বিক ঘটনা নয়। শিক্ষণের সঞ্চালন হ'লেও এর পরিমাণ 0% থেকে ৯২% পর্যন্ত হতে পারে। আবার সঞ্চালন যে সব সময়

ধনাত্মক, তাও নয়; কখনও কখনও ঋণাত্মকও হয়। সেইজন্য বলা যেতে পারে কেবলমাত্র মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে সঞ্চালনের উপর খুব বেশী একটা গুরুত্ব আরোপ না করাই বাঞ্ছনীয়। সঞ্চালন একটি বাস্তব-নির্ভর ঘটনা এবং সঞ্চালনের জন্য সচেতন সামান্যীকরণেরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কোন একটি বিষয়ের নিজস্ব মূল্যের জন্যই যে সঞ্চালন হয়, তা নয়, সঞ্চালন আরো অনেক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া কোন একটি বিষয় সামগ্রিক ভাবে যতটা সঞ্চালিত হবে, কোন একটি পদ্ধতি, আদর্শ বা নীতি তার চেয়ে বেশী সঞ্চালিত হবে।

সঞ্চালন কি ভাবে ঘটে? (সঞ্চালনের বিভিন্ন তত্ত্ব): শিক্ষাক্ষেত্রে সঞ্চালন কিভাবে ঘটে এ বিষয়ে নানারূপ পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গেছে, তার উপর ভিত্তি ক'রে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সঞ্চালন তথ্য পাওয়া গেছে। আগেই বলা হয়েছে দু'টি বিষয়ের মধ্যে সমতা বা মিল থাকলে উল্লেখ-যোগ্য ভাবে ধনাত্মক সঞ্চালন হওয়া সম্ভব। এই সমতা বা মিল বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করা যেতে পারে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই মিলগুলি লক্ষ্য করেই সঞ্চালন সম্বন্ধে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেগুলি সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হ'ল। এ বিষয় প্রথমে থর্নডাইকের দু'টি মতবাদের উল্লেখ করা হ'ল—

[এক] **বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্যের তত্ত্ব** (Theory of identity of content): থর্নডাইক বিশ্বাস করেন দু'টি ঘটনা বা বিষয়ের মধ্যে অভিন্ন বা সদৃশ উপাদান থাকলেই সঞ্চালন হবে। বিষয় বস্তুগত সাদৃশ্যের তত্ত্বে তিনি বলেছেন যদি দুটি বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রচুর মিল থাকে তবে একটির শিক্ষাফল অন্যটিতে ধনাত্মক হবে। অর্থাৎ পূর্বগামী ও অনুগামী পরিস্থিতির মধ্যে যে উপাদানটুকু অভিন্ন, সেটুকু সঞ্চালিত হচ্ছে। আমাদের দেশের পাঠক্রম দেখে বলা যায় সংস্কৃত ব্যাকরণ ও বাংলা ব্যাকরণের মধ্যে বিষয়বস্তুগত মিল থাকার জন্য যে কোন একটির শিখন অন্যটিকে সহায়তা করে।

[দুই] **পদ্ধতিগত সাদৃশ্যের তত্ত্ব** (Theory of Identity of Method): থর্নডাইক বলেন, দুটি বিষয়ের শিখন পদ্ধতির মধ্যে যদি সাদৃশ্য বা মিল থাকে, অর্থাৎ একটি বিষয় যেভাবে শেখা হ'ল অন্যটিও সেইভাবে শেখা যেতে পারে, তাহ'লে সে ক্ষেত্রেও শিক্ষাফল সঞ্চালিত হবে। যোগ অঙ্ক

আর গুণ অঙ্কের মধ্যে পদ্ধতিগত মিল বেশী বলে যে ছেলে যোগে পারদর্শী, সে গুণেও পারদর্শিতা দেখাবে। তেমনি জ্যামিতির সমস্যা সমাধানে, কাব্য রসাস্বাদনে, বীজগণিতের সূত্র গঠনেও এই সঞ্চালনের পরিমাণ কম নয়। পদ্ধতিগত সাদৃশ্য খুব বেশী হ'লে বিষয়বস্তুগত বৈসাদৃশ্য থাকলেও শিক্ষাফল ধনাত্মক ভাবে সঞ্চালিত হবে।

√[তিন] **লক্ষ্যগত সাদৃশ্যের তত্ত্ব** (Theory of Identity of Aim): ব্যাগ্‌লি (Bagly) হলেন এই মতবাদের সমর্থক। তিনি বলেন শিক্ষাফল সঞ্চালনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ধরা যাক, কোন শিক্ষার্থীর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হ'ল নির্ভুল ভাবে ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে অঙ্ক করা। এখন এই লক্ষ্যটি যদি সচেতন ভাবে সে অনুসরণ করে, তাহ'লে অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও সে ঐ একই লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেষ্টা করে; ফলে নির্ভুলতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাটি এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে সঞ্চালিত হবে। অন্যান্য লক্ষ্যের ক্ষেত্রেও ঐ এক কথাই বলা যেতে পারে। অর্থাৎ লক্ষ্য যেখানে অভিন্ন, সেখানে পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর তেমন একটা মিল না থাকলেও উল্লেখযোগ্য সঞ্চালন ঘটবে।

√[চার] **জাডের অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ তত্ত্ব** (Judd's Theory of Generalisation of Experience): জাড সামান্যীকরণ মতবাদের ভিত্তিতে শিক্ষাফল সঞ্চালনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জাড্-এর মত হ'ল উপাদানগত অভিন্নতার জন্য যে শিক্ষাফল সঞ্চালিত হয়, তা নয়, সঞ্চালন নির্ভর করে ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতার কতটা সামান্যীকরণ করতে পারল তার উপর। এঁর মত হ'ল আমাদের শিক্ষণপ্রাপ্ত বুদ্ধি বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিশিষ্ট, কিন্তু পদ্ধতির দিক থেকে সাধারণ (Trained intelligence is particular in its content but general in its method)। কোন একটি বিষয় শিখতে গিয়ে আমরা কতকগুলি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। পরবর্তিকালে অন্য কোন নতুন বিষয় শিখতে গিয়ে ঐ পূর্ব অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলিই প্রয়োগ করে থাকি। বিষয়বস্তু দুটি ক্ষেত্রে আলাদা হতে পারে, কিন্তু অভিজ্ঞতার পদ্ধতি হ'ল সাধারণ। অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের অর্থ হ'ল বিভিন্ন জাতীয় অভিজ্ঞতাগুলির অবান্তর লক্ষণগুলি বর্জন করে সেগুলির সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলিকে পৃথক করে নিয়ে সেগুলির সাহায্যে একটি সামান্য বা সাধারণ সূত্র গঠন করা।

এই মতবাদের সমর্থনে জাড্ একটি পরীক্ষাকার্য সম্পাদন করেন ১৯০৮ সালে। জাড পঞ্চম ও ষষ্ঠ এই দু' শ্রেণীর দু' দল ছেলেকে নিয়ে একটি পরীক্ষা পরিচালিত করেন। দু'দলের মধ্যে একটি হ'ল পরীক্ষণ দল আর অন্যটি হল নিয়ন্ত্রিত দল। তিনি দু'টি দলকেই জলের ১২ ইঞ্চি নীচে রাখা একটি লক্ষ্যকে ছোট তীর দিয়ে বিদ্ধ করতে বললেন। কিন্তু আলোর প্রতিসরণের জন্য জলের নীচে অবস্থিত কোন বস্তুকে ঠিক যে জায়গায় সেটি অবস্থিত, সেখানে দেখা যায় না, একটু দূরে অবস্থিত বলে মনে হয়। কোন দলই প্রতিসরণের এই নিয়মটি জানত না বলে উভয় দলই লক্ষ্য ভেদে ব্যর্থ হল। এরপর পরীক্ষণ দলটিকে আলাদা করে প্রতিসরণের নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করা হ'ল তাদের কাছে। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত দল কিছুই জানল না। তারপর আবার দুটি দলকেই জলের নীচে রাখা লক্ষ্যবস্তু বিদ্ধ করতে বলা হ'লে দেখা গেল যে, এবার পরীক্ষণ দলটি নিয়ন্ত্রিত দলের তুলনায় লক্ষ্যভেদে অনেক ভুল করল। এই একই পরীক্ষণ ক্রেভার ও হেনড্রিকসন অষ্টম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের উপর প্রয়োগ করে জাডের মত ফল পান। (এর থেকে জাড সিদ্ধান্ত করেন যে ব্যক্তি যদি-অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ বা সাধারণীকরণ-নীতিকে সচেতন ভাবে অনুসরণ করে অর্থাৎ যদি সে অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সামান্য সূত্র গঠন করে-তাহ'লে শিক্ষাফল সঞ্চালিত হবে।)

জাডের এই পরীক্ষণ থর্নডাইকের উপাদানগত অভিন্নতার তত্ত্বটিকে অসার বলে প্রমাণ করে দিচ্ছে। এই পরীক্ষণে দু'দল ছেলের ক্ষেত্রেই প্রথম বারের লক্ষ্যভেদ ও দ্বিতীয় বারের লক্ষ্যভেদ—এই দুটি পরিস্থিতির উপাদানগত অভিন্নতা প্রচুর ছিল। কিন্তু তা থাকলেও দ্বিতীয় দলের ক্ষেত্রে কোনরূপ সঞ্চালন হয়নি। যদি উপাদানগত অভিন্নতাই সঞ্চালনের কারণ হত, তাহ'লে দ্বিতীয় দলের ক্ষেত্রেও সঞ্চালন হতে পারত। কিন্তু প্রথম দলের ক্ষেত্রে যে সঞ্চালন হ'ল তার কারণ উপাদানগত অভিন্নতা নয়—অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ। বিষয়বস্তুগত বৈসাদৃশ্য থাকলেও অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের শিক্ষাফলের সঞ্চালন ধনাত্মক হয়ে থাকে। উইঞ্চ (Winch) একটি পরীক্ষণ করে দেখিয়েছেন যে, তর্কবিজ্ঞানসম্মত যুক্তি অনুশীলনের ফল পাটীগণিতে সমস্যা-মূলক অঙ্কের সমাধানের ক্ষেত্রে সহায়ক। জনস্টন (Johnston) বলেন, শিশুদের যদি জ্যামিতি শিক্ষায় ক্ষেত্রে সচেতন ভাবে যুক্তিবিজ্ঞান-সম্পর্ক চিন্তায় প্রয়োগ করতে শেখানো হয়, তাহ'লে শিক্ষাফল উল্লেখযোগ্য ভাবেই সঞ্চালিত

হয়। আধুনিক কালে মনোবিজ্ঞানীরা এইজন্যই শিক্ষাফল সঞ্চালনের ক্ষেত্রে সচেতন সামান্যীকরণের উপরই বেশী জোর দিয়ে থাকেন।)

[পাঁচ] **স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উৎপাদক তত্ত্ব (Spearman's Two Factor Theory) :** বুদ্ধি তত্ত্বে আমরা আগেই স্পীয়ারম্যানের দু'টি উৎপাদক 'g'ও 's'-এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। তাঁর মতে যে কোন বিষয় শেখার সময় 'g' বা সাধারণ শক্তিটি কাজ করবেই। এই 'g'-এর অস্তিত্ব ও প্রয়োগের জন্যই শিক্ষাফল সঞ্চালিত হয়। দেখা গেছে যে শিশু যত বেশী বুদ্ধিমান তার ক্ষেত্রে সঞ্চালন তত বেশী সহজ ও পরিমাণেও বেশী।

✓[ছয়] **অভিস্থাপন তত্ত্ব বা গেস্টাল্ট মতবাদ (Transposition of Gestalt Theory) :** গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা তাঁদের সমগ্রতা মতবাদের উপর ভিত্তি করেই শিখন সঞ্চালনের ক্ষেত্রে একটা নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে শিখন হ'ল অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কোন একটি সমস্যার সামগ্রিক রূপটি বুঝে নিয়ে কি ভাবে প্রতিক্রিয়া করতে হবে, তা জানা। অন্তর্দৃষ্টি হ'ল সমস্যাটির বিচ্ছিন্ন অংশগুলির সঙ্গে পূর্ণ সমস্যাটির সম্বন্ধ সামগ্রিক ভাবে উপলব্ধি করা। গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, এই ভাবে যে শিখন ঘটে, সেই শিখনই সঞ্চালিত হয়। তাঁদের মতে সঞ্চালন হ'ল প্রথম শিখন পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ এবং সেগুলির মধ্যে একটা সমগ্রতার লক্ষণ ক'রে পরবর্তী শিখন পরিস্থিতিতে সেইটি অভিস্থাপন করা। অর্থাৎ প্রথম পরিস্থিতিতে সমগ্র ও অংশের পারস্পরিক সংযোগটি অনুধাবন করে সেই জ্ঞান দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে অভিস্থাপন করার নামই হ'ল সঞ্চালন।)

গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের একটি পরীক্ষণের কথা উল্লেখ করলেই জিনিসটি সহজ হয়ে যাবে। কোহ্‌লার কয়েকটি মুরগীকে বিশেষ ধরনের পাত্র থেকে খাবার খাওয়ার শিক্ষা দিলেন। মুরগীগুলির সামনে দু'টি কালো কাগজে কিছু দানা ছড়ানো থাকত। ধরা যাক্ কাগজ দুটি হ'ল A আর B। A-এর চেয়ে B ছিল বেশী কালো। মুরগীগুলিকে ঐ বেশী কালো কাগজ থেকে দানা খেতে দেওয়া হ'ত—কম কালো কাগজের দিকে গেলেই তাড়িয়ে দেওয়া হ'ত। কিছুদিন এই ভাবে চলার পর যখন মুরগীগুলি বেশী কালো কাগজ থেকে দানা খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেল, তখন A কাগজটি সরিয়ে তার জায়গায় C কাগজ রাখা হ'ল—যেটি B-এর চেয়েও কালো। এইবার মুরগীগুলি খাবার খেতে

এসে কিন্তু B থেকে না খেয়ে C থেকে খেল। এখানে তাদের প্রথম বারের অভিজ্ঞতা—অর্থাৎ বেশী কালো থেকে খাওয়া, দ্বিতীয় বারে অভিস্থাপিত হয়েছে বলে শিক্ষণের সঞ্চালন ঘটেছে।

(গেস্টাল্টবাদীদের অভিস্থাপন মতবাদ থর্নডাইকের উপাদানের অভিন্নত মতবাদের বিরোধী। থর্নডাইক বলেছেন, শিক্ষণ সঞ্চালনের জন্ম প্রথ পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের সঙ্গে দ্বিতীয় পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশে অভিন্নতা খুঁজে বের করতে হবে। গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন, শিক্ষা সঞ্চালন ঘটাতে গেলে পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে তার সামগ্রিক রূপটি উপলব্ধি করতে হবে এবং সেইমত কিভাবে প্রতিক্রিয়া করতে হবে তা স্থির করতে হবে। এই দিক থেকে এই মতবাদের সঙ্গে জাডের সামান্যীকরণ মতবাদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন মতবাদের সমালোচনা : এখন বিভিন্ন তত্ত্ব বা মতবাদের একটা তুলনামূলক আলোচনা করা যাক্। থর্নডাইকের অভিন্ন উপাদানের মতবাদ সঞ্চালন তত্ত্বটিকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, দু'টি শিক্ষণ পরিস্থিতির মধ্যে অভিন্ন উপাদান থাকা সত্ত্বেও সঞ্চালন হয়নি, আবার অনেক ক্ষেত্রে অভিন্ন উপাদান না থেকেও সঞ্চালন হয়েছে জাডের পরীক্ষণ এই অভিন্ন উপাদানের তত্ত্বটির অসারতা প্রমাণ করেছে অনেক পরীক্ষণ থেকে আবার দেখা গেছে, উপাদানের অভিন্নতা সঞ্চালনকে ব্যাহত করে।

জাডের অভিজ্ঞতা সামান্যীকরণের মতবাদ একদেশদর্শী। এতে শিক্ষণের বিষয়বস্তুর প্রকৃতির উপর কোন মূল্য আরোপ না করে শিক্ষণের পদ্ধতির উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষাফল সঞ্চালনের জন্ম শিক্ষণ পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু তা বলে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রকৃতিগত জ্ঞানও উপেক্ষা করা চলে না।

গেস্টাল্ট মতবাদ বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি দু'টিকেই সংযুক্ত করার চেষ্টা করেছে বিষয়বস্তুটিকে সামগ্রিক ভাবে উপলব্ধি করা শিখন সঞ্চালনের পক্ষে অপরিহার্য। সুষ্ঠু শিক্ষণের প্রথম শর্তই হ'ল বিষয়বস্তুটির সামগ্রিক ভাবে উপস্থাপন। কিন্তু যদি বিষয়বস্তুটিকে আংশিক ভাবে উপস্থাপিত করা হয়, তাহ'লে শিখনও যেমন কার্যকরী হয় না, সঞ্চালনও তেমনি সন্তোষজনক হয় না। আবার শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টাটিকেও হতে হবে সমগ্রধর্মী। অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া শিখন সম্ভব নয়। বিষয়

বস্তুর বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে একটা পারস্পরিক যোগসূত্র বা সম্বন্ধ নির্ণয় করা এবং বস্তুটি সম্বন্ধে একটা অবিচ্ছিন্ন সামগ্রিক জ্ঞান অর্জন করাই হ'ল অন্তর্দৃষ্টি জাগানোর একমাত্র উপায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সম্বন্ধমূলক চিন্তন এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা সামগ্রিক জ্ঞান অর্জন—এই দুটিই শিখন সঞ্চালন ঘটানোর প্রধান উপায়।)

সঞ্চালনের শিক্ষামূলক দিক: এতক্ষণ আমরা সঞ্চালনের যে সমস্ত তত্ত্ব আলোচনা করলাম—তাতে বোঝা গেল যে, কোনো কোন ক্ষেত্রে এক পরিবেশ থেকে অন্য পরিস্থিতিতে শিক্ষণ সঞ্চালিত হয়। কাজেই এ ব্যাপারে শিক্ষকেরও কিছু করণীয় আছে। কোন্ বিষয় থেকে কোন্ বিষয়ে বা কোন্ পরিস্থিতি থেকে কোন্ পরিস্থিতিতে সঞ্চালন হয়, সে বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। এতদিন পর্যন্ত যে সমস্ত গবেষণালব্ধ মতবাদ পাওয়া গেছে, সেগুলির উপর ভিত্তি করেই সঞ্চালনের ক্ষেত্রে শিক্ষককে অগ্রসর হতে হবে। সঞ্চালন সম্বন্ধে শিক্ষকের মনোভাবই শিক্ষকের কর্মপদ্ধতি স্থির করে দেয়।

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, মানসিক শৃঙ্খলার বস্তুটি অসার। কতকগুলি বিশেষ বিষয় পাঠ করলেই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মানসিক শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়—এই বিশ্বাস নিয়ে শিক্ষকের কতকগুলি বিশেষ বিষয়ের পঠন-পাঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা ঠিক নয়। যে কোন বিষয় শিক্ষাদানের মাধ্যমেই মানসিক উন্নতি সাধিত হ'তে পারে। বিষয় যেমনই হোক না কেন ঠিকমত শিক্ষা দিতে পারলে কোন বিষয়ই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

শিখন সঞ্চালন একটি বাস্তব প্রক্রিয়া এবং শিখন সহায়ক একটি উপকরণ। শিক্ষক যদি দক্ষতা ও সুবিবেচনার সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন, তা'হলে শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঠ্য বিষয়টি খুব বেশী পরিমাণে সঞ্চালিত হতে পারে। শিখন সঞ্চালনকে ঠিকমত কার্যকরী করতে হ'লে প্রথমে শিক্ষককে শিখন সঞ্চালনের ব্যাপকতা বা বিস্তৃতি সম্পর্কে একটা সুষ্ঠু জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কোন বিষয় থেকে কি জাতীয় ও কি পরিমাণ সঞ্চালন হ'তে পারে—তা তাকে জানতে হবে। শিখন সঞ্চালন সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলি সম্পর্কে শিক্ষককে অবহিত হতে হবে।

শিখন সঞ্চালন নির্ভর করে শিখনের গভীরতা, ব্যাপকতা ও সম্পূর্ণতার

উপরে। কাজেই এ ব্যাপারে শিক্ষকের নিজস্ব দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

যে দুটি পরিস্থিতির মধ্যে শিখন সঞ্চালিত করতে হবে, সেই দুটি পরিস্থিতির মধ্যস্থিত মূল সূত্রটি শিক্ষার্থীকে জানতে দিতে হবে। ক্রোন্‌ব্যাক (Cronback)-এর মত হ'ল,—শিক্ষার্থীকে এই মূল সূত্রটি বুঝিয়ে দিলে যে যে পরিস্থিতিতে এই সূত্রের প্রয়োগ করা যেতে পারে, সেই সব পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকৃষ্ট হবে।

পরিস্থিতি বিচিত্র ও জটিল হলেও শিক্ষার্থীকে সূত্রটি খুঁজে নিতে হবে।

পাঠ্য বিষয়ের পরিকল্পনাটি সুসংগঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঞ্চালন ঘটাতে গেলে পাঠ্য বিষয়টির মধ্যে একটা সুপরিকল্পনা ও সংহতি থাকা প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থী বিষয়টির একটা মূলগত ধারণা অর্জন করতে পারে।

শিক্ষার্থীরা যাতে পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে, তা অনুধাবন করতে পারে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে সাদৃশ্য নির্ণয় করতে পারে, সেদিকেও শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে।

আমরা আগেই দেখেছি অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ সঞ্চালনের সহায়ক। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে এমন ভাবে সাহায্য করবেন যাতে সে পাঠ্য বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির উপর নির্ভর ক'রে সামান্য সূত্র গঠন করতে পারে।

শিক্ষাদানের পদ্ধতি, নীতি, আদর্শ বা মূলগত তত্ত্ব প্রভৃতি এক পরিস্থিতি থেকে অন্য পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয়। কাজেই এগুলির সুষ্ঠু প্রয়োগের উপর শিক্ষকের গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এর জন্য আবার কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় মানসিক প্রক্রিয়ার অভ্যাস করা প্রয়োজন। মনোযোগী হওয়ার অভ্যাস, পর্যবেক্ষণ করার অভ্যাস, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করার অভ্যাস, সাদৃশ্য ও পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতা অর্জন, বিচারকরণের নিয়মাবলীর সঙ্গে অবহিত হওয়া ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি যাতে শিক্ষার্থী ঠিকমত সম্পন্ন করতে পারে সেদিকে শিক্ষককে লক্ষ্য তো রাখতেই হবে, প্রয়োজনমত সে সম্পর্কে নির্দেশও দিতে হবে।

এবার সঞ্চালনের প্রভাবটি বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রে কিরকম হতে পারে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্‌। বিদ্যালয়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে আমরা শিশুদের শিক্ষা দিয়ে থাকি। কিন্তু আমরা শিক্ষা-ফলকে জীবন

ক্ষেত্রেও সঞ্চালিত করতে চাই। বর্তমান যুগে দেখা যাচ্ছে শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে যে ফাঁক তা ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে। কি ভাবে শিক্ষা দিলে শিক্ষাফল জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে সঞ্চালিত হবে, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমে ধরা যাক পাঠক্রমের দিকটি। আমাদের পাঠক্রমটি কি সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত? পাঠক্রমের কয়েকটি বিষয়ের হয়তো মানসিক অনুশীলন বা উৎকর্ষ সাধনের ক্ষমতা আছে। কিন্তু যদি তার ব্যক্তিজীবন বা সমাজ জীবনে কোন মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা না থাকে, তবে ঐ বিষয়টি পাঠক্রম থেকে বাদ দেওয়াই উচিত। কোন বিষয়ের উৎকর্ষণ মূল্যের উপর গুরুত্ব আরোপ না ক'রে শিক্ষাসূচী বা পাঠক্রম এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ আত্মবিকাশ ও সামাজিক যোগ্যতা অর্জিত হতে পারে। তাছাড়া বিষয়গুলিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে উপস্থাপিত না করে সামগ্রিক ভাবে ও সম্পর্ক-যুক্ত করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করতে হবে।

এরপর পদ্ধতির কথা। বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বিষয়বস্তুর স্বরূপের উপরই শিখনের পদ্ধতি নির্ভর করে। বিষয়বস্তু ভিন্ন ভিন্ন হ'লে পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন হবে। জীবনের ক্ষেত্রে শিক্ষাফল সঞ্চালিত করতে হ'লে শিক্ষককে শিক্ষণ-পদ্ধতির সাধারণ দিকটির দিকে নিশ্চয়ই গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং এই পদ্ধতিই কি ভাবে অন্য কোন নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, তা উপলব্ধি করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে হবে।

বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রে শিক্ষাফল সঞ্চালিত করতে হ'লে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা তো অবলম্বন করতে হবেই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীরও আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। পরীক্ষাতে পাশ করা আর পুঁথিতে বিদ্যা অর্জন করাই তো শিক্ষার চরম লক্ষ্য নয়। এই লক্ষ্যের দিকে নজর রেখে এগিয়ে গেলে শিক্ষাফল সঞ্চালিত হতে পারে না। ডিউইও তাই বলেছেন বিদ্যালয় হবে সমাজেরই একটি প্রতিচ্ছবি, কিন্তু সেই বিদ্যালয়কে বৃহত্তর মানবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে জ্ঞানবিপণি রূপে সংশোধিত করার জন্যই জীবনক্ষেত্রে সঞ্চালন হচ্ছে না। তাই প্রথমেই বিদ্যালয়গুলিকে সমাজ জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, সমাজ জীবনের বাস্তব সমস্যা ও বিচিত্র কর্মপ্রবাহের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করতে হবে। বিদ্যালয়গুলি সংগঠিত ও পরিচালিত হবে জীবন কেন্দ্রীক, বাস্তব ও কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতাকেই আশ্রয় করে। তবে বিদ্যালয়টি

ঠিক বৃহত্তর সমাজের মত হবে না ; হবে সরল, পবিত্র ও সুষম একটি সমাজ। এই সমাজের সভ্যরা সব ভাই ভাই। এখানে নানা ধরনের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জাতীয় উৎপাদনধর্মী কর্ম অনুষ্ঠিত হবে। বাস্তব সমস্যার পটভূমিকায় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়-সমাজ-জীবনেও সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করবে। এইভাবে যে জ্ঞান, দক্ষতা ও কুশলতা তারা অর্জন করবে—তা নিশ্চয়ই জীবনের ক্ষেত্রেও সঞ্চালিত হবে।

শিশুদের শিক্ষাও হবে বাস্তব-ভিত্তিক। বিভিন্ন জাতীয় প্রজেক্ট ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের শিক্ষা দিলে ভালো হয়। কৃত্রিম পরিবেশে নিছক তত্ত্বগত জ্ঞান কাজে লাগে না। বৃহত্তর জীবনে শিক্ষার্থী যে যে অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে পারে, বিদ্যালয়ে অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করে তাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে হবে। তাছাড়া শিক্ষাসূচী ও সহপাঠক্রমিক কর্মসূচীর সমন্বয়ে এমন একটি সুন্দর সুষ্ঠু সমাজ জীবন গড়ে তুলতে হবে যেখানে তত্ত্বের সঙ্গে ব্যবহারিক প্রয়োগের, জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের, শিক্ষার সঙ্গে আচরণের ও বিদ্যালয় জীবনের সঙ্গে সমাজ জীবনের একটা রাখী বন্ধন গড়ে উঠতে পারে। তখনই শিক্ষাফল বিদ্যালয় জীবন থেকে বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রে সঞ্চালিত হবে, তার আগে নয়।

প্রক্ষোভ

(Emotions)

[Emotions are innate responses essentially chaotic in nature involving the whole body in their expression, particularly the glandular and visceral organs and having intimate relationship with the preservation of the species or of the individual.

An emotion according to Woodworth is a "stirred up state of the organism" in which there is an impulse or conscious attitude tending toward some defintte activity.

'Emotions—differently described and explained by different psychologists, but all agree that it is a complex state of the organism, involving bodily changes of a widespread character—in breathing, pulse, gland secretion etc,'—Dictionary of Phychology.]

সাধারণ ভাবে রাগ, দুঃখ, আনন্দ, ভয়, ভালোবাসা, ঘৃণা ইত্যাদি শব্দের দ্বারা আমরা আমাদের মনের যে বিশেষ অবস্থা বুঝিয়ে থাকি, সেইগুলিকেই প্রক্ষোভ বা Emotion বলে। ইংরেজী Emotion শব্দটি এসেছে ল্যাটিন E'movere ধাতু থেকে যার অর্থ হ'ল বিক্ষুব্ধ বা উত্তেজিত হওয়া। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রক্ষোভ বলতে এমন একটি অবস্থার কথা বোঝায় যা ব্যক্তিকে উত্তেজিত বা প্রক্ষুব্ধ করে।

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন ভাবে প্রক্ষোভের সংজ্ঞা দিয়েছেন। প্রক্ষোভকে আমরা আবেগও বলতে পারি। কোন কোন মনোবিজ্ঞানী বলেন প্রক্ষোভ হ'ল একজাতীয় দেহজ সংবেদন। আবার কেউ কেউ বললেন প্রক্ষোভ হ'ল অতীত সুখ-দুঃখের পুনরাবির্ভাব ও ভবিষ্যত সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে চিন্তন। আবার কেউ কেউ বললেন প্রক্ষোভ হ'ল কোন বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী আচরণ করার প্রবণতা এবং এক জাতীয় ইচ্ছামূলক চেতনা। যাই হোক সকলের সংজ্ঞাগুলি মেনে নিয়ে বলা যেতে পারে (প্রক্ষোভ হ'ল এক জাতীয় জটিল অনুভূতি যার মূলে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি বর্তমান; কোন বিশেষ বস্তু বা ধারণার জন্ত প্রক্ষোভ জাগরিত হয়; এই জাগরণের ফলে শরীরে ও অভ্যন্তরে কিছু পরিবর্তন ঘটে এবং নানাপ্রকার কাজে আমরা সেইজন্তই প্রবৃত্ত হয়ে থাকি।)

প্রক্ষোভের বিভিন্ন সংজ্ঞা পর্যবেক্ষণ করলে এর কয়েকটি দিক সম্বন্ধে অবহিত হ'তে পারা যায়। যেমন—

* প্রক্ষোভ হ'ল একজাতীয় জটিল অনুভূতি।

* প্রক্ষোভ জাগরিত হ'লে শরীরের অভ্যন্তরে কতকগুলি পরিবর্তন দেখা যায়।

* এই আভ্যন্তরিণ পরিবর্তনের ফল বাইরেও দেখা যায়। যেমন, দাঁত কড়মড় করে, হাত মুষ্টিবদ্ধ করে, চোখ লাল করে, যে লোকটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে বকছে তার বাইরের আচরণ দেখে তাকে জিজ্ঞাসা না করেও বুঝতে পারি—সে রাগ করেছে।

* প্রক্ষোভই আমাদের কাজে প্রবৃত্ত করে।

এক কথায় বলা যেতে পারে যে, কোন প্রক্ষোভ-ঘটিত পরিস্থিতির তিনটি দিক থাকবে—এক, বাহ্যিক আচরণের দিক; দুই, আভ্যন্তরিণ আচরণের দিক এবং তিন, প্রাক্ষোভিক অনুভূতিমূলক দিক।

প্রক্ষোভের অধীন হ'লে প্রত্যেক প্রাণীই কিছু বাহ্যিক আচরণ সম্পন্ন করে। ভয় পেলে আমরা দৌড়ে পালাই, রাগ হলে চেঁচামেচি করি, আক্রমণ করি ইত্যাদি। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও বিভিন্ন প্রক্ষোভমূলক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন জাতীয় বাহ্যিক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত আচরণ স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যায় না। সুতরাং বলা যেতে পারে, প্রাক্ষোভিক আচরণগুলি প্রাণীর সংহতি ও সাম্যাবস্থা নষ্ট করে দেয়।

প্রক্ষোভ দেহের অভ্যন্তরেও কতকগুলি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই আভ্যন্তরিণ দৈহিক পরিবর্তন বিভিন্ন জাতীয় হতে পারে। যেমন, রক্তচলাচল-ঘটিত, গ্রন্থি-ঘটিত, পেশী-ঘটিত, স্নায়ু-ঘটিত, শ্বাস-প্রশ্বাস-ঘটিত ইত্যাদি। কোন্ প্রক্ষোভের জন্য কি রকম আভ্যন্তরিণ পরিবর্তন দেখা দেবে—তা সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় না। এগুলির একটি সাধারণ রূপ আছে যা সমস্ত প্রক্ষোভের ক্ষেত্রেই দেখা দিতে পারে। তবে প্রক্ষোভ যদি বিভিন্ন জাতীয় হয়, তাহ'লে মাত্রা ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এই আভ্যন্তরিণ পরিবর্তনগুলি বিভিন্ন হয় এবং বিভিন্ন প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।

প্রত্যেকটি প্রক্ষোভের সঙ্গে আবার একটি অনুভূতিমূলক দিক যুক্ত থাকে। এই অনুভূতি হয় সুখজনক নয়তো দুঃখজনক হবে। ভয় যে অনুভূতির সৃষ্টি করে—তা সুখকর নয়, কিন্তু ভালোবাসা বা আনন্দের অনুভূতিটি সুখকর।

প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্য (Characteristics) : বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী স্ট্যাউট (Stout) প্রক্ষোভের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সংক্ষেপে সেগুলি হ'ল :—

[এক] প্রক্ষোভের পরিধিটি অত্যন্ত ব্যাপক (Wide Range)।

[দুই] বিভিন্ন অবস্থা বা পরিবেশ একই প্রক্ষোভ জাগরিত করতে পারে (Varied Nature of the Conditions)।

[তিন] প্রক্ষোভ জাগরণের একটি কারণ থাকবেই (Cause)।

[চার] প্রক্ষোভ জাগরণের ফলেই একটা মেজাজ সৃষ্টি হয়—যে মেজাজ আবার প্রক্ষোভটিকে দীর্ঘস্থায়ী করে (Mood)।

[পাঁচ] প্রক্ষোভগুলি হ'ল পরাশ্রয়ী (Parasitical)।

[ছয়] তীব্র প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে দৈহিক সংবেদন লক্ষ্য করা যায় (Organic Sensation)।

[সাত] প্রক্ষোভ অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই আবির্ভূত হতে পারে (Suddenness)।

[আট] প্রক্ষোভ আমাদের বিচারকরণ ক্ষমতাটিকে সাময়িক ভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে (Interference with judgment)।

[নয়] প্রক্ষোভের অভিব্যক্তি সব বয়সেই দেখা যায় (Appearance at all ages)।

[দশ] প্রক্ষোভগুলি অনুবর্তন-সাপেক্ষ (Can be conditioned and de-conditioned)।

প্রক্ষোভ জাগে কেন ? (Causes) : যে কোন একটি প্রক্ষোভমূলক পরিস্থিতি বেশ ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে প্রক্ষোভ জাগরণের একাধিক কারণের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে প্রক্ষোভ জাগরণের প্রথম কারণ হ'ল—পারিবেশিক উত্তেজনা। হঠাৎ আলোর ঝলকানি, উচ্চশব্দ, আকস্মিক ভাবে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা ইত্যাদি পরিবেশমূলক শক্তি প্রক্ষোভ জাগরণের সহায়ক। তবে এগুলি শৈশবকালে খুব বেশীমাত্রায় কার্যকরী থাকে। শিশু যত বড় হয় তত তার প্রক্ষোভ জাগরণের কারণগুলি বিস্তৃত হয়ে পড়ে। অন্ধকার, নির্জনতা বা খুব ভীড়, কদাকার-কুৎসিত কোন লোক, পশু ইত্যাদিও তার প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ হতে পারে। তবে পরিণত বয়সে প্রক্ষোভের কারণগুলি সাধারণতঃ সামাজিক

প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং কারো মুখের একটু কথা, একটু মন্তব্য, আচরণ বা সামান্যতম ইঙ্গিতই আমাদের প্রক্ষোভ জাগরণের পক্ষে যথেষ্ট।

দ্বিতীয় কারণটি হ'ল—পারিবেশিক উত্তেজনা সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতা ও চিন্তাধারা। কোন একজনের মন্তব্য বা আচরণ আমাদের যতটুকু প্রক্ষোভ জাগাতে পারে সে সম্বন্ধে আমরা যদি আগের থেকেই মনে মনে চিন্তা বা জল্পনা-কল্পনা করি, তাহ'লেও প্রক্ষোভ জাগবে এবং বেশী মাত্রাতেই জাগবে। সচরাচর বয়স্কদের ক্ষেত্রে এই ভাবেই প্রক্ষোভ জাগে। তেমনি অতীতের কোন দুর্ঘটনা বা দুঃখজনক অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করলেও প্রক্ষোভ জাগে।

তৃতীয় কারণটি হ'ল, গ্রন্থিজনিত উত্তেজনা। এটিকে প্রক্ষোভ জাগরণের কারণও বলা যেতে পারে, ফলও বলা যেতে পারে। প্রক্ষোভ জাগরিত হ'লে বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে রস নিঃসৃত হতে থাকে। অর্থাৎ গ্রন্থিগুলি উত্তেজিত হয়ে যায়। এই গ্রন্থিজনিত উত্তেজনাই আবার প্রক্ষোভের মাত্রা ও অভিব্যক্তিটি বাড়িয়ে দেয়। বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে জানা গেছে যে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি থেকে যে রস নির্গত হয়—তা প্রক্ষোভের জাগরণ ও মাত্রাবৃদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য।

প্রক্ষোভের বিভিন্ন তত্ত্ব (Theories of Emotions) : প্রক্ষোভের প্রকৃতি ও কার্যধারা নিয়ে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন ভাবে গবেষণা করে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এগুলি প্রক্ষোভের তত্ত্ব হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের কথা আলোচনা করা হ'ল—

[এক] **ম্যাক্‌ডুগালের প্রবৃত্তি-প্রক্ষোভ তত্ত্ব** (Mc. Dougall's Theory of Instinct Emotion) : ম্যাক্‌ডুগাল তাঁর বিখ্যাত প্রবৃত্তি-প্রক্ষোভকে প্রবৃত্তির কেন্দ্রীয় শক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেকটি সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে একটি প্রক্ষোভ থাকবেই এবং ঐ প্রক্ষোভটি জাগলে তবেই প্রবৃত্তিটি কার্যকরী হবে। তিনি মোট সতরটি প্রবৃত্তি ও তার সহগামী সতরটি প্রক্ষোভের কথা বলেছেন।

[দুই] **জেমস্-ল্যাংগ তত্ত্ব** (James-Lange Theory) : প্রক্ষোভের দুটি দিক আছে—(ক) একটি মানসিক দিক, আর একটি হ'ল (খ) দৈহিক পরিবর্তনের দিক। কিন্তু কথা হচ্ছে—কোনটি আগে ? প্রক্ষোভ জাগার পর দৈহিক পরিবর্তন দেখা দেয়, না দৈহিক পরিবর্তন দেখা দেবার পর প্রক্ষোভ জাগে ? আরো সহজ করে বলি—আমরা ভয় পেয়ে দৌড়াই, না দৌড়াই বলেই

ভয় পাই? দুঃখ পেয়ে কাঁদি, না কাঁদি বলেই দুঃখ পাই? রেগে গিয়ে আক্রমণ করি, না, আক্রমণ করি বলেই রেগে যাই?

সাধারণ মতানুযায়ী বা ম্যাকডুগাল সাহেবের মত অনুযায়ী বলা যায়—প্রক্ষোভ জাগরণের স্তরগুলি হ'ল এই রকম —

উদ্দীপকের প্রত্যক্ষণ	→	প্রক্ষোভের অনুভূতি	→	শারীরিক প্রতিক্রিয়া

কিন্তু প্রসিদ্ধ আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী উইলিয়ম জেম্‌স (William James) ১৮৮৪ সালে ও ড্যানিস শারীরবিজ্ঞানী কার্ল ল্যাংগ (Carl Lange) ১৮৮৫ সালে এই সাধারণ মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি মতবাদ উপস্থাপিত করেন। তাঁদের মতে প্রক্ষোভ দৈহিক পরিবর্তনের কারণ নয়—ফল। দেহগত পরিবর্তনের ফলে যে দৈহিক সংবেদনের সৃষ্টি হয়—সেই দৈহিক সংবেদনই হ'ল প্রক্ষোভ। জেমস্‌ ল্যাংগের মতে প্রক্ষোভ জাগরণের স্তরগুলি হ'ল এই রকম :—

উদ্দীপকের প্রত্যক্ষণ	→	শারীরিক প্রতিক্রিয়া	→	প্রক্ষোভের অনুভূতি

অর্থাৎ আমরা ভয় পেয়ে দৌড়াই না, দৌড়াই বলেই ভয় পাই, দুঃখ পেয়ে কাঁদি, তা নয়, কাঁদি বলেই দুঃখ পাই, রেগে গিয়ে আক্রমণ করি না—আক্রমণ করি বলেই রেগে যাই। তাঁরা বলছেন, কোন একটি বস্তু প্রত্যক্ষ করলে দেহের ভিতর কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে। সংবেদক স্নায়ু এই পরিবর্তনের খবর মস্তিষ্কে নিয়ে যায় এবং তার জন্যই একটা দৈহিক সংবেদন সৃষ্ট হয়। এই যে দৈহিক সংবেদন তার অনুভূতিটিই হ'ল প্রক্ষোভ। মনে করা যাক্‌, কোন একজন লোক একটি বাঘ দেখল। সে ভয় পাবে ঠিকই; কিন্তু এই বাঘ দেখা ও ভয় পাওয়ার মাঝে আরো অনেক কিছুই আছে। যেমন, বাঘ দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার মস্তিষ্কে একটা উদ্দীপনার সৃষ্টি হবে। এই উদ্দীপনা আবার স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়বে। তার ফলে শরীরের মাংসপেশী গ্রন্থি ইত্যাদিতে নানাপ্রকার শারীরিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এই প্রতিক্রিয়াগুলি সৃষ্ট হবার পর স্নায়বিক উত্তেজনা স্নায়ুপথ বেয়ে আবার মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছাল এবং তার ফলে

"ভয়" নামক প্রক্ষোভের সৃষ্টি হ'ল। তা'হ'লে দেখা যাচ্ছে, জেমস্-ল্যাংগের মতে শারীরিক প্রতিক্রিয়া আগেই ঘটবে—তারপর দেখা দেবে প্রক্ষোভ।

জেমস্ তাঁর দেওয়া প্রক্ষোভের এই নতুন মতবাদের সমর্থনে কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করেন। কতকগুলি যুক্তির উল্লেখ করা হ'ল—

(ক) কোন একটি সম্পর্কে মনে মনে চিন্তা করার সময় যদি এই প্রক্ষোভের দৈহিক বহিঃপ্রকাশ সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয় তা'হলে প্রক্ষোভের আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। যা অবশিষ্ট থাকবে তা হ'ল—উত্তেজনাবিহীন নিরপেক্ষ বুদ্ধিগত একটা প্রত্যক্ষণ মাত্র। তা'হলে দেখা যাচ্ছে দৈহিক অভিব্যক্তি বা শারীরিক প্রতিক্রিয়াটি বাদ দিলে প্রক্ষোভের অস্তিত্বই থাকে না।

(খ) মানসিক বিকৃতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় বাইরের জগতের কোন উদ্দীপক ছাড়াই তাদের মনে প্রক্ষোভ সৃষ্ট হয়। হিস্টিরিয়া বা ম্যানিয়া রোগের ক্ষেত্রে দেখা যায়—কখনও তারা হাসছে, কখনও কাঁদছে, কখনও কাল্পনিক কোন লোককে আক্রমণ করছে রেগে গিয়ে। বাহ্যিক কোন কারণ নেই, অথচ তাদের মনে রাগ, আনন্দ, ভয় ইত্যাদি প্রক্ষোভের আনাগোনা চলছে। এ কি করে সম্ভব হয়? জেমস্ বলছেন, নিছক শারীরিক অভিব্যক্তির জন্যই এ সমস্ত প্রক্ষোভ জাগরিত হচ্ছে।

(গ) প্রক্ষোভের দেহগত বহিঃপ্রকাশকে যদি কোন উপায়ে বাইরে ঘটানো যায়—অবশ্য কৃত্রিম ভাবে, তা'হলে মনের মধ্যে প্রক্ষোভের সঞ্চার হয়। অভিনয়ের সময় দেখা যায়, অভিনেতারা রাগ, দুঃখ, ভয়, ঘৃণা ইত্যাদি প্রক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বাইরে অর্থাৎ দৈহিক আচরণের মাধ্যমে ঘটাবার চেষ্টা করেন। ফলে তাদের মনেও ঐ সমস্ত প্রক্ষোভ সৃষ্ট হয়।

(ঘ) মাদক দ্রব্য বা উত্তেজক কোন বস্তু গ্রহণ করার পর অনেক লোক হয় দুঃখ, না হয় ভয়, না হয় আনন্দ অনুভব করে—যদিও ঐ সমস্ত প্রক্ষোভ সৃষ্ট হবার বা অনুভূত হবার কোন সঙ্গত কারণ থাকে না। এক্ষেত্রেও দৈহিক বহিঃপ্রকাশই প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ এ কথা বলা যেতে পারে।

(ঙ) দৈহিক অভিব্যক্তি বা বহিঃপ্রকাশের মাত্রা যদি বাড়ানো যায়, তাহ'লে প্রক্ষোভই সেই অনুপাতে বাড়তে থাকে। রাগের সময় বেশী করে হাত পা ছুঁড়লে, ভয়ের সময় যত বেশী কাঁপা যায় তত বেশী রাগ বা ভয়ের মাত্রা বাড়তে থাকে।

(চ) প্রক্ষোভ জাগরণের সময় প্রক্ষোভকে যদি অভিব্যক্ত হতে না দেওয়া

যায় অর্থাৎ তার দৈহিক বহিঃপ্রকাশটি যদি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যায় তাহ'লে প্রক্ষোভ লুপ্ত হয়ে যায়। রাগের সময় যদি রাগকে অভিব্যক্ত হতে না দেওয়া যায় তাহ'লে রাগ আর থাকে না। অনেকে বলেন রাগ থামানোর উত্তম উপায় হচ্ছে রাগের সময় আয়নাতে নিজের চেহারাটি দেখা বা মনে মনে এক থেকে একশো পর্যন্ত বার বার গণনা করা।

এই সমস্ত যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে জেমস বলেন যে, কোন একটি বস্তু প্রত্যক্ষ করার পর যে দৈহিক পরিবর্তন ঘটে এবং এই সমস্ত দৈহিক পরিবর্তনের জন্য যে দেহজ সংবেদনের সৃষ্টি হয় সেইটিই হ'ল প্রক্ষোভ। প্রক্ষোভ দৈহিক সংবেদন ছাড়া বেশী কিছু নয়। দৈহিক উত্তেজনা ও প্রক্ষোভ একই ঘটনার নামান্তর ছাড়া আর কিছু নয়। ল্যাংগও স্বাধীন ভাবে জেমস্-এর মতটিকে সমর্থন করেছেন বলে মতবাদটি জেমস্-ল্যাংগ মতবাদ নামে পরিচিত।

জেমস্-ল্যাংগ মতবাদের সমালোচনা : জেমস-ল্যাংগ-এর মতবাদের নতুনত্ব মনোবিজ্ঞানের জগতে দারুণ একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এর অভিনবত্বে আকৃষ্ট হয়ে অনেক মনোবিজ্ঞানীই গবেষণা কার্য শুরু করে দেন। কিন্তু গবেষণালব্ধ ফলাফল এই তত্ত্বের অনুকূলে যায় নি। বরং এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, দৈহিক অভিব্যক্তিই আবেগের একমাত্র কারণ নয়; কোন না কোন প্রকার মানসিক অনুভূতি ছাড়া প্রক্ষোভ সৃষ্ট হতে পারে না। সমালোচকরা এই মতের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করেন, তার মধ্যে কয়েকটির কথা উল্লেখ করা হ'ল :—

(ক) জেমস্-এর মত হ'ল, দৈহিক প্রকাশ ছাড়া প্রক্ষোভের জাগরণ সম্ভব নয়। কিন্তু তাতে এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে না যে দৈহিক প্রকাশ ও প্রক্ষোভ অভিন্ন। দৈহিক প্রকাশ ও প্রক্ষোভের দৃঢ় সহ-অবস্থান এ কথাই প্রমাণ করে যে একটির থেকে আর একটিকে পৃথক করা যায় না—দুটি একই সঙ্গে ঘটে। কিন্তু দুটি যে একই জিনিসের ভিন্ন নাম একথা মনে করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই। মনোবিজ্ঞানী স্টাউট (Stout) বললেন—"পাথর জলের মধ্যে ছুঁড়ে দিলে তরঙ্গ সৃষ্টি না করে পারে না। কিন্তু তাই বলে এই তরঙ্গগুলিই তো পাথর হতে পারে না। আগুন ছাড়া ধুঁয়ো হয় না। কিন্তু ধুঁয়ো আর আগুন ভিন্ন ভিন্ন জিনিস।"

(খ) জেমস্ দেহজ সংবেদনের কথা বলেছেন কিন্তু দেহজ সংবেদনের স্বরূপটি সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করেন নি। যে সমস্ত দেহজ সংবেদন প্রক্ষোভ সৃষ্টি

করে না—সেগুলির মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? এক্ষেত্রেও স্টাউট বলেন—"এ কথা সুনিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে যে, দৈহিক সংবেদন মাত্রই প্রক্ষোভ নয়। ক্ষুধা বা পেটে ব্যথা দৈহিক সংবেদন ; কিন্তু প্রক্ষোভ-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা নয়।"

(গ) জেমস বলেছেন উন্মাদ বা বিকারগ্রস্ত লোকদের ক্ষেত্রে বাইরের কোন উদ্দীপক ছাড়া কেবলমাত্র শারীরিক অভিব্যক্তির জন্যই প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এর বিরুদ্ধে বলা যায় এ সব লোকদের ক্ষেত্রে যা দেখা যায়, তা ঠিক প্রক্ষোভ নয়, একটা প্রক্ষোভগত মেজাজ (Mood)। দৈহিক পরিবর্তন এই মেজাজটি সৃষ্টি করতে পারে মাত্র। এই মেজাজটি আবার কোন পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষণ বা ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রক্ষোভে পরিণত হয়। মাদক দ্রব্য বা উত্তেজক দ্রব্য সেবনের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যেতে পারে।

(ঘ) জেমস্-এর মতে প্রক্ষোভ জাগরণের সময় দৈহিক অভিব্যক্তির মাত্রা বাড়ালে প্রক্ষোভের মাত্রাও বাড়ে—যেমন হয় অভিনেতাদের ক্ষেত্রে। কিন্তু এটা খুব দৃঢ় একটা সিদ্ধান্ত নয়। অভিনেতারা এই প্রক্ষোভের জাগরণ সম্বন্ধে সচেতন থাকেন এবং প্রক্ষোভটি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। যে অভিনেতা স্টেজে সীতা সেজে দারুণ দুঃখে চোখের জল ফেললেন পর মুহূর্তেই দেখা গেল তিনি যবনিকার অন্তরালে সিগারেট খেতে খেতে অন্য একজনের সঙ্গে হাসাহাসি করছেন। স্টেজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রক্ষোভটিও অন্তর্হিত হয়েছে।

(ঙ) জেমস্ প্রক্ষোভ ও দৈহিক সংবেদনকে অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু মনোবিজ্ঞানী ওয়ার্ড (Ward) বলেন প্রক্ষোভ হ'ল অনুভূতিমূলক (Affective) আর দৈহিক সংবেদন হ'ল জ্ঞানমূলক (Cognitive)। প্রক্ষোভের প্রতি মনোযোগী হলে তা অদৃশ্য হতে পারে কিন্তু দৈহিক সংবেদনের প্রতি মনোযোগী হলে তা অদৃশ্য হয় না। যে লোক রাগ করেছে সে রাগের প্রতি মনোযোগী হলে রাগ আর থাকে না। কিন্তু যে লোকটির ক্ষিদে পেয়েছে সে তার প্রতি মনোযোগী হলেই তার ক্ষিদে অদৃশ্য হবে না।

(চ) প্রক্ষোভ ও তার দৈহিক অভিব্যক্তি যদি একই হয় তাহ'লে প্রত্যেকটি প্রক্ষোভের জন্য এক একটি সুনির্দিষ্ট দৈহিক অভিব্যক্তি থাকত। আমরা কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখি যে বিভিন্ন প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে একই দৈহিক প্রকাশ ঘটছে। ভয় পেয়ে দৌড়ান আর খুব ব্যস্ত হয়ে দৌড়ানোর মধ্যে কি তফাৎ আছে ? তাছাড়া স্থান-কাল-পাত্র ভেদে প্রক্ষোভের দৈহিক অভিব্যক্তি বিভিন্ন হ'তে বাধ্য। ছোট ছেলেরা রাগ করলে মারামারি করে, আঁচড়ে কামড়ে

দের, কিন্তু আমরা বড়রা তা পরি না। বিরক্ত হলে ছোটরা পরিষ্কার ভাবে তা প্রকাশ করে। কিন্তু আমরা আমাদের বিরক্তিটি সযত্নে গোপন রাখার চেষ্টা করি। অসভ্য ও অশিক্ষিত লোকদের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের দৈহিক অভিব্যক্তি যত সহজ, স্বাভাবিক ও সাবলীল, সভ্য ও শিক্ষিত লোকদের ক্ষেত্রে তা নয়।

তাছাড়া দৈহিক অভিব্যক্তি হলেই যে প্রক্ষোভ জাগবে এমন কোন কথা নেই। ভয় পেলে আমরা কাঁপি। শীত করলেও কাঁপি। কিন্তু যখন শীতের জন্য কাঁপি তখন তো প্রক্ষোভ থাকে না। টিচেনার (Titchener) বলছেন দৈহিক সংবেদন-দৈহিক সংবেদনই ; হৃৎপিণ্ডের কম্পনকে ভয়ের আবেগ বলা যেতে পারে না, তেমনি সিঁদুরে মুখ মাত্রেই যে লাজে রাঙা তাও বলা যায় না।

(ছ) শেরিংটন একটি কুকুরের উপর গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, জেমস-ল্যাংগ মতবাদটি নির্ভুল নয়। তিনি একটি কুকুরের (কুকুরী?) সংবেদনবাহী স্নায়ুগুলির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন যাতে তার ক্ষেত্রে কোন প্রকার দৈহিক উত্তেজনা সৃষ্টি হতে না পারে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল তা সত্ত্বেও কুকুরটি স্পষ্টভাবেই রাগ, আনন্দ, ভয় ইত্যাদি প্রকাশ করছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় প্রক্ষোভ আন্তর-যন্ত্রীয় সংবেদনের উপর নির্ভরশীল নয়। ক্যানন, লুইস্ ও ব্রিটন বিড়ালের উপর অনুরূপ পরীক্ষা চালিয়ে একই সিদ্ধান্তে এসেছেন। মানুষের ক্ষেত্রেও অনুরূপ এক ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারা গেছে। চল্লিশ বৎসর বয়স্কা এক মহিলা ঘোড়া থেকে পড়ে যান, ফলে তার মস্তিষ্কের সঙ্গে সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুমণ্ডলীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর ফলে তাঁর পক্ষে কোনরূপ দৈহিক অভিব্যক্তি সম্ভব না হলেও তিনি কিন্তু বিভিন্ন প্রক্ষোভ, যেমন রাগ, দুঃখ আনন্দ ইত্যাদি ঠিকমতই অনুভব করতেন।

(জ) আর একটি পরীক্ষণ এই মতবাদের বিরুদ্ধে যায়। একবার কৃত্রিম প্রক্রিয়ার সাহায্যে শরীরে উত্তেজনা সৃষ্টি করে দেখা গেল তা থেকে প্রক্ষোভ জাগে কি না। কয়েকজন লোকের শরীরে এ্যাড্রেনালিন (Adrenalin) ইন্জেকশান দিয়ে কৃত্রিম ভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করা হ'ল। দৈহিক অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা গেল। কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোন প্রক্ষোভ তারা অনুভব করতে পারলেন না। কাজেই শারীরিক উত্তেজনাই প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ নয়।

পরবর্তী কালে জেম্স তাঁর মতবাদটিকে কিছুটা পরিবর্তিত করেন। তিনি পরে বলেন যে, আমরা প্রথমে একটা অবস্থিতি পর্যবেক্ষণ করি যার জন্য একটা অনুভূতির সৃষ্টি হয়। এই অনুভূতিযুক্ত প্রত্যক্ষণ আমাদের মধ্যে

দৈহিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং সেই সংবাদটি মস্তিষ্কে পৌঁছালে তবেই প্রক্ষোভের সঞ্চার হয়। কাজেই বলা যেতে পারে দৈহিক অভিব্যক্তির আগেই প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয়। জেমস-এর মতবাদের মূল্য এইখানেই। তিনিই দেখিয়েছেন যে, দৈহিক সংবেদন প্রক্ষোভের অপরিহার্য অংশ।

[তিন] **ক্যানন বার্ডের থ্যালামিক তত্ত্ব (Cannon Bard's Thalamic Theory)**: আধুনিক কালে প্রক্ষোভ সৃষ্টি হবার কারণ সম্বন্ধে এই তত্ত্বটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। তত্ত্বটি শরীরতত্ত্বমূলক গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত বলে নির্ভরযোগ্য। এতে জেমস্ ল্যাংগের তত্ত্বটির বিরোধিতাই করা হয়েছে।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী বলা যায় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উত্তেজনা যায় মস্তিষ্কে এবং মস্তিষ্ক থেকে নেমে আসে তার নীচে অবস্থিত থ্যালামাস নামক একটি অংশে। ক্যানন বলছেন এই থ্যালামাস বা আরো সঠিক ভাবে বলতে গেলে হাইপো্যা-থ্যালামাস স্নায়বিক উত্তেজনার সমন্বয়-কেন্দ্র। এইখান থেকে উত্তেজনাটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একভাগ আবার ফিরে চলে যাচ্ছে মস্তিষ্কে-প্রক্ষোভের অনুভূতির প্রকৃতি ও মাত্রা নির্ধারণ করার জন্য। অর্থাৎ রাগ, আনন্দ না ভয় কি জাতীয় প্রক্ষোভ, তা মস্তিষ্কই স্থির করে দিচ্ছে। আর এক ভাগ নেমে চলে আসছে অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলী এবং সেখান থেকে শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, মাংসপেশী, গ্রন্থি প্রভৃতিতে। এর ফলে নানা

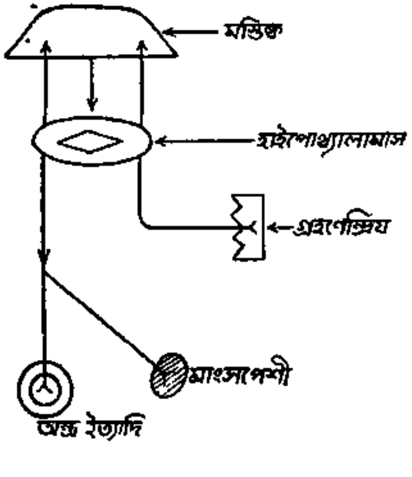

প্রকার শারীরিক উত্তেজনা সৃষ্ট হয়। এই উত্তেজনা আবার স্নায়ুপথ বেয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছায় এবং যে প্রক্ষোভটি আগেই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে তার অনুভূতিকে আরো বেশী করে তীব্র করে তোলে। তত্ত্বটি ক্যানন ও বার্ড যৌথভাবে প্রকাশ করেন বলে এর নাম ক্যানন-বার্ড তত্ত্ব এবং থ্যালামাসের সক্রিয়তার মাধ্যমে প্রক্ষোভের জাগরণ ও কার্যকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে বলে তত্ত্বটিকে প্রক্ষোভের থ্যালামাসমূলক তত্ত্বও (Thalamic Theory of Emotions)

বলা হয়। সুতরাং শারীরিক উত্তেজনা প্রক্ষোভ জাগরিত করতে না পারলেও প্রক্ষোভের মাত্রা তীব্রতর করতে সাহায্য করে।

প্রক্ষোভের উৎপত্তি ও বিকাশ : মানব শিশু কোন্ কোন্ প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং কিভাবে সেগুলি বিশেষায়িত হয় তা নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। তবে প্রাথমিক প্রক্ষোভের স্বরূপ ও সংখ্যা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা একমত হতে পারেননি। তবে সকলেই একথা স্বীকার করেন যে, নবজাত শিশু কতকগুলি প্রক্ষোভ নিয়েই জন্মায় এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার এই প্রক্ষোভগুলি নানা অভিজ্ঞতা ও আবরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। প্রক্ষোভের দুটো দিক আছে। একটি হ'ল মানসিক দিক আর অন্যটি হ'ল দেহগত দিক। দেহগত দিকটি প্রক্ষোভের আচরণ-মূলক দিক।

বিখ্যাত আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানী ওয়াট্‌সন (Watson) প্রক্ষোভের এই মানসিক দিকটির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁর মতে প্রক্ষোভ হ'ল দৈহিক উত্তেজনা-জনিত একটি পরিবর্তন মাত্র। নবজাত শিশু কোন সুনির্দিষ্ট প্রক্ষোভ বা তার প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। তিনি বলেন, মানব জীবনে প্রক্ষোভের প্রকাশ ও বিকাশ সাপেক্ষীকরণের জন্যই হয়ে থাকে। (শিখন অধ্যায়ে ওয়াট্‌সনের অ্যালবার্টের ওপর পরীক্ষণ দ্রষ্টব্য)। ওয়াট্‌সনের মতে শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভ মাত্র তিনটি—রাগ, ভয় ও ভালবাসা বা আনন্দ। এই তিনটি প্রক্ষোভ দেখা দেয় সাপেক্ষীকরণের ফলেই। এ বিষয়ে ১৯২০ সালে ওয়াট্‌সন বিভিন্ন শিশু নিয়ে গবেষণা-কার্য চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসেন। ওয়াট্‌সন্ দেখলেন যে শিশুর মধ্যে ভয় জাগাতে পারে উচ্চ শব্দ, যন্ত্রণাদায়ক কোন উদ্দীপক ও হঠাৎ অবলম্বন হারিয়ে ফেলা। তিনি শিশুর দৈহিক অভিব্যক্তি, যেমন কুঁকড়ে যাওয়া, নিশ্বাস বন্ধ করা, হাত পা গুটিয়ে নেওয়া, মুখ হঠাৎ রক্তশূন্য হয়ে যাওয়া ইত্যাদি দেখে প্রক্ষোভটি যে ভয়, সে বিষয়ে নিশ্চিত হন। তেমনি রাগ জাগে যখন শিশুর-আচরণে একটা প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হয় বা তাকে দেহিক ভাবে বাধাদান করা হয়। এই প্রক্ষোভের দৈহিক অভিব্যক্তি হ'ল কাঁদা, হাত পা ছোঁড়া, শরীর শক্ত হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। শিশুর মধ্যে আনন্দ জাগাতে পারে—শিশুকে আদর করা, তার গায়ে মৃদু ভাবে হাত বুলানো প্রভৃতি উদ্দীপক। এই প্রক্ষোভটির দৈহিক অভিব্যক্তি হ'ল হাসা, শিশুর কল-কাকলী, কোলে আসার জন্য হাত বাড়ানো বা পরম শান্তিতে চুপচাপ শুয়ে থাকা ইত্যাদি।

ওয়াটসনের এই মৌলিক প্রক্ষোভ ও তার দৈহিক অভিব্যক্তির কথা অনেক মনোবিজ্ঞানীই স্বীকার করেন না। শারম্যান এর সমালোচনা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন উদ্দীপকের প্রকৃতি জানা না থাকলে কেবলমাত্র দৈহিক অভিব্যক্তি দেখে কোন্‌টি রাগ, কোন্‌টি ভয় আর কোন্‌টি আনন্দ, তা ঠিক করা যায় না। ওয়াটসন উদ্দীপকের প্রকৃতি জানতেন, তাই তাঁর পক্ষে রাগ, ভয় বা আনন্দ পৃথক ভাবে বলা সম্ভব ছিল। পরবর্তী কালে শারম্যান একটি পরীক্ষণে ৩২জন গ্রাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রীকে বিভিন্ন শিশুর প্রক্ষোভ-জনিত দৈহিক অভিব্যক্তির ছবি দেখান, কিন্তু উদ্দীপকটি গোপন রাখা হয়। ঐ অভিব্যক্তি দেখে যখন প্রক্ষোভের প্রকৃতি অর্থাৎ রাগ না আনন্দ না ভয়, সে সম্বন্ধে তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হল, তখন দেখা গেল খুব কম ছাত্র ছাত্রীই সঠিক উত্তর দিতে পারছেন কাজেই নিছক দৈহিক প্রক্ষোভের স্বরূপ সম্বন্ধে মতামত দেওয়া অত্যন্ত কঠিন।

অনেক মনোবিজ্ঞানী একটিমাত্র প্রাথমিক প্রক্ষোভের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন আরউইন এটির নাম দিয়েছেন **সামগ্রিক সক্রিয়তা**। ব্রিজেসের মতে শিশুর এই মৌলিক প্রক্ষোভটিকে বলা যেতে পারে **সাধারণ উত্তেজনা**। শিশু প্রক্ষোভজাত আচরণ সম্পন্ন করার মত একটা সুপ্ত ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে ঠিকই কিন্তু তার জন্মের প্রথম দিনগুলিতে তার আচরণগুলি এত সাধারণ প্রকৃতির থাকে যে সেগুলি দেখে তার প্রক্ষোভের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু ব্যাখ্যা করতে পারি না। শিশুর বয়স যত বাড়তে থাকে, ততই এই সাধারণ উত্তেজনাটি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। এগুলিকে প্রক্ষোভের **বিশেষায়ণ** বলে। গুড্‌এনাফের একটি পরীক্ষণ থেকে জানা যায়—দশমাস বয়সের একটি শিশুর মুখের বিভিন্ন ভাবভঙ্গী দেখে বিভিন্ন প্রক্ষোভের অস্তিত্ব ও প্রকাশ সম্বন্ধে একটা অনুমান করা যায়।

আমেরিকার শিশু মনোবিজ্ঞানী ক্যাথারিন ব্রিজেস একটি শিশুভবনে নবজাতক থেকে শুরু করে দু'বছর বয়সের শিশুর প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া ও দৈহিক অভিব্যক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তিনি বলেন বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভগুলি বিশেষায়িত হতে থাকে, তাদের তীব্র ও উগ্র প্রতিক্রিয়া ক্ষীণ হতে থাকে ও বিশেষ বিশেষ উদ্দীপকের দ্বারা সৃষ্ট প্রক্ষোভগুলি সুনির্দিষ্ট একটা আকার ধারণ করতে থাকে। তাঁর এই গবেষণা চিত্ররূপটি হ'ল এই জাতীয়—

JOHN B. WATSON

1878—

সাধারণ উত্তেজনা..............জন্মের সময়

.........৩ মাসে

আনন্দ — অস্বাচ্ছন্দ্য

রাগ.........৪ মাসে

বিরক্তি........৫ মাসে

উচ্ছ্বাস..............................ভয়..........৬ মাসে

ভালবাসা (বড়দের প্রতি) ... ...১০ মাসে

ভালবাসা (ছোটদের প্রতি) ......হিংসা... ...১৫ মাসে

এর থেকে দেখা যাচ্ছে তিন মাস বয়স থেকেই শিশুর প্রক্ষোভ বিশেষায়িত হতে শুরু করে। তিন মাস বয়সে সাধারণ উত্তেজনা থেকে দু'টি বিভিন্ন প্রকৃতির প্রক্ষোভ সৃষ্ট হয়—আনন্দ ও অস্বাচ্ছন্দ্য। চার মাস বয়সে অস্বাচ্ছন্দ্য বিশেষায়িত হয় রাগে, পাঁচ মাসে বিরক্তিতে, আর ছয় মাসে ভয়ে। আনন্দ বিশেষায়িত হচ্ছে উচ্ছ্বাসে— ছয় মাস বয়সেই। এর পর একটু বেশী সময় দরকার হচ্ছে। দশ মাসে আনন্দ বিশেষায়িত হচ্ছে বড়দের প্রতি ভালোবাসাতে আর পনর মাসে— ছোটদের প্রতি ভালোবাসাতে। ঐ পনর মাসে আবার অস্বাচ্ছন্দ্য থেকে দেখা দিচ্ছে হিংসা।

শিশুর মধ্যে প্রথম যে প্রক্ষোভমূলক আচরণটি সুনির্দিষ্ট ভাবে দেখা যায়—তা হ'ল পরিচিত মুখ দেখে হাসা। প্রথমে তার এই হাসিটি থাকে নীরব হাসি, পরে তা পরিণত হয় সরব হাসিতে। গেসেলের একটি পরীক্ষণ থেকে জানা যায়, মাত্র এক মাস বয়স থেকেই শিশুর ক্ষুধা, রাগ, ব্যথা প্রভৃতি দ্বারা সৃষ্ট কান্নার পার্থক্য বোঝা যায়।

অনেকের ধারণা প্রক্ষোভের দৈহিক অভিব্যক্তি অনুকরণ ও শিখনের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু গুডএনাফের একটি পরীক্ষণ থেকে জানা গেছে এ ধারণা ভুল। তিনি একটি কালা ও অন্ধ মেয়ের উপর এই পরীক্ষা চালান। মেয়েটির পক্ষে কোন প্রকার আচরণ দেখা বা কোন কথাবার্তা শোনা সম্ভব ছিল না

কিন্তু প্রক্ষোভের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে সে একেবারে স্বাভাবিক মানুষের মতই ছিল। কাজেই বলা যেতে পারে, প্রক্ষোভ-সঞ্জাত আচরণ পরিশমনের উপরই বেশী নির্ভরশীল।

শিশুর প্রক্ষোভমূলক আচরণগুলি যত বিশেষায়িত হতে থাকে, প্রক্ষোভের প্রকাশ ততই সুসংহত ও সুনির্দিষ্ট হতে থাকে। শিশু বড় হলে তার অনুভূতি বোধটি সুস্পষ্ট হয়, তার অভিজ্ঞতা হয় বহুমুখী, তার কল্পন ও চিন্তন-শক্তি বিকশিত হয় ও সবচেয়ে বড় কথা—সে সামাজিক বোধ সম্পন্ন হয়। ফলে তার বাহ্যিক অভিব্যক্তির মধ্যেও একটা পরিবর্তন আসে। ছোটদের প্রাক্ষোভিক অভিব্যক্তির কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন—

★ **পুনরাবৃত্তি :** বিভিন্ন প্রক্ষোভ বার বার তার মধ্যে দেখা যায় বর্ষার মেঘের মত। সে সারাদিনে কতবার রাগ করে, কতবার আনন্দিত হয়, আর কতবার যে ভয় পায়, তার হিসেব রাখা শক্ত।

★ **দ্বৈততা :** ছোটদের প্রক্ষোভে দ্বৈততা একটি বড় বৈশিষ্ট্য। এই দু' বন্ধু বা দু'ভাই প্রাণ খুলে খেলা করছে ; হঠাৎ লেগে গেল চুলোচুলি। সকালে দু'বান্ধবীর মধ্যে এমন 'আড়ি' হ'ল—মনে হ'ল সারাজীবন বোধ হয় আর কেউ কারো মুখই দেখবে না। বিকেলে দেখা গেল, দু'জনে আবার হরিহর আত্মা হয়ে গেছে। ক্ষণ মেঘ, ক্ষণ রৌদ্রের অবস্থা আর কি !

★ **মাত্রাবোধের অভাব :** প্রক্ষোভের অভিব্যক্তি কতটুকু হবে, সে বিষয়ে তারা সচেতন নয়। সামান্যতম কারণে হো হো করে হাসা বা অতিমাত্রায় কাঁদা এটা শিশুদের ক্ষেত্রেই সম্ভব।

★ **প্রকাশ :** ছোটরা প্রক্ষোভ চেপে বা ধরে রাখে না। রাগ হ'লে কান্নাকাটি করে বা আক্রমণ করে। ভয় হলেও কান্নাকাটি করে, আনন্দ হ'লে হেসে নেচে গেয়ে তারা প্রক্ষোভটি প্রকাশ করে দেয়। তাই তো তাদের মনের বোঝা কম, তারা বড়দের চেয়ে কত সুখী !

প্রাথমিক ও মিশ্র প্রক্ষোভ (Primary and Secondary Emotions) : ম্যাক্‌ডুগাল প্রক্ষোভকে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন —প্রাথমিক ও মিশ্র। তাঁর মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থলে একটি করে প্রক্ষোভ থাকবেই। মানুষের ক্ষেত্রে এইরূপ সহজাত প্রবৃত্তির সংখ্যা ১৭টি বলে তার সহগামী প্রক্ষোভের সংখ্যাও ১৭টি। এই ১৭টি প্রক্ষোভকে তিনি প্রাথমিক প্রক্ষোভ আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এই প্রাথমিক প্রক্ষোভগুলি আবার নিজেদের

মিশ্রণে কোন নতুন আবেগ সৃষ্টি করতে পারে। এই নতুন আবেগটি নিজে মৌলিক নয় কিন্তু মৌলিক আবেগের সমন্বয়ে সৃষ্ট। যেমন ম্যাক্‌ডুগালের মতে, কৃতজ্ঞতা হ'ল মমতা ও হীনমন্যতার সমন্বয়, প্রশংসা হ'ল বিস্ময় ও হীনমন্যতা, ঘৃণা হ'ল ক্রোধ, বিরক্তি ও ভয়, লজ্জা হ'ল—হীনমন্যতা ও আত্মগরিমার সমন্বয়।

আমাদের মধ্যে নানা মিশ্র আবেগের বা প্রক্ষোভের আনাগোনা রয়েছে। কিন্তু ম্যাক্‌ডুগাল যেভাবে মিশ্র প্রক্ষোভগুলির বর্ণনা দিয়েছেন বা সেগুলিকে যে ভাবে কতকগুলি মৌলিক প্রক্ষোভের সমন্বয় বলে বর্ণনা করেছেন তা অত্যন্ত অন্যায় ভাবে সরলীকৃত (over simplified) করা হয়েছে। অনেক মনোবিজ্ঞানীই মিশ্র প্রক্ষোভের এ জাতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন না। তাছাড়া ম্যাক্‌ডুগাল যেগুলিকে মৌলিক বা প্রাথমিক প্রক্ষোভ বলছেন সেগুলি সত্যই মৌলিক কি না, সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। অনেকে তো মৌলিক প্রক্ষোভ বলতে কেবল ভয়, রাগ ও আনন্দ এই তিনটিকেই ধরে থাকেন। বিখ্যাত দার্শনিক ডেকার্টে (Descartes) মনে করেন যে, মৌলিক প্রক্ষোভ মাত্র ছ'টি—বিস্ময়, ভালবাসা, কামনা, ঘৃণা, আনন্দ ও দুঃখ। ওয়াটসনের মতে তিনটি। আবার আর একদল মনোবিজ্ঞানী বলেন, যেহেতু সমস্ত প্রক্ষোভের মূলে আছে এক জাতীয় সাধারণ উত্তেজনা, অতএব প্রক্ষোভ মূলতঃ একটিই—একাধিক নয়। দৈনন্দিন জীবনে অবশ্য আমরা একসঙ্গে একাধিক প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি অনুভব করে থাকি। সুখ-দুঃখ, রাগ-আনন্দ, ভয়-ভালোবাসা ইত্যাদি অনেক প্রক্ষোভ একসঙ্গে ঘটতে পারে। কিন্তু যে প্রক্ষোভের মাত্রাটি বেশী থাকে, আমরা তারই অধীনস্থ হয়ে তদনুরূপ অভিব্যক্তি প্রকাশ করি।

প্রক্ষোভের নিয়ন্ত্রণ (Emotional Control): শিক্ষাক্ষেত্রে আবেগের বা প্রক্ষোভের মূল্য অপরিসীম। প্রক্ষোভগুলিকে ঠিক পথে পরিচালিত করলে যেমন সুফল পাওয়া যায়, সুপরিচালনার অভাবে তেমনি এর কুফলদায়ক দিকটিও কম ক্ষতিকর নয়। এইজন্য শিক্ষাক্ষেত্রে এবং জীবনের ক্ষেত্রেও প্রক্ষোভগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত করা প্রয়োজন। আমরা মস্তিষ্ক দিয়ে যে জ্ঞান অর্জন করি ও হৃদয় দিয়ে যা অনুভব করি—এই দুটি দিক অর্থাৎ জ্ঞানমূলক দিক ও অনুভূতিমূলক দিকের মধ্যে যখন পুরোপুরি সমতা রক্ষিত হয় তখনই মনকে সুস্থ ও স্বাভাবিক মন বলা যেতে পারে। এই সমতা

রক্ষা করার জন্যও প্রক্ষোভমূলক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। প্রক্ষোভগুলি যদি ঠিকমত স্বাভাবিক পথে বিকশিত হ'তে না পারে, তাহ'লে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশও যথাযথ ভাবে হয় না। এই সমস্ত শিশু শেষ পর্যন্ত প্রতিযোজন করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশুতে পরিণত হয়। কাজেই শৈশব থেকেই শিশুর আবেগগুলির সুপরিচালনা ও সুনিয়ন্ত্রণ বাঞ্ছনীয়।

সাধারণতঃ যে সমস্ত কারণগুলির জন্য শিশুর স্বাভাবিক প্রাক্ষোভিক বিকাশ ও অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেগুলি হল—**শিশুর উপর তার বংশগতির প্রভাব, প্রক্ষোভঘটিত নিরাপত্তার অভাব, অর্থনৈতিক বৈষম্য, পাঠ-দানের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি,শৃঙ্খলা সম্বন্ধে অতি প্রাচীন ও নিপীড়নমূলক ধারণা, অতিরিক্ত ভয়, শিক্ষকের ত্রুটিপুর্ণ আচরণ, বিদ্যালয়ের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অস্বাস্থ্যকর সামাজিক পরিবেশ, বিদ্যালয়ে সহ-পাঠক্রমিক কার্যের অভাব, কুসঙ্গীর প্রভাব ইত্যাদি।**

শিক্ষকের পক্ষে সবগুলি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যতগুলি উপাদান বা কারণ তাঁর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে, সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করতে হবে। তাঁকে মনে রাখতে হবে, শিশু একটি সমগ্র শিশু হিসেবে বিদ্যালয়ে এসেছে। তার পরিচালনাও সামগ্রিক ভাবে করতে হবে। তার বিদ্যা-বুদ্ধির দিকটা উন্নত করে যদি প্রাক্ষোভিক দিকটি অনুন্নত রাখা যায় তাহ'লে তার বিকাশটি সুসম্পূর্ণ হ'ল না। তাকে সব দিক দিয়ে 'মানুষ' করে গড়ে তুলতে হবে।

শিক্ষককে প্রথমে তাঁর নিজের প্রক্ষোভগুলিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে। শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন জাতীয় ছাত্রছাত্রী থাকে। শিক্ষককে সামান্য কথায় দারুণ রেগে গেলে বা ভীষণ উচ্ছ্বসিত হলে চলবে না। তাঁর প্রাক্ষোভিক আচরণটিই ছাত্রছাত্রীদের সামনে আদর্শ হিসেবে খাড়া করতে হবে। তেমনি শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে কঠোর নিপীড়নমূলক মনোভাবও অচল। শিক্ষক যেন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁর নিজের দোষ-ত্রুটি অন্যের উপর আরোপ করার চেষ্টা না করেন। এতে শিশুরা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে যায়। শিশুদের প্রক্ষোভগুলি ব্যক্তিগত ভাবে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। তাদের প্রক্ষোভগুলি যাতে ঠিকমত প্রকাশিত হতে পারে—এর জন্য তাদের উপযুক্ত সুযোগ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, শিশুমনের আবেগ বিচার করার কোন সাধারণ সূত্র বা নিয়ম নেই। বিভিন্ন মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে শিশুদের প্রক্ষোভ প্রকাশিত হবার সুযোগ দিতে হবে। উচ্চ ভাবাদর্শ বা জীবনাদর্শ এখানে অচল। দৈহিক কারণের জন্য কোন প্রকার

প্রাক্ষোভিক আলোড়ন ঘটলে শিক্ষককে ধীর স্থির ভাবে তার সমাধান করতে হবে। তেমনি অনেক শিশুকেই বাড়ীতে বা বিদ্যালয়ে অতি আদর বা অতি যত্নে পুতুপুতু করে মানুষ করা হয়। এরা আত্মবিশ্বাসটি হারিয়ে ফেলে। প্রতি ক্ষেত্রে অপরের সাহায্য না নিলে তারা কোন কাজই করতে পারে না। তেমনি মেলামেশা করার অবাধ সুযোগ না পাওয়ার জন্য অনেক শিশু অসামাজিক প্রকৃতির হয়ে ওঠে। বাঞ্ছিত প্রক্ষোভের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য শিক্ষককে শিশুর পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয়টি হবে তার নিকট একাধারে পরিবার ও সমাজ। বিদ্যালয় যদি প্রক্ষোভের বিকাশ ও পরিচালনের ক্ষেত্রে শিশুকে ঠিক মত সাহায্য করতে না পারে তবে বৃহত্তর জীবনে সে শিশু প্রাক্ষোভিক দিক থেকে অপসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করবে। শিশুর জীবনের আদর্শ কি হবে—সে সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। প্রাক্ষোভিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শিক্ষককে শিশুর মধ্যে তিনটি গুণের পরিপূর্ণ বিকাশের কথা ভাবতে হবে। সে তিনটি গুণ হ'ল—**আত্মবিশ্বাস, আত্ম-নির্ভরশীলতা ও সামাজিকতা**। পরিশেষে আর একটি কথা বলে বক্তব্য শেষ করি। প্রক্ষোভের উপযুক্ত পরিচালনের ক্ষেত্রে স্নেহ ও প্রীতির বন্ধন অত্যন্ত কার্যকরী। যে শিক্ষক শিশুদের ভালোবাসতে জানেন ও পারেন, তাঁর পক্ষে প্রাক্ষোভিক পরিচালনা যেমন সহজ, তেমনি কার্যকরী হয়। শিশুরা কি রকম শিক্ষক পছন্দ করে? অত্যন্ত জ্ঞানী ও পণ্ডিত, কিন্তু শিশুদের ভালোবাসেন না—এমন শিক্ষককে, না পাণ্ডিত্য বা জ্ঞান আগের জনের চেয়ে কম, কিন্তু শিশুদের ভালোবাসেন, এমন শিক্ষককে? বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে—দ্বিতীয় জনকেই শিশুরা বেশী ভালোবাসে। আবার শিশুরা যাকে ভালোবাসে, তাকেই তো অনুকরণ করে। কাজেই এ রকম শিক্ষক নিজে যদি প্রাক্ষোভিক দিক থেকে আদর্শ শিক্ষক হন, তাহ'লে তাঁকে আর সুপরিচালনার জন্য চেষ্টা করতে হবে না—শিশুরা নিজের থেকেই সচেষ্ট হবে। প্রাক্ষোভিক শিক্ষা শ্রেণীকক্ষে দেওয়া যায় না, উপযুক্ত সময়ে ও পরিবেশে ধরিয়ে দিতে হয় মাত্র (Emotions cannot be taught, they should be caught)।

প্রক্ষোভ ও শিক্ষা (Emotion and Education) : আগেই বলা হয়েছে প্রক্ষোভ হ'ল শিক্ষার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রকৃতির দিক দিয়ে প্রক্ষোভ ও শিক্ষা বিপরীতধর্মী। প্রক্ষোভ হ'ল অনুভূতিমূলক আর শিক্ষা হ'ল জ্ঞানমূলক। কিন্তু তাহ'লেও এই দুটির মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও পারস্পরিক একটা

সম্পর্ক আছে।) বিশেষ কোন অনুভূতি ছাড়া কোন জ্ঞান অর্জিত হতে পারে না। মানুষ চিন্তাশীল জীব ঠিকই, কিন্তু মানবজীবনের সমস্ত আচরণ ও কাজকর্ম কেবলমাত্র চিন্তাশক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় না। বরং বলা যেতে পারে প্রক্ষোভ-গুলিই সব কাজের পেছনে শক্তি জোগায়। ম্যাকডুগালের মতে,—প্রতিটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থলে যে ইচ্ছামূলক ও অনুভূতিমূলক শক্তি বিদ্যমান রয়েছে—সেইটিই তো প্রক্ষোভ।

(শিক্ষাদানকালে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ভাবে অবহিত হতে হবে।) প্রক্ষোভের নিয়ন্ত্রণ অংশে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যাই হোক্ এখন শিক্ষার উপর প্রক্ষোভের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্।

(প্রক্ষোভগুলিকে আমরা প্রধানতঃ দু'টি ভাগে ভাগ করে থাকি। একভাগে থাকছে রাগ, ভয়, হীনমন্যতাবোধ, বিরক্তি ইত্যাদি প্রক্ষোভ যেগুলি সুষ্ঠু শিখনের প্রতিকূল বলেই ধরে নেওয়া হয়। আর এক ভাগে রয়েছে আনন্দ, বিস্ময়, কৌতূহল ইত্যাদি শিক্ষা-সহায়ক অনুকূল প্রক্ষোভ। আধুনিক শিক্ষাকে বলা হয়েছে—জীবন-ভিত্তিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। শিক্ষাকে জীবন-ভিত্তিক করতে হ'লে প্রক্ষোভের সঙ্গে শিক্ষাকে মিশিয়ে দিতে হবে।) শিশু মন যদি ভয়, বিরক্তি, দুঃখ বা হীনমন্যতাবোধে ভারাক্রান্ত থাকে, সহপাঠি ও শিক্ষকের সঙ্গে তার সম্পর্কটি যদি সহজ ও প্রীতির সম্পর্ক না হয়, বিদ্যালয় পরিবেশটি যদি তার গৃহ-পরিবেশের মত স্বাভাবিক ও আনন্দময় না হয়, তাহ'লে শিশুর শিক্ষা ব্যাহত হতে বাধ্য। পক্ষান্তরে আনন্দ, বিস্ময়, কৌতূহল, আত্ম-প্রতিষ্ঠা-লাভেচ্ছা, আত্ম-গরিমা প্রভৃতি শিশুর শিক্ষাকার্যে সহায়ক। শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে, শিক্ষা-দান কালে যেন শিশুর মধ্যে কোন প্রতিকূল প্রক্ষোভের সৃষ্টি না হয় এবং অনুকূল প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। (শিক্ষা যাতে প্রক্ষোভধর্মী হয়, সেইজন্য শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পাঠক্রম নির্ধারণ করার সময় শিশুর প্রক্ষোভের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশু যে বিষয়টি শিখতে চলেছে তার প্রতি যাতে সহজেই তার অনুরাগ, আনন্দ, কৌতূহল বা বিস্ময় সঞ্চারিত হতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।) শিশুমন স্বাভাবিক ভাবেই কৌতূহলপ্রবণ। কাজেই কৌতূহলকে অহেতুক মনে করে শিশুকে তিরস্কৃত করা শিক্ষকের পক্ষে উচিত হবে না। শিশুর সাফল্যে তাকে উৎসাহিত করা ভালো, সন্দেহ নেই; কিন্তু তার অসাফল্যের জন্য তাকে তিরস্কৃত করা ততটা ভালো নয়। সামান্য অসাফল্যের জন্য শিশু তিরস্কৃত হলে সে ক্রমশঃ বিরক্ত হয়ে পড়ে এবং পরে শিক্ষককে, শিক্ষণীয় বিষয়কে এমন কি বিদ্যালয়কেও

এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতে পারে। এটা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে খুবই ক্ষতিকর।

কিছু কিছু প্রতিকূল প্রক্ষোভ আবার শিক্ষাক্ষেত্রে সহায়কও হতে পারে। অসাফল্যের জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে রাগের সঞ্চার হ'লে, তাহ'লে সে কঠোর কর্ম-প্রবণ ও অধ্যবসায়ী হয়ে উঠতে পারে। হীনমন্যতা বোধটি বেশী মাত্রায় জাগরিত হলে শিক্ষার্থী আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য সচেষ্ট হতে পারে। প্রতিকূল প্রক্ষোভ স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় অনুকূল হ'লে হতেও পারে—হবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তবে এই সমস্ত প্রক্ষোভ সাধারণভাবে শিক্ষা সহায়ক নয় বলে শিক্ষাদান কালে শিক্ষার্থীকে এগুলি থেকে মুক্ত রাখাই বাঞ্ছনীয়।

আবার আবেগের বা প্রক্ষোভের মাত্রা যদি তীব্র হয় অর্থাৎ স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তাহ'লে অনুকূল হ'লেও সে প্রক্ষোভ শিক্ষাকে ব্যাহত করবে। কৌতূহল, আনন্দ, বিস্ময় প্রভৃতি অনুকূল প্রক্ষোভ তীব্র হ'লে মনোযোগ, স্মরণ করা ইত্যাদি লক্ষ্যণীয় ভাবে ব্যাহত হয়। আর প্রতিকূল প্রক্ষোভ তীব্র হ'লে তো কথাই নেই। প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধ যে বিস্মরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তা তো আগেই আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রক্ষোভগুলির বিকাশ যথাযথ ও সীমিত করতে হবে। প্রক্ষোভের তীব্রতাকে সংহত করতে হবে। শ্রেণীকক্ষে তীব্র প্রক্ষোভ দেখা দিলে শিক্ষককে কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

শিশুর মধ্যে যদি কোন অবাঞ্ছিত প্রক্ষোভ দেখা যায়, তাহ'লে মনোবিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে সেটি দূর করে তার মধ্যে বাঞ্ছিত প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে হবে। এর জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে যেমন সুপরিচালনের মাধ্যমে প্রক্ষোভের প্রকাশ (Re-direction), উন্নীতকরণ (Sublimation), বিরেচন (Catharsis), অবদমন (Repression), নিরুদ্ধকরণ (Inhibition), কোন মানসিক বৃত্তি (Mental occupation) ইত্যাদি। তবে উন্নীতকরণের মাধ্যমে শিশু মনে শিক্ষা ও জীবনক্ষেত্রে সহায়ক নানাপ্রকার সেন্টিমেন্টের সৃষ্টি হতে পারে। তেমনি অবদমনের মাধ্যমে তার মনে নানাপ্রকার জট ও বিকৃতির সৃষ্টি হতে পারে।

যাই হোক প্রক্ষোভের উপযুক্ত বিকাশ সাধনের ও শিক্ষা সু-সম্পাদনের জন্য আমাদের তিনটি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে—

(১) যে সমস্ত প্রক্ষোভ শিক্ষা সহায়ক বা শিক্ষাক্ষেত্রে অনুকূল বলে মনে

করা হয় অর্থাৎ আনন্দ, বিস্ময়, কৌতূহল ইত্যাদি সেই সমস্ত প্রক্ষোভ যাতে শিক্ষাদান কালে শিশুর মধ্যে জাগ্রত হয়, সেদিকে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন।

(২) প্রতিকূল প্রক্ষোভ যেমন রাগ, ভয়, বিরক্তি ইত্যাদি যাতে শিশুর মধ্যে শিক্ষাদানকালে জাগ্রত না হয়, সেদিকেও শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৩) প্রক্ষোভ অনুকূলই হোক আর প্রতিকূলই হোক তার মাত্রা যেন সীমা ছাড়িয়ে না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ওয়াটসন্ (Watson) তো বলেন যে প্রক্ষোভগুলিকে অনুবর্তিত ও অপানুবর্তিত করাও সম্ভব। পরিবেশের জন্যই প্রক্ষোভ সৃষ্ট হয় এবং অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সেই প্রক্ষোভ শিশু মনে সঞ্চারিত হয়। এখন যদি দেখা যায় এইভাবে কোন অবাঞ্ছিত প্রক্ষোভ সৃষ্ট হয়েছে তাহ'লে অপানুবর্তন ও পুনরুপস্থাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই অবাঞ্ছিত প্রক্ষোভটি দূর করে তার জায়গায় একটি বাঞ্ছিত প্রক্ষোভ সৃষ্ট করতে হবে।

রস

(Sentiment)

[The general name of all the feelings—**Ribot**.

The feeling of highly developed abstract ideas—**Ancient view**.

The permanent emotive condition of a higher degree of development having an object or idea in the centre—**Shand**.

The tendency to feel a sort of emotion around certain objects, persons or ideas can be called sentiment—**Mc. Dougall.**

The sentiment is a permanent part of ourselves, while the emotion or the feeling is merely a passing experience—**Ross.**

An emotional disposition, centring round the idea of an object, not an experience, but part of an individual's make-up.

—**Dictionary of Psychology**].

সেন্টিমেন্ট বা রস কাকে বলে ? সেন্টিমেন্ট বা রস শব্দটি বহুল প্রচলিত এবং বিভিন্ন অর্থে আমরা এটিকে ব্যবহার করে থাকি। যে সমস্ত অর্থে আমরা শব্দটি ব্যবহার করে থাকি, সেগুলি সবগুলিই যে মনোবিজ্ঞানসম্মত, তা নয়। তবু দেখা যাক্ সাধারণতঃ কি কি অর্থে আমরা শব্দটি ব্যবহার করে থাকি।

প্রথমতঃ, কোন কোমল অনুভূতি বা প্রক্ষোভ বোঝাতে আমরা 'রস' শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। দ্বিতীয়তঃ, কোন প্রকার কোমল অনুভূতি বা প্রক্ষোভ অনুভব করার স্থায়ী প্রবণতাটিকেও 'রস' অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন, আমরা বলি—মহিলারা স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ (sentimental); কিংবা খুব অল্পে যারা কাতর হয়ে পড়ে, তাদেরও বলি sentimental। তৃতীয়তঃ, রস বলতে প্রক্ষোভমূলক ধাত বা মেজাজও বুঝিয়ে থাকে। চতুর্থতঃ, রস বলতে কোন অমূর্ত প্রক্ষোভ (abstract emotion)-কেও আমরা বুঝিয়ে থাকি। পঞ্চমতঃ, রস বলতে এই জাতীয় অমূর্ত প্রক্ষোভ অনুভব করার ধাত বা প্রবণতাটিকেও বুঝিয়ে থাকি। আবার রস বলতে অমূর্ত কোন প্রক্ষোভ এবং এই প্রক্ষোভ অনুভব করার, ধাত, মেজাজ বা প্রবণতা—উভয়কেই বুঝিয়ে থাকি।

যাই হোক্ লোকে বিভিন্ন ভাবে রসের ব্যাখ্যা করলেও এর প্রচলিত সংজ্ঞা প্রথম দেন স্যাণ্ড (Shand)। তাঁর মতে কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে যখন কোনও একটি বিশেষ প্রক্ষোভ ব্যক্তির মধ্যে একটি সুসংহত সংগঠনের সৃষ্টি করে তখন তাকে সেন্টিমেন্ট বা রস বলে। ব্যক্তিমাত্রেই জন্মগ্রহণ করে

কতকগুলি সহজাত প্রবণতা বা প্রবৃত্তি নিয়ে এবং তার প্রাথমিক আচরণগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় এই প্রবৃত্তিগুলির দ্বারাই। কিন্তু সে যত বড় হতে থাকে, পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এই প্রবৃত্তিগুলি ততই পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রথম দিকে এই প্রবৃত্তিগুলি থাকে বিচ্ছিন্ন, অসংহত ও অনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু ক্রমেই সেগুলি সুসংহত ও নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। সেন্টিমেন্ট হ'ল—প্রক্ষোভমূলক প্রবণতাগুলির একটা সুসংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত রূপ।

ভালবাসা হ'ল একটি প্রক্ষোভ। প্রথম দিকে শিশু অনেক জিনিসকেই ভালোবাসে। অর্থাৎ তার ভালবাসারূপ প্রক্ষোভটি অসংহত ও অনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু যখন এই প্রক্ষোভটিই কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে একটা সুসংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত রূপ ধারণ করে—তখন রস সৃষ্টি হয়। যেমন আমাদের জন্মভূমি, মাতৃভাষা, জাতীয় সংগীত, জাতীয় পোশাক বা জাতীয় নেতাকে কেন্দ্র করে এই ভালবাসার প্রক্ষোভটি সুসংহত ও সুসংগঠিত হতে পারে আর তা থেকেই আমাদের মধ্যে দেখা দেবে ভালবাসার সেন্টিমেন্টটি। তেমনি, কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে ঘৃণা বা রাগ সুসংগঠিত হলে দেখা দেবে ঘৃণার বা রাগের সেন্টিমেন্ট। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সেন্টিমেন্ট সহজাত নয় অর্জিত। এই সেন্টিমেন্ট আমরা জন্মসূত্রে লাভ করি না নিজেরাই সৃষ্টি করি।

সেন্টিমেন্ট ও প্রক্ষোভ (Sentiment and Emotion) : অনেক সময় আমরা রস ও প্রক্ষোভকে প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুটির মধ্যে বেশ কিছু প্রভেদ আছে। রসের সৃষ্টি প্রক্ষোভ থেকেই, কিন্তু প্রক্ষোভই রস নয়। দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অবশ্য একথা ঠিক যে রস মাত্রেই প্রক্ষোভের উপর নির্ভরশীল এবং প্রক্ষোভ না জাগলে রস সৃষ্টি হতেই পারে না। প্রত্যেকটি রসই বিশেষ বিশেষ প্রক্ষোভের উপর নির্ভরশীল। এখন দেখা যাক্ কোন্ কোন্ দিক থেকে রস ও প্রক্ষোভের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে—

প্রথমেই বলা যেতে পারে প্রক্ষোভগুলি সহজাত, কিন্তু রস অর্জিত। ম্যাক্‌ডুগালের মতে প্রত্যেক সহজাত প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থলে একটি করে প্রক্ষোভ থাকবেই। কিন্তু এই সহজাত প্রক্ষোভগুলিকে সুসংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করে আমরা রস সৃষ্টি করে নিই। এটি হ'ল মনের একটি অর্জিত সংগঠন।

দ্বিতীয়তঃ, প্রক্ষোভ হ'ল এক জাতীয় সাময়িক ও ক্ষণিক মানসিক অভিজ্ঞতা কিন্তু রস হ'ল একটি স্থায়ী মানসিক সংগঠন। প্রক্ষোভের বিষয়বস্তু

পরিবর্তিত হতে পারে কিন্তু যে বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে রস গড়ে ওঠে তার পরিবর্তন হয় না।

তৃতীয়তঃ, একটি প্রক্ষোভ থেকে মাত্র একজাতীয় রস সৃষ্টি হতে পারে। যেমন ভালবাসা বা ঘৃণার প্রক্ষোভ থেকে ভালবাসা বা ঘৃণার রসেরই সৃষ্টি হয়। কিন্তু একটি রস থেকে একাধিক প্রক্ষোভ জাগ্রত হতে পারে। যেমন, দেশকে ভালোবাসা একটি সেন্টিমেন্ট বা রস। কিন্তু এই রস থেকে একাধিক প্রক্ষোভ জাগতে পারে, যেমন, দেশকে ভালোবাসা, দেশদ্রোহীকে ঘৃণা করা, দেশের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন বা আক্রমণকারী ব্যক্তি বা জাতির প্রতি ভয়, রাগ, ঘৃণা ইত্যাদি।

চতুর্থতঃ, প্রক্ষোভ আমাদের উত্তেজিত করে, কিন্তু রস আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। অর্থাৎ প্রক্ষোভ উত্তেজনাধর্মী, কিন্তু রস প্রশমনধর্মী।

পঞ্চমতঃ, প্রক্ষোভ জাগরণের জন্য কেবলমাত্র প্রবৃত্তির প্রয়োজন ; কিন্তু রস সৃষ্টির জন্য প্রত্যক্ষভাবে প্রক্ষোভ ও পরোক্ষ ভাবে প্রবৃত্তিরও প্রয়োজন।

ষষ্ঠতঃ, সাধারণতঃ প্রক্ষোভের সঙ্গে একটি বাহ্যিক বা দৈহিক অভিব্যক্তি দেখা যায় ; কিন্তু রসের সঙ্গে সে জাতীয় দৈহিক অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় না। অর্থাৎ প্রক্ষোভের অভিব্যক্তি দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ হতে পারে, কিন্তু রস প্রধানতঃ মানসিক-অভিব্যক্তি-নির্ভর।

সেন্টিমেন্ট ও প্রবৃত্তি (Sentiment and Instinct) : সেন্টিমেন্ট ও প্রবৃত্তি দুটিই মানব-আচরণের নিয়ন্ত্রক রূপে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করে থাকে। প্রবৃত্তিগুলি হ'ল—মানুষের সহজাত ভাবে আচরণ করার প্রবণতা। অবশ্য প্রবৃত্তিগুলি একা কাজ করে না, এর সঙ্গে সহগামী প্রক্ষোভগুলিও থাকে। প্রথম দিকে এই প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভগুলি অসংহত ও অনিয়ন্ত্রিত থাকলেও পরবর্তিকালে এগুলি সুসংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় এবং প্রক্ষোভের সুসংগঠনের ফলেই ব্যক্তির মধ্যে রস সৃষ্টি হয়। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে—

প্রবৃত্তি → প্রক্ষোভ → সেন্টিমেন্ট বা রস।

প্রক্ষোভের সঙ্গে রসের যেমন কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য আছে—প্রবৃত্তির সঙ্গেও রসের তেমনি কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রধান প্রধান পার্থক্য-গুলি হ'ল—

[এক] প্রবৃত্তি সহজাত বা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত, কিন্তু রস হ'ল অর্জিত।

[দুই] প্রবৃত্তিগুলি শিশুর সহজ, সরল ও প্রাথমিক আচরণগুলি নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু রস ব্যক্তির উন্নততর ও অর্জিত আচরণগুলি নিয়ন্ত্রণ করে।

[তিন] প্রবৃত্তিমূলক আচরণে চিন্তন ও বিচার করণের কোন সুযোগ থাকে না, কিন্তু রস সৃষ্টির সময় আমরা চিন্তন ও বিচারকরণ ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করি।

[চার] প্রবৃত্তিগুলি তাদের আদিম রূপেই থেকে যায়, কিন্তু রসকে বলা যেতে পারে প্রবৃত্তি তথা প্রক্ষোভের একটা সুমার্জিত ও সুসংস্কৃত রূপ।

[পাঁচ] প্রবৃত্তির কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে না। কিন্তু প্রত্যেক রসের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে।

[ছয়] প্রবৃত্তিমূলক আচরণে কোন পূর্ব পরিকল্পিত আদর্শ বা ধারণার স্থান নেই। কিন্তু রস পূর্ব পরিকল্পিত কোন আদর্শ বা ধারণার উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে।

[সাত] প্রবৃত্তিগুলি হ'ল নীচুস্তরের একটা মানসিক সংগঠন বা সংলক্ষণ। কিন্তু রস হ'ল উচ্চস্তরের মানসিক সংগঠন।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যায় প্রবৃত্তি ও রস উভয়েই কিন্তু প্রক্ষোভের উপর নির্ভরশীল। এই প্রক্ষোভই উভয় ক্ষেত্রে প্রেরণা সঞ্চার করে। কোন একটি বিশেষ প্রক্ষোভ জাগরিত হ'লে তবেই প্রবৃত্তিটি কার্যকরী হয়। তেমনি কোন একটি প্রক্ষোভের দ্বারা নিষিক্ত না হ'লে রস সৃষ্টিও হতে পারে না।

রসের বৈশিষ্ট্য : রসের সংজ্ঞা থেকে এবং প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের সঙ্গে রসের পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করে এর কয়েকটি প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলি হল—

* রস সহজাত নয়, অর্জিত। ব্যক্তির নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ বা ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা অনুযায়ী রস সৃষ্ট হয়।
* রস হ'ল বিভিন্ন জাতীয় অনুভূতির একটা সংমিশ্রণ। অর্থাৎ অনুভূতি, প্রক্ষোভ, তাড়না (impulse) প্রভৃতি সুসংগঠিত হয়ে রসের সৃষ্টি হয়।
* কোন বিশেষ ব্যক্তি, বস্তু বা ধারণাকে কেন্দ্র করে রসের সৃষ্টি হয় এবং ব্যক্তির নিকট ঐ বিশেষ ব্যক্তি, বস্তু বা ধারণার একটা গুরুত্ব থাকে।
* ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে রসের প্রভাব যথেষ্ট।
* রস ব্যক্তির একটা স্থায়ী মানসিক সংগঠন।

সেন্টিমেন্ট ও কমপ্লেক্স (Sentiment and Complex) : সেন্টিমেন্ট ও কমপ্লেক্স দু'টিই মানসিক সত্তা বা প্রকৃতির দিক থেকে অভিন্ন। বলতে গেলে

একই জিনিসকে দু'টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার জন্য দু'টি নাম দেওয়া হয়েছে। প্রক্ষোভের সংগঠনে উভয়ের সৃষ্টি বা উদ্ভব। উভয়েই কোন ব্যক্তি, বস্তু বা ধারণাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট হয় এবং যখনই ঐ বিশেষ ব্যক্তি; বস্তু বা ধারণাটির উল্লেখ করা হয়, বা ঐ সম্বন্ধে চিন্তা করা হয় তখনই ব্যক্তির মধ্যে একটা প্রক্ষোভমূলক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এবং সে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আচরণ করতে আরম্ভ করে দেয়। কিন্তু তা হ'লেও দুটির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যথেষ্ট পার্থক্য আছে। যেমন—

* প্রক্ষোভ ও প্রবৃত্তির উন্নীতকরণের ফলে বাঞ্ছিত রসের সৃষ্টি করা হয়, কিন্তু ঐগুলির অবদমনের ফলে কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হয়।

* রস বাঞ্ছিত, কিন্তু কমপ্লেক্স অবাঞ্ছিত।

* ফ্রয়েডীয় সংব্যাখ্যান অনুযায়ী বলা যেতে পারে, রসের সৃষ্টি হয় ব্যক্তির চেতন মনে, কিন্তু কমপ্লেক্সের সৃষ্টি—ব্যক্তির নির্জ্ঞান মনে বা অবচেতনে—অবদমন প্রক্রিয়ার ফলে। কমপ্লেক্সের প্রভাবে পড়ে ব্যক্তি যখন কোনপ্রকার ব্যাখ্যা দিতে পারে না কিংবা যে ব্যাখ্যা সে দিয়ে থাকে, তা সঠিক নয় কষ্টকল্পিত। অর্থাৎ ব্যক্তি রস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ও চেতন থাকে, কিন্তু কমপ্লেক্স সম্বন্ধে সে অনবহিত ও অচেতন থাকে।

* রস হ'ল স্বাভাবিক, কিন্তু কমপ্লেক্স হ'ল অস্বাভাবিক। অহংসত্তার নিকট হতে পরিত্যক্ত হয়ে যখন কোন বাসনা-কামনা বা ইচ্ছা অচেতনে অবদমিত হয়, তখনই কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হয়।

* রস ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে কারণ এটি মনের সুসমন্বয়নের একটি প্রধান উপকরণ। কিন্তু কমপ্লেক্স মানসিক সংহতি নষ্ট করে মনের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করে বলে এটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। রসের মধ্যে আছে শৃঙ্খলা আর কমপ্লেক্সের মধ্যে বিশৃঙ্খলা।

কমপ্লেক্সের প্রকৃতি ও প্রকার : কমপ্লেক্স কি ও কিভাবে এর উদ্ভব হয় তা আমরা জানলাম। কমপ্লেক্সের প্রকৃতি সম্বন্ধেও কিছু কিছু জেনেছি। সেন্টিমেন্টের সঙ্গে কমপ্লেক্সের পার্থক্য কি, তাও জেনেছি। এখন দেখা যাক, কমপ্লেক্স কত প্রকারের হ'তে পারে। অনেকে কমপ্লেক্সকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করেছেন—ব্যক্তিগত (Personal) ও সর্বজনীন (Universal)। যখন একটি কমপ্লেক্স একজন লোকের মধ্যেই দেখা যায় তখন তাকে ব্যক্তিগত

কমপ্লেক্স বলা হয়; আর যখন একই কমপ্লেক্স সব লোকের মধ্যেই দেখা যায়, তখন তাকে সর্বজনীন কমপ্লেক্স বলে। মনঃ সমীক্ষণ অংশে এ সম্বন্ধে বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করা হবে। এখন কয়েকটি প্রধান প্রধান কমপ্লেক্সের কথা আলোচনা করা যাক্—

[এক] **আত্মগরিমা বা আত্মপ্রভাবমূলক কমপ্লেক্স (Superiority or self-assertion Complex):** এ জাতীয় কমপ্লেক্স সাধারণতঃ কিছু বিত্তবান বা সাধারণ সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সন্তান-সন্ততি, একটু বেশী বুদ্ধিমান ছেলে বা কিছু সুন্দর চেহারার ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায়। মাতাপিতার সন্তানদের প্রতি অতিরিক্ত আদর বা স্নেহ, অত্যধিক ভোগবিলাস, অযাচিত ও প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রশংসা ইত্যাদির ফলে ছেলেমেয়েদের মনে ধারণা জন্মে যায় যে তারা একটা কেষ্ট-বিষ্টু গোছের কেউ আর কি! তারা সব সময় কথা-বার্তা, চাল-চলন, পোশাক-আশাক বা আচার-আচরণে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য জাহির করার একটা প্রবণতা অর্জন করে। অনেক সময় এই আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য এদের বহু অসঙ্গত ও মিথ্যা আচরণের আশ্রয় নিতে হয়। "আমি অমুক প্রিন্সের নাতি—বা আমার মত বুদ্ধিমান ভারতে আর ক'টা আছে, বা আমার মত এমন সুন্দর চেহারা—সিনেমার অমুক-কুমার বা অমুক কুমারীরও নেই"—এই জাতীয় মন্তব্য স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী তো বটেই, অনেক বয়স্ক লোকের নিকট হতেও শোনা যায়। এরা কথায় কথায় রাজা-উজীর মারেন, কারে এরা রাজ্যপদ দেন, আবার কাউকে এরা অধোগামী করেন। বিশ্বের বড় সব শক্তিমান রাষ্ট্রনায়কেরা এঁদের অঙ্গুলি সংকেতে পরিচালিত হন। এ জাতীয় কমপ্লেক্স সৃষ্টি হ'লে ঠিক এর বিপরীত কমপ্লেক্স হীনমন্যতামূলক কমপ্লেক্স সৃষ্টি করাই ভালো।

[দুই] **হীনমন্যতামূলক কমপ্লেক্স (Inferiority Complex):** এটি আত্মগরিমার কমপ্লেক্সের ঠিক বিপরীত। পূর্বোক্ত কমপ্লেক্স যেমন বলে, "হাম্‌সে আচ্ছা কৌন্ হ্যায়?" আর এই কমপ্লেক্স বলে—"মুঞ অতি ছার।" শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণে বা অন্য কোন কাজে যদি ক্রমাগত ব্যর্থতা দেখা দেয় বা সে যদি তার শিক্ষক, মাতাপিতা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের নিকট অসাফল্যের জন্য কেবলই তিরস্কৃত হতে থাকে, তাহ'লে এই কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হয়। তেমনি কর্মক্ষেত্রে অসাফল্য বা ব্যর্থতার জন্যও এই জাতীয় কমপ্লেক্স সৃষ্ট হতে পারে। শিক্ষার্থী বা ব্যক্তির মধ্যে এমন একটা ধারণা জন্মাবে যে তার দ্বারা কোন কাজ করা সম্ভব

নয়। বাস্তব জীবন থেকে আত্মগোপন করে থাকার একটা প্রবণতাও দেখা দিতে পারে। কোন শিশুর মনে এই জাতীয় কমপ্লেক্স সৃষ্টি হ'লে তার অবচেতন মনে একটা দারুণ বিকারের সৃষ্টি হয় যার ফলে তার দৈহিক ও মানসিক বিকাশ চিরদিনের মত অবরুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। মাতা-পিতা ও শিক্ষকের সহৃদয় ব্যবহার সতত উৎসাহ দান প্রভৃতির মাধ্যমে এই কমপ্লেক্সটি দূর করা সম্ভব।

[তিন] **যৌনমূলক কমপ্লেক্স (Sex Complex)** : যৌন প্রবৃত্তিটি মানব-আচরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে বসে আছে। যৌন আবেগকে অবদমন করার জন্য সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় অনুশাসনের বাঁধ তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু এই দুর্বার জলতরঙ্গ রোধ করার ক্ষমতা কোন শক্তিরই নেই। যৌন-কৌতূহল স্বাভাবিক ভাবে তৃপ্ত না হ'লে প্রায়ই দেখা যায় কিশোর-কিশোরীরা অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত ভাবে তাদের সেই যৌন কৌতূহলকে পরিতৃপ্ত করছে। এর ফলে তাদের মধ্যে নানাপ্রকার যৌন-কমপ্লেক্স সৃষ্ট হয়। ফ্রয়েড তাঁর মনঃসমীক্ষণে এই যৌন কমপ্লেক্সকেই সব রকম অপসঙ্গতির কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। এই জাতীয় কমপ্লেক্স যাতে না সৃষ্ট হতে পারে তার জন্য আমরা বর্তমানে যৌন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছি।

[চার] **আত্মকর্তৃত্বমূলক কমপ্লেক্স (Authority Complex)** : শিশুর স্বাভাবিক আচরণ যখন বড়দের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় বা শিশুকে যখন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে বাধ্য করা হয়, তখন সে স্বভাবতঃই বিরক্ত হয়। এই জাতীয় আচরণ পুনরাবৃত্ত হ'তে থাকলেই শিশুর মধ্যে আত্মকর্তৃত্বমূলক কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হয়। শিশু সব সময় টুকিটাকি নানা কাজে ব্যস্ত। আমাদের অর্থাৎ বড়দের চোখে সেটা কোন কাজই নয়, কিন্তু শিশুদের চোখে তা হ'ল "রাজ-কাজ"। ঐ সব কাজ ফেলে বড়দের চোখ রাঙানী, হুমকি, শাসানি আর শাস্তির ভয়ে সে হয়তো অন্য কাজ করতে বাধ্য হ'ল কিন্তু তার মন পড়ে থাকল ঐ 'রাজকাজে'। তেমনি নিয়মানুবর্তিতা শেখানোর নামে তার উপর নিয়ন্ত্রণের একটা বেড়াজাল চাপিয়ে দেওয়াটাও ঠিক মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়। এর ফলে শিশু বড়দের উপর মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হবে আর আত্মকর্তৃত্ব লাভের জন্য সে মনে মনে বিদ্রোহী হতে থাকবে। প্রায় সব শিশুই রাতারাতি বাবার মতো বড়ো হতে চায়। এর কারণ আর কিছুই না—আত্মকর্তৃত্ব লাভ। এই জাতীয় কমপ্লেক্স তার অবচেতন মনে যদি স্থায়িভাবে থেকে যায়—তাহ'লে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সে সমাজ, রীতি-নীতি, আইন-কানুন সব কিছুর বিরুদ্ধেই জেহাদ্ ঘোষণা

করবে। এমন কি কালাপাহাড়, রবিনহুড্ বা বিশে ডাকাত হয়ে সে সমাজকে চুরমার করে দেবার স্বপ্নও দেখে থাকে।

এ ছাড়াও আরো অনেক প্রকার কমপ্লেক্স আছে, যেমন, ইডিপাস, ইলেক্ট্রা, নার্সিশাস বা কাস্ট্রেশান ইত্যাদি। স্থানান্তরে এগুলি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

রসের বিকাশ (Development of Sentiment): শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন সে কোনপ্রকার রস নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। আমরা আগেই বলেছি রস সহজাত নয়, অর্জিত। সামাজিক, মানসিক, প্রাকৃতিক, শিক্ষামূলক ইত্যাদি বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই রসের সৃষ্টি হয়। প্রথম দিকে শিশুর আচরণগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় তার প্রবৃত্তির দ্বারা। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভগুলি নানাপ্রকার অভিজ্ঞতার জারক রসে জারিত হয়ে রসে পরিণত হয়।

কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে রস সৃষ্টি হলেও যে অভিজ্ঞতা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষণ-মূলক, তা থেকে রস সৃষ্টি হয় না। রস সৃষ্টি হবার জন্য অভিজ্ঞতাগুলির বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। অর্থাৎ অভিজ্ঞতাগুলিকে প্রত্যক্ষণমূলক স্তর থেকে চিন্তনমূলক স্তরে উন্নীত করতে হবে। যখন ব্যক্তি বা বস্তু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাটি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন রস সৃষ্টি হয় না, কিন্তু ঐ অভিজ্ঞতাই যখন চিন্তামূলক হয়, তখনই রস সৃষ্টি হয়।

মনোবিজ্ঞানীরা শিশু মনের বিকাশ ও বৃদ্ধির তিনটি বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হ'ল—**প্রত্যক্ষণমূলক স্তর** (যার অনুভূতি হ'ল অসংহত প্রক্ষোভ), **চিন্তনমূলক স্তর** (যার অনুভূতি হ'ল রস) এবং **বিচারমূলক স্তর** (যার অনুভূতি হ'ল জীবন দর্শনের অনুভূতি)। রসের বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে ব্যক্তি-মানসের বিকাশের ক্রম অনুসারেই আলোচনা করতে হবে।

[এক] **প্রত্যক্ষণমূলক স্তর (Perceptual Level):** প্রায় সাত আট বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর মানসিক বিকাশ বলতে তার প্রত্যক্ষণের বিকাশ ও বিস্তৃতিকেই বুঝিয়ে থাকে। এই স্তরে শিশুর ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিকশিত হয়। বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তির ও সহগামী প্রক্ষোভের সহজ ও অবাধ সক্রিয়তাই এই স্তরের বৈশিষ্ট্য। শিশু যে সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে—এই স্তরে প্রবৃত্তিগুলি তাদের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে যায়। রস-সৃষ্টির পরিবর্তে এই স্তরে আমরা অসংহত প্রক্ষোভের লীলাখেলাই দেখতে পাই।

[দুই] চিন্তনমূলক স্তর (Thinking Level) : সাত আট বছর বয়সের পর শিশু নিজের প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভগুলিকে সুসংযত ও সুসংহত করতে শেখে। এই স্তরেই চিন্তনের শুরু। শিশু নিজের চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করে তার প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভগুলিকে প্রশমিত করে যার ফলে এগুলির মধ্যে একটা সুসংগঠন সাধিত হয় এবং রসের সৃষ্টি হয়। কোন ব্যক্তি, বস্তু বা ধারণাকে কেন্দ্র করে শিশুর প্রক্ষোভগুলি একটা স্থায়ী-অনুভূতির সৃষ্টি করে এবং তার আচরণ ধারাটিও এই জন্য নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে যায়। মনের স্বাভাবিক সংগঠনটি প্রথম এই স্তরেই লক্ষ্য করা যায়।

৩। বিচারমূলক স্তর (Reasoning Level) : মানসিক বিকাশের এই স্তরটিতে রস সুসংগঠিত হয়ে একটা স্থায়ী রূপ নেয় এবং সারা জীবন ধরেই শিশুমনে এই রসের প্রভাব বর্ধিত ও বিকশিত হতে থাকে। এই স্তরে শিশুর বিচারবুদ্ধি জাগ্রত হয় এবং সে তার প্রত্যক্ষণের ও চিন্তাপ্রসূত অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুগুলিকে বিচার করতে শেখে। এইভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করার ফলে পূর্ব-অর্জিত রসগুলির মধ্যে আবার একবার সমন্বয় ঘটে এবং সংগঠনটি আরো ব্যাপক ও স্থায়ী হয়। বিভিন্ন রসগুলির সুসমন্বয়ের মাধ্যমে যে নূতন রসের সৃষ্টি হয়, তাকে বলা যেতে পারে অধিরাজ বা অধিশাসক রস (Master Sentiment)। এই অধিরাজ রসটি আবার শিশুর অহংসত্তার (Ego) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কযুক্ত বলে ম্যাক্‌ডুগাল এর নাম দিয়েছেন—আত্মবোধের রস (Self-reasoning Sentiment)। এই যে অহংসত্তা এটিকে কেন্দ্র করেই শিশুর জীবনবোধ ও জীবনদর্শন গড়ে ওঠে এবং তার জীবনের সামগ্রিক বিকাশটিও পরিপূর্ণ হয়। এই আত্মবোধের রসটি জাগ্রত হ'লে ব্যক্তির সকল কাজ, চিন্তা-ধারা, পরিবেশ ও সমাজের সঙ্গে বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যে একটা ঐক্যের সৃষ্টি হয়।

তাহ'লে রস সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরগুলিকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করতে পারি—

শিক্ষা ও চরিত্র গঠনে রস (Sentiment : Education and Character) : শিক্ষা ও চরিত্রগঠনে রসের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সার্থক রস সৃষ্টি করাকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভগুলি আমাদের কাজে প্রেরণা সঞ্চার করে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের প্রভাবকে আমরা একেবারে বাদ দিতে পারি না। কিন্তু তাই বলে এগুলির অবাধ ও যথেচ্ছ প্রকাশও আমরা চাই না। উত্তম ব্যক্তিত্বের লক্ষণ হ'ল—প্রবৃত্তি

ও প্রক্ষোভের সুনিয়ন্ত্রণ ও সুসংগঠন। এর জন্য আমরা উন্নীতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভকে অবাঞ্ছিত পথ থেকে বাঞ্ছিত পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করি। এই উন্নীতকরণ বিভিন্ন রস সৃষ্টির মাধ্যমেই সম্ভব।

ম্যাক্‌ডুগালের মতে শিশুর ব্যক্তিসত্তা গঠনে রসই হ'ল প্রবলতম শক্তি। প্রথম দিকে শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় তার প্রবৃত্তিগুলির দ্বারা। শিশুর সমস্ত আচরণই সহজাত প্রবৃত্তি সঞ্জাত। ক্রমশঃ শিশুমনে নানাপ্রকার প্রক্ষোভ দেখা দিতে থাকে। এই প্রক্ষোভগুলির বশবর্তী হয়েই সে নানাপ্রকার আচরণ সম্পাদন করে। কিন্তু প্রবৃত্তি বা প্রক্ষোভ কোনটিই এই স্তরে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংগঠিত থাকে না। ফলে তার আচরণ-ধারাও অসংলগ্ন হয়ে পড়ে। এই স্তরে তখনও পর্যন্ত তার ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না। কিন্তু বয়স ও অভিজ্ঞতা যত বাড়তে থাকে, ততই শিশুর বিভিন্ন প্রক্ষোভ বিভিন্ন বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে থাকে। এই প্রক্ষোভ পুনরাবৃত্ত হ'তে থাকলেই শিশু মনে রসের সৃষ্টি হয়। তখন সে বিশেষ একটি ধারাতে ও ভঙ্গীতে আচরণ করতে শুরু করে এবং পূর্বের অসংযত ও অনিয়ন্ত্রিত আচরণের পরিবর্তে তার আচরণ-ধারা হ'য়ে যায় সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত। এইবার তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের কাজ শুরু হয়ে যায়। ব্যক্তিত্ব বিকাশে শিশুর প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ ও অন্যান্য মানসিক ভাবধারার সংগঠনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর মধ্যে প্রথম দিকে বিভিন্ন রসের আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তার বিচারবুদ্ধি কিছু উন্নত হ'লে সে আবার বিভিন্ন রসের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করে এবং একটি অধিরাজ রসের অধীনে সব রসকে নিয়ন্ত্রিত করে। এর থেকেই তার ব্যক্তিত্বেরও একটা স্থায়ী সংগঠন লক্ষ্য করা যায়। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে রস সৃষ্টিই হ'ল ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রাথমিক ও প্রথম সোপান। প্রবৃত্তি থেকে শুরু করে চরিত্রগঠন পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর যেন একটা শিকলে বাঁধা। একটিকে বাদ দিলে বাকীগুলির কোন গুরুত্ব থাকে না।

॥ প্রবৃত্তি > প্রক্ষোভ > বিভিন্ন রস > অধিরাজ রস > ব্যক্তিত্ব > চরিত্র ॥

শিশুর বয়স বাড়লে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কমে যায়। তখন তার আচরণগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় অর্জিত রসগুলির দ্বারা যেগুলি অবশ্য তাদের উদ্ভবের জন্য প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের উপর নির্ভরশীল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন আচরণ-ধারা রসগুলির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে। প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ রস সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং রস সৃষ্টি হ'য়ে গেলেই তারাই আবার রসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে।

রস সহজাত নয়—অর্জিত। রসের সৃজন, বর্ধন ও স্থায়িত্বের উপর শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণা সম্বন্ধে শিশুমনে যে রকম রস সৃষ্টি হবে, তার আচরণ-ধারাও সেই মত রূপ পরিগ্রহ করবে। শিশুর মাতা-পিতা, বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী, বিদ্যালয়, পড়াশোনা প্রভৃতি সম্বন্ধে যদি তার একটা ভালোবাসার সেন্টিমেন্ট গড়ে ওঠে, তবে সেও সকলের সঙ্গে এবং সকলের প্রতি একটা স্নেহময় ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ করবে। তেমনি চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, অসৎ পথে চলা প্রভৃতির প্রতি যদি তার একটা ঘৃণার সেন্টিমেন্ট গড়ে ওঠে, তাহ'লে সে ঐ সব কাজগুলিকেও ঘৃণা করবে এবং তার থেকে দূরে সরে থাকতে চাইবে। কাজেই পিতামাতা বা শিক্ষকের পক্ষে শিশুর মনে কি কি প্রক্ষোভ জাগছে এবং তার সেন্টিমেন্টগুলি কিভাবে গড়ে উঠছে তা জানা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রক্ষোভই শেষ পর্যন্ত তার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে প্রভাবিত করবে। কাজেই শিশুমনে যাতে অনুকূল প্রক্ষোভ সৃষ্ট হয় শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষককে সেইভাবে অগ্রসর হ'তে হবে। ব্যক্তিত্বের সামাজিক দিক থেকে মূল্যায়নের নামই চরিত্র। কাজেই সুচরিত্র গঠন করতে হ'লে উত্তম ব্যক্তিত্ব গঠন করতে হবে। ব্যক্তিত্বের গঠন ও বিকাশ আবার নির্ভর করছে রস বা সেন্টিমেন্টের উপর। আমরা রসকে বলতে পারি চারাগাছ আর চরিত্রকে বলতে পারি, পরিণত বৃক্ষ। চারাগাছটি যেমন নোয়ানো হবে, পরিণত বৃক্ষটিও তেমনি ভাবে ঝুঁকবে। কাজেই সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে, সুনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত রস সৃষ্টি করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে শিশু উত্তম ব্যক্তিত্ব ও সু-চরিত্রের অধিকারী হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রধান প্রধান রস সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। এখন সেই রকম কয়েকটি রস সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল—

আত্মবোধের রস (Self regarding sentiment) : প্রত্যেকটি রসই কোন না কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং প্রত্যেকের একটা স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্ব গতিপথ আছে। কিন্তু বিভিন্ন রসের মধ্যে যদি কোন সমন্বয় না থাকে, পারস্পরিক সংযোগ ও সম্পর্ক না থাকে, তাহ'লে আচরণগুলিও পরস্পর-বিরোধী ও অসংলগ্ন হয়ে পড়ে এবং ব্যক্তিত্বেরও সুষ্ঠু বিকাশ সাধন হয় না।[1] সেইজন্য ব্যক্তিত্ব বিকাশের শেষ স্তরে দেখা দেয় নূতন একটি রস—অধিরাজ রস বা আত্মবোধের রস যেটি অন্য সব রসের মধ্যে

একটা সমন্বয় সাধন করে। এই আত্মবোধের রসটি গড়ে ওঠে শিশুর অহং-সত্তাকে কেন্দ্র করে। শৈশবের প্রথম দিকে শিশুর এই অহংসত্তাটি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অহংবোধ জাগ্রত হ'তে থাকে। শিশুর অভিজ্ঞতার প্রায় সকল বস্তুই কোন না কোন দিকে তার অহংসত্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এইজন্য শিশুর অন্যান্য অর্জিত রসগুলিও খুব স্বাভাবিক কারণেই এই আত্মবোধের রসের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। যে সমস্ত বস্তু বা ঘটনা অহংসত্তার অতি নিকটে থাকে বা যে সমস্ত বস্তু ও ঘটনা আমাদের আত্মবোধ বা আত্মচেতনা জাগরণের অত্যন্ত সহায়ক, প্রধানতঃ সেগুলিকে কেন্দ্র করেই আত্মবোধের রসটি গড়ে ওঠে। মাতাপিতা ছেলেমেয়েদের মধ্যে আর ছেলেমেয়েরা মাতাপিতার মধ্যে এই অহংসত্তাটি খুঁজে পান। আমার মা, আমার বাবা, আমার ছেলে, আমার মেয়ে—এই সব উক্তির মধ্যে 'আমি' ও 'আমার' এই বোধই প্রবল। এই ক্ষেত্রে আত্মবোধের রসটি বেশ প্রকট। তেমনি এই কলমটি আমার, এটিতে লিখে যতবার পরীক্ষা দিয়েছি, ততবার আমি প্রথম হয়েছি, এখানেও অহংসত্তা। আমার লেখা বই, আমার আঁকা ছবি, আমার গাওয়া গান, আমার দেওয়া বক্তৃতা—এ সবকেও কেন্দ্র করে রয়েছে সেই অহংসত্তা। এই অহংসত্তাটি অন্য সকল রসের সহায়তায় নিজস্ব আদর্শ নির্ধারণ করে নেয়।

অন্যান্য রসগুলি যেমন অত্যন্ত সহজে গড়ে ওঠে, আত্মবোধের রসটি তেমন সহজে গড়ে ওঠে না। এই রসের বিকাশ চলে সারাটি জীবন ধরে। আগেই বলা হয়েছে, যে সমস্ত বিচ্ছিন্ন ভাবধারা ও ভিন্ন ভিন্ন রসের সৃষ্টি হয়, সেগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এই আত্মবোধের রসটি। এর সাহায্যেই পরস্পর বিরোধী ও অসংলগ্ন বিভিন্ন রসের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। সব রসের রাজা যেন এই আত্মবোধের রসটি। সেইজন্যই ম্যাক্‌ডুগাল এর নাম দিয়েছেন অধিরাজ বা অধিশাসক রস (Master Sentiment)।

এই রস কিভাবে গঠিত হতে পারে, সে সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা দুটি পদ্ধতির কথা বলে থাকেন। **একটি হল**—শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের বাধাহীন ও পরিপূর্ণ বিকাশ, তার সুপ্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার এবং তার চাহিদা ও ইচ্ছার সঙ্গত ভাবে তৃপ্তিসাধন। **অপরটি হল**—শিশুর মধ্যে সামাজিক সচেতনতার উন্মেষ সাধন ও তার পরিপুষ্টি।

দুটি ক্ষেত্রেই গৃহ ও বিদ্যালয়, মাতাপিতা ও শিক্ষক প্রত্যেকেরই বেশ কিছু

করণীয় কাজ আছে। শিশুর চাহিদা ও ইচ্ছার সঙ্গত ভাবে তৃপ্তি সাধন করা হ'লে তার মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকবে। কিন্তু এগুলি তৃপ্ত না হ'লে বা অসঙ্গত ভাবে তৃপ্ত হ'লে শিশুর মানসিক ক্ষেত্রে দেখা দেবে নানা প্রকার অপসঙ্গতি। তেমনি শিশুর স্বাভাবিক কর্ম প্রচেষ্টাটিকে যদি বার বার ব্যাহত করা হয় বা তাকে যদি কঠোর নিপীড়নমূলক শাসন ও নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে "মানুষ" করা হয়, তাহ'লে তার অহংসত্তাটিও হয়ে পড়বে দুর্বল। বিভিন্ন প্রকার নিপীড়ন, অবদমন বা অবহেলার ফলে অহংসত্তা দুর্বল হ'য়ে গেলে শিশু নিজে হয়ে পড়বে উদ্যমবিহীন, অব্যবস্থিত চিত্ত, পরোমুখাপেক্ষী ও দুর্বলমনা। এদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সুগঠিত হতে পারে না।

তেমনি শিশুর সামাজিক বোধ জাগ্রত করার জন্য তার পরিবেশটিকেও সমাজধর্মী হতে হবে। অহংসত্তা জাগ্রত হয় বাস্তবের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া বা মিথ ক্রিয়ার মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ সামাজিক প্রকৃতির। সমাজের বিভিন্ন লোকের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে এই সামাজিক সচেতনতাটি জাগ্রত হয়। শিশুও বুঝতে শেখে যদিও সে সমাজের একজন সভ্য, তবু তার অহংসত্তা অন্য সকলের অহংসত্তার থেকে পৃথক। এই অহংবোধ জাগ্রত হবার সময় শিশুর পরিবেশটি যদি সত্য সত্যই সমাজধর্মী হয়, সমাজের সকলের আচরণ যদি সুষ্ঠু ও সঙ্গত হয়, তাহ'লে শিশুর অহংসত্তাটিও হবে বেশ সুস্থ ও সামাজিক প্রকৃতির। কিন্তু পরিবেশটি সমাজধর্মী না হ'লে তার এই অহংসত্তার বিকাশ হবে অসম্পূর্ণ, একমুখী ও অসামাজিক প্রকৃতির। এইজন্য গৃহ বা বিদ্যালয়—সর্বত্রই একটা সুস্থ সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। বিদ্যালয়ে সমবেত ভাবে কর্মানুষ্ঠান, সহযোগিতা, খেলাধূলা, বিতর্ক সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেবা ও ত্রাণমূলক কার্য ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুর অহংসত্তাটির স্বাস্থ্যময় ও পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের চেষ্টা করতে হবে।

নৈতিক সেন্টিমেন্ট বা নীতিবোধের রস (Moral Sentiment): আমরা যখন আচরণ করি, তখন নৈতিক আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে ও নৈতিক আদর্শের কথা চিন্তা করে আচরণ করার একটা অনুভূতি বোধ করি। নীতির বা নৈতিক দিকের প্রতি এই যে অনুভূতি বা সেই সম্বন্ধে যে প্রক্ষোভ জাগে তাকেই নৈতিক রস বলা হয়। তেমনি কোন একজন লোকের আচরণ ভালো না মন্দ, তা যখন বিচার করি, তখনও এই নৈতিক মূল্যের সাহায্যেই সেই বিচার করে থাকি। নৈতিক রস সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন, 'চরিত্র ও আচরণের মধ্যে

নৈতিক গুণ বা গুণাবলীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করার যে অনুভূতি তাই হ'ল নৈতিক রস। আমাদের আচরণের মধ্যে কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ বা কোনটি সৎ, কোনটি অসৎ, কোনটি সুন্দর, কোনটি অসুন্দর—এই বোধ বা এইভাবে বিচার করার ক্ষমতা এনে দেয় নৈতিক রস। অবশ্য একথা ঠিক যে শৈশবের গোড়া থেকেই এই নৈতিক রস গড়ে ওঠে না। শিশুর উপর সামাজিক পরিবেশের ও পিতামাতার প্রভাব, সামাজিক অনুশাসন ইত্যাদির প্রভাব যখন বিস্তৃত হয়, আর সে যখন ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতির মধ্যে বিচার করতে শেখে তখনই তার মধ্যে এই নৈতিক রসের সৃষ্টি হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই রসের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুচরিত্র গঠন যদি শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হয়, তবে এই নৈতিক রস সৃষ্টি করা সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রধানতম উপকরণ। কিন্তু নৈতিক রস সাধারণতঃ অমূর্ত ধারণাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। এই সমস্ত অমূর্ত ধারণা শিশু হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না বলে উপযুক্ত আচরণের মাধ্যমে নৈতিক রস সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয়। আর এই রস যদি শিশুর জীবনে গঠিত না হয়, তাহ'লে শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ হতেই পারে না।

নৈতিক রসের আবার দুটি দিক আছে যেগুলি পরস্পর বিরোধী। এগুলিকে ধনাত্মক (+ve) ও ঋণাত্মক (—ve) দিক বলা যেতে পারে। অর্থাৎ, এটি দ্বিমুখী। কোন একটি নৈতিক বস্তুর প্রতি যদি আমাদের ভালোবাসা জন্মায়, তাহ'লে তার বিপরীতধর্মী বস্তুটির প্রতি আমাদের বিরাগ বা ঘৃণা জন্মাবে। সত্য কথা বলতে যে ভালোবাসে, মিথ্যে কথা বলতে সে ঘৃণা বোধ করবে।

পরিশেষে আর একটি কথা। এই নৈতিক রস জাগ্রত হয় সমাজ-জীবন যাপনের মাধ্যমে। আলেকজাণ্ডার সলকার্কের মত বা রবিনসন্ ক্রুশোর মত সমাজবিহীন নির্জন দ্বীপে বা জনহীন জঙ্গলে কেউ যদি বাস করে, তাহ'লে তার এই রস জাগ্রত হবে না। সমাজে বাস করতে করতেই শিশু প্রচলিত নৈতিক গুণাবলীর কথা শোনে, সেগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়, সেগুলির সঙ্গে বাস্তব ক্ষেত্রে তার সাক্ষাৎ ঘটে এবং পরিশেষে নিজের আচরণের মধ্যে সেগুলিকে প্রকাশ করে। ম্যাকডুগাল বলেন, শিশুরা যে সব ব্যক্তিদের ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে, তাদের বৈশিষ্ট্যগুলিকেও তারা ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে এবং তাঁদের সংস্পর্শে এসেই শিশুর মধ্যে নৈতিক রসটি গড়ে ওঠে। অবশ্য এটি এক জাতীয় অনুবর্তন প্রক্রিয়া। এক জাতীয় মূর্তবস্তু থেকে অমূর্ত ধারণাগুলির প্রতি শিশুর রস সঞ্চালিত হয়ে যাচ্ছে।

দেশাত্মবোধের রস (Sentiment for Patriotism) : নিজের দেশকে কেন্দ্র করে শিশুর মনে যে প্রেম, ভালবাসা ও আকর্ষণের সৃষ্টি হয়, সেইটিকেই দেশাত্মবোধের রস বলা হয়। নিজের দেশ, নিজের দেশবাসী বা পরিবেশ সম্বন্ধে শিশুমনে যদি কোন আকর্ষণ না জাগে, তাহ'লে তার অহংসত্তার বিকাশটি ব্যাহত হবে এবং সে সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে না। এরা দেশের যোগ্য নাগরিকও হতে পারবে না। এরা স্বদেশেও প্রবাসী থেকে যান আবার প্রবাসকেও স্বদেশ করে তুলতে পারেন না। দেশাত্মবোধ জাতীয় চেতনারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে শিক্ষায় দেশাত্মবোধের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশাত্মবোধ ছাড়া কোন জাতি, কোন দেশ উন্নত হতে পারে না। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই আমরা দেশকে মাতৃমূর্তিরূপে কল্পনা করেছি—দেশকে মাতৃরূপে পূজা করেছি। কিন্তু স্বাধীনতার পর যেন এই দেশাত্মবোধে ভাঁটা পড়ে গেছে। আমরা তো স্বাধীন হয়ে গেছি, আমাদের দায়িত্ব তো শেষ, এখন আর দেশাত্মবোধ আনার কি প্রয়োজন! মাঝখানে ভারতের চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন হঠাৎ দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা চলতে থাকে। রেডিও, সিনেমা, বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা চলতে লাগল। এর জের এখনও আকাশবাণীর মাধ্যমে চলেছে। কিন্তু এভাবে দেশাত্মবোধ আনয়ন করা যায় না। শিক্ষার্থীদের মনে প্রকৃত দেশপ্রেম সঞ্চার করতে হলে সেই মত উপযুক্ত পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করতে হবে। কেবলমাত্র কয়েকটি 'শহীদের রক্তে রাঙা জীবন কথা' বা 'বীরত্বে বাঙালী' জাতীয় দ্রুতপাঠ্য বই পড়ালে হবে না। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি পাঠের মাধ্যমে অতীত গৌরবের সঙ্গে বর্তমান হতাশা ও ভবিষ্যত সম্ভাবনার একটি যোগসূত্র স্থাপন করে শিশুকে দেশ সম্বন্ধে, দেশবাসী সম্বন্ধে এবং দেশপ্রেম সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হবে। সমাজ সংস্কারক, দেশবরেণ্য নেতা, ধর্মীয় সংস্কারক ও নেতা, বৈজ্ঞানিক, দেশপ্রেমিক, দার্শনিক, সাহিত্য সেবী, কৃতবিদ্য শিক্ষক প্রভৃতি মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী পাঠের মাধ্যমেও শিশুমনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা যায়। আর এই প্রচেষ্টা অনিয়মিত হ'লে চলবে না—হ'তে হবে নিয়মিত।

ব্যক্তিত্ব

(Personality)

[Personality is the sum-total of the biological innate dispositions, impulses, tendencies, appetites and instincts of the individual and the disposition and tendencies aquired by experience—Morton Prince.

Personality is an integrated system of habitual adjustment to the environment, particularly to the social environment—William Healy.

Personality is the dynamic organization within the individual of those psycho-physical systems that determine his unique adjustment to his environment—Allport.

Personality is the broader term including character as one of its aspects—Thorpe.

Personality can be broadly defined as the total quality of an individual's behaviour—Woodworth.

Personality is intrinsically complex; we can offer no simple formula for reducing its rich variety to a dry definition—Stagner.

Character is personality evaluated and personality is character devaluated—Allport.

Personality—A term used in various senses * * * * the integrated and dynamic organization of the physical, mental, moral and social qualities of the individual.—Dictionary of Psychology.]

ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা : ব্যক্তিত্ব শব্দটির সাধারণ অর্থ তার মনোবিজ্ঞানসম্মত অর্থ থেকে পৃথক। সাধারণতঃ ব্যক্তিত্ব বলতে আমরা কোন ব্যক্তির মধ্যে এমন একটা স্বতন্ত্র ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্য বা গুণের কথা চিন্তা করি, যা অপর ব্যক্তির মধ্যে নেই এবং সেই বৈশিষ্ট্য বা গুণটি বর্তমান থাকার জন্যই সে অন্যান্য ব্যক্তি থেকে পৃথক। এই স্বাতন্ত্র্য (Individuality) এবং অসাধারণত্ব (Uniqueness)-কেই ব্যক্তিত্বের লক্ষণ বলে মনে করা হয়।

দৈনন্দিন জীবনে ব্যক্তিত্ব শব্দটিকে নানাভাবে ব্যবহার করা হয়। যে ব্যক্তি তার কথাবার্তায়, চাল-চলনে বা আচার-ব্যবহারে অপরের মনের উপর একটা ছাপ রেখে যায়, সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আছে বলে আমরা ধরে নিই। ইংরেজী Personality শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ পার্সোনা (Persona) থেকে—যার অর্থ হ'ল মুখোস। প্রাচীন গ্রীসে যখন রূপসজ্জায় তেমন কোন উন্নতি হয়নি তখন

অভিনেতারা দর্শকদের কাছে নিজেদের চরিত্রটির পরিচয় জানাবার জন্য বিশেষ ধরনের মুখোশ পরত। সে হিসেবে Personality-র অর্থ হ'ল—ব্যক্তি যে ভাবে নিজেকে অপরের নিকট জানায় তাই।

ব্যক্তিত্ব একটি জটিল বিষয় এবং তার একটি নিখুঁত সংজ্ঞা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। অলপোর্ট (Allport) তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর লেখা গ্রন্থে প্রায় ৫০টি প্রচলিত সংজ্ঞার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই সংজ্ঞাগুলি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেওয়া হয়েছে বলে কোন সংজ্ঞাই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ স্বরূপটি প্রকাশ করতে পারেনি। যাই হোক অলপোর্ট এই সমস্ত প্রচলিত সংজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করে একটি ব্যাপক সংজ্ঞা তৈরী করেছেন, তা হ'ল—

"ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে তার যে অনন্য সঙ্গতিবিধান (Unique adjustment), সেই সঙ্গতিবিধানকে নির্ধারণ ক'রে (Determine) যে সমস্ত দৈব-মানসিক সত্তা (Psycho-physical systems), ব্যক্তির মধ্যে সেই সমস্ত সত্তার প্রগতিশীল সংগঠনের (Dynamic organisation) নামই হ'ল ব্যক্তিসত্তা।"

ব্যক্তিত্বের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য : ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণার জন্য ব্যক্তিত্বের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা জানা প্রয়োজন। প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা নীচে আলোচনা করা হ'ল—

[এক] ব্যক্তির সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতা এবং পরিবেশের শক্তির মধ্যে একটা পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার (Interaction) ফলেই ব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ করে।

[দুই] পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান (Adjustment) বা উপযোজনের (Adaptation) জন্য প্রয়োজন ব্যক্তির চিন্তা, ইচ্ছা, অনুভূতি, ভাবধারা, কামনা বাসনা, জীবনাদর্শ, সহজাত প্রবৃত্তি ও বৃত্তি।

[তিন] ব্যক্তিত্ব দেহ মনের এক জীবন্ত ঐক্য। মানসিক এবং দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা সুসামঞ্জস রূপ লাভ করে। সেইজন্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে আছে একটা সমগ্রতা, সংহতি এবং একটা সুষম সংগঠন।

[চার] আত্মসচেতনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হ'ল ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি।

[পাঁচ] ব্যক্তিত্ব স্থির বা নিশ্চল নয়; ব্যক্তিত্বের গঠন ক্রমবর্ধমান এবং গতিধর্মী; এ চিরপরিবর্তনশীল এবং সদা বিকাশমান।

(ছয়) ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনশীল ও বিকাশমান হ'লেও এর মধ্যে একটা স্থায়িত্ব আছে যার জন্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্বটি সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মে।

[সাত] ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে। সমাজের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, কৃষ্টি, ভাবধারা প্রভৃতি সামাজিক উপাদানের প্রভাবে ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়।

ব্যক্তিত্বের উপাদান (Factors) : ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা চলে—(ক) প্রাকৃতিক উপাদান এবং (খ) পরিবেশগত উপাদান।

প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে পড়ে—(১) বংশধারা বা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্য, (২) দৈনিক গঠন এবং (৩) রসক্ষরা গ্রন্থির ক্রিয়া।

পরিবেশগত উপাদান বলতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান বা প্রভাবের কথা বলা হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশ হ'ল—জলবায়ু, মৃত্তিকা, গাছপালা, জীবজন্তু, খাদ্য ইত্যাদি। আর সামাজিক পরিবেশ হ'ল—গৃহ, বিদ্যালয়, ক্লাব, মন্দির, মসজিদ, লাইব্রেরী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান, সমাজের আচার ইত্যাদি।

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ (Traits) : ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় ব্যক্তির আচরণের মাধ্যমে। ব্যক্তির আচরণ নানাভাবে প্রকাশিত হয়। এই আচরণকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা ব্যক্তির কতকগুলি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে থাকি। এইগুলির সাহায্যে আমরা সংক্ষেপে ব্যক্তির আচরণের বর্ণনা দিয়ে থাকি। এই গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলিকেই বলা হয় ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ বা Trait, যেমন সদাশয়তা, পরিশ্রমশীলতা, সামাজিকতা ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের দুটি দিক আছে—একটি মানসিক ও অপরটি আচরণমূলক। ভদ্রতা বলতে মনের দিক থেকে মার্জিত রুচিসম্পন্ন মনোভাবকে বোঝায় এবং আচরণের দিক থেকে শিষ্ট সভ্য আচরণকে বোঝায়। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্বের এই সংলক্ষণগুলি কম বেশী পরিমাণে বিদ্যমান। তৃতীয়তঃ, ব্যক্তির জন্মগত প্রবণতা ও পরিবেশ উভয়ের প্রতিক্রিয়া থেকে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলির সৃষ্টি হয়। চতুর্থতঃ, এই সংলক্ষণগুলি কম বেশী স্থায়ী। পঞ্চমতঃ, ব্যক্তিত্বের অধিকাংশ সংলক্ষণই দ্বিমুখী।

সংলক্ষণগুলির স্থায়িত্বকে কেন্দ্র ক'রে ক্যাটেল তাদের দু'ভাগে মনোবিজ্ঞানী ভাগ করেছেন—(ক) বাহ্যিক সংলক্ষণ (Surface traits) এবং (খ) আভ্যন্তরিণ

সংলক্ষণ (Source traits)। বাহ্যিক সংলক্ষণ বলতে তিনি সেই সমস্ত গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছিলেন যেগুলি ব্যক্তির বাহ্যিক কাজের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ভাবে পরিস্ফুট হয়; যেমন—সামাজিকতা, সাহসিকতা, একগুঁয়েমি ইত্যাদি। আভ্যন্তরিণ সংলক্ষণগুলি থাকে অনেক গভীরে। এগুলি ব্যক্তির বাহ্যিক কাজের মাধ্যমে জানা যায় না। তবে আভ্যন্তরিণ সংলক্ষণই কিন্তু পরোক্ষভাবে বাহ্যিক আচরণকে এবং বাহ্যিক সংলক্ষণগুলিকেও নিয়ন্ত্রিত করে। 'নিরাপত্তা' বা 'নিরাপত্তার অভাববোধ'—এ জাতীয় সংলক্ষণ। অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগের পরিবর্তে মুখ্য এবং গৌণ (Cardinal and Secondary) সংলক্ষণের কথা বলে থাকেন।

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলির একটা সুনির্দিষ্ট সংখ্যা আছে—একথা বলা যায় না। এ সংখ্যা ৫ থেকে ২০,০০০ পর্যন্ত হ'তে পারে। Allport ব্যক্তিত্বের পাঁচটি প্রধান সংলক্ষণের কথা বলেছেন। সেগুলি হ'ল—

(১) বুদ্ধি (Intelligence); (২) গতিময়তা (Mobility); (৩) মেজাজ বা মনোপ্রকৃতি (Temporament); (৪) আত্মপ্রকাশ (Self-expression) এবং (৫) সামাজিকতা (Sociality)। Dashiel-এর মতে সংলক্ষণ হ'ল দু'টি। Fry এবং Haggaed এর মতে পাঁচটি। Rosanoff সংলক্ষণের তালিকাতে মেজাজ বা মনোপ্রকৃতিগত উপাদানের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

যাই হোক, সংলক্ষণ সম্বন্ধে মোটামুটি বক্তব্য হ'ল—

[এক] এগুলি অত্যন্ত দুর্বোধ্য।

[দুই] সংলক্ষণগুলি নির্ধারণের ব্যাপারে ব্যক্তির ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব অত্যন্ত বেশী থাকে।

[তিন] সংলক্ষণগুলি পরিমাপ করার সময় সচরাচর ব্যক্তিকে তার সামাজিক পরিবেশে থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

[চার] মানুষের আচরণ অত্যন্ত জটিল। এর জন্য সব সময় যে লোক একই সংলক্ষণের জন্য কাজ করে চলেছে এ রকম অনুমান করা ঠিক হবে না।

ব্যক্তিসত্তার টাইপ (Personality):

অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার সংলক্ষণের বদলে 'টাইপ' বা নমুনা নির্ধারণ করে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের কথা বলে থাকেন। 'টাইপ' কিন্তু ব্যক্তির মধ্যে থাকে না, থাকে বিচারকের দৃষ্টিভঙ্গীতে। টাইপ বলতে আমরা বুঝি মনোপ্রকৃতি এবং দেহগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের শ্রেণীকরণ।

টাইপ নির্ধারণের ব্যাপারে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর মত এবং শ্রেণীবিভাগ ভিন্ন প্রকৃতির। Jung-এর মতে ব্যক্তিত্বের তিনটি টাইপ অন্তর্মুখী, বহির্মুখী এবং উভয়মুখী। Jaensch-এর মতে টাইপ ভাব প্রতিরূপের উপর (Eidetic image) নির্ভরশীল। Spranger-এর Type হ'ল তাত্ত্বিক, হিসেবী, সৌন্দর্যবোধসম্পন্ন, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধার্মিক। Kretschmer-এর Type হ'ল পিকনিক, এস্থেনিক, এথলেটিক এবং হাইপোপ্লাস্টিক। Sheldon-এর Type হ'ল—এণ্ডোমর্ফ মেসোমর্ফ, এবং এক্টোমর্ফ। Eysenck-এর মতে ব্যক্তিসত্তার মধ্যে তিনটি মৌলিক ফ্যাক্টর বা dimension আছে। সে তিনটি হ'ল—অন্তর্বৃত্তি, মনোবিকার প্রবণতা এবং উন্মত্ততা।

ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা ও পরিমাপ (Personality Test and Measurements): ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার চেষ্টা বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। এই পরিমাপের প্রচেষ্টা প্রধানতঃ পর্যবেক্ষণ ও সংব্যাখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রাচীনকালের পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। পর্যবেক্ষণের পরিস্থিতিও সুনিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হ'ত না। কিন্তু বর্তমানে আরো নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার চেষ্টা চলছে।

ব্যক্তিত্ব পরিমাপের প্রচেষ্টার প্রথম প্রয়াস সম্ভবতঃ ১৮০০ সালের কাছাকাছি। ক্রেপেলীন এবং সোমার হলেন এর পূর্বসূরী। তারপর অনেক বিবর্তনের মধ্যে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের বর্তমান অভীক্ষাগুলি রূপ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে ১৯০৫ সালে Jung, ১৯২১ সালে Rorschach-এর নাম এবং ১৯৩৯ সালে Projective method-এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

কি পদ্ধতিতে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা হবে, সে সম্পর্কেও মত বিরোধ দেখা যায়। কোন কোন মনোবিজ্ঞানীর মতে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার পক্ষে হোলিস্টিক (Holistic) পদ্ধতিই বিশেষ উপযোগী। এই পদ্ধতি অনুসারে ব্যক্তিকে সমগ্র ভাবে গ্রহণ ক'রে তার সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করা হয়। আবার অনেকের ধারণা, এই পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যক্তিসাপেক্ষ বা subjective এবং তার ফলে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ স্বরূপটি জানা যায় না। অনেকে এইজন্য ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বা objective পদ্ধতি ব্যবহার করার পক্ষপাতী।

বর্তমান যুগে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য যে সমস্ত পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে তার মধ্যে কতকগুলির কথা পরপৃষ্ঠায় আলোচনা করা হ'ল—

[এক] **সাক্ষাৎকার (Interview) :** ব্যক্তির সঙ্গে সামনা সামনি সাক্ষাৎ ক'রে তার আভ্যন্তরিণ প্রকৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করার নাম হ'ল সাক্ষাৎকার। ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ আলোচনায়, কথাবার্তায় এবং তাকে নানারকম প্রশ্ন করে তার ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়। এই সাক্ষাৎকার চার প্রকারের হ'তে পারে —Standardized, Unstandardized, Stress এবং Exhaustive।

এই পদ্ধতির যথেষ্ট উপকারিতা থাকলেও পদ্ধতিটি কোন সুনির্দিষ্ট নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হওয়ার জন্য এর মধ্যে কতকগুলি দোষত্রুটি দেখা যায়। প্রথমতঃ, সঠিক উত্তর দেওয়া বা না দেওয়া নির্ভর করে অভীক্ষার্থীর ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর। দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় অভীক্ষার্থীর সঠিক উত্তর দেবার ইচ্ছা থাকলেও লজ্জা, সংকোচ বা ভয়ের জন্য সাক্ষাৎকারকের সামনে সঠিক উত্তর দিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মনোভাব বা প্রভাবের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। সাক্ষাৎকারের সাফল্য তিনটি বস্তুর উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, সাক্ষাৎকারের বিভিন্ন কৌশল যেন সাক্ষাৎকারীর আয়ত্তে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, সাক্ষাৎকারের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলি যেন সুচিন্তিত এবং কার্যকরী হয়। তৃতীয়তঃ, অভীক্ষার্থী যেন সাক্ষাৎকারের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দিতে প্রস্তুত থাকে। এরজন্য অবশ্য "র‍্যাপোর্টের" (Rapport) প্রয়োজন।

[দুই] **কেস হিস্ট্রি পদ্ধতি (Case History Method) :** এই পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যক্তির অতীত আচরণ, শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা, অভ্যাস, বংশগত বৈশিষ্ট্য, সামাজিক পরিবেশ, গৃহ পরিবেশ, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী, শিক্ষা, জীবন-বিকাশের গতিধারা প্রভৃতি সবগুলি সম্পর্কে নিরপেক্ষ ভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং তারই উপর নির্ভর ক'রে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়। এই পদ্ধতি বিশেষ ভাবে অনুসরণ করা হয় মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে।

[তিন] **রেটিং স্কেল (Rating Scale) :** কোন একজন ব্যক্তির গুণ, বৈশিষ্ট্য বা কার্যাবলী সম্পর্কে কারো পর্যবেক্ষণের মতামত বা ফলাফলকে একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অনুযায়ী সুসংহত রূপে প্রকাশ করার একটি বিশেষ পদ্ধতিকে রেটিং স্কেল বলে। এই পদ্ধতিতে গুণের পরিমাপ অনুসারে ব্যক্তিত্ব বিচার করা হয়। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির কোন একটি বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য তায় সেই গুণ বা বৈশিষ্ট্যটি ব্যক্তিত্ব পরিসর রেখায়

ঠিক কোন জায়গাতে অবস্থিত, তা দেখা হয়। গুণ বা বৈশিষ্ট্যটিকে বিভিন্ন মাত্রা অনুযায়ী কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়—একেই স্কেল বলে। সাধারণতঃ দু'টি বিপরীত গুণকে দুই প্রান্তে রেখে স্কেল তৈয়ারী করা হয়।

প্রঃ—ব্যক্তি সামাজিক না অসামাজিক ?

	অতিরিক্ত সামাজিক	বেশ সামাজিক	মোটামুটি সামাজিক	বেশ অসামাজিক	অতিরিক্ত অসামাজিক
কমল :		×			
অমল :			×		
বিমল :				×	

উপরের স্কেলটি একটি পাঁচ মাত্রার (5-point) স্কেল। এই স্কেল তিন, পাঁচ, সাত বা দশ মাত্রারও হ'তে পারে। রেটিং বিভিন্ন ভাবে করা যায়। যেমন—

1	2	3	4	5
—2	—1	0	+1	+2
A	B	C	D	E
A— —	A—	A	A+	A+ + ইত্যাদি

এ জাতীয় অভীক্ষার কয়েকটা দোষ আছে। প্রথমতঃ, রেটিং পরীক্ষকের উপর অত্যন্ত বেশী মাত্রায় নির্ভরশীল। পরীক্ষক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী রেটিং করে থাকেন। সেজন্য একজন পরীক্ষকের রেটিং-এর উপর নির্ভর না করে বিভিন্ন পরীক্ষকের রেটিং-এর উপর নির্ভর করলে নির্ভরযোগ্য ফলাফল পাওয়া যায়। আর একটি দোষ হ'ল—হ্যালো এফেক্ট (Halo Effect)। যখন কোন ব্যক্তির বিশেষ একটা সংলক্ষণের মান সম্পর্কে আগে থেকেই একটা ধারণা গঠিত হয়ে থাকে, তখন অন্য কোন সংলক্ষণের রেটিং-এর ক্ষেত্রে সেই ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা হয় তার খুব বেশী, না হয় খুব কম রেটিং করে ফেলি। একেই বলে হ্যালো এফেক্ট।

তৃতীয় দোষটি হ'ল Generosity Error। কোন কোন ক্ষেত্রে পরীক্ষক তার পরিচিত ব্যক্তির কোন গুণ পরিমাপ করতে গিয়ে স্কেলের একটা বিশেষ উপযোগী স্থানে তাকে বসিয়ে দিতে পারেন। (বাস্তবিক ক্ষেত্রে হয়তো সে ঐ স্থানের উপযুক্ত নয়)। একে Woodworth বলেছেন Generosity Error।

Haggerty Olson Wickman Behaviour Rating Schedule-এর

-এর উদাহরণ—

(25) Is he even-tempered or moody

Solid, rare changes of mood. (3)	Generally very even tempered (1)	Is happy or depressed as Conditions warrant. (2)	Strong and frequent Changes of mood (4)	Has periods of extreme elations or depressions. (5)

উত্তম রেটিং স্কেলের শর্তাবলী (Requirements) ; রেটিং-স্কেল পদ্ধতিতে

যথার্থ ফল পেতে হলে কয়েকটি নিম্নলিখিত বিষয়ের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে—

[এক] প্রত্যেকটি গুণের পরিষ্কার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

[দুই] প্রতি গুণের মাত্রা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। মাত্রাগুলি যেন খুব কম বা খুব বেশী না হয়। পাঁচ বা সাত মাত্রার স্কেলই সবচেয়ে সুবিধাজনক।

[তিন] অভীক্ষককে (Rater) পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দিতে হবে। কোন গুণ সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার ধারণা না থাকলে তিনি সেই গুণ সম্পর্কে কোন বিচার করবেন না।

[চার] অভীক্ষককে পক্ষপাতিত্ব থেকে দূরে থাকতে হবে। স্বচ্ছ এবং বিজ্ঞানসম্মত পক্ষপাতবিহীন দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করলে Halo effect এবং Generosity Error দূর করা সম্ভব।

[পাঁচ] কোন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য একজন অভীক্ষকের পরিবর্তে একাধিক অভীক্ষক নিয়োগ করলে অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক বিচার পাওয়া সম্ভব।

[হ্যালো-এফেক্ট দূর করার উপায়—একটি দলের সমস্ত ব্যক্তিকে আগে একটি মাত্র সংলক্ষণের উপর রেটিং করে নিতে হবে। তারপর আর একটি সংলক্ষণের, তারপর আর একটির এবং এইভাবে পর পর সমস্ত সংলক্ষণগুলির রেটিং করতে হয়।]

[চার] **প্রশ্নগুচ্ছ (Questionnaire) :** এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে বিভিন্ন জাতীয় প্রশ্নের একটি তালিকা দেওয়া হয় এবং অভীক্ষার্থীকে প্রশ্নগুলির প্রকৃতি অনুযায়ী সেগুলির উত্তর দিতে বা চিহ্নিত করতে বলা হয়। উত্তরগুলি সাধারণতঃ "হ্যাঁ, না, জানি না" এই তিন রকমের হয়। এই সব প্রশ্নের উত্তর থেকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক জানা যায়। যেমন, ব্যক্তি অন্তর্মুখী না বহির্মুখী, মিশুক না নির্জনতাপ্রিয়, সামাজিক না অসামাজিক ইত্যাদি।

প্রশ্নগুচ্ছের প্রশ্নাবলী লিখিত অবস্থায় থাকার জন্য এগুলির অনেক সুবিধা আছে। এর প্রশ্নগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত বা আদর্শায়িত করা সম্ভব। সরাসরি প্রশ্নের উত্তর অনেকে এড়িয়ে চলতে পারে, কিন্তু এখানে সে সম্ভাবনা কম। বিভিন্ন লোকের উত্তর থেকে প্রতিটি প্রশ্নের কি ধরনের উত্তর পাওয়া যায় বা উত্তর হ'তে পারে তার একটি বিবরণী রাখা সম্ভব।

প্রশ্নগুচ্ছের প্রশ্নাবলীকে সাধারণতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) নির্বাচনী প্রশ্নাবলী (Screening Questions) এবং (খ) ব্যক্তি সত্তানির্ণায়ক প্রশ্নাবলী (Presonality Inventory)

নির্বাচনী প্রশ্নাবলী (Sereening Questions): এ জাতীয় প্রশ্ন বিশেষ কোন উদ্দেশ্যের জন্য নির্বাচন বা বাছাই করা হয়। বার্ট (Burt) ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম এই ধরনের একটি প্রশ্ন-তালিকা রচনা করেন। তাঁর তালিকায় মোটামুটি এই জাতীয় প্রশ্ন ছিল—

[এক] তুমি কি অপরের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালবাস?

[দুই] অপরিচিত লোকের মাঝে তুমি কি অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব কর?

[তিন] অপর লোক তোমার সম্পর্কে কি ভাবে, তুমি কি তা নিয়ে চিন্তা কর?

যে সমস্ত লোকের জন্য বিশেষধর্মী মনোবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের বা বিশেষ প্রকারের চিকিৎসার প্রয়োজন আছে সেই সমস্ত লোককে সাধারণ লোকদের থেকে বাছাই করার জন্য এই জাতীয় প্রশ্নাবলী ব্যবহার করা হয়। তবে সে ক্ষেত্রে প্রশ্নাবলীর একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়। যেমন ১৯১৮ সালে উডওয়ার্থ যে প্রশ্নাবলী তৈরী করেন তার নাম—সাইকোনিউরটিক ইন্‌ভেন্টরী। গত দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় এই জাতীয় অনেক নির্বাচনী প্রশ্নাবলী প্রস্তুত করা হয়েছে।

ব্যক্তিসত্তানির্ণায়ক প্রশ্নাবলী (Personality Inventory): এই জাতীয় প্রশ্নাবলীর সাহায্যে ব্যক্তিসত্তার বিশেষ বিশেষ দিকগুলি পরিমাপ করা হয়। এই জাতীয় প্রশ্নাবলীতে কতকগুলি সুবিধা আছে। এই প্রশ্নগুলির মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেই নিজের সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করে থাকে। ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ গুণাবলীকে আদর্শায়িত (standardised) করা যায়। এই অভীক্ষা সংশোধিত করা হয় যে গুণটির উপর প্রশ্নাবলী সেই গুণটির বিপরীত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের উপর প্রয়োগ ক'রে। কতকগুলি প্রশ্নাবলীর সাহায্যে কেবলমাত্র একটি গুণ পরিমাপ করা হয়। যেমন, কর্তৃত্ব করা, বশ্যতা স্বীকার করা (Ascendance Submission), অন্তর্মুখী বহির্মুখী (Introversion-Extroversion) ইত্যাদি। আবার অনেক প্রশ্নাবলীর সাহায্যে ব্যক্তিত্বের একটা সম্পূর্ণরূপ (Profile)-ও পাওয়া যায় অর্থাৎ এই ধরনের প্রশ্নাবলীতে বিশেষ একটি বা একাধিক সংলক্ষণের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি ক'রেই প্রশ্নগুলি তৈরী করা

হয়। সেই সংলক্ষণ বা সংলক্ষণগুলি তার মধ্যে কি পরিমাণে আছে তা নির্ণয় করা হয় ব্যক্তির উত্তর থেকে।

এ জাতীয় প্রশ্নাবলীর একটির নাম হ'ল মিনেসোটা মাল্টিফেজিক পার্সোনালিটি ইনভেন্টরী (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) বা সংক্ষেপে M M P I। এতে মোট ৫৫০টি উক্তি আছে। উক্তিগুলি পৃথক পৃথক কার্ডে ছাপানো থাকে। উক্তিগুলি পড়ে ব্যক্তিকে সেগুলি তিন ভাবে সাজাতে বলা হয়। যথা—"সত্য, মিথ্যা, জানি না।" প্রশ্নগুলি বিভিন্ন দিক থেকে সংগ্রহ করা হয়, যেমন, স্বাস্থ্য, মনোবিকৃতি, যৌনবিষয়, ধর্ম, রাজনীতি, শিক্ষা, পেশা, পরিবার, সমাজ, বিবাহ, ভ্রান্তি (delusion), অলীক বীক্ষণ (hallucination) ইত্যাদি। ব্যক্তির দেওয়া উত্তরগুলি থেকে তার ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে নানা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

M M P I-এর কয়েকটি উদাহরণ :—I do not tire quickly.
I am worried about sex matters.
I believe I am being plotted against.

M M P I ছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নাবলী আছে। যেমন, বার্ণরয়টার পার্সোনালিটি টেস্ট (Bernreutes Personality Test), Taylor Manifest Anxiety Scale, California Psychological Inventory, Allport's Ascendance—Submission Reaction Study, Jurgensen Classification Inventory (forced-choice technique) ইত্যাদি।

Allport-এর A-S Reaction Study-এর একটি উদাহরণ :

"মনে কর তোমার একজন বান্ধবীর সঙ্গে তুমি রেস্তোরাঁতে গিয়ে খাবার শেষে পরিচালক যে বিল দিল, তার পরিমাণ যেন তোমার কাছে একটু বেশী বলে মনে হল। তুমি কি করবে?

(ক) বিলটি সামনা সামনি খুঁটিয়ে দেখবে, (খ) বিলটি গোপন ভাবে দেখবে, (গ) বিলটি খুঁটিয়ে না দেখেই পয়সা দেবে।

(ক) উত্তরের জন্য নম্বর দেওয়া হয়+2, (খ) এর জন্য—1 এবং (গ)-এর জন্য O।

উপরে যে Forced Choice Technique বা বাধ্যতামূলক নির্বাচন

পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, তাতে ব্যক্তির সামনে দু'টি প্রশ্ন রাখা হয় এবং তার মধ্যে একটিকে নির্বাচন করতে বলা হয়। কখনও কখনও তিনটি প্রশ্ন দিয়ে সবচেয়ে বেশী পছন্দ এবং সবচেয়ে কম পছন্দ—যে দুটি প্রশ্ন, সে দুটি নির্বাচন করতে বলা হয়। বলা বাহুল্য, বিকল্প প্রশ্নগুলির আকর্ষণীয়তা মোটামুটি একই স্তরের হয়। যেমন, তুমি কি পছন্দ কর?, মোটা মাইনেতে একঘেয়ে কাজ করতে, না কম মাইনেতে চিত্তাকর্ষক কাজ করতে? কিংবা তুমি কি ধরনের স্ত্রী পছন্দ কর? ধনীর দুলালী অথচ অশিক্ষিত, না গরীবের মেয়ে কিন্তু উচ্চশিক্ষিত?

Shipley-এর Personality Inventory-ও বাধ্যতামূলক ও নির্বাচনমূলক।

[পাঁচ] **উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Factor Analysis): এই** পদ্ধতিটি আধুনিক গাণিতিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে সর্বাধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত। পদ্ধতিটির প্রথম প্রয়োগ করেন গিলফোর্ড এবং তার সহকর্মীরা। এরা প্রথমে ব্যক্তিসত্তামূলক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহ-পরিবর্তনের মান নির্ণয় করে ব্যক্তিসত্তার মৌলিক উপাদানগুলির (Factors) প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করেন। তাঁদের পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ থেকে ব্যক্তিসত্তার ১০টি মৌলিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। এই উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে তাঁরা নানারকম প্রশ্নাবলী প্রস্তুত করেন। তার মধ্যে বিখ্যাত একটি প্রশ্নাবলী হল Guilford Zimmerman Temperament Survey। এতে ঐ দশটি উপাদানের উপর প্রতি উপাদানের জন্য ৩০টি করে মোট ৩০০টি প্রশ্ন আছে। প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হয়, "হ্যাঁ?—না" এর মধ্যে যে কোন একটির সাহায্যে। উপাদান দশটি হল:—(১) General Activity G (সাধারণ সক্রিয়তা), (২) Restraint R (সংযম), (৩) Ascendance A (প্রাধান্য), (৪) Sociability S (সামাজিকতা), (৫) Emotional Stability E (প্রাক্ষোভিক সমতা), (৬) Objectivity O (বিষয়মুখিতা), (৭) Friendliness F (বন্ধুত্ব), (৮) Thoughtfulness T (চিন্তাশীলতা), (৯) Personal Relations P (ব্যক্তিগত সম্পর্ক) এবং (১০) Masculinity M (পৌরুষ)।

। কয়েকটি উদাহরণ ।

1. You start work on a new project with a great deal of enthusiasm......... YES? NO

2. You are often in a low spirit......... YES ? NO

3. Most people use politeness to cover up what is really "cut-throat competition......... YES ? NO

ইত্যাদি।

এই অভীক্ষার গড় দেওয়া হয় Percentile এবং Standard Score Norm-এর আকারে। অভীক্ষার্থীর প্রতিটি গুণের profile তৈরী করে তার সম্বন্ধে একটা ধারণা করা সম্ভব।

ক্যাটেল (Cattle)-ও উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে একটি ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষা প্রস্তুত করেন। সেটি Personality Factor Questionnaire নামে পরিচিত।

[ছয়] **প্রতিফলন বা প্রক্ষেপণ অভীক্ষা** (Projective Tests): উদ্দীপকের উত্তরে প্রতিক্রিয়া জানানো মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। প্রতিফলন অভীক্ষাতে এই উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রতিফলন বা প্রক্ষেপণ কথার অর্থ হল 'বাইরে নিক্ষেপ করা'।

ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, উদ্দীপকের উত্তরে ব্যক্তির যে প্রতিক্রিয়া, তার মধ্যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয়। সেই উদ্দীপকের অন্তর্ভুক্ত অংশগুলির উত্তরে সে প্রতিক্রিয়া জানায় তার নিজস্ব ভাবধারা বা অনুভূতির সাহায্যে। অবশ্য মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যাতে এ প্রক্রিয়া অবচেতন। ব্যক্তির নিজস্ব কোন চাহিদা, গোপন ইচ্ছা, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা অন্যের উপর প্রতিফলিত হয়। অবশ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় প্রতিফলন অভীক্ষা প্রয়োগ করতে হয়। এ অভীক্ষার আর একটি বিশেষত্ব হ'ল এতে জ্ঞানমূলক ও অনুভূতিমূলক—উভয় দিকের জ্ঞাতব্য তথ্যাদি জানতে পারা যায়। এ ছাড়া ব্যক্তির কোন প্রকার কমপ্লেক্স (Complex), অপরাধবোধ, পাপবোধ, অসঙ্গতি—যা সে সাধারণতঃ প্রকাশ করতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক, সেগুলির সম্বন্ধেও একটা ধারণা পাওয়া যায় এই অভীক্ষার সাহায্যে। এক কথায় অচেতন ও অবচেতন মনের অনেক গোপন বিষয়ের খবর দিতে সক্ষম প্রক্ষেপণ অভীক্ষাগুলি।

কয়েকটি প্রতিফলন অভীক্ষার উদাহরণ দেওয়া হল—

(ক) **রর্সা ইঙ্কব্লট অভীক্ষা** (Rorschach Inkblot Projective Test): প্রতিফলন অভীক্ষার ক্ষেত্রে সুপরিচিত এবং বহু আলোচিত অভীক্ষা হ'ল রর্সার ইঙ্কব্লট অভীক্ষা। হারম্যান্ রর্সা (Hermann Rorschach) নামক

একজন সুইজারল্যাণ্ডবাসী মনোবিজ্ঞানী চিকিৎসক ১৯২১ সালে এই অভীক্ষাটি প্রবর্তিত করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে অভীক্ষার্থীকে কয়েকটি কালির ছাপ দেখান হয় এবং সেই দেখে অভীক্ষার্থী তার যা অর্থ নিরূপণ করে সেটি অভীক্ষককে জানায়। অভীক্ষক তার এই বর্ণনা থেকে তার মানসিক সংগঠন, প্রক্ষোভ, চিন্তাধারা, মনোভাব, ইচ্ছা, কমপ্লেক্স প্রভৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারেন এবং তার মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ জানার চেষ্টা করেন।

একটি কাগজের মাঝামাঝি জায়গাতে খানিকটা কালি ফেলার পর যদি কাগজটিকে ঠিক মাঝখানে ভাঁজ করা হয় তবে দু'দিকে একই রকমের কালির ছাপ পাওয়া যাবে। এইভাবে রর্শার ইঙ্কব্লট প্রস্তুত করা হয়। অভীক্ষাগুলি শিশু থেকে আরম্ভ করে পূর্ণবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের উপর প্রয়োগ করা চলে। অভীক্ষাতে মোট ১০টি ব্লট আছে। এগুলি পৃথক পৃথক কার্ডের উপর ছাপা থাকে। ১০টি ব্লটের মধ্যে ৫টি হ'ল ধূসর ও কালো রং-এর, ২টি ধূসর কালো ও গাঢ়লাল রং-এর আর বাকি ৩টি বিভিন্ন রং-এর।

কার্ডগুলি অভীক্ষার্থীর সামনে একের পর এক উপস্থাপিত করা হয়। তাকে বলা হয় "লোকে এর মধ্যে বিভিন্ন জিনিসের ছবি দেখে, এ দেখে বিভিন্ন জিনিস সম্বন্ধে ধারণা বা চিন্তা করে। এখন বল তুমি এর মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছ, বা এটা দেখতে কি রকম? বা এটা কি হতে পারে? বা তুমি এর থেকে কি কি চিন্তা করতে পার?"

এই অভীক্ষার জন্য কিন্তু কোন সময় সীমা নির্দিষ্ট করা ছিল না। বিভিন্ন কার্ডের জন্য নির্দিষ্ট কোন উত্তরও ঠিক করা ছিল না। অভীক্ষার্থীর উত্তর লিপিবদ্ধ করলেই কিন্তু অভীক্ষকের কাজ শেষ হয় না। অভীক্ষার্থী এক কার্ড থেকে অন্য কার্ডে যেতে বা এক উত্তর থেকে অন্য উত্তর দিতে কত সময় নিচ্ছে, কিভাবে কার্ডগুলি ধরছে, কার্ডগুলি দেখে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কোন মন্তব্য করছে কিনা, উত্তর দেবার সময় সে উল্লেখযোগ্য কোন ভঙ্গী বা আচরণ করছে কিনা এ সমস্তের হিসেব রাখতে হয় অভীক্ষককে।

এ সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য জানার পর অভীক্ষককে দেখতে হবে ছাপের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের প্রভাব অভীক্ষার্থীর উপর বেশী, অভীক্ষার্থী কোন্ কার্ডের কোন্ অংশে বেশী মনোযোগ দিয়েছে, ছাপগুলির অবস্থান, রং, শেড্ (shade), স্থিতি বা গতি ইত্যাদির মধ্যে কোনটির প্রভাব তার উত্তরের উপর বেশী।

এই অভীক্ষাতে নম্বর দেবার সময় রর্শা অভীক্ষাটিকে তিনটি দিক থেকে বিচার করেছিলেন। সেগুলি হ'ল—(১) অবস্থিতি (location), (২) বৈশিষ্ট্য (determinants) এবং (৩) বিষয়বস্তু (contents)।

অবস্থিতি : অবস্থিতি বলতে বোঝায় ব্যক্তি যে উত্তর দিচ্ছে, ছাপের কোন্ অংশ দেখে সে সেই উত্তর দিচ্ছে, তা নির্ণয় করা। ছাপটিকে সমগ্র ভাবে দেখছে, না তার কোন একটি অংশ দেখছে, সে ছাপটি ভালোভাবে দেখে উত্তর দিচ্ছে, না তার কল্পনা থেকে উত্তর দিচ্ছে, এ সমস্তও দেখা হয়।

বৈশিষ্ট্য : বৈশিষ্ট্য বলতে বোঝায় ছাপের আকৃতি বা ধরন, রং, শেড্ এবং গতি। বাস্তবক্ষেত্রে যদিও ছাপগুলির কোন 'গতি' নেই তবুও অভীক্ষার্থী ছাপের মধ্যে কোন গতিশীল বস্তু বা জীবের কল্পনা করে থাকে।

বিষয়বস্তু : নম্বর দেওয়ার পদ্ধতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বস্তুও পরিবর্তিত হয়। তা হলেও অভীক্ষার্থী যে উত্তর দেয়, তার বিষয়বস্তুগুলিকে মোটামুটি কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হ'ল—মানুষ, শারীরিক বা দৈহিক গঠন। জীব-জন্তু, জীব জন্তুর দেহের কোন অংশ, উদ্ভিদ, মানচিত্র, মেঘ, আকাশ, রক্ত, এক্স রে, যৌন সম্বন্ধীয় বা কোন প্রতীক।

যে সমস্ত ব্যক্তি ছাপগুলি সামগ্রিক ভাবে এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে

তাদের মধ্যে ধারণামূলক চিন্তনের অস্তিত্ব (Conceptual Thinking) আছে, এ কথা ধরে নেওয়া হয়। যারা দুর্বলচিত্ত ও অব্যবস্থিত চিত্ত তারা ছাপটির সমগ্র অংশে মনোনিবেশ করতে পারে না। যারা রং-এর দিকে বেশী

আকৃষ্ট হয়, তারা আবেগ প্রধান। যারা 'গতিশীল মানুষ' কল্পনা করে কল্পনা-শক্তি তাদের বেশী, কিন্তু তারা প্রায়ই দিবাস্বপ্ন দেখে। আবার যারা উদ্ভিদ বা জীব-জন্তু দেখে তাদের চিন্তা-শক্তিতে কোন নতুনত্ব নেই, একথাই বুঝতে হবে। যাদের মনে কোন জট আছে, যারা ক্ষীণ বুদ্ধি বা দুর্বলচিত্ত-বিশিষ্ট তারা প্রায় সব ছাপের উত্তর একই দিয়ে থাকে।

যাই হোক একটা কথা মনে রাখা দরকার। যেমন তেমন করে অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে ব্যক্তির বিচার করলে সুবিচার করা সম্ভব নয়। দক্ষতার সঙ্গে অভীক্ষাটি প্রয়োগ করা, বিচক্ষণতার সঙ্গে নম্বর দেওয়া ও যথার্থ ভাবে তার সমালোচনা করার জন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ মনস্তত্ত্ববিদের প্রয়োজন।

(খ) **কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ পরীক্ষণ-পদ্ধতি :** (Thematic-Apperception Test বা T A T) : মুরে (Murray) এবং হার্ভার্ড মনস্তাত্ত্বিক ক্লিনিকে (Harvard Psychological Clinic) তাঁর সহকর্মীরা, বিশেষতঃ মর্গান (Morgan) এই পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রবর্তক। এই পদ্ধতিতে অভীক্ষার্থীর সামনে একটি ছবি রাখা হয়। ছবিটির কিন্তু অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অর্থাৎ ঐ ছবিটি দেখে নানাপ্রকার গল্প তৈরী করা সম্ভব। অভীক্ষার্থীকে ছবিটি দেখে তার মনে কি গল্পের উদয় হয় সেটি বলতে বলা হয়।

অভীক্ষাটিতে ১৯টি কার্ডে সাদা কালোতে বিভিন্ন ছবি ছাপানো থাকে এবং ১টি খালি (blank) কার্ড থাকে। ছবিগুলি দেখে অভীক্ষার্থীকে বলতে হয় ছবিতে যে ঘটনা ঘটছে তার কারণ কি হ'তে পারে, ছবিটিতে কি ঘটেছে বা ঘটছে বলে মনে হচ্ছে, ছবির নায়ক-নায়িকারা বা পাত্র-পাত্রীরা কি ভাবছে ইত্যাদি সবশেষে তাকে ছবিগুলি সম্বন্ধে পৃথক পৃথক গল্প তৈরী করতে বলা হয়। মুরের প্রথম পদ্ধতিতে দুটি ১ ঘণ্টার পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। প্রতি পরীক্ষার জন্য ১০টি করে ছবি ব্যবহার করা হ'ত। প্রথম বারের পরীক্ষার জন্য যে ছবি ব্যবহার করা হ'ত, দ্বিতীয় বারে ঠিক সেগুলিই ব্যবহার করা হ'ত না। দ্বিতীয় বারের ছবিগুলি হ'ত আরো বেশী অবাস্তব, নাটকীয়, সমস্যামূলক এবং অভীক্ষার্থীকে তার কল্পনার যথেচ্ছ ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হ'ত। ছেলে, মেয়ে, ১৪ বৎসরের ঊর্ধ্বে যাদের বয়স সেইরকম ছেলে এবং মেয়ে এই চার দলের জন্য ২০টি করে পৃথক কার্ডে পৃথক ছবির ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বর্তমানে সুবিধার জন্য তিন প্রকার ছবির ব্যবস্থা করা হয়। ছেলেদের জন্য ১০টি, মেয়েদের জন্য

১০টি এবং উভয় দলের জন্যই সাধারণ ছবি ১০টি। প্রত্যেক দলকেই কিন্তু ২০টি ছবি দেখানো হচ্ছে। অভীক্ষার্থী ছবিটি দেখে যে গল্পটি তৈরী করে, সেই গল্পের

বর্ণনার মাধ্যমে অভীক্ষক অভীক্ষার্থীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, অতৃপ্ত বাসনা, কামনা, ইচ্ছা, তার মনোভাব, আবেগ, কমপ্লেক্স, মানসিক জট, কল্পনা শক্তি ইত্যাদি জানার চেষ্টা করেন এবং সেইগুলির সাহায্যে তার ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করার চেষ্টা করেন। অভীক্ষককে প্রথমেই কিন্তু নির্ণয় করতে হবে অভীক্ষার্থীর গল্পের নায়ক বা নায়িকা (hero) কে এবং কোন্ চরিত্রের সঙ্গে তার অভেদীকরণ (Identification) হয়েছে। অভীক্ষা গ্রহণ শেষ হয়ে গেলে অভীক্ষক অভীক্ষার্থীর সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের (Interview) মাধ্যমে তার গল্পের বা কাহিনীর উৎস সম্বন্ধে একটা ধারণা করেন।

অভীক্ষার্থীর কাহিনীটি থেকে তার আশা, আকাঙ্ক্ষা, অপরিতৃপ্ত ইচ্ছা, মনোভাব, মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, কল্পনাশক্তি প্রভৃতির সাহায্যে তার ব্যক্তিত্বের গঠন এবং ঐ ব্যক্তিত্বের বিশেষ বিশেষ দিক নিরূপণ করার চেষ্টা করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বর্তমানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে T A T তৈরী করা হয়েছে। তাদের পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে হয় এই রকম প্লট ও ছবির সাহায্যে তাদের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক জানার চেষ্টা করা হয়। তবে এই জাতীয় অভীক্ষাতে তাদের অপ্রকাশিত মানসিক ইচ্ছা বা দ্বন্দ্বের স্বরূপ ভালোভাবে জানতে পারা যায়। এই জাতীয় অভীক্ষার নাম দেওয়া হয়েছে শিশু সংবোধন অভীক্ষা (Children's apperception Test বা C A T)।

(গ) **শব্দানুষঙ্গ পদ্ধতি (Word Association Test) :** প্রতিফলন অভীক্ষার একটি অতি পুরাতন পদ্ধতি হ'ল শব্দানুষঙ্গ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে কতকগুলি "শব্দ" (word) উদ্দীপক হিসেবে একটির পর একটি করে অভীক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং সেই উদ্দীপকের উত্তরে অভীক্ষার্থীর দেওয়া "প্রতিক্রিয়া শব্দ" (Response word) টি লিপিবদ্ধ করা হয়। অভীক্ষার্থীকে এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হয় :—"আমি (অভীক্ষক) তোমাকে (বা আপনাকে) একটি শব্দ বলছি। সেই শব্দ শোনার সঙ্গে প্রথম যে কথাটি বা চিন্তাটি তোমার মনে আসবে, সেটিই বলবে। কথাটি বা চিন্তাটি যদি অসংযত, অশ্লীল, অবাস্তব বা অসম্ভব বলে মনে হয়, তবুও প্রথমটিই বলবে। চেপে রাখবার কোন চেষ্টা করো না।"

অভীক্ষার্থীর উত্তর বিচার করার সময় সে উত্তর দিতে কতটা সময় নিয়েছে, উত্তর দিবার সময় ইতস্তত করছে কিনা, তার মুখের আকৃতিতে কোন পরিবর্তন হচ্ছে কিনা এই সমস্তও লক্ষ্য করতে হয়। অভীক্ষার্থীর উত্তরের সাহায্যে তার অবচেতন বা অচেতন মনের অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত করা সম্ভব হয় এবং তার কমপ্লেক্স বা অবদমিত ইচ্ছার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী Yung এবং পরে Kent ও Rosanoff এই অভীক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।

। একটি উদাহরণ ।

ক্রমিক নং	উদ্দীপক শব্দ	প্রতিক্রিয়া শব্দ		সময়		মন্তব্য	
		অভীক্ষার্থী ১	অভীক্ষার্থী ২	অ ১	অ ২	অ ১	অ ২
১	মাষ্টার মশাই	স্কুল	কড়া	১"	২"	স্বা	অ
২	ঝগড়া	প্রতিবেশী	মারামারি	৩"	১"	অ	স্বা

স্বা—স্বাভাবিক
অ—অস্বাভাবিক
ইত্যাদি

এই অভীক্ষার আর একটি পরিবর্তিত আকৃতি-বিশিষ্ট অভীক্ষা হ'ল—

অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা (Incomplete Sentence Completion Test): এই অভীক্ষাতে অভীক্ষার্থীর সামনে এমন কতকগুলি অসম্পূর্ণ বাক্য উপস্থাপিত করা হয় যেগুলি বিভিন্ন ভাবে সম্পূর্ণ করা যায়। এই সম্পূর্ণকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী, মনোভাব, প্রবণতা বা মানসিক সংগঠনের একটা বিশ্বাসযোগ্য রূপ পাওয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণ—

I feel………

If I had my way………

My father used to………

Women are………

ইত্যাদি।

এই জাতীয় আর একটি সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা হ'ল গল্প সম্পূর্ণ করণ' (Story completion)। অভীক্ষার্থীকে নাটকীয় ঘটনাসমূহের একটা বিবরণ দেওয়া হয় অর্থাৎ তাকে একটা অসম্পূর্ণ 'প্লট' বলে দেওয়া হয়। এর সাহায্যে তাকে একটি পূর্ণাঙ্গ গল্প তৈরী করতে বলা হয়।

(ঘ) **অন্যান্য প্রতিফলন অভীক্ষা**: এই সমস্ত অভীক্ষা ছাড়াও প্রতিফলন অভীক্ষার শ্রেণীভুক্ত বহু বিভিন্ন অভীক্ষা উদ্ভাবিত হয়েছে। কতকগুলি নাম দেওয়া হল :—

A. The Blacky Pictures.

B. Make A Picture Story (M. A. P. S.)—Shneidman.

C. Argument Completion—Murray and Morgan.

D. Rosenzweig Picture-Frustration Study (P—F Study)

E. Szondi Test.

F Tomkins-Horn Picture Arrangement Test.

G. Machover Draw-a-Person Test.

H. House-Tree-Person Projective Technique (H-T-P)-Buck.

এ ছাড়া খেলাধুলা (Play Techniques), সাইকো ড্রামা (Psycho-drama) ইত্যাদিকেও প্রতিফলন অভীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(ঙ) **পরিস্থিতি অভীক্ষা** (Situation Test): এই অভীক্ষা সম্বন্ধে C. T. Morgan তাঁর An Introduction to Psychology বইতে

বলেছেন—"In such test a person is placed in a problem situation with other people and his way of dealing with the problem is observed." অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে অন্যের সাথে কি ভাবে আচরণ করে, তার মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করা হয়। এ জাতীয় অভীক্ষার উদাহরণ হ'ল—Character Education Inquiry (CEI)—Hartshorne May and Others; Circles Puzzle; Magic Square ইত্যাদি।

(৭) **সমাজমিতিমূলক পদ্ধতি** (Sociometric Methods বা Sociometry): পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতি বিধানের ক্ষেত্রে সামাজিক উপাদান এবং শক্তিগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা সামাজিক সংগঠনের রূপ এবং বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তির নিজের স্থান নির্ধারণ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। একটি বিশেষ দলের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্ক থাকা সম্ভব। তাদের এই সম্পর্ক বৈচিত্র্যকে একটি চিত্রের আকারে প্রকাশ করা যায়। এই চিত্রটিকে সোসিওগ্রাম (Sociogram) বলা হয়। সোসিওগ্রাম বা সমাজচিত্রের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতিকে সমাজমিতিমূলক পদ্ধতি বলা হয়। J. L. Moreno এই পদ্ধতিকে যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত করেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। এই পদ্ধতি সেই সমস্ত লোকের উপরই সচরাচর প্রয়োগ করা হয় যারা দীর্ঘদিন একসঙ্গে কোন কাজ করছে বা যারা দীর্ঘদিন ধরে পরস্পরের পরিচিত। স্কুলের ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, ফ্যাক্টরীর কর্মী, ক্লাবের সভ্য বা মিলিটারী ইউনিটের সৈনিক প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যায়। এই পদ্ধতি দু'ভাবে কার্যকরী হয়। প্রথমতঃ, এর সাহায্যে একটি গোটা দলের মানসিক সংগঠনের খবর পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত গুণ বা দোষের একটা মোটামুটি হিসেব পাওয়া যায় এই পদ্ধতির সাহায্যে।

পদ্ধতিটির প্রয়োগ কৌশল খুবই সরল। কোনও বিশেষ দলের সোসিওগ্রাম তৈরী করার সময় দলের প্রত্যেকটি সদস্যকে সেই দল থেকে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে পছন্দ করতে বলা হয় যার সঙ্গে বা যাদের সঙ্গে সে বিশেষ বিশেষ কাজ করতে বা বিশেষ কোন সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছুক। অভীক্ষার্থীকে কখনও বলা হয় সে ইচ্ছামত যথেষ্ট-সংখ্যক ব্যক্তিকে পছন্দ করতে পারে, কখনও মাত্র একজনকে পছন্দ করতে বলা হয়, আর কখনও বা নির্দিষ্ট-সংখ্যক ব্যক্তিকে পছন্দ করতে

বলা হয়। শেষের ক্ষেত্রে আবার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পছন্দের কথা বলা থাকে। এই পছন্দ করা কাজটা কিন্তু একটা বিশেষ গুণ বা অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়। অংশকার্থীদের পছন্দ করা নামগুলি লিখে দিতে হয়। পরে সেই লিখিত নামগুলির সাহায্যে সমাজচিত্র তৈরী করা হয়। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো হ'ল।

ধরা যাক্ একটি ক্লাসে আটটি ছাত্রী আছে। তাদের প্রত্যেককে প্রশ্ন করা হ'ল বেড়াতে যাবার সঙ্গিনী হিসেবে সে কাকে পছন্দ করে। তাদের কাল্পনিক উত্তর থেকে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের একটা চিত্ররূপ নীচে দেওয়া হ'ল :—

চিত্রটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমেই ধরা যাক্ কৃষ্ণার কথা। কৃষ্ণাকে পছন্দ করেছে অপর চার জন ছাত্রী। কৃষ্ণাকে বলা চলে শ্রেণীর "তারকা" (star)। অপর পক্ষে অনীতা কাউকে পছন্দ করেনি, আবার অনীতাকেও কেউ পছন্দ

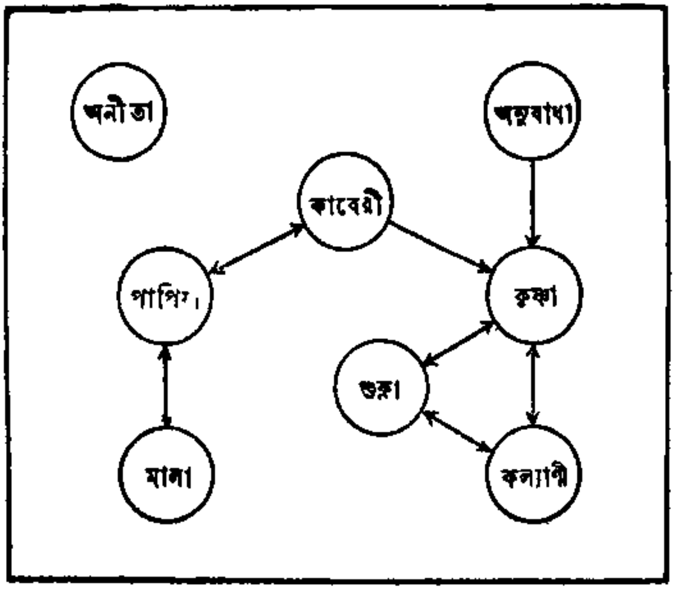

করেনি। অনীতাকে বলা চলে "নিঃসঙ্গ" বা "পরিত্যক্ত" (Isolate)। অনুরাধা আর মালা নিজের পছন্দ করা সঙ্গিনীর সন্ধান দিয়েছে, কিন্তু ঐ দুজনকে আর কেউ পছন্দ করেনি। এদেরকে কিন্তু নিঃসঙ্গ বলা চলে না। কোন কোন মনোবিজ্ঞানী এদেরকে বলেছেন "অ-পছন্দ" (unchosen)। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল কৃষ্ণা, শুক্লা ও কল্যাণীর ত্রিভুজ সংগঠন। এদের

পারস্পরিক পছন্দের ফলে একটি ত্রিভুজের সৃষ্টি হয়েছে। কাবেরী ও পাপিয়া পরস্পর পরস্পরকে পছন্দ করে। কাবেরী কিন্তু পাপিয়ার দলেও আছে, আবার কৃষ্ণা, শুক্লা, কল্যাণীর দলেও আছে।

সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন গবেষণার ক্ষেত্রে সমাজ চিত্র যে যথেষ্ট সাহায্য করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মোরেনো এবং অন্যান্য বহু মনস্তত্ত্ববিদ্ এর সাহায্যে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু কেবল সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রেই নয়, ব্যক্তিগত সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সমাজচিত্র নানা তথ্য সরবরাহ করে। দলের বিশেষ একজন লোক অন্যান্যদের সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করে বা ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে দলের অন্যান্যদের মতামত কি, এই সমস্ত তথ্যাদি জানতে পারা যায় সমাজ চিত্রের সাহায্যে।

স্কুলে শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে তোলেন। সেই ধারণা যাচাই করে নেওয়া হয় সমাজ চিত্রের সাহায্যে। এটি শিক্ষককে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করে। যেমন, (১) ছাত্রদের মধ্যে ভালো এবং মন্দ সম্পর্ক আবিষ্কার করা, (২) ক্লাশে কোন্ ছাত্রের নেতা বা দলপতি হবার সম্ভাবনা এবং ক্ষমতা আছে তা জানা, (৩) স্কুলের মধ্যে একপ্রকার এবং স্কুলের বাইরে আর একপ্রকার দল থাকলে দু'টিরই স্বরূপ জানা, (৪) জাতি ধর্ম, অর্থনৈতিক, পারিবারিক ইত্যাদি বিভিন্ন কারণের জন্য একত্রিত বা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া, (৫) সহশিক্ষা প্রচলিত থাকলে ছেলে এবং মেয়েদের দলের তুলনামূলক বিচার করা ইত্যাদি। যে সমস্ত ছেলেমেয়ে পরিত্যক্ত বা যাদের অন্য কেউ পছন্দ করছে না তাদের আচরণই সমস্যামূলক হয়ে ওঠে। সে রকম কোন সম্ভাবনা থাকলে তা এই সমাজচিত্রের সাহায্যেই জানতে পারা যাবে এবং জানা গেলেই তখন তা দূর করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে সমাজচিত্র যে সম্পূর্ণ ত্রুটিশূন্য, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ (Development of Personality): শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন সে কোনরূপ ব্যক্তিত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু জন্মের পরই শিশুর মধ্যে পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাব কার্যকরী হয়ে উঠে আর শিশুও তার দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিয়ে পরিবেশের এই বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে শুরু করে। একদিকে শিশুর অন্তর্নিহিত বহুমুখী বৃদ্ধি প্রচেষ্টা আর একদিকে পরিবেশের বিভিন্ন শক্তি—এই দু'য়ের মিথষ্ক্রিয়া বা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই জন্মলাভ করে ব্যক্তিত্ব। কিন্তু এই

ব্যক্তিত্ব কোন স্থির বস্তু নয়—চলমান একটি ঐক্য। এই ব্যক্তিত্ব গঠনের কাজটিও একেবারে সম্পূর্ণভাবে কোনদিন শেষ হয়ে যায় না। সারা জীবন ধরেই ব্যক্তিত্ব-বিকাশের প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে। বিচিত্র পরিবেশের বিচিত্রতর পরিবর্তন অনুযায়ী ব্যক্তিত্বের মধ্যেও একটা নিয়ত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পরিবর্তনশীল হ'লেও প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য ও স্থায়িত্ব থাকে—যার ভিত্তিতে আমরা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা অর্জন করতে পারি। এই ঐক্য ও স্থায়িত্ব না থাকলে কোন ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যই আমরা নির্ণয় করতে পারতাম না।

আমরা আগেই জেনেছি ব্যক্তিত্বের বিকাশে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর উপাদান কার্যকরী। এক হ'ল তার প্রাকৃতিক উপাদান অর্থাৎ বংশধারা, দৈহিক গঠন, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ইত্যাদি। আর একটি হ'ল—সামাজিক উপাদান। ব্যক্তিত্বের বিকাশে সাধারণতঃ দু'টি প্রক্রিয়া বিশেষভাবে কার্যকরী। সে দুটি প্রক্রিয়া হ'ল পৃথক্করণ (Differentiation) ও সমন্বয়ন (Integration)। এখন এই দুটি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হ'ল—

পৃথককরণঃ শিশু তার জীবনের প্রথম দিকে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তিমূলক আচরণ করে থাকে। কোন বিশেষ জাতীয় আচরণ তার পক্ষে করা সম্ভব হয় না বলে সে সমস্ত আচরণ করে তার সর্বদেহ দিয়ে। এর ফলে তার আচরণ হয়ে উঠে সামগ্রিকধর্মী। শিশুর এইরূপ আচরণ বয়স্কদের আচরণের মত কোন প্রকার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে না। কোন একটি বিশেষ উদ্দীপকের প্রতি বিশেষভাবে আচরণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু শিশু যত বড় হতে থাকে, ততই তার আচরণগুলি অনেক বেশী সুনির্দিষ্ট, নির্ভুল ও কার্যকরী হতে থাকে। তখন সে বিভিন্ন উদ্দীপকের উত্তরে পৃথক ভাবে সাড়া দিতে শেখে। পৃথক বা স্বতন্ত্র উদ্দীপকের উত্তরে পৃথক বা স্বতন্ত্র প্রতিক্রিয়াকেই পৃথককরণ বা বিভেদীভবন বলা হয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রাথমিক স্তর হ'ল এই প্রক্রিয়াটি।

সমন্বয়নঃ এই প্রক্রিয়া হ'ল ব্যক্তিত্ব বিকাশের দ্বিতীয় স্তর এবং এর উপরই ব্যক্তিত্বের সুসম্পূর্ণ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত। শিশু যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও উপকরণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল—বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের সংস্পর্শে আসার ফলে সেগুলি বিভিন্ন মানসিক সংগঠনের রূপ পরিগ্রহ করে। অবশ্য

প্রথম দিকে এই সংগঠনগুলি থাকে বিশৃঙ্খল ও অসংহত অবস্থায়। কিন্তু আরো বয়স বাড়লে এই সমস্ত মানসিক সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সুশৃঙ্খল, সুসংহত ও সামগ্রিক রূপ ধারণ করে। এইজন্যই এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় সমন্বয়ন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া চলে দীর্ঘ দিন ধরে এবং এর থেকেই ব্যক্তিত্বের মুল রূপটি ধরা পড়ে। এই সমন্বয়ন আবার নানা স্তরের মধ্যে সমন্বয়ন ঘটতে ঘটতে চলে এবং অবশেষে ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হ'লে এর কাজ শেষ হয়ে যায়। যে সমস্ত স্তরের মধ্যে সমন্বয়ন ঘটে, সেগুলি হ'ল—

[এক] **অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া** (**Conditioned Reflex**): এই স্তরে শিশু নির্দিষ্ট উদ্দীপকের উত্তরে প্রতিক্রিয়া করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট উদ্দীপকের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো উদ্দীপকের উত্তরেও সাড়া দেয়। এই জাতীয় প্রতিক্রিয়া হ'ল সঙ্গতি বিধানে শিশুর সহজ ও সরলতম প্রচেষ্টা এবং এগুলির মাধ্যমেই সে পরিবর্তিত ও নতুন উদ্দীপকের সঙ্গেও সার্থক ভাবে সঙ্গতি সাধন করতে পারে।

[দুই] **অভ্যাস** (**Habit**): অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়াগুলি প্রথম দিকে থাকে অসংহত ও অসংবদ্ধ। পরে এগুলির মধ্যেই সমন্বয়ন দেখা দেয় এবং তা থেকে সৃষ্ট হয় বিভিন্ন অভ্যাস। একই উদ্দীপকের উদ্দেশে বারবার অপরিবর্তিত ও গতানুগতিক পদ্ধতিতে সাড়া দেওয়ার নামই হ'ল অভ্যাস। অভ্যাস গঠন হ'ল সমন্বয়নের প্রথম স্তর।

[তিন] **সংলক্ষণ** (**Traits**): সমন্বয়নের দ্বিতীয় স্তরে সৃষ্টি হয় নানা জাতীয় মানসিক সংগঠন। এই সংগঠনগুলি মোটামুটি স্থায়ী প্রকৃতির এবং এইগুলিই ব্যক্তির আচরণের গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত করে দেয়। মানসিক সংগঠন অনেক প্রকারের হ'তে পারে। যেমন, দৃষ্টিভঙ্গী, রস, কমপ্লেক্স, আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদি। এই সমস্ত সংগঠনকে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ বলা হয় এবং প্রকৃতপক্ষে এগুলিই হ'ল ব্যক্তিত্বের একক।

[চার] **অহংবোধ** (**Ego or Self**): এই স্তরে বিভিন্ন সংলক্ষণের মধ্যে আবার সমন্বয় দেখা দেয় এবং ব্যক্তির মধ্যে অহংবোধের সৃষ্টি হয়। সংলক্ষণ-গুলিও প্রথম দিকে বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন থাকে। কিন্তু অহংবোধ জাগ্রত হলেই এগুলির মধ্যে সমন্বয়ন সাধিত হয়। শিশুর অহংসত্তা বিকশিত হলেও এটি একেবারে শুরু থেকে কোন সুসম্পূর্ণ বা সুগঠিত রূপ নেয়না—বিভিন্ন পরিবেশে অহংসত্তা বিভিন্ন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

[পাঁচ] ব্যক্তিত্ব (Personality) : বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র অহংসত্তাগুলি যখন পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি একক, অনন্ত ও অখণ্ড অহংসত্তার উদ্ভব হয় তখনই ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়। এর আগে শিশুর মধ্যে যে সমস্ত বিভিন্ন জাতীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল—এই স্তরে সে সবগুলির মধ্যেও একটা ঐক্য ও সংহতি দেখা দেয়। অর্থাৎ সংলক্ষণ, প্রতিক্রিয়া, অহংবোধ সবকিছুই একটা সামগ্রিক ও ঐক্যবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে। এই স্তরেই ব্যক্তিত্ব তার পরিপূর্ণ পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছয়।

অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার ব্যক্তিত্ব বিকাশের একটা সময়গত স্তরের হিসেবও দিয়েছেন। কিন্তু ঠিক ঐভাবে ব্যক্তিত্ব বিকশিত হবেই—একথা জোর করে বলা যায় না। খানিকটা পরিবর্তন হবেই। যাই হোক, সময়গত বা বয়সগত স্তরের হিসেবটি এইরূপ—

* জন্মের ঠিক পর থেকেই——অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া—(২ বা ৩ বছর বয়স অবধি).
* নার্সারি স্তর——অভ্যাস।
* ৫।৬ বছর বয়েস থেকে——সেন্টিমেন্ট, কমপ্লেক্স ইত্যাদির সৃষ্টি।
* প্রাক্ যৌবনাগম——অহংবোধ জাগরণ।
* যৌবনাগম——অহংবোধের মধ্যে সমন্বয়ন শুরু।
* পরবর্তী যৌবন——ব্যক্তিত্ব পূর্ণভাবে বিকশিত।

ব্যক্তিত্বের ফ্রয়েডীয় সংব্যাখ্যান সম্বন্ধে "মনঃসমীক্ষণ" অধ্যায়ে আলোচনা করা হ'ল।

। ছয় ।

চরিত্র

(Character)

[Psychologicaliy employed of that integration of habits, sentiments and ideals which renders an individual's action relatively stable and predictable ; special features in this integration or revealing themselves in action are designates character—Dictionary of Psychology.

Character is personality evaluated and personality is character devaluated—Allport.

Character is the sum-total of man's instinctive tendencies. It is the sum-total of acquired dispositions, a mental structure which is lasting, enduring and ever influencing conduct.—Mc. Dougall.

Character is the result of habits of thoughts, emotion and will. It is the permanent bent of mind constituted by settled habits of will.. ... ...

Habits are the foundation of character. Good habits build good character. Conduct is the outer expression of character.]

চরিত্রের স্বরূপ (Nature of Character) : ব্যক্তিত্ব যেমন একটি যৌগিক ধারণা—চরিত্রও তেমনি। সেই কারণে চরিত্রেরও একটা সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। প্রচলিত ভাষণে চরিত্রকে অনেক ভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়। চরিত্রের সংজ্ঞা দেওয়ার চেয়ে একে বর্ণনা করা অনেক সহজ। সাধারণ অর্থে চরিত্র কথাটি "যৌন শুচিতা" অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আসলে এটি তার চেয়েও ব্যাপক। আবার অনেক সময় চরিত্র বলতে ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলি সদ্‌গুণের সমাবেশকে বুঝিয়ে থাকি। যখন আমরা বলি "লোকটি চরিত্রবান"—তখন ধরে নেওয়া হয় তার মধ্যে কতকগুলি বাঞ্ছনীয় সদ্‌গুণ আছে। আর যখন বলা হয়—"লোকটি চরিত্রহীন" তখন ধরে নেওয়া হয় তার মধ্যে ঐ বাঞ্ছনীয় সদ্‌গুণগুলির অভাব আছে বা তার মধ্যে কতকগুলি অবাঞ্ছনীয় অসদ্‌গুণের সমাবেশ আছে। তবে "চরিত্রহীন" বলে কোন কথা মনোবিজ্ঞান মেনে নেয় না। তারও একটা চরিত্র আছে যদিও সেটা অবাঞ্ছনীয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমরা সাধারণ ভাবে চরিত্রকে ভালো ও মন্দ এই দুই অর্থেই ব্যবহার করে থাকি—যদিও

নৈতিক দিক থেকে বিচার করলে চরিত্র কথাটি সচ্চরিত্র অর্থে অর্থাৎ ভালো দিকের পরিপ্রেক্ষিতেই ধরা হয়।

অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার 'চরিত্র' শব্দটির মনোবিজ্ঞানে কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না। তাঁরা বলেন—ব্যক্তিত্বই মানুষটির পরিচয় দেবার পক্ষে যথেষ্ট—চরিত্রের কোন প্রয়োজনই নেই। তাঁরা বলেন, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সমার্থক। এ সম্বন্ধে অলপোর্টের বক্তব্য হ'ল—ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র একই জিনিসকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখার জন্য দুটি পৃথক নাম মাত্র। ব্যক্তিত্বের উপাদান ও সংলক্ষণগুলিই চরিত্রেরও উপাদান। ব্যক্তির মধ্যে বৈশিষ্ট্য বা গুণগুলিকে যখন কেবলমাত্র বৈশিষ্ট্য ও গুণ হিসেবেই দেখি—তখন ব্যক্তিত্বের কথা বলি। কিন্তু যখন এগুলিতে কোন প্রকার মূল্য আরোপ করা হয়—তখনই তা হয়ে যায় চরিত্র। অর্থাৎ—

চরিত্র = ব্যক্তিত্ব + কোন মূল্য।

ব্যক্তিত্ব = চরিত্র − ঐ মূল্য।

একটি লোকের মধ্যে হয়তো 'সততার' গুণটি আছে। গুণটিকে যখন কেবল অস্তিত্বের দিক থেকে বিচার করা হবে—তখন বলা হবে তার ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ হ'ল—সততা। কিন্তু যখন সমাজ বা নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে এই সততা থাকা ভালো না মন্দ তার বিচার করে একটা মূল্য নিরূপণ করা হবে—তখনই লোকটির ব্যক্তিত্বের কথা না বলে চরিত্রের কথা বলা হবে। অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব হ'ল অস্তিত্ব-বাচক (Positive) আর চরিত্র হল মূল্যবাচক (Normative)। এইজন্যই অলপোর্ট বলেছেন—চরিত্র হ'ল মূল্য-নিরূপিত ব্যক্তিত্ব আর ব্যক্তিত্ব হল মূল্য-নিরূপণহীন চরিত্র।

ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে কিন্তু অভিন্ন করে দেখা যুক্তিযুক্ত নয়। ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিত্বই ব্যাপকতর। ব্যক্তিত্বের যে সমস্ত বিভিন্ন উপাদান আছে চরিত্র তাদের মধ্যে অন্যতম। তবে ব্যক্তিত্বের সমস্ত উপাদানকেই তো সামাজিক বা নৈতিক মানদণ্ডে বিচার করা হয় না; কিন্তু চরিত্র নামক উপাদানটিকে সামাজিক ও নৈতিক মানদণ্ডে বিচার করা হয়। অনেক সময় এটিকে ধর্মীয় বা লৌকিক আদর্শের দিক থেকেও বিচার করা হয়ে থাকে।

সুচরিত্রের স্বরূপ (Marks of good character): আমরা আগেই দেখলাম বিশেষ কতকগুলি মান বা আদর্শের দিক থেকে ব্যক্তিত্বের

বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার করলে চরিত্র কথাটি ব্যবহার করা হয়। বৈশিষ্ট্যগুলিকে যখন ব্যক্তিত্বের দিক থেকে বিচার করা হয়, তখন ভালো-মন্দ, বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত, কাম্য-অকাম্য ইত্যাদি প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে বিচার করতে গেলেই এই ভালো-মন্দ ইত্যাদির প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয়। বিভিন্ন আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা সুচরিত্র সম্বন্ধে নিজেদের একটা ধারণা গঠন করে নিই। তারপর বিচার করি বাস্তবে ব্যক্তি সেই সুচরিত্রের কি পরিমাণে অধিকারী হ'ল।

চরিত্র একটি আপেক্ষিক (relative) শব্দ। যে বিশেষ বিশেষ মানের সাহায্যে চরিত্র বিচার করা হয়, সেই মানগুলি বিভিন্ন সমাজের পক্ষে বিভিন্ন। তবে প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব কতকগুলো মান বা আদর্শ আছে। ব্যক্তিত্বের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য এই মানের বিচারে অনুমোদিত, সেগুলিকে আমরা সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নিই। আর যেগুলি এই মানের বিচারে অননুমোদিত, সেগুলিকে আমরা অবাঞ্ছিত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নিই। চরিত্রটি আপেক্ষিক শব্দ হলেও সুচরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় সব সমাজেই এক জাতীয় হয়ে থাকে।

সচরাচর তিন প্রকার ভিন্ন জাতীয় মান বা মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্র বিচার করা হয়ে থাকে। এই তিন প্রকার মান হ'ল—ব্যক্তির নিজের কল্যাণ সাধক বৈশিষ্ট্যের মান, সমাজের কল্যাণ সাধক বৈশিষ্ট্যের মান ও নৈতিক মান। ব্যক্তির আচরণ যদি এই তিন প্রকার মানের যে কোন একটির দিক থেকে কাম্য বা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়, তবে সেই আচরণ-ধারার বৈশিষ্ট্যগুলিকে সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। যাই হোক্ এখন এই তিন প্রকার মান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্ :—

[এক] **ব্যক্তির নিজস্ব কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যের দিক :** আমরা যখন বিভিন্ন জাতীয় আচরণ করি, তখন নিজেদের জীবনের সুখ, শান্তি ইত্যাদির কথা ভেবেই আচরণ করি। ব্যক্তির নিজস্ব কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সংকল্পের দৃঢ়তা, মানবিক ও প্রাক্ষোভিক স্থৈর্য, সৎ সংকল্প, সদাচার ইত্যাদি ধারণ। এইগুলি ব্যক্তির জীবনে উন্নতি, পার্থিব সাফল্য, আত্মতৃপ্তি ইত্যাদি আনয়ন করে। এর অভাবে ব্যক্তির আচরণ অসংযত ও ভারসাম্য-বিহীন হয়ে পড়ে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ঠিক বিপরীত হ'ল—দুর্বলচিত্ততা, চাপল্য, সংকল্প-হীনতা, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা, মানবিক ও প্রাক্ষোভিক অসাম্য প্রভৃতি।

[দুই] **সামাজিক কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যের দিক :** ব্যক্তির নিজের মঙ্গলের সঙ্গে সামাজিক মঙ্গলের দিকটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সামাজিক কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে সহানুভূতি, সহযোগিতা, দল-প্রীতি, বিশ্বস্ততা, বন্ধু-প্রীতি, স্বার্থত্যাগ, সমাজের প্রতি আনুগত্য, সামাজিক কর্মচেতনা প্রভৃতি কারণ। এইসব বৈশিষ্ট্যের জন্যই সমাজ বন্ধনটি যেমন দৃঢ় হয়, সমাজ জীবনটিও তেমনি সুন্দর হয়। এর বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল—স্বার্থপরতা, আত্ম-কেন্দ্রিকতা, বিশ্বস্ততার অভাব, অসহযোগিতা ইত্যাদি। ব্যক্তির মঙ্গল ও সমাজের মঙ্গলের দিকে বিরোধ যে দেখা যায় না তা নয়। তখন এই দুটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন্‌টি সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হবে—তা নির্ভর করছে সমাজের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির উপরে। তবে প্রকৃতপক্ষে এই দুয়ের মধ্যে কোন বিরোধ বা দ্বন্দ্ব থাকা উচিত নয় কারণ সমাজের মঙ্গলে ব্যক্তিরই মঙ্গল, ব্যক্তির কল্যাণে সমাজেরই কল্যাণ সাধিত হয়।

[তিন] **নৈতিক আদর্শের দিক :** উপরোক্ত দু'রকম বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আমাদের কতকগুলি নৈতিক আচরণে অভ্যস্ত হতে হয়। এই ক্ষেত্রে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য নীতি বা নৈতিক দিক (morality) থেকে কাম্য বলে মনে করা হয়, সেগুলিকে সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে নৈতিক বিচারে কতকগুলি আচরণকে বিশেষ ভাবে মূল্যায়িত করা হয়। অবশ্য নৈতিক দিক থেকে বিচার করা বৈশিষ্ট্যগুলি কোন না কোন দিক থেকে ব্যক্তি বা সমাজের মঙ্গল সাধন করেই থাকে। এগুলি যে কেবল নীতির দিক থেকেই কাম্য—ব্যবহারিক বা প্রয়োগমূলক কোন মূল্যই এদের নেই তা নয়। সততা, সত্যবাদিতা, সাধুতা, দয়া, মায়া, কৃতজ্ঞতা, মহত্ব, অন্তরের পবিত্রতা ও শুচিতা—এই সমস্ত নৈতিক কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্য। এই সমস্ত আচরণের মাধ্যমে ব্যক্তি পরোক্ষ ভাবে তার নিজের ও সমাজের কল্যাণসাধনই করে থাকে। এই সব বৈশিষ্ট্যের বিপরীত হ'ল—অসাধুতা, মিথ্যা কথা বলা, শঠতা, প্রবঞ্চনা, নিষ্ঠুরতা, কৃতঘ্নতা ইত্যাদি।

চরিত্রের বিকাশ (Development of character) : ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সমজাতীয় অর্জিত গুণ বা বৈশিষ্ট্য বলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ জানা থাকলে চরিত্রের বিকাশও জানা সম্ভব। তবে চরিত্র বিকাশ স্বতন্ত্র ভাবেই পর্যবেক্ষণ করা হয়, কারণ এই বিকাশ প্রক্রিয়ায় কোন্‌ স্তরে ও কিভাবে শিশুর মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক সচেতনতা জাগে—তা জানা প্রয়োজন। যেহেতু আমরা

'চরিত্রকে সামাজিক ও নৈতিক বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি সেইজন্য এই দু'শ্রেণীর বোধ না জাগলে প্রকৃতপক্ষে চরিত্র সৃষ্ট হয়েছে এ কথা বলা যায় না।' এইখানেই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে চরিত্রের পার্থক্য। ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র কোনটিই সহজাত নয়; উভয়েই অর্জিত। সহজাত সূত্রে প্রাপ্ত উপাদানসমূহ ও পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়। শিশুর জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ শুরু হয় বিভিন্ন ভাবে। কিন্তু ঐ সঙ্গে চরিত্র গঠনের কাজ শুরু হয় না। 'চরিত্র গঠনের কাজ শুরু হয় সেই দিন যেদিন শিশুর মনে সামাজিক ও নৈতিক বিচার বোধ জাগ্রত হয়।' ব্যক্তিত্বের বিকাশ শুরু হয়ে যায় আগেই, কিন্তু চরিত্রের বিকাশ শুরু হয় আরো অনেক পরে।

ম্যাক্‌ডুগাল চরিত্রের বিকাশ সম্বন্ধে একটি সংখ্যাখ্যান দিয়েছেন। তাতে তিনি প্রধানতঃ প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে সেন্টিমেন্ট বা রসই হ'ল ব্যক্তিত্বের একক (unit)। তিনি মানব চরিত্রের বিকাশকে চারটি বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে চরিত্র প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের যুগ্ম বিকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

চরিত্র বিকাশের প্রথম স্তরে তিনি প্রবৃত্তিগুলির প্রাধান্যের কথা বলেছেন। তিনি বলেন এই সময় শিশুর আচরণগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় তার সুখ-দুঃখের অনুভূতি গুলির দ্বারা। কোন প্রকার সামাজিক বা নৈতিক বোধ এই সময় তার মধ্যে জাগ্রত হয় না।

দ্বিতীয় স্তরে শিশুর মধ্যে সামাজিক বোধটি জাগ্রত হয় এবং বিভিন্ন মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে তার মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে। সামাজিক প্রভাবের জন্য শিশুর প্রবৃত্তি চালিত অনিয়ন্ত্রিত আচরণগুলি যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। ম্যাক্‌ডুগাল বলেন, এই স্তরেই নৈতিক রস জন্মলাভ করে। শিশু তার নিজের পরিবেশ, ঘরবাড়ী, মা-বাবা, ভাইবোন, বন্ধু-বান্ধব, খেলার সামগ্রী ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সেন্টিমেণ্ট গড়ে তোলে। প্রকৃতপক্ষে চরিত্রের বিকাশ এই স্তর থেকেই শুরু হয়।

তৃতীয় স্তরে শিশুর আচরণে নৈতিক ও সামাজিক প্রভাব আরো সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। সামাজিক নিন্দা, প্রশংসা ও সে সম্বন্ধে ধারণা শিশুর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই স্তরেই শিশু অমূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে সেন্টিমেন্ট গড়ে

তোলে। তাছাড়া সততা, ন্যায়পরায়ণতা, নিষ্ঠুরতা, সৌন্দর্য ইত্যাদি ধারণাকে কেন্দ্র করে তার নৈতিক রস দানা বাঁধতে থাকে এবং ঐগুলি তার আচরণকেও নিয়ন্ত্রিত করে। ম্যাক্‌ডুগাল চরিত্রের বিকাশে এই নৈতিক রসের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই স্তরে চরিত্র বিকাশের কাজটি আর এক ধাপ এগিয়ে যায়।

চতুর্থ বা শেষ স্তরে শিশু নিজের জীবনের আদর্শ স্থির করে নেয় এবং এই সামাজিক ও নৈতিক আদর্শবোধ তার আচরণ তো বটেই, ভাবনা-চিন্তা, ধ্যান ধারণাকে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত করতে পারে। এই সময় শিশুর চরিত্রের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে একটা সুষ্ঠু সমন্বয় সাধিত হয় এবং তার চরিত্রের বিকাশ পূর্ণ পরিণতি লাভ করে।

বিভিন্ন স্তরের আলোচনা থেকে দেখা গেল চরিত্রের বিকাশ শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় স্তর থেকে, কারণ এই স্তরেই নৈতিক ও সামাজিক বোধ জাগ্রত হচ্ছে। প্রথম স্তরটি মূলতঃ ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্তর। দ্বিতীয় স্তরে যে নৈতিক আদর্শের অঙ্কুর দেখা যায়—তা বৃদ্ধি পায় তৃতীয় স্তরে আর পূর্ণ পরিণতি লাভ করে চতুর্থ স্তরে। চতুর্থ স্তরেই নৈতিক ও সামাজিক আদর্শবোধ শিশুর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শিশুর আচরণগুলিই এই আদর্শবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে। সামাজিক নিন্দা, প্রশংসা বা শাস্তি-পুরস্কারের আর কোন প্রয়োজন হয় না।

শিক্ষা ও চরিত্র গঠন (Education and formation of character): শিক্ষা পরিকল্পনায় চরিত্র গঠনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। বহু শিক্ষাবিদ্ চরিত্র গঠনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে বর্ণনাও করে গেছেন। এই লক্ষ্যটি খুবই সংকীর্ণ। তবে চরিত্র গঠন যে শিক্ষার বহুবিধ লক্ষ্যের মধ্যে অন্যতম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্বাধীনতার পর যে সমস্ত শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করা হয়েছিল, তারাও শিক্ষাক্ষেত্রে চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে যেয়ে আমরা দেখেছি—ব্যক্তিসত্তার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সংলক্ষণকে সুচরিত্রের লক্ষণ বলে অভিহিত করা হয়। সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে ব্যক্তির নিজস্ব মঙ্গলের দিকটি, সমাজের মঙ্গলের দিকটি ও নৈতিক আদর্শের দিকটি। শিশুর মধ্যে এই তিন শ্রেণীর গুণ সৃষ্টি করতে পারলেই তার সুচরিত্র গঠিত হবে—এ কথা বলা যেতে পারে। ব্যক্তির

নিজের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন—মানসিক দৃঢ়তা, স্থির চিত্ততা, ধৈর্য, প্রাক্ষোভিক ও মানসিক সমতা ইত্যাদি গুণগুলির। সামাজিক মঙ্গলের জন্য দরকার—সহযোগিতা, বন্ধুপ্রীতি, বিশ্বস্ততা, স্বার্থত্যাগ, সামাজিকতা ইত্যাদি গুণাবলীর। আর সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠা, স্নেহ, দয়া, মায়া, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি গুণ পড়ে নৈতিক আদর্শের পর্যায়ে। এই সমস্ত গুণের বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন।

শিক্ষার প্রকৃত সমস্যা হ'ল—এই গুণগুলি কিভাবে শিশুকে শেখান যেতে পারে—তা নির্ধারণ করা। একদল মনোবিজ্ঞানী চরিত্র গঠনে নৈতিক আদর্শের প্রভাবের উপরই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা এই গুণগুলি ব্যবহারিক দিক থেকে কতটা উপযোগী—তা বিচার করেন না। কিন্তু গুণগুলির আভ্যন্তরিণ মূল্য তাঁদের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান। তাঁদের মত হ'ল—মানুষ সৎ হওয়ার জন্যই সৎ হবে। এখানে সৎ হবার নৈতিক অনুশাসনটিই বড়, এর সামাজিক বা ব্যক্তিগত উপকারিতা আছে কি না, তা দেখার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের অনুশাসন—বিশেষতঃ বাস্তব উপকারিতা বর্জিত অনুশাসন শিশুকে বোঝানো অত্যন্ত শক্ত। সৎ হতে বললেই তো সে জিজ্ঞাসা করবে—সৎ হব কেন? সৎ হয়ে আমার কি লাভ হবে? ইত্যাদি হাজার রকমের প্রশ্ন। এর উত্তর দিতে না পারলে শিশু সৎ হওয়ার নৈতিক যুক্তিটি কিছুতেই মেনে নেবে না এবং হয়তো প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। আজকালকার দিনে পড়াশুনা করার প্রতি ছেলেদের যে মনোভাব দেখা যায়—তাও একই কারণে। কেবল নীতিশাস্ত্র বলেছে বলেই পড়াশুনা করতে হবে? কিন্তু যে আপ্তবাক্যটি সে ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে—লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই; এই ব্যবহারিক দিকটি তো সম্পূর্ণ অন্ধকারেই আছে। নীতিশাস্ত্র লেখাপড়া কেন করা হবে—তার কোন সঠিক যুক্তি দেখাতে পারছে না—কিংবা যা দেখাচ্ছে, তা যথেষ্ট নয় বলেই ছাত্রদের এ অনীহা!

ব্যাপক গবেষণার পর জানা গেছে অমূর্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। শিক্ষা হ'ল—of, by and for experience। নৈতিক শিক্ষাকে যতক্ষণ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা না হবে, ততদিন সে শিক্ষা শিশুর কাছে কার্যকরী ও স্থায়ী হবে না। এইজন্য নৈতিক অনুশাসনগুলিকে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হবে। এর ফলে কোন

আচরণ করার জন্ম তার নিজের বা সেই সমাজের কিরূপ মঙ্গল সাধিত হতে পারে—তা সে যুক্তি দিয়ে অনুভব করতে পারবে। নৈতিক অনুশাসনের ভালো-মন্দ বা উচিত-অনুচিতের মাপকাঠিটি যদি ব্যক্তি ও সমাজের ভালো-মন্দ মাপ করার কাজে লাগানো যায় তাহ'লে শিশু সেই নৈতিক অনুশাসন অনুযায়ী কাজ করতে দ্বিধা বা কুণ্ঠাবোধ করবে না।

শিশুর সামাজিক ও নৈতিক বিচারবুদ্ধি তার চারপাশের পরিণত ব্যক্তিদের প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শিশু যাকে ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে, তাকে সে নিজের অজান্তেই অনুকরণ করতে শুরু করে দেয়। ভালোবাসা বা শ্রদ্ধার পাত্রের আচার-আচরণ, চাল-চলন, কথা বলার ভঙ্গী, ভাবনা চিন্তা পর্যন্ত শিশু অনুকরণ করতে চেষ্টা করে, এর ফলে ঐ ব্যক্তির সঙ্গে শিশু বিভিন্ন গুণের দিক থেকে সমকক্ষ হতে চায়। অর্থাৎ এই রকম ব্যক্তিই শিশুর ভবিষ্যৎ চরিত্রটি নির্ধারিত করে দেন—যদিও অজান্তেই।

শিশুর পরিবেশে যে সমস্ত ব্যক্তি থাকেন, শিশুর সু-চরিত্র গঠনে তাঁদের প্রত্যেকের দায়িত্ব অপরিসীম। শিশু যাতে বাঞ্ছিত গুণাবলীর অধিকারী হয়ে সুচরিত্র অর্জন করতে পারে তার জন্ম সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। এতে পিতামাতার যতখানি দায়িত্ব—শিক্ষকেরও ততখানিই থাকা উচিত।

সুচরিত্র গঠনের উপায় (Method of forming good character): কি উপায়ে শিক্ষার্থীর চরিত্র সুগঠিত করা যেতে পারে—এ চিন্তা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ ও মনীষী করে গেছেন। তাঁদের গবেষণা-মূলক ফল থেকে আমরা সুচরিত্র গঠনের কয়েকটি উপায়ের কথা জানতে পারি। এই উপায়গুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল। তবে একটা কথা আগেই বলে রাখা প্রয়োজন। তা হ'ল এই উপায়গুলির সার্থকতা কিন্তু শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সমাজ—সকলের যৌথ প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করছে।

[এক] **নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ:** ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র বিকাশের প্রধান উপাদান হ'ল—পরিবেশ। শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত গুণ দেখা দেবে, না অবাঞ্ছিত, তা নির্ভর করছে তার পরিবেশের উপর। একটি ভদ্র সমাজের শিশুর চরিত্র যেমন হয় খুব নীচু স্তরের বস্তির একটি ছেলের তেমনটি হয় না। দুই শুকপাখীর গল্পেও দেখি, যে শুক পাখীটি ধার্মিক লোকের আশ্রয়ে ছিল, সে আগন্তুক দেখলে

স্বাগত জানাত। আর যেটি এক দুষ্টমতি ব্যাধের আশ্রয়ে ছিল, সে আগন্তুক দেখলেই বলত মার, মার, কাট, কাট, ইত্যাদি। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে—পরিবেশটিকে ঠিক মত নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে সদ্‌গুণ বিকশিত হয় না। তাই বিদ্যালয়, গৃহ, সমাজ সর্বত্রই একটা সুপরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

[দুই] **উপযুক্ত পাঠক্রম:** পাঠক্রমের মধ্যেও শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক যুগে আমরা অন্তরের দিকে দেউলিয়া হতে চলেছি। স্নেহ, বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা, দয়া, মায়া ইত্যাদি সদ্‌গুণ অভিধানের পৃষ্ঠাতে আশ্রয় নিচ্ছে। নীতি-শিক্ষা, ধর্ম-শিক্ষা ইত্যাদির কথা ভাবাও বোধ হয় পাপ। এমতাবস্থায় পাঠক্রম শিক্ষার্থীর চরিত্রগঠনের কাজে কিছু করতেই পারে না। পরীক্ষাসর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও জাতীয় চরিত্র হনন করছে। এর পরিবর্তন আবশ্যক। পাঠক্রমটি এমন ভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

[তিন] **সদাচরণ:** শিশুমন অনুকরণধর্মী। তার চারপাশে বয়স্ক ব্যক্তিরা যেভাবে আচরণ করবে—সেও ঐভাবে আচরণ করতে চাইবে এইটাই স্বাভাবিক। সুচরিত্র গঠন করতে হলে শিশুর সামনে আদর্শ আচরণ উপস্থাপিত করতে হবে। যে বাবা পাওনাদার এলে ছেলেকে বলেন—যা বলে আয়, বাবা বাড়ীতে নেই, সে বাবা আর যাই করুন না কেন, ছেলের চরিত্র গঠনের পথটি রুদ্ধ করে দিচ্ছেন। যে সমাজে বয়স্কদের আচরণ অসংযত ও অনিয়ন্ত্রিত, সেখানের শিশুরাও উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত হয়। আবার অনেক সময় পিতা-মাতা বা বয়স্ক আত্মীয় আত্মীয়ারা শিশুর সামনে এমন সব বিসদৃশ আচরণ করেন বা এমন সব কথাবার্তা বলেন—যেগুলি শিশুর দেখা বা শোনা উচিত নয়। তাঁরা এইভাবে নিজেদের আশ্বস্ত করেন "ছেলেমানুষ, কিছু বুঝছে না!" কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সে সব বুঝছে। এই সব ঘটনা সুচরিত্র গঠনের প্রতিকূল। কাজেই শিশুর সামনে এমন আচরণ করতে হবে—যেটি তার পক্ষে অনুকরণযোগ্য যার ফলে শিশুর আচরণও বাঞ্ছিত পথ ধরেই এগিয়ে যাবে।

[চার] **জীবন-চরিত পাঠ:** যে সমস্ত ব্যক্তি চারিত্রিক গুণে বিশিষ্ট, যাঁরা স্বীয় কর্মক্ষেত্রে কৃতবিদ্য, এমন সব বিখ্যাত দার্শনিক, সমাজ-সংস্কারক, দেশপ্রেমিক, কর্মবীর প্রভৃতি ব্যক্তির জীবন চরিত পাঠ করলে শিশু যথেষ্ট উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয় এবং ঐ সব জীবন-চরিতের রত্নকোষ থেকে কিছু মণি-মাণিক্য আহরণ করে।

কল্পনা

(Imagination)

[Imagination is the thinking of remote objects—Mc. Dougall.

A product of imagination is composed of parts received at different imes and recalled and combined—Woodworth.

Imaginatien is a device for attaining unattainable goals—Murphy.

The constructive, though not necessarily creative, employment of past perceptual experience, revived as images in a present experience at the deational level. Dictionary of Psychology.

Clear insight into the remote, the absent, the abscure is its aim.

—Dewey]

কল্পনার স্বরূপ (Nature of Imagination) : কল্পন বা কল্পনা করা এক জাতীয় আচরণ বা এক প্রকার মানসিক প্রক্রিয়া। সাধারণ কথায় কল্পনা বলতে উদ্ভট বা অলীক কোন কিছু চিন্তা করার কথাই বুঝিয়ে থাকে। মেঘের উপর প্রাসাদ নির্মাণ, মৎস্যকন্যা, হাতিমি বা হাঁসজারু কিংবা সেই গান—আমড়ার মত গাছে ঝুলে আছে পান্তুয়া শত শত"—এ সবগুলিকে আমরা কল্পনা বলে থাকি। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে কল্পনা কথাটিকে এত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয় না। অলীক চিন্তাকেও মনোবিজ্ঞানীরা এক শ্রেণীর বিশেষ কল্পনা বলে থাকেন। কল্পনার বিষয়বস্তুকে যে সব সময় অলীক বা উদ্ভট হ'তে হবে, অসম্ভব, অনিয়ন্ত্রিত ও উদ্দেশ্যহীন হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। আবার অতীতে যা কখনও ঘটেনি—কল্পনাকে এমন একটা কিছু হ'তে হবে তাও নয়। মনোবিজ্ঞানে কল্পনার অর্থ হ'ল—যা সামনে নেই, মনে মনে তার কথা ভাবা, তার মানস ছবিটিকে উদ্দীপিত ও উজ্জীবিত করা এবং পুরাতন মানস ছবিগুলিকে আংশিক বা সম্পূর্ণ নূতন ভাবে সাজানো। কল্পনার এই অর্থটি অত্যন্ত ব্যাপক এবং স্মরণ করা, দিবা স্বপ্ন দেখা, অলীক চিন্তা বা আকাশ-কুসুম রচনা করা, বর্তমানের কোন সমস্যার সমাধানের জন্য উদ্দেশ্যমূলক ভাবে চিন্তা করা বা ভবিষ্যতের জন্য কোন পরিকল্পনা করা সবই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যাচ্ছে।

আমরা যখন কোন অভিজ্ঞতা অর্জন করি, তখন তার একটা অনুরূপ প্রতিচ্ছবি আমাদের মনের মধ্যে আঁকা হয়ে যায়। সিনেমা দেখে আসার পর বা একটি সুন্দর দৃশ্য দেখার পর তার একটি ছবি মনে গাঁথা হয়ে যায়। মনশ্চক্ষুতে আমরা সেগুলি যেন আবার দেখতে পাই। তেমনই একটা গান শোনার পর তার সুরটি যেন কানে লেগেই থাকে; একটা সুখাদ্য খাবার পরও তার স্বাদ জিভে যেন লেগে থাকে। এইভাবে উত্তেজকটি চলে গেলেও, মনের মধ্যে তার যে প্রতিচ্ছবিটি থেকে যায় মনোবিজ্ঞানে তাকে বলে মানস ছবি। আমরা প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে চলেছি। এগুলির মানস ছবি আমাদের মনের মধ্যে জমা হয়ে থাকছে। এই সব মানস ছবিকে উজ্জীবিত ক'রে ইচ্ছামত সাজানোকেই আমরা কল্পনা বলে থাকি।

এই তো সেদিন ট্রেণিং কলেজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রাজগীর, নালন্দা, গয়া, বুদ্ধগয়া ইত্যাদি জায়গা ঘুরে এলাম। রাজগীরে পাহাড়ের উপর বিশ্বশান্তিমিশনের মন্দিরটি খুব ভালো লেগেছে। ভালো লেগেছে 'রোপ্‌ওয়ে' চড়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে। এখন তো সেগুলি আমার সামনে নেই। তবু ঐ মন্দির, পাহাড়, রোপ্‌ওয়ে, সেখানকার লোকজন, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা সব ঠিক ঠিক মনে পড়ছে—অর্থাৎ মানস ছবিগুলি একে একে পরিষ্কার ভাবে আমার মানসপটে ভেসে উঠছে। ঘটনাগুলি এখন আর ঘটছে না—কিন্তু আমার মনের সামনে যেন সেগুলি ঘটে চলেছে। কাজেই এগুলি কল্পনা। কিন্তু কল্পনার ছবিটি যখন আসল ঘটনার বা অভিজ্ঞতার বস্তুর মত অবিকল প্রতিভাত হয়, তখন তাকে স্মৃতি ছবি (**Memory Image**) বলে। কাজেই স্মরণ করা আর কল্পনা করার মধ্যে প্রভেদ নেই। স্মরণও এক জাতীয় কল্পন।

তবুও কল্পনাকে আমরা স্মৃতির থেকে পৃথক করে রেখেছি। কল্পনা হ'ল সৃজনধর্মী (**Constructive**)। যেমনটি দেখেছি ঠিক তেমনটি মনে মনে পুনরুজ্জীবিত করার নাম স্মৃতি। কিন্তু কল্পনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষিত প্রতিরূপ-গুলিকে আমরা ইচ্ছামত সাজিয়ে প্রয়োজনমত নতুন মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করি। এতে অতীত অভিজ্ঞতার কোন কোন প্রতিরূপকে হয়তো বাদ দিতে হয়, কখনও বা বিভিন্ন অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, কখনও সেগুলিকে বাড়ানো হয়, আবার কখনও বা কমানো হয়ে থাকে। আমরা যখন কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি এবং পরে তা স্মরণ করি তখন সে অভিজ্ঞতা বাস্তব-ভিত্তিক হয়ে থাকে। কিন্তু কল্পনার ক্ষেত্রে তা অবাস্তবও

হ'তে পারে। ডায়মণ্ডহারবারে বেড়াতে এসে গঙ্গার ধার, সাগরিকা, সূর্যাস্ত, ঝাউ-গাছ সব দেখে পরে স্মরণ করার সময় জিনিসগুলি ঠিক যে যেমন অবস্থায় ছিল তেমনি ভাবেই মনে করতে হয়। কিন্তু কল্পনার ক্ষেত্রে সাগরিকাকে গঙ্গার উপর বসিয়ে দিতে পারি, নৌকাগুলোকে রাস্তায় আর বাসগুলোকে জলে চালাতে পারি, ঝাউ গাছগুলো হেঁটে বেড়াচ্ছে আর মানুষগুলো ঝাউ গাছের মত হাত-পা মেলে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে—ভাবতে পারি।

কল্পনার বৈশিষ্ট্য : এর থেকে আমরা কল্পনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের-কথা জানতে পারছি। এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকার জন্যই কল্পনাকে অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়া থেকে পৃথক করা সম্ভব ; কল্পনার একটা স্বাধীনতা আছে—যদিও সে স্বাধীনতা একেবারে সীমাহীন বা অবাধ নয়। কল্পনার ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলিকে ইচ্ছামত সাজানো হয়। এর থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তা হ'ল—আমরা এমন কিছু কল্পনা করতে পারি না— যার প্রতিক্রিয়া বা মানসছবিগুলি অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ বা মানসছবি নয়। অর্থাৎ পূর্বে যা প্রত্যক্ষ করি নি—তা কল্পনা করা সম্ভব নয়। জিনিসটা একটু ব্যাখ্যা করা যাক্—গল্প আছে মৎস্যকন্যা সমুদ্রের নীল জলের নীচে সোনার পাহাড়ের উপর মৎস্যপুরীতে বাস করত। রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে সেখানে যেয়ে হাজির হ'ল। গল্পটি শোনার বা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে কতকগুলি ছবি কি ভেসে উঠছে না? উঠছে নিশ্চয়ই এবং তার অর্থ হ'ল— আমরা কল্পনা করছি। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, যা দেখিনি তার কল্পনা করতেও পারি না—এই যদি বক্তব্য হয়, তাহ'লে মৎস্যকন্যা, সোনার পাহাড়, পক্ষীরাজ ঘোড়া এ সব তো কেউ দেখিনি। তবে কেমন করে কল্পনা করছি? একটু ভেবে দেখা যাক। আগেই তো বলা হয়েছে কল্পনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিরূপকে ইচ্ছামত সাজানো হয়। তাহ'লে? মাছ আমরা সকলে দেখেছি। বড় আকারের মাছের কথাও কল্পনা করতে পারি। এখন ঐ মাছের অর্ধেকের সঙ্গে অর্ধেক মানবী যোগ করে দিলেই তো মৎস্যকন্যা হয়ে যাচ্ছে। বলা যেতে পারে, অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা। তেমনি পক্ষিরাজ ঘোড়া দেখিনি—কিন্তু পাখী দেখেছি, ঘোড়াও দেখেছি। এখন ঘোড়ার পিঠে পাখীর ডানা দুটো জোড় করলেই পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়ে গেল। তেমনি সোনার পাহাড় না দেখলেও সোনা আমরা দেখেছি। পাহাড় বা উঁচু ঢিবিও দেখেছি। এইভাবে তৈরী হয়েছে সোনার পাহাড়। কাজেই ঐ সমস্ত জিনিসের কল্পনা নতুন কোন সৃষ্টি

নয়। তাদের উপাদানগুলি সবই অতীত অভিজ্ঞতার মানসছবি। নতুনত্ব আছে ঐ সমস্ত উপাদান বা মানসছবিগুলিকে নতুন ভাবে সাজানোর মধ্যে। কাজেই বলা যেতে পারে কল্পনার সঙ্গে প্রত্যক্ষের সম্পর্ক অতি নিকট। এইভাবে শিংওয়ালা ঘোড়া (Unicorn), দৈত্য, রাক্ষস, লিলিপুট ইত্যাদির কথা আমরা কল্পনা করতে পারি। কাজেই কল্পনা যেমনই হোক্ না কেন—তাকে অতীত প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করতেই হবে।

অনেক সময় বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বা কোন সমস্যার সমাধানের জন্যও কল্পনা করতে হয়। কোন একটি সংকল্প বা ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেবার আগে তার সম্বন্ধে অনেক কিছু কল্পনা করে নিতে হয়। একটা বাড়ী তৈরী করার আগে কল্পনাতে সেই বাড়ীটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমাদের দেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিও একজাতীয় কল্পনা। এইজন্য প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী মারফি বলেছেন—"আমাদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করার জন্যই আমরা নানারকম কল্পনা করি।" তেমনি কোন একটি অঙ্ক করার আগে কল্পনাতে তার সমাধানের পথটি দেখে নিই।

আবার কতকগুলি জিনিস আর তাদের আনুষঙ্গিক গুণ এমন ভাবে সম্বন্ধযুক্ত যে একটিকে কল্পনা করতে হ'লে আর একটিকেও কল্পনা করতেই হয়। একটি থেকে আর একটিকে বাদ দিয়ে কল্পনা করা যায় না। আগুনের কল্পনা করলে সঙ্গে সঙ্গে তার তাপ বা দাহিকা-শক্তিরও কল্পনা করতে হয়। তেমনি দুধ সাধা, রক্ত রাঙা, বরফ ঠাণ্ডা। আমরা অবশ্য তুলনা করার সময় এক বা একাধিক গুণের সমন্বয় করে থাকি। যেমন দুধে আলতায় গায়ের রঙ, আগুনের মত রাগ, হিম-শীতল অভ্যর্থনা, দুধ সাদা কাপড় ইত্যাদি। চিন্তা করার সময়ও কতকগুলি মানসছবিকে কল্পনার মতই সাজান হয়। যেমন, হয়তো একটি বই-এর আমার খুব দরকার যেটি আমার কাছে নেই। লাইব্রেরীতে আছে। সেখানে গেলে পাবো। এই কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি মানসছবি পর পর মনের মধ্যে উদিত হবে। যেমন,—আমি লাইব্রেরীতে যাচ্ছি, লাইব্রেরীয়ানের কাছে বইটি চাচ্ছি, তিনি আমাকে বইটি দিচ্ছেন ইত্যাদি। বাজার করতে যাবার আগেও অনুরূপ মানসছবির সৃষ্টি হয়।

স্মৃতি ও কল্পনা (Memory and Imagination): মনে করা ও কল্পনা করা উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিরূপের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অতীতে যেমনটি দেখেছি তেমনটি পুনরুদ্রেক করার নাম স্মৃতি। আর যখন অতীত

অভিজ্ঞতার যথাযথ পুনরাবৃত্তি না করে তার থেকে প্রতিরূপ বা মানস ছবিগুলি নিয়ে সেগুলিকে নতুন ভাবে সাজিয়ে কোন মানসছবি গঠন করা হয় তখন তার নাম কল্পনা। স্মৃতিতে মানস ছবিগুলির পুনরাবৃত্তি হয় বলে একে **পুনরুদ্রেক-মূলক** (Reproductive) কল্পনা বলা যেতে পারে কারণ সেখানে নতুন কিছু তৈরী হচ্ছে না। কিন্তু কল্পনার ক্ষেত্রে মানসছবিগুলি পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ইত্যাদি হয়ে নতুন কিছু উৎপাদন বা সৃজন করছে বলে সাধারণ কল্পনাকে **উৎপাদনমূলক** বা **সৃজনমূলক** (Productive) কল্পনা বলা হয়। স্মৃতি ও কল্পনা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। এদের পারস্পরিক সম্পর্কটি ভালো করে বুঝতে হ'লে দুটির মধ্যে সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য ও উভয়ের সংমিশ্রণের ব্যাপারগুলি ভালো করে জানতে হবে। এখন ঐ সম্পর্কে নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হচ্ছে—

সাদৃশ্য : (১) স্মৃতি ও কল্পনা উভয়েই অতীত প্রত্যক্ষণ বা অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত। যে বিষয়ের অভিজ্ঞতা নেই, তা যেমন মনে করতে পারি না, তেমনি কল্পনা করতেও পারি না। স্মৃতি অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলি মনের মধ্যে নিয়ে আসে। কল্পনা সেগুলিকে আবার ইচ্ছামত সাজিয়ে নেয়। এদিক দিয়ে বলা যায় স্মৃতিই কল্পনার উপাদান জোগান দেয়।

(২) স্মৃতি ও কল্পনা উভয়ের কাজের ধারাটি এক রকম। আমরা প্রত্যক্ষণ করার সময় বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে, ঘটনাকে কার্য-কারণের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বস্তুর বৈশিষ্ট্যকে তার সঙ্গে তাঁর গুণের পরিপ্রেক্ষিতে। কল্পনা ও স্মৃতির ক্ষেত্রেও ঐ এক ভাবেই কাজ হয়ে থাকে। সেখানের অভিজ্ঞতা ও কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত। উভয় ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুকে স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে মনে মনে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করি।

বৈসাদৃশ্য : (১) স্মৃতির ক্ষেত্রে মানসছবিগুলি যথাযথ ভাবেই পুনরু-জ্জীবিত করা হয়, সেগুলির কোন পরিবর্তন সাধন করা হয় না কিন্তু কল্পনার ক্ষেত্রে মানসছবিগুলির মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করা হয়।

(২) স্মৃতির ক্ষেত্রে 'চিনতে পারা'র (Recognition) একটা ভূমিকা আছে যা কল্পনার ক্ষেত্রে নেই। যা মনে করলাম সেটি ঠিক জিনিসটি কি না তা চিনে নিতে হয়। কল্পনার ক্ষেত্রে জিনিসটি নূতন বলে চিনবার কোন সুযোগ নেই।

(৩) স্মৃতি অতীত ঘটনার ক্ষেত্রেই সম্ভব। যখন স্মরণ করি তখন যে ঘটনা আগে ঘটে গেছে তার কথাই কল্পনা করি। কিন্তু কল্পনা সময়ের শেকলে বাঁধা থাকে না। যা ঘটলে ঘটতেও পারত বা যা ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে কল্পনা করা যায়।

(৪) স্মৃতি ও কল্পনা উভয়ের উপাদানই হ'ল প্রতিরূপ বা মানসছবি। কিন্তু কল্পনার প্রধান উপাদানই হ'ল প্রতিরূপ। ভাষা, ধারণা প্রভৃতি প্রতীকগুলি উপাদান হিসেবে কল্পনার ক্ষেত্রে খুব কমই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু স্মৃতির ক্ষেত্রে মানসছবি ছাড়াও এগুলি বহুল ব্যবহৃত।

(৫) প্রকৃতির দিক থেকে স্মৃতি-প্রতিরূপ (Memory-Image)-গুলি পরিবর্তনশীল কিন্তু কল্পনার প্রতিরূপগুলি (Image of Imagination) স্থির। এই মতবাদটি টিচেনারের মতবাদ।

সংমিশ্রণ ঃ প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্মৃতি ও কল্পনা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। কোন একটি ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ক'রে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে এই বর্ণনাটি বিভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আবার একই ঘটনা কয়েক জনকে প্রত্যক্ষ করতে বলে যদি তাদের নিকট হ'তে বর্ণনা নেওয়া যায় তবে দেখা যাবে তাদের এই বর্ণনার মধ্যে মিল নেই। তার কারণ তারা স্মৃতির সঙ্গে কল্পনাকে মিশিয়ে ফেলেছেন। আদালতে সাক্ষীদের বর্ণনাও প্রায়ই বাস্তব ঘটনা থেকে পৃথক হয়ে যায়। আবার লেখকরা যখন কোন গল্প বা উপন্যাস লেখেন, তখন তাদের ব্যক্তিগত ঘটনার স্মৃতি অনেক ক্ষেত্রেই কল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। মনে হয় কল্পনা একটি রঙীন চশমা। বাস্তব জগতের রুক্ষতা, শুষ্কতা বা রূঢ়তাকে আমরা কল্পনার সাহায্যে শ্যামল সরস করে নিই। জীবনের অসাফল্য, ব্যর্থতা, হতাশা প্রভৃতিকেও কল্পনার সাহায্যে পরিবর্তিত ক'রে আত্মপ্রসাদ ও মানসিক তৃপ্তি লাভ করি। আমরা কল্পনার সাহায্যেই নতুন নতুন জিনিস সৃষ্টি করতে পারি নতুন আবিষ্কার করতে পারি। কাজেই বলা যেতে পারে, স্মৃতির সঙ্গে কল্পনার সম্পর্কটি অত্যন্ত নিবিড়, স্মৃতি এক জাতীয় কল্পনা ও কল্পনা স্মৃতির এক রূপ।

কল্পনার শ্রেণীবিভাগ (Types of Imagination) ঃ বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী কল্পনাকে বিভিন্ন ভাবে শ্রেণীভুক্ত করেছেন। কল্পনার মধ্যে ইচ্ছা, কল্পনার মৌলিকতা, উদ্দেশ্য ও বিষয়—এই চারটি বিষয়কে কেন্দ্র করে কল্পনাকে

বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। তবে ড্রেভারের দেওয়া শ্রেণীবিভাগটি বেশ স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। তাঁর শ্রেণীবিভাগটি হ'ল এই রকম—

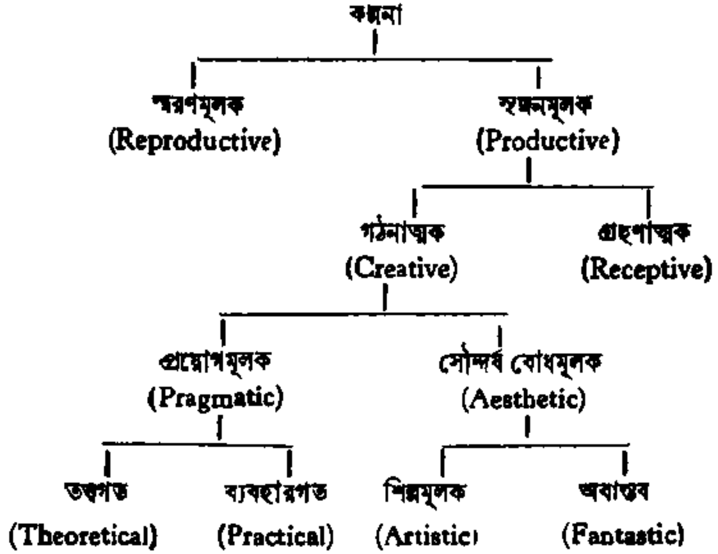

এখন এগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা হচ্ছে—

স্মরণমূলক কল্পনা ঃ কোন অতীত অভিজ্ঞতার কথা যখন আমরা যথাযথ ভাবে অর্থাৎ যেমন ভাবে ঘটেছিল ঠিক তেমন ভাবে কল্পনা করি তখন তাকে স্মরণমূলক কল্পনা বলে। আসলে এটিই স্মৃতি। কিন্তু যখন আমরা প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তুগুলির মানসছবি নিজেদের খুশীমত সাজাই তখনকার কল্পনাকে বলা হয় **সৃজনমূলক কল্পনা**। সৃজনমূলক কল্পনা আবার দু' রকমের হ'তে পারে— **গঠনাত্মক ও গ্রহণাত্মক**। কোন লেখক যখন কোন গল্প বা উপন্যাস লেখেন বা কবি তাঁর কবিতা লেখেন, তখন তিনি তাঁর বিভিন্ন মানসছবিগুলিকে নতুন নতুন ভাবে সাজিয়ে কল্পনা ক'রে নতুন কাহিনী বা কাব্য রচনা করেন। তাঁর এই কল্পনা **গ্রহণাত্মক**, কারণ তিনি কল্পনার ক্ষেত্রে নতুন কিছু গড়ছেন। কিন্তু যখন আমরা সেগুলি পড়ি, তখন তিনি যেমন যেমন ভাবে মানসছবিগুলি সাজিয়েছেন, আমাদের চেতনাতেও মানসছবিগুলি তেমনি ভাবে সাজানো হয়ে যায়। অর্থাৎ আমরাও কল্পনা করছি কিন্তু লেখক বা কবির কল্পনার অনুসরণে, এটি হ'ল **গঠনাত্মক** কল্পনা। ড্রেভার বলেন গঠনাত্মক কল্পনাই হ'ল প্রকৃত

কল্পনা। তিনি এই গঠনাত্মক কল্পনাকে আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন—**প্রয়োগমূলক ও সৌন্দর্যবোধমূলক**। প্রয়োগমূলক কল্পনা কল্পনা হলেও বাস্তবের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। এই জাতীয় কল্পনা বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় বলেই এর নাম **প্রয়োগমূলক কল্পনা**। কল্পনার সাহায্যে এঞ্জিনিয়ারের সেতু নির্মাণ বা আমাদের বাড়ী তৈরী করার আগে কি রকম বাড়ী করব সে সম্বন্ধে কল্পনা এই জাতীয় কল্পনার উদাহরণ। কিন্তু **সৌন্দর্যবোধমূলক** কল্পনা বহুলাংশে অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত। এক্ষেত্রে ব্যক্তি বাস্তবের রীতি-নীতি বা আইন-কানুন মেনে চলতে অভ্যস্ত নয়। প্রয়োগমূলক কল্পনাতে কল্পনা যখন লক্ষ্যে গিয়ে পৌছায়, তখন তৃপ্তি আসে। কিন্তু সৌন্দর্যবোধমূলক কল্পনাতে লক্ষ্যের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কল্পনা করার মধ্যেই এর তৃপ্তি। প্রয়োগমূলক কল্পনার আবার দুটি ভাগ—(ক) **তত্ত্বগত** ও (খ) **ব্যবহারগত**। প্রয়োগমূলক কল্পনাটি যখন প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে রূপায়িত হয়ে যায় তখন তাকে আমরা **ব্যবহারগত কল্পনা** বলি। এঞ্জিনিয়ার সেতুটি নির্মাণ করলেন, আমরা বাড়ী তৈরী করলাম বা কিভাবে ফসল বেশী জন্মাবে সে সম্বন্ধে আগে কল্পনা করে কৃষক সত্যি সত্যি ভালো ফসল উৎপাদন করল; এ সবই হ'ল প্রয়োগমূলক কল্পনার ব্যবহারগত দিক। কিন্তু যখন প্রয়োগমূলক কল্পনা বাস্তবে ঐ ভাবে রূপায়িত হয় না—কোন একটি বিশেষ তত্ত্ব আহরণ করার জন্যই প্রয়োগ করা হয়, তখন তাকে বলা যেতে পারে **তত্ত্বগত** দিক। গণিতের কোন ফর্মুলা, বিজ্ঞানের কোন সূত্র বা তত্ত্ব হ'ল এর উদাহরণ। সৌন্দর্যবোধমূলক কল্পনাকেও আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়—(১) **শিল্পমূলক** ও (২) **অবাস্তব**। যখন আমরা নানাপ্রকার সুন্দর বস্তুর কথা কল্পনা করি, যেমন, কবির ক্ষেত্রে কবিতা, চিত্রকরের বা শিল্পীর কোন চিত্র, ভাস্করের কোন ভাস্কর্য, তখন সেই কল্পনাকে বলা হয় **শিল্পমূলক কল্পনা**। যখন বস্তুটির অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি না, অথচ কেবলমাত্র তৃপ্তি পাবার উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যবিহীন, উদ্ভট ও অলীক কল্পনার জাল বুনতে থাকি, তখন তাকে **অবাস্তব কল্পনা** বলে। যেমন, শূন্যে সৌধ নির্মাণ ইত্যাদি।

এ ছাড়াও কল্পনার আর কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ আছে। সেগুলি হ'ল—

স্বতঃস্ফূর্ত (Passive) ও চেষ্টাপ্রসূত (Active) কল্পনা: যখন নানা রকম মানসছবি আপনা থেকেই আমাদের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হয় না—তখন আমরাও স্বাভাবিক ভাবেই নানা রঙে রসে কল্পনার জাল বুনতে লেগে যাই। এ হ'ল স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনা। এ জাতীয়

কল্পনার সংখ্যা আমাদের জীবনে প্রচুর। যে কোন অবসর সময়ে বা অলস মুহূর্তে এ রকম হাজার কল্পনা আমাদের চেতনাতে এসে ভীড় করে। কিন্তু যখন আমরা চেষ্টা করে কোন মানসছবি উজ্জীবিত করে কল্পনা করি—তখন তাকে বলে চেষ্টাপ্রসূত কল্পনা। এক্ষেত্রে আমাদের মন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে। একটা বাড়ী তৈরী করতে হবে। পাঁচটা বাড়ী দেখেছি। মন তার মানসছবিগুলি উজ্জীবিত করল সক্রিয় ভাবে। তারপর চেষ্টা করে প্রত্যেক বাড়ীর মানসছবি থেকে কিছু কিছু অংশ নিয়ে একটা নতুন বাড়ীর মানসছবি সৃষ্টি করল। এ হ'ল চেষ্টাপ্রসূত কল্পনা।

বিশ্লেষণী কল্পনা (Intellectual) : সূক্ষ্ম বা জটিল কোন বিষয় নিয়ে কল্পনা করাকে বলে বিশ্লেষণী কল্পনা। এক্ষেত্রে কল্পনা উপলব্ধির ব্যাপারে বুদ্ধিকে সাহায্য করে ও জ্ঞানের অগ্রগতি এবং সত্যের সন্ধানে সাহায্য করে। নিউটনের আপেল পড়া নিয়ে কল্পনা, জেমস্ ওয়াটের কেটলীর জল ফোটা দেখে কল্পনা, বা দার্শনিকদের পৃথিবীর উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে কল্পনা হ'ল এ জাতীয় কল্পনা।

বিশ্বাসযুক্ত ও বিশ্বাসবিযুক্ত কল্পনা (Believable and unbelievable) : পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আমরা কেউ দেখিনি তবু বিশ্বাস করি। অণু বা পরমাণুর অস্তিত্বেও আমরা বিশ্বাসী। ভূগোল বা ভ্রমণকাহিনী পড়ে কোন দেশের অস্তিত্ব ও সংবাদের যাথার্থ্যে বিশ্বাস করি। আমরা যখন কল্পনা করি—গোলাপের মিষ্টি গন্ধ আছে তখন বিশ্বাস করি সত্যসত্যই সব গোলাপেরই এই রকম মিষ্টি গন্ধ। এ সবই হ'ল বিশ্বাসযুক্ত কল্পনার উদাহরণ। কিন্তু যখন আমরা বস্তুটির বাস্তব অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না—তখন সেই জাতীয় কল্পনা হ'ল বিশ্বাসবিযুক্ত কল্পনা। আমাদের অলীক কল্পনাগুলি বা রূপকথার কাহিনীগুলি জাতীয় কল্পনা।

শিক্ষাক্ষেত্রে কল্পনার স্থান (Role of imagination in the field of Education) : নানাদিক দিয়ে শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে কল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। মানবজীবনের প্রতি স্তরেই কল্পনার একটা নিজস্ব ভূমিকা আছে—যেটিকে অস্বীকার করা যায় না। কল্পনাকে আশ্রয় করেই শিশু তার চিন্তন-প্রক্রিয়া শুরু করে। তার প্রথম দিকের সব চিন্তা তাকে করতে হয় প্রতিরূপ বা মানসছবির সাহায্যে। তবে সে যত বড় হতে থাকে, ততই এই প্রতিরূপের সংখ্যা কমতে থাকে। আবার যৌবনাগমের সময় এই কল্পনা প্রাধান্য বিস্তার করে। এই সময়ের কল্পনা প্রায়ই অবাস্তব ও উদ্ভট হয়। আজগুবি দিবাস্বপ্নের মাত্রা এ সময় এত বেশী হয় যে কল্পনাও হয়ে যায় অসম্ভব

রকমের অবাস্তব ও অসংগত। তবে কল্পনা ও অলীক উদ্ভট দিবাস্বপ্ন কখনও এক নয়। কল্পনা হ'ল একটি সুস্থ মানসিক আচরণ, কিন্তু প্রায়ই দিবাস্বপ্নে মগ্ন থাকা অসুস্থ মনের পরিচায়ক। বাস্তবে যে সমস্ত বাসনা-কামনা পরিতৃপ্ত হবার সুযোগ পায় না, দিবাস্বপ্নের মাধ্যমে এক কাল্পনিক জগতে ব্যক্তি সেগুলি পরিতৃপ্ত করে। আসলে অত্যধিক দিবাস্বপ্ন পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয় বহন করে।

শিশুদের কল্পনা অবাধ থাকবে, না তা নিয়ন্ত্রিত করা হবে, সে বিষয়ে মনো-বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। রূপকথা, উপকথা বা অবাস্তব গল্প শোনার জন্য অনেক শিশুর মধ্যে অলীক ও অবাস্তব কল্পনার তীব্রতা লক্ষ্য করা যায় বলে **মন্টেসরী-প্রমুখ** শিক্ষাবিদ্ এ জাতীয় রূপকথা শিশুদের শোনাবার বিরোধী। তিনি বলেন, শিশু স্বভাবতঃই কল্পনাপ্রবণ। কাজেই তার কল্পনাকে আরো বিকশিত করার কোন সার্থকতা নেই। বরং লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিশুর মধ্যে অলীক ও অবাস্তব কল্পনার মাত্রা বেশী না হ'য়ে যায়—কারণ সেক্ষেত্রে তার মানসিক পরিণতি ব্যাহত হতে বাধ্য। তিনি আরো বলেন যে, এই জাতীয় রূপকথা বা কাহিনী শিশুকে একটা অবাস্তব জগতে নিয়ে গিয়ে তার মনে একটা উদ্বেগ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, বাস্তব জগত সম্পর্কে একটা অহেতুক ভীতির সঞ্চার করে ও বাস্তব জগতের মুখোমুখি হবার সাহসটি পর্যন্ত নষ্ট করে দেয়। পরবর্তী কালে এই সব শিশু কোন বিপদে পড়লে ভাবে তারা আলৌকিক ভাবে দৈব-প্রেরিত কোন সাহায্য পাবে যাতে বিপদ থেকে তারা উদ্ধার পেতে পারে। কিন্তু শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল পরিবেশের সঙ্গে সার্থক ভাবে সঙ্গতিবিধান। সেক্ষেত্রে এ জাতীয় কল্পনা যদি সঙ্গতিবিধানের প্রতিকূল হয়, তাহলে কল্পনাকে বাদ দেওয়াই শ্রেয়। **অ্যাডলার**-এর মতে রূপকথার মধ্যে যে ক্ষতিকারক, কুসংস্কারমূলক ও নীতি-বর্জিত উপাদান থাকে সেগুলি বাদ দেওয়া উচিত, কারণ এইগুলি শিশুকে দুর্বলচিত্ত করে তার আত্মবিশ্বাসটি নষ্ট করে দেয়। অবশ্য অনেক শিক্ষাবিদ্ রূপকথা বা কাহিনীকে একেবারে বাদ দিতে চান না। তাঁরা এগুলির সংস্কার সাধন করতে চান। মন্টেসরীর মতে শিশুর কল্পনা সত্য ও বাস্তবানুগ হওয়া প্রয়োজন। আবার মন্টেসরীর অভিমত অনেকে সমর্থন করেন না। তাঁরা মনে করেন মন্টেসরী তাঁর মতবাদে শিশুর স্বাভাবিক প্রকৃতির প্রতি অবিচার করেছেন। শিশুর জগত কল্পনার জগত। সে বাস্তব জগতের চেয়ে কল্পনার জগতে বেশী আকর্ষণ অনুভব করে। অবশ্য তার জ্ঞান পরিপক্ক হবার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার জগতের প্রতি আকর্ষণটিও ক্রমশঃ কমতে থাকে।

মনোবিজ্ঞানী ড্রেভার কিন্তু শিশুর মধ্যে কিছু পরিমাণ অলীক কল্পনা থাকা প্রয়োজন বলেই মনে করেন। তাঁর অভিমত হ'ল শিশুর জীবনের অপরিতৃপ্ত বাসনা, কামনা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষাগুলি কাল্পনিক জগতে পরিতৃপ্ত হয় বলেই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যটিও অক্ষুণ্ণ থাকে। অবশ্য এই অবাস্তব কল্পনা যাতে মাত্রা না ছড়িয়ে যেতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এরূপ ক্ষেত্রে শিশু বাস্তবকে সব সময় এড়িয়ে চলতে চাইবে ও কল্পনার জগতে আশ্রয় নিতে চাইবে। এই জাতীয় পলায়নী মনোবৃত্তির নাম প্রত্যাবৃত্তি (Regression)। শিশুর স্বাভাবিক জীবন বিকাশের ধারাটি ব্যাহত হলে তার মানসিক স্বাস্থ্যও ক্ষুণ্ণ হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সৃজনমূলক কল্পনার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুশিক্ষার মূল কথাই হ'ল শিশুর অবাস্তব ও উদ্ভট কল্পনাকে সুসংহত ও নিয়ন্ত্রিত করে বাস্তবের পথে পরিচালিত করা। অবাস্তব কল্পনা কোন উদ্দেশ্য বা অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারে না। আবার প্রত্যেকটি আবিষ্কারের মূলেই থাকে সৃজনমূলক কল্পনা। বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, কৃষি সব কিছুরই সৃষ্টির মূলে এই সৃজনমূলক কল্পনা কাজ করে চলেছে। এই জাতীয় কল্পনা শিশুর মধ্যে সৃষ্টি করা যে সুশিক্ষার একটা বড় অঙ্গ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রূপকথার গল্প বা কাহিনী শিশুকে একটা বিশেষ বয়স—বড় জোর প্রাক্-বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত পড়তে বা শুনতে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তারপরই তাকে কল্পনার জগত থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়ে এসে বাস্তব জগতের সঙ্গে পরিচিত করে দিতে হবে। তার কল্পনাকেও করতে হবে বাস্তবমুখী ও প্রয়োগমূলক। তাহ'লে শিশু তার বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলিরও উপযুক্ত ভাবে সমাধান করতে পারবে।

শিশুর কল্পনা নিয়ন্ত্রণের একটা প্রধান উপায় হ'ল—সেগুলিকে বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত করা। এরজন্য অবশ্য শিশুর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার বাড়াতে হবে এবং তার পরিবেশের গণ্ডিটিকে সীমিত রাখলে চলবে না। এই বৃহত্তর পরিবেশ ও বিচিত্রতর এবং ব্যাপকতর অভিজ্ঞতার ফলে তার কল্পনা হবে সুনিয়ন্ত্রিত, সুসংহত, বাস্তবানুগ ও প্রয়োগমূলক। বাস্তবানুগ কল্পনা শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়ক এবং এর প্রভাবেই শিশু তার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার সম্ভাব্য ফলাফলটি বুঝে নিয়ে সেইমত কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে, শিশুশিক্ষার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল—শিশুর কল্পনাকে নিয়ন্ত্রণ করে উপযুক্ত ও বাঞ্ছিত পথে তাকে পরিচালিত করা। সাধারণতঃ পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে। তখন

তাদের কল্পনা মূর্ত বস্তুকে আশ্রয় করেই উদ্দীপিত হয়। এই সময় ইন্দ্রিয় অনুশীলনের তাদের কল্পনাশক্তিকে আরো তীব্র করে তোলা যায়। ইন্দ্রিয়ের অনুশীলনের ফলে প্রতিরূপগুলি তাদের মনে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই প্রতিরূপগুলিই কল্পনাকে তীব্রতর করে তোলে। সৃজনমূলক কল্পনা ইন্দ্রিয় অনুশীলন ছাড়া সম্ভবই নয়। মণ্টেসরী তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইন্দ্রিয় অনুশীলনের জন্য যে সমস্ত পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন এবং তিনি ইন্দ্রিয় অনুশীলনের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে সবিশেষ কার্যকরী।

এ ছাড়া শিশুকে অবাধ ও স্বাধীন ভাবে খেলাধূলা করতে দিলেও তার কল্পনা যথেষ্ট বিকশিত হতে পারে। কল্পনার বিকাশের সঙ্গে ভাষা জ্ঞানের সম্পর্ক অতি নিবিড়। শিশু যখন কথা বলতে শেখে, তখন থেকেই তার কল্পনার বিকাশ শুরু হয়ে যায়। কাজেই কল্পনার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য শিশুর ভাষাবোধটি যাতে কোন প্রকারে ব্যাহত না হয়, সেদিকেও সবিশেষ লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে গল্প বলার একটা বিশেষ স্থান আছে। শিক্ষক নিজে গল্প বলবেন, আবার ছাত্রকেও গল্প বলতে বলবেন। শিশুদের মধ্যে সৃজনমূলক কল্পনা বিকশিত করার জন্য শিক্ষক ছাত্রদের কোন গল্পকে নাটকে রূপান্তরিত করতে বলতে পারেন। আবার বিজ্ঞান, ইতিহাস বা ভূগোলের চার্ট, ম্যাপ, মডেল ইত্যাদি তৈরী করাতে পারেন। ইতিহাসের নাট্যরূপ দেওয়াও (Dramatization) একটি ভালো পদ্ধতি। এক কথায়, শিশুর শিক্ষাকে সক্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কেবলমাত্র মৌখিক বর্ণনা বা পুস্তকলব্ধ নীরস জ্ঞান সত্যকারের বাস্তব জ্ঞান দিতে অসমর্থ। আবার যেখানে মৌখিক বা পুস্তকলব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, সেখানে ইন্দ্রিয় সহায়ক উপকরণের সাহায্য নেওয়া উচিত। এরজন্য এপিডায়াস্কোপ, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন, ছবি, চার্ট, মডেল প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে, যাতে কল্পনাটি বাস্তবমুখী হয়।

আবার সাহিত্য, কাব্য, সংগীত, চিত্রকলা প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুর শিল্পমূলক ও সৌন্দর্যমূলক কল্পনা বিকশিত করা যায়। এই দু'শ্রেণীর কল্পনাই শিশুর ভবিষ্যত জীবনকে সুন্দর ও শিল্প-সুষমামণ্ডিত করে তোলে। তবে কেবল সৌন্দর্য-মূলক কল্পনার বিকাশই যথেষ্ট নয়; এর সঙ্গে যাতে সমান ভাবে প্রয়োগমূলক কল্পনাটিও বিকশিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

শিশুর কল্পনাকে বাস্তবানুগ ও প্রয়োগমূলক করতে হলে তার পরিবেশটিকে উন্নত করতে হবে। লক্ষ্য করে দেখা গেছে—যে শিশু যত বেশী সংকীর্ণ

সমস্ত দোষমুক্ত হয়ে ওঠে। তেমনি আচরণের প্রথম দিকে কোন অসম্পূর্ণতা না থাকলে পরবর্তী কালে পুনরাবৃত্তির সময় সেই অসম্পূর্ণতা দূরীভূত হয়ে পূর্ণতা লাভ করে। কাজেই অভ্যাস হ'ল আচরণের নিখুঁত, সহজ, গাবলীল ও সম্পূর্ণ রূপ।

অভ্যাসের জন্য আচরণের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন। অধিকাংশ অভ্যাসই অর্জিত হয় প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে। এই পুনরাবৃত্তির কাজটি অবশ্য আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারেও হ'তে পারে। কোন কোন অভ্যাস আমরা স্বেচ্ছায় অর্জন করি, আবার অনেক অভ্যাস আমাদের অজ্ঞাতসারেই অর্জিত হয়ে যায়। এই অজ্ঞাতসারে অর্জিত অভ্যাসগুলি সাধারণতঃ অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সৃষ্ট হয় এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আচরণ ধারার একটা বড় অংশ অধিকার করে থাকে। হাঁটা, চলা, কথা বলা, খাওয়া, শোওয়া, ভাষা ব্যবহার করা ইত্যাদি আচরণের বেশীর ভাগই অনুবর্তন প্রক্রিয়া-জাত অভ্যাসের উদাহরণ।

অভ্যাসের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of habitual actions) : অভ্যাস-জাত আচরণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি বিবেচনা করে অভ্যাস-জাত আচরণকে অন্যান্য শ্রেণীর আচরণ থেকে পৃথক করা যায়। অভ্যাসের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল—

সমতা (Uniformity) : অভ্যাস-জাত আচরণ সম-প্রকৃতিবিশিষ্ট। ইচ্ছা প্রসূত ক্রিয়া বিভিন্ন ভাবে সম্পাদিত হ'তে পারে, কিন্তু অভ্যাস সৃষ্ট হ'য়ে গেলে আচরণটি প্রতি ক্ষেত্রে এক ভাবেই সম্পাদিত হবে, কোন তারতম্য ঘটবে না।

দ্রুততা (Promptness) : অভ্যাস-জাত আচরণ অত্যন্ত দ্রুত সম্পাদিত হয়। অভ্যাসটি যত ভাল ভাবে গঠিত হবে আচরণের দ্রুততাও তত বেড়ে যাবে।

নির্ভুলতা (Accuracy) : অভ্যাসজাত আচরণ যে কেবল দ্রুত সম্পাদিত হয়, তা নয় ; নির্ভুল ভাবে সম্পাদিত হয়। অভ্যাসটি যত দৃঢ়মূল হবে আচরণটিও তত নির্ভুল হবে।

মনোযোগের অপ্রয়োজনীয়তা (Absence of attention) : অভ্যাস গঠনের জন্য মনোযোগের প্রয়োজন হয় ঠিকই ; কিন্তু একবার অভ্যাস গঠিত

হয়ে গেলে সেই আচরণে মনোযোগ দেবার প্রয়োজন হয় না। স্বতঃস্ফূর্ত ও যান্ত্রিক প্রকৃতির হয়ে যায়।

প্রবণতা (Propensity) : কোন একটি অভ্যাস গঠিত হয়ে গেলে সেই আচরণটি করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যে সিগারেট খেতে অভ্যস্ত অন্য কাউকে সিগারেট খেতে দেখলে তারও ধূমপান করার ইচ্ছাটি প্রবল হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী Stout-এর অভিমত হ'ল—"We are prone to do what we are used to do"।

আয়াস ও স্বাচ্ছন্দ্য (Ease and Facility) : অভ্যাস-জাত আচরণ বেশ সহজ ভাবে ও স্বচ্ছন্দ ভাবেই সম্পন্ন করা যায়। অনভ্যস্ত কাজে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে সহজেই ক্লান্তিবোধ খুব কমই হয়।

বর্জনে অসুবিধা (Difficult to get rid of) : কোন একটি কাজ বা আচরণে একবার অভ্যস্ত হ'য়ে গেলে সেটি আর সহজে পরিত্যাগ বা বর্জন করা যায় না। চা খাওয়ার বা ধূমপান করার অভ্যাস আমাদের মধ্যে এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, সেটিকে আমরা সহজে পরিত্যাগ করতে পারি না। এ প্রসঙ্গে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। অনেকের অভ্যাস কোন কিছুতে গভীর ভাবে মনোনিবেশ করার সময় মাথা চুলকানো বা গালে হাত দেওয়া। মাথাটি না চুলকালে বা গালে হাতটি না রাখলে এঁরা যেন জটিল বিষয়ে মনোনিবেশ করতেই পারেন না। স্যার ওয়াল্টার স্কট স্কুলে খুব বুদ্ধিমান ছাত্র বলে পরিচিত ছিলেন। শিক্ষক মশায় ক্লাশে যা জিজ্ঞাসা করতেন তিনি চট্ করে তার উত্তর দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁরও একটা মুদ্রাদোষ ছিল। কোন প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় তিনি তাঁর আঙুল দিয়ে কোটের নীচের বোতামটি নাড়তে থাকতেন। সহপাঠীরা এটা লক্ষ্য করল। একদিন স্কটের অজ্ঞাতসারে তারা সেই বোতামটি ছিঁড়ে দিল। এবার আর বোতামটি খুঁজে না পাওয়ার জন্য স্কটের পক্ষে অত্যন্ত সহজ একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হ'ল না।

অভ্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে আমরা অভ্যাসের কতকগুলি সুবিধার কথা জানতে পারি। সেগুলি হ'ল—

- অভ্যাস শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপচয় বন্ধ করে।
- এর জন্য ক্লান্তির পরিমাণ কম হয়।
- আচরণগুলি সহজ ও সরল হয়।

- আচরণটি নির্ভুল ভাবে সম্পাদিত হয়।
- উন্নততর মানসিক প্রক্রিয়াগুলি অব্যাহত ও মুক্ত থাকে।
- সুচরিত্র গঠনের কতকগুলি গুণ বিকশিত হয়।

অভ্যাসের কতকগুলি অসুবিধাও আছে। যেমন—

- অভ্যাস গতানুগতিক ও যান্ত্রিক, এর মধ্যে কোন অভিনবত্ব থাকে না।
- অভ্যাস বুদ্ধিজাত আচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত এক শ্রেণীর আচরণ।
- অভ্যাস একবার অর্জিত হয়ে গেলে সহজে দূর করা যায় না।
- অভ্যাস অনুভূতি নষ্ট করে দেয়। যাঁরা প্রথম বার ডায়মণ্ড হারবারে বেড়াতে আসেন, তাঁরা এখানের নদী ইত্যাদির সৌন্দর্যে অভিভূত হ'য়ে যান। কিন্তু এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা, যাঁরা ঐসব দেখতে অভ্যস্ত, তাঁরা এতে কোন আনন্দ পান না।
- অভ্যাস মানুষকে অত্যন্ত রক্ষণশীল করে দেয়।
- অভ্যাস মানসিক উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করে।

অভ্যাস ও প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার সম্পর্ক (Habit and Reflex action): অভ্যাস-জাত আচরণ ও প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার মধ্যে যেমন সাদৃশ আছে, তেমনি বৈসাদৃশ্যও আছে। প্রতিবর্ত-ক্রিয়া ইচ্ছাপ্রসূত নয়, অনৈচ্ছিক। অভ্যাস যদিও ইচ্ছাপ্রসূত ক্রিয়ার থেকে সৃষ্টি, তবু অভ্যাসটি সঠিক হবার পর সেটি অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় পরিণত হয়ে যায়। অভ্যাস-জাত আচরণ ও প্রতিবর্ত-ক্রিয়া দুটিই বেশ দ্রুততার সঙ্গে সম্পাদিত হয়। দুটি ক্রিয়াই একটি বিশেষ ধারায় সম্পন্ন হয়। দু'শ্রেণীর আচরণই স্বতঃস্ফূর্ত ও যান্ত্রিক। উভয় ক্ষেত্রেই চেতনা, মনোযোগ দান, ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজন হয় না। অভ্যাসের সঙ্গে প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার বেশ কিছু বৈশাদৃশ্যও আছে। প্রতিবর্ত-ক্রিয়া হ'ল প্রাণীর আচরণের সরলতম রূপ, কিন্তু অভ্যাস হ'ল জটিল আচরণ-ধারা। প্রতিবর্ত-ক্রিয়া সহজাত, কিন্তু অভ্যাস-জাত আচরণ অর্জিত। কোন একটি অভ্যাস গঠিত হয়ে গেলে যদিও তা দূর করা কষ্টকর, তবুও চেষ্টা করলে তা বর্জন করা যায়। কিন্তু প্রতিবর্ত-ক্রিয়া বর্জনের কোন প্রশ্নই ওঠে না—যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে এর প্রকাশকে বিলম্বিত বা রোধ করা সম্ভব। কোন অভ্যাস-জাত আচরণ যখন সৃষ্ট

হ'তে থাকে তখন প্রথম স্তরে তা থাকে ঐচ্ছিক, কিন্তু প্রতিবর্ত-ক্রিয়া গোড়ার থেকেই অনৈচ্ছিক।

অভ্যাস ও প্রবৃত্তির মধ্যে সম্পর্ক (Habit and Instinct): অভ্যাস-জাত আচরণ ও প্রবৃত্তি-জাত আচরণের মধ্যে সাদৃশ্য কিছু থাকলেও বৈসাদৃশ্যের পরিমাণই বেশী। দু'রকম আচরণই জটিল এবং উভয় শ্রেণীর আচরণই প্রাণীর বা ব্যক্তির কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে। এই দু'শ্রেণীর আচরণের মধ্যে বৈসাদৃশ্যগুলি হ'ল—

- অভ্যাস-জাত আচরণ হ'ল অর্জিত কিন্তু প্রকৃতি-জাত আচরণ সহজাত বা জন্মগতসূত্রে প্রাপ্ত।
- অভ্যাস-জাত আচরণের উৎস হ'ল—ঐচ্ছিক ক্রিয়া, কিন্তু প্রবৃত্তি-জাত আচরণের উৎস হ'ল প্রাণীর জৈব চাহিদা থেকে উদ্ভূত অস্বস্তি-বোধ।
- অভ্যাস-জাত আচরণ ব্যক্তিগত, কিন্তু সহজাত আচরণ হ'ল জাতিগত বা সর্বজনীন।
- অভ্যাস সৃষ্ট হ'লে প্রয়োজনবোধে বর্জন করা চলে, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তিকে পুরোপুরি বর্জন করা সম্ভব নয়, কিছুটা পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। প্রবৃত্তির পরিবর্তন অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল।
- অভ্যাস-জাত আচরণ সৃষ্ট হবার সময় গোড়ার দিকে থাকে ঐচ্ছিক কিন্তু প্রবৃত্তি-জাত আচরণ সকল স্তরেই অনৈচ্ছিক।

॥ সংক্ষেপে বৈসাদৃশ্যগুলি হ'ল ॥

—প্রবৃত্তিজাত আচরণ—	—অভ্যাসজাত আচরণ—
(১) সহজাত	(১) অর্জিত বা শিক্ষাজাত
(২) অনৈচ্ছিক	(২) ঐচ্ছিক বা ইচ্ছাপ্রসূত
(৩) সরল	(৩) জটিল
(৪) জাতিগত বা সর্বজনীন (Racial or Universal)	(৪) ব্যক্তিগত (Personal)
(৫) বর্জন করা যায় না।	(৫) কঠিন হলেও বর্জন করা যায়।

সহজাত-ক্রিয়া বা প্রকৃতির উপর অভ্যাসের প্রভাব (Influence of Habit on Instinct: অভ্যাস কি সহজাত প্রবৃত্তির উপর কোনরূপ

প্রভাব বিস্তার করতে পারে ? এ বিষয়ে জেমস্ ও ম্যাকডুগাল দু'টি ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। এখন তাঁদের অভিমতগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল—

জেম্‌স-এর অভিমত (Jame's View) জেম্‌স প্রবৃত্তির উপর অভ্যাসের প্রভাব সম্পর্কে দু'টি সূত্রের কথা বলেছেন—প্রবৃত্তির ক্ষণ-স্থায়ীত্বের সূত্র (Law of Transitoriness) ও প্রবৃত্তির নিরোধ বা পরিবর্তনের সূত্র (Law of Inhibition)। ক্ষণ-স্থায়ীত্বের বা অনিত্যতার সূত্রটি হ'ল—If during the time of such an instincts' vivacity, objects adequate to arouse it are met with, habit of acting on them is formed ; if no such objects are met with, then no habit will be formed. দ্বিতীয় সূত্রটি হ'ল—A habit once grafted on an instinctive tendency restricts the range of the tendency itself and keeps us from reacting on any but the habitual object. এখন এ সম্পর্কে বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করা হচ্ছে—

ক্ষণস্থায়ীত্ব : জেমস্ বলেন, আমাদের অনেক সহজাত প্রবৃত্তি আছে যেগুলি চিরস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী নয়। তিনি এই সূত্রে বলেছেন—ব্যক্তির মধ্যে প্রবৃত্তি একটা বিশেষ সময়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তারপর ধীরে ধীরে তার শক্তি কমতে থাকে এবং শেষে একেবারে বিলুপ্ত হ'য়ে যেতে পারে। তবে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবার আগে সেটি কোন অভ্যাসের জন্ম দিয়ে থাকে এবং পরবর্তিকালে ব্যক্তির মধ্যে যেটি থাকে সেটি প্রবৃত্তি নয়, তার থেকে জাত এই অভ্যাসটি। যেমন, যৌথ প্রবৃত্তির তাড়নায় শিশু অপরের সঙ্গ কামনা করে, দল বাঁধে। কিন্তু বড় হলে এই যৌথ প্রবৃত্তিটি ঠিক প্রবৃত্তির আকারেই থাকে না। শিশুর এই সঙ্গ-কামনা, দল-বাঁধা প্রভৃতি আচরণ তার মধ্যে থেকে যায় অভ্যাসের আকারে। আবার অনেক প্রবৃত্তি প্রথম দিকে কার্যকরী থাকলেও পরবর্তিকালে কোন অভ্যাস সৃষ্টি না করেই বা কোনরূপ চিহ্ন না রেখেই বিলুপ্ত হ'তে পারে। শিশুর স্তন্যপান করার প্রবৃত্তিটি বড় হ'লে একেবারে চলে যায় এবং তা থেকে কোন বিশেষ অভ্যাসও ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় না।

তা'হলে দেখা যাচ্ছে অভ্যাসের দ্বারা প্রবৃত্তিটি বদ্ধ করতে পারলে সেটি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। আবার এর উল্টোটাও সম্ভব। অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা কোন প্রবৃত্তি-জাত আচরণকে বাঁচিয়ে রেখে আমরা সেটিকে দীর্ঘস্থায়ীও করতে পারি।

নিরোধ : দ্বিতীয় সূত্রে জেমস বলেছেন—অভ্যাসের দ্বারা আমরা প্রবৃত্তি-জাত আচরণকে পরিবর্তিত এমন কি রুদ্ধ পর্যন্ত করতে পারি। বাঘ দেখলে পলায়ন করা আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু সার্কাসের রিং-মাষ্টার তো বাঘ নিয়ে খেলা দেখান ; জেমস্ বলেছেন, তার ক্ষেত্রে অভ্যাসের জন্য পলায়ন প্রবৃত্তিটি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তাঁর মত হ'ল অভ্যাসই কোন একটি প্রবৃত্তির প্রকাশকে একটি সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত ক'রে তার প্রকাশকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে বা সেই প্রবৃত্তিটির প্রকাশের পথে একটা বাধার সৃষ্টিও করতে পারে।

ম্যাক্‌ডুগালের অভিমত (Mc. Dougall's View) : ম্যাক্‌ডুগাল জেম্‌সের সূত্রগুলির বিশেষতঃ প্রথম সূত্রটির ঘোরতর প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর বক্তব্য হ'ল, জেম্‌স ব্যক্তিগত জীবনে অভ্যাসের উপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করেছেন—প্রবৃত্তির উপর ততটা করেন নি। তাঁর মতে প্রবৃত্তিটি বিলুপ্ত হ'য়ে যায় না। প্রবৃত্তিটি হ'ল মনের চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় কর্মপ্রবণতা। প্রবৃত্তি থেকেই অভ্যাসের সৃষ্টি হয় ঠিকই, কিন্তু অভ্যাস সৃষ্টি করেই এর কাজ শেষ হয়ে যায় না। তার পরেও প্রবৃত্তিটি অব্যাহত থেকে যায়। বিপরীত অভ্যাস সৃষ্টি ক'রে প্রবৃত্তি-জাত আচরণের প্রকাশ বন্ধ করলেও তাকে একেবারে বিলুপ্ত করা যায় না। সে রকম ক্ষেত্রে প্রাণী আর তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে পারে না। আবার অভ্যাসের ফলে প্রবৃত্তিজাত আচরণের প্রকাশটি বন্ধ থাকলেও সুযোগ পেলেই সেগুলি আবার আত্মপ্রকাশ করে থাকে। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বললেন বুনো হাঁস জন্মা যার পরই যদি তাদের ডানা কেটে দেওয়া হয় এবং খাঁচায় বন্দী করে রাখা হয়, তবে সাময়িক ভাবে তাদের উড়ে বেড়াবার প্রবৃত্তিটি রুদ্ধ হয়ে যায় কিন্তু লুপ্ত হয়ে যায় না। ডানা গজাবার সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ পেলেই তারা উড়ে পালাবে। প্রবৃত্তি যদি ক্ষণস্থায়ী হ'ত তাহ'লে তার পক্ষে উড়ে যাওয়া সম্ভব হ'ত না। অতএব প্রবৃত্তি চিরস্থায়ী। ম্যাক্‌ডুগাল মনে করেন সহজাত প্রবৃত্তির কাছে অভ্যাস একান্তই দুর্বল। তাই তিনি প্রবৃত্তিকে প্রভু এবং অভ্যাসকে ভৃত্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ অভ্যাসগুলিই সহজাত প্রবৃত্তির অধীন।

অভ্যাসকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করেছি—সু-অভ্যাস ও কু-অভ্যাস।

যে সমস্ত অভ্যাস ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক, সেগুলিকে সু-অভ্যাস বলা হয়। আর যে সমস্ত অভ্যাস কোন না কোন দিক থেকে ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, সেগুলিকে কু-অভ্যাস বলা হয়। আমরা সু-অভ্যাস গঠন ও কু-অভ্যাস বর্জন করতে চাই। এই গঠন ও বর্জন কিভাবে করা সম্ভব, সে সম্বন্ধে উইলিয়ম জেমস কতকগুলি নিয়মের কথা বলে গেছেন। এখন সেই নিয়মগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল—

॥ **সু-অভ্যাস গঠনের নিয়মাবলী (Laws of Habit Formation)** ॥

[এক] **দৃঢ় সংকল্প** (Firmness of determination) : [One must launch one's self with as strong and decided initiative as possible] নতুন কোন অভ্যাস গঠন করতে গেলে দৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন। যে কোন কাজ যদি দৃঢ়-সংকল্প নিয়ে শুরু করা যায় তাহ'লে খুব সহজেই অভ্যাস গঠিত হ'তে পারে। যে ছেলেটি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠার অভ্যাস অর্জন করতে করতে চায়—তাকে প্রথমে সেটি করার জন্য মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করতে হবে। মনের মধ্যে দ্বিধা বা "হচ্ছে—হবে" জাতীয় ভাব থাকলে অভ্যাস গঠনের পথে বাধার সৃষ্টি হবে।

[দুই] **প্রথম সুযোগের সদ্ব্যবহার** (**Avail of the first opportunity**) : [Seize the very first opportunity to act on every resolution you make and on every emotional prompting you may experience in the direction of habits you aspire to gain] মনের কোন সংকল্পকে কার্যে পরিণত করতে হ'লে প্রথম সুযোগটির সদ্ব্যবহার করতে হবে। পড়ার অভ্যাস যদি করতে হয়, তবে আজই—এক্ষুণি পড়া শুরু করতে হবে। রবিবার ছুটির দিন অতএব পড়া আরম্ভ করব না। 'বিদ্যারম্ভে বৃহস্পতি'—বৃহস্পতি বার আসুক তখন পড়া শুরু করব—এ জাতীয় মনোভাব থাকলে সংকল্পটি অভ্যাসে পরিণত হবে না। যত সময় অতিবাহিত হতে থাকবে সংকল্পটিও তত হীনবল হ'তে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাবে অভ্যাস গঠন আর হবে না।

[তিন] **ব্যতিক্রম ঘটানো চলবে না (Persistence)** : [Never allow an exception to occur till the new habit is surely rooted in your life] অভ্যাসটি আরম্ভ করার সময় যাতে কোন প্রকার ব্যতিক্রম

না ঘটে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। যে লোকটি সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করার জন্য সিগারেট খাওয়া বন্ধ করেছে সে যদি দু'দিন পরে বলে "বাঃ এই তো বেশ সিগারেট ছাড়তে পারি। দুদিন না খেয়ে মন আমার অপূর্ব সংযমের পরিচয় দিয়েছে। আজ একটা খেলে তেমন কিছু দোষ হবে না" —তাহ'লে তার আর সিগারেট খাওয়ার অভ্যাসটি দূর করা যাবে না। ভোরে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস করতে হলে রোজই ভোরে উঠতে হবে। রবিবার—ছুটির দিন বলে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমুলে চলবে না।

[চার] **অনুশীলন** (**Activity**) : [Keep the faculty of effort alive in you by a gratuitous exercise everyday.] অভ্যাস গঠন করতে হলে অনুশীলনের প্রয়োজন। যে সব ক্ষেত্রে প্রত্যহ অনুশীলন করা সম্ভব নয়, সে সমস্ত ক্ষেত্রে সুযোগ পেলেই কাজটির অনুশীলন করা প্রয়োজন। টাইপ করা, সাঁতার শেখা, বন্দুক দ্বারা লক্ষ্যভেদ করা ইত্যাদির অভ্যাস অর্জন করতে হলে অনুশীলনের একান্ত প্রয়োজন।

উপরোক্ত চারটি নিয়মকে সু-অভ্যাস গঠনের প্রধান নিয়ম বলা হয়ে থাকে। এগুলি ছাড়া আরো কতকগুলি অপ্রধান নিয়মও আছে। সেগুলি হ'ল—

(ক) অপরের সামনে অভ্যাসটি আয়ত্ত করার জন্য অনুশীলন করা। (তুঃ আপনি আচরি ধর্ম শেখাও অপরে)।

(খ) মানসিক প্রস্তুতি।

(গ) অভ্যাস-জাত আচরণটির সম্ভাব্য সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যক্তির মধ্যে অচেতনতার সৃষ্টি করা।

(ঘ) অনুকূল পরিবেশের মধ্যে অভ্যাস গঠনের চেষ্টা করা।

(ঙ) অভ্যাসের ফলাফল সম্বন্ধে ব্যক্তিকে অবহিত করা।

(চ) সু-অভ্যাস গঠনে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করার জন্য প্রশংসা ও পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করা। (বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য যেমন পুরস্কার দেওয়া হয়।)

কু-অভ্যাস বর্জনের নিয়ম (Rules of breaking bad habits) : এবার কু-অভ্যাস কি করে বর্জন করা যায় সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্। এক্ষেত্রেও উইলিয়াম জেম্‌স কতকগুলি নিয়মের কথা বলে গেছেন। সেগুলি হ'ল—

[এক] কু-অভ্যাস বর্জনে বিলম্ব না করে অবিলম্বে তা বর্জন করার জন্ত দৃঢ় সংকল্প করতে হবে (Now habit shouldbe started at the earliest) ; গোড়ার থেকে তা বর্জন করার চেষ্টা না করলে পরে খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে—'Just as the sapling is bent—the tree is inclined। কাজেই সোজা গাছ পেতে হলে যেমন সোজা চারার প্রয়োজন সু-অভ্যাস গঠনে তেমনি গোড়া থেকেই সু-অভ্যাসের প্রয়োজন অর্থাৎ কু-অভ্যাস একেবারে প্রথম দিক থেকেই বর্জন করতে হবে। কোন অজুহাতেই বিলম্ব করা চলবে না।

[দুই] বিপরীত অভ্যাস গঠন করা (Formation of opposite or counter-habit) : কু-অভ্যাস বর্জন করার আর একটি ভালো উপায় হচ্ছে বিপরীত অভ্যাসটি গঠন করা। শিশুর যে অভ্যাসটি দূর করতে হবে ঠিক তার বিপরীত অভ্যাসটি গড়ে তুলতে হবে। যে ছেলে স্কুল পালাতে অভ্যস্ত তাকে বিভিন্ন কাজে ব্যাপৃত রেখে স্কুলে থাকার অভ্যাসটি গড়ে তুলতে হবে।

[তিন] পরিশ্রান্তিকর পদ্ধতি (Exhaustion Method) : এই পদ্ধতিতে যে কু-অভ্যাসটি গঠিত হয়েছে—শ্রান্তি বা ক্লান্তি না আসা পর্যন্ত সেই অভ্যাসটির পুনরাবৃত্তি করতে হবে। শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি বিরক্ত হয়ে ঐ অভ্যাসটি বর্জন করে। Dunlap-এর সেই পরীক্ষাটির কথা বোধ হয় মনে আছে। তিনি 'The' লিখতে গেলেই 'bte' লিখতেন। একদিন তিনি ৫০০ বার কেবল 'bte' লিখলেন। তারপর দেখা গেল, তাঁর আর ভুল হচ্ছে না—তিনি 'The' লিখতে পারছেন। এ প্রসঙ্গে আমার একটি নিজস্ব অভিজ্ঞতা আছে আমার সাত বছরের পুত্রটি দেশলাই পেলেই তার কাঠি জ্বালাত। এটা তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, বলে বলে কিছুতেই ছাড়ানো যায়নি। একদিন আমি তাকে এক ডজন দেশলাই দিয়ে কাঠিগুলি সব জ্বালাতে বললাম। সে জ্বালাল, কিন্তু তার পর থেকেই কাঠি জ্বালানোর ঐ অভ্যাসটি একেবারে দূর হয়ে গেল।

[চার] বিকল্প পদ্ধতির মাধ্যমে বর্জন (Elimination through substitution) : অনেক কু-অভ্যাস বিকল্প অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে বর্জন করা যায়। কু-অভ্যাসটি বর্জন করার জন্ত যে বিকল্প অভ্যাসটি গঠন করা হবে, সেটি যেন

কু-অভ্যাস হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন সিনেমা দেখতে অভ্যস্ত, সে যদি ঐ সময়ে বেড়াতে যায় বা সাহিত্য পাঠ বা সংগীত চর্চা করে, তাহ'লে অভ্যাসটি দূর হতে পারে। খুব বেশী চা খাওয়ার অভ্যাস দূর করতে হ'লে ঐ সময়ে দুধ, সরবৎ ইত্যাদি পান করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। আমি কয়েক জনকে জানি যারা সিগারেট খাওয়ার কু-অভ্যাস দূর করার জন্য সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে জাগলেই লজেন্স বা চকোলেট খেতেন। ফলে তারা সিগারেট খাওয়ার কু-অভ্যাসটি দূর করতে পেরেছিলেন।

[পাঁচ] আত্ম-সমালোচনা (Auto suggestion): কু-অভ্যাসের কুফল সম্বন্ধে আত্ম-সচেতন হ'লে আমরা কু-অভ্যাসটি দূর করতে পারি। কু-অভ্যাসটি যে খারাপ এ বোধটি জাগলেই আমরা নিজের থেকেই কু-অভ্যাসটি বর্জন করতে সচেষ্ট হতে পারব।

[ছয়] ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ (Will force): কোন কু-অভ্যাসকে নষ্ট করতে হ'লে যথেষ্ট ইচ্ছা বা মানসিক শক্তির প্রয়োজন। শিশু যাতে ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগ করতে পারে—সেইজন্য উপযুক্ত মানসিক দৃঢ়তা বা সংকল্প তার মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। এর-জন্য প্রয়োজন সহানুভূতি, সহযোগিতা ও সুপরিচালনা।

[সাত] মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis): কু-অভ্যাসটি কিজন্য গঠিত হয়েছে উপযুক্ত মনঃসমীক্ষণের মাধ্যমে তা যদি জানা যায় তাহ'লে সেটি দূর করা অত্যন্ত সহজ হয়। অধিকাংশ অভ্যাসই অনুবর্তন-প্রক্রিয়ার ফল। তাছাড়া যখনই কেউ কোন অভ্যাস (তা সে কু হোক আর সু হোক) অর্জন করে, তখন সেই অভ্যাস থেকে তৃপ্তি পাবার জন্যই সেটি অর্জন করে। সে কি ভাবে তৃপ্তি পাচ্ছে তা জানা দরকার। অনেক সময় সে যে কারণটি দেখায় সেটি প্রকৃত কারণ নয়। এ ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ প্রভূত সাহায্য করে।

[আট] শাস্তি (Punishment): শাস্তি দিয়েও অনেক সময় কু-অভ্যাস বর্জন করানো যায়। তবে এ পদ্ধতিটি মনোবিজ্ঞান-সম্মত নয়। এতে সুফলের চেয়ে কুফলই বেশী ঘটে থাকে।

[নয়] ফলাফল (Out come): অভ্যাস মাত্রেই ব্যক্তির কাছে তৃপ্তি-দায়ক। কোন কু-অভ্যাস দূর করতে হ'লে সেটি ব্যক্তির কাছে বিরক্তিকর করে তুলতে হবে। অর্থাৎ অভ্যাস-জাত আচরণটি সম্পন্ন করার সময় যেন তার মধ্যে বিরক্তি বা অসন্তোষ জাগে।

[দশ] পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ (Controlling the environment) : অনেক সময় বিশেষ বিশেষ পরিবেশের প্রভাবে বিশেষ বিশেষ কু-অভ্যাস গঠিত হ'তে পারে। কু-অভ্যাস বর্জন করার জন্য এমন একটি পরিবেশে নিজেকে রাখার চেষ্টা করতে হবে, যাতে কোন প্রকার প্রলোভনের দ্রব্য চিত্ত-বিক্ষোভ না ঘটাতে পারে। যে ব্যক্তি মদ্যপ, তার মদ্যপায়ীদের সঙ্গ বর্জন তো একান্তই উচিত, মদের দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়াও উচিত নয়।

[এগার] সুপরিচালনা (Proper guidance) : সুপরিচালনা কু-অভ্যাস দূরীকরণে ও সু-অভ্যাস গঠনে অত্যন্ত সহায়তা করে। কোন্ অভ্যাস তার সাফল্যের সহায়ক আর কোন্টি নয় সে সম্বন্ধে শিশুর মনে একটা স্থায়ী ধারণার সৃষ্টি করতে হবে। সুপরিচালনার গুণে শিশু নিজেই তার আচরণটি নিয়ন্ত্রণ করতে শিখবে এবং কু-অভ্যাসগুলি খারাপ বলে নিজেই সেগুলি বর্জন করতে শিখবে।

[বার] দৈহিক প্রস্তুতি (Physical readiness) : অভ্যাস গঠনের একটা দৈহিক দিকও আছে। অভ্যাস অর্জিত হলে মস্তিষ্কে একটা স্নায়ু-পথ (Nervous path) রচিত হয়। বিপরীত অভ্যাস গঠন করলে এই স্নায়ু-পথটি পরিবর্তিত বা বিনষ্ট হয়ে যায়,—ফলে অভ্যাসটি বর্জন করা সহজ হয়।

এগুলি ছাড়া আরো কতকগুলি নিয়মের কথা বলা হ'য়ে থাকে। যেমন—

[তের] অ-ব্যবহার (Disuse) : কু-অভ্যাসটি অনুশীলন করার বা সেটি ঘটবার কোন সুযোগ না দেওয়া।

[চৌদ্দ] মৌখিক আবেদন (Verbal appeal) : কু-অভ্যাসটি যে খারাপ, সেটি যে অবাঞ্ছনীয় বা তার কুফল সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বর্জন করতে আবেদন করা।

[পনর] প্রত্যক্ষ অনুবর্তন (Direct conditioning) : অভ্যাস মাত্রই কোন না কোন অনুবর্তনের ফল। কোন কু-অভ্যাস গঠিত হ'লে সেটিকে অন্য একটি সু-অভ্যাসের সঙ্গে অনুবর্তিত করে সুফল পাওয়া সম্ভব।

[ষোল] সামাজিক উদ্দীপক (Social stimulation) : অনেক ক্ষেত্রে সমাজের প্রসঙ্গ অবতারণা করেও কু-অভ্যাস বর্জন করানো সম্ভব। কোন একটি ছেলের হয়তো কোন কু-অভ্যাস আছে। তাকে যদি দেখান যায় ঐ জাতীয় কু-অভ্যাস সমাজে বসবাসকারী অন্য কোন লোক বা ছেলের মধ্যে

নেই, ঐ অভ্যাসটি থাকার জন্য সমাজ তাকে কি চোখে দেখছে বা তার সমবয়সী ছেলেরা তাকে কি ভাবে দেখছে—তাহ'লে ঐ কু-অভ্যাসটি দূর হ'তে পারে।

অভ্যাস গঠনের দৈহিক ভিত্তি (Physiological basis of habit formation): আগেই বলা হয়েছে অভ্যাস গঠন হলে মস্তিষ্কে একটা স্নায়ু-পথ (Nervous path) রচিত হয়। যখন আমরা কোন কাজ করি তখন মস্তিষ্কের নিউরনগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রত্যেক নিউরনের মাঝখানে খানিকটা ফাঁক থাকে—যাকে বলে সন্নিকর্ষ বা Synapse। যখন কোন কাজ প্রথম বার করা হয়, তখন এই সন্নিকর্ষগুলিতে খানিকটা বাধা অতিক্রম করতে হয়। আমাদের স্নায়ুগুলি নমনীয় পদার্থ দিয়ে তৈরী (Plastic)। কোন একটি স্নায়বিক শক্তি স্নায়ুযন্ত্রের কোন একটি নির্দিষ্ট পথ ধরে অগ্রসর হ'লে সম্মিলিত নিউরনগুলির মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা যায় এবং স্নায়ুসন্ধির বাধাটিও অতিক্রম করা সম্ভব হয়। এই বাধা অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে একই রূপ অবস্থায় স্নায়বিক শক্তির একই পথ ধরে প্রবাহিত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কাজেই দ্বিতীয় বার কাজটি করবার সময় বাধার পরিমাণ কম হয়। বার বার একই পথে স্নায়বিক শক্তি সঞ্চারিত হ'লে স্নায়ুপথটি পাকা হয়। এরই নাম হ'ল অভ্যাস। কিন্তু এই পথটি যদি দীর্ঘদিন ব্যবহার না করা হয়, তবে সন্নিকর্ষ থেকে আবার বাধার সৃষ্টি হয় ও স্নায়ুপথের রেখাটি ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট হ'তে থাকে। অভ্যাস গঠন সম্বন্ধে Sandiford-এর বক্তব্য হ'ল—স্নায়বিক শক্তি প্রত্যেক স্নায়ুসন্ধি বা সন্নিকর্ষে বাধাপ্রাপ্ত হয়। স্নায়বিক শক্তি-তরঙ্গের পর্যায়ক্রমিক আঘাতে স্নায়ুসন্ধির বাধা ভেঙ্গে ফেলার নামই হ'ল অভ্যাস গঠন। স্নায়বিক শক্তি যত প্রচণ্ড হবে, যত বারে বারে স্নায়ুসন্ধিতে এসে ধাক্কা মারবে তত দ্রুত বাধার বাঁধন ছিঁড়ে যাবে অর্থাৎ অভ্যাস গঠিত হবে।

শিক্ষা ও অভ্যাস (Education and Habit): রুশোর কথা হ'ল—"The only habit the child should be allowed to form is to form no habit at all" স্পষ্টতঃই রুশো অভ্যাস গঠনের দারুণ বিরোধী ছিলেন। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। অভ্যাসের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যেও শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বের কথাগুলি উপলব্ধি করা যায়। অভ্যাস-জাত কাজও সহজ ভাবে, স্বচ্ছন্দে

এমন কি মনোযোগ না দিয়েও করা সম্ভব। যে কোন কঠিন কাজ প্রথম প্রথম করতে গেলেই অনেক অসুবিধা হয়—সহজে অবসাদ আসে। কিন্তু কিছুদিন পর কাজটি আর কঠিন হলে মনে হয় না—অবসাদ বা ক্লান্তিও অনেক দেরীতে আসে। এর কারণ হ'ল—অভ্যাস গঠন। অভ্যাস গঠনের প্রথম দিকে অবশ্য অনেক বাধা, অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। যারা সংগীত, নৃত্য বা অন্য কোন ললিত কলাতে পারদর্শী হয়েছেন—তাঁরা যেমন জানেন যে কেবল আগ্রহ নয়, তার সঙ্গে অভ্যাসও তাদের এই সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে, তেমনি এ-ও জানেন প্রথম দিকে তাঁরা কিরূপ বিরূপ সমালোচনা ও বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কেবলমাত্র আগ্রহ থাকলেই সাফল্য আসে না। তাই শিক্ষকের অন্যতম কর্তব্য হওয়া উচিত—শিশুর মধ্যে শেখার অভ্যাস গড়ে তোলা। জেমস তো মনে করেন শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্যই হওয়া উচিত যথোচিত অভ্যাস গঠন। ডিউই তো অভ্যাসকে বর্তমানের পটভূমিকায় অতীতের যোগসূত্র বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন অভ্যাস অর্জন হয়ে গেলেই সেটি শেষ হয়ে যায় না। ভবিষ্যতে অভিজ্ঞতার উপরও তার প্রভাব রয়েছে। অভ্যাসকে তিনি ধারাবাহিকতার নীতিতে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন ঘটানো যাতে সে পরিবর্তিত পরিবেশে যথোচিত প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। কিন্তু অর্জিত আচরণগুলি যদি অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করা না হয়, তাহ'লে অবস্থানুসারে প্রতিক্রিয়া করা শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয় না। অভ্যাস না থাকলে ভালো করে শেখা সত্ত্বেও আমরা প্রয়োজনমত সেই শিখনের সদ্ব্যবহার করতে পারি না।

আবার অভ্যাসের জন্যই শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়। পুরাতন শেখাটি অভ্যাসের দ্বারা ভালো ভাবে আয়ত্ত করলে তবে নতুন শিখন সম্ভব। অভ্যাস শিক্ষার্থীর সময় ও পরিশ্রম বাঁচায় ও তাকে নতুন অভিজ্ঞতা লাভে সাহায্য করে। কেবলমাত্র নতুন অভিজ্ঞতাই নয়, দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জন করা যায় না। Practice surely makes a man perfect। সাইকেল বা মোটর চালানো, টাইপ করা, সাঁতার কাটা প্রভৃতি কাজে নিয়মিত অভ্যাসের প্রয়োজন।

শিক্ষা শিশুর ব্যক্তিত্বের সুসমঞ্জস ক্রমবিকাশের দিকেও যথেষ্ট লক্ষ্য রাখে। ব্যক্তি-সত্তার সুষম ক্রমবিকাশ আবার কতকগুলি সদ্ অভ্যাস গঠনের উপর নির্ভরশীল। শৈশব থেকেই কতকগুলি সু-অভ্যাস শিশুর মধ্যে গঠিত করলে ভবিষ্যতে তার চরিত্র নানা সদ্‌গুণের আকর হয়ে উঠবে। কথায় বলে—যা পাচে, তাই পঞ্চাশে, বা কচু গাছ কাটতে কাটতে ডাকাত। কাজেই দেখা যাচ্ছে শৈশবের অভ্যাসটিই ভবিষ্যত ব্যক্তিসত্তা বা চরিত্রটি নির্ধারিত করে দেয়। এ বিষয়ে অর্থাৎ সু অভ্যাস গঠনে ও কু-অভ্যাস বর্জনে শিক্ষক ও মাতাপিতা, সকলকেই সমভাবে অবহিত হ'তে হবে।

৬) শিশুর কাছে কোন অভ্যাস যেন অর্থহীন বা উদ্দেশ্যহীন না মনে হয়। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে বা অর্থ না বুঝে অভ্যাস গঠনের কোন সুফল লক্ষ্য করা যায় না। এতে বরং শিক্ষার্থীর মূল্যবান সময় ও মানসিক শক্তির অপচয় ঘটে।

নানা কারণে শিশুর মধ্যে অনেক কু-অভ্যাস দেখা যায় যেমন থুথু দিয়ে শ্লেট মোছা বা বইয়ের পাতা উল্টানো, নখ কামড়ানো, ছুরি দিয়ে বেঞ্চ কাটা ইত্যাদি। শিক্ষককে জানতে হবে—কেন ও কি ভাবে শিশু এই কু-অভ্যাসগুলি অর্জন করেছে। কারণটি জানার পর শিক্ষককে সযত্ন সতর্কতার সঙ্গে সেগুলি সমূলে বিনষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে। এর জন্য শিক্ষককে উপযুক্ত পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে অন্যথায় শিশুর মানসিক বিপর্যয় ঘটা অস্বাভাবিক নয়। কেবল মাত্র আচরণের দিকেই নয়—সুশৃঙ্খল ও সুসংগত চিন্তার, সুদৃঢ় ভাবে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করার প্রভৃতি নানাবিধ অভ্যাসও শিশু যাতে অর্জন করতে পারে সেদিকেও শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়কেই বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। পরিশেষে ডিউই-এর মন্তব্য দিয়ে বক্তব্য শেষ করা যাক্—

সেই অভিজ্ঞতা বা অভ্যাস শিক্ষার অনুকূল বা educative যেটি ব্যক্তির দেহ বা মনের গঠনকে এমন ভাবে পরিবর্তিত করে যাতে ভবিষ্যতে ফলপ্রসূ ও পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার পথটি প্রশস্ত হয়। কিন্তু যে অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা আপাতদৃষ্টিতে রমণীয় বলে মনে হয়—কিন্তু ভবিষ্যত জীবনকে বিকারগ্রস্ত, পঙ্গু ও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয় তা হ'ল শিক্ষার প্রতিকূল বা mis-educative। যে অভ্যাস (বা অভিজ্ঞতা) শিশুর মানসিক একাগ্রতা ও সামগ্রিক সমন্বয়ের সহায়ক, সেই অভ্যাসকেই শিক্ষক বেশী দাম দেবেন। বিপরীত অভ্যাসটি

বর্জন করতে হবে। "থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে দেখব এবার জগৎটাকে" বা "আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে"—এই জাতীয় বোধ যে অভ্যাস জাগাতে পারে তা নিঃসন্দেহে সু-শিক্ষার অঙ্গ। কিন্তু যে অভ্যাস শিশুমনকে সংকীর্ণ করে, স্বার্থপর করে বা আত্ম-কেন্দ্রিক করে তোলে, যা তাকে পরের জীবন ও অভিজ্ঞতার প্রতি উদাসীন, অশ্রদ্ধাপরায়ণ বা নির্মম করে তোলে তা নিঃসন্দেহে কু-শিক্ষা। অভ্যাস থেকেই সিদ্ধিলাভ হয়। কাজেই সু-অভ্যাস গঠন শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রয়োজনীয় ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অবসাদ

Fatgiue

[Loss of skill or efficiency —Sandiford

Partial or total loss of efficiency of any nerve or muscular organ,—generally temporary in nature caused by prolonged or repeated work.—Michael West.

Loss of efficiency or skill of our bodily organs...Mc. Dougall

Diminished productivity, efficiency or ability to carry on work because of previous expenditure of energy in doing work ; on the subjective side the complex of senaations and feelings and the increase difficulty of carring on, experienced after a prolonged spell of work ; must be distinguished from,boredom, which may be described as a subjective feeling of fatigue due to montony or lack of interest, rather than the expenditure of energy. Fatique may be mental, muscular, sensory or nervous—Dictionary of Psychology]

অবসাদ (Fatigue) : কর্মময় এই জগতে আমাদের সকলকেই কাজ করতে হয়। তবে কাজ বলতে আমরা সাধারণতঃ দু'ধরনের কাজ বুঝিয়ে থাকি—শারীরিক (Physical) ও মানসিক (Mental)। মানসিক কাজকে দু'ভাবে ভাগ করা যায়—ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক। যে কোন কাজ আমরা প্রথমে যে রকম উৎসাহ ও দক্ষতা নিয়ে শুরু করি, ঠিক সেই রকম উৎসাহ ও দক্ষতার মান বরাবর আমরা বজায় রাখতে পারি না। কাজের দক্ষতার এই যে হ্রাস-বৃদ্ধি, এ নানা কারণে ঘটতে পারে। তবে তাঁর মধ্যে দুটি কারণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি হ'ল প্রেষণা (Motivation) যার কথা আমরা 'শিখন' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। অপরটি হ'ল ক্লান্তি বা অবসাদ (Fatigue)। অবসাদ হ'ল সর্বজনীন। কাজ করলে ক্লান্তি বা অবসাদ সকলকে অনুভব করতে হয়। দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রমের একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করলেই ক্লান্তি দেখা দেবে—যদিও এই সীমা বিভিন্ন লোকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। সাধারণতঃ দৈহিক ক্লান্তির সঙ্গে মানসিক ক্লান্তি জড়িত থাকে। মানসিক ক্লান্তিও সর্বজনীন যদিও এটি কারো ক্ষেত্রে সহজে দেখা দেয়, আবার কারো ক্ষেত্রে অত্যন্ত দেরীতে আসে।

কোন একটা কাজ অনেকক্ষণ ধরে করতে করতে যখন একটা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন দেখা যায় যে, কাজে দক্ষতা বা কুশলতা হ্রাস পাচ্ছে, কাজে আর আগ্রহ জাগছে না, কাজ করতে যেন আর ইচ্ছেই করছে না। একেই আমরা বলি ক্লান্তি। অনেকক্ষণ ধরে রাস্তা চলার পর মনে হয় পা দুটো যেন প্রচণ্ড ভারী হয়ে গেছে—আর টানা যাচ্ছে না। একটানা অনেকক্ষণ ছুঁচ-সুতোর কাজ করতে করতে চোখ দুটো টনটন করতে থাকে, সব ঝাপসা হয়ে আসে। আবার ক্রমাগত কয়েক ঘণ্টা অঙ্ক করতে থাকলে দেখা যাবে শেষের দিকে আগের দিকের চেয়ে ভুল বেশী হচ্ছে সব যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এ সবই হচ্ছে ক্লান্তির উদাহরণ। ঘটনাগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে—ক্লান্তি বা অবসাদ পেশী সম্পর্কে (Muscular), ইন্দ্রিয় সম্পর্কে (Sensory) বা মন সম্পর্কে (Mental) হ'তে পারে। অবসাদ আবার সামগ্রিক হ'তে পারে কিংবা বিশেষ কোন একটি ইন্দ্রিয় বা পেশী সম্পর্কেও হ'তে পারে। আমাদের এমন মনে হতে পারে—যেন সমস্ত দেহটিই ক্লান্ত। আবার এমন মনে হ'তে পারে—কেবল চোখ দুটিতেই রাজ্যের ক্লান্তি নেমে এসেছে। তবে এ দুটো অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। চোখ দুটি ক্লান্ত হ'লে সারা শরীরেও তার একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। অবসাদ আবার সম্পূর্ণ বা আংশিকও হ'তে পারে।

অবসাদ সম্বন্ধে স্যাণ্ডিফোর্ড-এর সংজ্ঞা হ'ল—কার্যে দক্ষতার হ্রাস। মাইকেল ওয়েস্ট বলেন, কোন একটা কাজ অনেকক্ষণ বা অনেক বার করার ফলে সাময়িক, সাধারণ ভাবে অথবা বিশেষ কোন ইন্দ্রিয় বা পেশীর কর্মক্ষমতার সম্পূর্ণ বা আংশিক হ্রাস। আবার ম্যাক্‌ডুগাল বলেন, অবসাদ হ'ল দেহ-যন্ত্রের নৈপুণ্য বা ক্ষমতার হ্রাস যা তীব্র ও বহুক্ষণব্যাপী কার্যের ফলে দেখা দেয় এবং যা কিছুক্ষণের বিশ্রাম, বিশেষতঃ ঘুমের পর সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় এবং দেহযন্ত্র তার পূর্ব কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পূর্ণরূপে ফিরে পায়।

বিরক্তি (Boredom): অবসাদের সঙ্গে বিরক্তির যথেষ্ট মিল আছে, আবার সম্বন্ধও আছে। কিন্তু দু'টি এক জিনিস নয়। মাইকেল ওয়েস্ট বিরক্তিকে বলেছেন, মিথ্যে বা দুষ্ট অবসাদ (False fatigue)। বিরক্তিকে সঠিক ভাবে বলা যায়—কোন একটি কাজ করার অনিচ্ছা বা সেই কাজটির প্রতি বিতৃষ্ণা। স্যাণ্ডিফোর্ড-এর মতে বিরক্তি হ'ল, কোন কাজ করা সম্পর্কে

ইচ্ছার অভাব বা সেই কাজ সম্বন্ধে বিমুখতা।" অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন বিষয়ের ক্লাস শুরু হলেই ক্লাসের সকলে চঞ্চল হয়ে ওঠে, মনোযোগ আর থাকে না, বিষয়টি যেন মাথায় ঢুকছেই না। এরপর শুরু হবে হাই তোলা, তারপরই সম্পূর্ণ অমনোযোগ। কেউ কেউ ক্লাসের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। সাধারণতঃ স্কুলে অঙ্কের ক্লাসে আর বি. টি. ক্লাসে—History of Education-এর ক্লাসে এ ঘটনা একটু বেশী দেখা যায়। কিন্তু অত কম সময়ে তো ক্লান্তি আসার কথা নয়! এই অবসাদ মিথ্যা অবসাদ—যা দেখা দিয়েছে মূলতঃ বিতৃষ্ণার জন্য। ঘণ্টা পড়ার পর যেমনি অন্য একটি আকর্ষণীয় বিষয়ের ক্লাস শুরু হ'ল—অমনি সকলে চাঙ্গা হয়ে উঠল—মনোযোগ দিয়ে লেকচার শুনতে লাগল। অবসাদ এসে গেলে কাজে বিতৃষ্ণা আসে—তখন আর কাজটি করলেও তা দক্ষতার সঙ্গে করা যাবে না। আবার বিতৃষ্ণা এলেও অবসাদ আসে তখন কিন্তু দক্ষতা পুরোপুরি বজায় থাকে। আমরা চেষ্টা করলে দক্ষতার সঙ্গে কাজটি করতে পারি কিন্তু চেষ্টা করতে ইচ্ছা যায় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে অবসন্ন হয়ে পড়লেও আমরা বিতৃষ্ণাকে আসতে দিতে চাই না। পরীক্ষার আগের রাত্রে পড়াশুনা করা, কোন অসুস্থ প্রিয়জনের সেবা শুশ্রূষা করা ইত্যাদির সময় আমরা অবসন্ন হলেও কাজটিতে বিরক্ত হই না। কাজেই একথা নিশ্চয় আমরা বলতে পারি যে, অবসাদ ও বিরক্তি এক জিনিস নয়।

অনেক মনোবিজ্ঞানী তো বিরক্তিকে অবসাদের ঠিক বিপরীত বলে মনে করেন। এদের লক্ষণগুলিও এক নয়। অবসাদ আসার অনেক আগে এমন কি কোন একটি কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই বিতৃষ্ণা আসতে পারে। বিতৃষ্ণা অবসাদের চেয়ে অনেক দ্রুতবেগে বর্ধিত হয়। বিতৃষ্ণার প্রথম লক্ষণ হ'ল অমনোযোগী হওয়া। তখনই দেখা দেয় চঞ্চলতা। তারপর আলস্য ও সবশেষে বোধহীনতা। কিন্তু অবসন্ন হ'লে প্রথমেই দেখা দেয় বোধহীনতা ও আলস্য। অর্থাৎ—

বিতৃষ্ণা = চঞ্চলতা → বিরক্তি → আলস্য → বোধহীনতা।

অবসাদ = বোধহীনতা + আলস্য।

একঘেয়েমী ও বৈচিত্র্যহীনতাকে বিতৃষ্ণার কারণ বলা যেতে পারে। জীবনের সহজ ও স্বাভাবিক গতি হ'ল—এগিয়ে চলা। যেখানে এই এগিয়ে

চলাটি বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হয় সেখানে প্রাণশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশটিও ব্যাহত হয়। সেইখানেই দেখা দেবে বিতৃষ্ণা। দেহের ও মনের স্বাভাবিক গতিকে বাধা দেবার চেষ্টা করলে বিতৃষ্ণা আসে বলে আমরা বলতে পারি বিতৃষ্ণা হ'ল জড়তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ।

ক্লান্তি বা অবসাদের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Fatigue): সাধারণতঃ ক্লান্তি বা অবসাদকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—(১) পেশীর অবসাদ (Muscular), (২) ইন্দ্রিয়ের অবসাদ (Sensory) এবং (৩) মানসিক অবসাদ (Mental)। পেশী ও ইন্দ্রিয়ের অবসাদকে একত্রে বলা হয় দৈহিক অবসাদ (Physiological fatigue)। **সুতরাং অবসাদকে তিন ভাগে ভাগ না করে আমরা দু'ভাগেও ভাগ করতে পারি—দৈহিক ও মানসিক।**

কোন একটি কাজ (বিশেষতঃ যান্ত্রিক কাজ) অনেকক্ষণ ধরে একটানা করতে থাকলে ধীরে ধীরে পেশীগুলির কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং সেগুলি অবসন্ন হয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ ধরে হাঁটা, দৌড় ঝাঁপ করা, মাটি কোপান প্রভৃতি কাজের ফলে যে দৈহিক অবসাদ দেখা দেয়—তা প্রধানতঃ পেশীমূলক অবসাদ। আবার কোন একটা মানসিক কাজ—যেমন অঙ্ক করা—দর্শন শাস্ত্র পাঠ করা—অনেকক্ষণ ধরে করতে থাকলে স্নায়ুকেন্দ্রটি অবসন্ন হয়ে পড়ে; ফলে মানসিক অবসাদ দেখা দেয়।

তবে দৈহিক অবসাদ ও মানসিক অবসাদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ভাবে কোন সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। একটির সঙ্গে আর একটি ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত। দৈহিক অবসাদ থেকে মানসিক অবসাদের উদ্ভব হয়। আবার মানসিক অবসাদ ও দৈহিক অবসাদ সৃষ্টি করতে পারে। দেহতত্ত্বের দিক থেকে বলা হয় মানসিক অবসাদ হ'ল কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর ব্যাপার আর দৈহিক অবসাদ হ'ল পেশীমূলক ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অবসাদ এরকম পৃথক পৃথক ভাবে ঘটে না। এমন কোন দৈহিক অবসাদ দেখা যায় না যার সঙ্গে মানসিক অবসাদ যুক্ত নেই। আবার কেবল মানসিক অবসাদই রয়েছে—দৈহিক অবসাদ নেই, এ ঘটনাও বিরল। প্রকৃতপক্ষে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দু'রকম অবসাদ একসঙ্গে ঘটে থাকে। পেশীমূলক অবসাদ মনকেও অবসন্ন করে দেয়। আবার মানসিক অবসাদ পেশীগুলিকে দুর্বল করে ফেলে তবে মানসিক পরিশ্রম

জনিত দৈহিক অবসাদ আসতে যতটা সময় লাগে, দৈহিক পরিশ্রমজনিত মানসিক অবসাদ আসতে তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগে।

অবসাদ আবার সাধারণ (general) বা আংশিক (partial) হ'তে পারে। যখন সমগ্র দেহযন্ত্রটি ক্লান্ত ও অবসন্ন মনে হয় তখন তা হ'ল সাধারণ অবসাদ। কিন্তু যখন বিশেষ কোন পেশী বা ইন্দ্রিয় অবসন্ন হ'য়ে পড়ে তখন তাকে বলে আংশিক অবসাদ। অনেকক্ষণ সেলাই-এর কাজ করলে চোখ দু'টি ক্লান্ত হয়ে পড়ে বা অনেকক্ষণ ধরে লিখতে থাকলে ডান হাতটি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এগুলি হ'ল আংশিক অবসাদের উদাহরণ।

উভয়বিধ অবসাদেরই কিছু কিছু লক্ষণ (symptom) আছে। যেমন,—

দৈহিক অবসাদের লক্ষণ হল : মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও পাণ্ডুর হয়ে যাওয়া, ঔজ্জ্বল্যহীনতা, বিজৃম্ভন ও নিদ্রাকর্ষণ, শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা, দুর্বল মনে হওয়া, ইন্দ্রিয়গুলির শিথিলতা বোধ, দাঁড়ানোর বা বসার ভঙ্গীর পরিবর্তন, কাজে দক্ষতা হ্রাস ইত্যাদি।

মানসিক ক্লান্তির লক্ষণ হ'ল : পাঠ্যবিষয়ে বা করণীয় কর্মে আগ্রহের অভাব, পরিবর্তনের প্রচণ্ড ইচ্ছা, মনোযোগের কেন্দ্রীভবনে অক্ষমতা, বোধহীনতা, বিরক্তি-বোধ, মাথা ভারী মনে হওয়া, প্রচুর ভুল করা ইত্যাদি।

অবসাদের কারণ (Causes of Fatigue) : স্যাণ্ডিফোর্ড (Sandiford) অবসাদের তিনটি মূল কারণের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হ'ল—(১) যে সমস্ত উপাদান দেহে শক্তি উৎপাদন করে সেগুলির ক্ষয়, (২) দেহের ভিতর পেশী বা স্নায়ুগুলিতে অপচয়-জনিত বিষ সঞ্চিত হওয়া এবং (৩) অক্সিজেনের অভাব ঘটা। মাইকেল ওয়েস্ট আবার অবসাদের একটি রাসায়নিক কারণেরও নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,—"অবসাদে বল প্রদানকারী জটিল পদার্থগুলির অতিরিক্ত ব্যয় ঘটে এবং দেহে কতকগুলি সহজ অপরিচিত পদার্থ সঞ্চিত হয়ে যায় যেগুলি বিষের ন্যায় ক্রিয়া করে।" উড্‌ওয়ার্থ ও মারকুইসের মতে শরীর-অভ্যন্তরে ল্যাক্‌টিক এ্যাসিড সঞ্চিত হওয়ার ফলেই অবসাদ আসে।

যাই হোক আমরা এখন অবসাদের প্রধান তিনটি কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করব। সেগুলি হ'ল—**শারীরিক** (Physical), **মানসিক** (Mental) ও **পরিবেশগত** (Environmental) কারণ।

(ক) **শারীরিক কারণ (Physical Cause) :** আমাদের প্রত্যেকের দেহেরই কাজ করার ক্ষমতার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। কাজ করতে

করতে এই সীমায় পৌঁছালে বা অতিক্রম করার চেষ্টা করলে ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা দেয়। অবশ্য কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিলে বা ঘুমুলে শরীর আবার পূর্বক্ষমতা ফিরে পায়। শরীরের অবস্থার উপরও শারীরিক অবসাদ যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভরশীল। দুর্বল ও অসুস্থ শরীরে সবল ও সুস্থ শরীরের চেয়ে তাড়াতাড়ি ক্লান্তি নেমে আসে। শরীরের ভিতরে শক্তি-উৎপাদক উৎপাদানগুলির ক্ষয়ের জন্যই ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা দেয়। তাছাড়া অপচয়-জনিত বিষ সঞ্চিত হওয়ার জন্য ও অম্লজানের অভাব ঘটার জন্যও ক্লান্তি দেখা দেয়।

(খ) **মানসিক কারণ (Mental Cause) :** শারীরিক কারণের মত অবসাদের কয়েকটি মানসিক কারণও আছে। কাজে আগ্রহ ও প্রেষণার অভাব, মানসিক প্রস্তুতি না থাকা, নিরাপত্তাবোধের অভাব ইত্যাদি কারণের জন্য অবসাদ সহজেই দেখা দেয়। কাজটি একঘেয়ে বা বিরক্তিকর হ'লে অবসাদ আসে। তাছাড়া একটানা কাজ করার শক্তি। অভ্যাস ও দৃঢ় সংকল্প না থাকলেও অবসাদ আসে। কাজটি যদি ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করতে না পারে বা তার উপর যদি কোন কাজ জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহ'লেও অবসাদ আসে। মানসিক কারণের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হ'ল ব্যক্তির মানসিক দৃঢ়তা ও দৃঢ় সংকল্প। প্রত্যেক কাজেই ব্যক্তিকে তার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হয়। এই ইচ্ছাশক্তিই তার মনোযোগ অক্ষুণ্ণ রেখে উদ্যম বজায় রাখে। ইচ্ছাশক্তির অভাব ঘটলেই ক্লান্তি দেখা দেয়। মানসিক দৃঢ়তা থাকলে অনেক শক্ত ও বিরক্তিকর কাজও সানন্দে অনেকক্ষণ ধরে করা যায় এবং ক্লান্তির আগমনকে বিলম্বিত করা যায়।

(গ) **পরিবেশগত কারণ (Environmental Cause) :** অবসাদ জাগানোর পক্ষে পরিবেশেরও একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। একই পরিবেশ বিভিন্ন হয়ে গেলে কাজটির সম্পাদনের মানও বিভিন্ন হয়ে যায়। পরিবেশটি প্রীতিকর ও মনোরম হ'লে তা একটানা কাজ করার পক্ষে উপযোগী সেখানে সহজে অবসাদ আসে না। কিন্তু পরিবেশটি যদি অশান্ত, অস্বাস্থ্যকর বা অপ্রীতিকর হয়, তাহ'লে কাজটিতে ক্লান্তি আসে সহজেই। প্রচুর আলো-হাওয়াযুক্ত সুসজ্জিত শ্রেণীকক্ষে ছাত্ররা যথেষ্ট মনোযোগী থাকে। কিন্তু যে শ্রেণীকক্ষে আলো-হাওয়া নেই, যার চারিদিকে হট্টগোল, চেঁচামেচি লেগে আছে, যেখানে বসার সু-বন্দোবস্ত নেই,—সেই রকম শ্রেণীকক্ষে সহজেই ছাত্ররা অবসন্ন হয়ে হয়ে পড়ে। অত্যন্ত গরমে বা অত্যন্ত জলীয়

আবহাওয়াতে ক্লান্তি সহজেই আসে। পাফেন বার্জার (Poffen Berger)-এর পরীক্ষণ থেকে জানা গেছে যে বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা নেই এমন দুটি কারখানাতে শীতকালের তুলনায় গরমের সময় উৎপাদন শতকরা ১১ থেকে ১৮ ভাগ কম। অথচ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা আছে এমন কারখানাতে শীতকালের তুলনায় গরমের উৎপাদন শতকরা মাত্র ৮ ভাগ কম। আবার এটাও দেখা গেছে যে উপযুক্ত প্রেষণা থাকলে গরম, শীত, বদ্ধ-বাতাস, গোলমাল ইত্যাদিতেও ক্লান্তি সহজে আসে না।

অবসাদ পরিমাপের বিভিন্ন উপায় (Different ways of measuring Fatigue) : বিভিন্ন জাতীয় অবসাদ নির্ণয় ও পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় ও বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। দৈহিক অবসাদ পরিমাপ করার জন্য নাড়ীর স্পন্দনের গতি, রক্ত সঞ্চালনের হার, দেহের উত্তাপজনিত তারতম্য, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের হার, অঙ্গ সঞ্চালনমূলক দক্ষতার তারতম্য, পেশী সংক্রান্ত কর্মকুশলতার পার্থক্য, উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান (Reaction Time) ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়। তেমনি মানসিক অবসাদ পরিমাপের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা করার ক্ষমতা, লেখা বা বলার ভুলের হার, নির্ভুল ভাবে গণনা করা, মনোযোগ ও আগ্রহের বৈশিষ্ট্য, পাদপূরণ, স্মরণশক্তি কোন একটি বিশেষ অক্ষর কেটে দেওয়া, কোন একটি বিশেষ বিষয়ে অনেকক্ষণ ধরে দৃষ্টি দেওয়া ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া হয়। এখন কয়েটি পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা হ'ল—।

পাদপূরণ বা অপূর্ণ অংশ পূর্ণ করার পরীক্ষা (Completion Test) : যার অবসাদ পরিমাপ করতে হবে, তাকে একটি চিত্তাকর্ষক গল্প পড়তে দেওয়া হয়। কিন্তু গল্পটির মধ্যে কতকগুলি কথা বা কথার অংশ বাদ দেওয়া হয়। বলা হয় গল্পটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ অপূর্ণ অংশগুলি পূর্ণ করতে হবে। কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে পড়ার গতি যেমন কমে এসেছে অপূর্ণ অংশ পূর্ণ করার ক্ষমতাও তেমনি কমে গেছে। এক্ষেত্রে যে মানসিক অবসাদের উদ্ভব হয়েছে তার জন্য ফাঁকগুলি আর নজরে পড়ছে না।

অক্ষর কাটা বা মুছে দেওয়ার পরীক্ষা (Cancellation Test) : এই পরীক্ষাতে কোন একটি লেখার মধ্যে একটি বিশেষ অক্ষর দাগ দিয়ে কেটে

দিতে বলা হয়। একটানা কেটে যেতে যেতে কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় তার পড়ার গতি কমে এসেছে, কেটে দিতে দেরী হচ্ছে এবং কাটতে বেশ ভুল হচ্ছে। অর্থাৎ মানসিক অবসাদ এসে গেছে।

শেখা বা মুখস্থ করার পরীক্ষা (Memorisation Test) : কোন একটি নির্দিষ্ট অংশ মুখস্থ করতে কত বার পড়তে হচ্ছে, কতটা সময় লাগছে তা থেকেও অবসাদ পরিমাপ করা সম্ভব।

হিসাব দিয়ে পরীক্ষা (Calculation Test) : এই পরীক্ষাতে পরীক্ষার্থীকে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি জাতীয় সহজ কতকগুলি হিসেব করতে দেওয়া হয়। বেশ কিছুক্ষণ অনুশীলন করার পর তার অঙ্ক কষার গতি, ভুলের পরিমাণ, সময়ের মাত্রা ইত্যাদি থেকে তার মানসিক অবসাদ পরিমাপ করা যায়।

থর্নডাইক প্রথম মানসাঙ্ক (Mental Arithmetic) ব্যবহার করে মানসিক অবসাদ পরিমাপ করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তারপর কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কলেজের জাপানী ছাত্রী মিস্ আরাই (Miss Arai) মানসিক অবসাদ পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন রকম পরীক্ষণ কার্য পরিচালনা করেন। বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, অবসাদের ফলে কাজের গড় সময় আগের চেয়ে বেড়ে যায় এবং গড় ভুলের পরিমাণও আগের চেয়ে বেশী হয়। এই দুটি ঘটনাকে তিনি মানসিক অবসাদ পরিমাপের মাপকাঠি হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। স্টার্চ ও এ্যাশের (Starch and Ash) পরীক্ষার ফলও সমজাতীয় ঘটনার উল্লেখ করে। তাঁরা দেখান যে, অনেকক্ষণ ধরে কাজ করার ফলে যে মানসিক অবসাদের উদ্ভব হয় তাতে কাজের উৎকর্ষ কিছুটা কমে যায়। কিন্তু মানসিক পরিশ্রম-জনিত সম্পূর্ণ মানসিক অবসাদ অর্থাৎ যেখানে মনের কাজ করার ক্ষমতা একেবারে লোপ পেয়ে গেছে—এমন ঘটনা বাস্তবে দেখা যায় না।

দৈহিক অবসাদ পরিমাপ করার বর্তমানে বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এর মধ্যে কতকগুলি আধুনিক যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতির বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করা হ'ল—

এক। **এস্থেসিওমিটার (Aesthesiometer) :** এই যন্ত্রের সাহায্যে ত্বকের স্পর্শানুভূতি পরিমাপ করা হয়ে থাকে। অবসাদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে

অনুভূতি কমতে থাকে। এস্থিসিওমিটার যন্ত্রটি একটি স্কেলের উপরে বসানো থাকে। যন্ত্রটি দেখতে অবিকল কাঁটা-কম্পাসের মত।

[দুই] **ডাইনামোমিটার** (**Dynamometer**) : এই যন্ত্রের সাহায্যে হাতের মুঠির (grip) শক্তি নিরূপণ করা যায়। কিছুক্ষণ পরিশ্রম করার পর ব্যক্তি কতটুকু অবসাদগ্রস্ত হয়, তা এই যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। অবসন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের মুঠির জোরও কমে আসে। আজকাল মেলা বা প্রদর্শনীতে প্রায়ই এই যন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

[তিন] **আরগোগ্রাফ্** (**Ergograph**) : এই যন্ত্রটি ১৮৯০ সালে মসো (Mosso) আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রে পরীক্ষার্থীর হাতটি বেশ শক্ত করে একটি টেবিলের উপর রেখে এমন ভাবে বেঁধে দেওয়া হয়, যাতে সে মাঝের আঙুলটি ছাড়া অন্য আঙুল নাড়তে না পারে। ঐ আঙুলের সঙ্গে একটি শক্ত সুতো দিয়ে একটা ওজন কপিকলের সাহায্যে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। এরপর পরীক্ষার্থীকে আঙুলটি সংকুচিত ও প্রসারিত করতে বলা হয়। আঙুলের সঙ্গে একটি লেখার স্টাইলাস সংযুক্ত থাকে—যেটি আবার একটি কিমোগ্রাফের ধোঁয়ান কাগজের সঙ্গে লাগান থাকে। পরীক্ষার্থীর প্রতিটি টানের সঙ্গে ঐ কাগজে একটি দাগ টানা হয়ে যায়। প্রথম দিকে দাগগুলি বেশ লম্বা ও ঘন-সন্নিবিষ্ট হয়। কিন্তু বার বার সংকোচন ও প্রসারণের ফলে অবসাদ দেখা দিলে দাগগুলি ক্রমশঃ ছোট ফাঁক-ফাঁক হয়। এই জাতীয় চিত্রকে বলা হয় **আরগোগ্রাম** (**Ergogram**)। এই যন্ত্র দিয়ে আঙুলের সঙ্গে সংযুক্ত পেশীর অবসাদ পরিমাপ করা হয়।

[চার] **টোকা দেওয়ার পদ্ধতি** (**Tapping Method**) : এই পদ্ধতিতে একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে আঙুল বা পেন্সিল দিয়ে টোকা দিতে বলা হয়। প্রথম দিকে যত দ্রুত টোকা দেওয়া যায়, অবসন্ন হ'য়ে গেলে তত দ্রুত টোকা দেওয়া যায় না।

কাজের বক্ররেখা (**Work curve**) : অবসাদ-জনিত কাজের দক্ষতার পরিবর্তনের চিত্ররেখাকে কাজের বক্ররেখা বলা হয়। শিখনের বক্ররেখার অনুরূপ এই বক্ররেখারও তিনটি পর্যায় আছে—প্রাথমিক ঊর্ধ্বগতি (Initial Spurt), উপত্যকা বা অধিত্যকা (Pláteau) এবং অধোগতি (Fall)। যখন কাজটি প্রথম শুরু হয়, তখন ব্যক্তির দক্ষতা ও উৎকর্ষের একটা প্রাথমিক

ঊর্ধ্বগতি দেখা যায়। এই সময় ব্যক্তি কাজে তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এবং তার দক্ষতা সর্বোচ্চ বিন্দুতে গিয়ে ওঠে। এটিকে সর্বাধিক কাজের অবস্থা বলা হয় (Stage of warming up)। এরপর তার দক্ষতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং শীঘ্রই সে এমন একটা বিন্দুতে এসে পৌছায়—যখন তার দক্ষতা প্রায় এক ভাবেই থাকে। এই সময়টিকে উপত্যকা বা অধিত্যকা কাল বলা হয়। এই সময় কাজের দক্ষতা বিশেষ বাড়েও না কমেও না—তবে মাঝে মাঝে চেষ্টাজনিত হঠাৎ উদ্যম বা কাজের উন্নতি দেখা যায় যা অবশ্য বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। অধিত্যকা কালের পর দেখা দেয় অধোগতি। এবার ধীরে ধীরে দক্ষতার মান কমতেই থাকে। অনেক সময় প্রদীপ নিভে যাবার আগে দপ করে একবার জ্বলে ওঠে, তেমনি কাজটির দক্ষতা একেবারে কমে যাবার আগে হঠাৎ একবার দক্ষতার মান বা উদ্যম বেড়ে যেতে পারে। এটিকে প্রান্তীয় ঊর্ধ্বগতি (End Spurt) বলে। এটি অবশ্য সর্বজনীন ঘটনা নয়। যখন কর্মীরা বুঝতে পারে কাজটি সমাপ্তপ্রায়, ফললাভ আসন্ন, আর কাজটি করতে হবে না—তখন এই জাতীয় ঘটনা ঘটতে পারে।

কাজের বক্ররেখার এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রথম আবিষ্কার করেন ক্রেপেলিনের ছাত্র এ্যাক্সেল ওইর্ন (Axel Oehrn)—১৮৮৯ সালে। তিনি কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্রের উপর বিভিন্ন জাতীয় পরীক্ষণ চালিয়ে দক্ষতার পরিবর্তন পরিমাপ করেন। তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল থেকেই তিনি ঐ বৈশিষ্ট্য-গুলির সন্ধান পান। ক্লান্তি, প্রেষণা, কাজটির পরিবেশ, কর্মীদের ইচ্ছাশক্তি, মনোভাব ইত্যাদির দ্বারাও কাজের বক্ররেখাটি যথেষ্ট প্রভাবিত হ'তে পারে। অনেক সময় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে মানসিক আনন্দের জন্যও কাজের উন্নতি দেখা দিতে পারে।

বিদ্যালয়ে অবসাদ (Fatigue in Schools): পাঠগ্রহণ কালে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী কতটা অবসন্ন হ'তে পারে এবং তার জন্য কাজের দক্ষতা কি ভাবে ব্যাহত হ'তে পারে সে সম্পর্কেও বিভিন্ন রকম পরীক্ষণ কার্য চালান হয়েছে। Winch, Gates, Heck প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীর পরীক্ষণ কার্য থেকে জানা যায় যে, ক্লান্তি বা অবসাদের জন্য শিশুদের কাজের দক্ষতায় খুব একটা তারতম্য হয় না। তবে তারা যতটা ক্লান্ত হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী বিরক্ত হয়। বিদ্যালয়ে শিশুদের প্রকৃত

কোন মানসিক অবসাদ থাকে না। কাজেই বলা যেতে পারে মানসিক অবসাদের জন্য বিদ্যালয়ে শিশুদের মানসিক শক্তি ও কর্মক্ষমতা কমে যায়—এ ধারণা ভুল। স্কুলের পড়া যে ছেলেমেয়েদের অবসন্ন করে, তারা যে বিরক্ত হয় তার কারণ হ'ল উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, বদ্ধগৃহ, আলো-বাতাসের অপ্রাচুর্য, খেলাধুলা ও আনন্দের আয়োজনের অভাব, উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত শিখন প্রণালীর ব্যবস্থা না করা, শিক্ষকের বা কর্তৃপক্ষের কঠোর শাসন-ব্যবস্থা, বিশ্রামের অভাব, সাফল্য সম্বন্ধে উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা, উৎকণ্ঠা প্রভৃতি। পক্ষান্তরে শিক্ষার্থীর দৃঢ়সংকল্প, ইচ্ছা, মনোভাব, বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষণ-পদ্ধতি, পুষ্টিকর খাদ্য, উপযুক্ত বিশ্রাম ও নিদ্রা, খেলাধুলার ব্যবস্থা, শিক্ষকের আন্তরিকতা ইত্যাদি শিক্ষার্থীর এই বিরক্তি দূর করতে সক্ষম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিদ্যালয়ের কাজে শিক্ষার্থীদের দক্ষতার মান যদি কমেই যায় তা শিক্ষার্থীর কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার জন্যই নয়, কাজে আগ্রহের অভাবের জন্যই একটা ক্লান্তি বা অবসাদ শিক্ষার্থীর মধ্যে ঘটে থাকে।

শিশুরা বিদ্যালয়ে কাজের শুরুতে যে রকম দক্ষতা দেখায় কাজের শেষদিকেও ঠিক সেই রকম দক্ষতাই তারা দেখাতে পারে। কিন্তু তবুও দেখা যায় বিদ্যালয়ের কাজের শেষদিকে শিশুরা বেশ চঞ্চল হয়ে পড়ে, পাঠে মনোযোগ থাকে না। এর কারণ শিশুদের মনোযোগ দীর্ঘস্থায়ী নয়। তাছাড়া তারা কখন কি কাজ করবে—তার একটা মোটামুটি ছক মনে মনে তৈরী করেই রাখে এবং খেলাধুলা, গল্পগুজব করা, বেড়ান, ঘুড়ি ওড়ান ইত্যাদি কাজের জন্য তারা মনে মনে প্রস্তুত হ'তে থাকে। কাজেই তখন যদি 'আকাশে হেরিয়া ঘুড়ি মন তার যায় উড়ি' তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। এক্ষেত্রে তাদের মনোযোগ পাঠ্যবিষয় থেকে অন্য কোন অধিকতর আকর্ষণীয় বিষয়ে সরে যায়। কিন্তু যদি শেষের দিকে আকর্ষণীয় কোন বিষয়বস্তু সময় তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে শিশুদের আর আগ্রহ ও মনোযোগের অভাব ঘটবে না।

আমাদের একটা অতি-প্রচলিত ধারণা আছে যে, স্কুলপাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে কিছু কিছু বিষয় অন্য বিষয়ের তুলনায় দ্রুত অবসাদের সৃষ্টি করতে

পারে। মনোবিজ্ঞানী ভাগ্‌নার (Wagner) এ বিষয়ের উপর পরীক্ষা করে একটা তালিকা প্রস্তুত করেছেন। সেটি হ'ল এই রকম —

বিষয়	অবসাদের সূচক
অঙ্ক	১০০
ল্যাটিন, গ্রীক্ (ভাষা)	৯১
ইতিহাস ও ভূগোল	৮৫
প্রাণী ও প্রকৃতিবিজ্ঞান	৮০
অঙ্কন ও ধর্মালোচনা	৭৭

[অবসাদের পূর্ণমান—১০০]

ভাগ্‌নারের বক্তব্য ছিল—যে সমস্ত বিষয়ের অবসাদের সূচক ১০০ বা তার কাছাকাছি সেগুলি দিনের প্রথম দিকেই রাখা উচিত। শেষের দিকে যখন শিশুদের আগ্রহ ক্রমশঃ কমতে থাকে, তখন এমন বিষয় শেখানো উচিত যার অবসাদের সূচক অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু এ সম্পর্কে আরো বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে, ভাগ্‌নারের তালিকাটি একেবারে সঠিক নয়। বিষয়টির অবসাদের সূচক যত বেশীই হোক্ না কেন উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে পড়লে এবং উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করলে অবসাদ অনেক বিলম্বিত হয়ে আসবে। যে কোন বিষয় দিনের যে কোন সময়েই শিশুরা সমান কুশলতার সঙ্গে সম্পাদন করতে সক্ষম। বিষয়টির জন্য যত না অবসাদ আসে তার চেয়ে বেশী আসে শিক্ষণীয় পরিবেশের নানাবিধ দোষত্রুটির জন্য। শিশু অবসন্ন হয় না—হয় বিরক্ত। তবে এই বিরক্তি বা বিতৃষ্ণা শুধু শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের পক্ষে একটা বড় বাধাস্বরূপ। কাজের পরিবর্তন, বিষয়বস্তু, শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষক পরিবর্তনের মাধ্যমে শিশুদের আগ্রহ ও কর্মকুশলতা বজায় রাখা উচিত। শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থীর ক্লান্তি একটা বড় সমস্যা নয়। তার সামনে প্রধান সমস্যা হওয়া উচিত—কি ভাবে সারাদিন শিক্ষার্থীকে সব বিষয়ে সমভাবে আগ্রহী করে রাখা যেতে পারে।

অবসাদের কুফল (Dangers of Fatigue) : অবসাদকে বলা যেতে পারে ক্ষয়ের ইঙ্গিত এবং নূতন ভাবে শক্তি সংগ্রহের জন্য দেহ মনের আবেদন। কাজ করলেই দেহের ক্ষয় হবে এটাই স্বাভাবিক। আবার সে ক্ষয় পূরণ হয়ে যাবে এটাও স্বাভাবিক। কিন্তু ক্ষয় যদি বেশী বা

এত দ্রুত হয় যে, পূরণ করা সম্ভব নয় তখনই বিপদের আশংকা থাকে। অবসাদের জন্য শিক্ষাকর্মও ব্যাহত হয়। এই অবসাদ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ের ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর।

শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে কুফল : উপযুক্ত শিখনের জন্য চাই সুস্থ দেহ আর সতেজ প্রফুল্ল মন। যে কোন কাজ করতে গেলেই এ দুটির প্রয়োজন। দেহের সুস্থতার সঙ্গে মনের সুস্থতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দেহ-মন সুস্থ থাকলে শিক্ষার্থীর আভ্যন্তরিণ সমন্বয়নের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলে এবং তার পক্ষে সহজে শিক্ষাগ্রহণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু দেহ যদি ক্লান্ত হয় আর মন যদি হয় অবসন্ন, তবে কাজের উৎকর্ষ কমে যাবে, ভুল-ভ্রান্তিও হবে বেশী। অবসাদের অব্যবহিত ফল হ'ল—মনোযোগের হ্রাস। তাছাড়া শিক্ষার্থীর স্মরণ করার, চিন্তা বা বিচার করার বা পূর্ববর্তী জ্ঞানের সঙ্গে পরবর্তী জ্ঞানের সংযোগ স্থাপন করা অত্যন্ত শক্ত হয়ে পড়ে। অবসন্ন দেহ মনে কাজ করাটা কার্যশক্তির অপব্যয়, একটা বড় রকমের লোকসান ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া অবসাদ দেহের দিক দিয়েও চরম বিপদ ডেকে আনতে পারে। অবসন্ন হওয়ার পরও কাজ চালিয়ে গেলে শিরা, পেশী, কোষ ইত্যাদি স্থায়ী ভাবে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। তবে শরীরের মধ্যে এমন ব্যবস্থা আছে যে চরম বিপদ আসার আগেই দেহযন্ত্রের কার্যকরী কোন কোন অংশ কাজ বন্ধ করে দেয়। অর্থাৎ শিরা বা পেশী পুরোপুরি ভাবে অবসন্ন হওয়ার আগে অবসাদবোধ প্রবল হ'য়ে দেহকে কাজ করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত করে থাকে। এই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা প্রকৃতির নিজস্ব।

শিক্ষকের ক্ষেত্রে কুফল : শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের অবসাদ শিক্ষার্থীর অবসাদের চেয়েও মারাত্মক ভাবে ক্ষতিকর। শিক্ষকের উৎসাহ ও উদ্দীপনা শ্রেণীকক্ষে প্রাণ সঞ্চার করে। কিন্তু শিক্ষক নিজেই যদি অবসন্ন হয়ে কর্তব্য পালনে প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত হয়ে যান, তবে তা শিক্ষামূলক পরিস্থিতিতে একটা বড় বাধারই সৃষ্টি করবে। শ্রেণীকক্ষে বৈচিত্র্য এনে আগ্রহের সঞ্চার করে শিক্ষার্থীদের অবসাদ বিলম্বিত করতে পারেন—শিক্ষক। কিন্তু সেই শিক্ষক নিজেই যদি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন—তাহ'লে তিনি আর শিক্ষার্থীদের অবসাদ দূর করবেন কি করে? তাঁর নিজের মেজাজ হয়ে যাবে রুক্ষ ও খিটখিটে। সহনশীলতার মাত্রা অত্যন্ত কমে

যাবে। অথবা ছাত্রদের পীড়ন করবেন বা শাস্তি দেবেন তাদের মনোযোগের শৈথিল্যের জন্য। কিন্তু এই মনোযোগের শৈথিল্যের জন্য যে তিনি নিজেই দায়ী তা তিনি বুঝতে চাইবেন না, ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্কটি নষ্ট হয়ে যাবে। পাঠদানে শিক্ষকের কোন আগ্রহ দেখা যাবে না পরন্তু নতুন জ্ঞান আহরণের কোন উৎসাহও তার মধ্যে দেখা যাবে না। শিক্ষক হলেন শিক্ষার্থীদের কাছে আদর্শস্বরূপ। কাজেই নিজে উদ্যমহীন ও নিরুৎসাহ হ'য়ে তিনি ছাত্রদের কি করে উৎসাহ যোগাবেন ?

অবশ্য একই জিনিস বার বার বৈচিত্র্যহীন ভাবে পড়াতে থাকলে শিক্ষকের মনে বিরক্তি আসাটাই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়েরই একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের অবসন্ন হওয়ার অন্যতম কারণ হ'ল—সারা সকাল টুইশনি করা। অবস্থার চাপে এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবে প্রায় প্রতি শিক্ষককেই শিক্ষকতা ছাড়া এই বৃত্তিটি গ্রহণ করতেই হয়। আবার বিকেল বা সন্ধ্যেতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। কাজেই "চমৎকারা অন্নচিন্তা"র ভাবনাতেই তো শিক্ষকের সময়, শক্তি, উদ্যম সবই ব্যয়িত হয়ে যাচ্ছে। বিদ্যালয়ে ক্লাশের সংখ্যাও কম নয়। তারপর আছে Provisional Routine-এর বাড়তি ক্লাসের বোঝা, নেই উপযুক্ত টিফিন বা পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা, না আছে কোন বিশ্রাম বা মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা। ব্যয় বাহুল্যের অজুহাতে এ সমস্তকে সযত্নে বাদ দেওয়া হয়েছে। অভাব ও নিরাপত্তাহীনতার জন্য শিক্ষক আত্মোন্নতির কোন সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন না। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে শিক্ষকদের অবসাদ দূর করার জন্য কত না পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। আমাদের দেশে মাঝে মাঝে দু'দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে রাষ্ট্রের কর্তব্য শেষ হয়ে যায়। ছাত্রদের অকৃতকার্যতা ও অসাফল্যের জন্য শিক্ষকদের দায়ী করে সমাজ তার নিজের কর্তব্য পালন করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে শিক্ষকের বেঁচে থাকার সংগ্রামের জন্যই তার শেষ রক্ত বিন্দুটি খরচ করতে হচ্ছে—তার সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হচ্ছে। জীবনধারণের জন্য মোটামুটি ভদ্র রকমের একটা ব্যবস্থা করে শিক্ষকদের শক্তির বেশ কিছুটা যাতে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবাহিত করা যায়—তার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্র ও সমাজের আশু কর্তব্য। বিদ্যালয়েও শিক্ষকের বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে, ক্লাশের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত ভাবে কম

করতে হবে, রুটিনের মধ্যে বৈচিত্র্য আনতে হবে এবং সম্ভব হ'লে পুষ্টিকর টিফিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

অবসাদের প্রয়োজনীয়তা (Value of Fatigue): অবসাদ যে সব সময় খারাপ—তা নয়। নদীর একূল ভাঙলে—ওকূল গড়ে। অবসাদেও তেমনি একদিকে ক্ষয়—অন্যদিকে নতুন করে গড়া হাত ধরাধরি করে চলে। শরীরের কোষ, তন্তু ইত্যাদি ভেঙ্গে না গেলে বা ক্ষয়প্রাপ্ত না হ'লে অধিকতর শক্তিশালী নতুন কোষ তন্তু ইত্যাদি কি করে তৈরী হবে? ভাঙ্গা ও গড়া —Katabolism আর Metabolism সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনেরই লক্ষণ। যতদিন ক্ষয় পূরণ হয়, অর্থাৎ ভাঙ্গার চেয়ে গড়ার কাজ বেশী হবে ততদিন দেহ মনের বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটতে থাকবে। কিন্তু বার্ধক্যে গড়ার চেয়ে ভাঙ্গার কাজটাই বেশী হয়। তাই দেখা দেয় স্থবিরত্ব, দুর্বলতা, শীর্ণতা ইত্যাদির মাধ্যমে জরার আমন্ত্রণ-লিপি।

মাইকেল ওয়েস্ট বলেন, প্রত্যেক সুস্থ ও সবল দেহের মধ্যে অবসাদের ক্ষুধা বর্তমান থাকে। অবসাদের ক্ষুধা হ'ল জীবনের বিস্তার ও বিকাশের আকাঙ্ক্ষা। এইটিই জীবনের মূল ধর্ম। "The hunger for fatigue is the hunger for growth and the hunger for growth is the impulse of life itself."

অবসাদ দূরীকরণের উপায় (Remedy for Fatigue): ক্লান্তি প্রত্যেকের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দেয়। দৈহিক পরিশ্রম করলে ক্লান্তি আসে ঠিকই, মানসিক পরিশ্রমেও ক্লান্তি আসে। শিখন এমন এক জাতীয় কাজ যেখানে দৈহিক ও মানসিক—উভয়বিধ পরিশ্রমই করতে হয়। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য বা সহনশীলতা বয়স্কদের মত নয়। কাজেই তাদের ক্ষেত্রে ক্লান্তি সহজেই আসে। কিন্তু শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হ'লে ক্লান্তি হয় দূর করতে হবে নয়তো এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে ক্লান্তি অত্যন্ত দেরীতে আসতে পারে। ক্লান্তি এসে গেলে তা দূর করা কিছুটা সময়সাপেক্ষ। কাজেই বিদ্যালয়ে আমাদের দ্বিতীয় পথটি বেছে নেওয়া উচিত অর্থাৎ ক্লান্তি বিলম্বিত করতে হবে। এখন দেখা যাক্ কি কি উপায় অবলম্বন করলে ক্লান্তি দূরীভূত হয় আর কি ভাবেই বা তাকে বিলম্বিত করা যেতে পারে।

[এক] উপযুক্ত বিশ্রাম : কাজ করলেই শরীরের ক্ষয়সাধন হয়। দেহের মধ্যে যে সমস্ত উপাদান শক্তি উৎপাদন করে সেগুলি দুর্বল বা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে শরীরের ক্ষয়পূরণ হয় ও উপাদানগুলিও সক্রিয় হয়। ফলে ক্লান্তি দূরীভূত হয়।

[দুই] নিদ্রাও ক্লান্তি দূরীকরণে সাহায্য করে। নিদ্রার সময় আমরা পরিপূর্ণ বিশ্রামসুখ উপভোগ করতে পারি। নিদ্রা যেমন শারীরিক ক্লান্তি দূর করে—তেমনি মানসিক ক্লান্তি দূর করে মনকে আবার সতেজ করে তোলে।

[তিন] পুষ্টিকর খাদ্য ও পানীয় : পুষ্টিকর এবং তাজা খাদ্য ও পানীয় ক্লান্তি দূর করতে পারে কারণ ওদের প্রভাবে শরীরের ক্ষয়পূরণ হয়ে যায়। দুধ, ফল, গ্লুকোজ বা অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য শরীরের ক্ষয়পূরণ করে ক্লান্তি দূর করে। চা, কফি, কোকো বা ঐ জাতীয় উত্তেজক পানীয়ও নিস্তেজ পেশী বা তন্তুগুলিকে সাময়িক ভাবে উত্তেজিত করে ক্লান্তি দূর করে—কিন্তু ক্ষয়পূরণ করতে পারে না। কাজেই এ জাতীয় উত্তেজক পানীয় খুব বেশী ব্যবহার না করাই ভাল।

[চার] শারীরিক অবস্থা : শরীর সুস্থ থাকলে ক্লান্তি খুব সহজে আসে না। কিন্তু দুর্বল শরীরে দুর্বলতার জন্যই ক্লান্তি অত্যন্ত দ্রুত আসে। কাজেই কোন কাজ তা সে শারীরিক হোক্ আর মানসিক হোক্ আরম্ভ করার আগে শারীরিক সুস্থতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে।

[পাঁচ] আগ্রহ : আগ্রহ ক্লান্তির আগমনকে বিলম্বিত করে। আবার এই আগ্রহই ক্লান্ত শরীরে কাজ করার উদ্যম জোগায়। শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি উপযুক্ত ভাবে আগ্রহ সঞ্চার করা যায়—তাহ'লে তার ক্লান্তি সহজে আসবে না ; ক্লান্তি এলেও সে তা গ্রাহ্য করবে না।

[ছয়] অভ্যাস ও অনুশীলন : কাজের গতির জন্য অনেক সময় ক্লান্তি আসে। খুব ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরে কোন কাজ করতে থাকলে ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে চটপট্ কাজটি শেষ করার অভ্যাস গড়ে নিতে হবে। আবার যেখানে একটানা কাজ করার দরকার সেখানে যাতে শিক্ষার্থীরা সেই ভাবেই কাজটি করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই অভ্যাস গড়ার জন্য উপযুক্ত আগ্রহ ও প্রেরণার প্রয়োজন।

[সাত] উপযুক্ত পরিবেশ : শিখনের পরিবেশটিও ক্লান্তির আবির্ভাবকে বিলম্বিত করতে পারে। উপযুক্ত আলো বাতাস, প্রচুর অক্সিজেন, নিরিবিলি শান্ত পরিবেশ, সুষম তাপ ইত্যাদি পরিবেশটিকে মনোরম করে তুলতে পারে। সেক্ষেত্রে ক্লান্তি অনেক দেরীতে আসে।

[আট] পঠনীয় বিষয়ের প্রকৃতি : পঠনীয় বিষয় নীরস ও কঠিন হ'লে যত দ্রুত ক্লান্তি আসে, সেটি সরস ও চিত্তাকর্ষক হ'লে ক্লান্তি তত সহজে আসে না। স্কুলপাঠ্য সব বিষয়ই তো সহজ বা সরস নয়। কিছু নীরস বিষয় থাকবেই। সেক্ষেত্রে শিক্ষককে সেগুলি চিত্তাকর্ষক করে তুলতে হবে।

[নয়] বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি : বিষয়বস্তুকে চিত্তাকর্ষক করে তোলার অন্যতম উপায় হ'ল বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করা। মূর্ত থেকে অমূর্ত, সরল থেকে জটিলে যেতে হবে। এমন ভাবে পাঠদান করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ পাঠদান কালে সমভাবে বর্তমান থাকে। ভূগোল পাঠদানের সময় গ্লোব, মানচিত্র, বিজ্ঞান শিক্ষাদান কালে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, চার্ট, মডেল ইত্যাদি ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীর আগ্রহটি সহজে নষ্ট হয় না।

[দশ] পরিবর্তন : পাঠদান কালে মাঝে মাঝে পরিবর্তন আবশ্যক। নীচু ক্লাসে হাতের কাজ, ছবি আঁকা, গানের ক্লাস, আর উঁচু ক্লাসে হাতে কলমে কাজ, সহপাঠক্রমিক কোন কাজ ইত্যাদি থাকলে পাঠদান ক্রিয়াটি আর নীরস বলে মনে হবে না।

[এগার] সাফল্যের তৃপ্তি : কাজের সাফল্য ক্লান্তি দূরীভূত করে। সাফল্য নিকটবর্তী, এ বোধ জাগ্রত হ'লে ক্লান্তির আগমন বিলম্বিত হয়। শিখন প্রক্রিয়াকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত যাতে শিক্ষার্থী সাফল্য সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা অর্জন করতে পারে। শিক্ষণীয় বিষয়টি দীর্ঘ হ'লে সেটিকে কয়েকটি ছোট অংশে ভাগ করে নেওয়া ভালো কারণ তাতে সাফল্য ত্বরান্বিত হয় ও ক্লান্তি বিলম্বিত হয়।

এবার বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অবসাদ দূরীকরণের কয়েকটি উপায়ের কথা বলে বক্তব্যটি শেষ করা হচ্ছে—

* আগ্রহ অবসাদকে বিলম্বিত করে বলে বিদ্যালয়ের পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।
* বিদ্যালয়ের পরিবেশটি শান্ত ও মনোরম হওয়া বাঞ্ছনীয়।

* বিদ্যালয়ের কক্ষগুলি আলো বাতাসযুক্ত ও সুপ্রশস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

* শিক্ষার্থীরা যেন সব সময় চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী না থাকে। মাঝে মাঝে তারা যেন মুক্ত আলো-বাতাসে ঘোরাফেরা করবার সুযোগ পায়।

* বিদ্যালয়ের পিরিয়ড-গুলি যেন ছাত্রদের উপযোগী হয়। নীচু ক্লাসে ১৫-২০ মিনিট, উচু ক্লাসে ৪০ মিনিট, এর বেশী যেন না হয়।

* বিদ্যালয়ের সময়-তালিকাতে যেন শিক্ষার্থীদের জন্যও বিশ্রাম ও খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে।

* সময় তালিকাতে যেন একটানা মানসিক কাজ না থাকে। মানসিক ও শারীরিক বা হাতে কলমে কাজ যেন পর্যায়ক্রমে সাজানো থাকে।

* বিষয়গুলি সময় তালিকাতে যেন তাদের অবসাদের সূচক অনুযায়ী সাজানো থাকে। কঠিন বিষয়গুলি দিনে প্রথম ভাগে রাখা উচিত। সহজ বিষয়গুলি দিনের শেষদিকে রাখাই বাঞ্ছনীয়।

* সময় তালিকাতে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

* বিদ্যালয়ে দ্বিপ্রাহরিক জলযোগের ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়।

* শিক্ষকের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। ছাত্রদেরও স্বাধীনতা ও সক্রিয়তার সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

* শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। প্রত্যেকের ক্ষমতা তো সমান নয়। অকৃতকার্যতার জন্য শিক্ষার্থীকে মাত্রাতিরিক্ত তিরস্কার করা কোন প্রকারেই উচিত নয়।

* কোন বিষয় শিক্ষা দেবার সময় ছাত্রদের প্রক্ষোভমূলক সংগঠন ও মনোবৈজ্ঞানিক মুহূর্তটি (Psychological moment) জানা শিক্ষকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

* শিক্ষার্থীদের উপর যেন খুব বেশী কাজের বোঝা চাপানো না হয়। তারা যেন নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে পারে।

* শিক্ষার্থীরা যেন প্রফুল্ল থাকে—সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

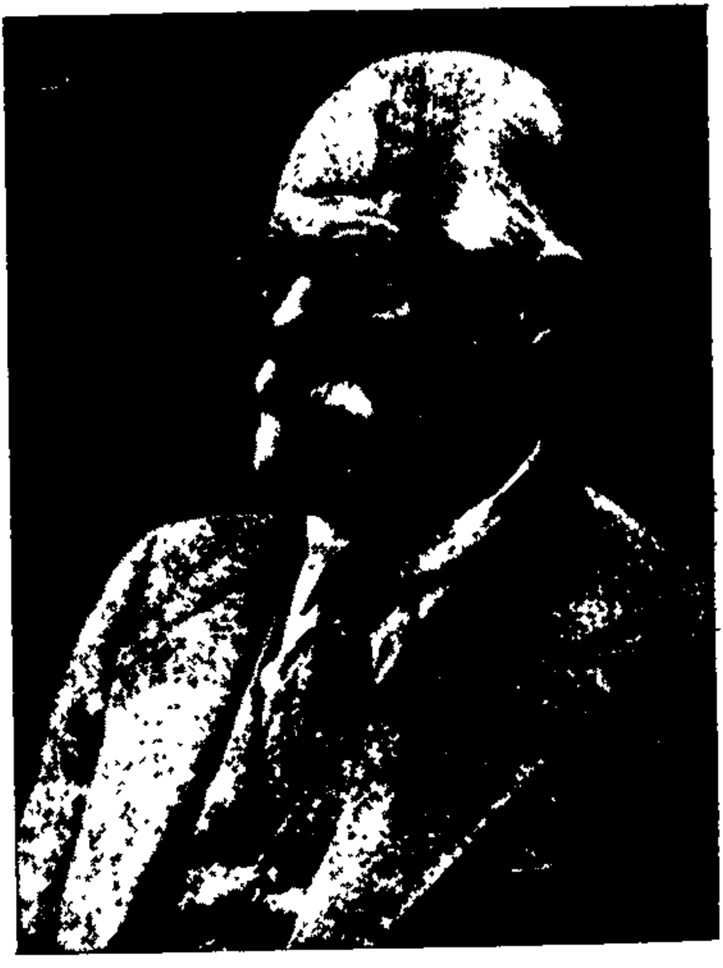

SIGMUND FREUD

1856-1939

॥ দশ ॥

॥ মনঃসমীক্ষণ ॥

(Psychoanalysis)

[Psychoanalysis is a lengthy process of discovering childhood sources of conflict by recall, free association, and dream analysis, with subsequent interpretation and re-education—Woodworth and Marquis.

A process of development (i. e. a period of infantile sexuality followed by a latency period. Such as Freud postulates) would be biologically unique ..... This impossible supposition is a consequence of the assertion that the early infantile activities of the presexual stages are sexual phenomena ..what (Freud) calls a disappearance of sexuality is nothing but the real beginning of sexuality ; everything preceding was but the fore-stage to which no real sexual character can be imputed.

—The Theory of Psycho-analysis—Jung.

A system of psychology, and a method of treatment of mental and nervous disorders developed by Sigmund Freud, characterized by a dynamic view of all aspects of the mental life, conscious and unconscious, with special emphasis upon the phenomena of the unconscious and by an elaborate technique of investigation and treatment, based on the employment of continuous free association—Dictionary of Psychology]

এখানে একজন লোক আছে যে, সব কাজ স্বাভাবিক ভাবে করে। কিন্তু কেউ "মুর্গীচোর" বললে ভীষণ ভাবে রেগে গিয়ে তাড়া করে মারতে যায়। আর একজন লোককে দেখেছি "রামপিয়ারী" বলে ডাকলে সেও গালাগালি করে, মারতে যায়। অন্য একজন লোককে দেখেছি যে রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় রাস্তার উপর পড়ে থাকা পাথর বা ইটের টুকরো তুলে তুলে ফেলে দেয়। বিমল বাবুর "হ্রদ" উপন্যাসে নায়ক 1 লিখতে গেলে সবসময় A লিখত। শরদিন্দু বাবুর "চিড়িয়াখানার" একজন বাবাজীর কথা আছে যিনি পানের পিকের লাল দাগ দেখলেই অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়তেন এবং নিজে সঙ্গে সঙ্গে জল এনে তা ধুয়ে মুছে সাফ করতেন।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এই রকম প্রচুর ভুলভ্রান্তি ঘটে থাকে। স্বপ্নের মাধ্যমেও আমরা অনেক অবাস্তব, অসম্ভব, অচিন্তনীয় বা অভূতপূর্ব ঘটনা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হই। এ সমস্ত ঘটনার কারণ কি? এর উত্তরের জন্য আমাদের মনোবিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখার উপর নির্ভর করতে

হবে যার নাম ফ্রয়েড দিয়েছেন—মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis)। আধুনিক যুগে মানসিক চিকিৎসার মূল পদ্ধতিই হ'ল মনঃসমীক্ষণ। তবে এই মনঃসমীক্ষণ কথাটি সাধারণতঃ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

[এক] মনঃসমীক্ষণ হ'ল মানসিক গঠন ও ক্রিয়া সম্পর্কীয় একটি বিশিষ্ট মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গী। ফ্রয়েডের মতে মন হ'ল গতিশীল (dymamic)। ফ্রয়েড-পন্থীরা মনে করেন, মন হ'ল একটি সক্রিয় ও জীবন্ত শক্তি। বাল্যকাল হতে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক স্তর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মনের বিকাশ ঘটতে থাকে। বাল্যকালের সুস্থ বা অসুস্থ বিকাশের উপরই ব্যক্তিত্বের গঠন নির্ভর করে।

[দুই] মনের প্রধান কাজ জ্ঞানমূলক নয়, ইচ্ছামূলক।

[তিন] মনঃসমীক্ষণ চেতন মন ছাড়াও অবচেতন মনটির স্বরূপ নির্ধারণ করে ও তার সঙ্গে সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করে।

[চার] মনঃসমীক্ষণ বিভিন্ন প্রকার মানসিক রোগের কারণ নির্ণয় করে, রোগগুলির সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করে ও তার চিকিৎসার উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ণয় করে।

মনঃসমীক্ষণকে আমরা দুটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করতে পারি। **এক:** মনঃসমীক্ষণ হ'ল ফ্রয়েড-প্রবর্তিত মানসিক রোগ চিকিৎসার বিশেষ একটি পদ্ধতি। আর **দুই:** মনঃসমীক্ষণ হ'ল ফ্রয়েডের মন-সম্পর্কীয় মতবাদ— বিশেষতঃ মনের গঠন, স্বরূপ ও কার্যাবলী-সম্পর্কীয় মতবাদ।

ফ্রয়েডের পূর্ববর্তী মনোবিজ্ঞানীরা মনের সচেতন দিকটির কথাই আলোচনা করে গেছেন। তাঁরা সচেতন মানসিক প্রক্রিয়াগুলিই বিশ্লেষণ করেছেন। ফ্রয়েড এবং তার অনুগামীরা প্রথম নির্জ্ঞান বা অচেতন মনের কথা সকলের সামনে প্রচার করেন। তাঁরা বলেন—কেবলমাত্র চেতন মনের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে মনের সম্পূর্ণ পরিচয়টি পাওয়া সম্ভব নয়। মনের অন্তরালে রয়েছে অচেতন মনের স্তর। প্রত্যেক মানসিক কার্যের একটা কারণ থাকবেই। কিন্তু এই কারণটিও সব সময় জ্ঞাত বা 'চেতন' (conscious) কারণ নয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'অজ্ঞাত' বা 'অচেতন' (unconscious)। আমরা যে সমস্ত বাসনা, কামনা, ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা জোর করে অবদমিত করি, সেগুলি এই অচেতন মনেই আশ্রয় নেয় এবং সেইখানেই বসবাস করতে থাকে। ব্যক্তির মনের সামগ্রিক পরিচয় পেতে হলে চেতন মনের সঙ্গে সঙ্গে অচেতন

মনটিও জানতে হবে। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ হ'ল এই অচেতন মন-সম্পর্কীয় বিজ্ঞান।

এখন মনঃসমীক্ষণ ও তার পদ্ধতির ইতিহাসের একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক। ১৮৮০-৮২' সালে ভিয়েনাবাসী চিকিৎসক জোসেফ্ ব্রুয়ার (Joesf Breuer) জনৈকা রোগিণীর হিষ্টিরিয়া রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন যে, তার রোগের লক্ষণ ও কারণ তার অসুস্থ পিতার সেবা শুশ্রূষা জনিত উত্তেজনার সঙ্গে জড়িত—যার সম্বন্ধে রোগীণী কিন্তু অবহিত নয়। ব্রুয়ার রোগিণীকে সম্মোহিত ক'রে তার মনের সব কথা বলার সুযোগ দিলেন এবং তার ফলে রোগিণী রোগমুক্ত হতে পারল। যে সময়ে ডাঃ ব্রুয়ার এ পরীক্ষা করেছিলেন, তখন মানসিক রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে শার্কোঁ এবং পিয়ের জ্যানেটের (J. M. Charcot and Pierre Janet) আবির্ভাব ঘটেনি। এই দু'জন চিকিৎসকও প্যারিস শহরে সম্মোহন পদ্ধতির সাহায্যে (hypnotism) হিষ্টিরিয়া রোগের চিকিৎসা করতে শুরু করেন। ফ্রয়েড প্রথমে শার্কোঁর নিকট সম্মোহন পদ্ধতি শিক্ষা করেন। পরে তিনি ডাঃ ব্রুয়ারের নিকট এ সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্য যান। ফ্রয়েড এবং ব্রুয়ার বিভিন্ন রোগীর উপর সম্মোহন পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাদের মনের কথা বলার সুযোগ দিয়ে রোগ নিরাময় করার চেষ্টা করতে থাকেন। ১৮৯৫ সালে তাঁরা উভয়ে "Studien Uber Hysterie" নামক একটি গ্রন্থে সম্মোহন পদ্ধতির অভূতপূর্ব উপকারিতার কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। এইভাবে সম্মোহিত অবস্থায় মনের কথা বলে যাওয়ার (talking out) পদ্ধতির তাঁরা নাম দিলেন বিরেচন (catharsis)। কিন্তু ব্রুয়ার খুব বেশীদিন এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে সাহস করলেন না—কারণ একবার এক রোগিণী এইভাবে সুস্থ হয়ে ডাঃ ব্রুয়ারের প্রেমে পড়ে গেলেন। ভয় পেয়ে ডাঃ ব্রুয়ার নিজেকে সরিয়ে নিলেন। ফ্রয়েড কিন্তু এতে ভয় পেলেন না। তিনি রোগিণীর ঐ প্রেমকে ডাক্তারের প্রতি কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি বলে মনে করলেন। ডাঃ ব্রুয়ারের সহযোগিতা বন্ধ হওয়াতে ফ্রয়েড একা এ সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা শুরু করেন। তবে তিনি সম্মোহন পদ্ধতি পরিত্যাগ করলেন কারণ অনেক ক্ষেত্রেই এ পদ্ধতি যথেষ্ট সুফল প্রদান করছিল না। যে সমস্ত ক্ষেত্রে রোগী সুস্থ হচ্ছিল—তাদের সে সুস্থতাও ছিল সাময়িক। আবার

অনেক হিষ্টিরিয়া রোগীকে সম্মোহিত করা সম্ভবই হ'ত না। শেষ পর্যন্ত ফ্রয়েড অবাধ অনুসঙ্গ পদ্ধতি (Free Association) অবলম্বন করলেন। এ পদ্ধতিতে রোগীর মনে যে সমস্ত কথা উদিত হয়—তা যতই অসংলগ্ন, অশ্লীল, অপ্রয়োজনীয় বা অসামাজিক হোক না কেন—সেইগুলি নিঃসংকোচে তাকে বলতে বলা হয়। কিন্তু ফ্রয়েড লক্ষ্য করলেন—এতেও যেন রোগী সব কথা মনে করতে পারছে না। মনের মধ্যে যেন দুটি ভিন্নমুখী স্রোতের প্রবাহ চলেছে (dissociation)। মনের মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্ব (conflict) ও বাধার (resistance) জন্য স্বাভাবিক চিন্তাপ্রবাহ বাধা পাচ্ছে। এই অন্তর্বিরোধের খোঁজ করতে গিয়ে ফ্রয়েড মনের অতলে ডুব দিয়ে পাতাল পুরীতে খোঁজ পেলেন অচেতন বা নির্জ্ঞান মনের। তিনি জানতে পারলেন এই বিরোধ ও বাধার মূল কারণ হ'ল রোগীর লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, দুঃখ ইত্যাদি এবং এই লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ও দুঃখের কারণ হ'ল—ব্যক্তির অবদমিত বাসনা, কামনা, ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাগুলি যৌনতার রঙে রঙীন। অবাধ অণুষঙ্গের পদ্ধতি ছাড়াও ফ্রয়েড স্বপ্ন বিশ্লেষণের (Dream Analysis) সাহায্যে মানসিক রোগের কারণ নির্ণয় করে তা নিরাময় করার চেষ্টা করেছিলেন।

ফ্রয়েডের মতে মানসিক সংগঠন (Mental structure according to Freud) : বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যাপক গবেষণার ফলে ফ্রয়েড মানব-মনের গঠন ও কার্যকারিতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হ'ন। মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর মনঃসমীক্ষণ এক নতুন ও যুগান্তকারী আবিষ্কার। মনঃসমীক্ষণ যদিও মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা, তবুও পরিকল্পনা পদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে এর সঙ্গে সাধারণ মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মনঃসমীক্ষণকে অনেকে আচরণের মনোবিজ্ঞান বলে থাকেন। কিন্তু নিখুঁত ভাবে বলতে গেলে এটিকে সঙ্গতি সাধনের মনোবিজ্ঞান (Adjustment-Psychology) বলা উচিত। মানুষকে "বহুমুখী বিপথগামী ব্যক্তি" (Polymorphous Pervert) বলা যায়। বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সঙ্গতি সাধনের জন্য মানুষ যে বিভিন্নমুখী আচরণ করে—তা ব্যাখ্যা করাই মনঃসমীক্ষণের কাজ। মনঃসমীক্ষণে মনের আচরণকে পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ে বিচার করা হয় এবং আচরণগুলির অন্তর্নিহিত

উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার ব্যাখ্যা করা হয়। আভ্যন্তরিণ শক্তি ও প্রেষণার সাহায্যে মানব আচরণ ব্যাখ্যা করা মনঃসমীক্ষণের কাজ।

অনেক সময় শীতপ্রধান দেশে নদীর উপর বড় বড় বরফের চাঁই ভাসতে দেখা যায়। এগুলির বেশীর ভাগ অংশটি থাকে জলের নীচে—কিছু অংশ থাকে জলের উপরে। এই উপরের অংশটুকু আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই। কিন্তু নীচের অংশ বাইরে থেকে দেখা যায় না—অথচ সেটি একটি বড় অংশ। আবার অনেক সময় দেখা যায় ঐ বরফের চাঁই বাতাসের উল্টো দিকে ভেসে যায়। অবাক লাগে বইকি। কিন্তু কারণ একটা নিশ্চয় আছে। নদীর অন্তঃস্রোতই এটিকে বাতাসের উল্টো দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তেমনি অনেক সময় আমরা এমন আচরণ করে থাকি, যা করা উচিত নয়, যে সমস্ত আচরণ অস্বাভাবিক, অসামাজিক বা ক্ষতিকর। এখানেও নিশ্চয় একটা কারণ আছে—যা আমাদের জানা নেই। এখানেই ফ্রয়েড অচেতন মনের (unconscious mind) অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন।

বর্তমান যুগে ফ্রয়েডের মতবাদ সকলে স্বীকার করেন না। তাঁর মতবাদের তীব্র সমালোচনা ও বিরোধিতাও অনেকে করেছেন। কিন্তু ফ্রয়েড যখন প্রথম এই আবিষ্কার প্রকাশ করেন, তখন তা দর্শন, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর মতবাদ এক সম্পূর্ণ অজানা, অচেনা, রহস্যময় জগতের দরজা আমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়। আমরা নিজেরা নিজেদের স্বরূপ দেখতে পাই—নিজেদের চিনতে পারি। কখনো পুলকে রোমাঞ্চিত হচ্ছি, কখনো বা নিজের তীব্র, ভয়াল, বীভৎস রূপ দেখে ভয়ে শিউরে উঠছি। বিশ্ববাসীর চোখের সামনে ফ্রয়েড মনের আবরণটি তুলে নিয়ে মানসিক সংগঠনের যে ছবিটি ফুটিয়ে তোলেন, তার বিরাট সম্ভাবনাকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন নি।

ফ্রয়েডের পূর্বে চেতন মন ছাড়া অন্য কোন প্রকার মনের কথা কেউ ভাবতেই পারেন নি। ফ্রয়েডই প্রথম দেখালেন যে, মনের জ্ঞাত অংশের চেয়ে অজ্ঞাত অংশই বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং মানব আচরণের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ে চেতন মনের চেয়ে অচেতন মনের প্রভাব বেশী।

ফ্রয়েড প্রথমে মনকে দু'টি অংশে ভাগ করেন—**চেতন** (Conscious—Ego) এবং **অচেতন** (Unconscious)। তিনি চেতন মনকে **ইগো** (Ego) বা

অহংসত্তা বলেও বর্ণনা করেছেন। মনের এই চেতন স্তর যে সমস্ত বাসনা-কামনা বা ইচ্ছাকে স্বীকার করতে নারাজ, সেগুলিকে জোর করে অবদমিত করে অচেতন স্তরে নির্বাসিত করে দেয়। অচেতন থেকে সেই সমস্ত বাসনা-কামনা সব সময় চেতন স্তরে উঠে আসতে চায়। কিন্তু ইগো তাদের বাধা দেয়। এই বাধা দেবার কাজটি অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞাতসারেই হয়ে থাকে। দেখা গেছে অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে কেউ যখন কোন অভিজ্ঞতার স্মৃতি উজ্জীবিত করতে চাইছে—তখন অজান্তে তারা বাধা পাচ্ছে। এইজন্য ফ্রয়েড আবার পরবর্তীকালে তাঁর মতবাদ সংশোধিত করে ইগোর দুটি ভিন্ন রূপের কথা বললেন। একটি হ'ল অংশতঃ সংজ্ঞান, অপরটি অংশতঃ নির্জ্ঞান।

পরবর্তিকালে ফ্রয়েড মানব মনের তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেন। মানব মন যেন একটি ত্রিতল বাড়ী। আমাদের মনের যে অংশ বাস্তব জগতের সঙ্গে যোগসূত্রটি বজায় রাখছে, যে মনটির কাজকর্ম সম্বন্ধে আমরা সচেতন, যে মনকে আমরা জানি বা চিনি, সেই অংশটির তিনি নাম দিলেন—**চেতন মন** (conscious mind)। এই চেতন মন কিন্তু অচেতনের তুলনায় অনেক ছোট। কেউ কেউ বলেন এই অংশটুকু অচেতনের প্রায় আট ভাগের এক ভাগ মাত্র। সবচেয়ে গভীর মানব মনের যে অংশটি আছে তা হ'ল **অচেতন মন** (unconscious mind)। মনের অধিকাংশ জায়গা দখল করে আছে এই অচেতন মনটি। মনের এই অংশ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত (individualistic), আদিম বাসনা কামনায় পরিপূর্ণ এবং অতিমাত্রায় সক্রিয়। অচেতন বলতে ফ্রয়েড চেতনাবিহীন কোন জড়বস্তু বা জড়সত্তা বলতে চাননি। তিনি বলেন, এই অচেতন বা নির্জ্ঞান স্তরের সঙ্গে মানুষের বাইরের জগতে বা সমাজের কোন রকম সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি—হতে পারে না।

তিনটি স্তরের বৈশিষ্ট্য : চেতন মনকে সব সময় বাস্তব জগতের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখতে হয়। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য হ'ল শৃঙ্খলা, সংহতি ও সামাজিক দিক থেকে ভালো মন্দের বোধ। অচেতন মনের সঙ্গে বহির্জগত বা সমাজের কোন সম্পর্ক নেই। এই স্তরটি আদিম, সামাজিক বিচারে বর্বর ও পুরোপরি আত্মকেন্দ্রিক প্রচণ্ড শক্তিশালী উৎক্ষেপনধর্মী বাসনা-কামনায় পরিপূর্ণ। এর প্রক্রিয়া অসঙ্গতিপূর্ণ ও আদিম। এর প্রধান অধিবাসী হ'ল নগ্ন ও আদিম বাসনা-কামনা, প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের দল। এই প্রচণ্ড শক্তিশালী

বাসনা-কামনার উৎস অচেতন মনের যে স্তরটিতে আছে ফ্রয়েড তার নাম দিয়েছেন লিবিডো (Libido)। তিনি বলেন—লিবিডো হ'ল গভীর মনের একটি জলন্ত উনুন যেখান থেকে ওপরের দিকে ছুটে আসছে যৌন কামনার অভীপ্সার গনগনে লাল আগুনের টুকরো। গভীর মনের সমস্ত বাসনাই যৌন-রঙে রঙীন। অবশ্য ফ্রয়েড এই যৌন শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। তিনি যৌনতাকে জৈবিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য হিসেবে যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন, অচেতন মনের বাসনা-কামনাগুলি সেই সমস্ত খাদ্য সংগ্রহের জন্য বাইরের দিকে, অর্থাৎ চেতন মনের দিকে প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছে।

এখন প্রশ্ন হ'ল—অচেতন মনে এই সমস্ত বাসনা-কামনা কিভাবে আসে? এগুলি আসে দুইটি উৎস থেকে। একটি হ'ল যে সমস্ত বাসনা-কামনা তাদের অসামাজিক প্রকৃতির জন্য চেতন মন থেকে অবদমিত হয়, তারা এসে এই অচেতন মনে আশ্রয় নেয়। এই অবদমনের কাজটিও অবিরত চলেছে। আর দ্বিতীয়টি—এই স্তরের কতকগুলি চিন্তা, বাসনা বা কামনা সহজাত। এরা জন্ম থেকেই অচেতনের অধিবাসী এবং কখনও চেতন হয়ে ওঠে না। অচেতনের এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বস্তুগুলির ইয়ুং নাম দিয়েছেন—"জাতিগত অচেতন" (Archetype)। এগুলি যেন আদি-পিতার মন থেকে বংশানুক্রমে আমাদের মনে সঞ্চালিত হয়ে যাচ্ছে।

অচেতন মনের ইচ্ছাগুলি সমাজের বাধা-নিষেধ বা সীমা-সংকীর্ণতার বেড়া মানতে চায় না—ভাঙতে চায়। এর ইচ্ছা পূরণের জন্য বাইরের জগৎ থেকে সে যা সংগ্রহ করতে চায়, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের চোখে অবাঞ্ছনীয়, অসামাজিক, কাজেই অচেতন মনের অনেক ইচ্ছা, বাসনা, কামনাকে অপূর্ণতার নিষ্ফল আক্রোশে মাথা কুটে মরতে হয়। এগুলি যে শুধু অপূর্ণই থাকে, তা নয়, মনের যে অংশ সমাজ-জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেখান পর্যন্ত তাকে পৌঁছাতেই দেওয়া হয় না। জোর ক'রে অবদমন করে, নিপীড়ন করে এগুলিকে আবার অচেতন মনের গভীর অন্ধকার গুহার মধ্যে নির্বাসিত করা হয়—তাতে অচেতন মন যতই ব্যথিত হোক, যতই পীড়িত হোক না কেন! অবদমনের যন্ত্র হিসেবে মানসিক সংগঠনের যে অংশটি কাজ করে যায়, ফ্রয়েড তার নাম দিয়েছেন সেন্সর (Censor)। সেন্সরের অবস্থিতি হ'ল

অচেতন গভীর মন ও চেতন মনের সঙ্গমস্থল। এ কাজ করে যায় অতন্দ্র প্রহরীর মত।

মনের অধিবাসী (Inhabitants of mind) : ফ্রয়েড মানসিক সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে তিনটি বিশেষ অধিবাসীর কথা বলেছেন। সে তিনটি হ'ল—ইদম্ (Id), অহম্ (Ego) এবং অধিসত্তা (Super Ego)। ইদম্ হ'ল সম্পূর্ণ রূপে অচেতন। এটি হ'ল লিবিডোর আদিম আশ্রয়স্থল এবং ব্যক্তির প্রবৃত্তিমূলক কামনা-বাসনার উৎস। আগেই বলা হয়েছে চেতন মন থেকে যে সমস্ত বাসনা-কামনা অবদমিত হয়, সেগুলি অচেতনে এসে আশ্রয় নেয়। ইদমের প্রকৃতি হ'ল আদিম, অন্ধ, অসামাজিক; ইদম্ যে নীতি অনুসরণ করে তাকে বলা হয় **সুখবোধের নীতি** (Pleasure Principle)। সে চায় দুঃখকে এড়িয়ে কেবল সুখ উপভোগ করতে। ইদম্ যেন মূর্তিমতী বাসনা-কামনার একটি নগ্ন প্রতিচ্ছবি। সমাজ, শিক্ষা, রীতি, নীতি, শালীনতা, রুচিবোধ কোন কিছুরই ধার ধারে না ইদম্। এর মধ্যে যুক্তি নেই, বিচার-বুদ্ধি নেই, নেই নীতিশাস্ত্রের প্রতি আনুগত্য। বহির্জগতের সঙ্গে ইদমের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। আমরা ইদমকে আদিম মানব-মনের প্রতীক বা প্রতিভূ বলতে পারি। সে চায় পুরোপুরি আনন্দ, সুখ। তার বাসনা-কামনার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি—তা সেগুলি ভালো হোক, মন্দ হোক, সামাজিক বা অসামাজিক—যাই হোক না কেন। ইদম্ কিন্তু সরাসরি তার বাসনা-কামনা বা ইচ্ছাগুলি পূরণ করতে পারে না। এগুলি পূরণ করতে পারে একমাত্র অহম্ বা ইগো। ইদমের নিজের থেকে কিছু করার ক্ষমতা নেই। ইদমের বাসনা-কামনাগুলি পর্যালোচনা করে বাস্তব জগতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলাই হ'ল ইগোর কাজ।

অহম্ বা ইগোকে বাস্তব জগতের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখে চলতে হয়। এ যে নীতিটি অনুসরণ করে তাকে বলা হয় বাস্তবতার নীতি (Reality Principle)। অহম্ বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন ও যুক্তিধর্মী। সে জানে, সমাজে অস্তিত্ব বজায় রাখতে হ'লে তাকে বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে হবে, সামাজিক অনুশাসনটি মেনে চলতে হবে। এইজন্যই সে ইদমের সমস্ত বাসনা-কামনা পরিতৃপ্তি করতে পারে না। ইদমের তৃপ্তি হলেই অহমের তৃপ্তি হয়। কিন্তু বাস্তবের কঠিন অনুশাসনের জন্য অহমকে বাধ্য হয়ে ইদম্‌কে দাবিয়ে রাখতে

হয়, তার বাসনা-কামনাগুলিকে অতৃপ্ত রাখতে হয়। তবে অহম্ যখন বোঝে—ইদমের বাসনা-কামনাকে তৃপ্ত হ'তে দিলে কোন সামাজিক বিপর্যয় ঘটবে না বা তাকে কোন সমালোচনা বা শাস্তি ভোগ করতে হবে না। তখন সেই বাসনা-কামনাকে তৃপ্ত করতে অহম্ অস্বীকার করে না, অহমের আবার দুটি রূপ—চেতন ও অচেতন। চেতন অহম্ বাস্তবের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখে আর অচেতন অহম্ ইদমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, তার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে। জন্মের সময়ই কিন্তু অহম্ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না। জন্মের সময় অহম্ থাকে দুর্বল, কিন্তু শিশু যত বড় হয়, ততই বাস্তবের সংস্পর্শে এসে অহম্ পূর্ণতা লাভ করতে থাকে।

এ ছাড়া মনের আর একটি অংশ আছে—যাকে বলা হয় অধিসত্তা। অহমের দুটি অংশ আছে—একটি হ'ল কর্মকর্তা অহম্ (Doer or Executive), অন্যটি হ'ল সমালোচক অহম্ (Critic or Watcher)।* অহমের এই নৈতিক সমালোচক অংশটিকে বলা হয় অধিসত্তা বা সুপার-ইগো। অহম্‌কে যদি বিক্রেতার সঙ্গে তুলনা করা চলে, তবে অধিসত্তাকে বলা যেতে পারে বিবেক বা নীতি-বুদ্ধি (Conscience)। অধিসত্তার বেশীর ভাগ অচেতনে অবস্থিত বলে অহমের চেয়ে অধিসত্তাই ইদমের বেশী খবর রাখে। অধিসত্তার প্রধান কাজ হ'ল—অহমের কাজের সমালোচনা করা। তীব্র সমালোচনার দ্বারাই সে ইদমের বাসনা-কামনাগুলি অবদমিত করতে অহমকে বাধ্য করে।

এখন দেখা যাক্ সে কিভাবে কাজ করে! ইদমের বাসনা-কামনাগুলি সব সময় চেতন মনে উঠে আসতে চায়। যখনই কোন অসামাজিক বা অবাঞ্ছিত ইচ্ছা অচেতন মন থেকে চেতন মনে উঠে আসতে চায়, তখনই অহম্ তার প্রহরী সেন্সর-এর দ্বারা তাকে অবদমিত করে অচেতন মনের গভীর অন্ধকার গুহাতে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়। অহম্ এই প্রহরী সেন্সরকে নিযুক্ত করেছে এই কাজের জন্যই যাতে অচেতন মনের অসামাজিক কোন বাসনা বা ইচ্ছা বাইরের জগতে আত্মপ্রকাশ করে অহমের সামাজিক জীবনকে বিব্রত বা বিপর্যস্ত না করে। অর্থাৎ চেতন অহম্ সব সময় চেষ্টা করে একটা

* The ego is split into, the doer or executive which remains the ego proper and the watcher or moral critic is the Super-Ego.

—Woodworth

তাড়নায় বুভুক্ষায় অস্থির হয়ে চেতন মনের সামাজিক স্তরে তার আহার অন্বেষণ করতে ছুটে যায় ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত। সমাজের অতন্দ্র প্রহরী সেন্সর তার টুঁটি চেপে ধরে আবার তাকে অচেতন মনে ফেরৎ পাঠাতে চায়। এর ফলেই সৃষ্টি হয় মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের যার নাম দিয়েছেন ফ্রয়েড Mental Conflict। বার বার চেষ্টা করেও যখন ইদমের ইচ্ছাগুলি চেতন মনে আসার পাশপোর্ট পায় না—তখন তারা বাধ্য হয়ে গভীর অচেতন মনে ফিরে আসে আর অতৃপ্ত ক্ষুধার অসহ্য যন্ত্রণায় সমস্ত মানসিক সংগঠনটিকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তোলে।

কখনও কখনও সেন্সারের অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে (যেমন ঘুমের সময়) কোন আদিম, নগ্ন বাসনা চেতন মনে চলে আসে খুবই গোপনে। চেতন মনে আসার পর যখন তার স্বরূপটি প্রকাশ পেয়ে যায়, তখন অহম কখনও তাকে অবদমিত করার চেষ্টা করে, আবার কখনও সে তাকে সামাজিক সাজ পোশাকে সজ্জিত করে অধিসত্তাকে অর্থাৎ সামাজিক অনুশাসনের চোখকে ফাঁকি দিতে চায়। ইদমের তৃপ্তিই হ'ল অহমের তৃপ্তি। কাজেই ইদমের আদিম বাসনা-কামনায় পরিতৃপ্তির জন্য অহমও ভেতরে ভেতরে লালায়িত হয়। ফ্রয়েড এ অবস্থার নাম দিয়েছেন—দ্বিধাবিভক্ত অহম (Dissociated Ego)।

আমরা অহমের যে ছবিটি পাচ্ছি—তা খুব সুখকর নয়। অহমকে একসঙ্গে তিনজন প্রভুর সেবা করতে হয়। এই তিনজন প্রভু হ'ল—বাস্তব জগৎ, অবাধ্য ইদম ও সমালোচক অধিসত্তা। এই তিনজন প্রভুর সঙ্গে বনিবনা করে অহমকে চলতে হয়। যদি কোন প্রকারে কোন এক দিকের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহ'লে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। ফ্রয়েডের মতে যে সমস্ত লোক মানসিক বিকারগ্রস্ত, তাদের অহম সত্তাটি কোন কারণের জন্য ঐ তিন জন প্রভুর সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে পারে নি।

ইদম্, অহম ও অধিসত্তার কাজগুলি একটি উপমার সাহায্যে বোঝানো যায়। ধরা যাক—আমাদের দেহটি হ'ল একটি মোটরগাড়ী। অহম্ হ'ল—ড্রাইভার। অধিসত্তা—গাড়ীর মালিক ও ইদম্ মালিকের স্ত্রী (পাঠিকারা দয়া করে মার্জনা করবেন)। অহমকে ড্রাইভার বলা হচ্ছে তার কারণ আমাদের শরীরে ইচ্ছাধীন পেশীগুলি চালনা করার ক্ষমতা অহম্ ছাড়া আর কারো নেই। ইদম্ মাঝে মাঝে গাড়ী নিয়ে বাইরে যেতে চায়। অহম্ যদি বোঝে গাড়ী নিয়ে তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে এলে কোন ক্ষতি হবে না বা মালিকের তিরস্কার সহ্য

করতে হবে না—তাহ'লে সে গাড়ী নিয়ে যাবে। মালিক যদি দেখে, ঠিক সময়ে গাড়ী ফিরে এসেছে, তাহ'লে সে ড্রাইভারকে কিছু বলবে না। কিন্তু ইদম্ যদি বাজারে যাবার নাম করে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে চায়, তাহ'লে অহম্ প্রথমে তাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করবে। কিন্তু ইদমের পীড়াপীড়িতে যদি অহম্ গাড়ী নিয়ে যেতে বাধ্য হয়, তাহ'লে ফিরে এসে অধিসত্তার বকুনি এড়াবার জন্য গাড়ী খারাপ হবার একটা অজুহাত দেখাবে। এই ভাবে সে সকলের সঙ্গেই সমন্বয় সাধন করে চলতে থাকে। অহমের সঙ্গে অধিসত্তার কোন বিরোধ অবশ্য থাকে না। অধিসত্তা লড়াই করে ইদমের সঙ্গে—অহম্ হ'ল যুদ্ধক্ষেত্র। তাছাড়া অবদমনের কাজে অধিসত্তা অহমকে সাহায্যই করে থাকে—বিরোধিতা নয়।

প্রাণশক্তি (Eros) ও মরণশক্তি (Thanatos) : ফ্রয়েড তাঁর মনস্তত্ত্বে মানসিক সংগঠনটির প্রকৃতিকে প্রাণধর্মী (vitalistic) বলে বর্ণনা করেছেন। মনঃসমীক্ষণ হ'ল একটি গতিশীল (dynamic) বিজ্ঞান এবং এতে মানব আচরণের ব্যাখ্যা করা হয় আভ্যন্তরিণ শক্তি ও প্রেষণার সাহায্যে। ফ্রয়েড বলেন—আমাদের সমস্ত মানসিক সক্রিয়তার পশ্চাতে দুটি বিপরীতধর্মী আদিম শক্তি কাজ করে চলেছে। এ দুটি হ'ল—**প্রাণশক্তি** বা **Eros** এবং **মরণশক্তি** বা **Thanatos**। প্রাণশক্তি হ'ল—জীবনীশক্তি। এর মধ্যে ভালোবাসার প্রকোষ্ঠের মাত্রাটি বেশী। এই শক্তির অন্তর্ভুক্ত হ'ল—নিজেকে ভালোবাসা, অন্যকে ভালোবাসা, আত্ম-সংরক্ষণ ও জাতি-সংরক্ষণের চাহিদাগুলি। এই শক্তিই প্রাণীর মধ্যে বেঁচে থাকার ইচ্ছাটি যেন প্রতিনিয়ত জাগ্রত করে রাখে। মরণশক্তি হ'ল ঠিক এর বিপরীত একটি শক্তি। এ যেন প্রাণীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। প্রাণশক্তিতে যেমন ভালোবাসার ছোঁয়া থাকে, মরণশক্তিতে তেমনি থাকে ঘৃণা, বিদ্বেষ, পীড়ন ও ধ্বংস করার একটা প্রচণ্ড শক্তি বা ইচ্ছা। এই মরণশক্তি আবার দু'রকম রূপ পরিগ্রহ করে থাকে—**ধর্ষকাম (Sadism)** ও **মর্ষকাম (Masochism)**। ধর্ষকাম হ'ল অপরকে নিপীড়ন করে সুখ বা আনন্দ (ফ্রয়েডের মতে যৌনসুখ) উপভোগ করা। এই শক্তির জন্য মানুষ ধ্বংস বা বিনাশের প্রচেষ্টাতে মেতে ওঠে। এই শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে নিষ্ঠুর, আক্রমণাত্মক ও ধ্বংসমূলক আচরণের মাধ্যমে। মর্ষকাম হ'ল অপরের দ্বারা নিজে নিপীড়িত হয়ে সুখ বা আনন্দ (যৌনসুখ) উপভোগ করা। মর্ষকামীরা যাদের ভালোবাসে, তাদের দ্বারা নিগৃহীত ও

নিপীড়িত হ'তে চায়। বিভিন্ন জাতীয় আত্ম নির্যাতনমূলক আচরণের মাধ্যমে এই শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। এই শক্তি যখন তীব্র আকার ধারণ করে, তখনই ব্যক্তির মধ্যে আত্মহত্যা করার ইচ্ছাটি অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে পড়ে। ফ্রয়েড বলেন—প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বাঁচার ইচ্ছা ও মরণের ইচ্ছা পাশাপাশি বর্তমান থাকে। এই দুটি শক্তির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে আমাদের সমস্ত আচরণ এক বিশেষ পথে পরিচালিত হয়। ফ্রয়েডের এই প্রাণশক্তির পরিকল্পনায় সমগোত্রীয় কিছু কিছু শক্তির সন্ধান অন্যত্রও পাওয়া যায়। বিখ্যাত জীবনীশক্তিবাদী (Vitalist) মনোবিজ্ঞানী বার্গসঁ এই শক্তির নাম দিয়েছেন জীবন-প্রেষণা (Elan Vital)। বার্নাড্‌ শ' একে বলেছেন জীবনীশক্তি (Life-force)। কিন্তু ফ্রয়েডের মতবাদের নতুনত্ব ও বৈশিষ্ট্য হ'ল—দুটি বিপরীতধর্মী শক্তির সহাবস্থান। মানব মনে যে একটা অন্তর্বিরোধ প্রতিনিয়ত চলেছে তার উপযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ফ্রয়েডের মতবাদ থেকে দেওয়া সম্ভব।

লিবিডো (Libido): ফ্রয়েডের মতে সমগ্র মানসিক সত্তার মধ্যে একটি জৈব-প্রবৃত্তিমূলক প্রাণশক্তি সতত বিরাজমান। প্রাণশক্তির মূলগত উৎসটির তিনি নাম দিয়েছেন লিবিডো। এই লিবিডোই ব্যক্তির বিকাশ ও পরিণতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই লিবিডোটিই হ'ল তেজ ও উদ্যমের মূলাগার যার থেকে উৎসারিত হয় গভীর মনে কামনাগুলি। লিবিডো প্রধানতঃ যৌন আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে। ফ্রয়েড বলেন—লিবিডো সম্পূর্ণ ভাবে মানসিক একটি শক্তি বিশেষ। একে দৈহিক শক্তি, সামর্থ্য বা দৈহিক কোন প্রকার ক্ষমতার সঙ্গে এক করা যাবে না। লিবিডোর প্রকৃতি সম্পূর্ণ যৌনমূলক। সমস্ত কামনাই প্রাথমিক ভাবে যৌন। ফ্রয়েড কিন্তু যৌন শব্দটি ব্যাপক অর্থে, জৈবিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। যৌনতা বলতে তিনি সব রকমের আসক্তিকে বুঝিয়েছেন। তবে যৌন শব্দটির সংকীর্ণ অর্থ অর্থাৎ যৌন পরিতৃপ্তিও যে লিবিডো থেকে আসবে, তা কিন্তু ফ্রয়েড অস্বীকার করেন না। যৌন পরিতৃপ্তি, দৈহিক-মিলন, প্রজনন—এ সমস্তও যে লিবিডোর লক্ষ্য, সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

সব মানুষ অবশ্য সম-পরিমাণ ও সমান শক্তিবিশিষ্ট লিবিডো নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। কারো ক্ষেত্রে এটি থাকে কম, কারো ক্ষেত্রে বেশী।

আবার জন্মের সময় লিবিডো পরিপূর্ণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করে না। এটি শৈশব থেকে ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে চলে। লিবিডোর এই বিভিন্ন জাতীয় বিকাশের জন্য বিভিন্ন সময়ে মানসিক স্বাভাবিকতা, অস্বাভাবিকতা ইত্যাদি দেখা যায়। লিবিডোর অন্তর্নিহিত শক্তি বা পরিমাণ এর গতি এবং বিকাশের পথে পারিবেশিক বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিক পরিণতি ও তার ব্যক্তিসত্তার সংগঠনটি। লিবিডো থেকে যে সমস্ত বাসনা-কামনা অর্থাৎ ক্ষুধা পরিতৃপ্তির জন্য বাইরের জগতে ছুটে আসছে, সেগুলি সবই সহজাত-প্রবৃত্তিমূলক। এরা হ'ল যৌনমূলক দুর্বার শক্তি, সামাজিকতার বিচারে অবাঞ্ছনীয়, সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে আদিম, নগ্ন ও বর্বর এবং জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীতে—আত্মকেন্দ্রিক। লিবিডো সম্পূর্ণ যৌনধর্মী; অর্থাৎ মানুষের সব আচরণের মূলেই আছে যৌনকামনা ও যৌনচেতনা। ফ্রয়েড বলেন—শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলের আচরণ ও কর্মপ্রচেষ্টা যৌন প্রয়াস মূলক। এ ক্ষেত্রে যৌনতা বলতে আমরা সেই সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকেই বুঝিয়ে থাকি যেগুলির রূপ তীব্র ক্ষুধার মত। আত্ম-প্রীতি, পিতা-মাতা বা বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি আকর্ষণ, নিঃস্বার্থ ভালবাসা—এ সবই ফ্রয়েডের মতে যৌনতার অন্তর্গত। প্রাণশক্তির মূলাধার লিবিডোর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হ'ল—যৌন মিলন বা যৌন ক্ষুধা পরিতৃপ্তির আনন্দ।

ফ্রয়েডের মতে লিবিডো হ'ল সচল শক্তির আধার। জন্মের সময় থেকেই শিশুর দেহ ও মনের, প্রধানতঃ মনের বিকাশ ও পরিণতির মধ্য দিয়ে চলতে থাকে লিবিডোর অব্যাহত গতি। জন্ম মুহূর্ত থেকেই এর চলার কাজ শুরু হয়ে যায় এবং বিভিন্ন পথ ধরে লিবিডো তার পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। একদিক থেকে বিচার করলে শিশুর ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের অর্থ হ'ল—লিবিডোর অগ্রগতি বা ক্রমবিকাশ। ফ্রয়েড লিবিডো বা ব্যক্তিসত্তার ক্রম-বিকাশের তিনটি প্রধান স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। এই স্তর তিনটি হ'ল—

[এক] শৈশব অবস্থা (Infancy): জন্মের সময় থেকে ৫-৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত। এই স্তরে প্রথমে লিবিডো অবস্থান করে শিশুর মুখে। এর নাম হ'ল—মৌখিক রতি-স্তর (Oral-erotic) ও মৌখিক ধর্ষণমূলক স্তর (Oral sadistic)। এরপর লিবিডো আসে শিশুর পায়ুতে (Anal-erotic), সবশেষে আসে লৈঙ্গিক স্তর (Phallic)।

[দুই] সুপ্তির সময় বা প্রসুপ্ত কাল (Latent Period) ৫-৬ বৎসর বয়স থেকে ১২-১৩ বৎসর পর্যন্ত। এই সময়কার আচরণ পূর্ণ যৌনবিবর্জিত হয় বলে একে প্রসুপ্তকাল বলা হয়। অবশ্য এ সময়েও লিবিডোর অগ্রগতি যথারীতি চলতে থাকে।

[তিন] যৌবনাগম (Adolescence) ১২-১৩ বৎসর বয়স থেকে ১৮-২০ বৎসর পর্যন্ত। এই সময় লিবিডো তার অস্বাভাবিক বিভিন্ন অবস্থানগুলি ত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে জননেন্দ্রিয়ে এসে অবস্থান করে। এই স্তরকে বলা হয় উপস্থ স্তর (Genital)।

লিবিডো যদিও প্রধানতঃ যৌনধর্মী, তবুও ফ্রয়েড উপরোক্ত তিনটি স্তরের মধ্যে শৈশব অবস্থার উপরই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শৈশবে লিবিডোর মধ্যে এমন অনেক পরিবর্তন ঘটে থাকে যার ফলে ভবিষ্যৎ জীবনের আচরণ ও ব্যক্তিসত্তার সংগঠনের উপর একটা মারাত্মক প্রভাব পড়তে পারে। ফ্রয়েডের মতে প্রাপ্ত বয়স্কদের বহু মানসিক বিকারের মূলে শৈশবে লিবিডোর অবস্থানমূলক কোন অস্বাভাবিক ঘটনা থাকায় বা ঘটার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। এ প্রসঙ্গে তিনি লিবিডোর সংবন্ধন (Fixation) এবং প্রত্যাবৃত্তির (Regression) কথা উল্লেখ করেছেন।

সংবন্ধন (Fixation) : লিবিডো যে সব সময় স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের পথেই এগিয়ে চলে, তা নয়। মাঝে মাঝে সে স্বাভাবিক পথটি ছেড়ে দিয়ে অস্বাভাবিক পথ ধরে চলতে থাকে। চলার পথে শৈশবে লিবিডো কখনও কখনও কোন অস্বাভাবিক আশ্রয়ে সাময়িক ভাবে অবস্থান করে। অনেক সময় দেখা যায়, লিবিডো এই সাময়িক আশ্রয়টি পরিত্যাগ করে আর অগ্রসর হ'তে চায় না, সেই খানেই দৃঢ়মূল হয়ে যায়। এটিকে বলা হয় লিবিডোর সংবন্ধন। ফ্রয়েড বলেন, শৈশবের অনেক প্রেষণা ও প্রবণতা হয়তো বয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে সারাজীবন ধরে অবদমিত হয়ে থাকতে পারে। এরা কিন্তু অবিকৃতই থাকে। বয়স্ক লোকের কোন অপসঙ্গতি ঘটলে শৈশবের এই প্রেষণা ও প্রবণতাগুলি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে এবং বয়স্ক লোকটির আচরণও শিশুসুলভ হয়ে যায়। ফ্রয়েড আরো বলেন, সম্পূর্ণ লিবিডোটির কখনও সংবন্ধন হয় না; লিবিডোর কিছু অংশের সংবন্ধন হয়, বাকীটা এগিয়ে চলে। ফলে লিবিডোটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। সংবন্ধিত লিবিডো যেমন ব্যক্তির ব্যক্তি-

সত্তাকে প্রভাবিত করে, বিভাজিত লিবিডো তেমনি ব্যক্তির সহজ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে। ফ্রয়েড মানসিক রোগের কারণ হিসেবে-সংবন্ধনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন।

সংবন্ধনটি প্রকাশিত হয় প্রত্যাবৃত্তির মাধ্যমে। সংবন্ধনের জন্য ব্যক্তি যে শিশুসুলভ আচরণ করে, তার কারণটি কিন্তু তার নিকট অজ্ঞাত থাকে। সংবন্ধন থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করতে হ'লে সে কেন শিশুসুলভ আচরণ করছে—তার কারণটি তাকে বুঝ্‌তে দিতে হবে—বা বোঝাতে হবে। সংবন্ধন থেকে মুক্ত হলেই লিবিডো আবার তার ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হবে এবং ব্যক্তি পরিপূর্ণ ও সুষম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হতে পারবে।

প্রত্যাবৃত্তি (Regression) : প্রত্যাবৃত্তি প্রমাণ করে যে, লিবিডোটি সংবন্ধিত হয়েছে। সংবন্ধনের সঙ্গে প্রত্যাবৃত্তির সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। চলার পথে কোন মানসিক আঘাত বা ব্যর্থতার জন্য লিবিডো তার চলার পথে বাধা পেলে আর স্বাভাবিক পথে তো অগ্রসর হয়ই না, বরং পিছন দিকে পিছিয়ে এসে শৈশবের নিশ্চিত আশ্রয়ে অবস্থান করার চেষ্টা করে। লিবিডোর এই পশ্চাদ-পসরণকে প্রত্যাবৃত্তি বলে। মনোবিকারের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। এখানেও পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির আচরণ শিশু-সুলভ হয়ে যায়। যার লিবিডো যেখানে সংবন্ধিত হয়ে থাকে, প্রত্যাবৃত্তির ফলে তার আচরণ ঠিক ঐ স্তরের উপযোগী হ'য়ে থাকে। তার বয়স তখন যতই বেশী হোক না কেন, আচরণগুলি হবে—যে বয়সে সংবন্ধনটি ঘটেছে, ঠিক সেই বয়সের উপযোগী। অনেক হিষ্টিরিয়া রোগীকে দেখা গেছে যারা ডাক্তারের সঙ্গে এমন আচরণ করে, ঠিক যেন একটি পাঁচ বছরের ছেলে তার মা বাবার সঙ্গে আচরণ করছে। অনেক প্রাপ্তবয়স্ক লোক আধো আধো কথা বলে, তোতলামি দেখা যায়, অনেককে খাইয়ে দিতে হয়, কাপড় পরিয়ে দিতে হয়। অনেকে আবার কি করতে হবে—কি বলতে হবে—তা না বলে দিলে কিছু করতেও পারে না, বলতেও পারে না। এরা সম্পূর্ণ পরোমুখাপেক্ষী, যাদের আমরা বলি—"মায়ের আঁচল ধরা" ছেলে! আসলে এরা জীবনযুদ্ধে বাস্তবের রূঢ় আঘাত সহ্য করতে না পেরে শৈশবের অবাস্তব কল্পনার মধ্যে জয়ের আনন্দ ও মানসিক সুখ পাবার চেষ্টা করে।

লিবিডো যখন অগ্রসর হতে থাকে, তখন তাদের আসক্তির বিষয় ও পাত্রের

মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন হ'তে থাকে। অবশ্য একেবারে গোড়ার দিকে লিবিডো কোন বিশেষ বিষয়ে আসক্ত থাকে না—দৈহিক সুখের মধ্যেই লিবিডোর তৃপ্তি নিহিত থাকে। এই স্তরেই আত্মরতির (Auto-erotic) স্তরটি শুরু হয়। শিশু তার দেহগত সুখের মধ্যে আনন্দ লাভ করে। এই দেহগত সুখ অবশ্য বিভিন্ন রকমের হ'তে পারে। যেমন, কোন কিছু কামড়ানো (খাদ্য বস্তু বা অখাদ্য বস্তু), চিবানো, চোষা, মলের বেগ সহ্য করা, মল নিঃসরণ, প্রস্রাব ত্যাগ করা বা সমজাতীয় কোন দৈহিক সুখ। কিন্তু শিশুর অহম সত্তাটি যখন বিকশিত হ'তে থাকে, তখন তার লিবিডোটিও অহম সত্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এই স্তরই হ'ল আত্ম-রতির স্তর।

ফ্রয়েড বলেন—প্রত্যেক শিশুই হ'ল আত্মকামী (Auto Sexual)। সে ভালবাসে নিজেকে—তার দেহকে, চেহারাকে, আকৃতিকে। এই যে আত্মকামীতা—এর নাম দেওয়া হয়েছে—নার্সিসাসত্ব (Narcissism)। নামটি এসেছে গ্রীক পুরাণের একটি কাহিনীর নায়ক নার্সিসাসের নাম হ'তে। নার্সিসাস ছিল খুব সুন্দর চেহারার একজন যুবক। কিন্তু সে নিজের চেহারার সৌন্দর্য সম্বন্ধে অবহিত ছিল না। একো (Echo) তার প্রেমে পড়ে। একদিন নার্সিসাস নদীতে জল খেতে গিয়ে জলের আয়নাতে নিজের চেহারা দেখে নিজেই নিজের প্রেমে পড়ে গেল। সে আর নদীর তীর থেকে উঠত না। কেবল জলে নিজের ছায়া দেখতো। একোর কথা সে ভুলেই গেল, তারপর ধীরে ধীরে অনাহার ও অনিদ্রার জন্য সে মৃত্যু বরণ করে। নার্সিসাস কথাটিতে আত্মরতি বা নিজেই নিজেকে ভালোবাসার কথা বোঝায়।

এই আত্মরতি শিশুর অহং সত্তাকে বিকশিত হতে সাহায্য করে। কোন মানুষই নার্সিসাসত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে না। নিজের সম্বন্ধে একটু উচ্চ ধারণা থাকে প্রত্যেকের মধ্যে। সকলে নিজেকেই একটু ভালবাসুক না। এতো মন্দ নয়। তবে এর মাত্রা বেশী হলেই খারাপ। নার্সিসাসত্বের স্তরে যাদের লিবিডো সংবদ্ধিত হয়ে যায়, তারা স্বার্থপর বা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যায়, অন্য কাউকে সহ্য করতে পারে না, অন্য কাউকে ভাল বললে হিংসাতে ফেটে পড়ে! মেয়েদের তো কথাই নেই। সাজ গোজ করে একেবারে শো-কেসের পুতুলটি হয়ে থাকতে চায়, "এবং অন্য কেউ সাজগোজ করলেই বলবে— আহা! কি ঢং, সাজগোজের কি ঘটা!" যৌবনাগমে নার্সিসাসত্বের প্রাবল্য

আর একবার লক্ষ্য করা যায়। এ সময় প্রাপ্তযৌবন ছেলেমেয়েরা আবার নতুন করে নিজেদের ভালবাসতে শুরু করে।

লিবিডোর আর এক স্তরে শিশুর আসক্তির বিষয় বা ব্যক্তি তার অহং সত্তাকে ছেড়ে বাইরের দিকে উদ্দীষ্ট হয়। প্রথম অবস্থায় ছেলেরা ছেলেদের এবং মেয়েরা মেয়েদের ভালবাসে, পছন্দ করে। একে বলা হয় সমকামিতা (Homo Sexuality)। পরিণত বয়সে এই আসক্তি বা ভালবাসা বিপরীত লিঙ্গের দিকে ধাবিত হয়। ছেলেরা মেয়েদের এবং মেয়েরা ছেলেদের ভালবাসতে শুরু করে। এক বলা হয় **বিপরীত কামিতা** (Hetero Sexuality)। (ফ্রয়েডের মতে শিশুর আসক্তির প্রথম পাত্র-পাত্রী হলেন তার মাতা-পিতা। এদেরকে কেন্দ্র করে শিশুর মধ্যে নানা প্রকার কমপ্লেক্স সৃষ্টি হয়। কমপ্লেক্স সম্বন্ধে "বস" শীর্ষক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে (পৃঃ ২২—৯৬, ২য় খণ্ড)। ফ্রয়েড বলেন—ছেলেরা সাধারণত তার মাকে ভালবাসে এবং বাবাকে ঈর্ষা করে বা ঘৃণা করে। এর নাম তিনি দিয়েছেন **ঈডিপাস কমপ্লেক্স** (Oedipus Complex)। আবার মেয়েরা সাধারণত বাবারই বেশী "ন্যাওটো" হয়, মাকে অপছন্দ করে। একে বলা হয়েছে **ইলেকট্রা কমপ্লেক্স** (Electra Compiex)। তেমনি মা'য়ের টান ছেলেদের দিকে, বাবার টান মেয়ের দিকেই।)

ঈডিপাস কমপ্লেক্স : পুরুষ-শিশুর লিবিডো যখন তার নিজের দেহ ছেড়ে বাইরের কোন বিষয় বা ব্যক্তির দিকে পরিচালিত হয়, তখন তার আসক্তির প্রথম পাত্রী হন তার মা। সে মাকে ভালোবাসে। কিন্তু লিবিডো যত পরিপুষ্ট ও পরিণত হতে থাকে, ততই এই আসক্তিটি ক্রমশঃ যৌনমূলক হতে থাকে। ফ্রয়েড বলেন—শিশুর মাতৃস্তন্য পান করা, মায়ের অঙ্গ স্পর্শ করা, মায়ের কোলে চড়া ইত্যাদি আচরণের মধ্যে সে যৌনতৃপ্তি উপভোগ করে। কিন্তু ক্রমশঃ শিশু বুঝতে পারে মায়ের প্রতি এই যৌন-আসক্তি থাকা অনুচিত এবং মায়ের প্রতি যৌনমূলক অধিকার একমাত্র তার বাবারই। ফলে সে তার এই আসক্তি বা কামনাকে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে সে তার বাবাকে ঘৃণা করতে, ভয় করতে এমন কি অপছন্দ করতেও শুরু করে। অনেক ক্ষেত্রে সে বাবার মৃত্যু কামনাও করে থাকে। অবশ্য শিশুর মায়ের প্রতি এই যে যৌন আসক্তি, এ কিন্তু সচেতন স্তরে থাকে না, থাকে অচেতন স্তরে।

মা'র প্রতি এই আসক্তি সে নির্দোষ ভাবে প্রকাশ করে। যেমন—মা'র আদর, মা'র মনোযোগ, মা'র হাতে খাওয়া, মা'র কাছে শোওয়া ইত্যাদি আচরণের মাধ্যমে। এই সব কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে তার বাবা। ফলে সে বাবাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। মা'র প্রতি এই যৌনমূলক আচরণই হ'ল ঈডিপাস কমপ্লেক্স।

মা'র প্রতি শিশুর কামনাটি অবদমিত করার জন্যই এই কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হয়। এই বিশেষ কমপ্লেক্সেরও নামকরণ করা হয়েছে একটি গ্রীক পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে। ঈডিপাস (রাজা অয়দি পাযুস) ছিলেন থিব্সের রাজপুত্র। তার জন্মের সময় জ্যোতিষীরা গণনা করে বললেন—এ ছেলে বড় হয়ে পিতাকে হত্যা করে তার মাতাকে বিবাহ করবে ও সিংহাসন দখল করবে। রাজার আদেশে তাকে এক পাহাড়ে ফেলে দিয়ে আসা হয়। একজন রাখাল তাকে উদ্ধার করে। সে পরে বড় হয়ে একজন বিখ্যাত যোদ্ধা হয় এবং এক দল সৈন্য নিয়ে তার পিতার রাজ্য আক্রমণ করে। যুদ্ধে সে তার পিতাকে হত্যা করে এবং তৎকালীন প্রথানুসারে তার মাতাকে বিবাহ করে। অবশ্য এ সবই সে করে তার পিতা-মাতার পরিচয় না জেনেই। প্রথম দিকে ধারণা ছিল—শিশুর মায়ের প্রতি এই আসক্তি বোধ হয় তার মায়ের দৈহিক সত্তার দিকে পরিচালিত। পরে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গেছে শিশু তার অবচেতন মনে, তার কল্পনার রাজ্যে তার মায়ের একটি প্রতিমূর্তি গড়ে নেয়। তার সমস্ত আসক্তি কেন্দ্রীভূত হয় অবচেতন মনের কল্পনাসৃষ্ট এই মাতৃমূর্তিকে ঘিরেই।

ছেলের যেমন মায়ের প্রতি আসক্তি দেখা যায়, মেয়ের তেমনি আসক্তি দেখা যায় তার বাবার প্রতি। মেয়ে চায় বাবার সঙ্গে থাকতে, তার আদর ভালোবাসা পেতে, তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে তার মাকে দেখে তার বাবার প্রতি ভালোবাসা ও আসক্তির ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে। কাজেই ছেলের বাবার প্রতি যেরূপ মনোভাব সৃষ্ট হয়, মেয়েরও ঠিক সেইরূপ মনোভাব সৃষ্ট হয় তার মায়ের প্রতি। এই কমপ্লেক্সের নাম দেওয়া হয়েছিল **ইলেকট্রা কমপ্লেক্স**। ইলেক্ট্রা তার মাকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে হত্যা করেছিল। বর্তমানে ছেলে-মেয়ে উভয়ের মনোভাব ও কমপ্লেক্সকে ঈডিপাস কমপ্লেক্স বলা হয়।

এই ঈডিপাস কমপ্লেক্স থেকে আর একটি কমপ্লেক্স সৃষ্ট হয়। মায়ের

প্রতি শিশুর আসক্তি তার পিতার সম্বন্ধে তার মনে একটা দারুণ ভয়ের সৃষ্টি করে। সে ভাবে—তার এই অন্যায় আসক্তির জন্য তার বাবা হয়তো তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন এমন কি তার যৌন অঙ্গটিও কর্তন করে দিতে পারেন। অনেক সময় খুব ছোট ছেলেরা যখন প্যান্ট পরতে চায় না, তখন তাদের বাবা যৌনাঙ্গ ছেদের ভয় দেখিয়ে প্যান্ট পরতে বাধ্য করেন। ফ্রয়েড এর নাম দিয়েছেন কাস্ট্রেশান কমপ্লেক্স (Castration Complex)। পিতার সম্বন্ধে এই অহেতুক ভয়ের জন্য সে পিতার অনুগত ও বাধ্য হয়। অনেক সময় এর জন্য সে পিতার প্রতি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়। শিশু যত বড় হতে থাকে, তত তার পিতার প্রতি এই অমূলক ও অস্বাভাবিক ভয়টি অন্তর্হিত হতে থাকে। তবে এ থেকে তার সুপার-ইগো বা অধিসত্তাটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবার সুযোগ পায়। শিশুর মনে কতকগুলি সামাজিক আদর্শ, বিধি-নিষেধ বা নৈতিক আদর্শের বীজ অঙ্কুরিত হ'য়ে যায় যেগুলি তার ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হয়ে থাকে।)

মানসিক কৌশল (Mental Mechanism) : আগেই বলা হয়েছে অহম্ বা ইগোকে একসঙ্গে ভিন্নধর্মী শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। এই তিনটি শক্তি হ'ল ইদম্, বাস্তব ও অধিসত্তা। ইদমের অনেক ইচ্ছা, বাসনা ও কামনা বাস্তবতার বিরো'ধী ও অধিসত্তা দ্বারা অননুমোদিত অথচ চেতন মনে আসার জন্য প্রতিনিয়ত তীব্র প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় সেন্সরকে এড়িয়ে চেতন মনে চলেও আসে। মাঝে মাঝে এমন অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়, যখন অহম্‌কে বেশ সংকটের মধ্যে পড়তে হয়। তখন ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অহম্‌কে কতকগুলি কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এগুলিকে বলা হয় মানসিক কৌশল। এর সাহায্যেই অহম্ ইদম্, অধিসত্তা ও বাস্তবের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা করে। এ যেন 'মনকে চোখ ঠা'রা'র প্রচেষ্টা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এই রকম অনেক কৌশলের সন্ধান আমরা পাই। বাজারে আঙুর কিনতে গিয়ে চড়া দাম দেখে কমলালেবু কিনতে বাধ্য হলাম। লোককে বললাম—আঙুরগুলো টক, লেবুগুলো বেশ মিষ্টি (Sour grapes and sweet oranges)। ইচ্ছে ছিল সরকারী চাকুরী করার, শুরু করতে হ'ল ব্যবসা। বললাম, এ বেশ ভালো হ'ল। পরের চাকর হওয়ার চেয়ে স্বাধীন থাকা অনেক ভালো। নাকের

বদলে যদি নক্সা পাওয়া যায় মন্দ কি! মেয়ে আবার ঝোঁক ধরল—একটা বড় পুতুল চাই যেটি হাঁটতে পারে, চোখ বন্ধ করে ঘুমুতে পারে, দাম অনেক। তাই কিনে দিলাম একটি স্যুটকেশ। বললাম এ কেমন সুন্দর হ'ল। পুতুল ছিঁড়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে; স্যুটকেশে কত জিনিস থাকবে, বই থাকবে। এ রকম কৌশল প্রত্যেকেই প্রতিনিয়ত অবলম্বন করে চলেছি।

মানসিক কৌশলগুলির উদ্দেশ্য দু'রকমের হতে পারে—(১) অবদমিত ইচ্ছাগুলির এবং ইদমের আক্রমণের বিরুদ্ধে অহমের আত্মরক্ষা করা এবং (২) ইদমের ইচ্ছাগুলির আংশিক তৃপ্তিদান। এগুলিকে আমরা সঙ্গতিসাধক কৌশলও Adjustment mechanism) বলতে পারি। উদ্দেশ্য অনুযায়ী কৌশলগুলির দু'রকমের নাম দেওয়া হয় :—প্রতিরক্ষণ কৌশল (Defence Mechanism) এবং পলায়ন মূলক কৌশল (Escapist Mechanism)। প্রতিরক্ষণ কৌশলে অহম্‌কে প্রতিরক্ষার একটা সুযোগ দেওয়া হয় যাতে সে ইদমের সঙ্গে লড়াই করে তাকে বাঞ্ছিত, সামাজিক পোশাকে সজ্জিত করতে পারে। পলায়নী কৌশলে অহম্ পালিয়ে এবং লুকিয়ে বাঁচে, যাতে অধিসত্তার নিকট তার আগমনের একটা নির্দোষ ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করে। এগুলি বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। এখন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল—

[এক] অনুকল্পন (Compensation) : যখন কারো মধ্যে কোন হীনমন্যতা দেখা দেয়, তখন এই অনুকল্পন কৌশলটি সে অবলম্বন করে থাকে। যে বিষয়ে তার হীনমন্যতা বোধটি থাকে, সে তা ঢাকবার জন্য অন্য কোন দিকে নিজের উৎকর্ষ প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকে। দুর্বল বা শারীরিক ত্রুটিযুক্ত কাজে শিশুরা অতিমাত্রায় সক্রিয়তা দেখিয়ে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার চেষ্টাই করে। যাদের চেহারা বেশ ভালো নয়, তারা সুন্দর সাজপোশাক ও "মেক-আপ" করে অপরের চোখে নিজেদের আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করে। অনেকে হীনমন্যতা ঢাকার জন্য উন্নাসিকতা ও আত্ম-গরিমার ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে শিশুরা স্কুলে সহপাঠীদের নিকট স্বীকৃতি না পেলে চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, অপরকে পীড়ন করা ইত্যাদি আচরণের মাধ্যমে স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করে। একটু বড় হ'লে অনেকে সামান্য জিনিসের উপর বাজে তর্ক করে নিজের বক্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত

করার চেষ্টা করে, নিজে যে সবজান্তা, তা প্রমাণ করার চেষ্টা করে। মনোবিজ্ঞানী পেজ (Page) একটি পরীক্ষণে মার্গারেট নামে একজন ছাত্রীর এরূপ আচরণের উল্লেখ করেছেন। অনুকম্পন কৌশল হিসাবে ভালো, কিন্তু সবক্ষেত্রে নয়।

[দুই] অবদমন (Repression): ইদমের অধিকাংশ বাসনা-কামনা সামাজিক দিক থেকে অবাঞ্ছিত বলে সমাজ-অনুমোদিত পথে সেগুলির তৃপ্তিসাধন করানো সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে এগুলিকে জোর করে আবার অচেতন মনে নির্বাসিত করে দিতে হয়। এই দমন করা বা জোর করে দাবিয়ে রাখার কাজটির নাম হ'ল অবদমন। অবদমনের কাজটি কিন্তু অহম্ একা করতে পারে না; অধিসত্তার সাহায্য তাকে নিতেই হয়। (The Super-ego fights with the Id, the Ego being the battle-ground)। অবদমিত হলেও বাসনা-কামনাগুলি শক্তিহীন হয়ে যায়। এরা সময় ও সুযোগ পেলেই আবার চেতন স্তরে উঠে আসার চেষ্টা করে এবং চেতন স্তরে বিভিন্ন ক্রিয়া— যেমন হঠাৎ ভুলে যাওয়া, কোন কিছু ভুল ভাবে করা, বলার ভুল (slip of the tongue), লেখার ভুল (slip of the pen) ইত্যাদির মাধ্যমে আত্ম-প্রকাশ করে। অবদমন হ'ল নিকৃষ্টতম কৌশল এবং বার বার অবদমনের ফলে অহম্ সত্তাটির দুর্বল হয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশী। অবদমন মাত্রাতিরিক্ত হলে ইদম্ ও অহমের অন্তর্দ্বন্দ্ব অত্যন্ত মারাত্মক রূপ ধারণ করে যার ফলে ব্যক্তির মানসিক সাম্য ও ধৈর্য বিনষ্ট হতে পারে। অধিকাংশ মনোবিকারের মূলগত কারণই হ'ল ব্যক্তির ইচ্ছার মাত্রাতিরিক্ত অবদমন।

[তিন] নেতিবাচক মনোভাব (Negativism): অনেক শিশুকে যা করতে বলা হয়, তারা ঠিক তার বিপরীত আচরণটিই করে। পাগলকে সাঁকো নড়াতে নিষেধ করলে সে বেশী করে সাঁকোটি নাড়াবে। সাধারণতঃ বিদ্রোহ বা প্রতিবাদের প্রবণতা থেকেই এই জাতীয় মনোভাব গড়ে ওঠে। একজন কিশোরীর ছোট ছোট ভাই-বোনেরা তাকে অত্যন্ত বিরক্ত করত, জ্বালাতন করত। সে এর জন্য মাঝে মাঝে তাদের মারধর করত। কিন্তু মেয়েটির মা-বাবা তার কোন কথা না শুনে তাকেই শাস্তি দিত। ফলে মেয়েটির মধ্যে একটা বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের মনোভাব গড়ে ওঠে। সে মা-বাবার কোন কথা শুনত না, তাঁরা যা বলতেন, ঠিক তার উল্টোটি করত, তাঁদের

প্রশ্নের জবাব দিত না। ফলে সে একগুঁয়ে ও অবাধ্য মেয়ে বলে পরিচিত হয়ে গেল। বেশী যত্ন নিলেও শিশুর মধ্যে এই মনোভাব গড়ে উঠতে পারে। আবার যাদের মধ্যে খুব বেশী আত্ম-গরিমার কমপ্লেক্স থাকে. তাদেরও এই মনোভাব থাকে। অনেক বড় বড় রাজনৈতিক নেতারও এই মনোভাব থাকে। তাঁরা ভাবেন, তাঁরা যা বলেন বা চিন্তা করেন, তাই ঠিক। অন্যের কোন মতামত তাঁরা গ্রহণ করেন না, বরং ঠিক উল্টোটাই করেন। এমন কি তাঁদের না জানিয়ে কোন ভাল কাজ করা হলেও তাঁরা সেই কাজটির দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করতে লেগে যান। তাঁদের উপর ভার দিলে তাঁরা যে আরো ভালোভাবে কাজটি করতে পারতেন, তা জানাতেও তাঁরা ভোলেন না—যদিও সত্য সত্যই তা তাঁরা পারতেন না। পৃথিবীর বড় বড় শাসকদেরও (Dictator) এই মনোভাবটি বর্তমান ছিল।

[চার] **উদ্‌গমন বা বিকল্প আচরণ (Sublimation) :** ফ্রয়েড বলেন যে লিবিডোর সকল আচরণই হ'ল যৌনমূলক। কিন্তু যৌনমূলক আচরণকে অবিকৃত ভাবে তো আর প্রকাশিত হতে দেওয়া যায় না। ইদমের বাসনাগুলির আংশিক তৃপ্তি দেবার জন্য অহম্ অনেক সময় এদের অবাঞ্ছিত পথ থেকে সরিয়ে বাঞ্ছিত পথে প্রকাশ করার সুযোগ দেয়। একেই বলা হয় উদ্‌গমন বা উন্নীত-করণ। উন্নীতকরণ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য প্রথম খণ্ডের ৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

উদ্‌গমনের একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করা হ'ল। ইতালীর বিখ্যাত কবি দান্তে একদিন ফ্লোরেন্সের রাজপথে সুন্দরী বিয়াত্রিচেকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যান ও তার প্রেমে পড়েন। কিন্তু বিয়াত্রিচে খুব সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা ছিলেন এবং উভয়ের আলাপ-পরিচিত হবার দ্বিতীয় কোন সুযোগও পাওয়া যায় নি। দান্তের বিয়োত্রিচের প্রতি আকর্ষণ ছিল মূলতঃ যৌনমূলক। যৌনপ্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে তিনি বহুদিন মনোকষ্ট পেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত এই যৌন আকর্ষণ রূপ নিল তাঁর বিখ্যাত প্রেমের কবিতা আকারে। দান্তে হলেন জগদ্বিখ্যাত।

[পাঁচ] **প্রতিক্রিয়া-সংগঠন (Reaction-Formation) :** অনেক সময় ব্যক্তি তার অবদমিত ইচ্ছাকে অস্বীকার করার জন্য সেই ইচ্ছার ঠিক বিপরীত মনোভাব প্রকাশ করে, বা ঐ ইচ্ছাপ্রসূত আচরণের ঠিক বিপরীত আচরণ সম্পন্ন করে। এই জাতীয় কৌশলকে বলা হয় প্রতিক্রিয়া-সংগঠন। নেতিবাচক মনোভাবের সঙ্গে এর পার্থক্য হ'ল—নেতিবাচক মনোভাবে কিছু

করতে বা বলতে না বললে তার বিপরীত আচরণটি শিশু বা ব্যক্তি করবে না। কিন্তু প্রতিক্রিয়া সংগঠনে তার মনোভাবটি সে সব সময় ব্যক্ত করে, আচরণটি সব সময় সম্পন্ন করার চেষ্টা করে। কেউ হয়তো খুব ভয় পেয়েছে। প্রতিক্রিয়া সংগঠনে সে বলছে না, না, ভয় কি? ভয় পাই নি। যৌন ইচ্ছা যখন অবদমিত হয়, তখন তা যৌন ভীতির রূপ নেয়। কমপ্লেক্সের ফলে শিশু মনে পিতার প্রতি যে ঘৃণা বা বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়, প্রতিক্রিয়া সংগঠনের ফলে তা রূপান্তরিত হয়ে যায় পিতার প্রতি অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ বা মনোযোগে। এই কৌশলে যে কেবলমাত্র অবাঞ্ছিত প্রবণতাটি বন্ধ হচ্ছে, তা নয়; বিপরীত একটি প্রবণতার উদ্ভব হচ্ছে, যা কিছুটা বাঞ্ছিত। শেক্সপীয়ার বলেছেন: "কোন কিছুর তীব্র অসম্মতি বা আপত্তি অপরাধকে প্রমাণিত করে।" অতিরিক্ত ভোগের মধ্যেই মানুষের মনে ত্যাগের ইচ্ছা জাগে। অধর্মই তাকে ধর্মের দিকে টানে। যাদের মনে অপরাধ প্রবণতা আছে, তারা অপরাধীদের গুরুতর শাস্তি বিধানের কথাই বলে থাকে। যাদের কিছু চারিত্রিক দুর্বলতা থাকে, তারা অন্যের সামান্যতম চারিত্রিক ত্রুটিকেও খুব বড় করে দেখে।

এবার আসা যাক পলায়নমূলক কৌশলগুলির কথায়। এগুলির মধ্যে দিবাস্বপ্ন, অভেদীকরণ, প্রক্ষেপণ, অপব্যাখ্যান বা যৌক্তিকরণ, পলায়ন প্রবৃত্তি, তীব্র অন্তর্মুখীতা ইত্যাদিই প্রধান।

[এক] **দিবাস্বপ্ন** (Fantasy or Day dreaming): ইদমের যে সমস্ত বাসনা-কামনা-ইচ্ছা বাস্তবে তৃপ্ত হতে পারে না, ব্যক্তি সেগুলিকে দিবাস্বপ্ন বা কল্পনার মাধ্যমে আংশিক ভাবে তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। বাস্তবের অসাফল্যকে কল্পনার সাফল্যে নিবিক্ত ক'রে ব্যক্তি আনন্দ উপভোগ করে, পূর্ণতার আস্বাদন গ্রহণ করে। দিবাস্বপ্নের সাহায্যে ইদমের ইচ্ছাগুলির আংশিক তৃপ্তিদান ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল; কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত দিবাস্বপ্ন মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই কিছু না কিছু দিবাস্বপ্ন দেখে থাকেন। লটারীতে টিকিট কেনার পর প্রত্যেকেই ভাবেন—প্রাইজ একটা এবার উঠবেই। সঙ্গে সঙ্গে টাকার হিসাব এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনাও তৈরী হয়ে যায়। আমাদের চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে যে ফাঁকটি থাকে, তা এই দিবাস্বপ্নের সাহায্যেই ভরাট করা হয়ে যায়। তেমনি প্রাপ্ত যৌবনদের অনেক যৌন কামনা বিভিন্ন ভাবে দিবাস্বপ্নের মাধ্যমে পরিতৃপ্তি লাভ করে।

[দুই] অভেদীকরণ (Identification) : ব্যক্তির মধ্যে হীনমন্যতার বোধ থাকলে সাধারণতঃ এই কৌশলটি অবলম্বন করা হয়। এখানে ব্যক্তি অন্য কোন লোকের সাফল্য, কৃতিত্ব বা সম্মানকে তার নিজেরই সাফল্য, কৃতিত্ব বা সম্মান বলে মনে করতে থাকে। আমরা আমাদের খ্যাতনামা পূর্বপুরুষদের নিয়ে গর্ববোধ করি, তাঁদের সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে যাই। শৈশবে শিশু তার পিতার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চায়। আবার পিতামাতা সন্তানের সাফল্যকে নিজেদের সাফল্য বলে মনে করেন। বলেন—"হবে না, দেখতে হবে তো কার ছেলে!" অধিকাংশ যুবক-যুবতীর মধ্যেই বীরপূজা করার একটা প্রবণতা থাকে। সিনেমা যেয়ে ছেলেরা নায়কের সঙ্গে আর মেয়েরা নায়িকার সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে যায়। ফুটবল রসিকেরা খেলার মাঠে গোল হলে ভাবেন তারাই বুঝি গোল দিলেন! ছাত্ররা প্রায়ই শিক্ষক বা বিদ্যালয়ের সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে যায়। অভেদীকরণ হ'ল—ক্ষতিপূরণমূলক আচরণ। ভৃত্যের মনিবের সঙ্গে এবং ঝি মনিব-পত্নীর সঙ্গে একাত্মীভূত হয় বা তারা প্রভু-প্রভুপত্নীর সম্মান মনে করে নিজেদের। এদের আচরণও হয় দাম্ভিক। প্রভু বা প্রভু পত্নীর অসাক্ষাতে বা অনুপস্থিতিতে তারা তাঁদের জিনিসপত্র ব্যবহার করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এমন কি বিছানায় গড়িয়ে পর্যন্ত নেয়। এ প্রসঙ্গে একটি সত্য ঘটনার কথা উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। আমাদের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগে একজন নেপালী দারোয়ান ছিল যে সব সময় বেশ সাজগোজ করে থাকত আর মাঝে মাঝে ইংরেজীতে কথা বলত। আমরা কলেজ থেকে চলে এলে ও সমস্ত ঘর-দোর বন্ধ করে চাবি ওর কাছেই রাখত। একদিন কলেজ থেকে বাসাতে এসে দেখি একটা জরুরী কাগজ আনতে ভুলে গেছি। সঙ্গে সঙ্গে কলেজে গেলাম। তখনও দারোয়ান ঘর বন্ধ করে নি। দেখি, আমার ঘরটিতে আলো জ্বলছে। ঢুকে দেখি দারোয়ান সাহেব আমার চেয়ারে বেশ জাঁকিয়ে বসে সিগারেট টেনে চলেছেন। আরো আছে! বি.টি.-তে ভর্তি হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্ত। আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকারের চাপে কলেজ থেকে আগেই বাড়ী চলে আসি। মাঝে মাঝে অফিসের ভেতর একটা ছোট ঘরে বসে কাজ করি। সেদিনও তাই করছিলাম। দারোয়ানজী ছিল আমার ঘরে। এদিকে দারোয়ান জানে না যে আমি কলেজেই আছি। এহেন সময় একজন আবেদনকারীর প্রবেশ! সে দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা

করল: "প্রফেসার চট্টরাজ আছেন?" দারোয়ান তখন চেয়ারের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল কি চাই? ব্যাস, আবেদনকারী তাকেই প্রফেসার চট্টরাজ ভেবে নমস্কার করে ভর্তির জন্য আবেদন-নিবেদন করতে লাগলেন। দারোয়ান বলতে থাকে "আচ্ছা, দেখব চেষ্টা করে"—যেন সেই প্রফেসার চট্টরাজ।

আমরা এমন অনেককে জানি যাঁরা একটু উপর মহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বা আত্মীয়তা করতে চান; কিন্তু দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনদের স্বীকার করতেই চান না। এ-ও অভেদীকরণের জন্যই হয়ে থাকে।

[তিন] **প্রক্ষেপন** (Projection): প্রক্ষেপন বা প্রতিক্ষেপন কথাটির অর্থ হ'ল—বাইরে নিক্ষেপ করা। এই কৌশলে ব্যক্তি ইদমের অতৃপ্ত বাসনা কামনাকে বাইরের জগতের কোন বস্তুর উপর প্রক্ষেপিত বা প্রতিক্ষিপ্ত করে। আমরা অপরাধ করি, কিন্তু অপরাধের বোঝাটি অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাই। নাচতে জানি না—দোষ দেই উঠানের। ছেলে পরীক্ষায় ফেল করেছে। বাবা বললেন—প্রশ্ন কঠিন হয়েছিল। মা বললেন—ঐ মুখপোড়ার কাছে আমার বাছা তো টিউশনি পড়ে না, তাই ইচ্ছা করে ফেল করিয়েছে। ছেলের দোষ কেউ দেখলো না। সাধারণতঃ পরিবারের মধ্যে প্রক্ষেপনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কোন স্ত্রী হয়তো অচেতন মনে তার স্বামীকে ঘৃণা বা অপছন্দ করে। এই ঘৃণা তার মনে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করবে যে সে সকলকে বলবে—তার স্বামীই তাকে দেখতে পারে না, পছন্দ করে না, ঘৃণা করে। তেমনি কোন লোকের মধ্যে যদি তীব্র ধ্বংসাত্মক কামনা থাকে—যা সহজ পথে মুক্তি পায় নি, তখন তার এই ধারণাই হবে যে সকলে তার উপরই অত্যাচার করছে, নিপীড়ন করছে। এ ধরনের মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা নিপীড়নমূলক ভ্রান্তিতে (Delusion of persecution) ভুগছে বলা হয়।

[চার] **অপব্যাখ্যান** (Rationalisation): কোন একটি আচরণ করে ফেলেছি। বুঝতে পেরেছি—খারাপ হয়েছে, লোকে নিন্দা করবে। তখন আচরণটির আসল উদ্দেশ্য বা কারণটি গোপন করে তার চেয়ে ভালো ও সমাজ অনুমোদিত কোন উদ্দেশ্য বা কারণ দেখাই। এই হ'ল অপব্যাখ্যান। অবদমিত বাসনাগুলি চেতন মনে উঠে গেছে, সহজে আর অবদমিত হচ্ছে না। তখন সাফাই দিতেই হবে। বাসে ভাড়া দিলাম না। বন্ধু জিজ্ঞাসা করল—"ভাড়া দিলি

না !" ধরা পড়ে গেছি, বলতে হ'ল—"ভাড়া তো বের করেই রেখেছিলাম, কিন্তু যে বেজায় ভীড়, দিই কি করে ? তাছাড়া কণ্ডাক্টর তো চাইলে না !" যেন ভাড়া না দেওয়ার অপরাধ আমার নয়, কণ্ডাক্টরের না নেওয়াটাই অপরাধ। কালো মেয়ের দিকে কেউ তাকায় না ; তার মনে বড় দুঃখ। সে মনকে সান্ত্বনা দেয়,—বেঁচে গেছি বাবা, সকলের দৃষ্টি প্রদীপের আগুনে আর জ্বলতে হবে না। আমাদের একজন বন্ধুর বেশ বড় বড় কান ছিল। আমরা তাকে "রাজা মিডাস" বলে ক্ষ্যাপাতাম, সে বলত—"ওরে, এতে আমি আরো ভাল শুনতে পাই ; তাই তো আমি গানের সমঝদার।" ছেলে বাবার পকেট থেকে পয়সা সরিয়েছে। একটা অপরাধবোধ এল। সে মনকে যুক্তি দেখাল—ঐ পয়সাতে বাবা সিগারেট খেতেন, তাতে তাঁর শরীর খারাপ হতে পারত। আমি তো আইসক্রীম খেলাম, খাবার জিনিস। এতে কোন দোষ নেই। ছেলেরা রকে আড্ডা দেয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ! হয়তো মাঝে মাঝে খারাপ লাগে, বকুনী খায়। কিন্তু ওরা বলবে—কি করি বলুন, বাড়ীতে এক চিলতেও জায়গা নেই যে দু'দণ্ড বসি। বাধ্য হয়েই "রক কেলার" হতে হয়েছে।

[পাঁচ] **পলায়ন প্রবৃত্তি** (Withdrawal or Retreat) : ব্যক্তি যখন বুঝতে পারে যে, সে বাস্তব জগতে তীব্র সমালোচনা বা উপহাসের বিষয়বস্তু হতে চলেছে, তখনই সে বাস্তব জগৎ থেকে পলায়ন করার একটা মনোভাব গড়ে তোলে। তীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব ও প্রক্ষোভজনিত অস্থিরতার জন্যই ব্যক্তি বাস্তবের সম্মুখীন হ'তে ভয় পায়। এই কৌশলটির লক্ষণ হ'ল—লজ্জা, ভয়, নির্জনতা-প্রিয়তা, স্বল্পবাক প্রভৃতি। সন্ধ্যেবেলাতে পড়তে বসালেই ছেলেমেয়েদের দু'চোখে রাজ্যের ঘুম নেমে আসে। কিন্তু খেলা করতে দিলে ঘুম কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। পাপিয়ার যেদিন স্কুল যাবার ইচ্ছা থাকে না, সেদিন সকাল থেকেই তার শরীর খারাপ হয়, স্কুলের বাস চলে গেলেই শরীর ঠিক হয়ে যায়। তখন সে তার বিরাট পুতুলের সংসার দেখাশোনার কাজ শুরু করে অক্লান্ত ভাবে। বয়স্ক ব্যক্তি যখন কোন কাজ করতে অনিচ্ছুক হ'ন, তখন শরীর খারাপের দোহাই দেন। সামাজিক মেলামেশা যারা চান না, তারা কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চান না। শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে এড়িয়ে চলেন। সামাজিক কার্যাবলীর সঙ্গে পলায়নী মনোবৃত্তিটি যুক্ত হ'লে ব্যক্তির মধ্যে মানসিক অসঙ্গতি বা অপসঙ্গতি দেখা দ'য়। বাস্তব

থেকে সে সব সময় লুকিয়ে থাকতে চায়। কিন্তু আর লুকিয়ে থাকতেও পারে না, তখন আত্মহননের পথটি বেছে নিয়ে সব জ্বালা-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করে।

[ছয়] তীব্র অন্তর্মুখীতা (Extreme Introversion) : এই কৌশলে ব্যক্তি "আপনার মাঝে আপনা আবরি"—এই অবস্থায় থাকে। সে কেবল নিজের কথাই ভাবে—নিজের ব্যর্থতা, হতাশা, অসাফল্য, অসম্মান, দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের কথা। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নিরাপত্তার অভাব, বন্ধু-বান্ধবদের উপহাস, সমালোচনা ও আরও হাজার রকমের মানসিক উত্তেজনা। ফলে সে একেবারে বাস্তবের সম্মুখীন হতে চায় না। নিজের মধ্যেই সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। অনেকে একে কূর্ম-বৃত্তিও বলেন। এই সব ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্বল-চিত্ত, ভীরু ও নিরাশাবাদী হ'য়ে থাকেন। এর জন্য অনেক ক্ষেত্রে লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তিও লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষা ও অচেতন মন (Education and The unconscious) : ফ্রয়েডের পূর্বে অচেতন মনের অস্তিত্ব ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কেউই অবহিত ছিলেন না। মন বলতে কেবল চেতন মনকেই বোঝাত। শিশুর সমস্ত আচরণের ব্যাখ্যা করা হ'ত তার চেতন মনের পরিপ্রেক্ষিতে। যেমন—যে ছেলে মিথ্যা কথা বলে, চুরি করে বা ক্লাশ পালায়, ধরে নেওয়া হ'ত—সেগুলি সে চেতন মনের পরিচালনায় করত। ফলে তার আচরণের পরিবর্তনের জন্য তার চেতন মনের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তিত করার চেষ্টা করা হ'ত। সে কেন মিথ্যা কথা বলে, কেন চুরি করে বা কেন ক্লাশ পালায়, তার কারণ অনুসন্ধান করা হ'ত না; কেবল লক্ষণ দেখেই তার আচরণের একটা মনগড়া কারণ খাড়া করে সেই মত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হ'ত—যাতে সে আর মিথ্যা কথা না বলে, চুরি না করে বা ক্লাশ না পালায়। এ সব ক্ষেত্রে চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল নিছক লক্ষণভিত্তিক।

মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অচেতন মনের আবিষ্কার এক বিস্ময়কর ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই অচেতন মন নিয়ে এখনও প্রতিনিয়ত গবেষণা চলেছে। মানুষের বিভিন্ন আচরণের ব্যাখ্যা করতে, শিশুর অপসঙ্গতির কারণ নির্ণয় করতে বা শিক্ষাদান কার্যটি সুষ্ঠু করতে অচেতন মনোবিজ্ঞানের সাহায্য আজ অপরিহার্য। এই শাখা আমাদের সামনে নূতন জ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচিত করে দিয়েছে। মন সম্বন্ধে এত দিনের প্রচলিত ধারণা, বিশ্বাস ও জ্ঞান পরিবর্তিত

হয়েছে। মানব মন সম্বন্ধে আমরা এতদিন যে জ্ঞান আহরণ করে এসেছিলাম অচেতন মনোবিজ্ঞান তা মিথ্যা বলে প্রমাণ করেছে। মানব আচরণের উপর সচেতন মনের চেয়ে অচেতন মনের প্রভাব যে বেশী, তা আমরা বুঝতে পেরেছি; তাছাড়া সচেতন মনই যে মনের সামগ্রিক পরিচয় নয়—তাও জেনেছি। সচেতন মনের বাইরে চলে গেলেই যে বাসনা-কামনাগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায় না—তাও জেনেছি। আমাদের অতৃপ্ত বাসনা কামনাগুলি অচেতন মনে যেয়ে আশ্রয় নেয়; অবদমিত ইচ্ছাও অচেতনের রাজ্যে আশ্রয় পায়। এ সব অচেতন মনে থেকেও আমাদের চেতন মানসে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি করে—অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করে। ফলে আমরা অপসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করতে বাধ্য হই—আচরণের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। এই অস্বাভাবিকতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে **অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান** (Abnormal Phychology) নামে মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা।

অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান দেখিয়েছে যে ব্যক্তির অস্বাভাবিক আচরণের কারণ আছে তার অচেতন মনে। সেখানে অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্যই আচরণটি অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। অস্বাভাবিক আচরণের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান-সম্মত হওয়া প্রয়োজন। নিন্দা-প্রশংসা বা শাস্তি-পুরস্কারের সাহায্যে অস্বাভাবিক ও অপসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ পরিবর্তিত করা যায় না। এর মূলগত কারণটি আগে জানতে হবে। এই কারণটি জানতে হ'লে মনের অতলে ডুব দিতে হবে। (এর জন্য আজকাল শিশুদের অস্বাভাবিক আচরণ দূর করার জন্য শিশু পরিচালনাগার (Child Guidance Clinic) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।)

(অচেতন মন সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান অর্জন করার পর শিক্ষা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এখন পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করার সময় শিশুর আগ্রহ মনোভাব, চাহিদা, ইচ্ছা, প্রক্ষোভ প্রভৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে কারণ এইগুলিই অবদমিত হয়ে অচেতন মনে গেলে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হয়ে থাকে। শিক্ষার পদ্ধতির ক্ষেত্রেই মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি, ব্যক্তিমুখী পদ্ধতি ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে।)

শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তি সত্তার সুষম বিকাশ সাধন করা। কিন্তু ব্যক্তি-সত্তার বিকাশ অচেতন মনের উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল। অচেতন মনের ইচ্ছাগুলি যখন সামাজিক বিধিনিষেধের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে—তখনই ব্যক্তিসত্তা

সুষম ভাবে বিকশিত হচ্ছে বলা যেতে পারে। কিন্তু অচেতন মনের বাসনা-কামনাগুলি যদি বাস্তবের সঙ্গে সংঘাতের সৃষ্টি করে—তবে ব্যক্তির আচরণে অস্বাভাবিকতা, অপসঙ্গতি ইত্যাদি দেখা দেবে এবং তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশটি ব্যাহত হবে। ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য কি ভাবে ঠিক রাখা যায়—তা জানবার জন্য আজকাল মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের (Mental Hygiene) সাহায্য নেওয়া হয়। এক কথায় অচেতন মনোবিজ্ঞান এখন সব ক্ষেত্রেই মনোবিজ্ঞানী, শিক্ষক ও সাধারণ মানুষদের সাহায্য করে চলেছে।

এখন শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে এই মনোবিজ্ঞান শিক্ষককে কিভাবে সাহায্য করছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। শিশুর ব্যক্তিসত্তাটি ঠিক মত গড়ে তুলতে হ'লে শিক্ষককে শিশুর মনের সামগ্রিক পরিচয়টি জানতে হবে। সামগ্রিক মনের অর্থ হ'ল—চেতন ও অচেতন মনের সমষ্টি। শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি করতে হ'লে মনকে হতে হবে সুস্থ-সবল। শিশুর মন সুস্থ, সবল ও দুশ্চিন্তামুক্ত হ'লে তবেই সে কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে সমর্থ হয়। শিক্ষককে শিশুর মনের প্রতিটি স্তর এবং সেই সঙ্গে প্রতি স্তরের কার্য-কলাপ সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে, পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। মনে যখন কোন বিকর্ষণমূলক শক্তি না থাকে, তখনই মন সুস্থ থাকে। দুশ্চিন্তা, অমীমাংসিত সমস্যা, অতৃপ্ত বাসনা, কামনা প্রভৃতি মনের ভারসাম্য নষ্ট করে, মনের সুস্থতা ব্যাহত করে। সচেতন মনে কোন প্রকার দুশ্চিন্তা ও অচেতন মনে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকলে চলবে না। শিক্ষককে এর জন্যই শিশুমনটি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

অন্তর্দ্বন্দ্ব শিক্ষাকে ব্যাহত করে বলে শিক্ষার অগ্রগতিটিও ব্যাহত হতে বাধ্য। শিক্ষক যদি শিশুর অচেতন মনের খবর রাখেন, তবে অন্তর্দ্বন্দ্বের খবরও তিনি পাবেন, আর সেটি দূর করে শিক্ষার অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে পারেন।

অনেক সময় শিশুরা পরিবেশের সঙ্গে ঠিক মত সঙ্গতি সাধন করতে পারে না। তাদের এই সঙ্গতি সাধন করতে অসামর্থ্যের কারণটি কিন্তু থাকে অচেতন মনে। এর জন্য শিক্ষককে তাদের অচেতন মনের খবর রাখতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ছেলেরা হোমটাস্ক আনতে ভুলে যায়, পেন্সিলের শিস্ ভাঙ্গে, বই-খাতা নষ্ট করে। এর কারণ হতে পারে যে—শিশু শিক্ষক বা বিদ্যালয় সম্বন্ধে তার অচেতন মনে একটি ঘৃণা ও বিদ্বেষের মনোভাব পোষণ করে।

যতক্ষণ তার অচেতন মনের খবরটি অজানা থাকবে. ততক্ষণ এই কারণগুলি জানা যাবে না।

অনেক ছাত্র অতিরিক্ত অন্যমনস্ক, অমনোযোগী বা মেজাজী (ভাবপ্রধান ও আবেগপ্রধান) হয়ে থাকে। তারা প্রায়ই খিটখিটে হয়, কাউকে সহ্য করতে পারে না, যা পড়ানো হচ্ছে, তাতে মনোযোগ দিতে পারে না, বুঝতে চেষ্টা করে না, বিদ্যালয়ের নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে, ক্লাশ পালায়। এ সব কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বের লক্ষণ। কেন এ রকম করছে—তা তারা নিজেরাই জানে না। কিন্তু শিক্ষককে এর কারণগুলি জানতে হবে—আর জানতে গেলেই অচেতন মনটির খবর নিতে হবে। শিশুকে অন্তর্দ্বন্দ্বের হাত থেকে বাঁচাতে হবে, তাদের ইচ্ছা, বাসনা, কামনাগুলিকে অবদমিত হ'তে দেওয়া চলবে না। শিশুমনের উপর কঠিন নিয়ম শৃঙ্খলার জগদ্দল পাথর চাপানো চলবে না। শ্রেণীকক্ষে এবং তার বাইরেও ছাত্রকে যথেষ্ট স্বাধীনতার সুযোগ দিতে হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে—যে সমস্ত কমপ্লেক্স ও অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য শিশুর আচরণ অস্বাভাবিক ও অপসঙ্গতি-পূর্ণ হয়, সেগুলি দূর করার জন্যই শিক্ষককে অচেতন মনটি ভালো ভাবে জানতে হবে।

অচেতন মনোবিজ্ঞান শিক্ষাতত্ত্বকে আরো কয়েক দিকে সাহায্য করেছে। শিক্ষক জানতে পেরেছেন যে, শিশুর সচেতন মনটি তার অচেতন মন দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়। শিক্ষক শিশুর অচেতন মনটি জানার মাধ্যমে শিশুর সম্বন্ধে আরো ব্যাপক ও বিজ্ঞানসম্মত তথ্য অনুসন্ধান করতে সক্ষম হয়েছেন। অচেতন মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কমপ্লেক্সগুলি জানার পর শিক্ষক উদ্গমন, অনুভাবন, সহানুভূতি ও ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারের ফলে সেগুলি দূর করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন—শিক্ষাপথটি সুগম করতে হলে অন্তর্দ্বন্দ্ব আগে দূর করা প্রয়োজন।

শিক্ষক এখন জেনেছেন—শিশুর অপরাধ-প্রবণতার মূল কারণটি নিহিত থাকে তার অচেতন মনে। শিশুর পরিবেশের বিভিন্ন বিপরীতমুখী শক্তিগুলি তার অচেতন মনে যে ছাপ ফেলে, তার থেকেই এই অপরাধ প্রবণতার সূত্রপাত ঘটে। শিশুর অপসঙ্গতিপূর্ণ আচরণগুলি শিক্ষক এখন ঠিক মত জানতে পেরেছেন, তার কারণ নির্ণয় করতে পেরেছেন ও মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তার চিকিৎসা করতে পেরেছেন।

শিশুকে এখন অবাধ স্বাধীনতা দেবার কথা বলা হয়েছে। এতে তার ইচ্ছাগুলি অবদমিত হবার সুযোগ পায় না। শিশুর প্রশ্ন করার আগ্রহটিও নষ্ট করা চলবে না। প্রশ্ন করার সুযোগ দিলে তার ইচ্ছাগুলি মনের বাইরে আসার সুযোগ পাচ্ছে। অন্যথায় সেগুলি মনে থেকে যাবে, অবদমিত হবে ও নানাবিধ অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করবে।

শিক্ষকের প্রধান কাজ হ'ল—শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা। এর জন্য শিক্ষককে ব্যক্তিসত্তার সঙ্গতি সাধনের সমস্ত দিকগুলি ভালো করে জানতে হবে।

অচেতন মনোবিজ্ঞান থেকেই সৃষ্ট হয়েছে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের নীতি। প্রত্যেকটি ছাত্রই দোষ, গুণ, ইচ্ছা, আগ্রহ, প্রবণতা, ইত্যাদির দিক থেকে অনন্য। এই ব্যক্তিগত পার্থক্যের নীতি থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে।

অচেতন মনোবিজ্ঞান থেকেই জানা গেছে—শিশুর কোন কোন সমস্যামূলক আচরণের কারণ থাকে তার অচেতন মনে। এই সমস্যাগুলি মনোবিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। এর জন্য বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রচলন এত বেশী।

অচেতন মনোবিজ্ঞান শিশুর শৈশব-কালীন যৌনতা ও যৌন-শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষককে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে যৌনতার প্রভাব, শিক্ষার্থীর যৌন-চাহিদা, যৌন-বিকৃতি ও যৌনশিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষক যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছেন।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপে শিক্ষক অচেতন মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিচ্ছেন। এতে তিনি যেমন তাঁর ছাত্রদের ভালোভাবে বুঝতে পারছেন, তাদের সমস্যাগুলির কারণ নির্ণয় করতে পারছেন, তেমনি মনোবিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। শিশুর ব্যক্তিসত্তা যেমন তিনি গড়ে চলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ভালো করে চিনে শিক্ষক নিজের ব্যক্তিসত্তার স্বরূপটিও যাচাই করতে পারছেন। এক কথায়, অচেতন মনোবিজ্ঞান আধুনিক শিক্ষকের হাতে আধুনিকতম উপকরণ—একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

॥ এগার ॥

মানসিক স্বাস্থ্য ও অপসঙ্গতি

(Mental Hygiene and Maladjustments)

[Mental Hygiene has implications for all persons. In the broadest sense, the aim of Mental Hygiene is to assist individual in the attainment of fuller, happier, more harmonious and more effective existence.

—L. F. Shaffer

Mental Hygiene is the study of the personality of the individual and his qualifications and disqualifications—Thomas B. Moore.

Mental Hygiene is the study of the ways and means for keeping the mind healthy and developing—D. B. Clean.

Mental Hygiene is the science and art of avoiding mental illness and preserving mental health. It deals with correction and maladjustments and in doing so is inevitably drawn into determination of causes.

—H. R. Bhatia.

Investigation of the laws of mental health and the taking or advocacy of measures for its preservation—Dictionary of Psychology.

Maladjustment: The condition of an individual who is enable to adopt or adjust himself adequately to his physical, occupational or social environment, usually with repurcussions on his emotional life and behaviour—Dictionary of Psychology.]

মানসিক স্বাস্থ্য কাকে বলে? স্বাস্থ্য বলতে আমরা সাধারণতঃ দৈহিক স্বাস্থ্যের কথাই ব'লে থাকি। কিন্তু দৈহিক স্বাস্থ্যের যেমন প্রয়োজন আছে, মানসিক স্বাস্থ্যেরও তেমনি প্রয়োজন আছে। কিন্তু "মানসিক স্বাস্থ্য" সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত সমাজও এতদিন পর্যন্ত উদাসীন ছিলেন। শারীরিক স্বাস্থ্য যেমন দেহ-কেন্দ্রিক, মানসিক স্বাস্থ্য তেমনি মানসিক সুস্থতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য পরস্পর নির্ভরশীল। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানকে নিছক তথ্যমূলক কোন শাস্ত্র বলে মনে করলে ভুল হবে। এটিকে আমরা একটি প্রয়োজনমূলক বিজ্ঞান বলতে পারি।

মানসিক স্বাস্থ্য বলতে কি বোঝায়, তা নিয়ে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। মানব জীবনের মূল কথা হ'ল—সঙ্গতিবিধান।

বিভিন্ন জাতীয় বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিণ শক্তির সঙ্গে মানুষকে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। মানসিক স্বাস্থ্য বলতে আমরা ব্যক্তির মানসিক সমন্বয়ের কথাই বুঝিয়ে থাকি, যার সাহায্যে ব্যক্তি নিজের সঙ্গে, তার পরিবেশের সঙ্গে ও বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে সার্থক ভাবে সঙ্গতি সাধন করতে পারে। এই অর্থে আমরা মানসিক স্বাস্থ্য বলতে ব্যক্তির সঙ্গতি সাধনের ক্ষমতাটিকেই বুঝিয়ে থাকি। ব্যক্তির পরিবেশ বা মানসিক পরিস্থিতিটি সব সময় সহজ ও সরল থাকে না। তার মনের মধ্যে বিভিন্ন অন্তর্দ্বন্দ্বের আনাগোনাও চলতে থাকে। মানসিক স্বাস্থ্য বলতে ব্যক্তির সেইরূপ যোগ্যতার কথাও বলা হয়, যার সাহায্যে ব্যক্তি জটিল মানসিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি সাধন করতে পারে, মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বগুলি মিটিয়ে ফেলতে পারে এবং তার মানসিক সুস্থতা বজায় রেখে ভবিষ্যৎ জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করতে পারে। যে ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রকার অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই যার কথাবার্তা, আচার আচরণ বা ভাবনা-চিন্তার মধ্যে কোনপ্রকার অপসঙ্গতি, অস্বাভাবিকতা বা অসামাজিকতা দেখা যায় না, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী।

দৈহিক স্বাস্থ্যকে আমরা দুটি দিক থেকে বিচার করে থাকি। এক হ'ল—সংগঠনমূলক দিক, আর অন্যটি হ'ল—আচরণমূলক দিক। মানসিক স্বাস্থ্যেরও অনুরূপ দুটি দিক আছে। দৈহিক সুস্থতা বজায় রাখতে হলে দেহকে যত্নে রাখতে হয়, উপযুক্ত খাদ্য দিতে হয়, দেহকে যাতে কোন রোগ আক্রমণ না করতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। মানসিক স্বাস্থ্যটি সুস্থ রাখতে গেলেও মানসিক সংগঠনটিকে ব্যাধির আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখতে হবে, মনের উপযুক্ত খাদ্য বা খোরাক সরবরাহ করতে হবে। তবে এই খাদ্য সরবরাহের দিকটি সামাজিক হওয়া প্রয়োজন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানসিক স্বাস্থ্য মনের কোনপ্রকার স্থির বা অপরিবর্তনীয় অবস্থার কথা বোঝাচ্ছে না, বরং একটি গতিশীল অবস্থার কথাই বুঝাচ্ছে। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানকে এমন একটি প্রয়োগধর্মী বিজ্ঞানশাস্ত্র বলা যেতে পারে যাতে মানসিক সুস্থতা বজায় রাখার কতকগুলি নিয়মকানুন ও শর্তের উল্লেখ করা থাকে, ব্যক্তি কি ক'রে তার বিভিন্ন-ধর্ম-বিশিষ্ট পরিবেশের সঙ্গে সার্থক ভাবে সঙ্গতিসাধন করতে পারে—তার উল্লেখ থাকে। এ যেন ব্যক্তির সামনে একটি আদর্শ বা একটি নির্ভরযোগ্য মান যার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি তার

মানসিক অবস্থার মধ্যে একটা সুস্থ, স্বাভাবিক ও সমাজ অনুমোদিত মাত্রা বজায় রাখতে পারে। এই মাত্রা বজায় রাখার জন্য ব্যক্তিকে তার ইচ্ছা, বাসনা-কামনা, প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য : এখন দেখা যাক মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যটি কি? মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্যই হ'ল—সঙ্গতি-সাধন। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ব্যক্তির মানসিক সংগঠনটিকে এমনভাবে পরিমার্জিত করে যাতে তার মানসিক আচরণ, পরিবেশ ও সামাজিকতার পরিপ্রেক্ষিতে ঠিকপথে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। ব্যক্তি-মানসের জটিল প্রক্রিয়াগুলিকে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সহজ ও বাঞ্ছিত পথে যেমন পরিচালিত করে, তেমনি তার মনোজগতে কোন সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধানের উপযুক্ত পথ-নির্দেশও করে। তবে এই স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, সমাজকেন্দ্রিক। অর্থাৎ এই বিজ্ঞান কেবলমাত্র ব্যক্তির নিজস্ব তৃপ্তির সম্বন্ধেই আলোচনা করে না, ব্যক্তি যাতে সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সহাবস্থান করতে পারে, সামাজিক জীবনযাপন করতে পারে, সেদিকেও সর্বশেষ দৃষ্টি দিয়ে থাকে। এক কথায়, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ব্যক্তিকে সমাজের ও পরিবেশের অর্থাৎ বৃহত্তর জগতের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সার্থকভাবে সঙ্গতিসাধন করতে শিক্ষা দেয়। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ব্যক্তির জীবনকে সম্পূর্ণ, সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

আবার প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই অজস্র সম্ভাবনা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। সেগুলিকে যথাযথ ভাবে বিকশিত করাও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্য। এ ছাড়া ব্যক্তিকে মানসিক দ্বন্দ্বের হাত থেকে রক্ষা করা, স্বল্পতম প্রয়াস ও প্রচেষ্টায় ব্যক্তির ও সমাজের চরম তৃপ্তি আহরণ করা ইত্যাদিও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানেরই লক্ষ্য। প্রত্যেক মানুষের মনেই ঈর্ষা, বিদ্বেষ, সন্দেহ, কুটিলতা, আদিম ও আরণ্যক বাসনা ইত্যাদি বাসা বেঁধে থাকে। এ সবের প্রভাবেই তার আচরণ হয় অশোভন, অস্বাভাবিক ও অসামাজিক। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ব্যক্তিকে ঐ সমস্ত শক্তির সঙ্গে পরিচিত করে দেয় এবং সে যাতে তার বিচারশক্তি, বিবেচনা, প্রাক্ষোভিক সাম্য ও ধৈর্য বজায় রেখে আচরণটিকে শোভন, স্বাভাবিক ও সামাজিক পথে পরিচালিত করে, তার শিক্ষা দেয়। মানসিক

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য মানবজীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে স্বতন্ত্র নয়।•

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পরিধি : সমগ্র মানবজীবনই হ'ল মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পরিসর। মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত, জটিলতা, মনের অগ্রসরণ, পশ্চাদপসরণ প্রভৃতির উপর ভিত্তি করেই মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সুবিশাল সৌধটি গড়ে উঠেছে। মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মূল কাজই হ'ল ব্যক্তির সঙ্গে পরিবেশের যে সম্পর্ক তার প্রকৃতি, স্বরূপ ও ব্যক্তি এবং পরিবেশের সংঘাতের ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলি পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করা। ব্যক্তি-জীবনের বিভিন্ন দিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে জড়িত। ব্যক্তির শৈশব থেকে শুরু করে জীবনবিকাশের বিভিন্ন স্তর, তার বৈশিষ্ট্য, তার মানসিক দিকটির পরিচয়, তার সঙ্গে তার বাড়ী মাতা পিতা, ভাইবোন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ইত্যাদি সকলের সম্পর্ক, তার চাওয়া-পাওয়া, তার আগ্রহ, রুচি, প্রবণতা, কর্মসংস্থান, অবসর বিনোদনের উপায় ইত্যাদি সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পরিধির মধ্যেই পড়ে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্য : মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্যকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক এই দু'দিক থেকে আলোচনা করা যায়। ব্যক্তিগত লক্ষ্য হ'ল—প্রত্যেক ব্যক্তিকে মানসিক সুস্থতা প্রদান করা এবং সামাজিক লক্ষ্য হ'ল—ব্যক্তিকে সমাজ জীবনের উপযোগী একজন সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। ব্যক্তিগত দিক থেকে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের লক্ষ্য সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানী পিটার ব্লসের (Peter Blos) বক্তব্য হ'ল—শিশু যাতে তার অনুভূতির সঙ্গে তথ্যের, চিন্তা ও বাস্তবে বিচারকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে, সে চেষ্টা করাই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাছাড়া বর্তমান জগতের উত্তেজনা সহ্য করা, প্রক্ষোভগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার ও আচরণকে পরিমার্জিত করার শিক্ষা দেওয়াও মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের লক্ষ্য। এই বিজ্ঞান ব্যক্তিকে দ্বন্দ্ব, হতাশা ও বিপদের মুখোমুখী দাঁড়াবার ক্ষমতা দান করে।

সামাজিক দিক থেকে বিচার করলে বলা যায়—ব্যক্তিকে সদা পরিবর্তনশীল সমাজ জীবনের সম্পূর্ণ উপযোগী করে ব্যক্তিকে গড়ে তোলাই হ'ল মানসিক

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের লক্ষ্য। তবে এই দুটি লক্ষ্যই ওতপ্রোতো ভাবে জড়িত—একটিকে বাদ দিয়ে আর একটি লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব নয়।

সংক্ষেপে বলা যায়—মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্য হ'ল—ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও সমাজ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্পর্কটি স্থির করে ব্যক্তির মানসিক অসুস্থতা বা বিকার নির্ণয় করা, সমাজ-জীবনকে সুস্থ ও সুন্দর করে গড়ে তোলা, আর রোগ নিরাময়ের পদ্ধতি আবিষ্কার ও প্রয়োগ করে ব্যক্তিকে সুস্থ করে তোলা।

শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্য : শিক্ষার সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের যে শুধু একটি সম্পর্ক আছে, তা নয় ; সেই সম্পর্কটি অবিচ্ছেদ্য ও ঘনিষ্ঠ। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশ, আর মানসিক স্বাস্থ্যবিধির উদ্দেশ্য হ'ল শিশুর মনোজগতের অপসঙ্গতি দূর করে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথের বাধাগুলি অপসারিত করা। শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যাগুলিই হ'ল মানসিক স্বাস্থ্যবিধির সমস্যা (The problems of Mental Hygiene are allied closely with those of education)। আবার শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থবিজ্ঞানের উদ্দেশ্যও এক ও অভিন্ন। Encyclopaedia of Modern Education থেকে উদ্ধৃত করে বলা যেতে পারে—"The aim of modern education and of mental hygiene is essentially the same......a well adjusted child integrated with his environment, making good use of abilities and utilising the potentialities."

প্রত্যেকটি শিশুই এক একটি পরিবেশের অংশ। শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল—শিশু যাতে পরিবেশের সঙ্গে সার্থক ভাবে সঙ্গতিসাধন করে সমাজের একজন সুযোগ্য নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে—তার চেষ্টা করা। মানসিক স্বাস্থ্যবিধির উদ্দেশ্যও তাই। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান উভয়েই চেষ্টা করে শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনাগুলিকে পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত করতে। তাছাড়া কতকগুলি সু-অভ্যাস অর্জন করা, কু-অভ্যাস পরিহার করা, বিশেষ প্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার ব্যাপারে উভয়ের ভূমিকাই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল শিশুর শারীরিক ও মানসিক শক্তি ও সম্ভাবনাগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে তাকে আত্মবিশ্বাসী, আত্ম-নির্ভরশীল ও সামাজিক আচরণে অভ্যস্ত করা যাতে সে সমাজের একজন বাঞ্ছিত ও কল্যাণকামী নাগরিক হিসাবে পরিচিত হতে পারে। শিক্ষার

এই লক্ষ্যে উপনীত হ'তে হলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যটি সুন্দর, সতেজ ও রোগমুক্ত রাখতে হবে।

প্রাচীন শিক্ষাবিদেরা শিক্ষা বলতে কেবলমাত্র পুঁথিগত জ্ঞান অর্জন করা কাজটিকেই বোঝাতেন। শিক্ষার সার্থকতা ও কার্যকারিতা নির্ভর করত— ব্যক্তির অর্জিত জ্ঞানের পরিমাণের উপর। সে ক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োজন ও কার্যকারিতাকে স্পষ্টতঃই এত গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা নিছক পুঁথিগত নয়—ব্যবহারিকও বটে। এ শিক্ষা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; শিক্ষাই জীবন, জীবনই শিক্ষা। কাজেই শিক্ষার অর্থ বলতে এখন কেবলমাত্র জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্তীকরণ বোঝায় না, জীবনের সমস্যাগুলি প্রত্যক্ষ করার ও সেগুলিকে সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করার ক্ষমতা অর্জন করাকেও বোঝায়। তাছাড়া শিক্ষা বলতে এখন শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু সমন্বয়কে বুঝিয়ে থাকে। এর জন্য শিশুর বুদ্ধিগত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভগত সব রকম চাহিদার সুষ্ঠু বিকাশ ও পরিতৃপ্তি ঘটানোর প্রয়োজন। আগে শিক্ষা শিশুর চাহিদাগুলিকে পরিচালিত করত—এখন শিশুর চাহিদাগুলিই শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। শিশুর চাহিদাগুলি যাতে অবদমিত, অবহেলিত, অনাদৃত বা অতৃপ্ত হয়ে তার মনে দ্বন্দ্ব, কমপ্লেক্স বা অপসঙ্গতি সৃষ্টি করে, সেদিকে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর এই কাজের জন্য তাঁকে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবেই।

ব্যবহারিক দিক থেকেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মধ্যে প্রভূত সাদৃশ্য আছে। শিক্ষাদানকে সুষ্ঠু ও সার্থক করে তুলতে হলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতা না থাকলে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না—শিক্ষা তাদের নিকট ভীতিপ্রদ ও বিরক্তিকর হয়ে পড়বে। আর শিক্ষকের সুস্থতা না থাকলে তিনি শিক্ষাদান কার্যটি ঠিকমত সম্পাদন করতে পারবেন না। তাঁর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পর্কটিও সুস্থ ও স্বাভাবিক হবে না। তাছাড়া তিনি নিজেও শিক্ষাদান কার্যে কোন প্রকার তৃপ্তি অনুভব (Job Satisfaction) করতে পারবেন না।

শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা দেখা দেয়। অপরাধপ্রবণতা, অপসঙ্গতি, যৌন-কৌতূহল, যৌন-বিকৃতি এ সবই আমরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখতে পাই। এই সমস্ত সমস্যার কারণ নির্ণয় ও সমাধান করতে মানসিক

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষককে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। আবার শিক্ষক, মাতা-পিতা, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি অনেকের সহানুভূতিহীন রূঢ় আচরণের জন্য শিশুর মধ্যে নানাপ্রকার অসঙ্গতি সৃষ্টি হয়। তার মনে নানা প্রতিকূল প্রক্ষোভ জাগরিত হয়। এ সমস্ত বন্ধ করার ব্যাপারেও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান তার সাহায্যকারী হাতটি বাড়িয়ে দেয়। শিশুমনে তার পাঠ্যবিষয়, শিক্ষক, সহপাঠী বা বিদ্যালয় সম্বন্ধে একটা ভীতি ও দুশ্চিন্তার ভাব সৃষ্ট হতে পারে। এটি তার মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। আবার কোন কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা না করে শিক্ষার্থীর পাঠ গ্রহণের অক্ষমতাকে নিন্দা বা তিরস্কার করলে শিক্ষার্থীর মনে একটা প্রতিকূল প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর গৃহ ও পরিবেশের এবং সেগুলির প্রতি শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভের একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। এ সমস্তই শিক্ষককে জানতে হবে। শিশুর পাঠগ্রহণে যে অসাফল্য বা তার অক্ষমতা, এর মূলে কিন্তু তার মানসিক সুস্থতার অভাবটি বর্তমান থাবে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যদি যথাযোগ্য স্বাধীনতা না পায়, সে যদি অবহেলিত ও অনাদৃত হয়, তার প্রাপ্য সম্মান ও স্বীকৃতি থেকে যদি তাকে অন্যায় ভাবে বঞ্চিত করা হয়, তাহ'লে তার আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান গুরুতররূপে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তাছাড়া শিক্ষক যদি তার সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ না করে সহানুভূতিহীন নির্দয় আচরণ করে, তাহ'লে শিক্ষার্থী নিজেকে উপেক্ষিত ও অবাঞ্ছিত বলে মনে করবে। উভয় ক্ষেত্রেই তার মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হবে। গৃহ ও পরিবেশেও অনুরূপ ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে অপসঙ্গতি দেখা দিলে তার পক্ষে শিক্ষাগ্রহণ করা আর সহজ হবে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সমস্যাগুলির সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের সমস্যাগুলির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

মানসিক স্বাস্থ্য এবং গৃহ বা পরিবার : শিশু জন্মায় তার গৃহে। সেখানে সে বর্ধিত হয়, লালিত-পালিত হয়। তার প্রথম দিকের আচরণ-ধারা, কতকগুলি অভ্যাস অর্জন, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের ক্ষেত্রে তার পরিবার বা গৃহের অবদান কম নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্যালয়ে আসার পূর্বে শিশুর প্রাথমিক মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার দায়িত্ব গৃহ বা পরিবারেরই। বহু মনোবিজ্ঞানী এই মতই পোষণ করেন যে, শিশুর শৈশবে যে সমস্ত শক্তি তার

ব্যক্তিসত্তা গড়ার কাজটি শুরু করে, সেই শক্তিগুলিই পরিণত বয়সে তার ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। পরিবার এমন একটি সংস্থা যেখানে শিশুর ব্যক্তিসত্তা গড়ার কাজটি শুরু হয়। এইখানেই শিশু তার আবেগগুলি প্রকাশ করতে, নিয়ন্ত্রণ করতে ও পরিবর্তন বা পরিমার্জন করতে শেখে। তার অনুভূতি, চিন্তাধারা বা দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিবারের নির্দিষ্ট প্রবাহ ধরে প্রবাহিত হতে শুরু করে। আবার এখানেই সে স্নেহ, মায়া, মমতা, ভায়ের মায়ের ভালোবাসা, সহানুভূতি ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। গুরুজনদের প্রতি, সমবয়সীদের প্রতি বা তার চেয়ে ছোট যারা তাদের প্রতি কিরকম ব্যবহার করতে হয়—তাও শিশু শেখে তার গৃহ-পরিবেশে। গৃহ-পরিবেশের বিভিন্ন শক্তি যে তার মানসিক স্বাস্থ্যকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গৃহে শিশুকে নানা প্রকার পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়—সঙ্গতিসাধনের নতুন নতুন পথ খুঁজে বের করতে হয়। গৃহের মধ্যেই আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বাত্মক সঙ্গতি সাধনের প্রচেষ্টা যেমন পরিলক্ষিত হয়, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। এই পরিবেশের কোন সমস্যা বা শক্তি যদি শিশুকে পীড়িত করে, যদি তার পক্ষে সঙ্গতি সাধন করা সম্ভব না হয়, তবে তার মানসিক স্বাস্থ্যটি ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। শিশুর চারিদিকে কত লোক—মা, বাবা, ভাই, বোন, অন্যান্য আত্মীয় স্বজন, এদের সকলের প্রতি শিশুর যে মনোভাব ও এদের সকলের আচরণ-ধারা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। এক মাত্র সন্তান হলে শিশু পায় মাত্রাতিরিক্ত আদর। আবার বাড়ীতে যদি 'পুত্র-কন্যা আসে যেন বন্যা'—তাহ'লে শিশুর অদৃষ্টে জোটে নিদারুণ অবহেলা ও অনাদর। দুটিই সমান ক্ষতিকর। অতিরিক্ত আদর, চরম অবহেলা, উদাসীনতা, অতিরিক্ত নিপীড়ন, কঠোর শাসন-শৃঙ্খলা, মা-বাবার বিসদৃশ আচরণ, ভাইবোনদের মধ্যে ঝগড়া, পরিবারের নীতির দুর্বলতা বা অভাব ইত্যাদি নানা কারণে শিশুর মনোজগতে বিপর্যয় দেখা দেয় এবং তার মানসিক সংগঠনটি অসুস্থ ও বিকৃত হয়ে যায়। আবার যে গৃহে শিশুর মানসিক, সামাজিক, প্রক্ষোভমূলক নৈতিক দিকগুলির উৎকর্ষ সাধন করার চেষ্টা করা হয়—সে গৃহের শিশুর মানসিক দিক থেকে সুস্বাস্থ্যেরই অধিকারী হয়। কাজেই সমাজের ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে

শিশুকে সার্থক ভাবে গড়ে তুলতে হলে গৃহকেই অগ্রণী হতে হবে। বিপর্যস্ত গৃহ পরিবেশ সমাজকে অপসঙ্গতিপূর্ণ শিশু উপহার দিতে পারে। আবার কোন গৃহে যে কোন একজনের আচরণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা অসঙ্গত হলে—তার প্রভাব পরিবারের অন্য সকলের উপর পড়তে বাধ্য।

মানসিক স্বাস্থ্য ও বিদ্যালয়ঃ মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার ব্যাপারে গৃহের পরই বিদ্যালয়ের স্থান। আধুনিক যুগে আর বিদ্যালয়ের কর্মপরিধি তার নিজস্ব চারটি দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। শিক্ষার পরিধি বাড়তে বাড়তে গৃহ ও সমাজকেও পরিব্যাপ্ত করেছে। বিদ্যালয়ের মধ্যেও শিশুর সঙ্গতিসাধনের প্রচেষ্টা কম নয়। সেখানেও তার চারিদিকে রয়েছে সহপাঠী, সতীর্থ ও শিক্ষকবৃন্দ। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতি তার সামনে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করে। এগুলি শিশুর বিকাশমান মনের উপর গভীর দাগ কাটে এবং তার মনোজগতে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি করে। এসব ক্ষেত্রে সে যদি পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করতে না পারে—তাহ'লেই অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশু বলে সে চিহ্নিত হয়ে যায়।

বিদ্যালয়ে শিশু যে সমস্ত লোকের সংস্পর্শে আসে তারা তার ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এখানেই শিশু আত্মবিশ্বাস, আত্ম-নির্ভরতা ও আত্মপ্রত্যয় সম্পন্ন হবার শিক্ষা অর্জন করে। এখানের সমস্যার তাকে নিজে নিজে সমাধান করতে হয়—মা কিংবা বাবা তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন না। এখানে স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বাঞ্ছনীয় পথে সে এগিয়ে চলতে বাধ্য হয়। এই চলার পথে যে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন আসবে, সেগুলি ঠিকমত অপসারিত করতে পারলে তবেই সে মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়—অন্যথায় অপসঙ্গতি সম্পন্ন শিশুতে রূপান্তরিত হয়।

শিক্ষক, সহপাঠী বা বন্ধুবান্ধবদের আচরণও তার মানসিক স্বাস্থ্যকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। বিদ্যালয়ের পরিবেশটি যদি সুস্থ, আনন্দময় ও সহানুভূতিতে সিঞ্চিত থাকে – তবে তা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল হয়। অন্যদিকে—যদি এই পরিবেশটি নির্দয়, রূঢ়, নিপীড়নমূলক ও কঠোর শাসনের পক্ষপাতী হয়, তবে তা মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হবে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—অনেক শিশুর ক্ষমতা বা সাধ্য থাকা সত্ত্বেও তারা পড়াশুনাতে তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারে না। শিক্ষক প্রথম

দিকে চেষ্টা করেন। পরে তাদের শিক্ষাদান-কার্যটি অসম্ভব মনে করে হাল ছেড়ে দেন। তাঁরা ধরে নেন—এ শিশু অমনোযোগী ও পড়াশুনা করতে অনিচ্ছুক। এ সব শিশু প্রকৃতপক্ষে অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশু। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ব্যাপক গবেষণা ও পরীক্ষণ থেকে এর কারণ জানা গেছে। সংক্ষেপে সেগুলি হ'ল—

● পাঠক্রমটি হয়তো শিশুর উপযোগী নয়। একই পাঠক্রম যে সব শিশুর পক্ষে সমান উপযোগী হবে সে কথা জোর করে বলা যায় না। মা বাবা জোর করে ছেলেকে ডাক্তার করবার জন্য বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি করেছেন। কিন্তু ছেলের মন কাব্যরস আস্বাদন করার জন্য উন্মুখ। এই যে চাওয়া-পাওয়ার বিরোধ, এ না মিটলে ছেলের মানসিক স্বাস্থ্য কি করে বজায় থাকে?

● সহপাঠীদের বিদ্রূপ বা বিরূপ সমালোচনার জন্য হয়তো তার মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। যে ক্লাশে প্রায় সব ছাত্রেরই একটা নির্দিষ্ট বয়স আছে—সেখানে যদি একজন অপেক্ষাকৃত কমবয়সী অথচ বুদ্ধিমান ছাত্র ভর্তি হয় তাহ'লে তার এই সমস্ত "বড়দা"'র বিদ্রূপের চোটে শিশুর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হতে বাধ্য।

● গৃহ পরিবেশও শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতি সৃষ্টি করে। বাড়ীর বয়স্কদের অশোভন আচরণ, ঝগড়া, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি তার শিশু মনকে নাড়া দেয় এবং তার মধ্যে দুঃশ্চিন্তা, ভয়, হিংসা, ঈর্ষা প্রভৃতি প্রতিকূল প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সে বদমেজাজী, খিটখিটে, অসহিষ্ণু ইত্যাদি হয়ে পড়ে। মা-বাবা এর কারণ খুঁজে না পেয়ে তার প্রতি যে রকম আচরণ করতে শুরু করেন তাতে তার মানসিক দ্বন্দ্ব আরো বেড়ে যায়।

পরিশেষে বলা যেতে পারে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োগ কেবলমাত্র যে শিশুদের ক্ষেত্রেই করা দরকার—তা নয়। প্রতিটি বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এর প্রয়োজন সমধিক। মানুষের জীবনেও তো মানসিক স্থিরতা, ধৈর্য ও সুস্থতার প্রয়োজন। গৃহ, সমাজ, কর্মজীবন প্রভৃতি কত বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গতিসাধন করে চলতে হয়। কত বিচিত্র পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয় আমাদের, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে আমাদের প্রত্যেককে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নীতি ও পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিধির তিনটি দিক : মানসিক স্বাস্থ্যবিধির যে সমস্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা আমরা আলোচনা করলাম তাতে এর তিনটি দিক সম্বন্ধে আমরা অবহিত হতে পারি। এই তিনটি দিক হ'ল—(১) **প্রতিকারমূলক** (Curative), (২) **প্রতিরোধমূলক** (Preventive) এবং (৩) **সংরক্ষণ-মূলক** (Preservative)। মানসিক স্বাস্থ্যবিধি প্রধানতঃ মানসিক সুস্থতা সংরক্ষণ করার চেষ্টা করে, তারপর রোগ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে এবং সর্ব শেষে রোগ দেখা দিলে তা নিরাময় করার চেষ্টা করে। এই তিনপ্রকার প্রক্রিয়ার জন্যই উপরোক্ত তিন প্রকার নাম দেওয়া হয়েছে। শিশুর সহজাত মানসিক স্বাস্থ্য যাতে সুস্থ থাকে, অক্ষুণ্ণ থাকে, প্রতিকূল পরিবেশের চাপে পড়ে যাতে তার মধ্যে কোন বিকৃতি বা অসামঞ্জস্য দেখা না দেয়, তা লক্ষ্য করাই হ'ল মানসিক স্বাস্থ্যবিধির সংরক্ষণমূলক দিকটির কাজ। এই দিকটি মানসিক সুস্থতা বজায় রাখার রীতিনীতি, নিয়ম-কানুন বা পরামর্শ সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়। রোগ সংক্রমণের আশংকা থাকলে প্রতিরোধমূলক দিকটি তা বন্ধ করার চেষ্টা করে। এই দিকটি ব্যক্তির নিজস্ব সমস্যা বা বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি দৃষ্টি দেয় এবং সেই সমস্ত সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার চেষ্টা করে। যে সমস্ত লোকের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা থাকে, তাদের বিশেষ সমস্যাগুলি পর্যবেক্ষণ করে সমস্যাগুলি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করাই হ'ল প্রতিরোধমূলক দিকটির কাজ। সবশেষে আসে প্রতিকারমূলক দিকটি। ঠিক সময়ে যদি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করা যায় তবে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে—তারা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে যায়। প্রতিকারমূলক দিকটি ব্যক্তির রোগ নিরাময় করার চেষ্টা করে তার বিশেষ সমস্যাগুলির উপযুক্ত সমাধানের মাধ্যমে। অর্থাৎ এই দিকটির আলোচ্য বিষয় হ'ল—মানসিক বিকৃতি, ত্রুটি, ভারসাম্যের অভাব, অপসঙ্গতি প্রভৃতি।

ব্যক্তির আচরণ-ধারা : মানুষের আচরণকে বলা যায় পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি সাধনের প্রচেষ্টা। এই আচরণগুলির মূলগত কারণ হ'ল তার বিভিন্ন চাহিদা। এই চাহিদা যেমন ভিন্ন জাতীয় হয়, তেমনি এর মাত্রাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণতঃ আমরা ব্যক্তির চাহিদাগুলিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করে থাকি—**জৈবিক চাহিদা** (Organic Needs) এবং **মানসিক বা মনো-**

বিজ্ঞানমূলক চাহিদা (Psychological needs)। জৈবিক চাহিদা হ'ল কতকগুলি সহজাত চাহিদা—যেগুলি দেহধারণ ও জীবন-যাপনের পক্ষে উপযোগী। এর মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র, জল, উত্তাপ, ঘুম, বায়ু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই চাহিদাগুলি তৃপ্ত না হ'লে ব্যক্তি দৈহিক দিক থেকে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে এবং শেষ পর্যন্ত তার অস্তিত্বটিও বিপন্ন হয়। মানসিক চাহিদাগুলি জৈবিক চাহিদাগুলির সংখ্যাতে যেমন বেশী তেমনি বেশী শক্তিশালী। এই চাহিদাগুলিও আবার দু'রকমের হতে পারে—ব্যক্তিগত ও সামাজিক। ব্যক্তিগত চাহিদাগুলি ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেমন—নিরাপত্তার চাহিদা, সক্রিয়তার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা প্রভৃতি। কিন্তু সামাজিক চাহিদাগুলি প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, যেমন 'সঙ্গলাভের চাহিদা', 'বন্ধুপ্রীতি ও ভালবাসার চাহিদা' প্রভৃতি।

ব্যক্তির বিভিন্ন জাতীয় চাহিদাগুলির যদি যথাযথ তৃপ্তিসাধন ঘটে, তবে ব্যক্তির মধ্যেও একটা পরিতৃপ্তির ভাব আসে এবং তার মানসিক সংগঠনটিও বাঞ্ছিত পথে বিকশিত হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিসত্তা বা মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশের পথে কোন প্রকার অন্তরায় সৃষ্ট হয় না। ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে সার্থক ভাবে সঙ্গতিসাধন করতেও সক্ষম হবে। কিন্তু যদি কোন কারণে কোন চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যায় তাহ'লে ব্যক্তির প্রক্ষোভমূলক সংগঠনটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তার মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই প্রাক্ষোভিক অসঙ্গতি ও মানসিক দ্বন্দ্ব তার বাহ্যিক আচরণকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করে এবং তার ফলে তার আচরণটি হবে অসঙ্গত, অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক। এই রকম আচরণের নাম দেওয়া হয়েছে অপসঙ্গতি (Maladjustment)। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে অপসঙ্গতি তখনই দেখা দেয় যখন ব্যক্তির কোন চাহিদা অপূর্ণ বা অতৃপ্ত থাকে। অবশ্য একথা সাধারণ ভাবে বা সার্বজনীন ভাবে বলা চলে না। আমাদের অনেক চাহিদা তৃপ্ত না হলেও তার থেকে অপসঙ্গতিরও সৃষ্টি হয় নি—এমন দৃষ্টান্তের সংখ্যা মোটেই কম নয়।

আমাদের চাহিদাগুলির তিন প্রকারের পরিণতির কথা আমরা জেনেছি। প্রথমতঃ চাহিদাগুলি পরিপূর্ণ ভাবে তৃপ্ত হতে পারে।

প্রথম ক্ষেত্রে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যটি অক্ষুণ্ণ থাকে এবং তার মধ্যে কোন

অপসঙ্গতি ঘটে না। ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হলে যাতে তার চাহিদাগুলি তৃপ্ত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তির মনোজগতে গুরুতর বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতে পারে, তার মানসিক ভারসাম্যটি নষ্ট হয়ে যায় এবং সে নানাপ্রকার অবাঞ্ছিত ও অননুমোদিত আচরণ করতে শুরু করে। চাহিদার গুরুত্ব অনুযায়ী অপসঙ্গতির মাত্রা নির্ধারিত হয়ে যায়। অনেক সময় অতৃপ্ত চাহিদাটি ব্যক্তির আচরণকে তেমন প্রভাবিত না করতেও পারে। কিন্তু এই চাহিদা ব্যক্তির অচেতন মন থেকে তার চেতন মনে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করে। এর ফলে তার মনে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং তার মধ্যে অপসঙ্গতির মাত্রা যথেষ্ট বেড়ে যায়।

তৃতীয় ক্ষেত্রে চাহিদার আংশিক পরিতৃপ্তি হয় বলে ব্যক্তির মধ্যে অপসঙ্গতির সম্ভাবনাটিও অপেক্ষাকৃত কম হয়। তবে যে অংশটুকু অতৃপ্ত থাকে তার জন্য অপসঙ্গতি দেখা দিতেও পারে।

ব্যক্তির মধ্যে যখন অপসঙ্গতি দেখা দেয় তখন যেমন তার মনে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মানসিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়—তেমনি তার আচরণ-ধারাটিও একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। এই জাতীয় আচরণকে পরিপূরক আচরণ বলা হয়। চাহিদাটি তৃপ্ত হ'লে ব্যক্তি একজাতীয় মানসিক তৃপ্তি লাভ করতে পারত। চাহিদাটি অতৃপ্ত থাকাতে সে ঐ তৃপ্তি লাভ করতে পারে না বলে আর একটি আচরণের মাধ্যমে অনুরূপ ও সমতুল মানসিক তৃপ্তি লাভ করার চেষ্টা করে। এই নূতন আচরণ-ধারাটি তাকে তার পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যে তো নিয়ে যেতে পারেই না—বরং বিপরীত একটি লক্ষ্যে উপনীত করে। কিন্তু ঐ লক্ষ্যটিও তাকে সেই রকম মানসিক তৃপ্তিই প্রদান করবে—যেমনটি সে পেত তার আসল বা প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছালে। এইভাবে ব্যক্তি তার আসল লক্ষ্যের বদলে একটি বিকল্প লক্ষ্য (Substituted Goal) গড়ে তোলে এবং আসল লক্ষ্যে পৌঁছানোর মাধ্যমে ঢেকে দেবার চেষ্টা করে। দুধের বদলে পিটুলীগোলা জল খেয়ে দুধ খাওয়ার তৃপ্তিটি অনুভব করে।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে অপসঙ্গতিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তিনটি স্তর পাচ্ছি। প্রথমতঃ প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যক্তির সম্পূর্ণ বা আংশিক অক্ষমতা —যেটির জন্য ব্যক্তি নিজে বা তার পরিবেশের বিভিন্ন শক্তি দায়ী; দ্বিতীয়তঃ প্রকৃত লক্ষ্যের পরিবর্তে একটি বিকল্প লক্ষ্য স্থির করা এবং তৃতীয়তঃ বিকল্প

লক্ষ্যে পৌঁছাবার উপযোগী পরিপূরক আচরণ (Compensatory Behaviour) স্থির করা ও তার সম্পাদন। অপসঙ্গতির অর্থই হ'ল অতৃপ্ত চাহিদার তৃপ্তি-সাধন আর অপসঙ্গতিমূলক আচরণ হ'ল প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছাবার উপযোগী আচরণের পরিবর্তে বিকল্প লক্ষ্যে পৌঁছাবার পরিপূরক আচরণ সম্পাদন।

একটা উদাহরণ দিলে জিনিসটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। ধরা যাক একটি ছেলে পরীক্ষাতে ভাল রেজাল্ট করে সকলের কাছে তার কৃতিত্বের ও সামর্থ্যের স্বীকৃতি পেতে চায়। এক্ষেত্রে তার চাহিদা হ'ল—সকলের স্বীকৃতি আদায় করা এবং তার উপযোগী আচরণ হওয়া উচিত ভালোভাবে পড়াশুনা করা যাতে রেজাল্ট ভালো হয়। এখন যে কোন কারণে সে পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারছে না। ফলে তার চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকেই যাচ্ছে। এক্ষেত্রে তার পক্ষে প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব নয়। অথচ স্বীকৃতি আদায় না করলে তার মানসিক তৃপ্তি হচ্ছে না এবং এর জন্য তার মনে প্রক্ষোভজনিত আলোড়নের সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে ছেলেটি বিকল্প লক্ষ্য ও পরিপূরক আচরণের আশ্রয় নেবে। এই বিকল্প লক্ষটি যেমন ভালো হতে পারে তেমনি খারাপও হতে পারে। পড়াশুনাতে স্বীকৃতি আদায় করতে না পেরে সে খেলাধূলা বা সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে সাফল্য অর্জন করে স্বীকৃতি আদায় করতে পারে। আবার অন্যভাবে, যেমন সহপাঠীদের ভয় দেখিয়ে নিপীড়ন করে, তাদের বই-খাতা চুরি করে বা বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করে সে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করবে—অর্থাৎ স্বীকৃতি আদায় করতে পারে। সে যেমনি বিকল্প লক্ষ্যের দিকে উদ্দীষ্ট পরিপূরক আচরণ সম্পন্ন করতে শুরু করল, তেমনি তার মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিল। কিন্তু বিকল্প লক্ষ্য ও পরিপূরক আচরণ যখন অন্য কারো ক্ষতি করে না এবং ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলজনক হয়, তখন তাকে আর অপসঙ্গতি বলা হয় না। অপসঙ্গতিমূলক আচরণের মাধ্যমে ব্যক্তি তৃপ্তিলাভ করলেও সে তৃপ্তি সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী হয়; এতে স্থায়ী মানসিক তৃপ্তি আসে না এবং মানসিক সমতাও দীর্ঘদিন অটুট থাকে না।

সব অতৃপ্ত চাহিদার থেকেই যে অপসঙ্গতির সৃষ্টি হয়—তা নয়, তা যদি হ'ত—তাহ'লে মানসিক দিক থেকে সুস্থ কোন মানুষই পাওয়া যেত না। আমাদের সকলের অনেক চাহিদাই অতৃপ্ত থাকে। তার জন্য মানসিক দ্বন্দ্ব ও প্রক্ষোভজনিত বিক্ষোভণ ঘটে ঠিকই, কিন্তু তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। তেমনি

আবার এমন কতকগুলি চাহিদা আছে যার অতৃপ্তির জন্য অপসঙ্গতির উদ্ভব অনিবার্য হয়ে পড়ে।

শিক্ষাক্ষেত্রে অপসঙ্গতি অবাঞ্ছনীয়—সুসঙ্গতি বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয়ের উঁচু শ্রেণীতে প্রাপ্তযৌবন ছেলেমেয়েরা তাদের কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের নানা রূপ-রস গন্ধে ভরা অনাস্বাদিত এক যৌব-রাজ্যে প্রবেশ করে। এদের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা থাকে যেগুলির অতৃপ্তি তাদের মনোজগতে এক নিদারুণ বিপর্যয় ও তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। এই সমস্ত ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশ সাধন করতে হ'লে শিক্ষককে তাদের চাহিদাগুলির প্রকৃতি, সেগুলির তৃপ্তির পথে বাধা, অতৃপ্তির কারণ ইত্যাদি সবই জানতে হবে এবং তাদের অপসঙ্গতিমূলক আচরণগুলি নিরাময় করার চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় তাদের শিক্ষা জীবন তো বটেই, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক জীবন-ধারাটিও বাঞ্ছিত পথ থেকে অবাঞ্ছিত পথে প্রবাহিত হতে বাধ্য।

অপসঙ্গতির কারণ (Causes of Maladjustment) : ব্যক্তির মধ্যে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দেখা দিলে তার প্রতিকার ও নিরাময়ের জন্য ঐ জাতীয় অপসঙ্গতির সম্ভাব্য কারণগুলি নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে এ কারণগুলি বাইরের থেকে বোঝা গেলেও প্রকৃত কারণগুলির স্বরূপ বাইরের থেকে সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। সেক্ষেত্রে এগুলির যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করার জন্য মনোবিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যাই হোক—অপসঙ্গতিমূলক আচরণের কয়েকটি প্রধান প্রধান কারণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যা—

[এক] **অন্তর্দ্বন্দ্ব (Conflicts) :** সব রকম অপসঙ্গতির মূলেই অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকে বলে এটিকে কোন একটি বিশেষ কারণ না বলে সব অপসঙ্গতির একটি সাধারণ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। নানা জাতীয় বাসনা, কামনা ব্যক্তিমানসে বিভিন্ন জাতীয় প্রক্ষোভ বা আবেগের সৃষ্টি করে। এই বাসনাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী হয়ে থাকে। এই সমস্ত পরস্পর-বিরোধী ইচ্ছা বা বাসনা-কামনাগুলি যখন অতৃপ্ত থেকে যায় এবং অচেতন মনে অবদমিত হ'য়ে যায়—তখনই অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। আসলে অন্তর্দ্বন্দ্ব একটি অপ্রীতিকর প্রক্ষোভ-নিষিক্ত মনোভাব ছাড়া আর কিছু নয়। ব্যক্তির মধ্যে যখন পরস্পরবিরোধী একাধিক চিন্তার বা বাসনার উদ্রেক হয়, কিংবা ব্যক্তির

কোন চাহিদা যখন পূর্ণ বা আংশিক ভাবে অতৃপ্ত থেকে যায়—তখনই তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় ব্যক্তি একটা অসাফল্য, ব্যর্থতা বা হতাশার মর্মবেদনায় পীড়িত ও ব্যথিত হতে থাকে। (অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে ব্যক্তি যে সব সময় সচেতন থাকে—তা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই অন্তর্দ্বন্দ্বটি ব্যক্তির অচেতন মানসে থেকে তার বাহ্যিক আচরণকে প্রভাবিত করে থাকে।)

আমরা সারাজীবন ধরে বাসনা-কামনার একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ অনুভব করে থাকি। এগুলি কখনও উত্তাল হয়—আবার কখনও বা স্তিমিত হয়ে যায়। কিন্তু সব বাসনা-কামনা চরিতার্থ করার ক্ষমতা আমাদের থাকে না। অন্যের সহায়তা বা সহানুভূতি ছাড়া সব বাসনা পূরণ করাও সম্ভব নয়। আবার অনেক বাসনা-কামনা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীতে অবাঞ্ছনীয়, কোন একটি আবার দেশ-জাতি-কৃষ্টি-সভ্যতা-সংস্কৃতি বা প্রচলিত প্রথার পরিপন্থী। অনেক ইচ্ছা আবার স্ব-বিরোধী বা পরস্পর-বিরোধী। এ জন্য সব সময় সব বাসনা-কামনাকে সাধারণ ও স্বাভাবিক পথে চরিতার্থ করা সম্ভব হয় না। শিশুমন প্রায়ই কল্পনার আশ্রয় নেয়। কিন্তু তবুও সে বাস্তব জগতে তো বটেই—কল্পনার জগতেও বাসনাগুলি চরিতার্থ করার পথে বাধার সম্মুখীন হয়।

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার সামাজিক, মানসিক ও দৈহিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সঙ্গতিসাধন করে চলতে হয়। তার নিজস্ব চাহিদা ও স্বাধীন আচরণ-প্রচেষ্টা তার এই সঙ্গতি-সাধনের কাজটিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত করতে সাহায্য করে। কিন্তু সব প্রচেষ্টাই যে আমাদের চাহিদাগুলির তৃপ্তি সাধন করে—এমন নয়। তাছাড়া নির্বিবাদে প্রচেষ্টামূলক আচরণ করার মত স্বাধীনতাও মানুষের থাকে না। এর ফলে আমাদের স্বাভাবিক আচরণ-ধারাটি ব্যাহত হয় এবং চাহিদাটিও অতৃপ্ত থেকে যায়। চাহিদার এই অতৃপ্তিজনিক ব্যর্থতার জন্য ব্যক্তির মনে প্রক্ষোভিক ভারসাম্যটি নষ্ট হয়ে যায় এবং এই প্রক্ষোভমূলক উত্তেজনা থেকেই তার মধ্যে দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। আবার অনেক সময় একটি বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য যে সমস্ত বিভিন্ন উপায়ের কথা ব্যক্তি চিন্তা করে, সেই সমস্ত উপায়গুলির মধ্যেও একটা বিরোধিতা দেখা দিতে পারে। এই বিভিন্ন বিরোধিতার জন্যও মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়ে থাকে। আবার শিশু যত বেশী সামাজিক দিক থেকে সক্রিয় হতে থাকে, তত বেশী মানসিক দ্বন্দ্ব

তার মধ্যে দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে Sherman-এর বক্তব্য হ'ল "Conflicts arise early in life as soon as the child becomes active socially."

সব রকম মানসিক দ্বন্দ্বই যে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, তা নয়। চাহিদার অতৃপ্তি প্রায় সকলের জীবনেই ঘটে থাকে, কিন্তু সবক্ষেত্রেই কি অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়? ব্যক্তির নিকট বিশেষ একটি চাহিদার গুরুত্ব কতখানি এবং ঐ চাহিদার অতৃপ্তি ব্যক্তিকে কতখানি বিক্ষুব্ধ করল—তার উপর নির্ভর করছে তার অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকৃতি ও তীব্রতা। অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি এই মানসিক দ্বন্দ্বের একটা সুষ্ঠু মীমাংসা নিজে নিজেই করে নিতে পারে। কিন্তু যখন ব্যক্তির অতৃপ্ত ইচ্ছা বা অবদমিত বাসনা ব্যক্তির মনে যে প্রক্ষোভমূলক উত্তেজনা সৃষ্টি করে, তার সঙ্গে বাস্তব জগতের সঙ্গতিসাধন করা সম্ভব না হয়, তবে তার মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। আগেই বলা হয়েছে—এই দ্বন্দ্ব সচেতনও হতে পারে আবার অচেতনও হতে পারে। অচেতন মানসের অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্যক্তির আচরণকে পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত করে এবং এই দ্বন্দ্বের সঠিক পরিচয় জানা অত্যন্ত কঠিন। ব্যক্তি নিজেও এর সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকে না। অচেতন মানসের এই দ্বন্দ্ব ব্যক্তির মধ্যে নানা প্রকার কমপ্লেক্স বা জটের সৃষ্টি করে এবং ঐগুলি তার জটিলতর আচরণ-ধারার মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

আগেই বলা হয়েছে—শিশুর সামাজিক চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই তার মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তবে দ্বন্দ্ব যে সব সময় খারাপ বা ক্ষতিকর তা নয়। এই দ্বন্দ্বই ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তাকে সঠিক ভাবে বিকশিত করতে পারে। অতি শৈশবে শিশু নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। কিন্তু সে যত বড় হ'তে থাকে, তত তার পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। তয়ে অহংসত্তাটিও শিশুর নিজস্ব দিক ছাড়াও বাইরের দিকে ধাবিত হয়। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে সে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য (I self) এবং অন্যদের (Other selves) সম্বন্ধে সচেতন হয়। এইভাবে তার ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও পরিবেশের সংস্পর্শে এসে শিশুমনে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্বটির সমাধান শিশু কি ভাবে করবে—তার উপর নির্ভর করবে তার ব্যক্তিসত্তার চূড়ান্ত রূপটি।

শিশুর ক্রমবিকাশের পথে দ্বন্দ্বগুলি সব সময় একভাবেই সৃষ্ট হয় না এবং

তাদের প্রকৃতিও এক রকম হয় না। শৈশব ও যৌবনাগমে যে সমস্ত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়—সেগুলি এক প্রকৃতির হয় না—আবার সংখ্যাতেও বিভিন্ন হয়। যৌবনাগমে দৈহিক, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক জগতে যে বিপ্লব আসে—শৈশবে তেমনটি হয় না। শৈশবকালে শিশুর মধ্যে যে সমস্ত প্রক্ষোভ জাগে, সেগুলি সহজ, সরল ও ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির। কিন্তু যৌবনাগমের প্রক্ষোভগুলি যেমন জটিল প্রকৃতির হয়, তেমনি দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই প্রক্ষোভের অধীনস্থ থাকার সময় প্রাপ্তযৌবনদের পক্ষে পরিবেশের সঙ্গে সার্থক ভাবে সঙ্গতিসাধন করা কষ্টকর হয়। তারপর যদি মাতাপিতা, অভিভাবক, শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির আচরণ সহানুভূতিমূলক না হয় তাহলে প্রক্ষোভগুলি অবদমিত করতে সে বাধ্য হয়। এ ক্ষেত্রে তার মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মানসিক দ্বন্দ্বগুলি যখন মনের অচেতন স্তরে আশ্রয় নেয়, তখন ব্যক্তির আচরণ অসংহত, অসংলগ্ন ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়; তখন মনঃসমীক্ষকের সাহায্য ছাড়া ঐ সমস্ত দ্বন্দ্বের সুষ্ঠু সমাধান করা সম্ভব হয় না।

[দুই] **নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব (Sense of Insecurity):** শিশুর মনে যদি কোন প্রকারে নিরাপত্তার অভাববোধ জাগ্রত হয়, তাহ'লে তার আচরণটি অপসঙ্গতিমূলক হয়ে পড়ে। যখন শিশু মনে করে যে সকলের নিকট অবাঞ্ছিত বা অবহেলিত, সকলে তাকে পরিহার করতে চায়—তখনই তার মনে এই মনোভাবটি জাগ্রত হয়। মাতা-পিতা, অভিভাবক, শিক্ষক সকলের চেষ্টা করা উচিত—যাতে শিশু-মনে নিরাপত্তার বোধটিই জাগ্রত হয়। শিশুকে নিরাপদে রাখাটাই বড় কথা নয়—তার নিরাপত্তার কথা যে সকলে চিন্তা করছে—এ ধারণাটিও শিশুর মধ্যে প্রবিষ্ট করাতে হবে। শিশুমনের নিরাপত্তাহীনতার বোধটি বয়স্ক ব্যক্তির মধ্যেও সঞ্চালিত হয়ে যায় এবং একটি অমূলক ভয়ের জন্য সে পরিবেশের সমস্ত উপাদানকেই তার অস্তিত্বের বিরোধী বলে মনে করে। এর ফলে সব জায়গাতেই ব্যক্তির আচরণটি অপসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে যায়। সে সব সময় নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়—সংকুচিত হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে পড়া বলতে ইতঃস্তত করে—সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে মেলামেশা বা খেলাধূলাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করে নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকতে চায়। তারা ভাবে অন্য সকলে বুঝি তাদের বিদ্রূপ, নিন্দা, সমালোচনা বা শাস্তিদান করার জন্যই প্রস্তুত হয়ে আছে।

খুব ছোট বেলাতে শিশুদের মনে এই অভাববোধ বড় বেশী জাগ্রত হয়। মা-বাবার সামান্য অবহেলা, শিশুর চাহিদাগুলির অতৃপ্তি, দৈহিক ও জৈবিক (Organic) সুখের অভাব, ভাই বা বোনের জন্ম, মা-বাবার রূঢ় ব্যবহার বা শাসনমূলক মনোভাব—এ সমস্তই নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব সৃজনের জন্য দায়ী। শিশু একটু বড় হ'লে পরিবেশের অন্যান্য শক্তিগুলির জন্য এই মনোভাব জাগ্রত হয়। কাজের কঠোরতা, অহেতুক নিন্দা বা তিরস্কার, অকারণে শাস্তি প্রদান ইত্যাদির জন্য এই বোধটি জাগে।

বিদ্যালয়েও বিভিন্ন কারণের জন্য শিশুর মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব সৃষ্ট হয়। শিক্ষকদের সহানুভূতিহীন আচরণ, সহপাঠীদের রূঢ় মন্তব্য, অশোভন আচরণ বা তীব্র সমালোচনা, গৃহকাজের কঠোরতা, শাস্তিদান, বিদ্যালয় পরিবেশে আনন্দের অভাব, ত্রুটিপূর্ণ শিখনের পদ্ধতি, বিদ্যালয়ে নিয়ম-শৃঙ্খলার ও ট্র্যাডিশনের অভাব ইত্যাদি কারণের এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। তেমনি বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণের জন্যও এই মনোভাব সৃষ্ট হ'তে পারে। সমাজের মধ্যে অসন্তোষ, কলহ, অসম্প্রীতি, জাতিগত বিরোধ, ধর্মগত বিরোধ, দারিদ্র্য, কুসংসর্গ, পিতামাতার আর্থিক দুরবস্থা, খাদ্যাভাব—এ সমস্তকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

এই মনোভাবটির জন্য যে অপসঙ্গতি দেখা দেয়—তা প্রকাশ পায় দিবাস্বপ্ন, প্রক্ষেপণ, হীনমন্যতাবোধ, প্রত্যাবৃত্তি, অভেদীকরণ প্রভৃতি আচরণের মাধ্যমে। এই মনোভাবটি জাগ্রত হ'লে প্রথমে এর মূলগত কারণটি নির্ণয় করতে হবে। তারপর শিশুর মন থেকে এই বোধটি অপসারিত করার চেষ্টা করতে হবে। এর জন্য তার গৃহ, পরিবেশ ও পরিমণ্ডলটি সুসংগঠিত হওয়া দরকার। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শিশু যেন বুঝতে পারে—সে অবহেলিত নয়—; তার সম্বন্ধেও অন্য সকলে চিন্তা করে, তার নিরাপত্তার কথা ভাবে। তবে এই বোধ যদি তীব্র হয় এবং অপসারণের অযোগ্য বলে মনে হয়—তবে মনঃসমীক্ষকের সাহায্য নেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

[তিন] আক্রমণাত্মক মনোভাব (Sense of Hostility) : অপসঙ্গতির আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হ'ল আক্রমণাত্মক মনোভাবের সৃষ্টি। শিশুমনে বিভিন্ন কারণের জন্য এই মনোভাবটি সৃষ্ট হয়। এটি চেতন ও

অচেতন, উভয় স্তরেই থাকতে পারে। এই বিশেষ মনোভাবটির জন্য শিশু-মনে যে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয় তার ফলে তার আচরণ-ধারায় ভারসাম্য ও সঙ্গতি নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য এই মনোভাব পোষণ করা যে অন্যায় ও অনুচিত, শিশু তা বোঝে। আর বোঝে বলেই সে তার আচরণ-ধারাটি এমন ভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করে যাতে এই মনোভাবটি প্রকাশিত না হয়। কারেন হর্নি বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে দেখিয়েছেন—এই মনোভাবটি থেকে নানা প্রকার মনোবিকারমূলক দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয়।

এই মনোভাবটি গড়ে ওঠে নানা কারণে। মাতাপিতার সন্তানের প্রতি আচরণ যদি পক্ষপাতমূলক হয়, যেখানে শাসনের মাত্রা অত্যন্ত বেশী বা যেখানে সন্তানকে অনাদর বা অবহেলা করা হয়, সেখানেই এই মনোভাবটির সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত দারিদ্র্য বা মাতাপিতার মধ্যেই যদি নিরাপত্তাহীনতার বোধটি জাগ্রত হয়—তাহ'লে তাদের পক্ষে সন্তানের প্রতি আচরণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হ'তেই পারে না। তাঁরা প্রায়ই স্বার্থপর ও সংকীর্ণমনা হ'ন এবং সন্তানের প্রতি তারা কখনও অতিমাত্রায় কঠোর, আবার কখনও অতিমাত্রায় কোমল হ'য়ে যান। এদের সন্তানদের মানসিক স্বাস্থ্যও কখনও ভালো হ'তে পারে না। ফলে তাদের মনে আক্রমণমূলক মনোভাবটি গড়ে ওঠে।

শৈশবে শিশুর আচরণ কিছুটা উদ্দাম, কিছুটা অসংযত হয়। সে চায় স্বাধীনতার অবাধ আনন্দ উপভোগ করতে। অনেক মাতাপিতা সন্তানদের "মানুষ" করার জন্য মাত্রাতিরিক্ত শৃঙ্খলার আশ্রয় নেন। তাঁরা সন্তানদের —"এটা করো না, ওটা করো না" ইত্যাদি বিধি-নিষেধের প্রাচীর তুলে শিশুর স্বাভাবিক ও স্বাধীন আচরণে বাধার সৃষ্টি করেন। তারা তার খেলা-ধুলা, কাজকর্ম, কথাবার্তা প্রভৃতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং তিরস্কার ক'রে তাদের আচরণ-ধারাটি নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেন। পিতামাতা যখন সন্তানদের নিয়ে কোন নেমন্তন্ন বাড়ীতে যান তখন তারা তাদের যে রকম পাখীপাড়া নির্দেশ দেন, তাতেই তাদের সন্তানদের প্রতি মনোভাবটি প্রকাশ পায়। তাছাড়া শিশু যদি প্রত্যাখ্যাত হয় বা তার আবদার যদি উপেক্ষিত হয় তাহ'লেও এই মনোভাবটি গড়ে ওঠে।

এই মনোভাবের অধীনস্থ হয়ে শিশুর আচরণটি বৈষম্যমূলক ও অবাঞ্ছিত হয়। আচরণ-ধারাও বিভিন্ন হ'তে বাধ্য। ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে মারামারি

করা, শ্রেণীতে দুর্বল সহপাঠীদের মারধর করা, সমবয়সীদের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করা—এ সব তো থাকেই ; শিশুর মধ্যে নানাপ্রকার নিষ্ঠুর আচরণও দেখা যায়। সে পোষা জীব-জন্তু বা পাখীকে নিপীড়ন করে আনন্দ পায়। সে জানে পশু-পাখী বা কীট-পতঙ্গকে নিপীড়ন করলে কেউ কোন প্রতিবাদ করতে পারবে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জড় পদার্থ ধ্বংসের মধ্যেও শিশুর এই আচরণটি প্রতিফলিত হয়। সেই বই-খাতা ছিঁড়ে ফেলে, পেন্সিল-কলম ভাঙ্গে, টেবিল-চেয়ার ভাঙ্গে কিংবা ছুরি দিয়ে কেটে নষ্ট করে, স্কুলের সম্পত্তি বিনষ্ট করে। এই সব ক্ষেত্রে যে সে সব সময় এই মনোভাবটি সম্বন্ধে সজাগ থাকে—তা নয়।

কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক মনোভাব এবং ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি জনিত হতাশার জন্যই প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এই বোধটি জাগ্রত হয়। আবার সমাজ-ব্যবস্থা যদি সুস্থ ও সুষ্ঠু না হয়—তাহ'লে অনেকের মধ্যেই এই মনোভাবটি জাগ্রত হয়। আমরা চারদিকে যে সমস্ত আক্রমণাত্মক ধ্বংস লীলা প্রত্যক্ষ করছি তার মূলগত কারণটি কিন্তু অনুসন্ধান করা হচ্ছে না। অথচ আমরা "দেশ গোল্লায় গেল" বলে চীৎকার করছি। কিন্তু কেন তারা এই রকম আচরণ করছে তা জেনে যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়—তাহ'লে এই সমস্ত জটিল সমস্যার অত্যন্ত সহজে সমাধান করা সম্ভব। আসল কথা হ'ল—প্রত্যেকের মধ্যে নিরাপত্তামূলক মনোভাবটির সৃষ্টি করতে হবে। শিশুমনে যে সমস্ত প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয় সেগুলি যেন স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশিত হয়—তার ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুর ভালো কাজগুলির প্রশংসা করতে হবে ; তাকে আত্মবিশ্বাসী ও আত্ম-প্রত্যয়সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে হবে। শিশুর স্বাধীন কাজে যতদূর সম্ভব কম বাধা দেওয়া যায়—ততই ভাল। পক্ষপাতমূলক আচরণ যতদূর সম্ভব বর্জন করতে হবে।

[চার] **অপরাধের অনুভূতি (Sense of Guilt) :** অপরাধের অনুভূতিও অপসঙ্গতির অন্যতম প্রধান কারণ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—ব্যক্তি তার আচরণের জন্য নিজেকে অপরাধী বা দোষী বলে মনে করে। এই অপরাধবোধ অনেক ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত হয় এবং ব্যক্তি অপরাধী, স্বীকৃতি বা অনুশোচনার মাধ্যমে তার হাত থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার অপরাধবোধটির কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারে না। ব্যক্তির

ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে নিকৃষ্টতর ধারণা থেকেই এ বোধটি জন্মায়। তারা সব সময় ভাবে এই বুঝি তাদের কথাবার্তা বা আচরণে কেউ অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হলেন। এ সব ক্ষেত্রে বিবেকের তীব্র কশাঘাতে তারা জর্জরিত হ'তে থাকে এবং এরই ফলে অপরাধবোধটি দৃঢ় হয়। সে তার নির্দোষ কাজের জন্যও নিজেকে অপরাধী মনে করে।

শিশুদের মধ্যেও এই অপরাধবোধের অনুভূতিটি প্রায়ই দেখা দেয়। এটি প্রকাশিত হয় নানা ভাবে। আত্মগ্লানি বা অহেতুক আত্মনিন্দার মধ্য দিয়ে এটি অভিব্যক্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে, তারা যে অপরাধ করেছে—এ কথাটি বার বার সকলকে শুনিয়ে থাকে। অনেকে আবার আত্মপীড়নের পথটি বেছে নেয়। নানাপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বা আরাম-বিরাম থেকে তারা নিজেদের সরিয়ে রাখে—এই ভেবে, যে ওগুলিতে তাদের কোন অধিকার নেই। অনেক বয়স্ক ব্যক্তি তীব্র অপরাধবোধজনিত অনুভূতির জন্য আত্মহত্যা ক'রে এ অনুভূতির হাত থেকে রেহাই পেতে চায়। আবার অনেকে "প্রতিফলন" (Projection) পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে নিজের অপরাধবোধটি অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।

শিশুদের ক্ষেত্রে এই অপরাধবোধ জাগরণের কারণ নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। সাধারণতঃ নিজের সম্বন্ধে নিম্নতাবোধই এই অনুভূতি জাগরণের প্রধান কারণ। শিশুর চারপাশে বয়স্ক ব্যক্তিদের তীব্র সমালোচনা, নিন্দা, তিরস্কার, ঠাট্টা-বিদ্রূপ বা অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা—এ সবই অপরাধবোধ জাগরণের জন্য দায়ী। তাছাড়া সাময়িক উত্তেজনার বশে শিশু যদি কোন অন্যায় কাজ করে ফেলে এবং তার জন্য যদি সব সময় তাকে ধিকৃত বা তিরস্কৃত করা হয় তাহ'লেও এই বোধটি জাগ্রত হয়।

মনঃসমীক্ষকদের মতে শিশুর অপরাধবোধ জাগরণের মূলে থাকে তার যৌনতাবোধ। আমরা প্রচলিত গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে শিশুর যৌন কৌতূহলকে প্রকাশিত তো হতেই দিই না বরং এ সম্বন্ধে কোন কথা যদি শিশু বলে তাহ'লে আমরা বলে থাকি—"ছিঃ অসভ্য কথা বলে না! বলা পাপ।" প্রকৃতপক্ষে যৌন শিক্ষা বা যৌন জিজ্ঞাসা আমাদের সমাজে একটি নিষিদ্ধ পাপ। যদি আমরা তা মনে না করি তাহ'লে বিবিধ ভারতীতে "নিরোধের" বা "পরিবার-পরিকল্পনার" বিজ্ঞাপন শুরু হলে যাতে ছেলেমেয়েরা

তা শুনে পাপ সঞ্চয় না করে, তার জন্ত রেডিওটি বন্ধ করে দিই কেন? আসলে আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব আছে বলে মনে হয়। ছোট শিশু স্বাভাবিক কৌতুহলের বশে তার যৌনাঙ্গটি নিয়ে নাড়াচাড়া করে। কিন্তু আমরা এর জন্ত তাকে ধমক, বকুনি, শাসানি এবং প্রহার দিয়ে তাকে কাজটি থেকে বিরত করার চেষ্টা করি। এতে তার কৌতুহল আরো বাড়ে। ফলে সে গোপনে সেই কাজগুলি করে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে অপরাধবোধটি জাগ্রত হয়। প্রাপ্ত যৌবনে এ বোধটি আরো বেড়ে যেতে পারে। আমরা ভুলে যাই—যৌন কৌতুহল শিশুর পক্ষে আর পাঁচটা কৌতুহলের মত স্বাভাবিক। এটি শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী নয়—সহায়ক! আমাদের সংস্কার, সমাজের শুচিবায়ুগ্রস্ত অনুশাসন যৌনশিক্ষাকে নিষিদ্ধ করে শিশুর অপরাধবোধ জাগরণের পথটি সুগম করে দিয়েছে।

শিশুকে জোর করে কোন ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য করলেও এই বোধটি জাগ্রত হয়। ধর্মীয় অনুশাসনগুলির মূলে থাকে অপরাধ এবং পাপ সম্বন্ধে একটা সচেতনতা এবং তার জন্ত শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তজনিত ভীতি। এ থেকেই শিশুমনে জন্মায় তীব্র অপরাধবোধ।

শিশুমনে অপরাধবোধ দূর করতে হলে তার আত্মবিশ্বাসটি ফিরিয়ে আনতে হবে এবং তার অহং সত্তাটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অপরাধবোধ হঠাৎ একদিনে জাগ্রত হয় না—দীর্ঘদিনের বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান ও আত্ম-গ্লানি, অন্যায় সম্বন্ধে অহেতুক সচেতনতা ইত্যাদি থেকে ধীরে ধীরে এই বোধটি জাগ্রত হয়। সহজভাবে এটি দূর করা সম্ভব না হলে মনঃশ্চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া উচিত। এর চিকিৎসায় জন্তও ধৈর্য, অধ্যবসায় ও সহানুভূতি একান্ত অপরিহার্য।

অপসঙ্গতির বিভিন্ন রূপ (Various Forms of Maladjustment) : যে সমস্ত শিশু সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে তার পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে সঙ্গতিসাধন করতে পারে না, তাদের আচরণ অপসঙ্গতিমূলক হয় এবং আচরণ-ধারাটিও তার বাঞ্ছিত সামাজিক পথটি ছেড়ে দিয়ে অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক পথে অগ্রসর হতে থাকে। এই সমস্ত আচরণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে থাকে। আমরা মানসিক কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় বিভিন্ন জাতীয় অপসঙ্গতিমূলক আচরণের কথা উল্লেখ করেছি। স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে

সচরাচর যে সমস্ত অপসঙ্গতিমূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়—সংক্ষেপে সেগুলি হ'ল—

[এক] **চুরি করা (Pathological Stealing) :** গুরুত্বপূর্ণ কোন চাহিদা অতৃপ্ত থাকলে তার তৃপ্তির জন্ম চুরি করা ; চুরির জন্যই চুরি করা নয়। অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্যও হতে পারে। অদম্য কৌতূহল ও সাময়িক লোভও এর কারণ হতে পারে।

[দুই] **মিথ্যা কথন (Lying, Pathological) :** অতৃপ্ত চাহিদার তৃপ্তি, আত্মস্বীকৃতি আদায় করা, অন্তর্দ্বন্দ্বের জাগরণ, শাস্তি বা তিরস্কার এড়ানোর উপায় ইত্যাদি হিসেবে মিথ্যাকথন শিশুদের অপসঙ্গতিমূলক আচরণের প্রধান লক্ষণ।

[তিন] **আক্রমণধর্মিতা (Aggressiveness or Bullying) :** সুষ্ঠু সঙ্গতি বিধানের অক্ষমতা, নিরাপত্তাহীনতার বোধ, আত্মস্বীকৃতির চাহিদাটি অতৃপ্ত থাকা ইত্যাদি কারণে শিশুর আচরণ ধারার মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দেয়।

[চার] **তীব্র ভীরুতা (Extreme Timidity) :** এখানেও আসে নিরাপত্তাহীনতার বোধ ও চাহিদার অতৃপ্তি। ইউং (Jung) এ জাতীয় আচরণের ক্ষেত্রে তীব্র অন্তর্মুখীতার (introversion) অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন।

[পাঁচ] **ক্লাশ থেকে পালানো (Truancy) :** এটি একটি অত্যন্ত সাধারণ অপসঙ্গতি। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের চাহিদাগুলি তৃপ্ত না হওয়া, সেখানে তাদের নিরাপত্তার অভাব বা সহপাঠী ও শিক্ষকের প্রতি আক্রমণধর্মিতার মনোভাবের জন্ম ছাত্ররা ক্লাশ থেকে পালায়। তাড়াড়া ত্রুটিপূর্ণ শিখন-পদ্ধতি, বেশী বুদ্ধ্যঙ্কবিশিষ্ট ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা না করা এবং বিশেষধর্মী মানসিক ক্ষমতাবিশিষ্ট ছেলেমেয়েদের বিশেষ ক্ষমতার উপযুক্ত পাঠ্যসূচীর ব্যবস্থা না থাকার জন্যও ছাত্ররা ক্লাশ পালায়। অতিরিক্ত নিপীড়নমূলক শাসন-ব্যবস্থা, কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা এ সবও ক্লাশ পালানোর কারণ।

[ছয়] **নেতিবাচক মনোভাব (Negativism) :** এটি হ'ল কোন আদেশ বা নির্দেশের বা প্রচলিত রীতি-নীতি ও নিয়ম কানুনের বিরুদ্ধাচরণ করা। ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিদ্রোহ বা প্রতিবাদের মনোভাব জাগ্রত হলে এই

মনোভাবটি সৃষ্ট হয়। এরও মূলে থাকে আক্রমণাত্মক মনোভাব, অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি।

[সাত] **যৌন অপরাধ** (Sex-offences) : এই অপরাধ বিভিন্ন জাতীয় যৌন আকৃতির রূপে দেখা দেয়। শিশুর অপরাধবোধের মনোভাবটিই মূলতঃ এর জন্য দায়ী—যদিও অন্তর্দ্বন্দ্বও কম দায়ী নয়।

[আট] **অহংকার** (Boasting) : অনেক শিশু অতিমাত্রায় অহংকারী হয়। এদের কোন চাহিদা অতৃপ্ত থাকলে বা স্বাভাবিক পথে চাহিদাটি তৃপ্ত না হ'লে অহেতুক অহংকারের মাধ্যমে আত্মস্বীকৃতি অর্জনের চেষ্টা করে। পোশাক-আষাক, চলা-ফেরা বা কথাবার্তায় তারা 'হাম্ বড়া' ভাবটি সযত্নে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে।

[নয়] **প্রতিবাদ-তর্ক** (Challenging) : অনেক শিশু নিজেদের সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করে থাকে। তাদের অভ্যন্তরস্থিত আক্রমণধর্মিতার মনোভাবটির জন্য তারা সব সময় প্রতিবাদ ও বিতর্কের ঝড় তুলতে চায়।

[দশ] **ধূমপান** (Smoking)* : এর মূলে থাকে শিশুর অপরাধবোধের অনুভূতিটি। বড়দের দেখে শিশুরা ধূমপান করার একটা ইচ্ছা অনুভব করে। কিন্তু বড়রা এর কুফলটি না বুঝিয়ে ছেলে "বখে গেছ" এই ধারণা নিয়ে তাকে শাস্তি দেন। ফলে সে গোপনে ধূমপান করার একটা মনোভাব অর্জন করে নেয়।

[এগার] **বাড়ী থেকে পালান** (Wandering) : শিশুর নিরাপত্তার অভাব বোধ ঘটলে সে বাড়ী থেকে পালিয়ে হয় কোন নির্জন স্থানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়, নয়তো উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়। এই মনোভাব তীব্র হ'লে তারা বাড়ী থেকে পালিয়ে অনেক দূরে কোন স্থানেও চলে যায়।

এসব ছাড়াও আরো বিভিন্ন ভাবে এই অপসঙ্গতিগুলি আত্মপ্রকাশ করে থাকে। শিশু অনেক ক্ষেত্রে বদ্‌মেজাজী, স্বার্থপর বা একগুঁয়ে হয়। বিদ্যালয়ে তার আচরণও শোভন ও সংহত হয় না। সে অবাধ্য হয়, ছাত্র ও শিক্ষকদের বিরক্ত করে থাকে, টেবিল-চেয়ার-দেওয়াল নষ্ট করে, প্রস্রাবখানা, পায়খানা ইত্যাদির দেওয়ালে কুরুচিপূর্ণ বাক্য, ছবি ইত্যাদি লেখে বা আঁকে। এসব আমরা অপরাধ-প্রবণতা অধ্যায়ে আবার আলোচনা করব। এ সব আচরণের পশ্চাতে শিশুর কোন না কোন মৌলিক চাহিদার অতৃপ্তি থাকে।

এগুলি দূর করতে হ'লে প্রথমে তাদের কোন্ কোন্ মৌলিক চাহিদা তৃপ্ত হয়নি, তা জানতে হবে। ঐসব চাহিদা তৃপ্ত করতে পারলে শিশুর অপসঙ্গতিটি দূর করা সম্ভব।

এখন শিশুর অপসঙ্গতিটির প্রকৃতি নির্ণয় করা ও তার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ধারণ করা সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল—

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান অপসঙ্গতিমূলক আচরণের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যতক্ষণ না অপসঙ্গতিটির মূল কারণটি নির্ণয় করা যাচ্ছে ততক্ষণ তা দূর করা সম্ভব নয়। কারণটি জানার পরই উপযুক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। অপসঙ্গতির সঙ্গে সাধারণতঃ একটি বাহ্যিক অভিব্যক্তি জড়িত থাকে। কিন্তু এই বাহ্যিক অভিব্যক্তি বিভিন্ন প্রকারের হ'তে পারে। কোন একটি বিশেষ মানসিক দ্বন্দ্বের জন্য বিভিন্ন প্রকার বাহ্যিক অভিব্যক্তি বিভিন্ন প্রকারের হ'তে পারে। কোন একটি বিশেষ মানসিক দ্বন্দ্বের জন্য বিভিন্ন প্রকার বাহ্যিক অভিব্যক্তি দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়। আবার অনেকগুলি মানসিক কারণ একত্রে কোন একটি বিশেষ আচরণকে ফুটিয়ে তুলতে পারে। যে ছেলে ক্লাশ থেকে পালিয়ে যায় বা বাড়ীর কাজ করে আনে না—বা মিথ্যা বলে তার আচরণ অপসঙ্গতিমূলক—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর জন্য তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সুষ্ঠু ও সুষম হয় না। কাজেই ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ সাধনের জন্যই তার এই অপসঙ্গতি দূর করা একান্ত প্রয়োজন। অপসঙ্গতির চিকিৎসা করতে হ'লে প্রথমে রোগ সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। তারপর ঐ তথ্য ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। শিশু ও বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মনঃসমীক্ষণ ও খেলা-ভিত্তিক চিকিৎসা—এই দুটি পন্থা অবলম্বন করা হয়। এখন তথ্য সংগ্রহ, তার সংব্যাখ্যান ও চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল।

তথ্য সংগ্রহ (Collection of Data) : অপসঙ্গতির মূলে আছে কোন সমস্যা। তথ্য সংগ্রহ করার অর্থ হ'ল শিশুর ঐ বিশেষ সমস্যাটি সম্বন্ধে একটা পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংগ্রহ করা। বিভিন্ন ভাবে এই তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। শিশুর পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির বিবরণ থেকে বা শিশুর কোন ডায়েরী রাখার অভ্যাস থাকলে তার থেকে সমস্যাটির একটা মোটামুটি চিত্র

পাওয়া সম্ভব। তবে মনোবিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে **সাক্ষাৎকার (Interview)** ও **অবাধ অনুষঙ্গের (Free Association)** পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

সাক্ষাৎকারের পর্যবেক্ষক সামনাসামনি শিশুর সংস্পর্শে আসেন। তিনি শিশুকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তার মুখ থেকেই সমস্যাটির বিবরণ সংগ্রহ করেন। তবে এর আগে সাক্ষাৎকারীকেও শিশুর আস্থা ও বিশ্বাসভাজন হ'তে হবে—র‍্যাপোর্ট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তাঁর শিশুর সঙ্গে আচরণ হবে বন্ধু-সুলভ ও সহৃদয়। শিশুর সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সাক্ষাৎকারী জেনে নেবেন শিশুর সমস্যা, তার প্রকৃতি ও স্বরূপ, তার উৎপত্তির কারণ ও সময় ইত্যাদি। তবে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সময় ও ধৈর্যের প্রয়োজন। সাক্ষাৎকারীকেও যথেষ্ট কুশলী ও দক্ষ হ'তে হবে তা না হ'লে শিশু তার সমস্যার প্রকৃত স্বরূপটি তাঁর নিকট উদ্ঘাটিত করবে না। কখনও হালকা আলাপ আলোচনা, কখনও গল্প, কখনও কথাবার্তা ইত্যাদি আচরণের মাধ্যমে দক্ষ সাক্ষাৎকারী শিশুর মানসিক দ্বন্দ্বের খবরটি টেনে আনবেন বাইরে। [দ্বিতীয় খণ্ডের ১০৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।]

এছাড়া আর একদল মনোবিজ্ঞানী এ ব্যাপারে অবাধ অনুষঙ্গের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। এঁরা বলেন অপসঙ্গতির মূল কারণ থাকে অচেতন মনে। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে অচেতন মনটির খোঁজ পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় সচেতন মনের। এইজন্য ফ্রয়েডপন্থী মনঃসমীক্ষকের অবাধ অনুষঙ্গের পদ্ধতিতে অচেতন মনটির খোঁজ-খবর নেওয়ার পক্ষপাতী।

[প্রথম খণ্ডের ২৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।]

অবাধ অনুষঙ্গের পদ্ধতিটি যথেষ্ট কার্যকরী ও সুফলদায়ক হ'লেও শিশুদের পক্ষে ততটা কার্যকরী হয় না। অ্যাড্‌লার (Adler) আবার এই পদ্ধতিটি স্বীকার করতেই চান না। তাঁর মত হ'ল শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতি তখনই দেখা দেয় যখন শিশুর নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধেও ধারণা ও বাস্তব সামর্থ্যের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই দ্বন্দ্বের খবর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেই সংগ্রহ করা যুক্তিযুক্ত।

সংব্যাখ্যান (Interpretation) : তথ্য সংগ্রহ করার পর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল—সেগুলির যথাযথ বিন্যাস ও ব্যাখ্যা করা। একেই বলা হয় সংব্যাখ্যান। তথ্যগুলির সঠিক বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে চিকিৎসা-পদ্ধতি অবলম্বন করা। বিশ্লেষণ ঠিক না হ'লে চিকিৎসা-বিভ্রাট অনিবার্য। অনেক সময় রোগী সঠিক তথ্য

সরবরাহ ক'রে না, প্রয়োজনাতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করে, প্রকৃত তথ্য গোপন করে বা তথ্যগুলি অবিন্যস্ত ভাবে বলে যায়। আসল কারণটির সঙ্গে যোগসূত্র আবিষ্কার করা এতে বরং শক্ত হয়ে যায়। সমীক্ষককে ধৈর্য, অভিজ্ঞতা ও বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে বিভিন্ন তথ্য থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সংগ্রহ করতে হবে, বিন্যস্ত করতে হবে ও তার থেকে রোগের কারণটি নির্ণয় করতে হবে।

আবার যারা মনঃসমীক্ষণের পদ্ধতিতে বিশ্বাসী, তাঁরা অচেতন মনের ক্ষমতার উপর বেশী আস্থাবান, তাঁরা চেতন মনের সংব্যাখ্যানের মাধ্যমে রোগের কারণ নির্ণয়ের পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন না। এরা চান সংব্যাখ্যানটি এমন হবে যাতে অচেতন মনের খোঁজটিও পাওয়া যায়। মানসিক দ্বন্দ্বটি আছে নির্জ্ঞান মনে—সেখানে পৌঁছাতে হবে। তবে এঁরা একথাও বলেন—চেতন মনটি অচেতন মন দ্বারাও যথেষ্ট প্রভাবিত হয়—বিশেষ বিশেষ সময়ে ও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। কাজেই সাক্ষাৎকার ও সংব্যাখ্যানের মাধ্যমে এই অচেতন বা নির্জ্ঞান মনটিকেই খুঁজে বার করতে হবে।

চিকিৎসা (Therapy): অপসঙ্গতিমূলক আচরণটির প্রকৃত স্বরূপটি জানবার পর তার কারণ নির্ণয় করাও অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। কারণ নির্ণয় করার পর ঐ সমস্যামূলক আচরণটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী অপসঙ্গতির কারণগুলি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে থাকেন। এর জন্য এগুলির চিকিৎসা পদ্ধতিও ভিন্ন জাতীয় হয়ে থাকে। কেউ কেউ অচেতন মনটি জানার মাধ্যমে **অবাধ অনুষঙ্গ** পদ্ধতিতে চিকিৎসা-ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। এ হ'ল "মনঃসমীক্ষণ-মূলক চিকিৎসা" (Psycho-analytical Theory)। কেউ কেউ আবার শিশুর আচরণ ধারাটি লক্ষ্য করে বিকল্প আচরণ ধারার ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেন। কিন্তু অপসঙ্গতিমূলক আচরণের সব চেয়ে ভাল চিকিৎসা পদ্ধতি হ'ল **"খেলা-ভিত্তিক চিকিৎসা"** (Play Therapy)। এখন এইটি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক—

খেলা-ভিত্তিক চিকিৎসা: খেলা হ'ল শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ। শিশুদের খেলার জন্য কোন প্রকার উৎসাহ দিতে হয় না। শিশু খেলার মধ্য দিয়েই নিজেকে প্রকাশ করে, খেলার সাথীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হয়, অধিকতর আত্ম-তৃপ্তি লাভ করে। এক কথায় বলা যায়—খেলার মাধ্যমেই শিশুর

স্বাভাবিক প্রাণ-শক্তি বিকশিত হয়, তার স্ফূর্তি, সক্রিয়তা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়, তার আশা আকাঙ্ক্ষা, কল্পনাশক্তি, প্রক্ষোভ, উত্তেজনা প্রকাশিত হয় আবার প্রশমিতও হয়। শিশুমনের নানা ভাবতরঙ্গ, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলায় তার খেলায় দোলনাটি দুলতে থাকে। খেলার মধ্যে শিশুর মানসিক দিকটির যেমন পরিচয় পাওয়া যায় তেমন আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এইজন্যই খেলা-ভিত্তিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা এখন সব দেশেই স্বীকৃত।

মনশ্চিকিৎসার আধুনিক পদ্ধতিতে ফ্রয়েডের কন্যা অ্যানা ফ্রয়েডই প্রথম খেলা-ভিত্তিক চিকিৎসার প্রচলন করেন। খেলার প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যই তাঁকে এই পদ্ধতির দিকে আকৃষ্ট করে। ছোট ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার বা আলাপ আলোচনা বিশেষ কার্যকরী হয় না কারণ তারা সব কথা গুছিয়ে বলতেই পারে না। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের মনোভাব জানার চেষ্টাটি পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছু হয় না। অথচ ঐ বয়সেই তাদের মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দেয়। ঐগুলির স্বরূপ ও কারণ জানা একান্ত প্রয়োজন। ঐ সব ছোট শিশুদের মনোবিকারের কারণ জানতে হ'লে তাদের খেলা বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাদের প্রক্ষোভ, অন্তর্দ্বন্দ্ব ইত্যাদি সব কিছু খেলার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে খেলা শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ বলে মনঃশ্চিকিৎসক নানা প্রকার খেলার সামগ্রী দিয়ে এবং খেলার ব্যবস্থা করে তার অন্তর্দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করেন। খেলার মাধ্যমে শিশু নিজেকে যত প্রকাশ করবে, যত বেশী ফুটিয়ে তুলবে ততই তার মানসিক স্বাস্থ্যটি সতেজ ও সুন্দর হবে—মানসিক সংগঠনটিও দৃঢ়তর হবে। খেলাই হ'ল শিশুর আত্মপ্রকাশের স্বাভাবিক মাধ্যম। এ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী W. M. Axline-এর বক্তব্য হ'ল 'Play Therapy is based upon the fact that play is the child's natural medium of self-expression. It is an opportunity which is given to the child to "play out" his feelings and problems, just as in certain type of adult therapy, an individual "talks out" his difficulties.

এই পদ্ধতিটির বৈশিষ্ট্য হ'ল—শিশু খেলতে ভালবাসে এটি স্বীকার করে নিয়ে শিশুকে বিভিন্ন জাতীয় খেলায় অংশ গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। খেলা চলাকালীন শিশুর বিভিন্ন জাতীয় আচরণ থেকে তার মানসিকতার

খবরটি নেওয়া হয়। শিশু কোন জাতীয় খেলা ভালবাসে, খেলার মধ্যে তার ভূমিকা কি জাতীয়, সে একা খেলতে চায়—না দল বেঁধে খেলতে চায়—খেলার মধ্যে সে কোন প্রতীক (Symbol) ব্যবহার করছে কি না, তার ঝোঁক কোন দিকে—ভাঙ্গা না গড়ার দিকে ইত্যাদি বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে অ্যানা ফ্রয়েড প্রমুখ শিশু মনোবিজ্ঞানীরা ক্রীড়া-বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিশুর অচেতন মনের অবদমিত বাসনা, কামনা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও নিরুদ্ধ প্রক্ষোভের সন্ধান নেবার চেষ্টা করেন। আমরা আগেই বলেছি—লিবিডোর দু'টি দিক আছে—প্রাণশক্তি (Eros) ও মারণশক্তি (Thanatos)। ক্রীড়া-বিশ্লেষণের মাধ্যমে মনঃশ্চিকিৎসক জেনে নেন—শিশুর লিবিডোটি কি জাতীয়। যে সমস্ত শিশু অপরের প্রতি প্রভুত্ব করার অতৃপ্ত বাসনাজনিত মনোবিকারে ভুগছে তারা খেলার মধ্যে নিজেরাই প্রধান হবার প্রবণতা দেখায়। আবার যে শিশু তার স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ না হওয়ার জন্য অসহায় মনে করে নিজেকে —সে খেলার মধ্যে নিজেকে প্রকট করার চেষ্টা করে না—সকলের পিছনে "বাড়তি খেলোয়াড়" হয়ে থাকতে চায়। নাটক-নাটকে খেলাতে এরা "নেপথ্যে মৃত সৈনিকের" ভূমিকা গ্রহণের পক্ষপাতী।

এই পদ্ধতিতে সাধারণতঃ অপসঙ্গতিপূর্ণ শিশুকে বিভিন্ন প্রকার খেলার সামগ্রী দেওয়া হয়। এ সমস্ত সামগ্রীর মধ্যে পুতুল, বাড়ী, গাড়ী, ছবি আঁকার, সাজ-সরঞ্জাম, মাটি, বালি, কাদা, কার্ডবোর্ড, কাঁচি, কাগজ ইত্যাদি থাকে। অনেক সময় এগুলি একটি খেলাঘরে সাজান থাকে। সরঞ্জামগুলি শিশুকে দেওয়া হয় ও তাকে ইচ্ছামত খেলা করতে বলা হয়। এরপরই শুরু হ'য়ে যায় মনশ্চিকিৎসকের কাজ।

শিশুকে খেলাঘরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসক বলেন—তুমি এখানে স্বাধীন ভাবে যে কোন জিনিস নিয়ে খেলা করতে পার। এখন তুমি খেলা শুরু কর। এর পর থেকেই চিকিৎসক শিশুকে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন। তিনি প্রথমেই লক্ষ্য করেন—তাঁর কথার উত্তরে শিশু কি ভাবে প্রতিক্রিয়া বা সাড়া দেয়। সে বেশ উৎসাহের সঙ্গে খেলা শুরু করে, না, বেশ বিলম্বে খেলা শুরু করে। তিনি আরো লক্ষ্য করতে থাকেন—শিশুর খেলাটি উদ্দেশ্যবিহীন, না, উদ্দেশ্য সম্পন্ন; সৃষ্টিমূলক, না, ধ্বংসমূলক। শিশুর এই খেলার মধ্যে তার মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন অভিব্যক্তি বা প্রকাশ ঘটছে কি না—তাও তিনি লক্ষ্য করেন।

শিশু খেলার মাঝে মাঝে কোনপ্রকার কথাবার্তা বলছে কি না—বা কি ও কা'কে উদ্দেশ্য করে কথা বলছে—তাও লক্ষ্য করা হয়।

মেলানী ক্লীন্ এবং আরো অনেক মনঃসমীক্ষকের পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গেছে, যে সমস্ত ছেলেমেয়ে মানসিক দিক থেকে অসুস্থ, তারা খেলা করতে ভালবাসে না। যদি বা তারা খেলায় যোগ দেয়, তবে তারা একা একা খেলা করে বা ভাঙ্গাচুরা, ধ্বংসাত্মক বা আঘাতাত্মক খেলা করতেই ভালবাসে। খেলা মানসিক রোগের প্রকৃতি নিরূপণ করতে সাহায্য করে। অনেকে খেলাকে একটা 'বিরেচক' যা ভেতরের নিরুদ্ধ বিষ বাষ্পের বোঝাটি কমিয়ে দেয়। ছোটদের খেলা সাধারণতঃ 'মনে করো যেন' (as if) জাতীয় খেলা। তারা কখনও সাজে কানাই পণ্ডিত, কখনও মা-বাবার ভূমিকা নেয়—কখনও রাজা, মন্ত্রী সাজে। যে সমস্ত অভাব তাদের বাস্তব জীবনে পূরণ হয় নি—তা তারা খেলার মধ্যে পূরণ করার চেষ্টা করে। যে ছেলে বাস্তব জীবনে পেটের অসুখের জন্য ভাল খাওয়া-দাওয়া করতে পায় না—তারা খেলার মধ্যে ধামা ধামা লুচি, ঘটি ঘটি দুধ, গাদা গাদা মাছ, মিষ্টি সব খেয়ে নেয়।

এখন একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি যেখানে খেলার মাধ্যমে মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বটি প্রকাশিত হয়েছে। আমার ছোট্ট মেয়ে পাপিয়াকে ওর দু'দাদা (তারাও খুব একটা বড় নয়) মাঝে মাঝে বেশ ক্ষ্যাপায়। যেদিন এটি চরমে ওঠে, সেদিন মেয়ে খুব রাগ করে গোমড়া মুখে বসে থাকে, কিছু বলে না, স্কুলেও যায় না। দাদারা স্কুলে চলে গেলে ও পুতুল নিয়ে খেলতে বসে—আর সেদিন 'স্কুল-স্কুল' খেলে। পুতুলদের একজনকে করে মাষ্টারমশায়, আর দু'জনকে দু'দাদা। তারপর পুতুল-মাষ্টার পুতুল-দাদাদের পড়া জিজ্ঞেস করেন, তারা বলতে পারে না। ফলে তাদের কপালে জোটে বিস্তর প্রহার আর তিরস্কার। এ ভাবে বেশ কিছুক্ষণ খেলার পর যখন তার অন্তর্দ্বন্দ্বটি ধুয়ে মুছে সাফ হ'য়ে যায়—তখন উঠে খাওয়া দাওয়া করে। বিকেলে দাদারা স্কুল থেকে ফিরে এলে একসঙ্গে আবার তিন জনে খেলা শুরু করে—সকালের কালো মেঘ দমকা হাওয়ায় যেন উড়ে গেছে।

এ প্রসঙ্গে আর একটি অত্যন্ত সুপরিচিত দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পাঁচ বছরের ছেলে নাম তার ডিক। ডিক সব সময় যেন বিমর্ষ, আনমনা

ও আত্মকেন্দ্রিক। তার মা বাবা তাকে নিয়ে এলেন চিকিৎসকের কাছে। প্রথম প্রথম সে মোটেই মুখ খুলত না। খেলাঘরে বালি নিয়ে খেলা করত নিজের মনে অথবা বক্সিং-এর ব্যাগে উদ্দেশ্যহীন ভাবে এলোপাথাড়ি ঘুসি মারত। সে মাঝে মাঝে উজ্জ্বল লাল রং দিয়ে ছবি আঁকত। ছবি মানে কতকগুলো বড় বড় মোটা হিজি বিজি বিজ আর কি! চিকিৎসক বুঝতে পারলেন—তার মনে কোন গভীর দ্বন্দ্ব রয়েছে—তার প্রকৃতিটিও ধ্বংসমূলক। তিনি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে ডিকের সঙ্গে আলাপ করা শুরু করলেন। এবার ডিকও তাঁর সঙ্গে কথা বলা শুরু করল। চিকিৎসক তাকে নানা ভাবে খেলার জন্য উৎসাহিত করতে লাগলেন এবং ডিকের অলক্ষ্যে তার উপর নজর রাখলেন।

একদিনের কথা: ডিক গেছে খেলাঘরে।, নানাপ্রকার পুতুল নিয়ে খেলা করছে সে। কেউ হয়েছে মা, কেউ বাবা—আবার একজন 'ডিক'। খেলতে খেলতে নিজের মনেই বিড় বিড় করে বকে চলেছে। বেশ কিছুক্ষণ খেলার পর ডিক হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে পড়ল। সে মা পুতুলটিকে টেনে বাইরে আনল। তারপর তার উপর এলোপাথাড়ি ঘুসি, চড় মারতে লাগল। কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর সে পুতুলটিকে জোরে আছাড় মেরে ফেলে বলল—"এইবার তুমি মর, মর, মর।" চিকিৎসক আড়ালেই ছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে সস্নেহে ডিককে কোলে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"ডিক, মাঝে মাঝে তোমার মায়ের উপর খুব রাগ হয়, তাই না?" তাঁর কোলে মুখ লুকিয়ে ডিক কান্নায় ফেটে পড়ল। তার এতদিনের নিরুদ্ধ প্রক্ষোভ যেন গলে গলে চোখের জলের আকারে বাইরে ভাসিয়ে গেল।

উপরের উদাহরণগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে—শিশুমনের অবদমিত চিন্তা ও নিরুদ্ধ প্রক্ষোভকে বিনা দ্বিধায় প্রকাশিত হবার সুযোগ দেওয়াই খেলাভিত্তিক চিকিৎসার মুখ্য উদ্দেশ্য। এর জন্য অবশ্য চিকিৎসককে শিশুর সঙ্গে একটি মধুর সম্পর্ক (Raport) স্থাপন করতে হবে। এই সম্পর্কটি স্থাপিত না হ'লে শিশু তার মনের কথা অকপটে চিকিৎসকের কাছে প্রকাশ করবে না। শিশু মনের অবদমিত প্রক্ষোভ, নিরুদ্ধ বাসনা, কামনা ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে গেলে চিকিৎসকের পক্ষে চিকিৎসা করা অত্যন্ত সহজ হ'য়ে যায়। খেলাভিত্তিক চিকিৎসা থেকে দু'ধরনের উপকার পাওয়া যায়। প্রথমতঃ খেলা বিরেচকের কাজ করে শিশুমনের নিরুদ্ধ প্রক্ষোভগুলি অভিব্যক্ত করে তার

মানসিক ধৈর্য ও সমতা রক্ষা বা পুনরুদ্ধার করে। দ্বিতীয়তঃ শিশুর মানসিক অপসঙ্গতি বা মনোযোগ দূরীকরণের জন্য তার এই মানসিক দিকটি—প্রক্ষোভ-মূলক দিকটি বিশেষ ভাবে জানা প্রয়োজন।

খেলাভিত্তিক চিকিৎসা-পদ্ধতি শিশু মনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে। খেলা অনেক সময় অনিয়ন্ত্রিত (uncontrolled) হয়। কিন্তু খেলাভিত্তিক চিকিৎসা-পদ্ধতিতে খেলাকে নিয়ন্ত্রিত (controlled) করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসক খেলা পরিচালিত করেন এবং শিশুকে খেলার ব্যাপারে নির্দেশ দান করেন। শিশুর আচরণে কোন প্রকার অবাঞ্ছিত লক্ষণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রিত খেলার মাধ্যমে চিকিৎসক ঈপ্সীত পরিবর্তন আনয়ন করে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করতে পারেন।

অপসঙ্গতি নিবারণ ও নিরাময়ের উপায় (Prevention and Cure of Maladjustment) : শিক্ষা ক্ষেত্রে অপসঙ্গতি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশুরাই "সমস্যামূলক" (Problem) শিশুতে পরিণত হয়। এদের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সর্বতো ভাবে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। মাতা-পিতা, শিক্ষক-অভিভাবক সকলকে এ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত হ'তে হবে এবং সহায়তার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। এদের সঙ্গে রূঢ় বা রুক্ষ ব্যবহার করলে ফল খারাপ হবার সম্ভাবনাই বেশী। অপসঙ্গতি নিবারণের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা যেতে পারে।

[এক] শিশুদের চাহিদাগুলি যথাসম্ভব তৃপ্ত ও পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে। যাতে তাদের এই চাহিদা বা প্রয়োজনগুলি অস্বাভাবিক ও অসামাজিক না হয়, সেদিকে পিতা-মাতা, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

[দুই] শিশুর পরিবেশটি যাতে উপযুক্ত ভাবে সামাজিক হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশু যাতে কু-সংসর্গে না পড়ে, তাও লক্ষ্য করতে হবে।

[তিন] শৈশবে শিশুর মধ্যে যাতে নিরাপত্তাজনিত অভাববোধটি না জাগ্রত হয় সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। তারা যেন মাতা-পিতা বা অন্যান্যদের - স্নেহ উপযুক্ত ভাবে পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

[চার] শিশুর মধ্যে ব্যর্থতা বা পরাজয়জনিত গ্লানি, হতাশাবোধ ইত্যাদি যাতে না জন্মায়—সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

[পাঁচ] শিশুকে বাস্তব জগতের সঙ্গে পরিচিত করাতে হবে। সে যেন অবাস্তব দিবাস্বপ্ন বা অলীক কল্পনার দাস না হয়ে পড়ে—সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া

প্রয়োজন। শিশুর মধ্যে সু-অভ্যাস, সংযমের দৃঢ়তা ইত্যাদি সদগুণের বিকাশ সাধন করতে হবে।

[ছয়] শিশু শিক্ষক-শিক্ষিকার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকার মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক থাকলে তবেই তাঁরা শিশুদের ঠিকপথে পরিচালিত করতে পারবেন। শিক্ষক-শিক্ষিকা এদিকে দৃষ্টি রাখলে ভাল হয়।

[সাত] কিভাবে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখা যায়—বা রোগ দূর করা যায়, সে বিষয়ে মাতা-পিতা বা শিক্ষক-শিক্ষিকার উপযুক্ত শিক্ষণ (Training) থাকলে ভাল হয়। বিভিন্ন জাতীয় অভীক্ষা মাঝে মাঝে প্রয়োগ করে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের খবর নিতে হবে।

[আট] শিশুদের মানসিক চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। Child Guidance Clinic-এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে।

এসব ছাড়া অপসঙ্গতি নিরাময়ের জন্য উপযুক্ত ও সুষম খাদ্য, যথোপযুক্ত ব্যায়াম, বিশ্রাম, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন (Sense training), সৌন্দর্যানুভূতি জাগরণ (Aesthetic appreciation), শিশুর কৌতূহল ও আগ্রহের তৃপ্তিসাধন, বিভিন্ন জাতীয় সমাজসেবামূলক ও কৃষ্টিমূলক আচরণ সম্পাদন, শিশুর চাহিদার তৃপ্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন, ভালবাসা ও স্নেহ ইত্যাদির প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ ব্যাপারে বিদ্যালয়গুলিরও কিছু করণীয় আছে। বিদ্যালয়ে শিশুকে সঙ্গতিসাধন করে চলার শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষা ঠিকমত দেওয়া হ'লে পরবর্তী জীবনে ও বৃহত্তর সমাজেও শিশু ঠিকভাবে সঙ্গতি সাধন করে চলতে পারবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশটিকেও সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এখানের আবহাওয়াটিও সুস্থ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঝগড়া, মারামারি, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যকে দুর্বল করে। ছাত্র শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্র সম্পর্কগুলি প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তা'ছাড়া এখানে যাতে বিভিন্ন সদ্‌গুণগুলি বিকশিত হয় সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা, আচার-আচরণ, নিয়মানুবর্তিতা, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করা ইত্যাদি সব কিছু যেন স্বাভাবিক ও জীবন্ত হয়। তা হ'লেই শিশুর ব্যক্তিত্বটি যথাযথ ভাবে বিকশিত হবে এবং সেও উপযুক্ত মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারবে।

॥ বারো ॥

॥ অপরাধ-প্রবণতা ॥
(Delinquency)

[Delinquent—used generally of the young offender against the law, but also where the offence is not so serious as to be designated crime.

—Dictionary of Psychology.

Broadly speaking the term delinquency refers to the breaking of some law. Such offences as stealing and the damaging of property may, as we have seen, occur in young children of under eight or nine, and in the case histories of clinics are sometimes listed as delinquencies. The term 'juvenile delinquent' however, usually relates to adolescents who are old enough to come under the purview of the juvenile courts : but psychologically it is impossible to fix a definite age at which 'responsibility' begins, if only because so much depends on mental rather than chronological age.

—C. W. Valentine.

Delinquency means—The act of falling away.

Many boys gangs are lawless and include boys with court records who must be classified as juvenile delinquents and potential criminal.

—Woodworth and Marquis.

Juvenile delinquency is sometimes defined as the violation of a law, that, if committed by an adult, would be a crime—Skinner.]

শিশু অপরাধপ্রবণতা শিক্ষাক্ষেত্রের একটি গুরুতর সমস্যা। অনেকে এটিকে শিক্ষামূলক সমস্যা না বলে সামাজিক সমস্যা হিসেবে অভিহিত করতে চান। প্রত্যেক সমাজের সভ্যদের আচরণ-ধারা কেমন হবে সে সম্বন্ধে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ ও নিয়ম কানুন থাকে। সমস্যার সৃষ্টি হয় তখনই যখন কেউ এই আচরণ-ধারাটি অনুসরণ না করে অন্যভাবে অবাঞ্ছিত বা অসামাজিক উপায়ে আচরণ করতে শুরু করে, শৈশব ও কৈশোরে যারা উপনীত হয়েছে, তারা অনেক ক্ষেত্রেই এরকম অবাঞ্ছিত আচরণ করে থাকে। সাধারণ দৃষ্টি-

ভঙ্গী থেকে বিচার করলে এই সমস্ত আচরণ-ধারাকে অসঙ্গত, অস্বাভাবিক ও অন্যায় বলেই মনে হয়। কিন্তু এই জাতীয় আচরণ যে সব সময় শাস্তি পাবার যোগ্য—তেমন মনে হয় না। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই এগুলিকে দুষ্টুমী বা ছেলেমানুষী বলে উড়িয়ে দিই—আবার কখনও তিরস্কার করে কর্তব্য সম্পন্ন করি। কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় নিছক ছেলেমানুষী বা দুষ্টুমী থেকে শুরু করে জঘন্যতম অপরাধ পর্যন্ত সব কিছু আচরণই অপরাধপ্রবণতার আওতার মধ্যে পড়ে। তবে একই আচরণ বিভিন্ন বয়সে সংঘটিত হয় বিভিন্ন ভাবে এবং তখনই আমরা সেগুলির ভিন্ন ভিন্ন নামও দিয়ে থাকি। খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যখন সমাজ-নির্ধারিত আচরণ-ধারা থেকে বিচ্যুত হয়—তখন তাকে বলি **সমস্যামূলক আচরণ** (Problem Behaviour); কিশোর বা প্রাক্‌যৌবন স্তরের এই আচরণ-ধারাটির নাম দেওয়া হয় **অপরাধ প্রবণতা** (Delinquency); আবার প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে এরই নাম দেওয়া হয় **আইনগত অপরাধ** (Crime) স্পষ্টতঃই অপরাধপ্রবণতাকে আইনগত অপরাধের মত অতটা গুরুত্বপূর্ণ বা নিন্দনীয় বলে মনে করা হয় না। অপরাধপ্রবণ ছেলেমেয়েদের বিচার করার জন্য স্বতন্ত্র বিচারালয় আছে—**কিশোর বিচারালয়** (Juvenile Court)। অপরাধ প্রবণতাকে আইনগত অপরাধ থেকে পৃথক করার কারণ হ'ল —মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন এই সমস্ত এই অপরাধপ্রবণ কিশোরদের অপরাধমূলক আচরণ করার পশ্চাতে এমন কতকগুলি কারণ আছে যার জন্য তারা নিজেরা দায়ী নয়। এই কারণগুলির প্রকৃতি নির্ণয় করে সেগুলি দূর করতে পারলে তাদের আচরণ-ধারা আবার সহজ, স্বাভাবিক ও বাঞ্ছিত পথেই পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে অপরাধপ্রবণ বিশ্লেষণ করলে চলবে না, পর্যবেক্ষণ করতে হবে অপরাধীকে। কেন সে ঐ রকম আচরণ করছে তা জানতে হবে।

অপরাধপ্রবণতা কেন ঘটে? (Causes of Delinquency): এখন দেখা যাক কি কি কারণের জন্য অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি হয়। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে বলা যায় বাল্যে ও কৈশোরে পারিবেশিক কোন প্রকার অপসঙ্গতির জন্যই এ জাতীয় আচরণ সৃষ্ট হয়। আবার শিশুর মৌলিক কোন চাহিদা অতৃপ্ত থাকার জন্য বা মনের কোন বাসনা-কামনা

অচেতনে অবদমিত হয়ে প্রক্ষোভজনিত ক্ষত সৃষ্টি হওয়ার জন্যও এই জাতীয় আচরণ সৃষ্ট হতে পারে। মনোবিজ্ঞানীরা অপরাধপ্রবণতার সমস্যাটি নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করে এসেছেন। তাঁদের সকলের সিদ্ধান্তের মূল কথা হ'ল— "অপরাধকে ঘৃণা কর, কিন্তু অপরাধীকে নয়।" তাঁরা বলেন অপরাধপ্রবণ আচরণের জন্ত তো কিশোর নিজে দায়ী নয়, তার মানসিক বিপর্যয়ই এর জন্ত দায়ী। এই বিপর্যয় কেন ঘটল—তা নির্ণয় করাই তো আসল কাজ। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ডাঃ সিরিল বার্টের (Dr. Cyril Burt) নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর 'Young Delinquent' গ্রন্থে অপরাধপ্রবণতার বিভিন্ন কারণের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে অপসঙ্গতি বিশেষতঃ প্রাক্ষোভিক অপসঙ্গতি ও অসমতাই এর প্রধান কারণ। এছাড়া আরো বিভিন্ন কারণও আছে। যাই হোক আমরা কারণগুলিকে মোটামুটি এই ভাবে ভাগ করতে পারি—

(১) বংশগত সূত্রে পাওয়া কারণ (Hereditary)

(২) পরিবেশিক কারণ (Environmental)

(৩) সামাজিক (Social)

(৪) অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক কারণ (Other Psychological)।

[এক] **বংশগত সূত্রে পাওয়া কারণ :** অনেকে এই মত পোষণ করেন যে—যেহেতু বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়, সুতরাং অপরাধীর সন্তানও অপরাধীই হবে। সন্তান তার বংশধারার মাধ্যমে এই অপরাধপ্রবণতার বীজটি পেয়ে থাকে। এটি যদি সত্যও হয়—তাহ'লে আংশিক সত্য। আসলে বংশগত সূত্রে শিশু যদি কোন রোগ, দোষ, ত্রুটি, অক্ষমতা বা অসম্পূর্ণতা পেয়ে থাকে—তাহ'লে তার মনে একটা হীনমন্যতা ও অসহায়তা বোধের সৃষ্টি হবে। সে যে আর পাঁচটি শিশুর চেয়ে অক্ষম, পৃথক এই অনুভূতিটি তার মধ্যে জাগবে যার ফলে তার মধ্যে অপসঙ্গতির সৃষ্টি হবে। এর ফলে সে কূর্মবৃত্তি বা শামুকধর্মিতা অথবা আক্রমণধর্মিতা যে কোন একটির দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে আচরণ করতে শুরু করবে যার নাম আমরা দিয়েছি অপরাধপ্রবণতা।

বংশগত সূত্রে পাওয়া কারণগুলিকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—শারীরিক কোন দোষ বা রোগ। অত্যন্ত দুর্বল, ভগ্নস্বাস্থ্য শিশুরা অপরাধ-প্রবণতার দিকে বেশী ঝুঁকে পড়ে। তারপর আসে একটানা কোন

রোগ (chronic disease)। এছাড়া দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা, ক্লান্তি, মৃগী রোগ, চোখের কোনপ্রকার রোগ, শোনার ত্রুটি, তোতলামী ইত্যাদিও এই পর্যায়েই পড়ে। বুদ্ধিকেও বংশগত সূত্রে পাওয়া কারণ হিসাবে ধরা যেতে পারে। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে—যেখানে দেবদূতেরা পা মাড়াতে ভয় পান, সেখানে বোকারা ছুটে যায়। H. H Goddard-এবং W. Healy-র ব্যাপক পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে অপরাধপ্রবণ কিশোরদের মধ্যে শতকরা ৩০ থেকে ৯০ জনই ক্ষীণবুদ্ধিবিশিষ্ট। কিন্তু A. F. Tredgold এর সিদ্ধান্ত এর বিপরীত। তিনি বলেন অপরাধ-প্রবণতার সঙ্গে উচ্চবুদ্ধির একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যাই হোক এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যারা ক্ষীণবুদ্ধি হয় তাদের অপরাধ করার দিকেই প্রবণতা বেশী। এরা সাধারণ মানুষের মত ন্যায়-অন্যায় বা ভালোমন্দের বিচার করতে পারে না। ফলে তারা কি করছে বা কি করতে চলেছে তা তারা নিজেরাই জানে না। আবার যারা উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন তাদের অজস্র চাহিদা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতৃপ্ত থাকে। এদের চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক বা অসঙ্গতি দেখা যায়। এদের যথাযোগ্য পুরস্কার ও স্বীকৃতি এরা পায় না। তার থেকেই তো সৃষ্টি হচ্ছে অন্তর্দ্বন্দ্ব, কমপ্লেক্স (Frustration)। এই তো এ যুগের কথা। নামকরা কলেজের কৃতী সব ছেলেরা বিশেষ একটি দলের অন্তর্ভুক্ত বলে বিভিন্ন মহল থেকে জানানো হয়েছে। এরা তো সকলে যথেষ্ট বুদ্ধিমান! তবে কেন এরা অপরাধ-প্রবণতা হ'ল? কেন ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হ'ল? খোঁজ নিলে দেখা যাবে—এদের মধ্যে রয়েছে অতৃপ্ত চাহিদা, স্বীকৃতির অভাব, বিভিন্ন দিক থেকে পাওয়া বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, তিরস্কার, কর্মক্ষেত্রে অসহায়তার মনোভাব ইত্যাদি। মূলগত কারণটি দূর না করে এদের সংশোধন করতে যাওয়া অর্থহীন প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। এক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে—অপরাধ বিশ্লেষণ করলে চলবে না—অপরাধীকে বিশ্লেষণ করতে হবে।

[দুই] **পারিবেশিক কারণ:** এতক্ষণ বংশগতসূত্রে প্রাপ্ত কারণগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল। কিন্তু বংশগতসূত্রে প্রাপ্ত কারণের চেয়েও পারিবেশিক কারণের জন্য অপরাধ-প্রবণতার উদ্ভব হয় বেশী। পারিবেশিক কারণগুলি আবার নানা প্রকারের হ'তে পারে। এখন কতকগুলি পারিবেশিক কারণ সম্বন্ধে পরবর্তী পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হ'ল—

(ক) গৃহ-পরিবেশ-শিশুর কাছে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব হ'ল তার গৃহের পূর্ণ পরিবেশটি। অপরাধ-প্রবণতার যত কারণ থাকে সেগুলির বেশীর ভাগই এই পরিবেশ থেকে সৃষ্ট। শিশুর গৃহ-পরিবেশটি যদি স্বাস্থ্যকর না হয়, তাহ'লে শিশুর ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ সাধনও হবে না। অস্বাস্থ্যকর গৃহ-পরিবেশের মধ্যে শিশু দুর্বলচেতা ও বিপথগামী হয়। এইজন্য অনেকে বলে থাকেন—শিশু অপরাধ-প্রবণতা সঙ্গে নিয়ে জন্মায় না; গৃহ-পরিবেশই শিশুকে অপরাধপ্রবণ করে গড়ে তোলে।

অস্বাস্থ্যকর গৃহ পরিবেশকে আমরা আবার নানাভাবে ভাগ করতে পারি। যেমন—

(১) অতিরিক্ত দারিদ্র্য বা অভাব, গৃহে লোকজনের সংখ্যাধিক্য, গৃহমধ্যে খেলাধুলা বা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা না থাকার জন্যই ছেলেরা রাস্তা-ঘাটে বা রকে আড্ডা জমায়। তেমনি দারিদ্র্যের জন্য বই বা খেলনা কেনা সম্ভব হয় না বলেই শিশু সেগুলি চুরি করার একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে। Vilion-এর মতে Poverty drives man to steal.

(২) পারিবারিক সম্পর্কজনিত বৈষম্যও অপরাধ-প্রবণতার অন্যতম কারণ। A. Paterson-এর মতে—Marriages are the commonest of all juvenile offences." যে সমস্ত শিশু বিপর্যস্ত গৃহে বাস করে, যাদের পিতা-মাতার মধ্যে সম্পর্কটি ভালো নয় বা যাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছে, মদ্যপ বা অসচ্চরিত্র মাতাপিতার সঙ্গে বাস করে যে সমস্ত শিশু—তারা প্রায়ই অপরাধপ্রবণ হয়। এছাড়া বিমাতা বা বি-পিতার নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন আচরণও অপরাধ-প্রবণতার অন্যতম কারণ।

(৩) ত্রুটিপূর্ণ শৃঙ্খলা : ত্রুটিপূর্ণ শৃঙ্খলাও অপরাধ-প্রবণতার কারণ হতে পারে। অতিরিক্ত আদর যেমন খারাপ, অনাদর বা অবহেলাও তেমনি খারাপ। পরিবারের একমাত্র পুত্র বা কন্যা বা একমাত্র সন্তান অতিরিক্ত আদরের জন্য অপরাধপ্রবণ যেমন হতে পারে, বহু ভাই বোনদের মধ্যে মানুষ হ'লে অবহেলার জন্যও শিশু তেমন অপরাধপ্রবণ হ'তে পারে। অতিরিক্ত শৃঙ্খলার জন্য অপরাধ-প্রবণতা সৃষ্ট হবার সম্ভাবনা যেমন থাকে, শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ অবলুপ্তির জন্যও অপরাধ-প্রবণতা সৃষ্ট হবার সম্ভাবনা ঠিক ততখানিই থাকে। অবশ্য স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার অবলুপ্তি এক কথা নয়। স্বাধীনতা

যদি উদ্দেশ্যমূলক হয় আর তাকে যদি ঠিকপথে পরিচালিত করা যায়, তবে তা শিশুর পক্ষে সুফলদায়কই হয়। শিশু উদ্দেশ্যবিহীন ও অপরিচালিত স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতারই নামান্তর মাত্র।

(৪) পিতামাতার বৈষম্যমূলক আচরণও অপরাধ-প্রবণতার অন্যতম কারণ। অনেক পিতামাতা শিশুকে বকাবকি বা মারধর করে পর মুহূর্তেই হয়তো বা অনুতপ্ত হয়েই তাদের আদরের বন্যায় ভাসিয়ে ফেলেন। তারা ভাবেন শাস্তি দেবার জন্য শিশুর মনে যে প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল আদরের ফলে সেটির প্রভাব শিশুর উপর থাকবে না। এ ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল। এই জাতীয় বৈষম্যমূলক আচরণ শিশুমনের ভারসাম্যটি নষ্ট করে ফেলে এবং পিতামাতার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে শিশু একটি খারাপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করে।

শিশুর গৃহ-পরিবেশের পর আসে গৃহের বাইরের পরিবেশটি ও বিদ্যালয়ের পরিবেশটি। গৃহের বাইরের পরিবেশের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে শিশুর সঙ্গী-সাথী ও পাড়া-প্রতিবেশীরা। শিশু সচরাচর যাদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করে তাদের প্রভাব শিশুর উপর পড়বেই। শিশুর বাসস্থানের পরিবেশটি যদি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হয়, তবে শিশু অপরাধপ্রবণ হবে। যে সমস্ত শিশু অপরাধপ্রবণ হয়েছে—পরীক্ষা করে দেখা গেছে—তার মূলে আছে শিশুর অসদ্‌সঙ্গীদের প্রভাব। বাংলাতে একটা প্রবাদ আছে—"সৎসঙ্গে কাশীবাস অসদ্‌সঙ্গে সর্বনাশ"। অনেক ভালো ছেলেও অসদ্‌সঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে অপরাধপ্রবণ হয়ে যায়। তাছাড়া যে পরিবেশে শিশুর খুব বেশী সিনেমা দেখার সুযোগ মেলে, যেখানে জুয়া ইত্যাদি খেলা বেশী হয়, যেখানে চোর ডাকাত বা ওয়াগান-ব্রেকাররা বাস করে। যেখানে বয়স্ক লোকদের অধিকাংশই মদ্যপ বা যে পল্লী কুখ্যাত, সেখানেও শিশুরা অপরাধপ্রবণ হয়। আবার নিরাপত্তার অভাব, বেকারত্ব ইত্যাদিও অপরাধ-প্রবণতার কারণ হ'তে পারে। এগুলি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হ'ল।

এরপর আসে শিশুর বিদ্যালয়ের পরিবেশটি। শিশু সারাদিনের বেশীর ভাগ অংশই বিদ্যালয়ে কাটায়, বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসে। শিক্ষক-শিক্ষিকা, সহপাঠী, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি সকলেই শিশুকে প্রভাবিত করে। আবার বিদ্যালয়ের আইন-কানুন, নিয়ম-শৃঙ্খলা, বৈশিষ্ট্য ও প্রথা ইত্যাদিও

শিশুর উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেখানে বিদ্যালয় পরিবেশ যথার্থ সামাজিক পরিবেশ, সেখানে শিশুরাও সামাজিক হতেই অভ্যস্ত হয়ে যায়। কিন্তু যেখানে এই পরিবেশটি অনুপস্থিত, সেখানে শিশু একক, বিচ্ছিন্ন, স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক জীব হিসেবে বেড়ে ওঠে। তেমনি যে সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্র ও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটি কলুষিত, যেখানে শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান এবং ভালোবাসা ও স্নেহের কোন অভাব নেই, সেখানে শিশু যে অপরাধপ্রবণ হবে, এতে আশ্চর্যান্বিত হবার কোন কারণ নেই। স্কুলে শৃঙ্খলার নামে নিপীড়ন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একস্থানে বসিয়ে রাখা, খেলাধূলার ব্যবস্থা না রাখা ইত্যাদিও অপরাধ-প্রবণতা সৃষ্ট হ'তে সাহায্য করে।

[তিন] **সামাজিক কারণ :** আগেই বলা হয়েছে অপরাধ-প্রবণতাকে শিক্ষা-মূলক সমস্যা না বলে একটি সামাজিক সমস্যা বলে চিহ্নিত করা যায়। আজ-কাল বহু মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী এটিকে সামাজিক সমস্যা হিসাবেই বর্ণনা করেছেন। ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে অপরাধ-প্রবণতার কারণ ও মাত্রা সামাজিক সংগঠন ও সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর নির্ভর করে। সমাজের মাটিতে প্রত্যেক শিশুকে এক একটি চারাগাছ বলে কল্পনা করা যেতে পারে। সমাজ তাদের প্রাণরসে সিঞ্চিত করছে, বেড়ে উঠতে সাহায্য করছে। কাজেই সমাজের মাটি যদি খারাপ হয়, প্রাণরস যদি উপযুক্ত প্রাণ শক্তি সঞ্চার করতে না পারে, তবে চারাগাছটি ঠিকমত বেড়ে উঠতে পারবে না।

প্রত্যেক সমাজের কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ, অনুমোদিত নির্দিষ্ট মান ও নৈতিক আদর্শের একটা মাপকাঠি থাকে। এগুলির দ্বারা ব্যক্তির (শিশুরও) আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। বয়স্ক ব্যক্তিরা সমাজের নৈতিক আদর্শ কতটা এবং কি ভাবে চলছেন তা দেখেই শিশুরা ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিতের ধারণা গড়ে তোলে। যে সমস্ত সমাজে নৈতিক আদর্শ এবং তা মেনে চলার ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন নেই, সেখানে শিশুরা অপরাধপ্রবণ হবার প্রবণতাই বেশী দেখায়। আবার যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদির প্রভাবে সমাজব্যবস্থা যখন বিপর্যস্ত হয়ে যায়, তখন অপরাধ-প্রবণতার মাত্রাও বেড়ে যায়। যখন কোন সমাজের সামাজিক সংগঠন ও সমন্বয়নটি নষ্ট হয়ে যায় তখন অপরাধ-প্রবণতার

মাত্রাও বেড়ে যায়। সমাজের মধ্যে নৈতিক দুর্বলতা, নেতৃত্বের অভাব, আভ্যন্তরীণ দলাদলি, ঘুষ, কালোবাজারী, অতিরিক্ত লাভ, প্রতারণা ইত্যাদি অন্যায় ও অসামাজিক কাজের জন্য অপরাধ-প্রবণতার মাত্রা যথেষ্ট বেড়ে যায়। আবার সমাজে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়ে গেলেও অপরাধ-প্রবণতা বেড়ে যায়। আবার অন্য কোন দেশের প্রচলিত নিয়ম-কানুন বা রীতি-নীতি যখন আর একটি দেশে জোর করে চালানোর চেষ্টা করা হয়, তখনও অপরাধ-প্রবণতা বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশী।

[চার] **মনস্তাত্ত্বিক কারণ :** অপরাধপ্রবণতার পশ্চাতে মনস্তাত্ত্বিক কারণের প্রভাবও যথেষ্ট আছে। প্রত্যেক শিশুর কতকগুলি মৌলিক চাহিদা থাকে। শিশু যত বড় হয়, এই চাহিদাগুলি সংখ্যাতেও তত বাড়ে, সেগুলির জটিলতাও তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই চাহিদাগুলি ঠিকমত তৃপ্ত হ'লে কোন গোলমাল হয় না। কিন্তু ঠিকমত তৃপ্ত না হ'লেই শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দেয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

তাহ'লে বলা যায় শিশুর বিভিন্ন জাতীয় মৌলিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি অপরাধ-প্রবণতার মূলগত কারণ হিসেবে কাজ করে থাকে। শিশুর ভালোবাসার চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা ইত্যাদির পরিতৃপ্তি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু অধিকাংশ বাড়ী ও সমাজে এই চাহিদাগুলির একটা বড় অংশ অতৃপ্ত থেকে যায়। ফলে শিশুর মধ্যে নানা প্রকার অপসঙ্গতি দেখা দেয়। এই অপসঙ্গতি দূর করার জন্য শিশুর নানা প্রকার পরিপূরক আচরণের আশ্রয় নেয়। এই জাতীয় আচরণ প্রায়ই সমাজ অনুমোদিত মান ও আদর্শের বিচারে অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক হয়ে থাকে। লোকে এগুলিকে অপরাধ বলে আখ্যা দিয়ে থাকে। আসলে কিন্তু শিশু অপরাধ করার জন্য অপরাধ করে না; অপসঙ্গতি দূর করার জন্য এক জাতীয় আচরণ করতে যেয়ে নিজের অজান্তেই অপরাধ করে ফেলে।

অপরাধ-প্রবণতার শ্রেণীবিভাগ (Types of Delinquency) : বিভিন্ন রূপ নিয়ে অপরাধ-প্রবণতা দেখা দেয়। সাধারণতঃ যে সমস্ত রূপে অপরাধ-প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়—সেগুলি হ'ল—

(ক) অপহরণ	(ঙ) আক্রমণ	(ঝ) শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা
(খ) মিথ্যাকথন	(চ) ধূমপান	(ঞ) নেতিবাচক মনোভাব
(গ) ভীতি-প্রদর্শন	(ছ) উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়ান	(ট) প্রতারণা
(ঘ) দম্ভ-প্রকাশ	(জ) ক্লাশ-পালানো	(ঠ) যৌন-অপরাধ।

শিশুদের মধ্যে সাধারণতঃ এই জাতীয় অপরাধ-প্রবণতা বিভিন্ন মাত্রাতে পরিলক্ষিত হয়। এই জাতীয় অপরাধ-প্রবণতা শিশুদের মধ্যে দেখা গেলে সঠিক কারণটি নির্ণয় ক'রে মনোবিজ্ঞানমূলক চিকিৎসা-পদ্ধতির সাহায্যে এগুলি দূর করা সম্ভব। কিন্তু চিকিৎসা করতে দেরী হ'লে বা কিশোর বয়সে এ জাতীয় অপরাধ-প্রবণতা দেখা সত্ত্বেও চিকিৎসার কোন সুব্যবস্থা না করলে শিশু ও কিশোররা বড় হয়ে "অপরাধী" (Criminal) বলে চিহ্নিত হয়ে যাবে। এরাই আবার সমাজ-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করে তুলবে। কাজেই সমাজের মঙ্গলের জন্য অপরাধ-প্রবণতার সুচিকিৎসা করা অপরিহার্য।

অপরাধ-প্রবণতা দূরীকরণের উপায়ঃ একটু আগেই বলা হয়েছে সামাজিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হ'লে অপরাধ-প্রবণতা দূর করা একান্ত প্রয়োজন। অপরাধ-প্রবণতা দূর করতে হ'লে দু'রকমের উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। নীচে তার একটি তালিকা দেওয়া হ'ল—

অপরাধ-প্রবণতা দূরীকরণের উপায়

- প্রতিরোধমূলক উপায় (Preventive)
  - ব্যক্তিগত (Individual)
  - সমষ্টিগত (Collective)
- নিরাময়মূলক উপায় (Curative)

প্রতিরোধমূলক উপায়ঃ ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে—Prevention is better than cure. কথাটা অপরাধ-প্রবণতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শিশু অপরাধ–প্রবণ হয়ে গেলে চিকিৎসা করে তাকে নিরাময় করে

তোলার চেয়ে গোড়ার থেকে এমন একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলে ভালো হয় যাতে শিশু আর অপরাধ-প্রবণ না হয়ে ওঠে। প্রতিরোধমূলক উপায়ের অর্থ হ'ল—যে সমস্ত কারণের জন্য শিশু অপরাধ-প্রবণ হয়, সেগুলি আগে থেকেই দূর করা বা সরিয়ে রাখা।

এই প্রতিরোধমূলক উপায় আবার দু' ধরনের হ'তে পারে—ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত। এখন এই দু'ধরনের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল—

ব্যক্তিগত প্রতিরোধমূলক উপায়ঃ যখন প্রতিরোধমূলক উপায়গুলি শিশুর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভাবে কার্যকরী হয়, তখন সেগুলিকে ব্যক্তিগত প্রতিরোধমূলক উপায় বলা হয়ে থাকে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—

(ক) শিশুর জন্য উত্তম পরিবেশের ব্যবস্থা করা (গৃহ, সমাজ ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ)।

(খ) শিশুর প্রতি আদর বা অনাদরের বৈষম্য দূর করা ও মাত্রা নির্ধারণ করা।

(গ) যে সমস্ত শিশু বিপর্যস্ত গৃহে মদ্যপ বা চরিত্রহীন পিতামাতার সঙ্গে বাস করে, তাদের জন্য উন্নততর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) বয়স্কদের দুশ্চিন্তা ও সমস্যাগুলি যাতে শিশুমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে না পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) শিশুর জন্য পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য, উপযুক্ত বিশ্রাম ও খেলাধূলার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(চ) শিশুর সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধব নির্বাচনে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

(ছ) শিশুর বহুমুখী চাহিদাগুলি যতদূর সম্ভব তৃপ্ত করার চেষ্টা করতে হবে।

(জ) শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।

(ঝ) শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। কি গৃহ, কি সমাজ, কি বিদ্যালয়—সর্বত্র এমন একটা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে হবে যার মধ্যে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যটি বজায় থাকবে। বিদ্যালয়

পরিবেশটিকে করতে হবে সমাজধর্মী, শিক্ষণ-পদ্ধতি হবে মনোবিজ্ঞানসম্মত, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কটির ভিত্তি হবে সহযোগিতা, বিশ্বস্ততা, প্রীতি, স্নেহ, ভালে বাসা, শ্রদ্ধা। লেখাপড়া ছাড়াও অন্যান্য সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

এবার **সমষ্টিগত প্রতিরোধমূলক উপায়** সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। সমষ্টিগত প্রতিরোধ বলতে একবারে অনেকের অপরাধপ্রবণ হবার পথ রোধ করা বোঝায়। এটি করা সম্ভব একমাত্র সামাজিক সংগঠনের উন্নয়নের মাধ্যমে। সমাজের অগ্রগতি আর উন্নয়নের অর্থই হ'ল সেই সমাজের সদস্যদের অগ্রগতি ও উন্নয়ন। এখন সামাজিক উন্নয়নের কয়েকটি সম্ভাব্য উপায়ের কথা এখানে আলোচিত হ'ল—

(ক) সমাজ যেন গোঁড়া প্রাচীনপন্থী না হয়ে প্রগতিশীল হয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সমান তালে তাল মিলিয়ে সমাজকেও এগিয়ে যেতে হবে।

(খ) প্রত্যেক সমাজেরই একটা নির্দিষ্ট আদর্শ ও নৈতিক মানের মাপ-কাঠি থাকে। সমাজের সদস্যদের চাহিদা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে এগুলি পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে হবে। প্রায়ই দেখা যায় সমাজে প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থীদের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা লড়াই চলে। এর ফলে শিশু বিশেষতঃ কিশোরদের মধ্যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এর থেকে অপরাধ-প্রবণতা সৃষ্ট হয়।

(গ) যখন সমাজে ব্যক্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় তখন তার প্রভাব শিশু ও কিশোরদের মধ্যেও বেশী করে পরিলক্ষিত হয়। এটা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকতর প্রকট। দলীয় কোন্দল, উপদলীয় সংঘর্ষ, ছাঁটাই, লকআউট ইত্যাদি এই নিরাপত্তাহীনতার অগ্রদূত। এই শঙ্কা, ভয়, অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার জন্য অপরাধ-প্রবণতা অত্যন্ত বেড়ে যায়। বর্তমান যুগকে আমরা এর জলন্ত উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি।

শিশু ও কিশোরদের এই রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত ও অর্থ নৈতিক সঙ্কট থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। রাজনৈতিক নেতারাও মূলতঃ সমাজ-সংস্কারক। তাঁদের নিজ নিজ দলের চেয়ে সমাজের সামগ্রিক মঙ্গলের কথা বেশী করে চিন্তা করা উচিত। এঁদের উচিত কোন শিশু বা কিশোরকে রাজনীতিতে টেনে

না আনা। শিশু ও কিশোরদের সৃজনমূলক ও সংগঠনমূলক কাজে সব সময় ব্যাপৃত রাখা উচিত।

(ঘ) সমাজের বিধি-নিষেধ বা আইন-কানুন যেমনই হোক না কেন, বয়স্ক ব্যক্তিরা যদি ঐগুলির প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রকাশ না করে, তাহ'লে শিশুমনে সেই সমাজের প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাব উদিত হয়। যে সমাজে বয়স্ক-ব্যক্তিরা সামাজিক বিধি-নিষেধের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও বিশ্বস্ত সেখানে অপরাধ-প্রবণতার মাত্রাও কম।

নিরাময়মূলক উপায়: অপরাধ-প্রবণতা দেখা দিলে তার নিরাময়ের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, সেগুলিকে নিরাময়মূলক উপায় বলা হয়। যখন শিশুর কোনপ্রকার অপসঙ্গতির জন্য অপরাধ-প্রবণতা দেখা দেয়, তখন মনশ্চিকিৎসকের পরামর্শ ও সহায়তায় শিশুর অপসঙ্গতি দূর করার চেষ্টা করতে হবে। তাছাড়া আরো কয়েক প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেও তার অপরাধ-প্রবণতা দূর করা যেতে পারে। এ জাতীয় কিছু ব্যবস্থার কথা নীচে আলোচনা করা হ'ল—

(ক) যদি বিশেষ কোন পরিবেশের প্রভাবের জন্য শিশুর মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা দেখা দেয়, তবে হয় সেই পরিবেশটিকে পরিবর্তিত করতে হবে, নয়তো শিশুকেই সেই পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

(খ) শিশুর গৃহ-পরিবেশটি যদি কলুষিত হয়, তবে তাকে কোন ভালো ছাত্রাবাস বা আশ্রমে রাখতে হবে।

(গ) শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতি সৃষ্ট হয় তখনই-যখন তার মৌলিক চাহিদাগুলি অতৃপ্ত থেকে যায়। অপরাধ-প্রবণতা দূর করতে হ'লে—শিশুর এই মৌলিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি সাধন করার চেষ্টা করতে হবে।

(ঘ) শিশুর জন্য সুস্থ সামাজিক কার্যসূচীর ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুর পরিবেশটি সমাজধর্মী করতে হবে, সম্মিলিত কার্যক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) শিশুর মধ্যে কোন প্রকার অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হ'লে তার কারণটি নির্ণয় করতে হবে এবং সেই অন্তর্দ্বন্দ্বটি দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

(চ) বেকারত্বের অবসান ঘটাতে হবে।

(ছ) অবসর সময় যাপন করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

(জ) শাসন, শৃঙ্খলা ও বিধি-নিষেধের সঙ্গে শিশু ও কিশোর যাতে উপযুক্ত ভাবে সঙ্গতিসাধন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ঝ) অপরাধপ্রবণ শিশুর সঙ্গে সহৃদয় ভাবে ও সহানুভূতির সঙ্গে আচরণ করতে হবে।

এবার দেখা যাক অপরাধপ্রবণ শিশুদের সম্বন্ধে শিক্ষকের কি কি করণীয় আছে।

শিক্ষকের কর্তব্য : শিক্ষকের প্রধান কাজ হ'ল শিশুর ব্যক্তিত্বটি যথাযথ ভাবে বিকশিত করা। শিক্ষকই শিশুর বিভিন্ন সমস্যা ও অসুবিধাগুলি পর্যবেক্ষণ করে সেগুলি সমাধানের চেষ্টা করেন এবং শিশুকে ঠিকপথে পরিচালিত করেন। অপরাধপ্রবণ শিশুদের ক্ষেত্রে শিক্ষককে কতকগুলি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং কতকগুলি কথা মনে রাখতে হবে। যেমন—

[এক] অপরাধপ্রবণ শিশুকে ব্যক্তিগত ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে তার নিজস্ব ও বিশিষ্ট কতকগুলি সমস্যার জন্যই সে অপরাধপ্রবণ হয়েছে। তার ঐ সমস্যাগুলি শিক্ষককে জানতে হবে।

[দুই] অপরাধপ্রবণ শিশুকে শাস্তি না দিয়ে মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তার চিকিৎসা করতে হবে। শিক্ষককে সহিষ্ণু, ধৈর্যপরায়ণ ও সহানুভূতিশীল হতে হবে।

[তিন] শিশুর আগ্রহকে সুপথে পরিচালিত করতে হবে।

[চার] কার্য সমস্যা পদ্ধতিতে শিশুকে শিক্ষাদান করতে হবে। শিশুদের অভিজ্ঞতা অর্জন, পছন্দ ও কাজকর্মের জন্য যথেষ্ট সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে।

[পাঁচ] শিশুকে কতকগুলি সু-অভ্যাস অর্জন করতে সাহায্য করতে হবে। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ও শৃঙ্খলাপরায়ণ হবার শিক্ষা প্রত্যেক শিশুকে দেওয়া উচিত।

[ছয়] শিশুদের শৃঙ্খলা হবে 'ইতিবাচক' (Positive); 'নেতিবাচক' (Negative) নয়। "এটা করো না, এরকম করা উচিত নয়"—এভাবে নির্দেশ না দিয়ে—"এইভাবে করো, এ রকম ভাবে করলে ভালো হয়"—এ জাতীয় নির্দেশ বেশী কার্যকরী।

[সাত] শিশুর ভুল-ভ্রান্তিগুলি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতে হবে এবং উপযুক্ত হাস্যরস সৃষ্টি করে ঐ ভুলের কুয়াশা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করতে হবে—যেন শিশু লজ্জা না পায়।

[আট] শিশুর পিতামাতা বা অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে শিক্ষক তার গৃহ-পরিবেশটির পরিচয় জেনে নেবেন।

[নয়] শিক্ষককে শিশুর বিশ্বাস অর্জন করতে হবে—যাতে শিক্ষক সহজে তাদের অনুভাবিত করতে পারেন।

[দশ] শিশুর সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধবদের খবর রাখতে হবে শিক্ষককে এবং প্রয়োজনবোধে সঙ্গী বা বন্ধু পরিবর্তন করতে হবে।

[এগার] যদি যৌনমূলক কোন গ্রন্থিকাণ্ডের জন্য শিশুর মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা দেখা দেয়, তবে শিক্ষককে ঐ প্রবৃত্তির "উন্নতিকরণ" (Sublimation) করতে হবে। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী, সম্মিলিত নাটক, সংগীত, খেলাধুলা, বনভোজন, ভ্রমণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

[বারো] শিশুর "অহং-বোধের সেন্টিমেন্ট"টি গড়ে তুলতে সাহায্য করতে হবে।

[তেরো] শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতির জন্য কোন প্রকার অপরাধ-প্রবণতা দেখা দেয় এবং তা যদি শিক্ষকের নিজের পক্ষে দূর করা সম্ভব না হয়, তবে শিশুকে কোন মনশ্চিকিৎসক কিংবা Child Guidance Clinic-এ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

[চৌদ্দ] শিশুর ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে যে মানসিক ও দৈহিক পরিবর্তন হয়, শিক্ষককে সেগুলি স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে হবে—এবং শিশুর সঙ্গে সেইমত প্রীতিপূর্ণ ও সহৃদয় আচরণ করতে হবে।

[পনর] শিক্ষককে শিশুর বন্ধু, দার্শনিক ও পথ-প্রদর্শক হতে হবে।

॥ তেরো ॥

যৌন শিক্ষা

(Sex Education)

[Sex-In psychoanalytic theory Sex and Sexual are widened so as to include phenomena which have no direct bearing on reproduction, on the assumption that the pleasure derived is of the same order, is in fact essentially the same, in the case particularly of the young child, as that associated with sex phenomena in the strict sense—*Dictionary of Psychology*

Sex-feeing—A general term covering feeings and emotions experienced by members of one sex towards the other sex, which are attributable to the difference of sex—*Dictionary of Psychology.*

Perhaps the most effective type of Sex-education programme would be one that both integrates sex-education study into such courses as biology, psychology, health or hygiene, sociology, home-economics, civics, literature, and also provides a special course dealing with family and personal living problems—*Blair etc.*]

সাধারণ ভাবে আমরা যৌনতা বলতে প্রাণীর বংশ-ধারা বা বংশ-প্রবাহকে অব্যাহত রাখার উপযোগী একটি শক্তিশালী শক্তি বলে বিবেচনা করে থাকি। এই অর্থে যৌনতা বলতে স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি আসক্তি ও আসক্ত-লিপ্সাকেই বোঝায়। পূর্বে আমাদের ধারণা ছিল পরিণত বয়স ছাড়া এই যৌনতার সৃষ্টি হয় না। শিশুদের মধ্যে কোন প্রকার যৌন-সচেতনতা দেখা যায় না। কিন্তু ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ থেকে আমরা জানতে পেরেছি শিশুদের মধ্যেও যৌনতা দেখা যায় এবং ঐ যৌন সচেতনতা দেখতে পাওয়াটাও খুবই স্বাভাবিক। অবশ্য শিশুর যৌনতা আর পরিণত বয়সের যৌনতা প্রকৃতির দিকে এক না হ'লেও দুটির মধ্যে একটা মূলগত সাদৃশ্য আছে। শিশুর যে সমস্ত আচরণ আপাতদৃষ্টিতে নির্দোষ বলে মনে হয় সেগুলির মধ্যেও হয়তো তার যৌনতৃপ্তির একটা প্রয়াস থাকতে পারে। যৌনতাকে শিশুর ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের একটা অঙ্গ বলা যেতে পারে। তাছাড়া

শিশুর দৈহিক, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক পুষ্টির উপর যৌনতত্ত্বের প্রভাব অপরিসীম।

ফ্রয়েড শিশুর জীবনবিকাশের বিভিন্ন স্তরে যৌনতা তথা "লিবিডোর" (Libido) অগ্রগতির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বাল্যকালকে যৌনতার "প্রসুপ্তকাল" (Latency) বলে উল্লেখ করেছেন। বাল্যকালের পরবর্তী স্তর অর্থাৎ যৌবনপ্রাপ্তির সাথ সঙ্গে যৌনতা পরিপূর্ণরূপে আত্ম-প্রকাশ করে ও পরিণত জীবনের প্রতিশ্রুতি বহন করে।

প্রাচীনপন্থী মতবাদীরা যৌনতাকে অশ্লীল ও অসামাজিক বলে মনে করেন—যদিও এর প্রভাব থেকে খুব কমসংখ্যক লোকই মুক্ত থাকেন। প্রায় প্রত্যেক সমাজে এই যৌনতা সম্বন্ধে একটা "চুপ চুপ" ভাব বিদ্যমান। সাধারণ সভ্যসমাজে যৌনতাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখার জন্য সযত্ন প্রয়াসের কত না ঘনঘটা! যৌনতা সম্বন্ধে সাধারণ সভ্য মানুষের একটা লজ্জা ও সংকোচের ভাব থাকে। শিশু যখন বড় হয় তখন যৌনতা সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য কেউ এগিয়ে আসেন না। অথচ এ সম্বন্ধে শিশুর কৌতূহল অসীম। ফলে সে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হতে রাস্তার ভাষায় এ সম্বন্ধে বিকৃত ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করে। যাদের নিকট সে জ্ঞান আহরণ করছে তারা বিশেষজ্ঞ তো নয়ই—বিশেষরূপে অজ্ঞ! এ যেন একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে। এই বিকৃত, অসম্পূর্ণ ও অর্ধসত্য জ্ঞান শিশুর পরবর্তী জীবনকে বিষময় করে তোলে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান কিন্তু যৌনতা সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ, উদার ও বিজ্ঞান-সম্মত মতবাদ পোষণ করে থাকে। যে যৌন কৌতূহলের পরিতৃপ্তি ও সদ্ব্যবহারের উপর শিশুর সমগ্র মানসিক সংগঠন, তার ব্যক্তিত্ব প্রাক্ষোভিক সমতা ইত্যাদি নির্ভরশীল, সেই যৌনতা সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত ও শোভন শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী হ'ল আধুনিক মনোবিজ্ঞান। তারই ফলে উদ্ভব হ'ল যৌনশিক্ষার।

যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা (Need of Sex-Education): "যৌনশিক্ষা দেবার প্রয়োজন কি"? এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। তবে বলা যেতে পারে, সুখী ও পরিপূর্ণ জীবন-যাপনের জন্য শিশুকে প্রস্তুত করে দেওয়া এবং তার ব্যক্তি সত্তার বিকাশ সাধন করাই যৌনশিক্ষাদানের উদ্দেশ্য। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে যৌনশিক্ষার

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কারণের কথা আমরা আলোচনা করব।

[এক] (আধুনিক শিক্ষা হ'ল—জীবনের সামগ্রিক প্রস্তুতি। এই শিক্ষা শিশুর জীবনের প্রতিটি শক্তির কথা বিবেচনা করে ও শিশুর চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করে।) শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, চাহিদা, সামর্থ্য, প্রবণতা, রুচি, আগ্রহ ইত্যাদি বিভিন্ন শক্তির সার্থক রূপায়ণ ঘটে আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে। (যৌন-প্রবৃত্তি একটি মারাত্মক শক্তিশালী প্রবৃত্তি। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী—এমন কি মানুষও এই শক্তির নিকট পরাজিত। (এই প্রবৃত্তির বিপথগামিতা বা বিকৃতির জন্য প্রাণী-জীবনে ও মানুষের ব্যক্তিসত্তার ক্ষেত্রে নেমে আসে চরম বিপর্যয়।) কাজেই দুর্দান্ত এই শক্তিকে ঠিক পথে পরিচালিত করার প্রয়োজন। (ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজ-জীবন সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে, তার প্রক্ষোভমূলক সুসংগঠনের জন্য, শিক্ষাকে স্বাভাবিক ও জীবনভিত্তিক করার জন্য যৌন-শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।)

[দুই] ব্যাপক পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গেছে ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু সংগঠন নির্ভর করে সুষ্ঠু ও সুস্থ যৌনজীবনের উপর। (যৌন-প্রবৃত্তি থেকে সৃষ্ট প্রক্ষোভ, যৌন-কৌতূহল ইত্যাদি শিশুর ব্যক্তিত্ব সংগঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই যৌন আবেগ ও যৌন কৌতূহলকে অবদমিত করা হয়। তাহ'লে শিশুমনে নানাপ্রকার যৌন বিকার দেখা দেয় এবং এর ফলে শিশুর দৈহিক, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত বা বিপথগামী হয়। অতএব, দেখা যাচ্ছে শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুসংগঠনের জন্য এবং তার পরবর্তী যৌন জীবনকে সফল ও সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য যৌনশিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।)

[তিন] অপরাধবিজ্ঞানীরা বলেন—প্রাপ্তবয়স্কদের অধিকাংশ অপরাধের মূলে থাকে যৌন-কৌতূহলের অবদমন, যৌন বিকৃতি, কদাচার, বিকৃত যৌন-জ্ঞান ও কুসংসর্গ। পরিণত বয়সের অধিকাংশ অভ্যাস ও আচরণের সংগঠন ও প্রকৃতি আবার শৈশবের অভ্যাস বা অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। কাজেই যৌনশিক্ষাকে বর্জনীয় মনে না করে বরং যৌনশিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে তার যৌন কৌতূহল ও যৌন প্রক্ষোভকে সুপথে পরিচালিত করে সেটিকে নানা প্রকার সৃষ্টিমূলক কর্মপ্রবাহে প্রবাহিত করা যেতে পারে।

[চার] 'ফ্রয়েড বলেন—বাসনা, কামনা অবদমিত হ'লে ব্যক্তির অচেতন মনে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, ব্যক্তি তার ফলে অপসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করতে শুরু করে। ফ্রয়েড আবার এ কথাও বলেছেন—আমাদের সমস্ত বাসনা-কামনার প্রকৃতি হ'ল যৌনমূলক। যৌন-কৌতূহল ও যৌন-আবেগ প্রত্যেকের জীবনে একটি স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু আমরা সমাজে যৌন কৌতূহল নিষিদ্ধ, পাপ, অন্যায়, যৌন আবেগ পোষণ করা ঘৃণার্হ ও লজ্জাজনক, ইত্যাদি কুসংস্কারের দ্বারা শিশুমনে একটি পাপবোধের বীজ অঙ্কুরিত করে থাকি। এর ফলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব, মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হ'লে যৌন-শিক্ষা দেওয়া দরকার।

[পাঁচ] যৌনশিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হ'ল ছেলেমেয়েদের যৌনতা সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী অর্জনে সহায়তা করা, নর-নারীর স্বাভাবিক সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা ধারণা অর্জনে সহায়তা করা এবং নর ও নারী উভয় পক্ষের একের প্রতি অপরের একটা সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার মনোভাব গঠনে সাহায্য করা। নর-নারীর যৌন আবেগকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিক মার্জিত ও স্বাস্থ্যকর আচরণ ও মনোভাব গড়ে ওঠার কথা। কিন্তু যৌন শিক্ষার অভাবে উভয় পক্ষের মধ্যেই নানাপ্রকার বিকৃত যৌনাচার, অপসঙ্গতি বা অসঙ্গত আচরণ সৃষ্ট হয়। এই সমস্ত অবাঞ্ছিত আচরণ থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখার জন্য যৌনশিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

[ছয়] ব্যক্তির বিবাহোত্তর জীবন, সন্তান পালন বা সুখী দাম্পত্য জীবন প্রভৃতির সার্থক রূপায়ণেও যৌনশিক্ষার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। যৌনশিক্ষার অভাবে বহু দাম্পত্য-জীবন বিপর্যস্ত হ'য়ে যায়, সন্তান-সন্ততিকে ঠিকমত 'মানুষ' করা যায় না। উপযুক্ত যৌন-শিক্ষা না পাওয়ার ফলেই জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় না এবং পরবর্তী জীবনে জটিলতর সমস্যা, হতাশা, ব্যর্থতা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে যার ফলে জীবন আরো বিষময় হ'য়ে যেতে পারে।

এর ফলে আমরা একথাই বলতে পারি—শিশুর পরবর্তী জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে, তার ব্যক্তিসত্তা সুসংগঠিত করতে এবং তাকে পরিপূর্ণ মানুষ করে গড়ে তুলতে— যৌনশিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

যৌনশিক্ষার প্রকৃতি (Nature of Sex-education) : এখন দেখা যাক আমরা যে যৌনশিক্ষা দেবার কথা বলছি তার প্রকৃতিটি কেমন হবে। আগেই বলা হয়েছে প্রতিটি মানুষের প্রক্ষোভমূলক জীবনে যৌনতা একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী ক্ষমতা। যৌনশিক্ষা বলতে কেবলমাত্র জীবতত্ত্বমূলক ও শরীরতত্ত্বমূলক কতকগুলি সংবাদ ও তথ্য পরিবেশন বোঝায় না। যৌন-শিক্ষা আরো ব্যাপক। যেহেতু যৌনতার প্রভাব ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনে পরিলক্ষিত হয়, সেইজন্য যৌনশিক্ষা বলতে বিভিন্ন প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রিত করার অভ্যাস অর্জন, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, শরীর ও মন সুস্থ রাখার প্রয়াস অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে মেলামেশা করা, বিবাহ, পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্কটি উপলব্ধি করা, সুষ্ঠুভাবে সন্তান পালন করা এবং সর্বোপরি যৌনতা সম্বন্ধে একটা শুচিসুন্দর মনোভাব গঠন করা এ সমস্তকেই বোঝায়। আমরা দেখি, পিতামাতা বা অন্যান্য অভিভাবক শিশুদের যৌনশিক্ষা দেবার পক্ষপাতী নন। তাঁরা ভাবেন—শিশুদের সামনে যৌনমূলক আলোচনা না করলে বা ঐ জাতীয় কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত না করলে তারা সচ্চরিত্র হবে। এটা খুব ভুল ধারণা। যৌনতা শিশুমনের একটি স্বাভাবিক ঘটনা, অনেকে আবার যৌনশিক্ষা দিতে ভয় পান। রেডিওতে "পরিবার পরিকল্পনা"র বিজ্ঞাপন শুরু হ'লে তাঁরা রেডিও বন্ধ করে দেন। অনেকে আবার যৌনশিক্ষার প্রকৃত অর্থ, স্বরূপ ও তাৎপর্যটি বুঝতে ভুল করেন। আমরা যতই এটিকে চাপা দিতে চাই, ততই শিশুমনে কৌতূহল ও আগ্রহ বাড়তে থাকে। এর ফলে হয়তো সে তার কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য কোন বিকৃত পথ খুঁজে নেয়। অনেক পিতামাতার নিজেদের যৌনজীবনের কোন অসঙ্গতির জন্য তাঁরা শিশুদের যৌনশিক্ষা দিতে ভয় পান। যৌনতা সম্বন্ধে প্রাচীন কুসংস্কার এখন আর নেই। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকার অনেক স্কুলে শিশুদের যৌনশিক্ষা দেওয়া শুরু হয়েছে। আমাদের দেশেও এ জাতীয় শিক্ষা দেবার সুপারিশ করা হয়েছে। বর্তমান যুগজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং শিশুর বহুমুখী বুদ্ধিপ্রচেষ্টার পটভূমিকাতে তার ব্যক্তি সত্তার সুসংগঠনের জন্য যৌন-শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষককে এ বিষয়ে সুবিবেচনা ও সহানুভূতির সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে।

যৌনশিক্ষা কিভাবে দেওয়া যেতে পারে? (How to Impart Sex

Education) : যৌনশিক্ষা দেওয়ার অর্থ এই নয় যে ছেলেমেয়েদের পৃথক পৃথক ভাবে যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধে তত্ত্বগত বা ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা। যৌন আবেগকে পরিতৃপ্ত, সুসংহত ও সুপরিচালিত করার জন্ম বিভিন্ন জাতীয় বিষয় পঠন-পাঠনের মাধ্যমে যৌনশিক্ষা প্রদান করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে সোজাসুজি ভাবে শিক্ষা না দিয়ে জীব-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, (ফুলের বংশবিস্তার, ফলের সৃষ্টি) ইত্যাদি বিষয়ের মাধ্যমে পরোক্ষ ভাবেও যৌনশিক্ষা দেওয়া সম্ভব। আবার এই ব্যাপারে মায়েরা মেয়েদের নিকট যতটা সহজ, পিতারা সন্তানের নিকট ততটা নয়। যৌনশিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানীরা কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছেন। এ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে শিক্ষকের কর্তব্য হ'ল—

শিক্ষককে ছাত্রদের যৌন কৌতুহল পরিতৃপ্ত করতে, যৌন-আবেগ উন্নীত করতে এবং যৌন শিক্ষা দিতে দ্বিধাবোধ করলে চলবে না। তাঁকে সহজ, স্বচ্ছ ও সরল দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে গবেষক বা বিজ্ঞানীর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এজন্ম শিক্ষককে শিশুর জীবনের ক্রমবিকাশের স্তরগুলি জানতে হবে—বিশেষ করে তাদের দৈহিক ক্রমবিকাশ। অবশ্য বিদ্যালয়ই যে যৌন-শিক্ষা দেবার আদর্শ ক্ষেত্র, তা নয়। শিশুর বাড়ীই আদর্শ স্থান, তাঁর পিতামাতাই আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা। যে সমস্ত শিশু এমন বাড়ীতে বাস করে যেখানে লিঙ্গজনিত শারীরিক পার্থক্যকে স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক (natural) বলে মেনে নেওয়া হয়, সেই সব শিশুই ভাগ্যবান। এই সমস্ত শিশু প্রয়োজনবোধে মাতাপিতার নিকট হ'তে উপযুক্ত যৌনশিক্ষা লাভ করে যার ফলে এরা বাঞ্ছনীয় অভ্যাস, আচরণ বা দৃষ্টি ভঙ্গী গড়ে তোলার সুযোগ পায়। কিন্তু বেশীর ভাগ শিশুই এ জাতীয় শিক্ষা পায় না, এরা এদের যৌনজীবনের হাজার প্রশ্নের উত্তরের জন্ম নির্ভর করে তাদের হাফ-জান্তা বন্ধুদের উপর যারা বিকৃত অথবা অর্ধসত্য সংবাদ পরিবেশন করে—তাও আবার অশ্লীল ভাবে। এতে শিশুর যৌনাবেগ প্রশমিত হওয়া দূরের কথা—আরো বেশী করে উদ্দীপ্ত হয়।

শিশুকে যদি যৌনজীবন সম্বন্ধে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষা দিতে হয়, তাহ'লে সে যাঁর নিকট তার প্রশ্নাবলী ও কৌতুহলের ডালি নিয়ে যাচ্ছে, তাঁকে ধরে নিতে হবে—শিশু বিজ্ঞানসুলভ কৌতুহল নিয়ে এসেছে, নতুন কিছু জানতে এসেছে। তাঁর উচিত হবে—বিকৃত, অর্ধসত্য বা চেপে-ঢেকে যৌন শিক্ষা না দেওয়া। বরং যৌন-পার্থক্য (লিঙ্গঘটিত), যৌনতার ক্রিয়া-কলাপ,

নর নারীর সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক, যৌনজীবনের সমস্যা ইত্যাদির কথা আলোচনা করতে হবে—একটা পারস্পরিক বিশ্বাস ও সততার পটভূমিতে। ছাত্র যদি দেখে—একজন পরিণত বয়স্ক শিক্ষক, যাঁকে সে শ্রদ্ধা করে, যৌনতাকে ক্রমবিকাশের পথে একটি সহজ ও স্বাভাবিক শক্তি বলে মেনে নিয়েছেন, তাহ'লে শিশুও এই শক্তিটির সঙ্গে অভিযোজন করার চেষ্টা করবে। কিন্তু শিক্ষক যদি এড়িয়ে যান বা এই শক্তিকে অস্বাভাবিক একটা শক্তি বলে মনে করেন, তাহ'লে ছাত্রের ক্ষেত্রেও অপ্রতিযোজন দেখা দেওয়াটাই স্বাভাবিক। তেমনি উপযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হ'তে বিকৃত ও অর্ধসত্য সংবাদ সংগ্রহ করাটাও ক্ষতিকর। এ বিষয়ে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার স্কুলগুলি অনেক বেশী প্রগতিশীল। সেখানে পিতামাতা, শিক্ষক সকলেই যৌনতাকে সহজ ও স্বাভাবিক বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে সুফল পাওয়া গেছে—তা নয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুদের সুখী ও সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ জীবন যাপনের প্রস্তুতির ব্যবস্থা করা গেছে।

সাধারণতঃ জীববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-তত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান, সাহিত্য, পারিবারিক অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদির মাধ্যমে যৌনশিক্ষা দেওয়া সম্ভব। যৌবনাগমে যে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন আসে, তার আকস্মিকতা ও নূতনত্বে শিশু দিশেহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু উপযুক্ত যৌনশিক্ষা লাভ করলে শিশু ঐ সমস্ত পরিবর্তনকে স্বাভাবিক বলে মনে করবে এবং যৌন আবেগের সঙ্গে সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্তরে সার্থক ভাবে সঙ্গতি স্থাপন করতে পারবে। শিশুর শিক্ষার সঙ্গে যৌনশিক্ষাকে সংযুক্ত করতে পারলে একদিকে যেমন তার যৌন কৌতূহল পরিতৃপ্ত হয়, অপরদিকে সে তেমনি তার যৌন আবেগ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। যৌনতাকে সে আর অবাঞ্ছিত, অশ্লীল ও অসামাজিক বলে মনে করবে না। তবে বিশেষ করে যৌনশিক্ষা দেবার জন্য পাঠ্যসূচীতে যৌনবিজ্ঞান নামে স্বতন্ত্র শাখাটি অন্তর্ভুক্ত করার কোন প্রয়োজন নেই। প্রাসঙ্গিকক্রমে এবং অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমে তাকে যৌনশিক্ষা দিতে হবে। পরিণত বয়সে কেউ যদি যৌনবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে চায়, সে স্বতন্ত্র ভাবেই যৌনবিজ্ঞান অধ্যয়ন করবে। আমেরিকায় অনেক বাড়ীতে পোষা জন্তু-জানোয়ারদের আচরণ, সন্তান ধারণ ও সন্তান পালন ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুদের যৌনশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার যৌন-কৌতূহল ও যৌন-আবেগের গতি প্রকৃতি ভিন্ন জাতীয় হয়ে থাকে। শিশুর বয়স ও যৌনপ্রবৃত্তির প্রকৃতি অনুসারে যৌনশিক্ষকেও কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যায় এবং যৌনশিক্ষাও সেই মত ভাবে দেওয়া যায়। যৌনশিক্ষাকে সাধারণতঃ তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়—

(১) **বাল্যকালের স্তর**—৩ বছর থেকে ১০ বছর,

(২) **কৈশোরকালের স্তর**—১০ বছর থেকে ১৪-১৫ বছর এবং

(৩) **যৌবনপ্রাপ্তির স্তর**—১৪-১৫ বছর থেকে ১৯-২০ বছর।

একটা কথা এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন। উপরে যে বয়সগুলি উল্লেখ করা হ'ল—এগুলি যেন অপরিবর্তনীয় বলে মনে করা না হয়। বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে দৈহিক, সামাজিক ও পারিবেশিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বয়সগুলিও পরিবর্তিত হ'যে যায়। বয়সগুলির সঙ্গে শিশুর শিক্ষা পর্যায়ের একটা যোগসূত্র আছে। বাল্যকাল নার্শারী, কিণ্ডারগার্টেন বা প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের কাল, কৈশোরকাল হ'ল—মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের প্রাথমিক পর্যায় এবং যৌবনপ্রাপ্তির স্তর হ'ল মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের শেষ পর্যায়।

বাল্যকালের যৌন শিক্ষা : বাল্যকালে প্রত্যক্ষ ভাবে যৌনশিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। এ স্তরে যৌনশিক্ষা দিতে হবে প্রাসঙ্গিকক্রমে ও পরোক্ষ ভাবে। নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশুর যৌন কৌতূহল পরিতৃপ্ত করতে হবে, তার যৌন আবেগ সুনিয়ন্ত্রিত করতে হবে। এই স্তরে শিশুর যৌন অনুভূতির বৈশিষ্ট্য হ'ল—সেটি দেহকেন্দ্রিক; শিশুর যৌনবিষয়ক কৌতূহল তার নিজের দেহকে কেন্দ্র করে বেড়ে ওঠে বলে ফ্রয়েড এই স্তরের যৌনতাকে "আত্ম-রতি মূলক" (auto-erotic) বলে বর্ণনা করেছেন। তার নিজের দেহকে কেন্দ্র করে হাজার প্রশ্ন তার মনে ভীড় জমায়। সব চেয়ে বেশী কৌতূহল তার নিজের যৌনাঙ্গ সম্বন্ধে। একটু বড় হ'লে তার কৌতূহলের মাত্রাও কিছু বাড়ে। বিপরীত যৌনাঙ্গও তার কৌতূহল উদ্রেক করে। যখন শিশু একটু বড় হ'য়ে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে শেখে তখন সে যৌনবিষয়ক নানা কথা শেখে। সে এই সম্বন্ধীয় নানা প্রশ্ন বাড়ীতে করতে শুরু করে। তখনই মাতাপিতার উপর বেশ গুরু দায়িত্ব এসে পড়ে। ছেলেমেয়েরা প্রথম দিকে সঙ্গী-সাথী নির্বাচনে কোন বাছ-বিচার করে না। কিন্তু সাধারণতঃ ৮-৯ বছর বয়সে তারা ছেলেমেয়ে নির্বাচন করে মেলামেশা করতে থাকে।

(শিশুর বাল্যকালের যৌনশিক্ষার দায়িত্ব—পরিবারের। শিশুরা সাধারণতঃ মায়ের উপর বেশী নির্ভর করে। বাল্যকালে মা'কেই শিশুর যৌন কৌতূহল পরিতৃপ্ত করতে ও যৌন আবেগ নিয়ন্ত্রিত করতে হয়।) প্রায় প্রত্যেকটি শিশুর চিরন্তন প্রশ্ন—এলাম আমি কোথা থেকে! আর প্রায় প্রত্যেকটি শিশু ভাবে—তার মায়ের পেট কেটে তাকে বাইরে আনা হয়েছে! শিশুও তাই এ ব্যাপারে নানা প্রশ্নে মাকে বিব্রত করতে থাকে। অনেকে এ প্রশ্নকে অশ্লীল অবান্তর, অস্বাভাবিক বলে মনে করেন এবং শিশুর "পাকামী বা জ্যাঠামী" দমন করার জন্য শাসনের পথটি বেছে নেন। এটা কিন্তু আদৌ মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়। শিশুর প্রকৃত যৌন কৌতূহল যাতে অবদমিত না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে মাতাপিতা উভয়কেই। যতদূর সম্ভব সহজ ভাবে ও শালীনতার মধ্যে তাদের যৌনজীবনের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রয়োজন হ'লে রূপকের সাহায্য নিতে হবে। আর একটা কথা। পরিবারে ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে কাজ করা বা খেলাধূলার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তারা যেন পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে একটা স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে—সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আবার কোনপ্রকার অবাঞ্ছিত যৌনপ্রচেষ্টায় তারা যেন লিপ্ত না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুরা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির নির্ভুল নাম শিখুক; জন্মরহস্য যদি সে জানতে চায়—তাকে রূপকের সাহায্যে জানানো হোক। এ জন্য ডিম থেকে বাচ্চা হওয়া বা পাখীর বাসাতে ডিম—ইত্যাদি উদাহরণের সাহায্য লওয়া চলতে পারে।

পরিবারের পরই আসে বিদ্যালয়ের স্থান। বিদ্যালয়ে যৌনশিক্ষা সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত পাঠদান করা সম্ভব। তবে আগেই বলা হয়েছে—এ শিক্ষা প্রত্যক্ষ হবে না; হবে পরোক্ষ। শিশুরা বিদ্যালয়ে জীববিদ্যা, শরীরবিদ্যা ইত্যাদি পড়বে। বিদ্যালয়ে তাদের ইন্দ্রিয়ানুশীলনের ব্যবস্থা থাকবে। সহ-শিক্ষামূলক বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে একটা দেওয়াল তুললে তারা অতিরিক্ত কৌতূহলীই হবে এবং তাদের যৌন জিজ্ঞাসার পরিমাণ ও মাত্রা বাড়বে বই কমবে না। আমেরিকার কিছু নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন স্কুল ছেলে-মেয়েদের পার্থক্য দূর করার জন্য ও তাদের সম্পর্কটি স্বাভাবিক করার জন্য সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় রৌদ্র-স্নানের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু এ ব্যবস্থা খুব বেশী একটা বয়স পর্যন্ত চলতে বোধ হয় পারে না। যাই হোক—ছেলেমেয়েদের

বিভিন্ন জাতীয় শারীরিক ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিমূলক পার্থক্য সম্বন্ধে তাদের সচেতনতা ও কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সহানুভূতির সঙ্গে সেগুলি বিবেচনা করতে হবে, তাদের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে ও তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে হবে। কোন জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ছাড়াই পরোক্ষ ভাবে এবং প্রাসঙ্গিকক্রমে তাদের যৌনশিক্ষা দিতে হবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত কাজ-কর্ম ও খেলাধূলার মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতার যোগসূত্র স্থাপন করতে পারলে উভয় পক্ষের সঙ্কোচেরও অবসান ঘটা সম্ভব।

কৈশোরকালে যৌন-শিক্ষা : কৈশোরে ছেলেমেয়েদের যৌন-কৌতূহল উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের যৌবনপ্রাপ্তি বা যৌবনাগম কিছুটা আগে ঘটে বলে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশী যৌন-সচেতন হয়। কাজেই এই স্তরে মেয়েদের দিকে সবিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এই স্তরে ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের শরীরেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আত্মপ্রকাশ করে। তারা এগুলির আকস্মিকতাতে ভয় পায় এবং সেগুলিকে অস্বাভাবিক মনে করে। এর ফলে তাদের মধ্যে একটা প্রাক্ষোভিক আলোড়ন চলতে থাকে। এটি প্রশমিত করতে না পারলে শিশুদের মধ্যে যৌনমূলক অপসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। এই স্তরে প্রধান পরিবর্তন হ'ল—মেয়েদের ক্ষেত্রে রজঃ সৃষ্টি ও ছেলেদের ক্ষেত্রে বীর্যোৎপাদন। মেয়েদের ক্ষেত্রে তাদের মা এ ব্যাপারে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ছেলেদের ক্ষেত্রে পিতাকেও তাদের যৌনমূলক শরীরতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হবে। যে সমস্ত ছেলেমেয়ে তাদের দৈহিক পরিবর্তনগুলির প্রকৃত স্বরূপ ও গুরুত্বের কথা না জেনেই জীবন-পরিক্রমা শুরু করে, তারা নানাপ্রকার সমস্যা, সংশয় ও ভ্রান্তির সম্মুখীন হয়ে থাকে। যৌনশিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত— তাদের এই সমস্ত সমস্যার হাত থেকে বাঁচানো। কিশোর স্তরের যৌনশিক্ষার পাঠ্যসূচীতে যৌনশিক্ষার অবতারণা করা যেতে পারে সাহিত্য, শারীরবিদ্যা, স্বাস্থ্য ও মানসিক বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ের মাধ্যমে। এই স্তরে ছেলে-মেয়েদের দৈহিক পরিবর্তন, যৌনমূলক প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান ও নির্ভুল ধারণা অর্জনে সাহায্য করতে হবে। সর্বোপরি ছেলেদের প্রতি মেয়েরা এবং মেয়েদের প্রতি ছেলেরা যাতে শ্রদ্ধাশীল ও বিশ্বস্ত হতে পারে, যাতে তাদের মধ্যে একটা সুস্থ সম্পর্ক ও উদার মনোভাব গড়ে ওঠে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

যৌবনপ্রাপ্তির স্তরে যৌনশিক্ষা : যৌবনপ্রাপ্তির স্তরটি অত্যন্ত মারাত্মক স্তর। এই সময় যৌন-কৌতূহল বাস্তবকে কেন্দ্র করে বেড়ে উঠতে থাকে। এই সময় বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অত্যন্ত তীব্র হয়। ছেলেমেয়ে উভয়েই যৌন-আচরণ অপেক্ষা তার কল্পনাতেই বেশী আনন্দ পায়। আবার নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কটি তাদের জানা হয়ে গেছে। ফলে তারা মেলামেশার সুযোগ খোঁজে। কিন্তু সামাজিক বাধা-নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ, যৌন শিক্ষা ও সম্পর্ক সম্বন্ধে অজ্ঞতা, কুশিক্ষা ইত্যাদি তাদের মেলামেশার পথে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে তাদের মধ্যে নানা অসঙ্গতি দেখা দেয়। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ পরিবর্তিত হয়ে তাদের মধ্যে সমকামিতার (Homo-Sexuality) লক্ষণ দেখা দিতে পারে। কিন্তু (প্রাপ্তযৌবনদের যৌন আকর্ষণ যদি তার স্বাভাবিক লক্ষ্যে গিয়ে না পৌঁছায়, তবে ভবিষ্যৎ জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে। বিকৃত যৌন-প্রবণতা সুখী ও সফল দাম্পত্য জীবনের একটা প্রধান অন্তরায়। কাজেই এই অবাঞ্ছিত পরিণাম থেকে তাদের রক্ষা করে মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার একমাত্র উপায়ই হ'ল সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে যৌনশিক্ষা দেওয়া। এই স্তরের পাঠ্য-সূচীতে নিম্নলিখিত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

- জীববিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান পরিবেশনের মাধ্যমে যৌন-বিষয়ক তথ্যাদির আলোচনা করা।
- বিভিন্ন জাতীয় যৌন-বিকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান ও সংবাদ পরিবেশন।
- যৌনতা সম্বন্ধে একটা বলিষ্ঠ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে সহায়তা করা।
- যৌন-আচরণের পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করা।
- দাম্পত্য জীবন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা।
- নারী-পুরুষের সুষ্ঠু সম্পর্ক ও তজ্জনিত ব্যক্তিগত ও সমাজগত সুফল এবং অস্বাস্থ্যকর ও অবাঞ্ছিত সম্পর্ক স্থাপনের কুফল সম্বন্ধে আলোচনা করা।
- সন্তান-ধারণের রহস্য ও সন্তান-পালনের নিয়মাবলী সম্পর্কে অবহিত করা।
- বিভিন্ন জাতীয় সম্মিলিত কার্যক্রম, যেমন খেলাধুলা, গীত-বাদ্য, নৃত্য, নাটক, সামাজিক মেলামেশা, ভ্রমণ বা অন্যান্য সৃজনাত্মক কার্যাবলীর সুব্যবস্থা করা।

॥ চৌদ্দ ॥

শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পরিচালনা

(Educational and Vocational Guidance)

[Guidance : Employed in a technical sense in three connexions :—(1) *Child guidance*, meaning the organization and co-operation of medical, psycholegical, educational psychiatric advice and treatment, through special clinics, in dealing with difficult or retarted children presenting either behaviour or educational problems ; (2) *Educational guidance*, meaning the employment of standardized tests, mental and educational, together with progress records, school reports etc, as a basis for advice to children and parents regarding educational courses which should be followed after the child has passed through the primary school ; (3) *Vocational guidance*, meaning the assistance of the child and child's parents in choosing a suitable vocation for the child, by means and on the basis of a systematic procedure, involving intelligence tests, educational tests, speciel aptitude, and special disabilities tests, school records, tastes and inclinations information regarding the state of labour market, etc

—*Dictionary of Psychology*.

"The provision of diversified courses of instruction imposes on teachers and school administrators the additional responsibility of giving proper guidance to pupils in their choice of courses and careers. The secret of good education consists in enabling the students to realise what are his talents and aptitudes and in what manner and to what extent he can best develop them so as to achieve proper social development and seek right types of employment" *Mudaliar* Commission *(1952-53)*.

Guidance and counselling should be regarded as an integral part of education, meant for all students and aimed at assisting the individual to make decisions and adjustments from time to time"—*Kothary Commission (1964-66)*.]

পরিচালনা কাকে বলে ? (What is Guidance ?) : সাধারণতঃ পরিচালনাকে আমরা তিনটি সুপ্রচলিত অর্থে ব্যবহার করি, যথা–শিশু পরিচালনা, শিক্ষামূলক পরিচালনা ও বৃত্তিমূলক পরিচালনা। পরিচালনা কথাটিকে আবার নানা অর্থে ব্যবহার করা হয়; যেমন—নির্বাচন করা, সাহায্য বা সহায়তা করা, এগিয়ে দেওয়া, নির্দেশ দেওয়া, লক্ষ্য স্থির করা ইত্যাদি। কিন্তু এই সমস্ত অর্থ

যে ভাবেই গ্রহণ করা হোক্ না কেন, সুপরিচালনার অর্থ হ'ল—ব্যক্তির সর্বাত্মক মঙ্গল বিধান করা ও তার সুষম বিকাশে সহায়তা করা।) সুপরিচালনা এক ধরনের সাহায্য; কিন্তু এমন সাহায্য যার ফলে ব্যক্তি তার লক্ষ্য স্থির করতে পারে, তার সাধ ও সাধ্যের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপন করতে পারে এবং সর্বোপরি ব্যক্তি আত্ম-বিশ্বাসী ও সক্রিয় হয়ে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। অনেকে সুপরিচালনাকে ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া একটা বোঝা বলে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুপরিচালনা ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। আবার সুপরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যক্তি পরিচালকের উপর নির্ভরশীল না হয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়। পরিচালনা সঠিক পথ নির্দেশ করে দেয় মাত্র; কিন্তু সেই পথ ধরে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর দায়িত্ব কিন্তু ব্যক্তিটির। ব্যক্তি হয় তো তার সামর্থ্য, রুচি, প্রবণতা ইত্যাদির সন্ধান জানে না। পরিচালক ব্যক্তিকে সে সম্বন্ধে অবহিত করে থাকেন। সুপরিচালনা ব্যক্তির সমগ্র জীবনের সঙ্গে জড়িত। এর ফলে ব্যক্তি তার সামর্থ্যের চরম সীমায় পৌঁছাতে পারে এবং সমাজের একজন সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে পরিগণিত হয়। কাজেই সুপরিচালনার সঙ্গে সমাজের উন্নতি এবং অগ্রগতিও জড়িত।

অনেকে পরিচালনা বলতে কেবলমাত্র বৃত্তিমূলক পরিচালনাকেই নির্দেশ করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরিচালনা আরো ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুপরিচালনার প্রয়োজন। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিচালনাকে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সুপরিচালনার ব্যবস্থা না থাকলে বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিচালনার কোন মূল্যই থাকে না। সুপরিচালনা শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল করার চেষ্টা করে। আবার সুপরিচালনাই ব্যক্তির সামগ্রিক মঙ্গল বিধানে ও সার্থক সঙ্গতি সাধনে সহায়তা করে। এইজন্য শিক্ষা ও জীবনের সকল স্তরেই সুপরিচালনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন জাতীয় সুপরিচালনা (Different kinds of Guidance): বর্তমান অধ্যায়ের শুরুতেই Dictionary of Psychology থেকে উদ্ধৃত তিন প্রকার পরিচালনার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া আরো বিভিন্ন জাতীয় পরিচালনার কথা বলা হয়ে থাকে। এখন কতকগুলি সুনির্দিষ্ট পরিচালনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল—

[এক] **শিশু পরিচালনা (Child Guidance):** যে সমস্ত শিশু মানসিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে সমস্যামূলক, বিশেষ চিকিৎসাগারে বা মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে তাদের সমস্যাগুলির প্রকৃতি নির্ধারণ করে তাদের জন্য চিকিৎসাশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনঃসমীক্ষণসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করে সমস্যার হাত থেকে মুক্ত করা হ'ল শিশু পরিচালনার অর্থ ও উদ্দেশ্য।

[দুই] **শিক্ষামূলক পরিচালনা (Educational Guidance):** শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করাই হ'ল শিক্ষামূলক পরিচালনার উদ্দেশ্য। এই জাতীয় পরিচালনা সাধারণতঃ শিশু কি জাতীয় শিক্ষা গ্রহণ করবে বা শিক্ষাসূচীর কোন শাখাতে সে সবচেয়ে ভালো ফল করতে পারে, তা স্থির করে দেয়। এর জন্য বিভিন্ন জাতীয় আদর্শীকৃত অভীক্ষা, শিক্ষামূলক ও মানসিক অভীক্ষা, শিশুর প্রগতি-পত্র সবাত্মক পরিচয়-লিপি ইত্যাদির সাহায্য লওয়া হয় এবং শিশু ও তার অভিভাবককে সেইমত নির্দেশ দেওয়া হয়। এ ছাড়া প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, সেন্টিমেন্ট, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির সুষ্ঠু বিকাশ এবং নিয়ন্ত্রণও এই জাতীয় পরিচালনার পরিধির মধ্যে পড়ে।

[তিন] **বৃত্তিমূলক পরিচালনা (Vocational Guidance):** বৃত্তিমূলক পরিচালনার মূল কথা হ'ল—ব্যক্তিকে বৃত্তির উপযুক্ত করে গড়ে তোলা এবং বৃত্তির উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করা। শিশু পরবর্তিকালে কি বৃত্তি অবলম্বন করবে, কোন্ বৃত্তি তার উপযুক্ত হবে—সেইমত নির্দেশ দেওয়া এবং তাকে প্রস্তুত করা—এই হ'ল বৃত্তিমূলক পরিচালনার উদ্দেশ্য। এরজন্য বুদ্ধির অভীক্ষা, রুচি আগ্রহ ও প্রবণতাব অভীক্ষা, তার মানসিক ও প্রাক্ষোভিক সংগঠন বোঝা যাবে এ জাতীয় অভীক্ষা ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়।

[চার] **স্বাস্থ্য রক্ষামূলক পরিচালনা (Health Guidance):** সুস্থ দেহেই সবল মনের বাস। শিশু-বিদ্যালয়ে শিশুকে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে যথোপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। শিশুকে নীরোগ ও কর্মঠ করে গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য তার কি জাতীয় ব্যায়াম করা উচিত, কি জাতীয় পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা উচিত, কখন বিশ্রাম করতে হবে, কখন ঘুমুতে হবে, কখন উঠতে হবে—ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়।

শিশুদের মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত দোষ-ত্রুটি দূর করার ব্যাপারে

বিশেষ জাতীয় শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন (Child Hospital and Child Guidance clinic)। কিন্তু আমাদের দেশে এ জাতীয় স্বতন্ত্র হাসপাতালের সংখ্যা অত্যন্ত কম। শিশুর দৈহিক ও মানসিক ত্রুটির জন্য বিভিন্ন জাতীয় অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়। এর ফলে শিশুর আচরণ তো সমস্যামূলক হয়ই, সে অপরাধপ্রবণও হয়ে যায়। কাজেই শিশুর সর্বাত্মক সুষম বিকাশের জন্য স্বাস্থ্য-রক্ষামূলক পরিচালনার একান্ত প্রয়োজন।

[পাঁচ] **সার্থক অবসর যাপনমূলক পরিচালনা** (Leisure-time Guidance): বিদ্যালয়ের কাজ কেবলমাত্র শিক্ষাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না—সার্থক ভাবে অবসর সময় যাপন করার শিক্ষা দেওয়াটাও বিদ্যালয়েরই কাজ। শিক্ষার্থীরা কিভাবে অবসর সময় যাপন করবে, কোন্ জাতীয় কাজে সে আনন্দ পাবে, কিভাবে সে পাঠের বা কাজের একঘেয়েমী দূর করতে পারবে – কি ভাবে অবসর সময়ে সৃজনমূলক কোন কাজ করা যেতে পারে— ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হ'ল অবসর যাপনমূলক পরিচালনার উদ্দেশ্য। প্রত্যেকের জীবনে কিছু না কিছু অবসর থাকেই। সেইটিকে সার্থক ভাবে যাপন করতে হবে।

[ছয়] **নাগরিকতামূলক পরিচালনা** (Civic Guidance): বিদ্যালয়ের অন্যান্য জাতীয় কর্তব্যের মধ্যে সামাজিক কর্তব্যও অন্যতম। আজকের শিশু ভবিষ্যতে সমাজের একজন নাগরিক। তাকে সুনাগরিক করে গড়ে তোলা প্রতিটি বিদ্যালয়েরই কর্তব্য। শিশু যে রাষ্ট্রে ও সমাজে বাস করবে সেই রাষ্ট্র বা সমাজের একজন সুযোগ্য সদস্য হবার উপযুক্ত গুণাবলী অর্জন করতে সাহায্য করাই হ'ল নাগরিকতামূলক পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য। এই জাতীয় সুপরিচালনাই রাষ্ট্র ও সমাজের যথাযথ মঙ্গল সাধন করতে পারে।

[সাত] **নৈতিকতামূলক পরিচালনা** (Moral Guidance): জীবনের অন্যান্য দিকের পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর নৈতিক দিকটিও সুপরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নৈতিকতামূলক পরিচালনার অর্থ হ'ল—শিক্ষার্থীর মধ্যে নৈতিক চেতনা জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করা। এ জাতীয় পরিচালনার ফলেই শিশু ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ধারণা অর্জন করতে পারে। মানুষ প্রাকৃতিক পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলেও সৎভাবে জীবন যাপন করার জন্য তাকে একটি নৈতিক পৃথিবী সৃষ্টি

করে নিতে হয়। তাছাড়া কৈশোর ও বয়ঃসন্ধি কালে যখন তার সামনে একটা আদর্শগত সংঘাত সৃষ্ট হয়, তখন এই পরিচালনাই তাকে উপযুক্ত আদর্শের সন্ধান দেয়। এই আদর্শ সৃষ্ট না হ'লে শিশু অপরাধী বা সমাজবিরোধী হ'য়ে বেড়ে ওঠে।

আমরা যদিও পরিচালনাকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করলাম—তবু একথাও মনে রাখতে হবে—এগুলির মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য নেই। একটি ক্ষেত্রের সুপরিচালনা অন্য একটি ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করে। তাছাড়া শিক্ষাজীবনের সঙ্গে বৃত্তি-মূলক জীবন, বৃত্তির সঙ্গে অবসরের, নাগরিকতার নৈতিকতা প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। একটি অন্যটি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য যেমন ব্যক্তির সামগ্রিক উন্নতি বিধান, পরিচালনার উদ্দেশ্যও তেমনি ব্যক্তির সামগ্রিক মঙ্গল সাধন। তবু আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পরিচালনার প্রয়োজন ও সুযোগ অপেক্ষাকৃত বেশী বলে এখন সে দুটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হ'ল।

শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পরিচালনা (Educational and Vocational Guidance) : যে কোন শিক্ষাব্যবস্থা ও বৃত্তির সঙ্গে পরিচালনা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। শিক্ষা শিক্ষার্থীর পরিবর্তিত পরিবেশ ও ভিন্ন জাতীয় চাহিদাগুলির সঙ্গে তার সার্থক সঙ্গতিবিধানে সহায়তা করে। তাছাড়া শিক্ষার ফলেই শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশ সম্ভবপর হয়। কিন্তু সুপরিচালনার অভাবে এই ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশে বিঘ্ন সৃষ্ট হ'তে পারে।

অনেকে পরিচালনাকে বাঁধাধরা ছকে ফেলা সুনির্দিষ্ট একটা যান্ত্রিক পদ্ধতি বলে বর্ণনা করে থাকেন। এটা কিন্তু মারাত্মক ভুল ধারণা। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা, রুচি, আগ্রহ বা প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে কয়েকটি মাত্রায় বিভক্ত করা বা কতকগুলি বিশেষ বৃত্তির জন্য তাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য বা অর্থ নয়। পরিচালনা একটি দীর্ঘ, কঠিন ও ধৈর্য-সাপেক্ষ ব্যাপার। শিক্ষার্থী তার মেধা, রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদির ভিত্তিতে কি জাতীয় শিক্ষাক্রম নির্বাচন করবে, কোন জাতীয় জীবিকা তার পক্ষে উপযুক্ত হবে এবং কিসে সে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে—সে বিষয়ে সুপরামর্শ দিয়ে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে তোলাই হ'ল সুপরিচালনার উদ্দেশ্য। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অভীক্ষা প্রয়োগ করে এবং কয়েকজন

বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিয়ে পরিচালনার কাজটি সুষ্ঠু ভাবে করা সম্ভব হয় না। সুপরিচালনার জন্য শিক্ষক, অভিভাবক, শ্রেণী-শিক্ষক, প্রধান-শিক্ষক, কেরিয়ার মাষ্টার, পরিচালন-অধিকর্তা ইত্যাদি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।'

শিক্ষামূলক পরিচালনা : সাধারণতঃ শিক্ষা গ্রহণের মূলে থাকে কোন না কোন বৃত্তি গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা বা চাহিদা। এই জাতীয় শিক্ষা-গ্রহণ কালে যখন শিক্ষার্থীরা কোনপ্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন সেগুলি ঠিকমত সমাধান করার অর্থ হ'ল শিক্ষামূলক পরিচালনা। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষামূলক পরিচালনা বৃত্তিমূলক পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষামূলক পরিচালনা আবার শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ সাধনে সহায়তা করে। শিশুর মধ্যে নানাপ্রকার প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের আনাগোনা চলতে থাকে ও সে নানা বিষয় জানার জন্য কৌতূহলী হয়। বিভিন্ন দিকে তার রুচি, আগ্রহ ও প্রবণতা ধাবিত হতে থাকে। শিশুর শিক্ষায় যাতে এ সমস্ত বিষয় অবহেলিত না হয়, শিক্ষক সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। তাছাড়া শিক্ষা যাতে শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক চাহিদার অনুকূল হয়, তাও লক্ষ্য করতে হবে। শিক্ষার্থীর ক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে শিক্ষা দিতে হবে। এর ফলে সৃষ্ট হয়েছে ব্যক্তিমুখী শিক্ষাদান পদ্ধতি।

শিশুকে সুযোগ্য সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে তোলাও শিক্ষামূলক পরিচালনার অন্যতম লক্ষ্য। শিশু বিভিন্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে এবং তার ফলে তার মনে বিভিন্ন প্রকার প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন জাতীয় প্রক্ষোভের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করতে হবে। সার্থক ভাবে সঙ্গতি সাধন করতে শিক্ষা দেওয়াও শিক্ষামূলক পরিচালনার কাজ। তেমনি শিশু পাঠদানে কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তার মধ্যে অনগ্রসরতা দেখা যায় কি না—, যদি যায়, কেন দেখা যায়, তা দূরীকরণের উপায় কি, এ সব প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া যায় পরিচালনার মাধ্যমে।

(শিক্ষামূলক পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে বাঞ্ছিত পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।) প্রাক্ প্রাথমিক স্তর হ'তেই পরিচালনা করার কাজটি শুরু হয়ে যায়—এবং এটি চলে সারা জীবন ধরে। (শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রসর হবার সময় শিক্ষার্থী নানাপ্রকার জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়। সেগুলি সমাধান করা একান্ত প্রয়োজন।) একেবারে নীচু স্তরে পরিচালনার ততটা গুরুত্ব থাকে

না। কিন্তু নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর থেকেই এর গুরুত্ব অনুভূত হতে থাকে। যেখানে শিক্ষাক্রম বিভাজনের (Streaming) প্রশ্ন থাকে, সেখানে এটি আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

শিক্ষামূলক পরিচালনার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হ'ল :—

১। শিক্ষার্থীর ক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা-পাঠক্রম নির্বাচন ও নির্ধারণ করা।

২। শিক্ষাদানের পদ্ধতির উন্নতিকরণ।

৩। শিক্ষায় অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ পদ্ধতি নির্ধারণ করা।

৪। উন্নত-বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষধর্মী পাঠক্রম স্থির করা।

৫। পরীক্ষাতে অকৃতকার্যতার কারণ অনুসন্ধান করা।

৬। শিক্ষার্থীকে পাঠগ্রহণে অনুপ্রাণিত করা।

৭। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা ও অনগ্রসরতা দূর করা।

Crow এবং Crow-এর মতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক পরিচালনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—

১। শিক্ষার্থীর ক্ষমতা, আগ্রহ ও ভবিষ্যৎ চাহিদার ভিত্তিতে পাঠক্রম নির্ধারণ করা।

২। শিক্ষার্থী লেখাপড়াতে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করতে পারবে—এমন কাজ করার সুযোগ দেওয়া বা অভ্যাস অর্জনে সহায়তা করা।

৩। ছাত্রের বিশেষ আগ্রহের সীমার মধ্যে যে সমস্ত পাঠ্য বিষয় বা ক্রিয়া-কলাপ পড়ে না, সেগুলি সম্বন্ধেও কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা।

৪। বিদ্যালয় কি ভাবে সাহায্য করছে—তা উপলব্ধি করানো।

৫। শিক্ষার্থীর চাহিদার সঙ্গে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যের সম্পর্ক স্থাপন করা।

৬। পরবর্তিকালে ছাত্র যদি কোন প্রকার পাঠগ্রহণে ইচ্ছুক থাকে, তবে যে স্কুল বা কলেজে সে পাঠগ্রহণ করতে চায় তার উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে অবহিত করা।

৭। শ্রেণীকক্ষের বাইরে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে ছাত্রের সক্রিয় অংশ গ্রহণে সহায়তা করা।

৮। ভবিষ্যৎ বৃত্তির উপযুক্ত মেজাজ গড়ে তোলা।

৯। পাঠক্রম, বিদ্যালয় পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সার্থক ভাবে সঙ্গতিসাধনে ছাত্রকে সাহায্য করা।

কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিচালনা সম্ভব? শিক্ষাক্ষেত্রে সুপরিচালনা দু'ভাবে সম্ভব। এটির একটি তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল—

শিক্ষামূলক পরিচালনা

ব্যক্তিগত (Individual)	দলগত (Group)
১। ছাত্রের অর্জিত জ্ঞানের অভীক্ষা।	১। বক্তৃতা।
২। বুদ্ধির অভীক্ষা।	২। মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা।
৩। প্রবণতা পরিমাপক অভীক্ষা।	৩। বিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত ছাত্র সম্পর্কীয় সংবাদ।
৪। রুচি বা আগ্রহের অভীক্ষা।	৪। পরিবার থেকে প্রাপ্ত ছাত্র
৫। ব্যক্তিসত্তা নির্ণায়ক অভীক্ষা।	৫। সাক্ষাৎকার।
৬। স্বাস্থ্য ও দৈহিক বিকাশ সম্বন্ধীয় তথ্য।	৬। ছাত্রের প্রোফাইল প্রস্তুত করণ।
৭। পারিবারিক ইতিহাস।	৭। পর্যবেক্ষণ।

বৃত্তিমূলক পরিচালনা : (বৃত্তিমূলক পরিচালনার অর্থ হ'ল—ব্যক্তিকে তার উপযুক্ত একটি বৃত্তি গ্রহণ করতে, সেই বৃত্তির জন্য তাকে প্রস্তুত করতে এবং ঐ নির্দিষ্ট বৃত্তিটিতে ব্যক্তির উন্নতিসাধন করতে পরামর্শ দেওয়া ও সাহায্য করা।) বৃত্তিমূলক পরিচালনার মূল লক্ষ্য হ'ল—Fitting the man to the job and fitting the job to the man. (Job satisfaction and job requirement)। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (Intrenational Labour Organisation) বৃত্তিমূলক পরিচালনার যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন, তা হ'ল এইরূপ—

(বৃত্তিমূলক পরিচালনার অর্থ হ'ল—কোন এক ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ ক্ষমতাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে তার বৃত্তিমূলক সুযোগের পর্যালোচনা করার পর বৃত্তি নির্বাচনে বা বৃত্তিতে উন্নতির ক্ষেত্রে কোন প্রকার সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধান-কল্পে যথাযথ ভাবে সুপরামর্শ দেওয়া ও সাহায্য করা।)

(বৃত্তিমূলক পরিচালনার উদ্দেশ্য হ'ল—ব্যক্তির রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী তাকে এমন বৃত্তি নির্বাচন ও গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া যাতে তার উন্নতি ও পরিতৃপ্তি সাধিত হবে জাতির "মনুষ্য-শক্তি" (Man power) সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।)

প্রয়োজনীয়তা : (প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কোন না কোন দিকে বিভিন্ন গুণাবলীর মধ্যে যথেষ্ট মাত্রাগত পার্থক্য দেখা যায়। এটিকেই আমরা ব্যক্তিগত পার্থক্য বলে থাকি। এই ব্যক্তিগত বিভিন্নতার জন্যই প্রত্যেকে এক প্রকার বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে না বা একই বৃত্তিতে সমান ভাবে উন্নতি করতে পারে না। এই পার্থক্যের জন্যই বৃত্তিমূলক পরিচালনার একান্ত প্রয়োজন)। ব্যক্তিগত পার্থক্য যদি না থাকত, তবে বৃত্তিমূলক পরিচালনার কোন প্রয়োজনই থাকত না। আগে এই ব্যক্তিগত পার্থক্যের উপর তত বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হোতো না। এই বৃত্তিগুলি বংশ পরম্পরায় একভাবে চলে আসত। অবশ্য তখন জীবনযাত্রা ও সমাজ-জীবনে জীবিকা এতখানি জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণও ছিল না। বর্তমান যুগে এই জটিলতা ও বৈচিত্র্যের জন্য বৃত্তিমূলক পরিচালনার একান্ত প্রয়োজন।

(আবার ব্যক্তি ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বৃত্তিমূলক পরিচালনার প্রয়োজন। বৃত্তিটি যদি ব্যক্তির উপযুক্ত হয়, তবে ব্যক্তির মধ্যেও একটা পরিতৃপ্তি আসে। সে ঐ বৃত্তিটিতে আরো বেশী উন্নতি করার চেষ্টা করে।) তার ব্যক্তি সত্তাটিও সুষম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। সামগ্রিক উন্নতির ফলে ব্যক্তি সমাজের একজন সুযোগ্য সদস্য হিসেবে পরিগণিত হয়। ব্যক্তির উন্নতির অর্থ হ'ল সমাজের উন্নতি।) তাহ'লে দেখা যাচ্ছে—সুখী ও (সুসংহত সমাজ সংগঠনের জন্য বৃত্তিমূলক পরিচালনার প্রয়োজন আছে।)

(প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অপরিসীম ক্ষমতা নিহিত আছে। দেশের উন্নতির জন্য এই অন্তর্নিহিত ক্ষমতা পুরোপুরি ভাবে কাজে লাগানো প্রয়োজন।) কিন্তু এই ক্ষমতা যদি ঠিক পথে পরিচালিত না হয়, তাহ'লে সুফলের চেয়ে কুফল ঘটার সম্ভাবনাই বেশী। (বর্তমান সমাজ পরিবর্তনশীল। প্রতিদিনই নূতন আবিষ্কার করছেন বৈজ্ঞানিকেরা। ফলে বৃত্তির প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।) তাছাড়া স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদি আবিষ্কারের ফলে সময় ও শ্রম অনেক বেঁচে যাচ্ছে। (ব্যক্তি তার ক্ষমতা আরো বেশী করে ও বেশী সময়ের জন্য কাজে লাগাতে

পারেন। কিন্তু কি ভাবে কাজে লাগালে সর্বাধিক সুফল পাওয়া যেতে পারে— তা স্থির করা সম্ভব বৃত্তিমূলক পরিচালনার মাধ্যমে।)

(তাহ'লে দেখা গেল—একদিকে রয়েছে ব্যক্তি তার অমগ্র সম্ভাবনা ও ক্ষমতা নিয়ে; আর অন্যদিকে রয়েছে বৃত্তিগুলি তাদের চাহিদা ও প্রয়োজনগুলি নিয়ে। এই দুটি দিকের মধ্যে একটা সুষ্ঠু সংযোগ স্থাপন করাই বৃত্তিমূলক পরিচালনার উদ্দেশ্য।) বৃত্তিমূলক পরিচালনাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তিনটি দিক দেখতে পাই—

(এক) একটি বিশেষ বৃত্তি নির্বাচনের পরামর্শ দান, (দুই) ব্যক্তিকে বৃত্তিগত পরিবেশের সঙ্গে সার্থক ভাবে সঙ্গতি সাধনের জন্য প্রস্তুত করা এবং (তিন) ঐ বৃত্তিটির জন্য উপযুক্ত শিক্ষণের ব্যবস্থা করা।) এখন এই তিনটি দিক সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল—

ব্যক্তির মধ্যে কোন কোন দিকে যেমন ক্ষমতা দেখা যায়, তেমনি কোন কোন দিকে তার দুর্বলতাও দেখা যায়। উপযুক্ত ভাবে বৃত্তি নির্বাচন করতে হবে। শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের কথা যেমন ভাবা উচিত, তেমনি তার ত্রুটীগুলিও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এই দুটি দিক বিবেচনা করে ব্যক্তিকে বিশেষ একটি বৃত্তি নির্বাচন করতে পরামর্শ দেওয়া হ'ল বৃত্তিমূলক পরিচালনার প্রথম ও প্রধান কাজ।

এর পর আসে বৃত্তিগত পরিবেশ। বিভিন্ন বৃত্তির পরিবেশগুলি বিভিন্ন। শিক্ষকতার পরিবেশ আর কল কারখানার পরিবেশ এক নয়। তাছাড়া বিভিন্ন বৃত্তির জন্য ভিন্ন ভাবে পরিশ্রম করতে হয়। বৃত্তির সঙ্গে শ্রম, শ্রম-নিয়ম (Labour law), বেতন, বিভিন্ন জাতীয় শ্রমিক সংস্থার পরিচয়, বিশেষ বিশেষ বৃত্তির জন্য উদ্ভূত সমস্যাবলী ইত্যাদির সঙ্গে ব্যক্তিকে পরিচিত করা ও ঐগুলির সঙ্গে ব্যক্তিকে সুসার্থক ভাবে সঙ্গতি সাধনে সহায়তা করা হ'ল বৃত্তিমূলক পরিচালনার দ্বিতীয় কাজ।

সব শেষ আসে বৃত্তিমূলক শিক্ষণ। কোন একটি বৃত্তি গ্রহণের উপযুক্ত ক্ষমতা ব্যক্তির মধ্যে দেখা গেলেই যথেষ্ট নয়। বৃত্তিটিতে সর্বাধিক উন্নতি করার জন্য এবং বৃত্তিটির প্রতি সুবিবেচনা করার জন্য ব্যক্তিকে বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হ'ল বৃত্তিমূলক পরিচালনার তৃতীয় কাজ। এই শিক্ষণের ভিত্তি হবে ব্যক্তির ক্ষমতা, আগ্রহ, রুচি, প্রবণতা ইত্যাদি।

বৃত্তিমূলক পরিচালনার লক্ষ্য : বৃত্তিমূলক পরিচালনার লক্ষ্যগুলি বিভিন্ন। Crow এবং Crow এই সমস্ত বিভিন্ন লক্ষ্যের মধ্যে যেগুলি অত্যন্ত নির্দিষ্ট প্রকৃতির—তার একটি তালিকা দিয়েছেন। তাঁর মতে লক্ষ্যগুলি হ'ল—

১। শিক্ষার্থীর পছন্দমত বৃত্তির উপযোগী কর্তব্য, দায়িত্ব ও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে অবহিত করা।

২। শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্বন্ধে অবহিত করা এবং সেই ক্ষমতা ও দক্ষতা অনুযায়ী কোন্ বৃত্তি তার পক্ষে গ্রহণযোগ্য, সে বিষয়ে তাহাকে অবহিত করা।

৩। শিক্ষার্থী যে বৃত্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে, সে বৃত্তির প্রতি তার একটা সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করা—যাতে সে ঐ বৃত্তিতে নিযুক্ত হ'লে সর্বাধিক সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

৪। বিভিন্ন জাতীয় বৃত্তি এবং সেগুলির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাকে অবহিত করা।

৫। বিভিন্ন বৃত্তি সম্বন্ধে বিশ্লেষণমূলক চিন্তনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা।

৬। বিভিন্ন জাতীয় অপসঙ্গতিসম্পন্ন এবং অনগ্রসর শিশুকেও তাদের উপযুক্ত বৃত্তি নির্বাচনে সাহায্য করা।

৭। শিক্ষক এবং বৃত্তি-আধিকারিকের নির্বাচনের ভিত্তির উপর শিক্ষার্থীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করা।

৮। যে সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক শিক্ষণ দেওয়া হয়—সেগুলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে সংবাদ সরবরাহ করা।

৯। বিভিন্ন জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও বৃত্তিমূলক শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার নিয়মাবলী, শিক্ষণ-কালের দৈর্ঘ্য, শিক্ষণোত্তর সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে অবহিত করা।

১০। কোন একটি দলে কাজ করার সময় ঐ দলে ব্যক্তির স্থান, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে তাহাকে অবহিত করা ও ব্যক্তি যাতে ঠিকমত তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা।

১১। পরিশ্রম, কর্ম-নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি বিভিন্ন গুণ (যেগুলি বৃত্তিতে উন্নতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন) সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে অবহিত করা।

বৃত্তিমূলক পরিচালনার উপায়ঃ বৃত্তিমূলক সুপরিচালনা দেবার জন্য দু'রকম উপায়ের কথা বলা হয়। নীচে তার একটি তালিকা দেওয়া হ'ল—

বৃত্তিমূলক সুপরিচালনার উপায়

ব্যক্তি-পর্যবেক্ষণ	বৃত্তি-পর্যবেক্ষণ
১। সাধারণ শিক্ষা	বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষা,
২। বিশেষ শিক্ষণ	বিশেষ শিক্ষণ, শ্রমের প্রকৃতি ইত্যাদি
৩। বুদ্ধির পরীক্ষা	জ্ঞাতব্য তথ্য আহরণ করে কোন্ ব্যক্তি
৪। বিশেষ মানসিক ক্ষমতা	সেই বৃত্তির উপযোগী—তা নির্ধারণ করা।
৫। রুচি ও আগ্রহ	
৬। ঝোঁক ও প্রবণতা	
৭। দৈহিক অবস্থা	
৮। প্রাক্ষোভিক প্রকৃতি	
৯। ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ	
১০। অর্থনৈতিক অবস্থা।	

বিদ্যালয়গুলিই হ'ল বৃত্তিমূলক নির্দেশ দানের আদর্শ স্থান। অন্যান্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানের চেয়ে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়কে অধিকতর ভালোবাসে—কারণ তারা জানে বিদ্যালয় তাদের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্যই চেষ্টা করে। এখানে শিক্ষকবৃন্দও ছাত্রদের ঘনিষ্ঠ সংযোগে দীর্ঘদিন ধরে আসতে পারেন বলে তাদের বিভিন্ন গুণাবলীর সন্ধান পেয়ে থাকেন। তাছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্ররা বৃত্তিমূলক পরিচালনার উপযুক্ত বয়সে উপনীত হয়। শিক্ষকদের উপর ছাত্রদের আস্থা এবং বিশ্বাসও অনেক বেশী। শিক্ষামূলক পরিচালনা বৃত্তিমূলক পরিচালনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই সমস্ত কারণে আজকাল বিদ্যালয় বা কলেজ শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে বৃত্তিমূলক পরিচালনার কথা বলা হয়ে থাকে।

এখন নির্দেশনা ও সুপরিচালনা সম্বন্ধে কোঠারী কমিশনের অভিমতগুলি আলোচনা করা যাক্। কোঠারী কমিশনের অভিমত হ'ল—নির্দেশনা ও সুপরিচালনা প্রতিটি শিক্ষাব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়া উচিত, যাতে

প্রতিটি ছাত্রকে তার লক্ষ্য নির্বাচনে এবং বিভিন্ন সময়ে সঙ্গতি বিধানে সাহায্য করা যেতে পারে। কোঠারী কমিশন শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নির্দেশনার সুপারিশ করেছেন। সংক্ষেপে সেগুলি হ'ল—

প্রাথমিক স্তর : প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের একেবারে নীচু ক্লাশ থেকে নির্দেশনার কাজ শুরু হবে। তবে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা অনেক বেশী এবং ছাত্রসংখ্যা আরো বহুগুণ বেশী বলে কতকগুলি অত্যন্ত সহজ পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন—(১) শিক্ষকদের দুর্বলতা-নির্ণায়ক অভীক্ষা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে পরিচিত করা, (২) চাকুরীরত অবস্থায় থাকাকালীন শিক্ষকদের জন্য বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা করা, (৩) বৃত্তিমূলক সংবাদ সরবরাহ করা, (৪) শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের নিকট উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করা।

মাধ্যমিক স্তর : এই স্তরে কিশোর বা প্রাপ্তযৌবনদের বিশেষ জাতীয় নির্দেশনার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে পরিচালন-কেন্দ্র স্থাপন করে একজন সুযোগ্য বৃত্তি-আধিকারিক নিয়োগ করতে হবে। তবে এ ব্যাপারে অসুবিধা হ'লে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা যেতে পারে—

ক) প্রতি দশটি বিদ্যালয়ের জন্য একজন 'ভ্রমণকারী নির্দেশক' (Visiting counsellor) থাকবেন—যিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সহযোগিতায় ছাত্রদের শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক নির্দেশ দান করবেন।

খ) প্রতি জেলাতে অন্ততঃ একটি বিদ্যালয় থাকবে যেখানে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক নির্দেশ দানের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা থাকবে।

গ) রাজ্যে যে সমস্ত নির্দেশদান কেন্দ্র থাকবে—সেখান হ'তে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পরিদর্শক পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠক্রমে "শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পরিচালনা" সম্বন্ধীয় পর্যাপ্ত শিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

পরিচালনার মূলনীতি (Principles of Guidance): পরিচালনা—তা শিক্ষাক্ষেত্রেই হোক আর কোন বৃত্তির ক্ষেত্রেই হোক—একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সুপরিচালকের বেশ কিছু যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। কিশোর মন অনুধাবন করা এবং তার সমস্যাগুলি পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা তাঁর থাকা চাই। যিনি কিশোর মনের চাহিদা ও সমস্যাগুলির সঙ্গে পরিচিত নন,

তাঁর পক্ষে সুপরিচালনা করা সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীকে বিচার করতে হ'লে গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। সুযোগ্য পরিচালক হতে হ'লে শিক্ষাবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

বৃত্তিমূলক সুপরিচালনায় ক্ষেত্রে পরিচালকের বিভিন্ন বৃত্তির চাহিদা, যোগ্যতা ইত্যাদি যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাঁকে বিভিন্ন বৃত্তি সম্বন্ধে সংবাদ, তথ্য ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। তিনি একদিকে যেমন বৃত্তির প্রয়োজনগুলি লক্ষ্য করবেন—তেমনি ব্যক্তির প্রয়োজনের দিকেও লক্ষ্য রাখবেন।

পরিচালক একদিকে যেমন ছাত্র ও তার অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন, তেমনি অন্যদিকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবেন। এর জন্য তাঁকে পরিশ্রম ও সময় দুটিই ব্যয় করতে হবে।

সুপরিচালনা মনোবিজ্ঞানের যে সমস্ত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত—সুপরিচালককে সেই সমস্ত নীতির সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এ ব্যাপারে নীতি বা নিয়মগুলির কথা আগেই বলা হয়েছে। সংক্ষেপে সেগুলি হ'ল—ব্যক্তিগত বৈষম্য, বৃত্তি ও বৃত্তি-শিক্ষণের বিভিন্ন কেন্দ্র সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান, ব্যক্তিগত সাহায্য ও নির্দেশনা, বৃত্তির সঙ্গে জীবনের একটা যোগসূত্র স্থাপন করা, শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা, আগ্রহ ইত্যাদির উপর বৃত্তিটি প্রতিষ্ঠিত করা। ব্যক্তির উপযোগী বৃত্তি ও বৃত্তির উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করা। এই সমস্ত দিকগুলির কথা বিবেচনা ক'রে শিক্ষামূলক পরিচালনার সঙ্গে বৃত্তিমূলক পরিচালনা সংযুক্ত করতে পারলে—তবেই ব্যক্তির উপযোগী বৃত্তি এবং বৃত্তির উপযোগী ব্যক্তি নির্বাচন করা সম্ভব হবে—যার ফলে ব্যক্তি-জীবনটি সুন্দর ও সফল হয়ে উঠবে, ব্যক্তি পরিতৃপ্তি লাভ করবে এবং বৃত্তিটির প্রতিও সুবিবেচনা করা সম্ভব হবে।

ব্যক্তিগত বৈষম্য

(Individual Difference)

[Variations or deviations from the average of the group, with respect to mental or physical character occurring in the individual members of the group—*Dictionary of Psychology.*

The doctrine of individual difference, then, has profoundly affected educational theory so far as instruction is concerned—Ross.]

আমরা আমাদের চারদিকে প্রতিনিয়ত কত না বস্তুই দেখছি ! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে কত রকমের বস্তু, প্রাণী, গাছ-পালা বা কীটপতঙ্গ আছে তার ইয়ত্তা নেই। এদের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু এগুলির মধ্যে যে বৈচিত্র্য তা আরো বিস্ময়কর। পৃথিবীর কোন দুটি বস্তুই দেখতে কিন্তু হুবহু এক রকমের নয়। আমাদের চারদিকে যে সমস্ত মানুষ দেখি—তাদের মধ্যে যত না মিল, তার চেয়ে বেশী গরমিল। একই গাছের একই ডালের দু'টি পাতা পর্যন্ত হুবহু এক রকম হয় না—কোন না কোন পার্থক্য একটা থাকবেই। এখন মানুষের কথা ভাবা যাক্ ! যে কোন দুটি মানুষকে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে—তারা দেখতে সম্পূর্ণ আলাদা। কথাবার্তা বললে বা আলাপ পরিচয় করলে তাদের আভ্যন্তরিণ পার্থক্যটিও বোঝা যাবে। দৈহিক গঠন—অর্থাৎ গায়ের রঙ, চোখ-মুখ-নাকের গঠন, হাত-পা-মাথার গঠন, কর্মদক্ষতা, পড়াশুনা, বিচার-বুদ্ধি, প্রাক্ষোভিক দিক—ইত্যাদি সব দিকে একজন আর একজনের থেকে পৃথক। সবকিছু মিলে প্রত্যেক মানুষ অন্য মানুষ থেকে পৃথক বা স্বতন্ত্র। তার এই স্বাতন্ত্র্যটিকে—অর্থাৎ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে বৈষম্য বা পার্থক্য সেইটিকে বলা হয় **ব্যক্তিগত বৈষম্য** (Individual Difference)।

এই যে স্বাতন্ত্র্য—এটা কি ধরনের স্বাতন্ত্র্য ? গুণগত (Qualitative), না মাত্রাগত (Quantitative) ? একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে—পার্থক্যটি গুণগত নয়, মাত্রাগত। গুণগত হ'লে—একজন মানুষের মধ্যে যে

সমস্ত গুণ থাকত—অন্ত একজনের মধ্যে তা আর থাকত না। কিন্তু আমরা প্রকৃতপক্ষে তেমন কোন পার্থক্য দেখি না। আমরা দেখি, প্রত্যেকের মধ্যে প্রায় সমজাতীয় গুণ আছে—তবে কারো কম, কারো বা বেশী। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায়,যে কোন দু'জন লোকের মধ্যে কোন একটি বিশেষ গুণ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় বর্তমান থাকে। ব্যক্তিগত বৈষম্য বলতে যে কোন দু'জন লোকের মধ্যে যে কোন একটি গুণের পরিপ্রেক্ষিতে এই মাত্রাগত পার্থক্যটি বোঝায়। এই রকম পার্থক্যকে আবার **আন্তঃব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য** (Inter-Individual Difference) বা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যও বলা হয়। আবার ব্যক্তিগত বৈষম্য বলতে যে কোন একটি গুণের দিক থেকে যে কোন দু'জন লোকের পার্থক্য বা বৈষম্য যেমন বোঝায়, যে কোন দুটি গুণের দিক দিয়ে একই ব্যক্তির মধ্যে যে পার্থক্য বা বৈষম্য, সেটিকেও বোঝায়। এই প্রকার (শেষোক্ত) বৈষম্যকে **অন্তঃব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য** (Intra-Individual Difference) বলা হয়। এর অর্থ হ'ল—একই ব্যক্তির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গুণের মাত্রাগত পার্থক্য।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই ব্যক্তিগত বৈষম্যের একটা বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য আছে। বর্তমান শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রতিটি শিশুকে ব্যক্তিগত বৈষম্যের ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়েও আমরা শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছি। এখন আমাদের স্থির করতে হবে—বিভিন্ন শিশুর মধ্যে কোন্ কোন্ দিক দিয়ে বৈষম্য আছে—তা স্থির করা এবং ঐ বৈষম্যের ভিত্তিতে তার উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার সংগঠন করা।

বিভিন্ন জাতীয় বৈষম্য (Different types of Individual Difference): ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি বর্তমান যুগে মনোবিজ্ঞানীদের অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে ঠিকই, কিন্তু বিষয়টি অত্যন্ত প্রাচীন। মানুষে মানুষে যে পার্থক্য আছে তা প্রাচীনকালে পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করেছিলেন। প্লেটো,অ্যারিস্টটল রুশো প্রভৃতি মনীষি এই বৈষম্যের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে মানুষের কয়েকটি দলের (type) কথা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী কালে এ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। এঁদের মধ্যে গ্যাল্টন, ক্যাটেল, বিনে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা বিভিন্ন গুণের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মধ্যে বৈষম্য নির্ধারণের চেষ্টা করেন।

এখন ব্যক্তিগত বৈষম্যের একটা শ্রেণীবিভাগ করা যাক্। সাধারণতঃ আমাদের জীবনের তিনটি প্রধান দিক আছে। একটি হ'ল **দৈহিক দিক**, একটি **মানসিক দিক**, আর একটি হ'ল **নৈতিক দিক**। অতএব বৈষম্যও এই তিন দিকে থাকবে। গেটস্ তাঁর Psychology for Students of Education নামক গ্রন্থে ব্যক্তিগত বৈষম্যের যে তালিকাটি দিয়েছেন—তা হ'ল এই রকম—**দৈহিক গঠন, মানসিক গঠন, বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা বা সামর্থ্য, অর্জিত আগ্রহ ইত্যাদি, মেজাজ-মর্জি, ইচ্ছা-শক্তি ও নৈতিক চরিত্র।**

অনেকে আবার বৈষম্যগুলিকে **সহজাত** ও **অর্জিত**—এই দুই ভাগে ভাগ করে থাকেন। যেমন—

বৈষম্য
- সহজাত
  - দৈহিক
  - মানসিক (বৌদ্ধিক)
  - মনঃপ্রকৃতি বা মানসিক গঠন সম্বন্ধীয়।
- অর্জিত
  - কৃষ্টিমূলক
  - সমাজগত
  - প্রাক্ষোভিক
  - শিক্ষাগত

কোন বৈষম্যকেই সম্পূর্ণরূপে সহজাত বা সম্পূর্ণরূপে অর্জিত বলা যায় না। প্রত্যেকটি বৈষম্যই সহজাত ও অর্জিত উভয়বিধ গুণাবলীর সংমিশ্রণে উদ্ভূত বা জাত। অবশ্য আলোচনার সুবিধার জন্য উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগগুলি মেনে নেওয়া চলতে পারে।

দৈহিক দিক থেকে বৈষম্য (Physical traits) : দৈহিক বৈষম্যগুলির মধ্যে পড়ে—ওজন, উচ্চতা, গায়ের রঙ, স্বাস্থ্য, মুখের আকৃতি, চেহারার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। এক এক জাতির দৈহিক গঠন এক এক রকমের হয়ে থাকে। দৈহিক গঠনের দিক থেকে বিচার করলে একজন বাঙালীর সঙ্গে আর একজন বাঙালীর যতটা পার্থক্য থাকে, একজন বাঙালীর সঙ্গে একজন পাঠান বা একজন আমেরিকানের পার্থক্য তার চেয়ে অনেক বেশী হবে।

মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য দৈহিক বৈষম্যের বিশেষ মূল্য দেন না। তবে

অ্যাডলারের (Adler) পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে—শারীরিক ত্রুটিসম্পন্ন ব্যক্তিরা (বিকলাঙ্গ ইত্যাদি) প্রায়শঃই হীনমন্যতাবোধে ভুগে থাকেন।

মানসিক (বৌদ্ধিক) গঠনে বৈষম্য (Mental traits) : এই পর্যায়ে পড়ে বুদ্ধি, বুদ্ধিহীনতা, মানসিক অনগ্রসরতা, বিশেষ কোন ক্ষমতা, স্মরণ করার ক্ষমতা, কল্পনাশক্তি, ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীক্ষ্ণতা প্রভৃতি। আমরা এর আগে বুদ্ধির আলোচনাকালে I. Q সম্বন্ধে জেনেছি। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধির দিক দিয়ে যথেষ্ট বৈষম্য দেখা যায়।

মনঃপ্রকৃতি বা মেজাজ-মর্জিগত বৈষম্য (Temperamental Difference) : মনমেজাজের দিক থেকেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যথেষ্ট বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। কেউ বা শান্ত প্রকৃতির—আবার কেউ বদরাগী বা খিটখিটে মেজাজের। কেউ অল্পেই সন্তুষ্ট, আবার কেউ বা বলেন—নাল্পে সুখমস্তি। কেউ অল্প শোকেই কাতর হয়ে পড়েন—আবার কেউ সংযত ও সংহত থাকেন।

নৈতিক চরিত্রগত বৈষম্য (Moral Difference) : কতকগুলি বিশেষ চারিত্রিক গুণের দিকেও ব্যক্তিগত বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। ক্ষমা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, স্থৈর্য, ঔদার্য ইত্যাদি নানা গুণের সমাবেশের মধ্যেও বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়।

কৃষ্টিমূলক বৈষম্য (Cultural Difference) : সামাজিক পরিবেশের পার্থক্যের জন্য কৃষ্টিমূলক বৈষম্য দেখা দেয়। বিভিন্ন সমাজের মধ্যে মূলগত একটা ঐক্য থাকলেও ভাবধারা, রীতি নীতি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা দেয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে কৃষ্টিমূলক বৈষম্য বেশী। আবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশের কৃষ্টিমূলক বৈষম্যগুলিও কম নয়।

সমাজগত বৈষম্য (Social Difference) : শিশু যে সমাজে বাস করে, শিশুকাল থেকে সেই সমাজের সঙ্গে সে পরিচিত হয়ে থাকে। সে সমাজের মাটি থেকে তার প্রাণরস আহরণ করে থাকে। সমাজের প্রচলিত আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি, চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, আদর্শ ইত্যাদি ব্যক্তিগত বৈষম্যের জন্য দায়ী। কোন দু'টি সমাজ এক প্রকার হয় না। এর ফলে শিশুদের মধ্যেও নানা জাতীয় বৈষম্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে। অবশ্য সমাজ বলতে পরিবার, স্কুল, লাইব্রেরী, সঙ্গী-সাথী ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর সংগঠনটির কথাই বলা হয়ে থাকে।

প্রাক্ষোভিক বৈষম্য (Emotional Difference) : যে কোন দু'জন শিশু বা দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের প্রাক্ষোভিক স্বরূপ ও সংগঠনটি পরীক্ষা করলে দু জনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। কেউ হয়তো অল্পেই রেগে যান, আবার কাউকে সহজে রাগানো যায় না। কেউ হয়তো অল্পে তুষ্ট আশুতোষ, আবার কেউ বা চির-অসন্তুষ্ট। কারো রাগ থেকে যায় অনেকক্ষণ তুষানলের মত, আবার কারো ক্ষেত্রে 'দপ্ করে জ্বলে ওঠে খপ্ করে নিভে যায়' রাগের আগুন, কারো দয়া-মায়া বেশী, কারো বা কম, কেউ প্রক্ষোভটি অভিব্যক্ত করেন, কেউ বা এর বহিঃপ্রকাশে অনিচ্ছুক। সেন্টিমেন্টগুলি কোন বিশেষ প্রক্ষোভকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে; কাজেই সেন্টিমেন্টের পার্থক্য হ'ল প্রাক্ষোভিক পার্থক্য।

শিক্ষাগত বৈষম্য (Educational Differance) : আমরা যদি শিক্ষার ব্যাপক অর্থটি গ্রহণ করি, তাহ'লে বলা যায় যে, কোন অর্জিত বৈষম্যই হ'ল শিক্ষাগত বৈষম্য, আমাদের জীবনের উপর পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন ঘটনা-প্রবাহের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। আমাদের আচরণ-ধারাটিও সেইমত পরিবর্তিত করে থাকি। বিভিন্ন লোকের আচরণ-ধারা ও কর্মধারার পার্থক্যটি হ'ল শিক্ষাগত বৈষম্য।

আবার অন্য আর এক অর্থেও শিক্ষাগত বৈষম্যের কথা বলা হয়ে থাকে। এখানে শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থটি ধরে স্কুল-কলেজে লব্ধ শিক্ষাগত বৈষম্যের কথা বলা হয়। কেউ হয়ত বেশ উচ্চশিক্ষিত, কেউ মোটামুটি শিক্ষিত, আবার কেউ বা অশিক্ষিত। তেমনি কেউ বিজ্ঞান শাখা নিয়ে পড়াশুনা করে, কেউবা মানব-বিদ্যা, কেউ বাণিজ্য, কেউ চিকিৎসা, কেউ বা আবার পূর্তবিদ্যা নিয়ে। তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। যেখানে সকলের জন্ম বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষা কোন একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত দেওয়া হয়, সেখানে এই জাতীয় বৈষম্য কম। আবার এই স্তরের পর যে সমস্ত দেশে বিভিন্ন শাখাতে শিক্ষালাভের যথেষ্ট উপায় ও অসংখ্য পথ খোলা থাকে, সে সমস্ত দেশে উপরের দিকে বৈষম্য বেশী। আমাদের দেশে আর্থিক ও মানসিক উভয় দিকেই বৈষম্য বেশী বলে শিক্ষাগত বৈষম্যও প্রচুর। আবার বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলেও এই বৈষম্যটি বেড়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে প্রত্যেকটি সভ্য দেশে ও প্রগতিশীল সমাজে শিক্ষা ব্যবস্থার এমন ভাবে নব-রূপায়ন করা হচ্ছে যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাস্তর বেছে নিতে পারে এবং তার ভবিষ্যৎ কর্মজীবনকে সার্থক, সফল ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে। এ ছাড়া আরো বিভিন্ন দিকে কতকগুলি বৈষম্যের কথা বলা হয়। যেমন—

ব্যক্তিত্বের টাইপ অনুযায়ী বৈষম্য (Difference in Types) : য়ুঙের (Jung) মতে মানুষের ব্যক্তিত্বের টাইপ তিনটি—(১) অন্তর্মুখী (Introvert), (২) বহির্মুখী (Extrovert) এবং (৩) উভয়মুখী (Ambivert)। এছাড়া ক্রেৎসমার. শেলডন, স্প্রাণগার, আইসেঙ্ক, জীভক্স, প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী মানুষকে বিভিন্ন টাইপে ভাগ করেছেন। কিংবা বলা যায় তারা কতকগুলি টাইপ নির্দিষ্ট করে বিভিন্ন মানুষকে এক একটি টাইপের দলে বসিয়েছেন।

জাতিগত বৈষম্য (Racial Difference) : এ হ'ল জাতিতে জাতিতে পার্থক্য। বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ এমন গুণ বা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—যা অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। নেপালী ও গুর্খারা কষ্টসহিষ্ণু, কিন্তু বাঙালী আরামপ্রিয়। তেমনি শিখরা সাহসী ও বলবান ইত্যাদি।

বংশগত বৈষম্য (Hereditary Difference) : বংশগতি বা বংশধারার জন্য বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কথাতেই বলে—"বাপ্ কা বেটা"। গ্যাল্টন প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান থেকে জানা গেছে মানুষের চরিত্র গঠনে পরিবেশের চেয়ে বংশধারার প্রভাবই বেশী। "বংশধারা ও পরিবেশ" অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পরিবেশগত বৈষম্য (Environmental Difference) : বিভিন্ন পরিবেশে বসবাস করার জন্যও মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। অনেকে বলেন মানুষের মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য দেখা যায়—তার কারণই হ'ল পরিবেশ। যে পরিবেশটি উন্নত, সেখানে মানুষের চরিত্র ও আচরণ-ধারাও উন্নত স্তরের। তেমনি দুর্নীতিপরায়ণতা ও চরিত্রহীনতার পশ্চাতে আছে ঘৃণ্য পরিবেশের নিন্দনীয় প্রভাব।

মনোভাবগত বৈষম্য (Attitudal Difference) : বিভিন্ন মানুষের-

মনোভাব বা দৃষ্টি-ভঙ্গীর দিকেও যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। কেউ উদারপন্থী, কেউ গোঁড়া ; কেউ বামপন্থী, কেউ বা দক্ষিণ পন্থী ; কেউ বলেন সমাজের নিয়ম-কানুন ভালো, আবার কারো মতে এটি খারাপ। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শিক্ষামূলক প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে মনোভাবগত বিভিন্ন বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। অনেক শিশুর যথেষ্ট বুদ্ধি থাকা সত্বেও দেখা যায় তারা শিক্ষা গ্রহণে অনিচ্ছুক। এর কারণ খুঁজলে দেখা যাবে, শিশুটির বাড়ীতে শিক্ষার প্রতি একটা অনুদার ও সংকীর্ণ মনোভাব আছে। যে অশিক্ষিত ভদ্রলোক কোন ব্যবসা বা কালো বাজারী করে লক্ষ টাকার মালিক হয়েছেন—তিনি যে তার সন্তানকে লেখাপড়া না শিখিয়ে ঝানু ব্যবসায়ী বা কালোবাজারী করে গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন তাতে সন্দেহ নেই। সন্তানও যদি দেখে লেখাপড়া না শিখেও যথেষ্ট উপার্জন করা যায়, তাহ'লে শিক্ষার প্রতি তার একটা অনুদার মনোভাব গড়ে উঠবেই।

বিদ্যার্জনে সামর্থ্যগত বৈষম্য (Difference in Achievements) : একই শ্রেণীর বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মধ্যে বিদ্যার্জনে সামর্থ্যগত বৈষম্য দেখা যায়। প্রায় একই বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q)-বিশিষ্ট ছেলেমেয়েদের একই শিক্ষকের অধীনে একই পদ্ধতিতে পাঠদান করলেও তাদের কৃতিত্ব বা ফলাফল এক প্রকার হয় না। এর কারণ হ'ল—বিদ্যার্জনে সকলের সামর্থ্য এক নয়। পড়া ও অঙ্ক করার ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটি বেশী করে চোখে পড়ে। কোন শিশু তাড়াতাড়ি মুখস্থ করতে পারে, কোন শিশু সহজে জিনিসটি উপলব্ধি করতে পারে, কোন শিশুর আগ্রহ থাকে—আবার কোন শিশুর হয়তো থাকে না—এই সব বিভিন্ন কারণের জন্য তাদের মধ্যে বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে সামর্থ্যগত বৈষম্য দেখা দেয়।

লিঙ্গভেদে বৈষম্য (Difference due to Sex) : দৈহিক গঠন, পরিশ্রম করার ক্ষমতা, স্বভাব, চাল-চলন, রুচি, আগ্রহ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণের জন্য নারী ও পুরুষের মধ্যে একটা বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। আগে বিদ্যা, বুদ্ধি ইত্যাদি দিক থেকে বিচার করেও এই বৈষম্য নির্ধারণ করা হ'ত। কিন্তু বর্তমান প্রগতির যুগে মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে—এই দুটি দিকে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন বৈষম্য নেই। বিভিন্ন দিকে এখন নারী পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দি'য়ে চলেছেন। তবে কোন কোন দিকে বৈষম্য আছে। যেমন, শারীরিক পরিশ্রম করার ক্ষেত্রে নারীর চেয়ে পুরুষের দক্ষতা

বেশী ; কিন্তু ভাষামূলক দক্ষতাতে নারী বেশী দক্ষ ; অঙ্ক বা হিসেব-নিকেশে পুরুষের মাথা যত খোলে নারীর ততটা খোলে না। আবার স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে নারীর উৎকর্ষই বেশী।

বিশেষ গুণের জন্য বৈষম্য (Difference in Special Qualities) : বিশেষ গুণ বলতে আমরা নৃত্য, গীত, চিত্রাঙ্কণ, কোন বাদ্যযন্ত্র বাজানো ইত্যাদির কথা বলছি। এ সমস্ত গুণের দিক থেকে বিচার করলেও বিভিন্ন লোকের মধ্যে প্রচুর বৈষম্য দেখা যায়।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের কারণ (Causes of Individual Difference) : কি কি কারণের জন্য ব্যক্তিগত বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে মনোবিজ্ঞানীরা কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁদের মতে এর কারণগুলি হ'ল—বংশধারা (Heredity), পরিবেশ (Environment), বয়স (Age), বুদ্ধি (Intelligence), জাতি ও বর্ণ (Cast and Race), অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic condition), শিক্ষার প্রভাব (Education), লিঙ্গগত পার্থক্য (Sex difference), পরিণমন (Maturation) ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত বৈষম্য পরিমাপের উপায় : বিভিন্ন জাতীয় পরীক্ষণ ও অভীক্ষার সাহায্যে ব্যক্তিগত বৈষম্য পরিমাপ করা সম্ভব। কয়েকটির নাম হ'ল—বুদ্ধির অভীক্ষা, ঝোঁক বা প্রবণতার অভীক্ষা, কৃতিত্বের অভীক্ষা, ব্যক্তিত্ব পরিমাপক অভীক্ষা, কেস-হিষ্ট্রি, Hand dynamometer, Steadiness apparatus, Chronoscope, চিহ্নণ অভীক্ষা, ম্যাসন-ডিস্ক, Psycho-Galvanic Reflex (P.G.R), Sphygmo-graph, Pheumograph ইত্যাদি।

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের গুরুত্ব (Importance of Individual difference in the field of Education) : এর আগে "শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা"র অধ্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কথা আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যকে উপেক্ষা করলে শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানো কখনও সম্ভব হয় না। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সব ছেলেমেয়ের মানসিক ক্ষমতা একই বলে ধরে নেওয়া হয়। এরই ফলে শ্রেণীগত-শিক্ষণের ব্যবস্থা উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি থেকে জানা গেছে—সব শিশুর মানসিক ক্ষমতা এক নয়। তাদের মধ্যে রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা, বুদ্ধি ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে যথেষ্ট পার্থক্য

থাকে। কাজেই শ্রেণীগত-শিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও শিক্ষা দেবার সময় শিশুকে ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষা দেওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রত্যেকটি শিশুর সুপ্ত গুণাবলী ও সুষ্ঠু ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধনের প্রতি প্রত্যেক শিক্ষকের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। শিক্ষাদান করার সময় প্রত্যেকটি শিশুর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, বুদ্ধি, যোগ্যতা, রুচি, প্রবণতা ইত্যাদির পার্থক্যের কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে। কোন ছেলে হয়তো গণিতে ভালো; তাকে গণিতে পারদর্শী করার চেষ্টা করতে হবে। সে যদি ভাষায় দুর্বল হয় এবং তাকে যদি জোর ক'রে ভাষা শিক্ষা দিতে গিয়ে বার বার তার অকৃতকার্যতার জন্য তিরস্কার করা হয়, তাহ'লে কুফলই ফলবে—সুফল নয়। ব্যক্তিগত বৈষম্যের এই সমস্ত মৌলিক নীতির জন্যই আজকাল দলগত শিক্ষণ প্রথার বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তিগত শিক্ষণ প্রথার স্বপক্ষে একটা মতবাদ গড়ে উঠেছে। তাছাড়া বহুমুখী পাঠ্যসূচীর ব্যবস্থা করে প্রত্যেক শিশুর ক্ষমতা ও আগ্রহ অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন করার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

অনেক প্রগতিশীল দেশে আবার বৈষম্যবিহীন শ্রেণীশিক্ষার পরিবর্তে সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যক্তিমুখী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডাল্‌টন প্ল্যান, মরিসন প্ল্যান ইত্যাদি এই জাতীয় ব্যক্তিমুখী শিক্ষাদানের পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর রুচি, সামর্থ্য, আগ্রহ ইত্যাদির প্রতি যথাসাধ্য সুবিচার করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশে একই শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের A, B, C (Bright, Medium and Dull)—এই রকম তিনটি দলে ভাগ করা হয় তাদের মানসিক ক্ষমতার বৈষম্যের ভিত্তিতে। এর পর প্রত্যেক দলকে তাদের প্রয়োজন ও ক্ষমতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। একে "ত্রিধারা পদ্ধতি" (three stream process) বলা হয়।

এ ছাড়া বর্তমান যুগে যেমন সাহিত্যমুখী বিষয় ছাড়া অন্যান্য ব্যবহারিক বিষয়গুলিকেও পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তেমনি লেখাপড়া ছাড়া অন্যান্য গুণগুলির প্রতিও সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি শিশুকে পৃথক ভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয় ঠিকই; কিন্তু এক এক জাতীয় শিশুকে একত্র করে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। প্রায় প্রত্যেক দেশেই মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিজ্ঞানীরা শ্রেণীগত শিক্ষণের সঙ্গে ব্যক্তিগত শিক্ষণের একটা সামঞ্জস্য

বিধান করার চেষ্টা করেছেন এবং সেই সঙ্গে শিক্ষাদানের পদ্ধতিটিকে ব্যক্তিগত বৈষম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রভাব ও সুফল সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হ'ল—

[এক] **উপযুক্ত শ্রেণীবিভাগ (Proper Division of the Class) :** ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতিগুলির সাহায্য নিয়ে শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত কয়েকটি দলে ভাগ করে নিতে হবে—কতকগুলি আদর্শমান বা ক্ষমতার ভিত্তিতে। বুদ্ধির বিস্তৃতি অনুযায়ী দল-বিভাজনই অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল। এই ভাবে দল স্থির হয়ে গেলে প্রত্যেকটি দলের জন্য উপযুক্ত ও পৃথক পৃথক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্য বুদ্ধি ছাড়াও বয়স, শারীরিক ক্ষমতা, প্রাক্ষেভিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক গুণাবলী, আগ্রহ ইত্যাদির কথাও চিন্তা করতে হবে। ছাত্রদের শক্তি ও আগ্রহ অনুযায়ী যেমন—শিক্ষার আদর্শ স্থির করা উচিত, তেমনি প্রত্যেকটি ছাত্র যাতে তার যোগ্যতা ও শক্তি অনুযায়ী অগ্রসর হ'তে পারে, তার ব্যবস্থাও করতে হবে। এই দল-বিভাজন সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানী Ross-এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য—'We should classify our peoples according to the types to which they belong.'

[দুই] **শিক্ষার্থীদের প্রবণতা ও আগ্রহের প্রতি মনোযোগ (Attention towards the attitude and interest of the pupils) :** পার্সি নান্ এক স্থানে বলেছেন—শিশুরা একই ছাঁচে ফেলা কতকগুলি নির্জীব বা জড় বস্তু নয়। তাদের পৃথক অস্তিত্ব আছে, বৈশিষ্ট্য আছে, স্বতন্ত্র প্রবণতা ও আগ্রহ আছে। শিক্ষার্থীদের এই সমস্ত প্রবণতা, আগ্রহ ও ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে হবে। অবশ্য এগুলির প্রতি মনোযোগ দিলেই যে শিক্ষার সমস্ত সমস্যা দূরীভূত হয়ে যাবে, তা নয়; তবে শিক্ষার্থীদের প্রতি যথাসম্ভব সুবিচার করা সম্ভব। ডাল্টন প্ল্যান, মরিসন প্ল্যান প্রভৃতি পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রতিই অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গেও Ross-এর মন্তব্য হ'ল—'The real solution of the difficulty is not classification according to types, but individualised instructions, as in the Montessori Method and under the Dalton Plan, success of which is beyond doubt.'

[তিন] **গৃহকার্য (Home-task) :** শিশুদের পারিবেশিক অবস্থা এক প্রকার

নয়। শিশুর শিক্ষা তার পরিবেশের উপর নির্ভর করে। শিশুদের যদি কোন গৃহকাজ দিতে হয়, তবে তা দিতে হবে তাদের ক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী। প্রত্যেককে এক জাতীয় গৃহকাজ দেওয়া চলবে না। সচরাচর বিদ্যালয়গুলিতে মাঝারী বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষাদান করা হয় এবং সেইমত গৃহকাজও দেওয়া হয়। ফলে বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েরা কম সময়ে কাজটি শেষ করে বাকী সময়টা আলস্যে কাটায়। আবার স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা সেই কাজটিও করতে পারে না। ফলে তারা হয় নকল করে, নয়তো ফাঁকি দেয়।

[চার] **বহুমুখী স্কুলের প্রতিষ্ঠা** (Establishment of multipurpose schools): আজকালকার যুগ হ'ল বিশেষজ্ঞের যুগ। বিদ্যালয়গুলিও আজকাল শিক্ষার্থীদের বিশেষজ্ঞ হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে না। কিন্তু বিশেষজ্ঞ হ'তে হ লে ভিন্ন জাতীয় এবং বিবিধ প্রকার পাঠক্রমের ব্যবস্থা থাকা দরকার। এর জন্য অনেক বহুমুখী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া লেখাপড়া ছাড়া আরো কিছু কিছু প্রয়োজনীয় কাজ—যেমন বেতের কাজ, চামড়ার কাজ ইত্যাদিরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

[পাঁচ] **দৈহিক বৈষম্যের প্রতি মনোযোগ** (Attention towards difference in Physique) : সব ছেলেমেয়ের দৈহিক অবস্থা এক নয়। কেউ বেশ সুস্থ-সবল আবার কেউ বা রুগ্ন, দুর্বল। শিশুদের শিক্ষা দেবার সময় এই বৈষম্যের কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে। দৈহিক বৈষম্যের জন্য সব শিশু একভাবে পরিশ্রম করতে পারে না। যে সমস্ত শিশুর দৈহিক বৈকল্য থাকে, তাদের স্বতন্ত্র করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এদের পাঠক্রমটিও স্বতন্ত্র করতে পারলে ভালোই হয়। এদের উপর খুব বেশী বোঝা না চাপানোই ভালো।

[ছয়] **শিশুর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা** (Social and Economic condition of the Child): শিশুর উচ্চতর শিক্ষা তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা করতে হবে।

[সাত] **পাঠক্রম** (Curriculum) : পাঠক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে একই রকম পাঠক্রম

রাখা চলতে পারে। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে পাঠক্রমটি ব্যক্তিগত বৈষম্যের ভিত্তিতে ভিন্নমুখী করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতা এক নয় বলে একই পাঠক্রম সকলের জন্য চলতে পারে না। শিক্ষার লক্ষ্য পাঠক্রম নির্ধারণের উপর নির্ভর করে। ব্যক্তিগত বৈষম্যের ভিত্তিতে রচিত পাঠক্রম শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা, রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা প্রভৃতির প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দেয় বলে এ জাতীয় পাঠক্রম শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে।

[আট] **শিক্ষাদানের নূতন পদ্ধতি (New teaching Methods) :** ব্যক্তিগত বৈষম্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন পরীক্ষণের সাহায্যে শিক্ষাদানের নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ডাল্টন প্ল্যান, মরিসন প্ল্যান সমস্ত এই জাতীয় পদ্ধতি। সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য সাধারণীকৃত কোন শিক্ষাদান পদ্ধতি যে সমান ভাবে কার্যকরী হয় না—তা এখন সকলেই মেনে নিয়েছেন। কাজেই বর্তমানে শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও ব্যক্তিগত বৈষম্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া উচিত।

বিশেষ পাঠদান (Special Classes) : ব্যক্তিগত বৈষম্য বিদ্যালয়ে কিছু কিছু বিশেষ ক্লাশের কথাও বলে থাকে। কোন একটি বিশেষ ক্লাশে কোন শিক্ষার্থী অস্বাভাবিক বা অপসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করতে থাকে, তবে তাকে বিশেষ কোন বিদ্যালয়ে বা বিশেষ কোন শ্রেণীতে বিশেষ ভাবে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

এ ছাড়া আরো কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারলে ভালো হয়। এই জাতীয় ব্যবস্থা হ'ল—

শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও চেষ্টার কথা বিবেচনা করে পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করা, অত্যন্ত উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা, শিশুর প্রক্ষোভ ও আবেগ ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুযায়ী সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষার পদ্ধতির বিভিন্নতা, বুদ্ধিগত যোগ্যতা ছাড়া বিশেষ বিশেষ বিষয়ের দক্ষতাকেও শিক্ষাব্যবস্থায় মর্যাদা দান করা ইত্যাদি।

বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি (Principles of Individual difference in vocational guidance) : এতক্ষণ আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির কথা আলোচনা করলাম। কিন্তু বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এই বৈষম্যের নীতির প্রভাব কোন অংশে কম তো

নয়ই, বরং বেশী বলেই প্রমাণিত হয়েছে। বৃত্তি বলতে এমন কোন বিশেষ ধরনের কাজকেই বোঝায় বা বিশেষ ধরনের জীবিকা বোঝায়, যার সুষ্ঠু সম্পাদনে ব্যক্তি যে কেবলমাত্র তার জীবন ধারণ করে, তা নয়; পর্যাপ্ত পরিতুষ্টিও অর্জন করে। তাছাড়া উপযুক্ত বৃত্তি নির্বাচন আবার ব্যক্তির পরিতুষ্টি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না; সেই সঙ্গে কাজটির সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক সম্পাদনের দিকেও দৃষ্টি দেয়। অর্থাৎ ব্যক্তির তৃপ্তি (man satisfaction) এবং কাজের তৃপ্তি (job satisfaction)—দুটিই বৃত্তি নির্বাচনের লক্ষ্য। যেখানে এই উভয়বিধ পরিতৃপ্তি বিদ্যমান সেখানেই বৃত্তি নির্বাচন সঙ্গত ও সুষ্ঠু হয়েছে বলা যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ব্যক্তি এমন একটি বৃত্তি নির্বাচন করে যেটিতে তার স্বাভাবিক আগ্রহ, রুচি, প্রবণতা বা সামর্থ্য নেই। ফলে ঐ বৃত্তিটিতে টিকে থাকার জন্য তাকে ইচ্ছাশক্তির ব্যাপক প্রয়োগ করতে হয়। এতে পরিশ্রম হয় এবং শক্তিও অযথা ব্যয়িত হয়। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই ব্যক্তির মধ্যে বৃত্তিটির প্রতি একটা অনাসক্তি, যান্ত্রিকতা, একঘেয়েমী, বিরক্তি ও হতাশার ভাব পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে ব্যক্তি ঐ বৃত্তিটির প্রতি আর সুবিচার করিতে পারে না। এতে ব্যক্তি নিজে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার নিয়োগকারীও তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বৃত্তিমূলক অপনির্বাচনের অর্থই হ'ল—জাতীয় উৎপাদন হ্রাস তথা জাতীয় ক্ষতি। এইজন্য আজকাল ব্যক্তিগত বৈষম্যের ভিত্তিতে আগে যাচাই করে নেওয়া হয় কোন্ ব্যক্তি কোন্ বৃত্তির উপযোগী। ব্যক্তির সামর্থ্য, আগ্রহ, রুচি ইত্যাদি বৃত্তিমূলক সঙ্গতি সাধনের পশ্চাৎপটে থাকে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি।

এখন দেখা যাক্ ব্যক্তির কোন্ কোন্ বৈষম্য বৃত্তি নির্বাচনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মানসিক শক্তির বৈষম্যটিই মনে হয় সর্বপ্রথম ও প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। এটিকে আমরা সাধারণ ভাষণে বুদ্ধি আখ্যা দিয়ে থাকি। বুদ্ধির স্বাভাবিক মান হিসেবে ১০০ বুদ্ধাঙ্ক ধরলে দেখা যায়—কেউ কেউ থাকেন এর উপরে; কেউ কেউ এই মানের নীচে, এবং অধিকাংশই এই স্বাভাবিক মানবিশিষ্ট। সব কাজে একই বুদ্ধ্যঙ্কবিশিষ্ট লোকের প্রয়োজন হয় না। মোটামুটি সহজ নিম্নস্তরের কতকগুলি শিক্ষামূলক বা হাতের কাজ ছাড়া প্রায় সবরকম কাজেই বুদ্ধির স্বাভাবিক মানের প্রয়োজন। কিন্তু এই সমস্ত কাজে যদি নিম্নবুদ্ধ্যঙ্কবিশিষ্ট লোকদের নিয়োগ

করা হয়, তবে তারা কাজে কখনও সাফল্য অর্জন করতে পারে না। তেমনি আরো অনেক এমন বৃত্তি আছে, যেখানে উচ্চ বুদ্ধ্যঙ্কের প্রয়োজন। আইনবিদ্যা, শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা, শাসন-বিভাগীয় কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা ইত্যাদি এই জাতীয় কাজ। এইসব বৃত্তিতে নিম্ন বুদ্ধ্যঙ্ক বা সাধারণ বুদ্ধ্যঙ্ক-সম্পন্ন লোক সবিশেষ কৃতিত্ব অর্জন বা দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবেন না। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে বৃত্তিতে যে রকম বুদ্ধ্যঙ্ক-সম্পন্ন লোক প্রয়োজন, ঠিক সেইরকম লোক নিয়োগ করলে তবেই সুফল লাভের সম্ভাবনা বেশী।

সাধারণ বুদ্ধি (g) ছাড়াও প্রত্যেকের মধ্যে কতকগুলি বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি (s) থাকে। এগুলিও বৃত্তি নির্বাচনে কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করে না। বুদ্ধির অধ্যায়ে আমরা V N M R P S W ইত্যাদি বিশেষ মানসিক শক্তির কথা জেনেছি। প্রত্যেকটি বিশেষ বিশেষ বৃত্তির ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়। যেমন, পড়াশুনার কাজ, সাহিত্য-চর্চা, শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা ইত্যাদি ভাষাপ্রধান বৃত্তিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে হ'লে V বা ভাষামূলক শক্তিটি ব্যক্তির মধ্যে থাকা একান্ত প্রয়োজন। তেমনি হিসেবরক্ষক (auditors), পরিসংখ্যানবিদ্, ব্যাঙ্ক বা বীমা বিভাগের কাজ, ক্যাশিয়ার, এ্যাকাউন্ট্যান্ট ইত্যাদি বৃত্তির জন্য প্রয়োজন N বা গাণিতিক শক্তির, আইন ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজন R বা বিচারকরণ ক্ষমতার। এইভাবে এক এক প্রকার বৃত্তির জন্য এক এক প্রকার বিশেষধর্মী মানসিক শক্তির প্রয়োজন। ব্যক্তির মধ্যে যেরকম বিশেষধর্মী মানসিক শক্তির প্রাধান্য দেখা যাবে, সেই রকম বৃত্তিই তাকে গ্রহণ করতে দেওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে আমি যা হ'তে পারিনি, আমার সন্তানকে তাই হ'তে দিয়ে আমার অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করার চেষ্টা করলে চলবে না। আমার সন্তান যা হতে পারে, যা হবার সম্ভাবনা তার মধ্যে নিহিত আছে, তাকে সেই ভাবেই গড়ে তুলতে হবে।

বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে এবার আসে মেজাজ বা মনোপ্রকৃতিগত ও প্রাক্ষোভিক দিকটি। এমন অনেক বৃত্তি আছে, যেখানে মেজাজ এবং আবেগের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত বৃত্তিতে অন্যান্য সমস্ত গুণ বর্তমান থাকলেও একমাত্র অনুপযোগী মেজাজ-মর্জি বা প্রাক্ষোভিক সংগঠনের জন্যই ব্যক্তি কাজটিতে সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য হয়ে যান। একটা উদাহরণ দিই। ডায়মণ্ড-হারবারে "সাগরিকার" রিসেপসনিষ্ট মিঃ রায়চৌধুরী কি রকম স্মার্ট আর

হাসি-খুশী। সব সময় প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর। কাউন্টারে এর 'স্মিতানন' দেখলেই মনে হয় এখানে ঢুকে কয়েক মিনিট বসে আসি। কিন্তু তার জায়গায় যদি এমন কোন লোক থাকতেন যার মুখটি হ'ত পেঁচার মত কিম্বা তিনি হতেন রামগরুড়ের ছানা—হাসতে যাদের মানা। সব সময় খিট্ খিট্ করতেন আর ঢোকার আগে হাজার প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করতেন। তা হ'লে কি কেউ ভেতরে যাবার আগ্রহ দেখাত? ঠিক একই কথা খাটে বড় বড় দোকানের সেলস্‌ম্যান বা বড় বড় কলকারখানার Labour welfare officer বা Public Relation Officer-দের সম্বন্ধে। বিভিন্ন প্রকার সংস্থার Representative-রাও অবশ্য এর আওতায় পড়েন। এদের মেজাজ হওয়া উচিত শান্ত, ধীর, স্থির, আবেগ হবে সংযত ও শোভন। তবেই না এরা বৃত্তিতে সাফল্য অর্জন করতে পারবেন।

ড্রাইভার বা পাইলট হ'তে গেলে বেশ কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু এ পরীক্ষা হ'ল ধৈর্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও প্রতিক্রিয়াকাল (Reaction Time)-সম্বন্ধীয় অভীক্ষা। উদ্দীপক-প্রাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া বা সাড়া দেওয়া যায় না। মাঝখানে কিছুটা সময়ের ব্যবধান থাকে। এই ব্যবধানকে বলে প্রতিক্রিয়া কাল। এটির একটা স্বাভাবিক নাম আছে (.16 SECS)। কারো বেশী, আবার কারো বা কম। ড্রাইভারদের এটি স্বাভাবিক নাম থেকে কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। গাড়ীর সামনে লোক আছে দেখে সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষতে হবে। যার এই প্রতিক্রিয়াকাল বেশী হবে, তার পক্ষে ব্রেক যে কষতে হবে—এই ধারণা জন্মাতে সময় নেবে। ততক্ষণে সামনের লোকটির 'এন্তেকাল ফরমাবা'র সম্ভাবনাই বেশী।

এর পর আসে সামাজিক বৈষম্য। আমরা প্রত্যেকে এক একটি সমাজের সভ্য এবং সেই সমাজের রীতি-নীতি, আচার আচরণের সঙ্গে অভ্যস্ত। ঐ সমাজে আমরা যেমন ভাবে সঙ্গতি সাধন করতে পারব, তেমনটি অন্য কোথাও পারব না। পরিবেশ ব্যাপক ভাবে পরিবর্তিত হ'লে আমাদের জলের মাছ ডাঙ্গায় তোলার অনুরূপ অবস্থা ঘটে। কাজেই বৃত্তিতে পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে হ'লে ব্যক্তিকে তার স্বাভাবিক ও পরিচিত পরিবেশের মধ্যে বৃত্তি নির্বাচনের সুযোগ করে দিতে হবে। অবশ্য প্রত্যেক মানুষই পরিবেশের সঙ্গে নতুন ভাবে সঙ্গতি সাধন করতে সক্ষম। কিন্তু এই সঙ্গতি সাধনও সময় ও শ্রমসাপেক্ষ।

ব্যক্তি যে সময় ও শ্রম সঙ্গতি সাধনের জন্য ব্যয় করবে তা—বৃত্তিটিতে সাফল্যের জন্য ব্যয় করলে আরো ভালো হয়।

এই সমস্ত বিভিন্ন কারণের জন্য আজকাল ব্যক্তিকে যেমন তেমন একটি বৃত্তি গ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। ব্যক্তিগত বৈষম্যের ভিত্তিতে ব্যক্তির গুণাবলী ও বৃত্তির প্রয়োজনগুলি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করে ব্যক্তির উপযোগী বৃত্তি ও বৃত্তির উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করা হয়। ব্যক্তি ও বৃত্তি যেন—'Made for each other'-এর জন্য বিভিন্ন প্রকার অভীক্ষা প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং বৃত্তিমূলক নির্দেশনার বিভিন্ন কেন্দ্রও স্থাপিত হচ্ছে। তাছাড়া আজকাল বৃত্তিমূলক নির্দেশনা শিক্ষামূলক নির্দেশনার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে।

॥ ষোল ॥

বংশধারা ও পরিবেশ

Heredity and Environment

or

Nature and Nurture

[Heredity—The transmission from parents to offspring of physical and mental characteristics, the totality of characteristics so transmitted.

—*Psychology of Dictionary*

"... Heredity, meaning simply the tendency of things to produce their own kind"—*Beals and Hoijer*

Heredity is a slow motion picture of evolution—*Mary Adams.*

Environment— all conditions and factors affecting an organism from without—*Psychology of Dictionary.*

"The field of effective stimulation and inter-action for any unit of living matter"—*T. D. Elliot.*

"Environment is any external force which influences us"—*E. J. Ross*

"Life and environment are, in fact, co-relates"—*Mac Iver and Page.*]

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ব্যক্তিগত বৈষম্যের কারণগুলি উল্লেখ করতে যেয়ে বার বার বংশধারা ও পরিবেশের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে মানব-জীবনে এ দুটির প্রভাব অপরিসীম। শিশুর শিক্ষার উপরও এদের প্রভাব কম নয়। Nunn সাহেব বংশধারাকে বলেছেন প্রকৃতি বা Nature এবং পরিবেশকে বলেছেন বাহ্যিক প্রভাব বা Nurture। এই দুটি শক্তির প্রভাব ও গুরুত্বের জন্যই শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীরা এগুলির প্রতি এত বেশী আগ্রহান্বিত ও কৌতুহলী। এখন বংশধারা ও পরিবেশ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হ'ল—

বংশধারা ও তার প্রকৃতি : বংশধারা বা Heredity কথাটি ল্যাটিন শব্দ Hereditas থেকে উদ্ভূত যার অর্থ হ'ল—এমন একটি বস্তু যা মানুষের নিজস্ব সম্পত্তি এবং যেটি সে তার উত্তরাধিকারীকে দিয়ে যায়। বংশধারা বলতে সাধারণতঃ সেই সব দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যকেই বোঝায় যা শিশু তার জন্ম-লগ্নে তার পিতামাতার কাছ থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে এবং অন্যান্য পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পরোক্ষ ভাবে লাভ করে। শিশু এই বৈশিষ্ট্যগুলির সম্ভাবনার বীজটি প্রাপ্ত হয় এবং সেইগুলি নিয়েই তার জীবন-পরিক্রমা শুরু হয়। এগুলি হ'ল সম্পূর্ণরূপে সহজাত। শিশু জন্মাবার পর নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা অর্জন করে। কিন্তু এই সমস্ত অভিজ্ঞতা বা বৈশিষ্ট্য সে জন্মের পর তার পরিবেশ থেকে অর্জন করে। অর্থাৎ এগুলি অর্জিত। এগুলি শিক্ষা-লব্ধ বা অর্জিত বলে বংশধারা থেকে পৃথক বা স্বতন্ত্র।

সাধারণতঃ বংশধারা বলতে শিশুর সঙ্গে মাতাপিতার সাদৃশ্যটির কথাই বলা হয়। কিন্তু সাদৃশ্যগুলি যেমন বংশধারার অন্তর্গত, বৈসাদৃশ্যগুলিও তেমনি বংশধারার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। পিতামাতার সঙ্গে শিশুর সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যগুলি শিশু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ক্রোমোজোম এবং জীন থেকে পেয়ে থাকে।

বংশধারার ধারা

প্রত্যেক নারী ও পুরুষ জন্মলগ্নে তাদের মাতাপিতার নিকট থেকে ২৪টি করে মোট ৪৮টি ক্রোমোজোম পেয়ে থাকে।

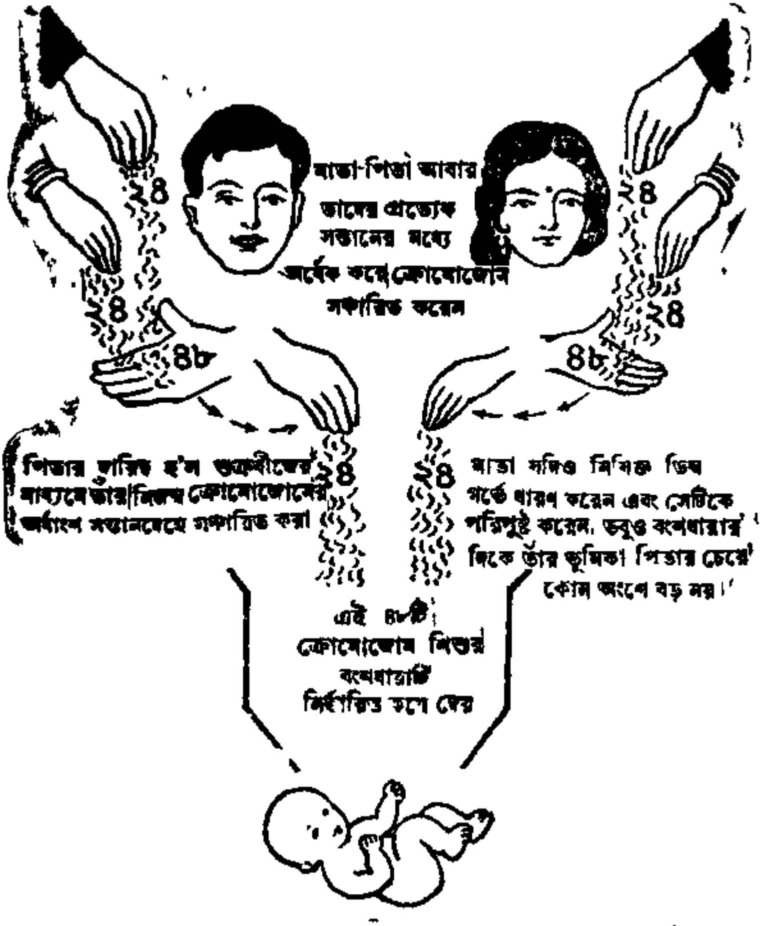

পিতামাতার নিকট থেকে শিশুদেহে ক্রোমোজোম সঞ্চারের চিত্র।
[Amram Scheinfeld-এর The New You and Heredity-এর অনুকরণে]

স্যাণ্ডিকোর্ডের মতে পুরুষের বীজকোষ এবং স্ত্রীর ডিম্বকোষ নিষিক্ত হ'য়ে একটি ভ্রূণ বা Zygote সৃষ্ট হয়। এই ভ্রূণ আসলে একটি নিষিক্ত কোষ—যার মধ্যে অপরিস্ফুট শক্তির বীজগুলি নিহিত থাকে। এই শক্তির বীজই হ'ল বংশগতি বা বংশধারা। এই শক্তি হ'ল মানুষের ভবিষ্যৎ শারীরিক ও মানসিক সম্ভাবনা-শক্তি যাকে আমরা বলি Potentiality। প্রাণের মৌল উপাদান, শিশুর ক্রমবিকাশের প্রচেষ্টা, দেহগত ও মনোপ্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব এবং শিশুর স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি সব কিছুই বীজের আকারে এই কোষের মধ্যে লুক্কায়িত বা নিহিত থাকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, শিশু ভূমিষ্ঠ হবার অনেক আগেই তার জন্ম-লগ্নেই তার 'ললাট-লিখন' অনেকখানি ঠিক হয়ে যায়—পিতৃবীজ ও মাতৃকোষের মিলনের ফলে এবং সম্ভাবনাপূর্ণ শক্তির আকারে। এই শক্তিগুলিই মাতৃগর্ভে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ২৮০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ অবয়ব ও মানসিক শক্তি-বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয়। বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে ভ্রূণ মধ্যস্থিত সম্ভাবনাপূর্ণ শক্তিগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হয় বলেই ভিন্ন ভিন্ন পিতামাতার এমন কি একই পিতামাতার সন্তানের দৈহিক ও মানসিক শক্তি বিভিন্ন প্রকারের হয়।

বংশধারার শ্রেণীবিভাগ (Classification of Heredity): বংশধারাকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন—(১) **দৈহিক** (Physical), (২) **মানসিক** (Mental) এবং (৩) **মনোপ্রকৃতিগত** (Temperamental)।

দৈহিক বংশধারা বলতে ব্যক্তির দৈহিক আকৃতি, গঠন, গায়ের রঙ, চুলের রঙ, চোখের তারার রঙ ইত্যাদি বোঝায়। আবার ব্যক্তির গ্রন্থিগত বৈশিষ্ট্য (glandular) গুলিও এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। গ্রন্থির কার্যপ্রণালীর উপর ব্যক্তির দেহের বৃদ্ধি ও মনের পুষ্টি অনেকখানি নির্ভরশীল।

মানসিক বংশধারা বলতে ব্যক্তির মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলিকেই বোঝায়। এগুলির মধ্যে ব্যক্তির প্রাক্ষোভিক সংগঠনগুলিই প্রথম ও প্রধান। এ ছাড়া ব্যক্তির চিন্তা, কল্পনা বা ইচ্ছা করার ক্ষমতা এবং তার সহজাত বিভিন্ন মানসিক শক্তি, বুদ্ধি ইত্যাদিও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

মনোপ্রকৃতিগত বংশধারা বলতে ব্যক্তির মনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য যাকে আমরা চলতি কথায় মেজাজ বা Mood বলে থাকি, সেইটি বোঝায়। বিভিন্ন

ব্যক্তির মধ্যে মনোপ্রকৃতিগত বৈষম্য অত্যন্ত বেশী দেখা যায়। তাছাড়া দৃষ্টি-ভঙ্গী ইত্যাদি কতকগুলি বৈশিষ্ট্যও মনোপ্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। অলপোর্টের মতে, মনোপ্রকৃতি হ'ল মনের আভ্যন্তরিণ আবহাওয়া বা প্রকৃতি।

বংশধারার সূত্রাবলী (Laws of Heredity) **:** বংশধারাকে ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে—বংশধারার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সূত্র বিদ্যমান। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলির কথা আলোচনা করা হ'ল—

[এক] জার্মান প্রাণীবিদ **ভাইসম্যানের** (Weisman) দেওয়া সূত্র হ'ল—

(ক) **জননকোষের নিরবচ্ছিন্নতা** (Continuity of Germ Plasm) **:** এর অর্থ হ'ল জননকোষটি বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হতে থাকবে, তার কোন বিনাশ নেই। পুং-জননকোষ ও স্ত্রী জননকোষের মিলনের ফলে যে ডিম্ব-কোষটি গঠিত হয়, সেটি আবার নিজে নিজেই বিভক্ত হ'তে থাকে এবং সংখ্যাতীত ভাবে বিভক্ত হওয়ার ফলেই ভ্রূণটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া চলার সময় কয়েকটি কোষ ভ্রূণদেহে অবিকৃত ভাবেই থেকে যায়। এই কোষগুলি নবজাত সন্তানের দেহে সঞ্চারিত ও সংরক্ষিত হয় যাতে নবজাতকের ভবিষ্যৎ প্রজনন কার্যে কোন অসুবিধা না হয়। পিতা তার পিতার নিকট থেকে এই জননকোষটি পেয়েছিলেন, তিনি সেটি আবার অবিকৃত ভাবেই হস্তান্তরিত করবেন—তাঁর পুত্রের নিকট। (Thus the parent it rather the trustee of the germ-plasm than the producer of the child)।

(খ) **অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশধারায় অ-সংক্রামণ** (Acquired traits cannot be transferred through Heredity) **:** বিভিন্ন অনুসন্ধান কার্য পরিচালনার পর ভাইসম্যান এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, পিতা-মাতার কোন অর্জিত গুণ বা বৈশিষ্ট্য সন্তানের বংশধারার মধ্যে সঞ্চারিত হয় না। পিতামাতা ভালো ছবি আঁকতে পারলে বা গান গাইতে পারলে সন্তানও যে তা পারবে—এমন কোন কথা নয়। ভাইসম্যান কয়েক পুরুষ ধরে ইঁদুরের লেজ কেটে যে পরীক্ষা চালান—তাতে দেখা গিয়েছিল লেজকাটা ইঁদুরের সন্তান লেজ-ওয়ালা হচ্ছে।

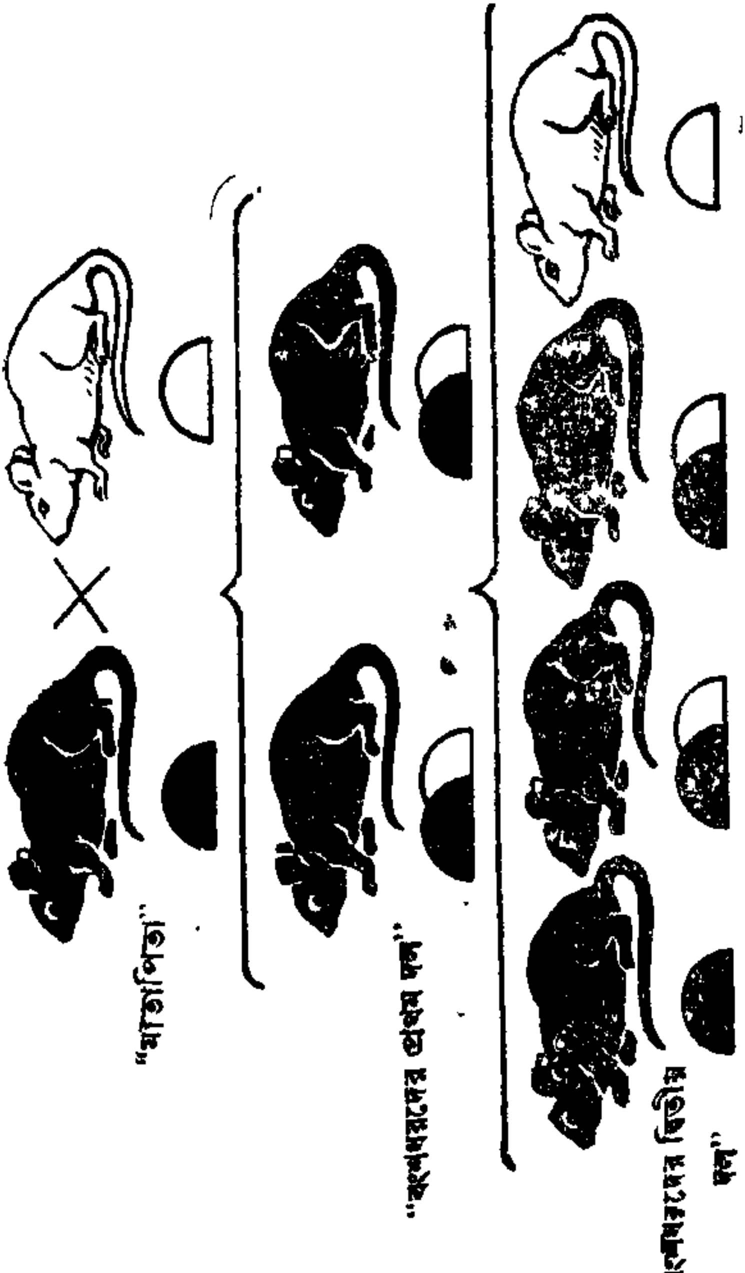
"মাতাপিতা"
"বংশধরদের প্রথম দল"
"বংশধরদের দ্বিতীয় দল"

[দুই] মেণ্ডেলের (Mendel) সূত্রাবলী :

(ক) কোন একটি প্রাণী বা উদ্ভিদ দৈহিক দিক থেকে এক বা অখণ্ড হ'লেও বংশগতির দিক থেকে তার মধ্যে একাধিক বিচ্ছিন্ন ও স্ব-প্রধান গুণ থাকে। কোন একটি মটর দানা গোল বা কোঁচকানো হ'লে তার গাছটা উঁচুও হ'তে পারে আবার লম্বাও হতে পারে।

(খ) বংশগতির মধ্যে বিপরীত গুণের সমাবেশ থাকলেও একটি মাত্র গুণ প্রকাশ পায়—যাকে বলা হয় **প্রকট** (dominant)। যে গুণটি বীজের মধ্যে অপ্রকাশিত অবস্থায় থেকে যায়—তাকে বলা হয় **অপসৃত** (recessive)।

(গ) ক্রোমোজোমের মধ্যে বিপরীত দুটি গুণ বর্তমান থাকলেও সন্তান-উৎপাদনকারী কোষে একটি মাত্র গুণ বর্তমান থাকে। সেইজন্যই উৎপন্ন সন্তানে একটি মাত্র গুণ প্রকাশিত হয়।

বংশগতি সম্বন্ধে মেণ্ডেলের সূত্র (Mendel's Law): চেক (Czech) পুরোহিত যোহন্ গ্রেগর মেণ্ডেল মটর দানার উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে বংশধারা সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান সূত্র আবিষ্কার করেন। তাঁর প্রচারিত তত্ত্ব **মেণ্ডেলবাদ** (Mendelism) নামে পরিচিত।

মেণ্ডেল গোলদানা (বিশুদ্ধ) ও কোচকানো দানা (বিশুদ্ধ) মটরশুঁটি মিশিয়ে কি জাতীয় শুঁটি পাওয়া যাবে তা নিয়ে মটর দানার কয়েক পুরুষ ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। তিনি দেখলেন যে গোল দানা ও কোঁচকানো দানার সংমিশ্রণে যে মটরশুঁটি উৎপন্ন হ'ল—তা গোল দানা। কিন্তু এরা বিশুদ্ধ গোল দানা নয়—কারণ এদের মধ্যে গোল বৈশিষ্ট্য প্রকট বা সক্রিয় হলেও কোঁচকানো বৈশিষ্ট্যটি সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছে। এখন এই নতুন জন্মানো গোল দানা মটরশুঁটি থেকে যে শুঁটি জন্মাল, সেগুলির শতকরা ২৫ ভাগ বিশুদ্ধ গোল, শতকরা ২৫ ভাগ বিশুদ্ধ কোঁচকানো এবং শতকরা ৫০ ভাগ মিশ্র গোল দানা। এর পরের বংশে দেখা গেল বিশুদ্ধ গোল দানা থেকে বিশুদ্ধ গোল দানার শুঁটি এবং বিশুদ্ধ কোঁচকানো দানা থেকে বিশুদ্ধ কোঁচকানো দানার শুঁটি জন্মেছে। কিন্তু মিশ্র গোল দানা থেকে শতকরা ২৫ ভাগ বিশুদ্ধ গোল, শতকরা ২৫ ভাগ

বিশুদ্ধ কোঁচকানো এবং শতকরা ৫০ ভাগ মিশ্র গোল দানা শুঁটি জন্মেছে। একটি ছকের সাহায্যে জিনিসটি বোঝানো হ'ল—

বিশুদ্ধ গোল দানা — বিশুদ্ধ কোঁচকানো দানা

মিশ্র গোল দানা

শতকরা ২৫ ভাগ	শতকরা ৫০ ভাগ	শতকরা ২৫ ভাগ
বিশুদ্ধ গোল	মিশ্র গোল	বিশুদ্ধ কোঁচকানো
বিশুদ্ধ গোল		বিশুদ্ধ কোঁচকানো
শতকরা ২৫ ভাগ	শতকরা ৫০ ভাগ	শতকরা ২৫ ভাগ
বিশুদ্ধ গোল	মিশ্র গোল	বিশুদ্ধ কোঁচকানো

॥ প্রকট ও সুপ্ত গুণাবলীর ধারাবাহিকতা ॥

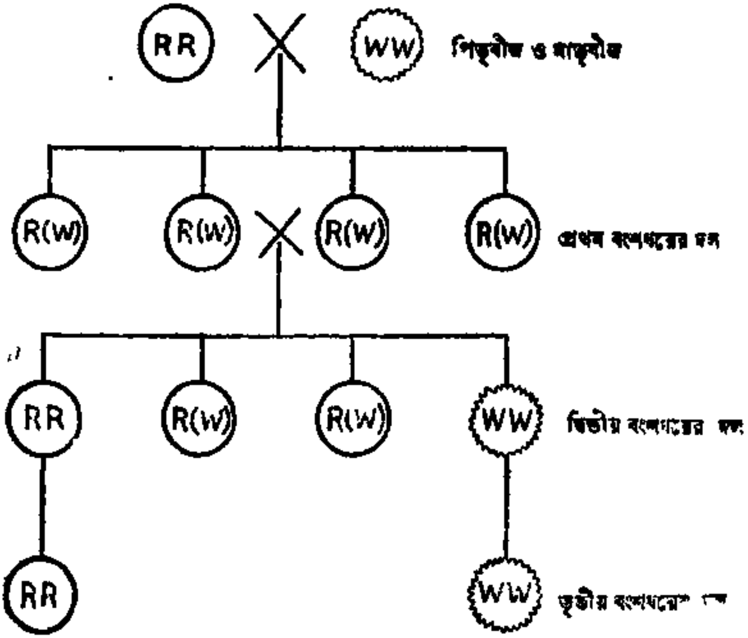

R R—সম্পূর্ণ গোলাকার, w w = সম্পূর্ণ কোচকানো (বন্ধনীর মধ্যে গুণটি সুপ্ত)

মেণ্ডেলের গবেষণা-লব্ধ ফলাফলকে পরবর্তিকালে উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের ক্ষেত্রেই বার বার প্রয়োগ করে তার সত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। মেণ্ডেলের সূত্র সেই সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে—যাদের মধ্যে বিপরীত গুণের সমাবেশ আছে।

বংশগতি কি ভাবে নির্ধারিত হয় (Mechanism of Heredity): আগেই বলা হয়েছে পুরুষের বীজকোষ এবং স্ত্রীর ডিম্বকোষ নিষিক্ত হ'য়ে সৃষ্ট হয় ভ্রূণ বা জাইগোটের। মাতার গর্ভেই প্রথম ভ্রূণের সঞ্চার হয়। এই জাইগোটটি আসলে একটি এককোষ-বিশিষ্ট প্রাণকেন্দ্র। এর মধ্যে মাতা ও পিতার দৈহিক উপাদান সমান ভাবে ছড়িয়ে থাকে। জাইগোট সৃষ্ট হবার পর শুরু হয় দ্রুত কোষ-বিভাজন। ঐ ছোট্ট কোষটি ভেঙ্গে এক থেকে দুই হয়, দুই থেকে চার, চার থেকে আট—এই ভাবে বিভক্ত হয়ে বেড়ে উঠে উঠে শিশুর সম্পূর্ণ অবয়বটি গঠন করে। প্রত্যেকটি কোষের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম (chromosome)। এই ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে একটি এসেছে পিতার দেহ থেকে, আর একটি এসেছে মাতার দেহ থেকে। একটি কোষের নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে যখন দুটি কোষ হয়, তখন কিন্তু প্রত্যেক কোষেই ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে। এখানে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকের দেহের প্রতিটি কোষে ৪৬টি করে ক্রোমোজোম থাকে; কিন্তু পুরুষ বা স্ত্রী—প্রত্যেকের জননকোষে থাকে মাত্র ২৩টি ক্রোমোজোম।

এই ক্রোমোজোমগুলির উপর নবজাতকের দেহের নানা বৈশিষ্ট্য—যেমন গায়ের রঙ, চুলের রঙ, চোখের তারার রঙ, লম্বা বা বেঁটে হওয়া ইত্যাদি নির্ভর করে। আগে এই সব ক্রোমোজোমকেই বংশগতির মূল উপাদান বলে মনে করা হত। কিন্তু এখন জানা গেছে প্রত্যেকটি ক্রোমোজোমের মধ্যে নানা ভাবে সাজানো নানা আকারের খুব ছোট সুতোর মত এক রকম জিনিস থাকে—যেগুলিকে খালি চোখে দেখা যায় না। এদের বলে জীন (gene factor)। এগুলির মধ্যে এক জাতীয় রাসায়নিক পদার্থের জটিল সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। মানুষের মধ্যে বেশ কয়েক হাজার জীন থাকে। জীনগুলির মধ্যে একটি সক্রিয় ও অপরটি নিষ্ক্রিয় থাকে। এই জীনগুলিই হ'ল বংশগতির

মূল উপাদান। জীনগুলি কি ভাবে জোড়া বাঁধবে তার উপরই নির্ভর করছে শিশুর বংশগতি। পুং-জনন কোষ ও স্ত্রী-জনন কোষের মিলনে যে নতুন কোষটি উৎপন্ন হবে তার ভেতরে ক্রোমোজোম ও জীনের মিলনের ব্যাপারটি কিন্তু সম্পূর্ণ আকস্মিক ও অনিশ্চিত। যখন দুটি জনন কোষ মিলিত হয়, তখন কোন্ ক্রোমোজোমের সঙ্গে কোন্ ক্রোমোজোমটি জোড়া লাগবে বা কোন্ জীন কোন্ জীনের সঙ্গে মিলিত হবে তাও আকস্মিক ও অনিশ্চিত। একমাত্র সমকোষী যমজ (Identical twins) ছাড়া পিতামাতার দুটি সন্তান একেবারে একরকম হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।

বংশগতি সম্বন্ধে আরো কয়েকটি তথ্য : বংশগতির সূত্রগুলির কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এখন এ সম্বন্ধে আরো কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য দেওয়া হ'ল—

১। বংশগতির নিয়মানুযায়ী সন্তানেরা পিতামাতার অনুরূপ বা সদৃশ হয় (Like tends to beget like) বাপকা ব্যাটা, সিপাইকা ঘোড়া, ইত্যাদি।

২। বংশগত গুণ পিতামাতা ছাড়াও পূর্বপুরুষদের নিকট হ'তে সন্তানে বর্তাতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় বেশ কয়েক পুরুষ আগের কোন বংশগত বৈশিষ্ট্যও সন্তানের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। এরকম ঘটনাকে **পশ্চাদাবর্তন** বলে।

৩। পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের যতটা মিল থাকার সম্ভাবনা থাকে, ততটা গরমিল থাকারও সম্ভাবনা থাকে।

৪। অর্জিত গুণ অধস্তন পুরুষে সঞ্চারিত হয় না।

৫। বিশেষ বিশেষ দক্ষতা বা নিপুণতাও পিতামাতা বংশগত সূত্রে সন্তানকে দান করতে পারেন না।

৬। পিতামাতার কোন রোগ-ব্যাধিও যে সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হ'তে পারে তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

৭। বংশগত সূত্রে প্রাপ্ত সব গুণই জন্মের সময় প্রকাশিত হয় না। পরিণমন, সময় ও পরিবেশ এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

৮। পিতামাতার কোন দোষ সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত না হ'লেও তার পরের কোন পর্যায়ের সন্তানদের মধ্যে দেখা দিতে পারে। একে লিঙ্গগত উত্তরাধিকার বা (Sex linked heredity) বলে।

পরিবেশ কাকে বলে? (What is Environment): প্রচলিত ভাষ'য় আমরা 'পরিবেশ' বলতে ব্যক্তির চারপাশে যে সমস্ত জিনিস তাকে বেষ্টন করে রাখে, তাই বুঝে থাকি। অর্থাৎ পরিবেশ হ'ল তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা। কিন্তু মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানে পরিবেশ কথাটিকে বেশ ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়। এখানে পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি সেই সমস্ত প্রভাব যেগুল ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধনে সহায়তা করে এবং তার আচরণের মধ্যে কোন-না-কোন পরিবর্তন আনয়ন করে। এই জাতীয় প্রভাব যে সব সময় ব্যক্তির চারপাশে সীমাবদ্ধ থাকে, তা নয়; আরো অনেক অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে। কোন একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নিকট তার পরিবেশ বহু দূরে অবস্থিত কোন তারকামণ্ডল বা সুদূর কোন নীহারিকা। উডওয়ার্থ এই প্রসঙ্গে **কার্যকরী পরিবেশ** (effective environment) কথাটি প্রয়োগ করেছেন।

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী পরিবেশকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করেছেন। কেউ কেউ পরিবেশকে প্রাকৃতিক ও সামাজিক—এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন। পার্থিব যে সমস্ত শক্তি মানুষকে প্রভাবিত করে তাই হ'ল প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্যের জন্যই মানুষের দৈহিক আকৃতি, গায়ের রঙ, জীবনযাত্রার প্রণালী ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। জলবায়ুর পার্থক্য বা বৈষম্যও প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত। এরজন্যই কোন স্থানের অধিবাসী অলস হয়, আবার কোন স্থানের অধিবাসী কর্মঠ হয়।

সামাজিক পরিবেশের স্রষ্টা মানুষ নিজেই। মানুষের অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমান রীতিনীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে তার সামাজিক পরিবেশ। পরিবার, বিদ্যালয়, গ্রাম-শহর-বন্দর, সব কিছু এই বিশেষ পরিবেশটির অন্তর্গত। আবার এই পরিবেশের মধ্যেই মানুষ বিভিন্ন জাতীয় আচার, আচরণ, অনুষ্ঠান ইত্যাদির ব্যবস্থা করে। এগুলির মাধ্যমে ব্যক্তি তার জীবনে নিরাপত্তার ব্যবস্থা যেমন সুরক্ষিত করে তেমনি তার আচার, ব্যবহার ও ব্যক্তিত্বও বিকশিত হয়ে থাকে।

হার্বার্ট স্পেন্সার বলেছেন—'জীবন হ'ল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি সাধন'। মানুষকে সব সময় তার পরিবেশের সঙ্গতি সাধন করে চলতে হচ্ছে। কখনও পরিবেশের তাগিদে সে তার নিজের আচরণ-ধারা বদলে ফেলে, আবার কখনও

সে নিজের প্রয়োজনে পরিবেশকে বদলায়। মূল কথা হ'ল—ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশে পরিবেশের অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

অনেকে পরিবেশকে **গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজ**—এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন। আবার অনেক শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বের পরিবেশ (Pre-natal) এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরের পরিবেশ—এই দু'ভাগেও পরিবেশকে ভাগ করছেন। যে ভাবেই ভাগ করা হোক না কেন, পরিবেশ যে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন জাগতে পারে—কে বড ? বংশগতি না পরিবেশ ? প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নটি নিয়ে শিক্ষাবিদদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। একদল বলেন—শিশুর বংশগতিই বড়, পরিবেশের কোন প্রয়োজন নেই। এই মতাবলম্বীদের বলা হয় **বংশগতিবাদী** (Hereditarians)। অন্যদল বলেন—বংশগতির কোন মূল্যই নেই, শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবেশই হচ্ছে একমাত্র উপাদান। এদের বলা হয় **পরিবেশবাদী** (Environmentalists)। দু'দলের বক্তব্যের পশ্চাতে কিছু কিছু যুক্তি ও প্রমাণ আছে। এগুলি সম্পর্কে আগে আলোচনা করা যাক—তারপর বিচার করা যাবে কে বড।

বংশগতির পক্ষে বক্তব্য ও যুক্তি : বংশগতির উপর যারা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাদের মধ্যে প্রধান হলেন গ্যাল্টন (Galton)। তাকেই বংশগতিবাদীদের প্রবক্তা বলা যেতে পারে। তিনি বংশগতির উপর এত বেশী আস্থাবান ছিলেন যে, এ সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য তিনি বিজ্ঞানের জন্য একটি নতুন শাখার সৃষ্টি করেন যেটি বর্তমানে Eugenics নামে খ্যাত। গ্যাল্টনের বক্তব্য ছিল শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে তাকে ভাল বংশগতির অধিকারী করতে হবে। যাই হোক এখন গ্যাল্টন ও তার সহকর্মীরা এবং অন্যান্য বংশগতিবাদীরা কি কি প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল—

[এক] গ্যাল্টন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ডারউইন পরিবারের ইতিহাস সংগ্রহ করে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন (Hereditary Genius)। এই ইতিহাস সম্পূর্ণ করেন কার্ল পিয়ার্সন। তিনি অনেক পরিশ্রমের পর প্রায় এক হাজার বৎসর-ব্যাপী ওয়েজউড-ডারউইন-গ্যাল্টন (Wedgewood-Darwin-Galton) পরিবারের বংশতালিকা তৈরী করেন। এই বংশতালিকাটি পর্যবেক্ষণ করে

তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে এই কয়টি পরিবার থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিভাবান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন। তারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিজ নিজ কীর্তি রেখে গেছেন। এর মধ্যে আবার উল্লেখযোগ্য হ'ল—ডারউইন পরিবারে পাঁচজন ইংল্যাণ্ডের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিল। এর থেকেই বংশগতির সমর্থকরা সিদ্ধান্ত করেন যে, ব্যক্তিত্বের বিকাশে বংশগতির প্রভাব অনস্বীকার্য।

[দুই] ডাগডেল (R. L. Dugdale)-ও অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেটে কারাগার সমূহের অধিকর্তা। বহু বৎসর কয়েদীদের দেখে দেখে তাঁর খেয়াল হ'ল—একটি বিশেষ বংশের নাম বার বার পাওয়া যাচ্ছে। বহু বছর অনুসন্ধান করে তিনি দেখলেন যে পরিবারটি শুরু হয়েছে একজন দুশ্চরিত্র, ভবঘুরে লোক থেকে। তিনি জ্যুকস (Jukes) এই ছদ্মনামে সেই পরিবারের বংশতালিকা প্রকাশ করেন। এই বংশতালিকা থেকে দেখা গেল শুরু থেকে বহু বৎসর পর্যন্ত ঐ পরিবার থেকে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তারা বেশীর ভাগই অসৎ প্রকৃতির।

[তিন] গডার্ড (Goddard) ঠিক একই ভাবে ক্যালিক্যাক (Kalikak) ছদ্মনামে অন্য একটি পরিবারের বংশতালিকা প্রকাশ করেন। তিনি দেখেন এই পরিবার যে ব্যক্তির থেকে শুরু হয়েছে তাঁর দুটি বিয়ে। একজন স্ত্রী বেশ সুস্থ ও বুদ্ধিমতী, কিন্তু অপর জন ক্ষীণবুদ্ধি ও অসৎকুলোদ্ভবা। এই দুটি স্ত্রীর সন্তানধারা থেকে দেখা যায় বুদ্ধিমতী স্ত্রীর সন্তানেরা বেশ বুদ্ধিমান, স্বাভাবিক ও সামাজিক; কিন্তু অপর জনের সন্তানরা ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন, অস্বাভাবিক ও অসামাজিক। এখানেও গডার্ড বংশগতির অনুকূলে রায় দেন।

[চার] টারম্যান (Terman) ক্যালিফোর্ণিয়ার এক হাজার প্রতিভাসম্পন্ন ছেলেমেয়ের বুদ্ধি পরিমাপ করেন এবং তারপর তাদের পিতামাতার বুদ্ধিও পরিমাপ করেন। দুটির মধ্যে সহ-সম্বন্ধের মাত্রা দেখে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, বংশগতিই ব্যক্তির বুদ্ধির ক্ষেত্রে প্রধান উপাদান।

[পাঁচ] নিউম্যান ফ্রেড (Fred) এবং এডুইন (Edwin) নামে দু'জন সমবোধী যমজ সন্তানকে নিয়ে পরীক্ষা করেন। তিনি যখন এদের খোঁজ পান, তখন এদের বয়স ছাব্বিশ বছর। খুব ছোট বেলাতেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং পৃথক পরিবেশে বড় হ'তে থাকে। কিন্তু নিউম্যান যখন তাদের

দেখা পান তখন দেখা গেল বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। তাদের মধ্যে দৈহিক পার্থক্য খুব একটা ছিল না। আবার গায়ের রঙ, চুলের রঙ, ওজন ইত্যাদিও প্রায় একই ছিল। মানসিক দিকেও দু'জনের মধ্যে যথেষ্ট মিল ছিল। দু'জনে একই ধরনের বৃত্তি বেছে নিয়েছিল। উভয়ের বুদ্ধ্যঙ্ক প্রায় একই ছিল। দু'জনে বিয়ে করেছে প্রায় একই সময়ে—দু'জনেরই একটি করে ছেলে! দু'জনেই কুকুর পুষেছে আর দু'জনেই নিজের নিজের কুকুরের নাম রেখেছে—"ট্রিক্সি"। নিউম্যান এ থেকে সিদ্ধান্ত করেছিলেন—বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও এত মিল থাকার একমাত্র কারণ হচ্ছে বংশগতি। সুতরাং জীবন বিকাশের পথে বংশগতিই বড়।

বংশগতির গুরুত্ব: উপরোক্ত যুক্তিগুলি থেকে বংশগতিবাদীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে শিক্ষা কার্যকরী করতে হ'লে শিশুর বংশগতি একান্ত প্রয়োজন। তাঁরা বলেন—যে শিশুর বংশগতি ভালো, তার শিক্ষাও ভালো হবে। আর যে সমস্ত শিশু বংশগত ভাবে দৈহিক বা মানসিক গুণ পায় না, তাদের হাজার চেষ্টা করলেও আদর্শ শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ করেও উন্নত করা যায় না। এদের বক্তব্য হ'ল—You cannot make a silk purse out of a sow's ears বা গাধা পিটিয়ে মানুষ করা যায় না। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল শিশুর আভ্যন্তরিণ সুপ্ত সম্ভাবনাগুলির বিকাশ সাধন করা। কোন শিশুর মধ্যে এই সম্ভাবনা না থাকলে বিকাশ সাধন করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কোন বস্তুকে বিকশিত করতে হ'লে তার মধ্যে বিকাশধর্মী কোন সত্তার অস্তিত্ব থাকা একান্ত প্রয়োজন। বীজ থেকে গাছ হয়। এটা সম্ভব হয় বীজের মধ্যে জীবনের বা বিকাশের একটা সুপ্ত সম্ভাবনা আছে বলেই। এই সমস্ত যুক্তির উপর নির্ভর করেই বংশগতিবাদীরা বলেন—শিক্ষাক্ষেত্রে একমাত্র প্রয়োজনীয় উপাদান হ'ল বংশগতি। বংশগতিই শিক্ষার উপাদান যোগায়। এঁরা পরিবেশকে খুব বড় করে দেখেন না।

পরিবেশের পক্ষে বক্তব্য ও যুক্তি: পরিবেশবাদীরাও তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি ও প্রমাণের অবতারণা করেছেন। এঁরা আবার বংশগতিকে মোটেই মানতে চান না। তাঁরা বলেন—শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবেশই বড়। পরিবেশ বংশগতিকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করতেও পারে। এ প্রসঙ্গে ওয়াট্‌সনের বক্তব্য

হ'ল—"Give me a dozen healthy infants, well formed, and my own specified world to bring them up in and I will guarantee to take any one at random and train him to become any type of specialised, I might select." এঁরা শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনা বিকশিত করার কথা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলছেন—কোন পরিবেশ যেমন কোন শিশুকে উন্নত ও প্রতিভাবান করতে পারে, তেমনি অন্য পরিবেশ তাকে অসামাজিক ও উচ্ছৃঙ্খল করে গড়ে তুলতেও পারে। অর্থাৎ পরিবেশ হ'ল—অঘটন-ঘটিয়সী একটি শক্তি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দার্শনিক যেমন হেলভেসিয়াস, রুশো প্রভৃতি পরিবেশের স্বপক্ষেই মত দিয়ে গেছেন। যাই হোক এখন পরিবেশবাদীদের পরিবেশের পক্ষে কতকগুলি পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্তের কথা আলোচনা করা যাক—

[এক] ইস্টার ব্রুক ডাগডেলের জ্যুকস পরিবার সম্বন্ধে আরো ব্যাপক গবেষণা করে দেখেন যে, সামাজিক পরিবেশ উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনেকেই উন্নত হয়েছে। তিনি বলেন—ডাগডেলের অনুসন্ধান অসম্পূর্ণ ছিল তাই তিনি কেবল বংশগতির দিকটাই দেখেছিলেন। তিনি পরিবেশের স্বপক্ষে মত দিলেও বংশগতিকে একেবারে বাদ দেননি।

[দুই] ক্যাটেল আমেরিকার কয়েকজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের জীবনী অনুসন্ধান করে দেখেন—তাঁদের মধ্যে অনেকের বংশগতি বেশ ভাল নয়। তিনি বলেন বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বা অন্যান্য বুদ্ধির উন্নতি ও বিকাশ বংশগতি অপেক্ষা পরিবেশের উপর বেশী নির্ভরশীল।

[তিন] অরণ্যে লালিত-পালিত হয়েছে এমন মানবশিশু পর্যবেক্ষণ করে বৈজ্ঞানিকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পরিবেশের প্রভাবে বংশগতি প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। এ্যাভিরণের বন্যবালক, নেকড়ে-বালক রামু বা মেদিনীপুরের জঙ্গলে প্রাপ্ত 'কমলা'—এরা সকলে মানব সন্তান হওয়া সত্ত্বেও পরিবেশের প্রভাবে 'জন্তুতে' রূপান্তরিত হয়েছিল।

[চার] অধ্যাপক ওয়েলম্যান এবং তাঁর সহকর্মীরা আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন করে লক্ষ্য করলেন যে, পরিবেশটি যত ভালো হবে বুদ্ধ্যঙ্কও তত বাড়বে এবং পরিবেশটি খারাপ হ'লে বুদ্ধ্যঙ্কও কমে যাবে। স্কিল্‌সের একটি পরীক্ষণ থেকেও অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

[পাঁচ] যাযাবর, ভবঘুরে, ইংল্যাণ্ডের ক্যানালবোট অঞ্চলের ছেলেমেয়ে, জিপ্সি ছেলেমেয়ে বা সুদূর পার্বত্য অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে—এদের মানসিক বিকাশ প্রতিকূল পরিবেশের জন্যই ব্যাহত হয়েছে।

[ছয়] মিস্ বারবারা বার্কস্ পালিত সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষা করেন। তিনি দেখেন পালিত সন্তানদের সঙ্গে পালক পিতামাতার সাদৃশ্য কম ; কিন্তু পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ক র এই সাদৃশ্য যথেষ্ট বাড়ানো সম্ভব।

[সাত] রাশিয়ার বিজ্ঞানী মিচু রন, লাইসেংকো পরিবেশ পরিবর্তিত করে বংশগতিকেও কৃত্রিম ভাবে পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তারা গমের চাষ করতে গিয়ে এ ব্যাপারে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছেন।

[আট] পরিবেশের স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ ও যুক্তি হ'ল—যমজ পর্যবেক্ষণ। এ ব্যাপারে হেলেন ও গ্ল্যাডিসের দৃষ্টান্তই উল্লেখযোগ্য। এ দু'জন ছিল সমকোষী যমজ। ঘটনাচক্রে মাত্র দেড় বৎসর বয়সে এরা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়। হেলেন তার পালিতা মাতার যত্নে বি. এ. পাশ করে এবং শিক্ষকতার কাজ নেয়। পরে এক বিত্তবান ব্যবসায়ীকে বিয়ে করে সে ভালভাবেই ঘর-সংসার করতে থাকে। হেলেন বেশ সামাজিক ও মার্জিত রুচিসম্পন্না নারী ছিলেন এবং নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলিও তার মধ্যে সুন্দর ভাবে বিকশিত হয়।

কিন্তু গ্ল্যাডিস্ ঠিক বিপরীত ভাবে বেড়ে ওঠে। খুব ছোট বেলাতে তার লেখাপড়ায় পাট চুকে যায়। ক্যানাডার নির্জন রকি অঞ্চলে মানুষ হওয়ার জন্য সে বেশ অসামাজিক হয়ে যায়। জীবিকা অর্জনের জন্য তাকে বিভিন্ন কল-কারখানায় ঘুরে বেড়াতে হ'ত। তার স্বাস্থ্যও ভাল ছিল না। আর সে ছিল দুর্বলচেতা, আত্মবিশ্বাসহীনা এবং সৌন্দর্যহীনাও।

পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়েস যখন তাদের খুঁজে বের করা হয়—তখন দেখা যায় তাদের মধ্যে বিভিন্ন দিকে অনেক পার্থক্য। দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, বৌদ্ধিক সবদিকেই হেলেন গ্ল্যাডিসের চেয়ে উন্নত। তা হ'লে এর থেকে বলা যায়—জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম।

[এ প্রসঙ্গে দু'টি যমজ শুক পাখীর গল্পটির অবতারণা করা যেতে পারে। একটি যায় ব্যাধের ঘরে, আর অন্যটি এক সাধুর আশ্রমে। ব্যাধের ঘরের শুকটি লোক দেখলেই বলত—মার-মার, কাট-কাট ইত্যাদি। কিন্তু সাধুর

[চ] বাবা-মা কোন বিশেষ অর্জিত গুণের অধিকারী হ'লে সন্তান-সন্ততির মধ্যেও যে সব গুণ বংশপরম্পরায় বর্তাবে, তার কোন স্থিরতা নেই। ধরে নেওয়া যেতে পারে—অর্জিত গুণ সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চালিত হয় না। তবে বাবা-মা কর্তৃক সৃষ্ট পরিবেশে (যেখানে ঐ অর্জিত গুণটির চর্চা করা হয়) শিশু ঐ গুণটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সেটি অর্জন করতেও পারে।

[ছ] শিশুর অভ্যাস ও স্বভাব-চরিত্র গঠনের পশ্চাতে বংশগতির চেযে পরিবেশের অবদানই বেশী। শিশু শৈশবকাল থেকে যেরূপ পরিবেশে মানুষ হয়, স্বভাব-চরিত্রও সেইমত গড়ে উঠে।

[জ] বিভিন্ন সময়ে ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ যে শিক্ষালাভ করেছেন, সেইটি আমাদের বর্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রত্যেক শিশুকে কোন না কোন সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠতে হয়। স্যান্ডিফোর্ড (Sandiford) এই সামাজিক পরিবেশটির নাম দিয়েছেন **সামাজিক বংশগতি (Social heritage)**। তিনি আরো বলেছেন—শিশু তার জৈবিক বংশগতি নিয়ে জীবন-পরিক্রমা শুরু করে, তাই সেইটির উপর আমাদের কোন হাত নেই। কিন্তু সে সামাজিক বংশগতির মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয় এবং এই বংশগতিকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। (A child is born with a biologic·l heritage, he is born into a social heritage—Sandiford)। বিভিন্ন জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, শিশুর সামান্যতম বিকাশও পরিবেশ ছাড়া সম্ভব হয় না।

শিক্ষাক্ষেত্রে বংশগতি ও পরিবেশ এবং শিক্ষকের কর্তব্য : বংশগতি ও পরিবেশ সম্বন্ধে এতক্ষণ যে আলোচনা করা হ'ল—তা থেকে বোঝা যাচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে উভয়েরই যথেষ্ট অবদান রয়েছে। কোনটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ, কোন্‌টি কম—এ নিয়ে বাদানুবাদ করার আর কোন প্রয়োজন নেই। মোটর গাড়ী চালাতে হ'লে এঞ্জিন ও গ্যাসোলিন দুটিই প্রয়োজন। যে কোন একটিকে বাদ দিলে গাড়ীটি অচল হয়ে যাবে। তেমনি শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু ক্রমবিকাশে বংশগতি ও পরিবেশ—দুটিই প্রয়োজন। একটি আর একটির পরিপূরক। তবে ব্যক্তিসত্তা কেবল বংশগতি ও পরিবেশের নিছক যোগফল নয়। এই দুটি শক্তির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে দুটিই বদলে যায়—তৈরী হয় নতুন একটি তৃতীয় সত্তার—যেটিকে আমরা বলি ব্যক্তিসত্তা।

শিশুর শিক্ষার সীমা ও গতি বংশগতিই স্থির করে দেয়। অতএব তার শিক্ষার ক্ষেত্রে বংশগতির উপর শিক্ষকের সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। শিশুকে কি শিক্ষা দেওয়া হবে, কেমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া দেওয়া হবে ও কতদূর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হবে—তা স্থির করে দেয় বংশগতি। কাজেই শিক্ষককে বংশ-গতির বিভিন্ন উপাদান শিশুর মধ্যে কি ভাবে ছড়িয়ে আছে—তা জানতে হবে।

প্রথমে ধরা যাক্ দৈহিক বংশগতির কথা। সাধারণতঃ দৈহিক বংশগতি শিক্ষাকে তেমন প্রভাবিত করে না। এ্যাড্‌লারের পরীক্ষা থেকে জানা গেছে—যে সব শিশু শারীরিক ত্রুটিসম্পন্ন, তাহাদের মধ্যে কিছুটা হীনমন্যতাবোধ সৃষ্ট হয় এবং এদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশও ব্যাহত হয়।

শিশুর শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করে তার মানসিক বংশগতি। মানসিক বংশগতির মধ্যে সর্বপ্রধান হ'ল—বুদ্ধি। বুদ্ধিই শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করে। এরপর আসে কতকগুলি বিশেষধর্মী শক্তি—যেমন ভাষামূলক শক্তি, যন্ত্রঘটিত শক্তি, গাণিতিক শক্তি ইত্যাদি। শিশুর মধ্যে এই সব শক্তিগুলির অস্তিত্ব ও পরিমাণ লক্ষ্য করে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিশুর মনোপ্রকৃতিটিও শিক্ষার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অলপোর্ট তো বলেছেন—মনোপ্রকৃতি হ'ল মনের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া। এই মনোপ্রকৃতি শিশুর মনের মৌলিক সংগঠনটির স্বরূপ নির্ধারণ করে দেয় এবং তার ব্যক্তিসত্তার কাঠামোটিও গড়ে তোলে।

বংশগত সূত্রে প্রাপ্ত কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তিও শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাবশালী। তবে অনেকগুলি প্রবৃত্তি ক্ষণস্থায়ী। উপযুক্ত শিক্ষা, অভ্যাস ও চর্চার ফলে সেগুলি স্থায়ী হ'তে পারে।

ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে বংশগতি যেমন প্রভাব বিস্তার করে, পরিবেশটিও তেমনি প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বংশগতি জোগান দেয় কাঁচামাল (raw material), পরিবেশ সরবরাহ করে তৈরী জিনিস (finished product)। বংশগতি দেয় শিক্ষার কাঠামোটি সেটি রূপায়িত করে পরিবেশ। শিক্ষকই হলেন পরিবেশ নিয়ন্ত্রণকারী (Manipulator of the environment)। তিনি শিশুর বংশগতি পরিবর্তিত করতে পারেন না ঠিকই, কিন্তু পরিবেশের সংস্পর্শে তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারেন। আগেই বলা হয়েছে—বংশগতির ঘাটতি পরিবেশের সাহায্যে অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব।

শিশুর বংশধারাটির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করাই যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয়, তাহ'লে শিক্ষক কি কি করতে পারেন, সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা দরকার—

[এক] বংশগতি বলে দেয় যে, প্রত্যেকটি শিশুই বিভিন্ন। কাজেই শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আধুনিক ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপর। শিশুর মানসিক শক্তি ও সামর্থ্য লক্ষ্য করেই শিক্ষা-পদ্ধতির ও শিক্ষার বিষয়-বস্তুর নির্বাচন করতে হবে। এজন্য তাঁকে বিভিন্ন জাতীয় মানসিক অভীক্ষার সাহায্য নিতে হবে।

[দুই] শিক্ষাকে করতে হবে মনোবিজ্ঞানসম্মত। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা মধুর ও আদর্শ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। বিদ্যালয় পরিবেশটিকেও সুস্থ ও সামাজিক করে গড়ে তুলতে হবে।

[তিন] প্রত্যেকটি শিশুকে তার রুচি, আগ্রহ ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হবে। সকলকে এক ছাঁচে গড়ে তুললে চলবে না—আর তা সম্ভবও নয়।

[চার] শিক্ষক শিক্ষার সহায়ক বিভিন্ন জাতীয় দৃষ্টি ও শ্রুতি নির্ভর প্রদীপণ ব্যবহার করবেন যাতে শিক্ষা সহজ ও সার্থক হ'তে পারে।

[পাঁচ] শিক্ষার্থীরা যাতে বিদ্যালয়ের অবসর সময় সুস্থ ভাবে কাটাতে পারে, তার জন্য নানাপ্রকার শিক্ষামূলক, শিল্পমূলক, সৃজনমূলক ইত্যাদি কাজ ও শিশু-চলচ্চিত্র দেখানো, খেলাধুলা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

[ছয়] বিদ্যালয় পরিবেশটি হবে আদর্শ গণতান্ত্রিক পরিবেশ। যে পরিবেশে শিশু তার বংশগতির ধারা অনুযায়ী কাজ করতে পারে না—সে পরিবেশটি স্বাস্থ্যকর হয় না।

[সাত] শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য নিয়মিত পরীক্ষা করার ব্যবস্থা যেমন থাকবে, মানসিক স্বাস্থ্যটি অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থাও তেমনি রাখতে হবে।

[আট] শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির পরিমাপ মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতিতে করতে হবে। পশ্চাদপদ, অনগ্রসর ও প্রতিভাবান শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। তেমনি বিশেষ গুণসম্পন্ন শিশুদের (talented) জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

[নয়] উপযুক্ত শিক্ষকের দ্বারা বিদ্যালয়ে ছাত্রদের শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক

নির্দেশনাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া দলগত নির্দেশনার কৌশলটিও (Group Dynamics and Group Guidance technique) সুপরিচালনা ও সুমন্ত্রণাই শিশুকে সার্থকভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

আমরা বংশগতি ও পরিবেশ সম্বন্ধে উড্‌ওয়ার্থের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে বক্তব্য শেষ করছি: বংশগতি নিজে নিজেই বিকশিত হয়, একথা না বলে বরং বলা উচিত শিশুর বিকাশ পরিবেশ কর্তৃক বংশগতির বিকাশের উপরই নির্ভর করছে। (**"Instead of saying that heredity unfolds itself, it would be nearer the truth to say that the development consists in the unfolding of heredity by environment."**)

।। জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর ।।

(Stages of Development)

[*Infancy* -The earliest period of post-uterine human life duri g which the child is wholly dependent on parental care , strictly should apply to the period before the child begins to speak, but is usually taken to cover the first two years of life,

Adolescence :—The period in human development between the beginning of puberty and the attainment of adulthood.

Adolescene is a period of great stress and strain, storm and strive-Stanley Hall

There is a tide which begins to rise in the face of youth at the age of 11 or 12. It is called by the name of adolescence If that tide can be taken at the flood and a new voyage begun in the strength and along the flow of its current, we think that it will move on to fortune. —Hadow Committee Report.]

শিশু হ'ল পৃথিবীর প্রাচীনতম বস্তু। প্রাচীন বলেই শিশুর প্রতি অবজ্ঞা করা হয়েছে সবচেয়ে বেশী। কিন্তু ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক গবেষণার ফলে পৃথিবীর সমস্ত দেশে শিশু সম্বন্ধে ধারণাটি বদলে গেছে। এখন শিক্ষা ক্ষেত্রে কেন্দ্রবিন্দুই হ'ল শিশু। প্রত্যেক শিক্ষকের অবশ্য করণীয় কর্ম হ'ল শিশুকে জানা। (The child is a book which the teacher is to read from page to page—Rousseau)। শিশুকে জানতে হ'লে তাকে সামগ্রিক ভাবে জানতে হবে। অর্থাৎ তার দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক দিকগুলির বিকাশ ও বৃদ্ধি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে হবে। এগুলি জানলে তবেই শিশুর ব্যক্তি সত্তার সার্বিক বিকাশের কলাকৌশলটিও জানা যাবে। যাই হোক্—প্রথমে শিশুর শারীরিক বা দৈহিক বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক—

দৈহিক বিকাশ (Physical Development) : প্রবাদ আছে, সুস্থ দেহেই সুস্থ মনের বাস। দৈহিক বিকাশটি ঠিক পথে এগিয়ে গেলে তবেই শিশুর

ব্যক্তিসত্তাটিও ঠিক ভাবে গড়ে উঠবে। (শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর সে আমাদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। শিশু থেকে বালক, বালক থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবা, যুবা থেকে বৃদ্ধ—এই পরিবর্তন আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। অন্য কোন প্রকার বিকাশ এত প্রত্যক্ষ ভাবে আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি না। তবে শিশুর দৈহিক বিকাশের একটা বড় অংশ আমাদের অগোচরে ঘটে যায়।) এটি হ'ল শিশুর মাতৃগর্ভে থাকাকালীন বা প্রাক্-জন্ম বিকাশ (Pre-natal development)। এই অবস্থায় শিশুর দৈহিক বিকাশ কি ভাবে ঘটে তা "বংশধারা" অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে বলে পুনরায় আলোচনা করা হ'ল না। শিশুর গর্ভকালীন আচরণ কিন্তু বিশেষধর্মী কতকগুলি আচরণ বা প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি নয়, বরং বলা যেতে পারে—এগুলি হ'ল সাধারণধর্মী আচরণ বা শারীরিক প্রতিক্রিয়া মাত্র।

(জন্মের পর থেকে শিশুর দৈহিক যে দিকটির পরিবর্তন বেশী করে চোখে পড়ে—তা হ'ল তার উচ্চতা ও ওজনের বৃদ্ধি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। শিশুর জন্মের গোড়ার দিকে তার এই বৃদ্ধি যতটা দ্রুত হতে থাকে, পরিণতির দিকে এগিয়ে গেলে বৃদ্ধি ততটা দ্রুত হয় না—বরং কমে যেতে থাকে। তবে যৌবনাগমে এর ব্যতিক্রম ঘটে। শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির হার সমান নয়। প্রথম দু'বছর এই বৃদ্ধির হার অত্যন্ত দ্রুত। তারপর ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম হারে ঘটে। আবার ১১-এর পর ১৬ পর্যন্ত এই হারটি হঠাৎ বেড়ে যায়। ১৬ পর ১৮ পর্যন্ত আবার কমে যায়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে একটি স্তরে বৃদ্ধি হ'লে পরের স্তরে তারই অন্তপূর্তি ঘটে—তাই বৃদ্ধির হার কম। যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায় এবং ওজনও হঠাৎ বাড়ে। আবার ছেলে ও মেয়েদের উচ্চতা বৃদ্ধির হার এক হয় না। সাধারণতঃ ১২—১৩ বৎসরের মেয়ে সমবয়সী ছেলের চেয়ে মাথায় কিছুটা লম্বা হয়। পরে ১৮ বৎসরের কাছাকাছি গিয়ে ছেলেই লম্বায় বড় হয়ে যায়।)

ইন্দ্রিয়জ সংবেদনের ক্ষেত্রেও বিষয়টি বেশ লক্ষণীয়। জন্মের সময় শিশু প্রাথমিক ইন্দ্রিয় ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রথম সপ্তাহে ইন্দ্রিয় ক্ষমতার বিশেষ পার্থক্য অনুভূত হয় না। ক্রমশঃ শিশুর মনোযোগ তীব্র শব্দ ও উজ্জ্বল রং-এর প্রতি ধাবিত হয় এবং সে গতিশীল বস্তু প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করে।

।। জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর ।।

(Stages of Development)

[*Infancy* : -The earliest period of post-uterine human life duri g whicl the child is wholly dependent on parental care ; strictly should apply tc the period before the child begins to speak, but is usually taken to covei the first two years of life.

Adolescence :—The period in human development between thi beginning of puberty and the attainment of adulthood.

Adolescene is a period of great stress and strain, storm and strive Stanley Hall

There is a tide which begins to rise in the face of youth at the age o 11 or 12. It is called by the name of adolescence. If that tide can be takei at the flood and a new voyage begun in the strength and along the flow o its current, we think that it will move on to fortune. —Hadow Committe Report.]

শিশু হ'ল পৃথিবীর প্রাচীনতম বস্তু। প্রাচীন বলেই শিশুর প্রতি অবজ্ঞা করা হয়েছে সবচেয়ে বেশী। কিন্তু উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষ মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক গবেষণার ফলে পৃথিবীর সমস্ত দেশে শিশু সম্বন্ধে ধারণাি বদলে গেছে। এখন শিক্ষা ক্ষেত্রে কেন্দ্রবিন্দুই হ'ল শিশু। প্রত্যেক শিক্ষকেৰ অবশ্য করণীয় কর্ম হ'ল শিশুকে জানা। (The child is a book whicl the teacher is to read from page to page—Rousseau)। শিশুবে জানতে হ'লে তাকে সামগ্রিক ভাবে জানতে হবে। অর্থাৎ তার দৈহিক মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক দিকগুলির বিকাশ ও বৃদ্ধি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে হবে। এগুলি জানলে তবেই শিশুর ব্যক্তি সত্তার সার্বিক বিকাশের কলাকৌশলটিও জানা যাবে। যাই হোক্—প্রথমে শিশুর শারীরিক বা দৈহিক বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক—

দৈহিক বিকাশ (Physical Development) : প্রবাদ আছে, সুস্থ দেহেই সুস্থ মনের বাস। দৈহিক বিকাশটি ঠিক পথে এগিয়ে গেলে তবেই শিশু

ব্যক্তিসত্তাটিও ঠিক ভাবে গড়ে উঠবে। (শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর সে আমাদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। শিশু থেকে বালক, বালক থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবা, যুবা থেকে বৃদ্ধ—এই পরিবর্তন আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। অন্য কোন প্রকার বিকাশ এত প্রত্যক্ষ ভাবে আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি না। তবে শিশুর দৈহিক বিকাশের একটা বড় অংশ আমাদের অগোচরে ঘটে যায়।) এটি হ'ল শিশুর মাতৃগর্ভে থাকাকালীন বা প্রাক্-জন্ম বিকাশ (Pre-natal development)। এই অবস্থায় শিশুর দৈহিক বিকাশ কি ভাবে ঘটে তা "বংশধারা" অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে বলে পুনরায় আলোচনা করা হ'ল না। শিশুর গর্ভকালীন আচরণ কিন্তু বিশেষধর্মী কতকগুলি আচরণ বা প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি নয়, বরং বলা যেতে পারে—এগুলি হ'ল সাধারণধর্মী আচরণ বা শারীরিক প্রতিক্রিয়া মাত্র।

(জন্মের পর থেকে শিশুর দৈহিক যে দিকটির পরিবর্তন বেশী করে চোখে পড়ে—তা হ'ল তার উচ্চতা ও ওজনের বৃদ্ধি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। শিশুর জন্মের গোড়ার দিকে তার এই বৃদ্ধি যতটা দ্রুত হতে থাকে, পরিণতির দিকে এগিয়ে গেলে বৃদ্ধি ততটা দ্রুত হয় না—বরং কমে যেতে থাকে। তবে যৌবনাগমে এর ব্যতিক্রম ঘটে। শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির হার সমান নয়। প্রথম দু'বছর এই বৃদ্ধির হার অত্যন্ত দ্রুত। তারপর ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম হারে ঘটে। আবার ১১-এর পর ১৬ পর্যন্ত এই হারটি হঠাৎ বেড়ে যায়। ১৬ পর ১৮ পর্যন্ত আবার কমে যায়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে একটি স্তরে বৃদ্ধি হ'লে পরের স্তরে তারই অন্তপূর্তি ঘটে—তাই বৃদ্ধির হার কম। যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায় এবং ওজনও হঠাৎ বাড়ে। আবার ছেলে ও মেয়েদের উচ্চতা বৃদ্ধির হার এক হয় না। সাধারণতঃ ১২—১৩ বৎসরের মেয়ে সমবয়সী ছেলের চেয়ে মাথায় কিছুটা লম্বা হয়। পরে ১৮ বৎসরের কাছাকাছি গিয়ে ছেলেই লম্বায় বড় হয়ে যায়।)

ইন্দ্রিয়জ সংবেদনের ক্ষেত্রেও বিষয়টি বেশ লক্ষণীয়। জন্মের সময় শিশু প্রাথমিক ইন্দ্রিয় ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রথম সপ্তাহে ইন্দ্রিয় ক্ষমতার বিশেষ পার্থক্য অনুভূত হয় না। ক্রমশঃ শিশুর মনোযোগ তীব্র শব্দ ও উজ্জ্বল রং-এর প্রতি ধাবিত হয় এবং সে গতিশীল বস্তু প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করে।

নবজাত শিশুর শ্রবণ সংবেদনের চেয়ে চাক্ষুষ সংবেদন বেশী তীব্র হয়। বিভিন্ন জাতীয় স্বাদজ সংবেদনের মধ্যে পার্থক্য কিন্তু শিশুর জন্মের পরই ধরা পড়ে। দ্বিতীয় সপ্তাহে শিশু ত্বক সংবেদনার মাধ্যমে বেদনা বা পীড়াদায়ক উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেবার ক্ষমতা অর্জন করে। আবার সে কিছু কিছু প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়াও সম্পন্ন করতে পারে।

(শিশু যত বড় হতে থাকে ততই সে হাত, পা ইত্যাদি পেশী সঞ্চালনমূলক আচরণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে থাকে। শিশুর মানসিক বিকাশ এই অঙ্গ সঞ্চালনের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন জাতীয় অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে শিশু পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হয়, তার কৌতূহল তৃপ্ত হয় ও সে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে। নবজাত শিশু তার ইচ্ছা ও প্রয়োজন মত পেশী সঞ্চালন করতে পারে না। Mary-Shirley-র একটি গবেষণা থেকে জানা যায় ১ মাসের শিশু চিবুক একটু উঁচু করতে পারে, ২ মাসে মাটি থেকে মুখ তোলে, ৩ মাসে কোন জিনিস ধরবার চেষ্টা করতে পারে, ৪ মাসে ধরলে বসতে পারে, ৫ মাসে কোলে বা চেয়ারে বসে জিনিস ধরতে পারে, ৬ মাসে জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারে ও তা দোলাতে পারে, ৭ মাসে একা একা বসতে পারে, ৮ মাসে সাহায্য বা অবলম্বন পেলে দাঁড়াতে পারে, ৯ মাসে কোন কিছু ধরে দাঁড়াতে পারে, ১০ মাসে হামাগুড়ি দিতে পারে, ১১ মাসে হাত ধরে হাঁটি হাঁটি পা পা করতে পারে, ১২ মাসে চেয়ার ইত্যাদি ধরে দাঁড়িয়ে সেগুলি টানতে বা ঠেলতে পারে, ১৩ মাসে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারে, ১৪ মাসে একা একা দাঁড়াতে পারে এবং ১৫ মাসে একা একা হাঁটতে পারে। তারপর ধীরে ধীরে সে লাফাতে, দৌড়াতে, উঠতে, নামতে প্রভৃতি নানা প্রকার কাজ করবার ক্ষমতা অর্জন করে।)

শিশুর প্রথম দিকের আচরণ বিশেষধর্মী নয়—সামগ্রিক। সেই জন্য তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন প্রথম দিকে কোন জিনিস লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য উদ্দীষ্ট হয় না। ধীরে ধীরে তার অনিয়ন্ত্রিত, অসংযত ও অসংহত আচরণগুলি নিয়ন্ত্রিত, সংযত ও সুসংহত হয়ে উঠে। (বয়স যত বাড়ে শিশু তত বিভিন্ন জাতীয় পেশীমূলক সঞ্চালনের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করে। চোখ এবং হাত, কান এবং চোখ ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয় সাধন হয় জন্মের বেশ পরে। শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা এসে পড়ে। শিশুর খেলা প্রথমে হাত-পা

নাড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সে হাত ঘোরাতে শেখে—পা নাচাতে বা দোলাতে শেখে। ক্রমশঃ দৌড়ান, লাফান, টানা, ঠেলা ইত্যাদি এবং আরও পরে জটিলতর খেলায় শিশু অংশ গ্রহণ করতে শিখে।) তবে শারীরিক বিকাশের প্রথম দিকে শিশুর খেলার মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গমূলক সঞ্চালনের যত বিধিবদ্ধতা ও বৈচিত্র্য দেখা যায়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি অনেক কমে যায়। অর্থাৎ খেলাধুলা তখন নির্দিষ্ট একটি পদ্ধতি ধরে চলতে থাকে। পার্থক্য বা বৈচিত্র্য বর্জন করে খেলাটিতে শিশু গুণগত উৎকর্ষ অর্জনের জন্য সচেষ্ট হয়। তেমনি প্রথম দিকে শিশুর খেলার মধ্যে যূথবদ্ধতা কম থাকে, কিন্তু যৌবনাগমে খেলার মধ্যে যূথবদ্ধতা এবং সংগঠনমূলক প্রভাব বেশী করে পরিলক্ষিত হয়।

(শিশুর বয়স যত বাড়তে থাকে, তার সাধারণধর্মী আচরণগুলি ততই বিশেষায়িত হতে থাকে এবং বিশেষ আচরণগুলি ক্রমশঃ জটিলতর আচরণ রূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। অঙ্গসঞ্চালনমূলক বিকাশের দিকে কিন্তু ছেলেরা সমবয়সী মেয়েদের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের শক্তি, ক্ষিপ্রতা ও অন্যান্য সঞ্চালনমূলক কৌশল মেয়েদের চেয়ে উৎকর্ষ লাভ করে। কিন্তু তা ব'লে একথা বলা যায় না যে, জটিল সঞ্চালনমূলক সব কাজেই ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে এগিয়ে থাকে। যেখানে দৈহিক শক্তির প্রয়োজন সেখানে ছেলেরা এগিয়ে থাকে ঠিকই, কিন্তু যে সব কাজে দৈহিক শক্তির বিশেষ প্রয়োজন নেই, সে সমস্ত মেয়েরা ছেলেদের ছাড়িয়ে যায়।

(সাধারণতঃ এক-দেড় বৎসরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ডান হাতের চেয়ে বাঁ হাত ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায়। এ দেখে আমরা অনেক সময় ধারণা করি, এরা বোধ হয় 'ন্যাটা' হবে। এরা কিন্তু বড় হলে আর সকলের মত ডান হাতই ব্যবহার করে। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন—যে সমস্ত শিশু প্রথমে বাঁ হাত ব্যবহার করে, তারা বড়দের চাপে ও অন্যান্য সকলকে ডান হাত ব্যবহার করতে দেখেই ডান হাত ব্যবহার করতে শিখে। অবশ্য এর পিছনে মস্তিষ্কের 'cross-connection' ও অনেকাংশে কাজ করে। মনোবিজ্ঞানীরা আরো বলেন—এই পরিবর্তনের জন্য শিশুদের উপর খুব বেশী চাপ দেওয়া ঠিক নয়। তারা ঠিক সময়ে ডান হাত ব্যবহার করতে শিখবে।)

ছেলেমেয়েদের দৈহিক বিকাশের পার্থক্য বয়সের বিভিন্ন স্তরে বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। শৈশবে ছেলে ও মেয়ে সমান শক্তিশালী থাকে, কিন্তু যৌবনাগমে

ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী হয়ে থাকে। যৌবনাগমে উভয়ের শারীরিক পরিবর্তন অত্যন্ত আকস্মিক ও দ্রুত হয়—যার ফলে তারা পরিবেশের সঙ্গে ঠিকমত সঙ্গতি সাধন করতে পারে না। (আমাদের দেশে সাধারণতঃ ১২-১৩ বৎসরেই মেয়েদের যৌবনাগম সূচিত হয়। রজঃসৃষ্টিই তাদের যৌবন সমাগমের প্রতীক। ছেলেদের যৌবন আর একটু দেরীতে শুরু হয় এবং তাদের যৌবন সমাগমের সুনির্দিষ্ট কোন প্রতীক নেই। মেয়েদের যৌবন সমাগম সুস্পষ্টিত হয় বলে তারা ছেলেদের চেয়ে বেশী যৌন-সচেতন। যৌবন সমাগমে উভয়েরই ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধি পায়, শরীর জয়ন্ত বা পুরন্ত হয়ে লাবণ্যমণ্ডিত হয়। এ ছাড়া কতকগুলি বিশেষ দৈহিক পরিবর্তন উভয়ের ক্ষেত্রেই ঘটে। যেমন-বিশেষ কতকগুলি স্থানে রোমোদ্‌গম, মেয়েদের স্তনোদ্গম ইত্যাদি। এই সময় ছেলেদের গলার স্বর মোটা ও মেয়েদের সরু হয়, ছেলেদের বক্ষ ও স্কন্ধদেশ স্ফীত হয়। এই সমস্ত দৈহিক পরিবর্তনের জন্য তাদের আচরণের মধ্যেও একটা পরিবর্তন লক্ষিত হয়। উভয়ের মধ্যেই এই সময় যৌন-কৌতূহল অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে। উপযুক্ত যৌন শিক্ষায় এটি তৃপ্ত করতে না পারলে সমূহ বিপর্যয়ের সম্ভাবনা।)

পিতামাতা ও শিক্ষকের কর্তব্য : শিশুদের বিভিন্ন জাতীয় সঞ্চালন মূলক কাজগুলির মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক নেই। একটিতে কেউ দক্ষ হ'লে অন্য একটি সঞ্চালনমূলক কাজেও যে সমান দক্ষতা অর্জন করবে—তার কোন নিশ্চয়তা নেই। মাতা-পিতা ও শিক্ষককে শিশুর বিভিন্ন সঞ্চালনমূলক কাজের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে-এবং এই বিকাশ যাতে সহজ ও স্বাভাবিক হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সঞ্চালন ও পেশীমূলক বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন স্তরে এমন সমস্ত খেলা ও কাজ রাখা প্রয়োজন যাতে শিশুর বিভিন্ন জাতীয় সঞ্চালনের মধ্যে একটা পারস্পরিক সংযোগ সাধিত হয়। শিশুর যথাযথ দৈহিক পুষ্টির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে— তা না হলে তাদের দৈহিক কোন ত্রুটি ঘটার সম্ভাবনা। শিশুদের মধ্যে দৈহিক কোন ত্রুটি বা রোগ থাকলে প্রথম থেকেই তা সারাবার ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুদের উচ্চারণের ত্রুটিও একটি দৈহিক ত্রুটি। এটিও শৈশবে না সারালে পরে আর সারতে চায় না। তেমনি শিশুদের এমন কোন কাজ করতে দেওয়া চলবে না—যাতে তাদের দৈহিক বিকাশ বাধা-

প্রাপ্ত হয় বা অস্বাভাবিক হয়। মনে রাখতে হবে, শিশুর দৈহিক বিকাশের উপর তার মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক বিকাশ অনেকাংশেই নির্ভরশীল। এই জন্য বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক বিকাশেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হয়। দেহ সুস্থ হলে মনও সুস্থ হবে। সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক নর-নারীই সমাজের সম্পদ, অন্যেরা সমাজের পক্ষে বোঝা বিশেষ।

মানসিক বিকাশ (Mental Development) : (শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তার মন সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয় না। সে থাকে অত্যন্ত অসহায় ও পরনির্ভর। যত সে বড় হতে থাকে, ততই পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি-সাধনের প্রচেষ্টায় নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে। এই অভিজ্ঞতা অর্জন করার সময় তার আচরণের মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা যায়। এই আচরণের পরিবর্তনকে মানসিক বিকাশ বলা চলে। তবে এই বিকাশের কতকগুলি স্তর, ধর্ম, গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকে।

পৃথিবীতে যে সমস্ত প্রাণী পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধনের চেষ্টা করে, মানুষ হ'ল তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণী। অন্যান্য অনেক প্রাণী বিভিন্ন দিকে মানুষের চেয়ে উৎকর্ষ লাভ করেছে সত্য, কিন্তু মানসিক বিকাশের দিকে মানুষের সমকক্ষ কোন প্রাণী নেই। আর সেইজন্যই মানুষ হ'ল—প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তবে মানসিক বিকাশের অর্থ এই নয় যে, এটি হ'ল পরিবেশের সঙ্গে সার্থক-ভাবে সঙ্গতিসাধন করা। মানসিক বিকাশ মানুষকে সম্পূর্ণ, ত্রুটিমুক্ত ও সার্থক ভাবে গড়ে তোলে এবং তার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। এই প্রয়াসের ফলেই তার আচরণ ধারা পরিবর্তিত হয়; কখনও তাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে আচরণের পরিবর্তন ঘটাতে হয়। এই পরিবর্তনকেই আমরা মানসিক বিকাশ বলে আখ্যা দিয়ে থাকি।

নবজাত শিশু কতকগুলি সহজাত প্রবণতা নিয়ে তার জীবন-পরিক্রমা শুরু করে। হাঁচা, কাশা, চোখ বন্ধ করা ইত্যাদি কতকগুলি প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষমতাও তার থাকে। কিন্তু কেবল এইগুলিকে মূলধন করে শিশুর বেঁচে থাকা বা বেড়ে ওঠা সম্ভব নয়। শিশুকে এ জন্য নূতন আচরণ-ধারা আয়ত্ত করতে হবে। শিশু নূতন আচরণ আয়ত্ত করার ক্ষমতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে এবং এই ক্ষমতার ক্রমবিকাশই শিশুকে জটিলতর পরিস্থিতিতে সঙ্গতিসাধন করতে সাহায্য করে।)

(শিশুর মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তর লক্ষ্য করলেই তার শিক্ষণ ক্ষমতার ক্রমবিকাশের ধারাটি পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে।) নবজাত শিশুকে কতকগুলি অর্থহীন, অস্পষ্ট অভিজ্ঞতার সমষ্টি বলা যেতে পারে। কিন্তু শিশু যত বড় হতে থাকে, ততই সে বিভিন্ন জাতীয় সংবেদন তথা অভিজ্ঞতার পার্থক্য নির্ণয় করতে ও অর্থ খুঁজতে চেষ্টা করে। সংবেদনের সংব্যাখ্যাত রূপ হ'ল প্রত্যক্ষণ। তাহ'লে বলা যায় এই স্তরে শিশু প্রত্যক্ষ করতে শিখে। শিশু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে শেখে। এই ভাবে তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-ক্ষমতা প্রাপ্ত হতে থাকে। তার অভিজ্ঞতাগুলিও সুনির্দিষ্ট ও সুসংহতরূপ ধারণ করতে থাকে। তাছাড়া সে অভিজ্ঞতার পূর্বা-পর বিচার করে তাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করে। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সে বর্তমানের কার্য ও ঘটনার তাৎপর্য নির্ধারণ করতে পারে ও কার্য কারণ সম্পর্কে স্থাপন করতে পারে। (মাকে দেখলে তার আনন্দ হয়, মায়ের হাতে খাবার দেখলে বুঝতে পারে ওটা তার খিদে মেটাবার জন্য আনা হচ্ছে. খেলনা দেখলে পুলকিত হয়। প্রথম প্রথম শিশু বিভিন্ন জাতীয় রং বা শব্দের মধ্যে পার্থক্য ঠিকমত বুঝতে পারে না। প্রথমে সে খুব রং-চং আছে এমন জিনিসের প্রতিই আকৃষ্ট হয়। তেমনি উচ্চ শব্দ শুনলেই সে সচকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু ক্রমশঃ সে ভিন্ন ভিন্ন রং ও শব্দের পার্থক্য বুঝতে পারে।)

(শিশু যত বড় হতে থাকে, ততই তার পুরাতন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আচরণধারা পরিবর্তিত করতে সচেষ্ট হয়। অতীতে সুখদায়ক ছিল এমন অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি সে কামনা করে, আর দুঃখজনক অভিজ্ঞতা বা পরিস্থিতি পরিহার করতে চায়।. এইভাবে শিশু তার শিক্ষা শুরু করে। ছয় থেকে বার বৎসরের মধ্যে শিশু অতীত অভিজ্ঞতা পুনরুজ্জীবিত করতে পারে এবং তার সাহায্যে জ্ঞান অর্জন করে। এই সময় শিশুর কৌতূহলও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। তার মনে হাজার প্রশ্ন। অনেক জিনিস তার চেনা হয়ে গেছে। তাই সে —"এটা কি" এরকম প্রশ্ন খুব কম করে। তার প্রশ্ন হল—"এটা এরকম কেন? এটা কিভাবে ঘটেছে"—ইত্যাদি জাতীয়। শিক্ষক ও মাতাপিতার কর্তব্য হ'ল শিশুর এই সমস্ত প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দেওয়া। তাহলে শিশুর জ্ঞান-লাভের স্পৃহাও বৃদ্ধি পাবে। শিশু এ সময় সকলের আচরণ বেশ মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে এবং সেগুলি অনুকরণ করে। এই অনুকরণের মাধ্যমে

সে পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে সঙ্গতিসাধনের পথে আরো একধাপ অগ্রসর হয়।

শিশুর মানসিক বিকাশে আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল—তার স্মৃতিশক্তির বিকাশ ও তার ব্যবহার। সাধারণতঃ ৩।৪ বৎসরের আগে শিশু তার পূর্ব অভিজ্ঞতাকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে বর্তমান ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে না। কিন্তু একটু বড় হ'লে শিশু কিছু কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করে। অর্থাৎ পূর্ব জানা বা চেনা বিষয়কে সে আবার চিনতে পারে। তাই দেখা যায় ঘরে যেখান থেকে শিশু কোন দিন খাবার বা মিষ্টি পেয়েছিল, বার বার সেখানে হানা দিচ্ছে। যার কাছে সদয় ব্যবহার পেয়েছিল তার কাছে যাচ্ছে, যাকে দেখে ভয় পেয়েছিল—তাকে দেখে লুকিয়ে পড়ছে। মানসিক বিকাশের আর একটি লক্ষণ হ'ল—শিশুর মনোযোগ দানের ক্ষমতা বৃদ্ধি—অর্থাৎ মনঃসংযোগ। প্রথম দিকে শিশুর মন থাকে চঞ্চল ও অস্থির সে স্থির ভাবে কোন জিনিসে মনঃসংযোগ করতে পারে না। তারপর সে রঙীন ছবি, মজাদার ছড়া, চিত্তাকর্ষক গল্প ইত্যাদিতে মনোযোগ দেয়। পরে তার চিন্তনশক্তি বাড়লে সে অপেক্ষাকৃত নীরস বিষয়েও মনোযোগ দেয়। অবশ্য মনোযোগের সঙ্গে শিশুর আগ্রহটি জড়িত। শিশুর যে বিষয়ে আগ্রহ আছে সে সেই বিষয়ে সহজে মনঃসংযোগ করতে পারে, কিন্তু যেখানে আগ্রহের অভাব থাকে সেখানে মনঃসংযোগ করা খুব কঠিন হয়।

শিশুর মন যত পুষ্ট হয়, তত সে প্রতীকের (Symbol) প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে শেখে। অর্থাৎ সময় বা স্থানের দিক দিয়ে অনুপস্থিত এমন কোন ঘটনা বা বস্তুর প্রতি সে সাড়া দিতে শেখে। এই প্রতীকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা বা প্রতীক ব্যবহার করার ক্ষমতা শিশুর মানসিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। যেমন, শিশুর হয়তো খিদে পেয়েছে। সে মা'কে দেখে কান্না বন্ধ করল। এখানে মা'তো খাদ্য নয়! কিন্তু মা হলেন তাঁর নিকট খাদ্যের প্রতীক। মা এসেছেন—এবার খাদ্য আসবে—এই ভাবটি শিশুর মনে জাগে। প্রতীকের ব্যবহার শিশুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ন ও নতুন আচরণ শিক্ষার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য।

শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি উল্লেখযোগ্য স্তর হ'ল—ভাষার বিকাশ ; শিশু তার মনের বিভিন্ন ভাবকে ভাষার সাহায্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা

করে। তবে শিশুর মধ্যে ভাষার বিকাশের কয়েকটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। যেমন, অস্ফুট বর্ণ উপকরণ, রিফ্লেক্স্ স্তর, অনুকরণ ও পুনরাবৃত্তির স্তর, অর্থবোধের স্তর, ভাষা সম্বন্ধে সচেতনতার স্তর, বাক্য বলার স্তর এবং সবশেষে বাক্য গঠন ও লিখনের স্তর। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন স্তরের জন্য শিশুর বয়সকে কতকগুলি ভাগে ভাগ করেছেন। সাধারণতঃ দুই বছরে শিশু শব্দ ব্যবহার করতে পারে। তিন বছরে সে বেশ 'বলিয়ে-কইয়ে' হয়, পাঁচ-ছ' বছরে পড়তে শেখে ও সাত বছরে লিখতে শেখে। তবে একথা বলা যায়—শিশুর ভাষা শিক্ষা করার ক্ষমতা নানারকম উপাদান ও শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়, যেমন, শিশুর স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, আগ্রহ, সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ, সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রথা-পদ্ধতি ইত্যাদি।)

ভাষা বিকাশের পর আসে শিশুর মধ্যে ধারণার (Concept) বিকাশ। উন্নত ধরনের চিন্তা করতে গেলে ধারণা অপরিহার্য। ধারণা বলতে আমরা বুঝি কোন একটি বস্তুর জাতি বা শ্রেণী সম্পর্কে একটা সামগ্রিক বোধ বা জ্ঞান। 'মানুষ' বললে আমরা কোন বিশেষ মানুষের কথা চিন্তা করি না, করি সমগ্র মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি মানুষের কথা। তেমনি 'পদ্ম ফুল' বললে পৃথিবীর সব রকম পদ্ম ফুলকেই বুঝি। এই ধারণা গড়ে তুলতে হ'লে জ্ঞানের প্রয়োজন। শিশুর মধ্যে এই জ্ঞান প্রথমে থাকে অসংহত ও বিচ্ছিন্ন। পরে এগুলি সুসংহত হ'য়ে ধারণা স্পষ্ট হয়। তাছাড়া আরো পরে পৃথক্করণ (abstraction) ও সামান্যীকরণ (generalisation) পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুর মধ্যে জটিল ধারণা গঠিত হয়। ধারণাগুলির সাহায্যেই অতীত অভিজ্ঞতাগুলিকে সংক্ষেপিত করা যায়। এ সময় শিশুর মনে "কার্য-কারণ" সময় ও "স্থান" সম্বন্ধেও কতকগুলি জটিল ধারণা গঠিত হয়। শিশু ধীরে ধীরে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে, তার চিন্তা-ধা | উন্নততর হয়।

(শিশুর মানসিক বিকাশে আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল "সর্বপ্রাণবাদ" (Animism)। শিশু সব ঘটনার ব্যাখ্যা করে সর্বপ্রাণবাদমূলক (animistic) ধারণার দ্বারা। শিশুমন শৈশবে সমস্ত বস্তুকে প্রাণবান বা জীবন্ত মনে করে। বইটা পড়ে গেল, বলটা গড়াচ্ছে, ঘুড়ি উড়ছে, মেঘ ভেসে যাচ্ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—এ সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা দেবার সময় শিশুমন ঐ গুলির মধ্যে

প্রাণের অস্তিত্ব আরোপ করে। পরে শিশু এই সর্বপ্রাণবাদমূলক ধারণা বর্জন করে প্রাকৃতিক ঘটনার সাহায্যে সমস্ত ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে শেখে। Dentsche'র একটি পরীক্ষণ থেকে জানা গেছে—সাধারণতঃ ৪।৫ বছর বয়স থেকেই শিশু সমস্ত বস্তুকে প্রাণবান মনে করে না। কিন্তু শিশু যে সমস্ত ঘটনা পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারে কেবলমাত্র সেগুলিরই তর্কবিজ্ঞানভিত্তিক ও বিজ্ঞান-ব্যাখ্যা দিতে পারে।

চিন্তাকে বলা যায় 'অশ্রুত বাণী' (Sub-vocal talking)। শিশুমনের বিকাশে চিন্তন ও কল্পন বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। চিন্তন এক প্রকার প্রতীকমূলক আচরণ। শিশু প্রথমদিকে তার সামনে যে সমস্ত বস্তু আছে—সেগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করে। যেমন, মেয়েরা যখন শৈশবে পুতুল নিয়ে খেলা করে—তখন খেলার ধারাটি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং সেটি বেশ জোরে জোরেই বলতে থাকে। পুতুল খাচ্ছে, পুতুল অফিস যাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে, ইত্যাদি। পরে বড় হ'লে শিশু অনুপস্থিত বস্তু সম্বন্ধেও প্রতীকমূলক চিন্তা করতে পারে। শিশু শৈশব থেকেই চিন্তা করে। কিন্তু তার চিন্তা প্রধানতঃ প্রতিরূপের (Image) উপর নির্ভরশীল। প্রতিরূপ হ'ল এক ধরনের প্রতীক—মূর্ত বস্তুর মানসিক ছবি। প্রথম দিকে শিশু এই সমস্ত মানসিক ছবির সাহায্যে চিন্তা করে। প্রতিরূপের সাহায্যে চিন্তা করাকে 'কল্পনা' বলে। শিশুর প্রথম দিকের চিন্তা হ'ল প্রতিরূপমূলক এবং কল্পনাশ্রয়ী। কিন্তু পরে শিশু মূর্ত বস্তু ছাড়াও অমূর্ত বস্তু নিয়ে চিন্তা করতে শেখে। শৈশবে শিশুর মনোরাজ্য জুড়ে থাকে দিবাস্বপ্ন ও অলীক কল্পনা (Make believe)। শিশু গল্পে শোনা ভূত, পেত্নী, দৈত্য-দানব একটা কাল্পনিক চেহারা মনে মনে খাড়া করে নেয়। তাছাড়া কোন জিনিস সম্বন্ধে চিন্তা করতে হ'লে সে একটা মানস-চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। এইখানেই শিশুদের মানসিক বিকাশের সঙ্গে বড়দের পার্থক্য চোখে পড়ে। শিশু ব্যবহার করে বস্তু প্রতিরূপ কিন্তু বড়রা করে শব্দ-প্রতিরূপ। শিশু জ্ঞানের একটা বড় অংশ সংগ্রহ করে সংবেদনের মাধ্যমে। কাজেই তার চিন্তন কোন বস্তুর মানসিক ছবির সাহায্যেই সংঘটিত হয়। দিবা-স্বপ্ন কিন্তু কেবল শৈশবের বৈশিষ্ট্যই নয়—এটি প্রাপ্তযৌবন স্তরেও থেকে যায়। আবার অনেকে সারাজীবন দিবাস্বপ্নকে জড়িয়ে রাখে। দিবা-স্বপ্ন ও অলীক কল্পনার সাহায্যে শিশু তার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও অপরিতৃপ্ত

কামনা চরিতার্থ করে। কাজেই গুলি শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক দিকগুলির মধ্যে সমতা ও সমন্বয় আনে এবং শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যটি বজায় রাখার চেষ্টা করে। তবে কল্পনায় অনেক জিনিসকে শিশু অনেক সময় বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করে। আবার একথাও ঠিক—খুব বেশী মাত্রায় দিবাস্বপ্ন ও অলীক কল্পনা শিশুকে বাস্তব জগৎ থেকে পলায়ন করতে সাহায্য করে যেমন, অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব সমস্যার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতও করে দেয় তেমন।

শিশু প্রথম অবস্থাতে কল্পনা ও সত্য, বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্যে কোন সীমারেখা টানতে পারে না। শিশুর মধ্যে যুক্তিতর্ক করার, বিচার করার বা সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা দেখা যায় তখনই—যখন তার সাধারণ চিন্তনের ক্ষমতা যথেষ্ট উৎকর্ষ অর্জন করে। এর কোন সুনির্দিষ্ট বয়স না থাকলেও বলা চলে সাধারণতঃ ৭-৮ বছরের আগে শিশু এ ক্ষমতাটি অর্জন করতে পারে না।

আবার শিশুর সবরকম মানসিক প্রক্রিয়ার পশ্চাতে যে সাধারণধর্মী শক্তিটি কাজ করে—তা হ'ল বুদ্ধি। চিন্তন, ধারণা গঠন, যুক্তিতর্ক করা, বিচারকরণ, সমস্যার সমাধান, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ন, সম্পর্ক স্থাপন, সহ-সম্বন্ধ নির্ণয় করা—এসব কিছুর জন্য প্রয়োজন বুদ্ধির। শিশুর মানসিক বিকাশ বুদ্ধিকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও বিকশিত হতে থাকে। তবে ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে জানা গেছে—১৬ বছরের মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ পূর্ণতা লাভ করে। অবশ্য সব শিশুর মধ্যে যে বুদ্ধির বিকাশ একইভাবে ঘটবে—তা নয়। বুদ্ধির দিক দিয়েই বিভিন্ন শিশুর মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য দেখা যায়।

শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি অংশ হ'ল—সামাজিক সচেতনতা। এসম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হ'ল।

তাহ'লে শিশুর মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলি আমরা এইভাবে বিন্যস্ত করতে পারি—সংবেদন বা অনিচ্ছাকৃত প্রত্যক্ষ জ্ঞান, প্রত্যক্ষণ বা ইচ্ছাকৃত প্রত্যক্ষ জ্ঞান, মনোযোগ ও আগ্রহ, স্মৃতির ব্যবহার, কল্পনা, চিন্তন, যুক্তি ও বিচার করণ, সিদ্ধান্ত গঠন, বিশ্বাস, নৈতিক বোধ।

শিক্ষক ও মাতাপিতাকে লক্ষ্য রাখতে হবে—শিশুর পরিবেশটি এমনভাবে গড়ে তুলতে যাতে তার মানসিক বিকাশ সহজ ও স্বাভাবিক পথ ধরে অনায়াসে এগিয়ে চলতে পারে। মানসিক বিকাশের পরিপন্থী বা প্রতিকূল এমন সব ঘটনা বা শক্তিকে পরিবেশ থেকে সযত্নে বাদ দিতে হবে। শিশুর বুদ্ধির বিকাশেও পরিবেশের যথেষ্ট প্রভাব আছে। এ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী Thorndike-এর বক্তব্য হ'ল—বিদ্যালয়ের সুস্থ পরিবেশ শিশুর বুদ্ধির বিকাশে যথেষ্ট সহায়ক। পরিশেষে আর একটি কথা: শিশুর শিক্ষা দিতে হবে তার মানসিক বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে; অন্যথায় শিক্ষা সার্থক তো হ'বে না—সময় ও শ্রমেরও যথেষ্ট অপচয় হবে।

প্রাক্ষোভিক বিকাশ (Emotional Development) : শিশুর ব্যক্তি-সত্তার বিকাশে তার বুদ্ধি বা অন্যান্য মানসিক শক্তি যেমন প্রয়োজনীয়, প্রক্ষোভগুলিও ঠিক তেমনি। প্রকৃতপক্ষে মানসিক শক্তির ও প্রক্ষোভের যথাযথ বিকাশের অর্থই হ'ল ব্যক্তি-সত্তার বিকাশ।। শিশুর শিক্ষায় প্রয়োজনগুলির স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর চিন্তাশক্তি যখন পরিণত হয় না; তখন এই সমস্ত প্রক্ষোভের মাধ্যমেই তার মানসিক জীবনের ছবিটি ফুটে ওঠে। প্রক্ষোভকে বাদ দিয়ে শিশুর শিক্ষার কথা চিন্তা করাই যায় না।

প্রক্ষোভের ইংরাজী Emotion কথাটি এসেছে ল্যাটিন Emovere থেকে যার অর্থই হ'ল প্রক্ষুব্ধ বা উত্তেজিত হওয়া। প্রক্ষোভ বলতে মনের এমন একটি অবস্থার কথা বোঝায় যা ব্যক্তিকে উত্তেজিত ক'রে তার মনের স্বাভাবিক সাম্যাবস্থাটি নষ্ট করে দেয়। প্রক্ষোভ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পুনরাবৃত্তির ভয়ে এ বিষয়ে আর করা হ'ল না।

সামাজিক বিকাশ (Social Development) : মানবজীবন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সামাজিকতা—এই দুটি গুণের এক অপূর্ব মিশ্রণ। এই দুটি উপাদান একে অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে মিথস্ক্রিয়ার ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে। এই দুটি গুণের সমাবেশের জন্যই মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে চিহ্নিত হতে পারার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। ব্যক্তি ছাড়া যেমন সমাজ গড়ে উঠতে পারে না—তেমনি সমাজ ছাড়া ব্যক্তিও পরিপূর্ণ হতে পারে না। ব্যক্তি তার প্রাণরস সংগ্রহ করে সমাজ জীবন থেকেই। তাহ'লে সামাজিক

কামনা চরিতার্থ করে। কাজেই গুলি শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক দিকগুলির মধ্যে সমতা ও সমন্বয় আনে এবং শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যটি বজায় রাখার চেষ্টা করে। তবে কল্পনার অনেক জিনিসকে শিশু অনেক সময় বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করে। আবার একথাও ঠিক—খুব বেশী মাত্রায় দিবাস্বপ্ন ও অলীক কল্পনা শিশুকে বাস্তব জগৎ থেকে পলায়ন করতে সাহায্য করে যেমন, অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব সমস্যার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতও করে দেয় তেমন।

শিশু প্রথম অবস্থাতে কল্পনা ও সত্য, বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্যে কোন সীমারেখা টানতে পারে না। শিশুর মধ্যে যুক্তিতর্ক করার, বিচার করার বা সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা দেখা যায় তখনই—যখন তার সাধারণ চিন্তনের ক্ষমতা যথেষ্ট উৎকর্ষ অর্জন করে। এর কোন সুনির্দিষ্ট বয়স না থাকলেও বলা চলে সাধারণতঃ ৭-৮ বছরের আগে শিশু এ ক্ষমতাটি অর্জন করতে পারে না।

আবার শিশুর সবরকম মানসিক প্রক্রিয়ার পশ্চাতে যে সাধারণধর্মী শক্তিটি কাজ করে—তা হ'ল বুদ্ধি। চিন্তন, ধারণা গঠন, যুক্তিতর্ক করা, বিচারকরণ, সমস্যার সমাধান, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ন, সম্পর্ক স্থাপন, সহ-সম্বন্ধ নির্ণয় করা—এসব কিছুর জন্য প্রয়োজন বুদ্ধির। শিশুর মানসিক বিকাশ বুদ্ধিকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও বিকশিত হতে থাকে। তবে ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে জানা গেছে—১৬ বছরের মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ পূর্ণতা লাভ করে। অবশ্য সব শিশুর মধ্যে যে বুদ্ধির বিকাশ একইভাবে ঘটবে—তা নয়। বুদ্ধির দিক দিয়েই বিভিন্ন শিশুর মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য দেখা যায়।

শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি অংশ হ'ল—সামাজিক সচেতনতা। এসম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হ'ল।

তাহ'লে শিশুর মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলি আমরা এইভাবে বিন্যস্ত করতে পারি—সংবেদন বা অনিচ্ছাকৃত প্রত্যক্ষ জ্ঞান, প্রত্যক্ষণ বা ইচ্ছাকৃত প্রত্যক্ষ জ্ঞান, মনোযোগ ও আগ্রহ, স্মৃতির ব্যবহার, কল্পনা, চিন্তন, যুক্তি ও বিচার করণ, সিদ্ধান্ত গঠন, ও বিশ্বাস, নৈতিক বোধ।

শিক্ষক ও মাতাপিতাকে লক্ষ্য রাখতে হবে—শিশুর পরিবেশটি এমনভাবে গড়ে তুলতে যাতে তার মানসিক বিকাশ সহজ ও স্বাভাবিক পথ ধরে অনায়াসে এগিয়ে চলতে পারে। মানসিক বিকাশের পরিপন্থী বা প্রতিকূল এমন সব ঘটনা বা শক্তিকে পরিবেশ থেকে সযত্নে বাদ দিতে হবে। শিশুর বুদ্ধির বিকাশেও পরিবেশের যথেষ্ট প্রভাব আছে। এ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী Thorndike-এর বক্তব্য হ'ল—বিদ্যালয়ের সুস্থ পরিবেশ শিশুর বুদ্ধির বিকাশে যথেষ্ট সহায়ক। পরিশেষে আর একটি কথা: শিশুর শিক্ষা দিতে হবে তার মানসিক বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে; অন্যথায় শিক্ষা সার্থক তো হ'বে না—সময় ও শ্রমেরও যথেষ্ট অপচয় হবে।

প্রাক্ষোভিক বিকাশ (Emotional Development): শিশুর ব্যক্তি-সত্তার বিকাশে তার বুদ্ধি বা অন্যান্য মানসিক শক্তি যেমন প্রয়োজনীয়, প্রক্ষোভগুলিও ঠিক তেমনি। প্রকৃতপক্ষে মানসিক শক্তির ও প্রক্ষোভের যথাযথ বিকাশের অর্থই হ'ল ব্যক্তি-সত্তার বিকাশ।। শিশুর শিক্ষায় প্রয়োজনগুলির স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর চিন্তাশক্তি যখন পরিণত হয় না; তখন এই সমস্ত প্রক্ষোভের মাধ্যমেই তার মানসিক জীবনের ছবিটি ফুটে ওঠে। প্রক্ষোভকে বাদ দিয়ে শিশুর শিক্ষার কথা চিন্তা করাই যায় না।

প্রক্ষোভের ইংরাজী Emotion কথাটি এসেছে ল্যাটিন Emovere থেকে যার অর্থই হ'ল প্রক্ষুব্ধ বা উত্তেজিত হওয়া। প্রক্ষোভ বলতে মনের এমন একটি অবস্থার কথা বোঝায় যা ব্যক্তিকে উত্তেজিত ক'রে তার মনের স্বাভাবিক সাম্যাবস্থাটি নষ্ট করে দেয়। প্রক্ষোভ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পুনরাবৃত্তির ভয়ে এ বিষয়ে আর করা হ'ল না।

সামাজিক বিকাশ (Social Development): মানবজীবন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সামাজিকতা—এই দুটি গুণের এক অপূর্ব মিশ্রণ। এই দুটি উপাদান একে অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে মিথস্ক্রিয়ার ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে। এই দুটি গুণের সমাবেশের জন্যই মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে চিহ্নিত হতে পারার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। ব্যক্তি ছাড়া যেমন সমাজ গড়ে উঠতে পারে না—তেমনি সমাজ ছাড়া ব্যক্তিও পরিপূর্ণ হতে পারে না। ব্যক্তি তার প্রাণরস সংগ্রহ করে সমাজ জীবন থেকেই। তাহ'লে সামাজিক

বিকাশ আমরা কাকে বলব? সমাজের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা সম্পর্ক আছে। সামাজিক বিকাশ বলতে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তি, বিভিন্ন জাতীয় দল, প্রতিষ্ঠান, সংঘ বা সংগঠনের সঙ্গে শিশুর সম্পর্কের ক্রমবিকাশকেই বুঝিয়ে থাকে। মানুষ যে সমস্ত সহজাত ক্ষমতা বা প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে—সমাজের মধ্যেই সেগুলি পরিণতি লাভ করে। সামাজিক বিকাশ বলতে অনেকে ব্যক্তির এই সমস্ত সহজাত ক্ষমতা, আগ্রহ, প্রবণতা, অভ্যাস ইত্যাদির পরিনমনকেও বুঝিয়ে থাকেন। সমাজের কোন সদস্য যদি তার নিজ ক্ষমতানুযায়ী অগ্রসর না হয়, বা সেইমত কাজ না করে, তাহলে তাকে আমরা সামাজিক দিক থেকে অনুন্নত বা কম উন্নত বলতে পারি। সামাজিক দৃষ্টি কোণ থেকে বিচার করলে বলা যায়—মানুষ একটি সহযোগী প্রাণী। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে পারস্পরিক সম্বন্ধের ও সম্পর্কের মাধ্যমে শিক্ষামূলক, কৃষ্টিমূলক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিশু সম্পর্কযুক্ত হয়। এর ফলে শিশু একটা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের আওতার মধ্যে পড়ে যায়। তারই ফলস্বরূপ শিশুর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, দল বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সার্থকভাবে সঙ্গতিসাধন করতে কোন কষ্ট বা অসুবিধা হয় না। এটিকেই বলা হয় শিশুর সামাজিকীকরণ বা সমাজের একজন সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে বাস করার যোগ্যতা অর্জন।

শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার মধ্যে সামাজিক সচেতনতা বা সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত হয় না। কিন্তু সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি তার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে। উপযুক্ত পরিবেশে ঐ সুপ্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বিকশিত হয়। শিশু যত বড় হতে থাকে, তত তার চারপাশে বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে সে আসে। সে নানাপ্রকার দলের সঙ্গে মেলামেশা করে, বিভিন্ন সংঘ, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সঙ্গে সে সংযুক্ত হয়। এইভাবে শিশুর সামাজিক সচেতনতার বোধটি জাগ্রত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে অভিযোজন করতে সমর্থ হয়। যে সমস্ত মনোবিজ্ঞানী সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে মানব আচরণের ব্যাখ্যা করেন, তাঁরা যৌথ প্রবৃত্তি বা সামাজিক প্রবৃত্তি নামে একটি সহজাত প্রবৃত্তির কথা বলে থাকেন এবং বলেন—শিশুর সামাজিকীকরণের মূলে আছে এই প্রবৃত্তিটির প্রভাব। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এ কথা স্বীকার করেন না। অবশ্য তাঁরা একথা স্বীকার

করেন যে শিশুর মধ্যে সামাজিক জীবনযাপন করার একটা সহজাত প্রবণতা থাকে। এই প্রবণতাই ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে শিশুকে সামাজিক আচরণের উপযোগী করে তোলে। তাঁরা সামাজিক আচরণের উপযোগী কতকগুলি গুণ বা প্রলক্ষণের (Traits) কথা বলেছেন—যেমন, সহযোগিতা, সহানুভূতি, দয়া, সঙ্ঘবদ্ধতা ইত্যাদি যেগুলি শিশুর মানসিক সংগঠনের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশে আত্মপ্রকাশ করে।

শিশুর সামাজিকীকরণে তার সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও এ ব্যাপারে পরিবেশের প্রভাবটিই অধিকতর কার্যকরী। সামাজিক পরিবেশ বলতে সমাজের রীতি-নীতি, ভাব-ধারা, আদর্শ, আচরণ-ধারা ও অন্যান্য সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বোঝায়। যে শিশু সুষ্ঠু ও সুস্থ সামাজিক পরিবেশে বেড়ে ওঠে, তাদের মধ্যে সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ তত ভাল হয়। বংশধারা ও পরিবেশ সম্বন্ধে আলোচনার সময় আমরা দেখেছি এ্যাভেরণের বন্য বালক বা নেকড়ে শিশু রামু বা কমলা সামাজিক পরিবেশে মানুষ না হওয়ার জন্যই সামাজিক রীতি-নীতি আয়ত্ত করতে পারে নি। কাজেই আমরা একথা বলতে পারি—শিশুর সামাজিকীকরণও এক ধরনের শিখন। সে কতকগুলি সামাজিক অভ্যাস আয়ত্ত করার চেষ্টা করে।

শিশু জন্মের সময় থাকে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর। আহ্ল (Uhl) বলেন—শিশুর জীবন শুরু হয় অহং ভাব (Egoism) নিয়ে। শিশু ভাবে পৃথিবীটা তারই, সে সব কিছুই পেতে চায় একান্ত নিজের করে। কিন্তু শীঘ্রই তার এই মনোভাবটি পরিবর্তিত হয়ে যায়। শিশু প্রথম দিকে তার এবং সমাজের মধ্যে যে ব্যবধানের একটি দেওয়াল গড়ে তোলে, সেটি সে নিজেই ভেঙে ফেলে এবং ধীরে ধীরে সে সমাজ অঙ্গনে প্রবেশ করে। তখন শিশু আর সমাজের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। সামাজিকীকরণের ফলে শিশুর আত্মকেন্দ্রিকতাটি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে। সে সমাজচেতন, সঙ্গপ্রিয় ও পারস্পরিক আদান-প্রদানে অভ্যস্ত একজন সামাজিক জীব হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়।

শিশুর মানসিক বিকাশের প্রথম ধাপটি হ'ল—স্বাতন্ত্রীভবন। এই স্তরে শিশুর অহংসত্তাটি সৃষ্ট হয়। সে নিজেকে চিনতে শেখে এবং নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করে বার বার "আমি" এই কথাটি জোর দিয়ে বলে। সে তখনও অন্যের

অস্তিত্ব স্বীকার করতে শেখে না। "আমি", "আমার", "আমাকে" এই বোধগুলিই তার মধ্যে তীব্র থাকে। এর পর ধীরে ধীরে আসে সামাজিকী করণের স্তরটি। তখন শিশু "তুমি", "তোমার", "তোমাকে"—এই কথাগুলির ব্যবহার ও অর্থগুলি উপলব্ধি করে। সে ভাবে—"আমার জিনিস আমারই, তোমার জিনিস তোমার।" আরো পরে যখন সে আরো বেশী মেলামেশা করে তখন সে ভাবতে শেখে—"আমার জিনিস তোমারও"। এই স্তরে শিশুর মধ্যে সত্যিকারের সামাজিক বোধ জাগ্রত হয়। সামাজিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ব্যক্তি স্বাতন্ত্রীকরণের পদ্ধতিটিও চলতে থাকে। শিশু যেমন একদিকে সামাজিক চেতনা অর্জন করে, তেমনি তার ব্যক্তিত্বটিও গড়ে উঠতে থাকে সামাজিক বোধটি যদি অপরিণত থাকে, তবে শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশটিও পরিণত হতে পারে না।

শিশু ঠিক কোন বয়স থেকে সামাজিক আচরণ শুরু করে—তা সঠিক ভাবে বলা যায় না। জন্মের পর প্রথম কয়েকটি মাস শিশু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। অপরের প্রতি সে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না। কিন্তু প্রায় ৫।৬ মাস বয়স থেকেই শিশু বিভিন্ন ভাবে সামাজিকতার পরিচয় দিতে থাকে। শিশু হাসে, শব্দ ও ভঙ্গীর অনুকরণ করতে শেখে, বিভিন্ন প্রকার অঙ্গভঙ্গী করে অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। প্রথম প্রথম শিশুর আচরণ বয়স্কদের প্রতি উদ্দীষ্ট হলেও পরে তার মনোযোগ ছোটদের প্রতিও ধাবিত হয়। দেখা গেছে প্রায় এক বছর বয়স থেকেই শিশু অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে মেলামেশা করার প্রবণতা দেখায়। কিন্তু ২ বা ২½ বৎসর পর্যন্ত শিশু বেশ আত্মকেন্দ্রিক থাকে। তবে এই বয়সের পর থেকেই শিশুর মধ্যে যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা ও মেলামেশা করে খেলাধুলা করার লক্ষণগুলি দেখা যায়। তবে ৪।৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশু যথেষ্ট অন্তর্মুখী, আত্মকেন্দ্রিক ও নির্জনতাপ্রায় থাকে।

শিশুর সামাজিক আচরণগুলি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয় সে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পর। এই সময় শিশুরা নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট দল গড়ে এবং একই দলের সদস্য হয়ে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শেখে। শিশু যত বড় হতে থাকে, ততই এই পারস্পরিক সম্পর্কটি দৃঢ়তর হয় সে আরো বড় দল বা সংঘ বা প্রতিষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে শেখে। এই সময় শিশুর

মধ্যে নেতৃত্ব করার ক্ষমতা বা প্রবণতা থাকলে সেটি প্রকাশিত হয়। শিশুর সামাজিক সচেতনার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধটিও বিকশিত হতে থাকে। সে দলের মধ্যে নিজের স্থান ও ক্ষমতাটি উপলব্ধি করতে শেখে। বহুর মধ্যে একের বোধটি জাগ্রত হয়। শিশু নিজের পছন্দ অনুযায়ী দল নির্বাচন করে, সঙ্গী নির্বাচন করে বা খেলাধুলা করে। সচরাচর ৮।১০ বৎসর বয়সে শিশুর সামাজিক বিকাশের যথেষ্ট অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। শিশু চায় সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করতে, বৃহত্তর দল গঠন করতে। গোষ্ঠী বা দল সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা তার মনে গড়ে ওঠে এবং দলপ্রীতি বা দলবিশ্বস্ততা শিশুমনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা যায়। শিশু নিজের দলকেই সর্বশ্রেষ্ঠ দল বলে মনে করে এবং দলের সুনাম ও গৌরব অর্জনের জন্য অপর দলের সঙ্গে শিশু প্রতিযোগিতায় নামে। শিশুর নিজের সম্বন্ধে তীব্র অনুরাগ ও ভালোবাসা দলের প্রতি সঞ্চারিত হয়ে যায়। এই সময়ই শিশু খেলাধুলা, প্রদর্শনী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রমোদানুষ্ঠান, দলগত ভ্রমণ, বনভোজন ইত্যাদি সঙ্ঘবদ্ধ কাজে যোগদান করতে আগ্রহী হয়। এরই জন্য শিশুর মধ্যে কতকগুলি সামাজিক গুণ বিকশিত হয়—যেমন দলপ্রীতি, দলবিশ্বস্ততা, সহযোগিতা, সহানুভূতি, আত্মত্যাগ, দয়া, মমতা, সম্প্রীতি, আনুগত্য ইত্যাদি।

শিশুর যৌনসচেতনতাও শিশুর সামাজিক বিকাশকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। সাধারণতঃ ৯।১০ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে এবং মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গেই খেলাধুলা ও মেলামেশা করতে ভালবাসে। কিন্তু যৌবনাগমের শুরুতেই তাদের এই মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে যায়। তখন তারা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে এবং বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে মেলামেশা বা খেলাধুলা করতে চায়। কিন্তু সামাজিক অনুশাসন ও বাধানিষেধের জন্য তারা এরকম সুযোগ পায় না বা খুব কম পায়।

শিশুর সামাজিক আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে আরো একটি বস্তু। তা হ'ল—তার চারপাশে বয়স্কদের সামাজিক আচরণ ও শিশুর সমাজ অনুমোদিত মান সম্বন্ধে সচেতনতা। শিশু প্রথমে নিজের দল বা অন্তর্গোষ্ঠীর সঙ্গে থাকে; কিন্তু পরে সে অন্য দল বা বহির্গোষ্ঠীর সঙ্গেও মেলামেশা করতে

থাকে। যে গোষ্ঠীর সঙ্গে শিশুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে—তাকে বলে প্রাথমিক গোষ্ঠী। পরিবার হ'ল এরকম একটি প্রাথমিক গোষ্ঠী। শিশু যেমনটি দেখে—তেমনটি শেখে। কাজেই তার চারপাশে বড়রা যেমন আচরণ করবে—শিশুও তেমনি শেখে। সামাজিকতার গুণ অনেকাংশে সহজাত হ'লেও এর বেশীর ভাগই অর্জিত।

শিশুর সামাজিক বিকাশে যে সমস্ত **ভিন্নধর্মী** শক্তি সম্মিলিতরূপে কাজ করে—এবার সেগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্। আগেই বলা হয়েছে এ শক্তিগুলির কিছু হ'ল সহজাত আর কিছু অর্জিত। এগুলির মধ্যে প্রথমে উল্লেখ ক'তে হয় **পরিণমনের** কথা। পরিণমনের ফলে শিশু দৈহিক ও মানসিক দিকে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। এর জন্যই শিশু বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন সামাজিক আচরণ করতে অভ্যস্ত হয়। এর পর আসে বুদ্ধি। বুদ্ধির উপর সামাজিকতা যথেষ্ট নির্ভরশীল। উন্নততর বুদ্ধি শিশুকে সহজে সামাজিক আচরণে অভ্যস্ত হতে সাহায্য করে। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েরাও সহজে সামাজিক আচরণে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু নিম্নবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুরা এ ব্যাপারে বেশ অসুবিধা বোধ করে। এর পর উল্লেখ করতে হয় শিশুর **মেজাজ-মর্জি, প্রবণতা, ক্ষোভ** ইত্যাদির। এগুলির উপরও সামাজিক বিকাশ নির্ভরশীল। **সামাজিক পরিবেশের প্রভাবও** সামাজিকীকরণের জন্য যথেষ্ট দায়ী। শিশু যে রকম পরিবেশে লালিত পালিত হয়, সেই পরিবেশ অনুযায়ী তার সামাজিক আচরণটি গড়ে ওঠে। সামাজিক পরিবেশ বলতে সমাজের রীতিনীতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, ভাবধারা, পূজা-পার্বণ, অনুষ্ঠান ইত্যাদিকে বুঝিয়ে থাকে। এরপর বলতে হয় **শিখনের** কথা। শিশু সামাজিক আচরণ কতখানি শিখতে পারল তার উপর তার সামাজিক বিকাশটি নির্ভর করছে। পক্ষান্তরে শিখন আবার নির্ভর করে শিশুর সামাজিক পরিবেশ, পরিণমন ইত্যাদির উপর। পরিবারের **সামাজিক—অর্থ নৈতিক অবস্থাও** সামাজিক আচরণের বিকাশেকে প্রভাবিত করে। উচ্চ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাভাবিক আচরণে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এর জন্যই সমাজে আমরা "সামাজিক দূরত্ব" (Social difference) ও "সামাজিক পিছিয়ে পড়া" (Social lag)-র অস্তিত্ব দেখতে পাই। দু'জাতীয় ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গুণের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। উচ্চতাবোধ ও নিম্নতাবোধের জন্য দায়ী এই সামাজিক

অর্থনৈতিক অবস্থাটিই। উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের বাড়ীর পরিবেশও একরকম হয় না। উচ্চ বিত্তসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের সামাজিক আচরণে উন্নাসিকতা, অহংকার, আত্মম্ভরিতা, ঔদ্ধত্য, অমিতব্যয়িতা ও আত্মসুখীতার একটা ভাব সচরাচর লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু নিম্নমধ্যবিত্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাবলম্বিতা, শ্রমশীলতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, বিনয়, উদারতা, অধ্যবসায়, মিতব্যয়িতা ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়।

এ ছাড়া কতকগুলি বিশেষধর্মী সামাজিক সংলক্ষণ (Social traits) আছে যেগুলি সামাজিকতাবোধের ভিত্তিস্বরূপ। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল **সহানুভূতি বা সমানুভূতি, বন্ধুত্ব, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, আক্রমণ ধর্মিতা ও প্রতিরোধ ইত্যাদি।** এগুলির প্রত্যেকটি শিশুকে সমাজিকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

শিশু যাতে ঠিকভাবে সামাজিকতার পথে এগিয়ে চলে, তার জন্য শিক্ষক ও পিতামাতাকে যথেষ্ট চেষ্টা করতে হবে। শিশুর সামাজিক পরিবেশটি ঠিকভাবে গড়ে তুলতে হবে। সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে শিশু যেন সহযোগিতা, সহানুভূতি ইত্যাদি গুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বয়স্কদের আচরণধারাও সামাজিক ও সংযত করতে হবে। মোট কথা সামাজিক পরিবেশে ও সামাজিক গুণের পরিমণ্ডলেই শিশু যথার্থ সামাজিক হয়ে বেড়ে উঠতে পারবে।

জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর (Stages of Development) : শিক্ষাক্ষেত্রে "বিকাশ" কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে এটিকে দৈহিক ও মানসিক উন্নতির সমার্থক মনে করেন। কিন্তু বিকাশ তার চেয়ে ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। বিকাশ বলতে এগুলির আত্মপ্রকাশ ও বিকাশকে তো বোঝায়ই, এই সব গুণগুলির একটা সুষ্ঠু সমন্বয়—যার ফলে ব্যক্তি তার জীবনকে সফল ও সার্থক করে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে, সেটিকেও বোঝায়। এই বিকাশ জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত বিস্তৃত।

জন্মের সময় শিশু কতকগুলি সহজাত বা প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। এগুলি সম্ভাবনার আকারে সুপ্ত থাকে। এগুলিই শিশুকে পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সঙ্গতি সাধন করতে ও নিত্য নব আচরণ করতে সাহায্য করে। এই সম্ভাবনাগুলি নবজাতকের মধ্যে অত্যন্ত অপরিণত অবস্থায় থাকে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দৈহিক ও মানসিক সম্ভাবনাগুলি ধীরে ধীরে

বিকশিত হতে থাকে স্বাভাবিক ভাবে আপন গতিতে। ঠিক যেমন ফুলের কুঁড়ি বিকশিত হতে হতে একদিন ফুলটি ফোটে, তার আপন পথে, আপন গতিতে। নবজাতকের মধ্যে সম্ভাবনায় যে বীজটি অঙ্কুর অবস্থায় থাকে, প্রাপ্তবয়স্কদের মত তা রূপ নেয় বিরাট মহীরুহেয়। অঙ্কুরের মধ্যেই থাকে, অরণ্যের বিশাল চেতনা। কিন্তু এই যে ক্রমবিকাশ, এতে ব্যক্তির কোন প্রভাব নেই। এর মূলে রয়েছে প্রকৃতি (Nature)। প্রকৃতি যেন অদৃশ্য হস্তে জীবন-নাট্যের বিভিন্ন অঙ্কগুলি পর পর সাজিয়ে দিচ্ছেন—আর আমরা মানুষেরা রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে একদিন চিরজীবনের মত রঙ্গমঞ্চের যবনিকার অন্তরালে হারিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু প্রবেশ থেকে প্রস্থান পর্যন্ত সবকিছু একসূত্রে বাঁধা অবিচ্ছিন্ন। কাজেই ব্যক্তির বিকাশে কোনপ্রকার স্তরভেদ করা যায় না। এই বিকাশ অবিচ্ছিন্ন সদা প্রবাহমান। সেইজন্য রেমণ্ট (Raymont) বলেছেন : বিকাশ একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ, এর মধ্যে কোন বিরতি নেই। যে সমস্ত দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য ক্রমপর্যায়ে ব্যক্তির জীবনে উপস্থিত হয়, সেগুলি একসময় পরিণত হয়। এবং অন্য একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

তবুও বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী ও পণ্ডিত জীবন-পরিক্রমাকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। ঠিক কোন স্তরে কিরকম বিকাশ হয় তা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা যায় না। একটি স্তর অন্য একটি স্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অর্থাৎ বিকাশের একটি স্তর থেকে অন্য একটি স্তরে যেতে কোন ফাঁক নেই। তবুও বিশেষ বিশেষ বয়সে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই জীবন-পরিক্রমার কতকগুলি স্তরের কথা বলা হয়েছে।

স্তর বা বিভাগ : বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন ভাবে এই স্তরগুলি বিভক্ত করেছেন। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রেও অনুরূপ স্তর-বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। কবি কালিদাস, সুপণ্ডিত চাণক্য এ বিষয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। যাই হোক আমরা হিন্দুশাস্ত্র থেকে এইরকম স্তর বিভাগ পেয়ে থাকি —

১। শৈশব বা কুমারাবস্থা :—জন্ম থেকে ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত।
২। বাল্য বা পৌগণ্ডাবস্থা :—৫ থেকে ১০ বৎসর পর্যন্ত।
৩। কৈশোর বা কিশোরাবস্থা :—১০ থেকে ১৫ বৎসর পর্যন্ত।
৪। যৌবনাগম :—১৫ থেকে।

রুশোও অনুরূপ একটি স্তরের কথা বলেছেন। তাঁর মতে স্তরগুলি হ'ল :—(১) ১-৫ বৎসর, (২) ৫—১২ বৎসর, (৩) ১২—১৫ বৎসর, এবং (৪) ১৫—২০ বৎসর তবে এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত হ'ল : ডঃ আর্নেষ্ট জোন্‌সের (Dr. Ernest Jones)। তাঁর মতে ব্যক্তির জীবন চারটি সুনির্দিষ্ট স্তরে বিভক্ত। সেগুলি হ'ল :—

১। শৈশব (Infancy) :—জন্ম থেকে ৫ পর্যন্ত।

২। বাল্যকাল (Boyhood বা Late childhood) : ৫ থেকে ১২ বৎসর পর্যন্ত।

৩। যৌবনাগম (Adolescence) : ১২ থেকে ১৮ বৎসর পর্যন্ত।

৪। পূর্ণবয়স্ক (Adulthood) : ১৮ বৎসরের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত।

স্তরগুলি বিভিন্ন হ'লেও একথা মনে রাখতে হবে শিশুর বিভিন্ন বয়সে একই ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ ঘটে। কাজেই এটি এক এবং সেই সঙ্গে অবিভাজ্য। একটি পরিবর্তনের সঙ্গে দৈহিক বা মানসিক আর একটি পরিবর্তন যুক্ত হয়ে একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং ব্যক্তিকে তার বিকাশের পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে। তবে বিকাশের পথটি হ'ল পেঁচাল (Spiral) বা ঘোরান সিঁড়ির মত। এতে ক্রমপর্যায়ে উচ্চাবস্থা ও নিম্নাবস্থা বিদ্যমান। অর্থাৎ উঠতে উঠতে ও নামতে নামতে ঘোরাপথে পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে হয়। উচ্চাবস্থা অসংহতি ও বৃদ্ধি নির্দেশ করে আর নিম্নাবস্থা করে সংহতি ও অন্তপূর্তি। যাই হোক এখন প্রতি স্তরের বৈশিষ্ট্যের কথা পৃথকভাবে আলোচনা করা যাক—

শৈশব (Infancy) : জন্মের পূর্বেই নবজাতকের মাতৃগর্ভে থাকার সময় (Prevatal stage) তার বিকাশের বেশ খানিকটা অংশ সম্পন্ন হয়ে যায়। গর্ভাবস্থাতেই শিশুর হৃদস্পন্দন, শ্বাসকার্য, রক্তসঞ্চালন ইত্যাদির কার্য শুরু হয়ে যায় এবং তার গঠন, স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদির সৃষ্টি হয়ে যায়। শিশুর পূর্ণ-পরিণতিতে মস্তিষ্কটি যেমন হওয়া উচিত, তার প্রায় ¼ অংশ তার জন্মের সময়ই তৈরী হয়ে যায়। গেসেল (Gesell), ম্যাকগ্র (Mr graw) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানী শিশুর ক্রমবিকাশকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন ; যেমন, দেহগত, ভাষাগত, সঙ্গতিমূলক ও ব্যক্তি-সামাজিক।

সাধারণতঃ জন্ম থেকে ৫ বা ৬ বছর পর্যন্ত কালকে শৈশবকাল বলা হয়।

এ সময় শিশুর বিকাশ খুব দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকে। শিশুর শিক্ষার দিক থেকে বিবেচনা করলে এটিকে নার্সারী বা কিণ্ডারগার্টেন স্তর, অর্থাৎ প্রাক্-বিদ্যালয় স্তর (Pre-school stage) বলা যেতে পারে। আবার এই স্তরে বিকাশের দ্রুত হার লক্ষ্য করে অনেকে এটিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি হ'ল—প্রাথমিক শৈশবকাল (Early Infancy) এবং অপরটি হ'ল প্রান্তীয় শৈশবকাল (Late Infancy)। প্রথম স্তরটিকে তিন বছর পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়টিকে তিন থেকে ছয় বছর পর্যন্ত বিস্তৃত বলে ধরা যেতে পারে। এখন দুটি স্তর সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করা যাক্।

॥ প্রাথমিক শৈশবকাল ॥

দৈহিক বৈশিষ্ট্য : দৈহিক বৃদ্ধির দ্রুততা শৈশবের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ শিশু একমাসে মাথা তুলতে পারে, দু'মাসে মাথা খাড়া করতে পারে, পাঁচমাসে কোন কিছুর আশ্রয় নিয়ে বসতে পারে, আট-ন মাস ধরে দাঁড়াতে পারে, দশমাসে হামাগুড়ি দিতে পারে, বারো মাসে কাউকে ধরে হাঁটতে পারে, পনর মাসে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারে এবং আঠারো মাসে দৌড়াতে পারে। শিশুর দেহের আয়তনও বেশ বাড়তে থাকে। প্রথম দু'বছরেই শিশু লম্বাতে দশ থেকে পনর ইঞ্চি বেড়ে যায়। শরীরের অন্যান্য অংশের চেয়ে মাথার বৃদ্ধি এ সময় অনেক বেশী। স্নায়ুতন্ত্র বিকাশপ্রাপ্ত হয় এবং স্নায়ু কোষও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। শিশুর বিভিন্ন জাতীয় স্নায়বিক উপাদান পরিপূর্ণতা লাভ করে। তার মেরুদণ্ড শক্ত হয়, হাড় পেশী ইত্যাদি সবল হয়। শিশুর বিভিন্ন ইন্দ্রিয় উন্নততর হয়। শিশু বিশেষ বিশেষ সংবেদন যাতে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করতে পারে সেইজন্য বিশেষ সংবেদন গ্রহণ করার ইন্দ্রিয়গুলি উন্নত হয়। শিশুর দেহ সঞ্চালনের ক্ষমতা প্রথম দিকে সামগ্রিক প্রকৃতির থাকে; কিন্তু ক্রমশঃ তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পৃথক পৃথক ভাবে কাজ করতে শেখে। তার বিভিন্ন জাতীয় কাজের মধ্যে একটা সুষ্ঠু সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় এবং শিশু তার দেহগত সঞ্চালনকে নিজের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে আনতে সক্ষম হয়।

মানসিক বৈশিষ্ট্য : শিশু শৈশবে অতিমাত্রায় পরনির্ভর থাকে। সে তখন অত্যন্ত অসহায়। এ সময় তার জীবনে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন নিরাপত্তা ও ক্ষুধাতৃষ্ণার নিবৃত্তির। শিশু সাধারণতঃ "সুখভোগের রীতি" অনুসরণ করে। কিন্তু যখন শিশু নিজে নিজে হাঁটতে শেখে, তখন সে নিজের

অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ শিশু-মনে স্বাধীনতার মনোভাবটি গড়ে ওঠে। তাছাড়া এই স্তরে শিশুর মধ্যে অহং (Ego) ভাব এবং আত্ম-সচেতনতার বিকাশ ঘটে। শিশুর সকল ভাব, কর্ম, চিন্তা, আচরণ ইত্যাদি এই অহংকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। শিশু তখন সব জায়গাতেই এই "আমি"কে খুঁজে বেড়ায়, সে আত্মপ্রশংসা করতে ও শুনতে ভালবাসে। শিশুর এই অহং ভাবটি তিনটি ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। প্রথমতঃ শিশু তার পরিবেশ অনুযায়ী নিজের আচারণধারাটি নিজের অজ্ঞাতসারেই পরিবর্তিত করতে শেখে। অপরের সামান্য ইঙ্গিতও তার আচরণকে পরিবর্তিত করতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ তার মা-বাবার আচরণ অনুযায়ী নিজের আচারণধারাটি ঠিক করে নেয়। দ্বিতীয় স্তরে শিশু সচেতন অনুকরণের মাধ্যমে তার আচারণ পরিবর্তিত করে। সে তার কল্পনাপ্রবণ মন নিয়ে বাবার টেবিলে বসে বাবার মত অফিসের কাজ করে, মা'-র সঙ্গে রান্নাঘরে কত রাজ্যের রান্না করে। সবশেষে তার অহং অন্য পথে পরিচালিত হয়। এই অবস্থায় শিশু গল্প বা কবিতা শুনতে ভালবাসে এবং যারা তার কাছে বীর পুরুষ বলে প্রতীত হয় তাদের সঙ্গে সে একাত্মীভূত হয়ে যায়। এই অবস্থাতে শিশু অহংবোধের একটি আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে।

শিশুর ভাষার বিকাশও এই স্তরের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রথম ছ'মাসের মধ্যে সে অস্ফুট, অস্পষ্ট ও অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করতে শেখে (echo-babbling stage। এক বছরের পর শিশু নানাপ্রকার কথা বলার চেষ্টা করে যেগুলির বেশীর ভাগই শব্দ ও উচ্চারণের সমষ্টিমাত্র। অবশ্য শিশুর প্রথম ব্যবহৃত ভাষা হ'ল—তার কান্না। প্রথম দিকে কান্নাই হ'ল তার মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। শিশু কোন বয়সে কত কথা শেখে, স্মিথ (Smith তার একটা মোটামুটি হিসাব দিয়াছেন।

বয়স :—	১ বৎ	২ বৎ	৩ বৎ	৪ বৎ	৫ বৎ	৬ বৎ
শব্দসংখ্যা :	৩	২৭২	৮৯৬	১৫৪০	২০৭২	২৫৬২[১]

এই তথ্যটি আমাদের দেশের না, হলেও আমরা ধরে নিতে পারি আমাদের দেশেও শিশুদের ভাষার বিকাশ অনুরূপভাবেই ঘটবে।

মানসিক বিকাশের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল—কৌতূহল। সে তার চারিপাশে যা দেখে, তাই তার নতুন লাগে, তার জিজ্ঞাসার শেষ নেই।

শুধু 'ক জিজ্ঞাসা ? সে নিজে পরীক্ষা করে দেখতে চায়, অনুসন্ধান করতে চায়। এইজন্য হ্যাড্‌ফিল্ড (Hadfield) বলেছেন—অল্প বয়সে শিশুরাই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ; বৈজ্ঞানিক যেভাবে প্রত্যেকটি ঘটনা বা বস্তুকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন করেন, শিশুও সেইভাবে 'এটা কি', 'কেন হ'ল' ইত্যাদি প্রশ্ন করে যায়। শিশুর মনোযোগের পরিবর্তনটিও হয় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে।

প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য : শৈশবে প্রাক্ষোভিক বিকাশও অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ। "প্রক্ষোভ" অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। **ব্রিজেসের** মতবাদ অনুযায়ী প্রায় দু'বছরের মধ্যেই শিশুর প্রক্ষোভগুলি বিশেষায়িত হয়ে যায়। শিশুর প্রথম দিকের প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়াগুলি মায়ের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়। তবে এই স্তরের শেষ দিকে শিশু অন্য ব্যক্তির প্রতি প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া করতে সমর্থ হয়। শৈশবে **যৌনতার** (Sexuality) মধ্যে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। পূর্বে মনে করা হ'ত, শিশুর মধ্যে কোন যৌনতাবোধ থাকে না। কিন্তু ফ্রয়েডের গবেষণা থেকে ধারণাটি ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই শৈশবকালীন যৌনতাই পরিণত জীবনে শিশুর আচরণধারাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। অবশ্য এই স্তরে শিশুর **লিবিডো** নিজের দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ফ্রয়েড এই জন্য এই স্তরটির নাম দিয়েছেন আত্মরতির স্তর (Auto-erotic Stage) যার থেকে নার্সিসাসত্বের উদ্ভব হয়। শিশুর যৌন আকাঙ্ক্ষা নিজের দেহের যৌন উত্তেজক কেন্দ্রের (eretic zones) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ফ্রয়েডের মতে শিশু মাতৃস্তন্য পান করার সময়, মলমূত্র ত্যাগ বা ধারণ করে রাখার সময় দেহের বিভিন্ন অংশে যে উত্তেজনা অনুভব করে, তার মধ্যেই তার যৌনাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি লাভ করে। আবার আঙুল চোষা বা কোন কিছু কামড়ানোর মাধ্যমেও সে যৌনতৃপ্তি লাভ করে।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য : জন্মের সময় শিশুর মধ্যে সামাজিক বা অসামাজিক কোন বৈশিষ্ট্য বা গুণের সমাবেশ ঘটে না। শিশু যত বড় হতে থাকে, তত তার মধ্যে সামাজিক গুণ বিকাশ হতে থাকে। শিশু ধীরে ধীরে আত্ম-পর বুঝতে শেখে। সে যেমন আনন্দ ও ভালবাসা প্রকাশ করে, তেমনি অন্যের প্রতি হিংসা, রাগ বা বিরক্তিও প্রকাশ করে। শিশু এ সময়ে অন্যদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টাও করে। শিশুর প্রথম সামাজিক আচরণ শুরু হয় তার

মা কিংবা বাবাকে কেন্দ্র করে। তারপর ভাই, বোন ও পরে একই পরিবারস্থ শিশু ও তারও পরে প্রতিবেশী সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলা ও অন্যান্য আচরণের মাধ্যমে তার সামাজিকতার গুণটি বিকাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শিশু অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক থাকে বলে সবকিছুতেই নিজের অধিকার ও প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়। ফলে সার্থক সামাজিক আচরণ ঐ সময় ঘটছে বলে মনে করা ঠিক হবে না।

প্রাক্তীয় শৈশব কাল: তিন থেকে পাঁচ বা ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত স্তরকে যেমন প্রাক্তীয় শৈশব কাল বলা হয়, তেমনি অনেকে এটিকে প্রথম বাল্যের স্তর (Early Childhood)-ও বলে থাকেন। শিশুর প্রাথমিক জীবন এই স্তরে সম্পূর্ণ হয়ে তাকে শিক্ষাগ্রহণের উপযোগী করে তুলছে বলে স্তরটির গুরুত্ব অনেক বেশী।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য: এই স্তরের দৈহিক বিকাশও বেশ দ্রুত। শিশুর পেশীর বিকাশ এই স্তরে উল্লেখযোগ্য ভাবে লক্ষ্যণীয়। শিশু বিভিন্ন ধরনের দেহ সঞ্চালনমূলক খেলাধূলা করে বলে তার দৈশিক বিকাশ এত দ্রুত হয়। তাছাড়া শিশুর দেহ সঞ্চালনমূলক ক্ষমতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সে বিভিন্ন দিকে সঞ্চালনমূলক দক্ষতাও অর্জন করে। শিশু কোন কিছুকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরা, কিছু ছোড়া, দৌড়ানো, লাফানো, উঁচু জায়গাতে ওঠা ইত্যাদি কাজগুলি শিশু সহজেই করতে পারে। তাছাড়া শিশু ছোটখাট যন্ত্রপাতির ব্যবহারও শিখে যায়। লাইন টানা, ছবি আঁকা, রঙ করা ইত্যাদি কাজ করার ক্ষমতাও শিশু অর্জন করে।

মানসিক বৈশিষ্ট্য: মানসিক বিকাশের হারটিও এই স্তরে অত্যন্ত দ্রুত। এর আগের স্তরে শিশুর যে ভাষার বিকাশ শুরু হয়েছিল, এই স্তরে তা আরো বিকশিত হয়। শিশুর শব্দ ভাণ্ডার যথেষ্ট বেড়ে যায়। তাছাড়া শিশু শব্দের সমন্বয়ে বাক্য এবং বাক্যের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখে যায়। কৌতূহল প্রবৃত্তিটিও এই সময় বেশ তীব্র আকার ধারণ করে। এই স্তরের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল ধারণার সৃষ্টি (Concept formation)। শিশু তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বস্তুকে কেন্দ্র করে তার সম্বন্ধে একটি অর্থপূর্ণ ধারণা গড়ে তোলে। চার বছরের পর শিশুর ইন্দ্রিয়গুলি বেশ তীক্ষ্ণ হয়। এ সময় শিশুর জীবনে বুদ্ধির বিকাশ কি ভাবে হয় সে নিয়ে মতবিরোধ আছে। তবে শিশুর

জ্ঞান সঞ্চয়ের ক্ষমতা যে বাড়ে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রুশো বলেছেন, এই স্তরে যেন আমরা শিশুকে বেশী কথা বলতে না দেই, কারণ শিশু বেশী কথা বললে তার চিন্তাশক্তির বিকাশটি ব্যাহত হবে। স্পষ্টতঃ রুশো ভাষাকে চিন্তার প্রতিযোগী মনে করেছেন। কিন্তু ভাষা চিন্তার বাহন এবং চিন্তা ও ভাষা সহযোগী। অনেকে বলেন এ সময় শিশু চিন্তা করতে শেখে ঠিকই, কিন্তু যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সে চিন্তা করতে পারে না। আবার অমূর্ত বস্তু সম্বন্ধেও সে চিন্তা করতে শেখে না। এ বিষয়ে মনোবিজ্ঞানী পিয়াজে'র (Piaget) মত হ'ল—শিশু এই স্তরে অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক থাকে এবং তার সব আচরণেই এই অহংবোধটি প্রতিফলিত হয়। শিশুর আচরণ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই আবেগপ্রধান, সেখানে চিন্তার কোন স্থান নেই। কিন্তু মনোবিজ্ঞানী সুসান আইজ্যাক্স (Susan Isaacs) বলেছেন শিশুর চিন্তাধারাকে বয়স্কদের চিন্তাধারা দিয়ে বিচার করলে চলবে না। বয়স্কদের চিন্তায় অমূর্ত ধারণা (abstract) থাকে, কিন্তু শিশুর চিন্তাতে অহংবোধই মূল উপজীব্য। এই অহংবোধ থেকেই শিশুর মধ্যে সর্বপ্রাণবাদ (animism) লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আইজ্যাক্স ও অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন শিশুর চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধির বিকাশ এই স্তরেই শুরু হয়। শিশুর চিন্তা প্রতীক-ধর্মী, কল্পনাশ্রয়ী। অলীক কল্পনা ও দিবাস্বপ্নও এই স্তরের বৈশিষ্ট্য। কল্পনা বিলাস (Fantasy) এ স্তরে অতিমাত্রায় দেখা দেয়। শিশু কল্পনামূলক অলীক ও অবাস্তব গল্প শুনতে ভালবাসে এবং সেইরকম জগতে বিচরণ করতে ভালবাসে। 'মনে কর যেন' (Make believe) খেলাও তার অত্যন্ত প্রিয়। সে কল্পনাতে তেপান্তরের মাঠের উপর দিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়া উড়িয়ে নিয়ে যায়, বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করে। আবার কখনও সে মস্ত বীরপুরুষ—মাকে নিয়ে যাচ্ছে বিদেশ ঘুরতে। কখনও সে কানাই পণ্ডিত। একটা সাধারণ লাঠি কখনও তার নিকট ঘোড়া আবার কখনও বা রাক্ষস। শিশু ক্রমশঃ বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে সংঘাতের ফলে প্রবৃত্তিমূলক আচরণগুলি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করে। এই স্তরে তার শিখন (Learning) শুরু হয়। তাছাড়া শিশু অন্যান্যদের অনুকরণ করতেও শেখে। তবে এর পূর্বের স্তরের মত অনুকরণটি শুধু অনুবর্তন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, তার মধ্যে কিছুটা বিচারবুদ্ধি শিশু প্রয়োগ করে। বিচারকরণের ক্ষমতাটি কিন্তু এই স্তরে বিকশিত হয় না।

প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য : এর আগের স্তরে আমরা শিশুর মধ্যে যে প্রাক্ষোভিক সংগঠনটি দেখেছিলাম, এই স্তরে সেটি আরো বিশেষায়িত হয়। শিশুর পরিচিতির গণ্ডী ক্রমশঃই বাড়ছে। তার স্নেহ ভালোবাসাও ছড়িয়ে পড়ছে বৃহত্তর গণ্ডীর মধ্যে। সে তার সঙ্গীদের ভালোবাসছে, গুরুজনদেরও ভালবাসছে, শ্রদ্ধা করছে। তাছাড়া তার মধ্যে কতকগুলি মিশ্র প্রক্ষোভও দেখা দেয়। উদ্বেগ, সংকোচ, লজ্জা, ঘৃণা, ঈর্ষা ইত্যাদি মনোভাবও তার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে। প্রক্ষোভগুলি দ্রুতলয়ে এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে ধাবিত হচ্ছে। এই হাসছে তো এই কাঁদছে। এক্ষুণি রেগে গেল, পরমুহূর্তে আনন্দে গলে যেন একেবারে জল। এই স্তরেই প্রক্ষোভগুলি কেন্দ্রীভূত হয়, শিশুর মধ্যে সেন্টিমেন্ট বিকাশে সহায়তা করে। তবে এই সেন্টিমেন্ট মূলতঃ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বস্তুকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। যৌনজীবনেও একটা পরিবর্তন আসে। শিশুর লিবিডো নানা অস্বাভাবিক পাত্র থেকে পাত্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়। এর আগের স্তরের আত্মরতিমূলক যৌনতা থেকে শিশুর যৌন আকাঙ্ক্ষা বাইরের ব্যক্তিতে স্থানান্তরিত হয়। এই সময় ছেলেরা মায়ের প্রতি এবং মেয়েরা বাবার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফ্রয়েডের মতে শিশুরা এই যে বিপরীত লিঙ্গের মা-বাবার দিকে আকৃষ্ট হয়, তা তাদের যৌন শক্তি বা যৌন আকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক বিকাশের জন্যই হয়। তাঁর মতে এই আকর্ষণ বা আসক্তি যৌনমূলক, ছেলেদের মায়ের প্রতি আকর্ষণকে বলা হয় **ঈডিপাস কমপ্লেক্স** (Oedipus Complex) এবং মেয়েদের বাবার প্রতি আকর্ষণকে বলা হয় **ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স** (Electra Complex)। এই কমপ্লেক্স দেখা দিলে ছেলেরা তাদের মায়ের প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাবাকে এবং মেয়েরা বাবার প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে মাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে এবং তাদের প্রতি একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিদ্বেষের ভাব পোষণ করে। তবে এই যৌনতা বিকাশের ফলে এবং বিদ্বেষের জন্য ছেলেমেয়েদের মনে একটা ভয় জন্মায়। ছেলেরা ভাবে এই আসক্তির জন্য বাবা এবং মেয়েরা ভাবে মা-তাদের শাস্তি দেবেন হয় যৌনাঙ্গ ছেদ করে বা অন্য কোন দৈহিক ক্ষতি করে। ফ্রয়েড এই ভয়ের নাম দিয়েছেন **কাস্ট্রেশন কমপ্লেক্স** (Castration Complex)। পরে এই ভয় থেকে ছেলেমেয়েরা আবার তাদের ভালবাসার বিষয়বস্তু পরিবর্তিত করে নেয়। ছেলেরা বাবাকে এবং মেয়েরা মাকে তাদের

মা ও বাবার সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করে নিয়ে তাদের ভালোবাসতে শুরু করে দেয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে বাবার প্রতি বিদ্বেষ ও ভালোবাসার এই মিশ্র অনুভূতিকে ফ্রয়েড বলেছেন মুগ্মানুভূতি (Amoivalence)। মায়ের প্রতি যৌন আকর্ষণ ও বাবার প্রতি বিদ্বেষজনিত ভয় থেকে জন্মায় তাঁদের প্রতি প্রতিবাদহীন আনুগত্য ও নানা বিধিনিষেধ অনুসরণ করার অভ্যাস। কাজেই একথা বলা যায় ঈডিপাস কমপ্লেক্স থেকেই সৃষ্টি হয় আনুগত্য ও বাধ্যতার। শিশু যখন বড় হয়, তখন এই ভীতিময় আনুগত্য ও বাধ্যতা আর থাকে না। তার জায়গায় দেখা দেয় নীতিবোধ ও বিবেক। যায় হোক, সমলিঙ্গের প্রতি ভালোবাসা বা সমকামিতা (Home-Sexuality) এই স্তরেরই বৈশিষ্ট্য।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য ঃ সামাজিক বিকাশের দিকেও শিশু পূর্বের স্তরের চেয়ে যথেষ্ট পরিণত হয়। তার সামাজিক আচরণ ও প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রটিও অনেক বড় হয়। তার সমাজ বলতে এখন আর শুধু পরিবারটিকেই বোঝায় না। তার প্রতিবেশীরা ও খেলার সাথীরাও তার সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়। শিশুর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক সংলক্ষণ দেখা দেয় যেমন **সহযোগিতা, সহানুভূতি** ইত্যাদি। তার অহংসত্তার তীব্রতাও কিছুটা কমে যায় এবং সে সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করতে থাকে। শিশুর মধ্যে বন্ধুত্বের বিকাশ হয় এবং সে যাদেরকে ভালবাসে তাদেরকে নিজের অত্যন্ত প্রিয় জিনিসটি দিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অবশ্য ঝগড়া মারামারি যে হয় না—তা নয়। আবার এই স্তরেই শিশু সমবয়সীদের নিয়ে দল গড়তে শুরু করে।

শৈশবকালের শিক্ষা ঃ শৈশবকাল প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশ ও পরিমার্জনার স্তর। এই স্তরটির উপরই শিশুর পরবর্তী স্তরগুলি নির্ভর করছে। অ্যাডলারের (Adler) মতে শিশুর ভবিষ্যত জীবনের সুবিশাল সৌধটি শৈশবের বুনিয়াদদের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রয়েডও বলেন—শিশু ভবিষ্যতে যা হবে, তা তার ৪-৫ বছর বয়সেই ঠিক হয়ে যায়। আমাদের বাংলাদেশেও একটা প্রবাদ আছে—যা পাঁচে তাই পঞ্চাশে। শিক্ষার দিক থেকে বিচার করলে এই স্তরের শিক্ষাকে প্রাক্ বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা (Pre-school stage) বলা যেতে পারে। অনেকে মনে করেন, এই স্তরে শিক্ষা দেবার কোন প্রয়োজন নেই। রুশোও বলেছিলেন—It is not

to gain time, but to lose time কিন্তু আমরা যদি মনোবিজ্ঞানসম্মত পথে শিক্ষা পরিচালনা করতে যাই, তাহ'লে এই স্তরের শিক্ষাকে তো উপেক্ষা করতে পারিই না, বরং অধিকতর গুরুত্ব দিতে হয়। শিশু এই স্তরে যে জীবন-বোধ অর্জন করে, ভবিষ্যতে সেইগুলিই তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশকে প্রভাবিত করে। শিশু এ সময় কতকগুলি অভ্যাস গঠন করে, যেগুলিকে সু-অভ্যাসে পরিণত করা শিক্ষার দ্বারাই সম্ভব। এই সময় মানসিক বিকাশের অঙ্গ হিসাবে শিশুর ভাষা বিকশিত হয়। (শিশুর ভাষার বিকাশ, ব্যবহার ও উচ্চারণ যাতে সুষ্ঠু হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তার কল্পনার যথাযথ বিকাশের জন্য ছড়া, গল্প, গান, ছন্দ, খেলন প্রভৃতি সযত্নে নির্বাচন করতে হবে।) শিশুর প্রাথমিক সৌন্দর্যবোধের ধারণাটিও এ সময় বিকশিত হয়। সেদিকেও উপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। শিশুর প্রাক্ষোভিক বিকাশও এই স্তরের ঘটনা এবং তার প্রধান ক্ষেত্র হ'ল তার পরিবার। পরিবেশটি ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত করে পিতামাতা যদি শিশুর প্রাক্ষোভিক বিকাশকে ঠিকপথে পরিচালিত না করেন, তাহ'লে পরবর্তী স্তরে শিশুর প্রাক্ষোভিক বিকাশ ব্যাহত হতে বাধ্য। সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। শিশু যে পরিবেশে বেড়ে উঠছে, সেখানের বয়স্কদের আচরণ আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত। শিশুর সঙ্গী নির্বাচনেও যথেষ্ট যত্ন নিতে হবে। শিশুর প্রথম শিক্ষক হলেন তার মা। শিশুর এই স্তরের শিক্ষার দায়িত্ব কেবল বিদ্যালয়গুলির উপর ছেড়ে দেওয়া চলবে না। মনে রাখতে হবে, এ ব্যাপারে মাতাপিতার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের চেয়েও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।)

অবশ্য প্রাক্-বিদ্যালয় বা বিদ্যালয় যাবার প্রস্তুতি হিসাবে এই স্তরটিকে চিহ্নিত করা হলেও কিছু কিছু বিদ্যালয় আছে যেখানে এই বয়সের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলি হ'ল নার্সারী ও কিণ্ডার-গার্টেন স্কুল। এই সব স্কুলে শিশুদের স্বাভাবিক ও সহজাত প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে এবং পরবর্তী স্তরগুলির কথা চিন্তা করেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তাদের কৌতূহল প্রবৃত্তিটি বিকশিত করার জন্য নানাপ্রকার খেলার সামগ্রী দেওয়া হয়। আবার ইন্দ্রিয়ানুভূতি পরিমার্জিত করার জন্য নানাপ্রকার শিক্ষোপকরণ ব্যবহৃত হয়। এর জন্য মন্তেসরী ব্যবহার করতেন ডাই-

ড্যাকটিক যন্ত্র (Didactic apparatus) এবং কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে ক্রমবদ্ধ ব্যবহার করতেন গিফ্‌ট ও অকুপেশন (Gifts and Occupations)। শিশুর সামাজিক দিক বিকশিত করার জন্য দলবদ্ধ ভাবে খেলা, গান, নাচ ইত্যাদির ব্যবস্থাও রাখা হয়। তাছাড়া নাটক, অভিনয়, ছবি আঁকা বা গল্প বলার মাধ্যমে তাদের কল্পনাশক্তি বিকশিত করার চেষ্টা করা হয়। শিশু এই স্তরে মায়েদের প্রতি বেশী আকর্ষণ অনুভব করে বলে এই সমস্ত স্কুলে শিক্ষাদান কার্য শিক্ষয়িত্রীরাই পরিচালনা করেন। বিদ্যালয় পরিবেশটিকেও গৃহ-পরিবেশের অনুরূপ করার চেষ্টা করা হয়। এতে শিশু শিক্ষার আনন্দটি পুরোপুরি উপভোগ করতে পারে।

এখন এই স্তরের শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মতামত করা হল—

(১) এই স্তরে শিশুর মধ্যে অনেক গুণই সুপ্তাবস্থায় থাকে। কাজেই এই স্তরের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে সুপ্ত গুণাবলীর যথাযথ বিকাশ সাধন করা।

(২) শিশুর শিক্ষা পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। আবার এই স্তরে শিশুর মনোযোগ থাকে চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত। কাজেই শিশুর পরিবেশটি করতে হবে শান্ত ও সংযত।

(৩) শিশুর শিক্ষাতে সংগীতকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সংগীত শিশুর কতকগুলি অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তিকে পরিবর্তিত করে এবং তার মধ্যে সৌন্দর্যানুভূতি জাগ্রত করে।

(৪) খেলা হচ্ছে শিশুদের প্রাণস্বরূপ। খেলা হ'ল শিশুদের সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ। এর মাধ্যমেই শিশুর কল্পনা-শক্তির বিস্তার ঘটে, তার মানসিক সমস্যার সমাধান করে ও দেহ-মনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করে। এইজন্য ক্যাল্ডওয়েল কুক (Caldwell Cook) শিশুর শিক্ষায় খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা প্রবর্তন (Playway in Education) করতে চেয়েছেন এবং বর্তমানে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

(৫) শিশুর প্রবৃত্তিগুলি যাতে অবদমিত (Repressed) না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রবৃত্তিগুলির উদ্গমন (Sublimation) শিশুর প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

(৬) শিশুর চিন্তা ও বিচার-করণের শক্তি যথাযথ ভাবে বিকশিত করতে হবে।

(৭) শিশুর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে **মাতৃভাষার মাধ্যমে।** শিশুর পক্ষে মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের মত উপকারী। সে সহজে এই ভাষা বুঝতে পারে। এই ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিলে শিশু সহজে জ্ঞান আহরণ করতে পারবে।

(৮) শিশুর কৌতূহল প্রবৃত্তিটিকে কাজে লাগাতে হবে। এই প্রবৃত্তিটিই শিশুর চিন্তাশক্তি বিকশিত করতে সহায়তা করে।

(৯) শিশুর সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করতে হবে। দলবদ্ধ ভাবে খেলাধূলা, গান, নাচ, বনভোজন ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুর বিভিন্ন সামাজিক গুণ বিকশিত হয়।

(১০) সুস্থ দেহেই সুস্থ মনের বাস। কাজেই শিশু যাতে সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। শারীর-শিক্ষার ব্যবস্থাও পাঠ্য-সূচীতে রাখতে হবে।

(১১) রুশোর মতে শিশুর হাত, পা, চোখ তার শিক্ষা দানের প্রধান সহায়ক। এইগুলির মাধ্যমেই শিশু তার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করে। কাজেই এই অঙ্গগুলির যথাযথ ব্যবহার শিশুকে শেখাতে হবে।

সবশেষে বলতে হবে, এই স্তরের শিক্ষাদান কোন একজনের উপর নির্ভর করে না। মাতাপিতা, অভিভাবক, শিক্ষক, সমাজসেবী, পরিচালক-মণ্ডলী, সরকার এবং মনোবিজ্ঞানী প্রত্যেকেরই এই স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু না কিছু অবদান থাকবেই। প্রত্যেকে যদি শিশুর শিক্ষার জন্য যথাযথ ভাবে চেষ্টা করে যান, তাহ'লে তার শিক্ষা সার্থক হবে।

বাল্যকাল (Childhood) : বাল্যকাল হ'ল শৈশব ও যৌবন দুইটির মধ্যে সংযোজক একটি কাল। সাধারণতঃ ৫ বা ৬ বছর বয়স থেকে এই স্তরের শুরু এবং এটি ১২ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। শৈশবে শিশুর মধ্যে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল, এ স্তরে সেগুলি অনুপস্থিত। আমরা যদি সেই সোপান সিঁড়ির কথা চিন্তা করি তাহ'লে বোঝা যাচ্ছে এ স্তরটি অন্তর্পূর্ণের স্তর। শৈশবের সেই চঞ্চলতা বা উদ্দামতা যেন কোন মন্ত্রবলে সংহত রূপ ধারণ করে। (তুঃ ফেনিলতা, উচ্ছলতা। হয়ে যায় তুচ্ছ কথা। উদ্দামতা সকলি

মিলায়)। দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, বা প্রক্ষোভিক ইত্যাদি দিক থেকে শৈশব এক গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটময় স্তর। শৈশবে যেন নবজাতকের দেহ মনে এক বিরাট পরিবর্তনের বন্যা নিয়ে আসে। কিন্তু বাল্যকালে উদ্দাম বন্যার সেই তাণ্ডব স্রোতের কোন চিহ্নই থাকে না। এ যেন দুরন্ত ঝড়ের পর শান্ত, সমাহিত অবস্থা! বাল্যকালে বিকাশের স্রোত শৈশবের মত কূল ছাপিয়ে যায় না। শিশুর মধ্যে কোন অস্থিরতা নেই, সে শান্ত, সমাহিত ও স্থিতধী। পরিণত জীবনের বহু আচরণের সঙ্গে বাল্যকালের আচরণের মিল লক্ষ্য করেই আর্নেষ্ট জোন্স বাল্যকালকে প্রাপ্ত বয়সের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আবার পুনরাবর্তন মতবাদ (Recapitulation theory) অনুযায়ী জোন্স প্রাপ্তবয়সকে (Adulthood) বাল্যকালের পুনরাবৃত্তি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। মনঃসমীক্ষকরা বলেন শিশুর শৈশবে তার লিবিডো বা যৌনভাবের যে প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল, বাল্যকালে তা ঘুমিয়ে থাকে। শিশু নিজের যৌনাঙ্গটি সম্বন্ধে সচেতন থাকে ঠিকই, কিন্তু সে কোন প্রকার যৌন আকর্ষণ অনুভব করে না।

অনেক মনোবিজ্ঞানী বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করে বাল্যকালকেও দুটি স্তরে ভাগ করেছেন, যথা, **প্রাথমিক বাল্যকাল** (Early childhood) এবং **প্রান্তীয় বাল্যকাল** (Late childhood)। প্রত্যেক স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এগুলি প্রায়ই সম্পাতিত (over lapped)। সেইজন্য দুটি স্তরকে আর পৃথক ভাবে আলোচনা না করে একই সঙ্গে বাল্যকালের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা হ'ল।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য: শৈশবে শিশু যত দ্রুত হারে বাড়তে থাকে, বাল্যকালে তা অনেক কমে যায়। **বল্ডুইন** একটি পরীক্ষাতে দেখিয়েছেন শিশু জন্মের সময় থাকে প্রায় ৫২ সেমি. লম্বা, ৫ বছরে হয় ১০৬ সেমি. ৯ বছরে ১৩১ সেমি. ১৩ বছরে প্রায় ১৫১ সেমি.। শিশুর অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা দেয়। তার দেহে অযথা মেদ বৃদ্ধি না হয়ে শরীর বেশ সুঠাম হয়ে গড়ে ওঠে। তবে ওজন ও উচ্চতা উভয় ক্ষেত্রেই মেয়েদের বিকাশ ছেলেদের চেয়ে কিছুটা বেশী হয়। শিশুদের দুধ-দাঁতগুলি এ সময় ভেঙে পড়তে থাকে এবং তার জায়গাতে স্থায়ী দাঁত উঠতে থাকে। শারীরিক কাজ করার ক্ষমতা, লাফানো, দৌড়ানো ইত্যাদির ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। শিশুর প্রায় প্রতিটি অঙ্গ বিকশিত হয়ে যায়।

চোখের দৃষ্টি বেশ তীক্ষ্ণ হয়। সহজে শিশু অসুস্থ হয় না। বাল্যকালে মস্তিষ্কের বিকাশও মোটামুটি একটা উন্নত স্তরে এসে পৌঁছায়। শিশু নিজের অঙ্গমূলক সঞ্চালনগুলিকে ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে শেখে। শৈশবে শিশুর মুখমণ্ডলে যে সারল্যের ভাব থাকে, তা কিন্তু এই স্তরে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হতে থাকে। প্রান্তীয় বাল্যকালে শিশুদের হাত পা কিছু লম্বা হতে শুরু করে। দেহের অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে খানিকটা অসংহতি দেখা দেয়। হৃদযন্ত্র ও ফুসফুস প্রায় স্বাভাবিক ভাবে কাজে করে, কিন্তু পাচনতন্ত্রটি থাকে কোমল অবস্থায়। এই স্তরে ছেলেমেয়েরা নিজেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। মস্তিষ্ক ও পেশী আগের চেয়েও উন্নত হয়।

মানসিক বৈশিষ্ট্য : মানসিক বিকাশের দিকে এই স্তরে শিশুরা যথেষ্ট উন্নত হয়। আমরা আগেই দেখেছি এই স্তরে তাদের শব্দ-ভাণ্ডার যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়। তাদের স্মৃতিশক্তিও যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। তবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বস্তুগুলিই শিশু দীর্ঘ দিন ধরে স্মরণ করতে পারে। শিশু পড়া-শুনাতে যথেষ্ট আগ্রহী হয় এবং তার কৃতিত্ব ও অন্যের প্রশংসা তাকে আরো বেশী আগ্রহী করে তোলে। শিশুর মনোযোগ এ সময় খুব চঞ্চল থাকে এবং তার মনোযোগের পরিসরও কম থাকে। শিশুর কৌতূহল এ সময় যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। সে তার চারপাশে যা দেখে বা যাদের দেখে সেই সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে চায়। এই কৌতূহল থেকেই ধারণা, ভাব ও ভাষার বিকাশ ঘটে। সে বড়দের সামনে হাজার প্রশ্ন রাখে। কিন্তু শৈশবের প্রশ্নের মত এগুলি অনির্দিষ্ট বা অস্পষ্ট থাকে না। তাছাড়া কৌতূহলের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর চিন্তা ও বিচার করার ক্ষমতাটিও বাড়ে। এই স্তরের বৈশিষ্ট্যই হ'ল—পর্যবেক্ষণ, মনঃসংযোগ, চিন্তন ও বিচারকরণ। ৬ থেকে ১২ বছরের মধ্যে শিশুরা অতীত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ ও পুনরুদ্রেক করতে পারে। শৈশবে শিশু প্রশ্ন করত "এটা কি"? এই স্তরে সে প্রশ্ন করে—"এটা কেমন করে হ'ল?" বা "এটা এমন কেন?" ইত্যাদি। শিশুর বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে ধারণাও (concept) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কোন জিনিসটা কি, কি তার কাজ এবং কেমন তার ব্যবহার এ সম্বন্ধে তার একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে। শিশুর মধ্যে কল্পনা-বিলাস এ স্তরেও লক্ষ্য করা যায়। শিশু কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে পরিষ্কার কোন পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। সে

যে সমস্ত কাল্পনিক গল্প পড়ে বা শোনে, সেগুলিকে সত্য বলেই মনে করে। অবশ্য শেষের দিকে শিশুর কল্পনার রাজত্বের সীমানা অনেক কমে যায় এবং শিশু বাস্তব জগতকে চিনতে চেষ্টা করে। এই স্তরে শিশুর মধ্যে আবিষ্কারের স্পৃহাটিও জাগ্রত হয়। শিশুর মধ্যে যুক্তিশক্তির (reasoning) বিকাশ ঘটলেও সেটা খুব উন্নত স্তরের হয় না। স্থান, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে শিশুদের ধারণা খুব একটা স্পষ্ট হয় না।

শৈশবে শিশুর বুদ্ধির বিকাশের জন্য কোন মূর্ত মাধ্যম প্রয়োজন। তার বুদ্ধি তখন কল্পনার সঙ্গে মিশে থাকে এবং প্রধানতঃ আবেগধর্মী থাকে। বাল্যকালে শিশুর বুদ্ধির মধ্যে যুক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অমূর্ত চিন্তা করার ক্ষমতাও বাল্যকালে দেখা দেয় তবে প্রাপ্তবয়স্কদের মত তা পরিণত হয় না। বাল্যকালে শিশু চিন্তা করে প্রধানতঃ প্রতীক বা প্রতিরূপের মাধ্যমে। বাল্যকালে শিশুমনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল—শিশুমন সঞ্চয়ী হয়ে ওঠে। সে নানা জিনিস সঞ্চয় করতে চায়। এটিকে শিশুর মালিকানাবোধের (Sense of proprietory) জাগরণ বলা যেতে পারে। শিশু তার বই, কলম, পেন্সিল, ইত্যাদি নিজের বলে মনে করে বেশ গর্ববোধ করে। এই মালিকানা-বোধটি অতৃপ্ত থাকলে শিশুর মধ্যে অহেতুক ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং এই ক্ষোভটি অবদমিত হ'লে সে অপরের জিনিস চুরি করে, ছিঁড়ে ফেলে বা অন্য কোন উপায়ে ক্ষতিসাধন করে। বাল্যকালে শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল—সৃজনশীলতা। শিশু নতুন কিছু করার জন্য একটা তীব্র তাড়না অনুভব করে। দল গঠন করা বা নতুন কোন জিনিস তৈরী করাতে সে আনন্দ অনুভব করে। আবার খেলাধূলা ও অন্যান্য গঠনমূলক কাজে সে নিজের কর্তৃত্ব প্রকাশ করার চেষ্টা করে। এই সমস্ত দেখে অনেক মনোবিজ্ঞানী এই স্তরকে প্রস্তুতি বা সংগঠনের স্তর বা জীবনের প্রস্তুতির স্তর (Preparation Stage) বলেছেন।

এই বয়সে ছেলেমেয়েদের আগ্রহের বস্তুর পরিধি ও মনোযোগের পরিসর যথেষ্ট বেড়ে যায়। এরা বিভিন্ন বস্তুতে এদের আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে বলে বহু মনোবিজ্ঞানী বলেছেন যে, এই পর্যায়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যত বেশী পরিমাণ বস্তুর প্রতি আগ্রহ থাকে, জীবনের অন্য কোন স্তরে তা আর দেখা যায় না। ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনা বা বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি জানার

একটা তীব্র কৌতূহলও দেখা দেয়। তারা বই পড়ার দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়। শৈশবের কল্পনামূলক স্তরটি চলে যায় এবং শিশুর মধ্যে বাল্যকালে বাস্তববোধ বেশ প্রখর ভাবে জাগ্রত হয়। আর্নেস্ট জোনস্ পরিণত বয়সকে বাল্যেরই পুনরাবৃত্তি বলে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি বলেছেন এই স্তরেই শিশুর বয়স্ক জীবনের সব কিছু বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়।

প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য ঃ এই স্তরে ছেলেমেয়েদের প্রাক্ষোভিক বিকাশের ক্ষেত্রেও অনেক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। শৈশবের প্রক্ষোভমূলক অস্থিরতাটি থাকে না। তার প্রক্ষোভমূলক আচরণ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বিকাশের স্রোতটি কূল ছাপিয়ে যাচ্ছে না—বরং একটা গণ্ডীর মধ্যে সীমিত ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। তার মধ্যে নেই অস্থিরতা, নেই উদারতা, নেই চঞ্চলতা। সে যেন স্থিতধী। অবশ্য এই স্তরের প্রথমদিকে কিছু কিছু প্রাক্ষোভিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তবে দলবদ্ধ ভাবে খেলাধূলা করা বা অন্যান্য সামাজিক আচরণের মাধ্যমে তার প্রক্ষোভগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। সে নিরাপত্তার অভাবকে ভয় করে। অনুবর্তন প্রক্রিয়ার জন্যই সে অন্ধকারকে, ভূতকে এবং কতকগুলি প্রাকৃতিক ঘটনাকে ভয় করে। যৌন-চেতনামূলক প্রক্ষোভের দিকে ফ্রয়েড এটিকে বলেছেন **সুপ্তকাম অবস্থা** (Latency Period)। তাঁর মতে শৈশব পর্যন্ত শিশুর যৌনতা নানাপ্রকার বৈচিত্র্যের মধ্যে পরিণতি লাভ করলেও বাল্যকালে এটি সুপ্তাবস্থায় থাকে। যৌবনতার কোন বাহ্যিক প্রকাশ এ স্তরে থাকে না। অবশ্য বাহ্যিক প্রকাশ না থাকলেও অন্তর্নিহিত অবস্থায় তা পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলতে থাকে। ধীরে ধীরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রক্ষোভগুলি বিশেষায়িত হতে থাকে। তাদের মধ্যে ঈর্ষা, হিংসা ইত্যাদি প্রক্ষোভগুলি দেখা দেয়। ঈর্ষা প্রধানতঃ ছোট ভাইবোনদের কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে কারণ সেখানে পিতামাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার একটা আশঙ্কা তাদের মধ্যে দেখা দেয়। ছেলেমেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাটিও এই সময় বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। ছেলেরা চেষ্টা করে নানা-প্রকার খেলাধূলা বা প্রতিযোগিতামূলক কাজের মাধ্যমে নিজেদের অহংসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। মেয়েরাও সাজ-পোশাক, নাচগান, অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে। এইজন্য বহু মনোবিজ্ঞানী এই স্তরে খেলাকে ছেলেমেয়েদের প্রতিষ্ঠির প্রচেষ্টা বলে বর্ণনা করেছেন।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য ঃ এই স্তরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে সামাজিক বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়, তা তাদের পরবর্তী জীবনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। শৈশবের আত্মকেন্দ্রিকতাটি কাটিয়ে শিশু সমাজ-জীবনে প্রবেশ করে এই স্তরেই। বাল্যকালের প্রাথমিক দিকটিতে দলবদ্ধভাবে খেলাধুলা করার ঝোঁকটি অত্যন্ত প্রবল থাকে। তারা যে কোন একটি দলের মধ্যে মিশে যায় এবং দলনেতার নির্দেশ মেনে চলতে থাকে। কিন্তু শিশু খুব বেশীদিন কোন দলের সভ্য হয়ে থাকতে পারে না। সে একটি দলে যোগ দেয়। এই স্তরে শিশু কিছু কিছু সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করতে সচেষ্ট হয়।

তবে এই স্তরের উল্লেখযোগ্য সামাজিক বৈশিষ্ট্য হ'ল—দল-প্রীতি বা দল-বিশ্বস্ততা। মনোবিজ্ঞানী **পিয়াজেঁর** (Piaget) মতে এই স্তরে শিশুর সমাজ-চেতনার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির বিকাশও ঘটে। সাত আট বছরে শিশু বেশ সামাজিক হয়ে ওঠে। বন্ধু-প্রীতি, দল-প্রীতি, দল-গঠনের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদিই তাকে অনেকাংশে সামাজিক করে গড়ে তোলে। অন্যান্য সকলের মতামত ও দৃষ্টি-ভঙ্গীকে শিশু যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতে শেখে এবং তা সময় সময় এত বেড়ে যায় যে, শিশু পিতা মাতা বা শিক্ষকের মতামতের চেয়ে বন্ধুবান্ধব, দলনেতা বা দলীয় সভ্যের মতামতকেই বেশী মূল্য দেয়। এই বয়সটিকেই বলা হয় **দল-বাঁধার-বয়স** (gang-age)। ম্যাকডুগাল এই দলপ্রীতিকেই বলেছেন যৌথ-প্রবৃত্তি। শিশু তার পরিবারের সীমানা ছাড়িয়ে বৃহত্তর সমাজে তার একটি নির্দিষ্ট স্থান খুঁজে নিতে প্রয়াসী হয়। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা প্রায় বয়স্ক ব্যক্তির মতই সামাজিক আচরণে অভ্যস্ত হয়। শিশু তার নিজের সম্বন্ধে এমন সচেতন হয় যে, পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ-গ্রহণ করতেও সে পশ্চাদপদ হয় না।

বাল্যকালের শিক্ষা (Education in Childhood) **ঃ** বাল্য-কালেই প্রাথমিক শিক্ষার শুরু। কাজেই সে দিক দিয়ে এই স্তরের শিক্ষা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তরের মানসিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিশুর শিক্ষার পরিবেশটি গড়ে তুলতে হবে এবং সেইমত পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করতে হবে। এই স্তরের বৈশিষ্ট্যই হ'ল—সমাজচেতনা। কাজেই এর জন্য সমবেত কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন। শিশু যাতে অসংগত বা অবাঞ্ছিত কোন আচরণ অনুকরণ না করে সে যাতে সমাজবিরোধী বা নীতিবিরোধী আদর্শে উদ্বুদ্ধ না হয়, সেদিকে

শিক্ষক ও পিতামাতাকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুকে সৃজনধর্মী ও গঠনধর্মী কাজে উৎসাহ দিতে হবে। শিশু চায় নিজেকে প্রকাশ করতে। তার জন্য এমন সমস্ত কাজের ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদাটি পরিতৃপ্ত হয়। বিদ্যালয়ে খেলাধুলা, নাচ-গান, আবৃত্তি, অভিনয়, এসব তো থাকবেই, তার পর সমাজসেবা (N. S. S.), জাতীয় সমর শিক্ষণ (N. C. C.), বয়স্কাউট বা গার্লগাইড ইত্যাদির ব্যবস্থাও থাকবে। শিশুর সঞ্চয় প্রবৃত্তিটিকে পরিতৃপ্ত করার জন্য তাকে ডাকটিকিট, দেশপ্রেমিক বা নেতাদের ছবি ও বাণী ইত্যাদি সংগ্রহ করতে উৎসাহ দিতে হবে। নির্ধারিত পাঠসূচীর সঙ্গে সঙ্গে সহপাঠক্রমিক পাঠ্যসূচীরও সুবন্দোবস্ত রাখা উচিত। মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ বা তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা শিশুর নৈতিক আদর্শ গঠনে যথেষ্ট সহায়ক।

এই স্তরে শিশুদের মধ্যে দলপ্রীতি অত্যন্ত বেশী দেখা দেয় এবং দলকে শিশু এত বড় করে দেখে যে, দলের সম্মান রক্ষার জন্য সে এমনকি নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকে। কাজেই শিশুকে দল-বিশ্বস্ততা, সহযোগিতা, সহানুভূতি ইত্যাদি গুণাবলীর সঙ্গে সুপরিচিত করে দিতে হবে। এই স্তরে শিশুরা যাকে বেশী ভালোবাসে বা পছন্দ করে, তাকেই জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে তার কাছে সবচেয়ে বড় আদর্শ হ'ল—শিক্ষক। কাজেই শিক্ষককে তাঁর নিজের বৈশিষ্ট্যগুলি এমনভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা তাঁকেই আদর্শ বলে মেনে নিতে পারে। শিক্ষকের আচরণধারাই শিক্ষার্থীদের আচরণধারাকে প্রভাবিত করবে। তাছাড়া শিশুর মধ্যে আত্ম-প্রত্যয় বা আত্মবিশ্বাস, স্ব-নির্ভরতা, শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য, বিনয় ইত্যাদি সদ্‌গুণ বিকশিত করতে হবে। আর বিকশিত করতে হবে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও প্রীতি সম্বন্ধে মনোভাবের। এই সব শিশুর মধ্যেই শিশুর পিতা ঘুমিয়ে আছেন। এরাই পারবে একদিন সমগ্র বিশ্বকে এক জাতি, এক মন, এক প্রাণ করে গড়ে তুলতে।

কৈশোর বা যৌবনাগমের কাল (Adolescence) : জীবনায়নের পথে বাল্য এবং যৌবনের মধ্যবর্তী দ্রুত পরিবর্তনের কালকে কৈশোর বা যৌবনাগমের কাল বলে অভিহিত করা হয়। কৈশোরের ইংরেজী প্রতিশব্দ "adolescence"টির মূল ল্যাটিন ভাষায় অর্থ হ'ল – 'পরিণত বয়সের দিকে

পদক্ষেপ'। এই স্তরটি হ'ল মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর। দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের বহুমুখী বিকাশের বিচিত্র পরিবর্তনের কাল এটি। এই স্তরেই শিশু বাল্যকাল থেকে যৌবনে, অপরিণত বয়সের স্তর থেকে পরিণত বয়সের স্তরে উন্নীত হ'তে চলে। বয়ঃসন্ধির কালও বলা হয় এটিকে। শিশুর দেহে-মনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে। তার সামনে এক নতুন জগতের প্রবেশদ্বার খুলে যায় যেন। সে বিভিন্ন জাতীয় মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়, সাধারণতঃ তার মানসিক ভারসাম্যটিও হারিয়ে ফেলে। তাদের নিজেদের পরিবর্তন দেখে নিজেরাই কখনও ভয়ে শিউরে উঠে, কখনও বা অকারণ পুলকে রোমাঞ্চিত হয়। এই কালটি সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করেছেন। তার কিছু কিছু এখন আলোচনা করা হ'ল।

(কেউ কেউ এই কালটিকে বলেছেন ঝড়-ঝঞ্ঝা ও উৎকণ্ঠা দ্বন্দ্বের কাল (Storm and Strees, Strain and Strife)। হ্যাডো কমিটির (Hadow Committee) কথা আগেই বলা হয়েছে। এই কমিটি কৈশোর কালের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন এগারো বারো বৎসর বয়সে ছেলেমেয়েদের জীবনে একটা নতুন জোয়ার আসে যাকে বলা হয় কৈশোর। যদি এই জোয়ারের অনুকূলে তাদের জীবন-তরী ঠিক ভাবে পরিচালিত করা হয়, তবে তারা জীবনে ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে। কেউ কেউ এই স্তরটিকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের স্তর (Stage of revolutionary stage) বলেছেন। সাধারণতঃ ১১-১২ বৎসর থেকে প্রায় ২১ বৎসর পর্যন্ত এই কালের বিস্তৃতি। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী এই স্তরটি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। অনেকে বিভিন্ন নামে এই স্তরটিকে চিহ্নিত করেছেন। মনোবিজ্ঞানী স্ট্যান্লী হল্ (Stanley Hall) এই বয়সের মেয়েদের বৈশিষ্ট্য সহজে বোঝাবার জন্ত একটি সুন্দর উপমা ব্যবহার করেছেন—Flapper যার অর্থ হ'ল যে সমস্ত পাখীর পাখার পরিপূর্ণ বিকাশ এখনও হয়নি অথচ তারা বাসার মধ্যে ওড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। কৈশোরকে পরিণত বয়সের দিকে পদক্ষেপ বলে যদি ধরা হয়, তাকে বলা যেতে পারে এটি এমন এক জাতীয় প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজের পক্ষে উপযুক্ত জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় কৌশলগুলি আমরা আয়ত্ত করতে পারি। আবার অনেক মনোবিজ্ঞানী এই

স্তরটিকে নিছক দৈহিক বিকাশের একটি সাধারণ স্তর বা জীবনায়নের পথে একটি সোপান বলে উল্লেখ করেছেন। থর্নডাইক ও কিন্‌সে (Kinsey এই স্তরটিকে জীবনবিকাশের ক্রমবিকাশমূলক স্তর বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্‌সে বলেছেন—বাল্যকাল যে শেষ হ'ল তার প্রমাণ স্বরূপই কৈশোরের আগমন এবং কৈশোর যে আসছে তার ইঙ্গিত বাল্যকালেই পাওয়া যায়। তিনি একটি উপমা ব্যবহার করেছেন যেটিকে ঈষৎ পরিবর্তিত করে আমরা বলতে পারি শীতকাল যেমন বসন্তের অগ্রদূত, বাল্যকালে তেমনি কৈশোরের অগ্রদূত। শীতকাল বসন্তকালকে তার জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে যায় এবং শীতকালেই বসন্তাগমের কিছু কিছু আভাষও আমরা পাই। তেমনি বাল্যকালে পাই যৌবনাগমের আভাষ। অনেকে আবার কৈশোকে যৌন পরিণতির স্তর বলেও উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ আবার এটিকে একটা বিশেষ বয়সের স্তর বলে উল্লেখ করেছেন। হারলক্ (Hurlock, E) ১২ থেকে ২১ বৎসরের কালকে কৈশোর কাল বলেছেন এবং তাকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। ১৩ থেকে ১৬ পর্যন্ত প্রাথমিক কৈশোর এবং ১৭ থেকে ২১ পর্যন্ত প্রান্তীয় কৈশোর। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা কৈশোরের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে। এটি এমন একটি স্তর যে স্তরে ব্যক্তির আচরণকে ঠিক শিশুসুলভ আচরণের ফেলা যায় না আবার বয়স্কদের আচরণের সঙ্গে সমপর্যায়েও ফেলা যায় না। মনোবিদ জরোথী রজার্স ঠিক এই মত পোষণ করেন।

কৈশোর সম্বন্ধে যে সমস্ত বিভিন্নধর্মী মতামত পাওয়া গেল, তাতে কৈশোর বলতে ঠিক কি বোঝায় তা বলা শক্ত। যাই হোক এ বিষয়ে হারলকের মতামতটিই সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কৈশোরকে একটি বিশেষ বয়সের স্তর হিসাবে বিবেচনা করাই যুক্তিযুক্ত। তবে এই কালটির বিস্তৃতি সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা একমত হতে পারেননি এবং কোন নির্দিষ্ট বয়সের গণ্ডীর মধ্যে কৈশোরকে বেঁধে ফেলাও সম্ভব নয়। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সাধারণতঃ মেয়েদের ক্ষেত্রে ১১-১২ বৎসরে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৩-১৪ বৎসরে যৌন পরিণতি (Puberty) লক্ষ্য করা যায়। আবার এই স্তরটি কখন শেষ হচ্ছে তাও সঠিক ভাবে বলা যায় না। কেউ বলেন এই বয়সটি হ'ল —১৮ কেউ বলেন ২১। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি ১৮ বৎসর বয়সে

প্রায় পরিসমাপ্তি লাভ করে থাকে। অন্যান্য কালগুলির মত এই কালটিকেও আবার দু'ভাগে ভাগ করা চলতে পারে। সাধারণতঃ এগারো বা বারো বৎসর বয়স থেকে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত কালটিকে বলা হয় **প্রাথমিক কৈশোর স্তর** (early adolescence) এবং পনর থেকে আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত কালটিকে বলা হয় **প্রান্তীয় কৈশোর স্তর** (Late adolescence)। এখন কৈশোরের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা যাক—

কৈশোরে দৈহিক পরিবর্তন (Physiological characteristics): কৈশোরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক সার্বিক পরিবর্তন দেখা দেয়। ছেলেমেয়েদের দেহে এই সময় আকস্মিক ভাবে এমন কতকগু'ল পরিবর্তন আসে যেগুলি সকলের দৃষ্টি সহজে আকর্ষণ করে। এই পরিবর্তন সম্বন্ধে ছেলেমেয়েরা মোটেই সচেতন থাকে না। আবার অনেক সময় বয়স্করা এই পরিবর্তনকে সহজ ও স্বাভাবিক পরিবর্তন বলে মেনে না নিয়ে অবাঞ্ছিত বলে মনে করেন এবং তাদের উপহাস বা বিদ্রূপ করে থাকেন। ফলে কিশোররা নিজেদের পরিবর্তনকে অবাঞ্ছিত ও অস্বাভাবিক বলে ভাবতে শুরু করে এবং একটি অস্বাচ্ছন্দ্যময় ও অস্বস্তিকর মনোভাব সব সময় তাদের পীড়ন করতে থাকে। তাদের আচরণও সংকোচময় ও আড়ষ্ট হয়ে পড়ে এবং কোন গুরুতর মানসিক আঘাত পেয়ে তারা তীব্র অন্তর্মুখিতার জন্য নিজেদের বাস্তব জগৎ থেকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করে আত্মগোপনতার মাধ্যমে।

এই স্তরে ছেলেমেয়েদের যে সমস্ত দৈহিক পরিবর্তন হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল যৌন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশ। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সাধারণতঃ ১২-১৩ বৎসর বয়সেই মেয়েরা রজঃস্বলা হয়। ছেলেদের মধ্যেও ১৩-১৪ বৎসর বয়সের মধ্যেই বীর্যোৎপাদনের ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়। ছেলে-মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই যৌন-ইন্দ্রিয় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। দেহের মধ্যে কতকগুলি যৌন-চিহ্নও (Secondary Sexual Character) পরিস্ফুট হয়। সাধারণতঃ ১৩-১৪ বৎসর বয়সে ছেলেমেয়ে উভয়েরই যৌন-লোম (Pubic hair) দেখা দেয়। মেয়েদের স্তনোদ্গম হয় এবং ছেলেদের দাড়ি-গোঁফ গজাতে শুরু করে। ছেলেদের শরীরের অন্যান্য অনেক স্থানেও লোমোদ্গম শুরু হয়।

কৈশোরে দেহের সর্বাঙ্গে নানা পরিবর্তন দেখা যায়। শরীরের মাংসপেশী, হাড়, রসক্ষরা গ্রন্থি, মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্র প্রভৃতিরও পরিবর্তন হয়। শরীরের ওজন ও

উচ্চতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তবে এই দৈর্ঘ্য ও ওজন কিন্তু সমান অনুপাতে বাড়ে না। ফলে কিশোরকে অনেক সময় অস্বাভাবিক লম্বা বা ঢ্যাঙা—ফলে কিছুটা রোগা বলে মনে হয়, হাত-পা বেশ লম্বা হয়ে যায়। তবে মেয়েদের বৃদ্ধি ছেলেদের তুলনায় কিছুটা বেশী থাকে। অনেকে মনে করেন, দৈহিক বিকাশের দিকে এই বয়সে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে এক বৎসর এগিয়ে থাকে। এই বয়সে দৈহিক বৃদ্ধির হার অত্যন্ত দ্রুত হয় বলে এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একই হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না বলে কিশোর কিশোরীদের মধ্যে দৈহিক সঞ্চালনের দিকে কিছুটা অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। তবে ১৫ বৎসর বয়সের পর দৈহিক বৃদ্ধির হার কিছু কমে যায়। হঠাৎ পরিবর্তনের জন্য কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যে চঞ্চলতা দেখা দিয়েছিল তা এবার স্তিমিত হয়ে আসে। কৈশোর স্তরের শেষ দিকে দৈহিক বৃদ্ধি অর্থাৎ উচ্চতা থেমে যায়। ১৫-১৮ বৎসরের মধ্যে উচ্চতার দিকে ছেলেরা কিন্তু মেয়েদের চেয়ে এগিয়ে যায়। দৈর্ঘ্য ও ওজনে তারা মেয়েদের ছাপিয়ে যায় এবং এই পার্থক্য সাধারণতঃ সারাজীবন ধরে বর্তমান থাকে। দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির মধ্যে এবার একটা সামঞ্জস্য আসে। ছেলেদের কাঁধ ও বুক বেশ চওড়া হয় এবং বুকেও লোম গজায়। কৈশোরে দৈহিক পরিবর্তনের জন্য ছেলেমেয়ে উভয়েই বিশেষতঃ মেয়েরা অত্যন্ত সংকোচ বোধ করে। কিন্তু ১৭-১৮ বৎসর বয়সে তারা এই পরিবর্তনকে অনেকটা স্বাভাবিক বলে মেনে নেয় এবং সংকোচ কাটিয়ে ওঠে। ছেলেদের শরীর বেশ শক্ত সবল হতে শুরু করে এবং মেয়েদের মধ্যে একটা নমনীয় বা কমনীয় ভাব বা একটা পেলবতা লক্ষ্য করা যায়। ছেলেমেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই মুখে বেশ ব্রণ উঠতে থাকে। মেয়েরা চেষ্টা করে নিজেদের আরো সুন্দর, আরো কমনীয় করে তুলতে। ছেলেদের মুখের উপর একটা কাঠিন্যের ভাব আসে, চোয়ালের হাড়ও বেশ দৃঢ় হয়, মুখের মাংসও দৃঢ় ও চকচকে হয়। তাছাড়া রক্ত সঞ্চালন, শ্বাস-প্রশ্বাস ও পাকস্থলীর কর্মক্ষমতা ও শক্তিও বেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ছেলেমেয়েদের কণ্ঠস্বরের মধ্যেও বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ছেলেদের স্বরনালীর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় বলে তাদের কণ্ঠস্বর বেশ কর্কশ ও ভারী হয়। কিন্তু মেয়েদের কণ্ঠস্বর হয় মিহি ও তীক্ষ্ণ। যৌন অঙ্গের বিকাশ এই সময় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কৈশোরে ছেলেমেয়েদের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির পরিবর্তনের জন্য যৌনগ্রন্থি নিয়মিত ভাবে কাজ

করে। এর ফলে দেহে যৌন হর্মোন নিঃসৃত হয় এবং যৌন অংশ ও দেহের পরিবর্তন হয়। ফলে তাদের জীবনে যৌন-পরিণতি (Puberty) দেখা দেয়। এই স্তরেই ছেলেরা পুরুষে এবং মেয়েরা নারীতে পরিণত হয়। সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। এই স্তরে এসে লিবিডো (Libido) তার শেষ স্বাভাবিক আশ্রয়স্থলটি খুঁজে পায় এবং তার পথ পরিক্রমাটিও শেষ হয়। ছেলেমেয়ে উভয়েই পরনির্ভরতার বন্ধন ছিন্ন করে স্বাধীন ও স্ব-নির্ভর ভাবে জীবন যাপন করার ক্ষমতা অর্জন করে এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করার অধিকার অর্জন করে।

মানসিক পরিবর্তন (Mental Characteristics): এই স্তরে দৈহিক বিকাশ যতটা দ্রুত হয়, মানসিক বিকাশ কিন্তু তত দ্রুত হয় না। এতদিন পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ যে হারে হয়ে আসছিল তাতে যেন কিছুটা ভাঁটা পড়ে যায়। অনেকে আবার এই কালটিকেই বুদ্ধির চরম বিকাশের কাল বলে অভিহিত করেছেন। তবে সকল মনোবিজ্ঞানীই এ বিষয়ে একমত নন। দৈহিক বিকাশের সঙ্গে বুদ্ধির বিকাশের খুব স্পষ্ট কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। দুর্বল দেহধারী ব্যক্তির মধ্যে যে রকম বুদ্ধির বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, সুস্থ ও পূর্ণ বিকশিত দেহধারী বা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধির বিকাশের অসম্পূর্ণতাও তেমনি লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা আবার বুদ্ধির বিকাশের একটি চরম সীমা আছে বলে মনে করেন এবং ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ ঘটে বলে মনে করেন। কিন্তু কৈশোর তো আর ১৮ বছরেই শেষ হয়ে যায় না; ২০-২১ বয়স পর্যন্ত চলে। যাই হোক কৈশোরকে বুদ্ধির বিকাশের চরম কাল বলতে না পারলেও এই সময়টি যে বুদ্ধি বিকাশের প্রশস্ত ক্ষেত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই সময় ছেলে-মেয়েদের মনে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ও আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। ফলে তাদের মধ্যে স্মরণ-শক্তি, মনোযোগ দান, নতুন জ্ঞান অর্জন, ভাষা-শিখন ইত্যাদি ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাদের ধারণার (concept) বিকাশ যথেষ্ট পরিমাণে হয়। কোন বস্তুর তাৎপর্য সে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করতে শেখে এবং বিভিন্ন জাতীয় বস্তু সম্বন্ধে সে একটা সাধারণ ও সামগ্রিক ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। তবে এই বয়সে প্রধান মানসিক পরিবর্তনটি ঘটে কিশোর-কিশোরীদের অনুভূতির রাজ্যে। তাদের দৈহিক পরিবর্তন, ইন্দ্রিয়গুলির

পরিপূর্ণতা এবং সর্বোপরি যৌন পরিণতি তাদের মানসিক জীবনে একটা আলোড়ন ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানী হলিংওয়ার্থ (Hollingworth) বলেছেন যে, এই বয়সে ব্যক্তি নানাপ্রকার কৌতূহল, অনুভূতি, ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষার তাড়না অনুভব করে, সব রকম কাজে সাহস ও বীরত্ব দেখাবার চেষ্টা করে এবং বড়দের বিরক্তিকর শাসনের প্রতি কিছুটা অবহেলা বা অবজ্ঞার ভাব পোষণ করে। এদের অনুরাগের ক্ষেত্র কিছুটা সংকুচিত হয়ে যায়। বলা যেতে পারে অনুরাগটি বিশেষ বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে আরম্ভ করে। যা কিছু দেখে, সব কিছুতেই আর আগ্রহ প্রকাশ করে না। ছেলেরা বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু, ভ্রমণকাহিনী বা রহস্য উপন্যাস জাতীয় গ্রন্থের দিকে আগ্রহ দেখায়। চিন্তাশক্তিও যথেষ্ট বিকশিত হয় বলে তাদের পক্ষে সমস্যার সমাধান করা সহজ হয়। তারা যুক্তি প্রয়োগ করতে শেখে এবং তাদের বিভিন্ন আচরণকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। অবশ্য তাদের দেওয়া যুক্তি সব সময় গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না, তা হলেও এই প্রবণতাই তাদের পরবর্তী স্তরের আচরণগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিমূর্ত চিন্তনের (abstract thinking) ক্ষমতাটিও এই বয়সে তাদের মধ্যে পরিস্ফুট হয়।

কৈশোরে যৌন পরিণতি কিশোর কিশোরীদের আবেগমূলক জীবনে একটা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাদের যৌন চেতনা, প্রক্ষোভ ও আচরণের ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন আনে। যৌন-চেতনা যে কেবলমাত্র এই কালটিতেই জেগে ওঠে, তা নয়। লিবিডোর অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, শিশুর শৈশবেই এই যৌন চেতনাটি দেখা দেয়। তবে তা থাকে আত্ম-রতিমূলক। কিন্তু প্রধানতঃ নিজের দেহকে আশ্রয় করেই যৌনতৃপ্তি লাভ করে। বাল্যকালে আবার এটি সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং শিশু সমলিঙ্গবিশিষ্ট শিশুদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে এবং মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে। কিন্তু কৈশোরে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এই স্তরে ছেলে-মেয়েরা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। ছেলেরা মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েরা ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। এই আকর্ষণ মূলতঃ যৌন-আকর্ষণ। অবশ্য যৌন-আকর্ষণ বলতে যৌন-চাহিদা বা প্রজননমূলক

যৌন-তৃপ্তি নয়। যৌন-কৌতূহলই বড় কথা। যৌন-ঘটিত পরিবর্তনগুলি ও যৌন-চেতনা তাদের দেহ-মনে এক অনাস্বাদিত পুলক সঞ্চারিত করে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা প্রেম বা প্রণয়মূলক অনুভূতি লক্ষ্য করা যায় যদিও গভীর ভাবসমৃদ্ধ প্রেমের ঘটনাও বিরল নয়। তবে এই প্রেম বা প্রণয়ের ক্ষেত্রেও তাদের যৌন-কৌতূহলই প্রধান—যৌন পরিতৃপ্তিটি নয়।

কৈশোরের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল—অবাস্তব কল্পনা ও দিবাস্বপ্ন। এই স্তরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় চাহিদার সৃষ্টি হয়। নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার, কোন কিছু সৃষ্টি করার, সব কাজে দক্ষতা ও বীরত্ব দেখাবার বা সকলের প্রশংসা অর্জন করার একটা প্রবণতা তাদের মধ্যে দেখা যায়। তার উপর বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণও রয়েছে। এর সবগুলি তো আর বাস্তবে সম্ভব হয় না, ফলে তাদের পরিতৃপ্তি ঘটে না। তখন তারা কল্পনা ও দিবাস্বপ্নের মাধ্যমে পরিতৃপ্তি লাভ করার চেষ্টা করে। এদের দিবাস্বপ্নগুলি বিশ্লেষণ করলে দু'রকমের স্বপ্ন পাওয়া যায়। এক জাতীয় হ'ল **আত্মপ্রতিষ্ঠা বা আত্মগৌরবমূলক**, আর অন্যটি হ'ল **প্রণয়মূলক**। প্রথম জাতীয় দিবা-স্বপ্নের ক্ষেত্রে তারা স্বপ্ন দেখে পড়াশুনায় বা খেলাধূলায় তারা প্রথম হচ্ছে, অসম সাহসিকতার কাজ করছে, দারুণ বীরত্ব প্রদর্শন করছে ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তারা দিবাস্বপ্নের মাধ্যমে ঈপ্সীত প্রণয়ী বা প্রণয়িনীকে লাভ করে। এই স্তরে দিবাস্বপ্নের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তাও আছে। এই দিবাস্বপ্ন-গুলি সাধারণতঃ তীব্র প্রক্ষোভে নিষিক্ত থাকে এবং এগুলির সাহায্যে তারা তাদের অতৃপ্ত প্রক্ষোভগুলির তৃপ্তি সাধন করে। ফলে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ও প্রাক্ষোভিক সাম্য বজায় থাকে। কিন্তু এগুলি মাত্রাতিরিক্ত হলেই ছেলে-মেয়েদের সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে একটা বাধার সৃষ্টি হয়। অবশ্য মনো-বিজ্ঞানী রুস্ (Roos) একথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেছেন—এই বয়সে দিবাস্বপ্ন বা কল্পনাবিলাস চলে যায় এবং তারা বাস্তবকে সহজভাবে মেনে নিতে শেখে। আঠারো বৎসর বয়সের একজন কিশোরকে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে রুসের মন্তব্য আরো বহু মনোবিজ্ঞানী সমর্থন করেন না। এই স্তরে দয়া, মায়া, সততা ইত্যাদি সদ্‌গুণের বিকাশ ঘটে।

প্রাক্ষোভিক পরিবর্তন (Emotional Characteristics):

প্রক্ষোভমূলক বৈশিষ্ট্যের দিকে কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে অন্যান্য বয়সের ছেলেমেয়েদের একটা বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তাদের প্রাক্ষোভিক জগতে যেন একটা বিপ্লবের ঝড় বয়ে যায়। আকস্মিক দৈহিক পরিবর্তন, মানসিক শক্তির পরিপূর্ণতা, যৌন-পরিণতি, বাইরের জগতের বিভিন্ন জাতীয় প্রতিক্রিয়া—এ সমস্ত একসঙ্গে মিলিত হয়ে কিশোর-কিশোরীদের মনে একটা দারুণ বিপ্লবের ও আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং তার এতদিনের গড়া প্রাক্ষোভিক জগৎটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। (তার নিজের বহুমুখী পরিপূর্ণতা একদিকে যেমন তাকে আনন্দে উদ্বেলিত করে, তেমনই তার সামর্থ্য ও প্রয়োজনের প্রতি বড়দের তাচ্ছিল্য ও উদাসীন্য তাকে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করে তোলে। এর জন্য বেশীর ভাগ কিশোর-কিশোরীই অন্তর্মুখী (Introvert) ও আত্ম-কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। এই আত্মকেন্দ্রিকতা থেকেই আবার তাদের মনে হীনমন্যতার বোধ জাগ্রত হয়।

কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আত্মসচেতনা বেশ প্রবল আকার ধারণ করে। তারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে সব সময় সচেতন থাকে। এর জন্যই তারা সব ব্যাপারে নিজেদের প্রাধান্য ও স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। মেয়েরা যেমন সাজগোজ, প্রসাধন, কথাবার্তা ইত্যাদির ব্যাপারে মহা ব্যস্ত হয়ে ওঠে, ছেলেরাও তেমন চুলের কায়দা, রঙীন ছাপ-ওয়ালা জামা, কথাবার্তা, মেলামেলা ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের বৈশিষ্ট্যটি দেখাতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

কিশোর কিশোরীরা অনুভূতির দিক থেকে অত্যন্ত ভাবালু ও আবেগ প্রবণ হয়ে ওঠে। তাদের প্রাক্ষোভিক জীবনে একটা দারুণ অস্থিরতাও দেখা দেয়। কখনও কখনও প্রক্ষোভমূলক আচরণের বহিঃপ্রকাশ অত্যন্ত বেশী হয়, আবার কখনও কখনও একেবারে হয় না। কখনও তারা অত্যন্ত তীব্রভাবে আনন্দ প্রকাশ করে, আবার কখনও বা অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ে। অবহেলা-জনক বা তাচ্ছিল্যকর সামান্যতম মন্তব্যেই তারা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। আবার এদের মধ্যে লজ্জা, অপরাধবোধ বা ভয়ের প্রক্ষোভ যৌন-কৌতূহলের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে।

কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বও এই বয়সের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিশোর-কিশোরীরা বয়স্কদের দ্বারা কখনও 'ছেলেমানুষ' হিসেবে আবার

কখনও বা 'বয়স্ক' হিসেবে বিবেচিত হয়। আবার কখনও তারা বয়স্কদের কাছাকাছি গেলে বড়রা 'পাকা বা জ্যাঠা' ছেলে বলে তাদের সরিয়ে দেন, আবার এরা ছোটদের নিকটে গেলে ঐ বয়স্করাই বলবেন—'শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকেছে!' তাহ'লে এরা যায় কোথা? এর জন্যই সৃষ্টি হয়েছে অন্তর্দ্বন্দ্বের। যাই হোক কিশোর-কিশোরীরা কতকগুলি আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং মনে মনে কোন বীরের আদর্শ অনুসরণ করে। একেই বলে বীর পূজা। এদের মধ্যে কতকগুলি বিমূর্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে সেন্টিমেন্ট গড়ে ওঠে। নৈতিক সেন্টিমেন্টটিও এই স্তরে বিকশিত হয়। শৈশবের মত কৈশোরেও প্রাক্ষোভিক জীবনের চঞ্চলতা লক্ষ্য করেই আর্নেষ্ট জোন্স কৈশোরকে শৈশবের পুনরাবৃত্তি বলে উল্লেখ করেছেন।

মনোবিজ্ঞানী **স্ট্যানলী হল্** (Stanley Hall) তাঁর Adolescence গ্রন্থে কৈশোরকে ঝটিকা ও ঝঞ্ঝার, পীড়ন ও কষ্টের কাল বলে উল্লেখ করেছেন (Stress and Strain, Strife and Strain)। তিনি এদের দেহ মনে যে পরিবর্তন ও আলোড়নের উদ্ভব হয়, তা লক্ষ্য করেই এ কথা বলেছেন। কিশোর-কিশোরীদের প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। তা হ'ল—**নিপীড়নমূলক মনোভাব** (Persecution mentality)। কিশোর-কিশোরীরা সাধারণতঃ আত্ম-কেন্দ্রিক ও আবেগপ্রবণ থাকে। কিন্তু সে মাঝে মাঝে এটাও অনুভব করে যে সমাজ বা পরিবার তাকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করছে। এর থেকেই ঐ মনোভাবের উদ্ভব। আর এটি প্রকাশিত হয় ক্ষোভের আকারে প্রচলিত রীতি, নীতি, প্রথা, অনুশাসন, নিয়ম-কানুন ইত্যাদির বিরুদ্ধে ক্ষোভ, বিপ্লব বা জেহাদের আকারে। সে তখন সব কিছু ভাঙতে চায়, ধ্বংস করতে চায়। তার এই যে ক্ষোভ—এটা আর কিছু নয়, নতুন ভাব, নতুন প্রক্ষোভ বা নতুন আবেগের নবতম সূচনার একটা যন্ত্রণা; ধ্বংসের মধ্যে সে চায় নতুন করে সৃষ্টি করতে! পুরাতন ধারণার সঙ্গে নবীন ভাবনার এ সংঘাত! এ দিক দিয়ে সত্যই এটি ঝটিকাবিক্ষুব্ধ পীড়ন ও কষ্টের কাল। তবে কেবলমাত্র পীড়ন ও কষ্টের কাল বললে একটু অতিশয়োক্তি করা হয়। কৈশোরে এদের দেহ-মনে একটা প্রচণ্ড বন্যা আসে ঠিকই, তবে সেটা কেবলমাত্র বিধ্বংসী বন্যাই নয়। এই বন্যাই এদের সর্বতোমুখী জীবনবিকাশকে সম্ভব করে তোলে, তাদের

জীবনকে রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শে সমৃদ্ধ করে তোলে। এই 'কষ্ট ও নিপীড়ন' তাদের বৃহত্তর জীবনকে লাভ করার বলিষ্ঠ সংগ্রামের একটা পদক্ষেপ মাত্র।

সামাজিক পরিবর্তন (Social Characteristics): সামাজিক দিক থেকে বিচার করলে কিশোর-কিশোরীদের বেশ অসামাজিক বলেই মনে হবে। আকস্মিক দৈহিক পরিবর্তন এদের বিহ্বল করে তোলে এবং তাদের একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলে। তারা চায় তাদের দৈহিক বিকাশকে সকলের চোখ থেকে লুকিয়ে রাখতে। তারা ভাবে, এ পরিবর্তন কেবলমাত্র তারই হয়েছে, তাদের সমবয়সীদের হয়নি! এর জন্যই আত্মগোপন। আবার শৈশবের কিছু কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্য এই স্তরে লক্ষ্য করা যায়। এরা আবার মা-বাবার প্রতি অনুরক্ত ও তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কৈশোর স্তরের শেষ দিকে দলপ্রীতি আবার বেশ তীব্র আকারে দেখা দেয়। দলের মধ্যে তারা নিজেদের অস্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠা কায়েম করতে চায় এবং তার জন্য দলের নিকট নিজেদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাগুলি বিসর্জন দেয়। এই স্তরে তাদের আচরণের নিয়ন্ত্রণে মা-বাবার চেয়েও দলের প্রভাব বেশী। ছেলেমেয়েরা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মেলামেশা করতে আগ্রহী হয়। তবে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে একটু বেশী লাজুক হয়। অবশ্য কেবল বিপরীত লিঙ্গের প্রতিই নয়-এ বয়সে ছেলেমেয়েরা বাইরের জগতের প্রতি, সমাজের প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে। সে সমাজের শৃঙ্খলা, অনুশাসন ও মূল্যবোধের (values) সম্মুখীন হয় এবং সেগুলির সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করতে শেখে। তবে সে একেবারে যান্ত্রিক ভাবে বা একান্ত অনুগত ছাত্রের মত এগুলি মেনে নেয় না। তার নিজস্ব আদর্শ ও নীতিবোধ অনুসারে সমাজের নতুন একটা রূপ দেবার চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে বাউলির (Bowley) অভিমত হ'ল—কৈশোরে তরুণদের সঙ্গে বাস করা একটা শক্ত ব্যাপার, তারা চিন্তাশীল তবে অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, অন্যের দোষক্রটি ধরতে ব্যগ্র এবং বাচাল।

কিশোর-কিশোরী একটু দুঃসাহসী হয়ে থাকে। বীরপূজা, দলপ্রীতি, বন্ধুপ্রীতি এ সবের উপর একটা গভীর বিশ্বাস এবং গৃহের বন্ধন ছিন্ন করার একটা মনোভাব—এই দুটি মিলিত হয়ে তাকে দুঃসাহসের প্রেরণা যোগায়। সে সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, প্রচলিত প্রথা ও পরিবেশকে অতিক্রম করতে চায়। এই বীরপূজা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা দরকার। কিশোর-

কিশোরীরা সাধারণতঃ তাদের সামনে কোন একজন ব্যক্তিকে (বীরকে) আদর্শ হিসাবে খাড়া করে তারই পূজা করে—তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হবার চেষ্টা করে। এই বীর কোন পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক চরিত্র, কোন সমাজসেবী, রাজনৈতিক নেতা যেমন হতে পারেন, তেমনি কোন বক্স-অফিস হিট্ করা সিনেমাভিনেতা বা অভিনেত্রীও হতে পারেন। সাধারণতঃ ছেলেরা এই বীরপূজার ক্ষেত্রে সংযম ও শিষ্টাচারের পরিচয় দিয়ে থাকে। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে এই সংযম ও শিষ্টাচারের কিছুটা অভাব লক্ষ্য করা যায়—বিশেষতঃ যখন তারা কোন ফিল্মী নায়িকাকে তাদের Hero (ine) হিসেবে পূজা করে।

সামাজিক বৈশিষ্ট্যের আর একটি দিক হ'ল—মানবতা-বোধ ও জনকল্যাণ-মূলক কাজে আত্মনিয়োগ। কিশোর-কিশোরীরা সাধারণতঃ একটু বেশী-মাত্রায় পরোপকারী হয়ে থাকে এবং কোন জনকল্যাণমূলক কাজে আত্ম-নিয়োগ করতে অত্যন্ত ভালোবাসে। মানুষকে ভালবাসা, দরিদ্রকে সাহায্য করা রুগ্ন ও পীড়িতের সাহায্য করা ইত্যাদি ব্যাপারে কিশোর-কিশোরীরাই বেশী করে এগিয়ে আসেন—যার থেকে বোঝা যায় এই স্তরে সামাজিক বিকাশটি যথেষ্ট উন্নত স্তরে গিয়েই উপনীত হয়েছে। সম আদর্শবিশিষ্ট ও সমমনোভাবাপন্ন কিশোর-কিশোরীরা দল বাঁধতে চায়। যূথবদ্ধতার প্রবৃত্তিটি এই স্তরে বেশ তীব্র থাকে। এই স্তরে যে দলটি গঠিত হয়, তা কিন্তু মোটামুটি দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। তবে বাল্যকালের দলগুলি তখন ভেঙে যায় এবং কিশোর-কিশোরীরা বাল্যের অনেক বন্ধুকে পরিত্যাগ করেও থাকে।

কৈশোরের চাহিদা (Needs of the Adolescents) : বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী, বিশেষতঃ ষ্ট্যান্‌লী হল, হলিংওয়ার্থ প্রভৃতি কৈশোরের বিভিন্ন চাহিদা ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁরা যে সমস্ত চাহিদা ও সমস্যার সন্ধান পেয়েছেন, তার ওপর ভিত্তি করে কতকগুলি প্রধান প্রধান চাহিদা ও সমস্যার কথা আলোচনা করা হ'ল।

[এক] স্বাধীনতার ও সক্রিয়তার চাহিদা : কৈশোরে ছেলেমেয়েদের মনে একটা প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। নিজের দায়িত্ব বহন করার, নিজের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে দেখা দেয়। তারা আর অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকতে চায় না। বয়স্কদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কাজ করতেই চায়। কিন্তু মা, বাবা,

শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলেই এই মনোভাবকে ভালো চোখে দেখেন না, ফলে দমন করতে চান। তাদের স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ করাটিকে অকালপক্কতা বলে মনে করা হয়। তাদের সক্রিয়তাকেও যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয় না। এদের স্বাধীন ও সক্রিয় আচরণকে সমর্থন জানাতে হবে। তাদের জীবনে শৃঙ্খলা থাকবে ঠিকই, তবে তা হবে অন্তর্জাত শৃঙ্খলা, বহির্জাত বা আরোপিত নয়। স্বাধীনতার অর্থ তো উচ্ছৃঙ্খলতাবোধের অভাব নয়।

[দুই] **সামাজিক চাহিদা:** কিশোরদের সমাজ চেতনা বেশ গভীর হয়। তাদের আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধ তাকে শৈশবের মত স্বার্থকেন্দ্রিক করে তোলে না। বরং তাকে সামাজিক জীবন যাপনের প্রতি অনুরাগী ও আগ্রহী করে তোলে। সে তখন তার দোসর যে জন—তাকেই খুঁজে। তার নিজস্ব স্বাধীন চিন্তাধারা তাকে সঙ্গীসাথী নির্বাচন করে তাদের সঙ্গে মেলামেশাতে উদ্বুদ্ধ করে। এক সীমাহারা বাধাবন্ধহীন বৃহত্তর পৃথিবীর আমন্ত্রণ লিপি তাকে বাইরের দিকে টানে। সুদূরের আহ্বানে সে সাড়া দেয়। অপরিচিত, অচেনা মুখের ভীড়ে সে নিজের জায়গা করে নেয়, পরকে আপন করে নেয়। এই সামাজিক চাহিদার জন্য আমরা তাদের মধ্যে দু' ধরনের আচরণ-ধারা লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ এরা সমবয়সী বা সমভাবাপন্নদের সঙ্গে এক সাথে দল গড়তে চায়। এরই ফলে দেখা যায় কত ক্লাব, সংগঠন, যাত্রা বা থিয়েটারের দল, সংঘ ইত্যাদি গড়ে উঠতে। এই চাহিদাই তো সমাজ-জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার চাহিদা। দ্বিতীয়তঃ—এরা যে দল বা সংঘ গঠন করে, বয়স্কদের নিকট থেকে তার স্বীকৃতি চায়। এটি হ'ল কিশোর-কিশোরীদের সামাজিক স্বীকৃতির চাহিদা। তারাও যে সমাজের একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ—এ স্বীকৃতিটুকু তারা চায় বড়দের কাছে—বৃহত্তর সমাজের কাছে।

[তিন] **আত্মনির্ভরতার চাহিদা:** কিশোর-কিশোরীরা সব সময় নিজেদের প্রকাশ করতে চায়। পড়াশুনা, খেলাধুলা বা অন্যান্য নানাপ্রকার কাজের মাধ্যমে তারা আত্মপ্রকাশ করতে চায়। এই আত্মপ্রকাশের চাহিদা থেকেই তাদের মধ্যে আত্মনির্ভর চাহিদাটি দেখা দেয়। তারা স্ব-নির্ভর হ'তে চায়—নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। অনেকে এটিকে বৃত্তির (vocation) চাহিদা

বলে মনে করেন। স্বাধীনভাবে উপার্জন করে সমাজে নিজের জন্য একটি স্থান নির্দিষ্ট করার চিন্তা কিশোর-কিশোরীদের মনে উদিত হয়ে থাকে।

[চার] **আত্ম-অভিব্যক্তির চাহিদা :** কৈশোরের প্রাক্ষোভিক তৃপ্তি প্রধানতঃ নিজেকে অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত করার মধ্য দিয়েই সাধিত হয়। কিশোর-কিশোরীরা সমাজের নিকট হ'তে নিজেদের মূল্য আদায় করে নিতে চায়, যাচাই করে নিতে চায়। এর জন্য তারা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। কেউ পড়াশুনাতে, কেউ বা খেলাধূলাতে, কেউ বা নাটক-অভিনয়ে ইত্যাদি-নানাভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। আবার কেউ কেউ সাজপোশাক, কথাবার্তা, চাল-চলন ইত্যাদির মাধ্যমেও নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। প্রত্যেকেরই চেষ্টা সকলে তাকে দেখুক, বুঝুক, তার গুরুত্ব উপলব্ধি করুক।

[পাঁচ] **নিরাপত্তার চাহিদা :** কৈশোরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাধীনতার চাহিদাটি যেমন দেখা, তেমনি এর বিপরীত একটি চাহিদা—নিরাপত্তার চাহিদাও দেখা দেয়। কৈশোরে এদের মনে নানাপ্রকার আশা, আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়, যেমন—তেমনি আরো হাজার প্রশ্ন ও সমস্যা এদের মনে ভীড় করে। বয়স্কদের আচরণই এদের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। বয়স্করা কখনও এদের সঙ্গে ছেলেমানুষের মত ব্যবহার করেন—আবার কখনও ভাবেন—ওরা বুঝি বয়স্ক। কিশোর-কিশোরীরা বুঝতে পারে না—তারা ছেলেমানুষ, না বয়স্ক! তারা সবসময় তাদের আচরণের জন্য তিরস্কৃত হইতে পারে, এই রকম একটা ভয় করে। নিজেদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত বলেই তারা মনে করে। ফলে তারা বয়স্ক ব্যক্তিদের বিশেষতঃ মা, বাবাকে এড়িয়ে চলে। টাকা-পয়সার দিকে সে মোটেই স্ব-নির্ভর নয়। কাজেই একটা ভয় থাকে পাছে কোন আচরণের জন্য বাবার হোটেলের সীটটা খোয়াতে হয়! অর্থনৈতিক ও মানসিক কারণের জন্যই নিরাপত্তার চাহিদাটি জাগ্রত হয়।

[ছয়] **নতুন জ্ঞানের চাহিদা :** কিশোর-কিশোরীদের মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি কৈশোরে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের মানসিক শক্তিগুলিও পরিপূর্ণতা লাভ করে। এদের কৌতূহল এই সময় তীব্রতম রূপ ধারণ করে এবং তারা নতুন জ্ঞান অর্জন করার একটা চাহিদা অনুভব করে। তাছাড়া এদের পরিচয়ের গণ্ডীটি আস্তে আস্তে বাড়ে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস,

সমাজবিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের দিকে তারা আকৃষ্ট হয়। এই জাতীয় বিভিন্ন সমস্যার সমাধান তারা নিজে নিজেই করতে চায়। এর জন্য তারা নিজেদের 'অন্তর থেকেই একটা সাড়া' পায়। এটিই হ'ল নতুন জ্ঞানের চাহিদা।

[সাত] **দুঃসাহসিকতার চাহিদা :** কিশোর-কিশোরীরা সাধারণত এ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় হয়ে থাকে। দুঃসাহসিক অভিযানে দুর্গম পথের যাত্রী হয়ে তারা বেরিয়ে পড়তে চায়। উত্তরমেরু তাদের ডাকে, দক্ষিণ মেরু তাদের টানে, ঝটিকার মেঘ তাদের কটাক্ষ হানে। স্বাভাবিক কারণেই শান্ত গৃহকোণ তাদের নিকট আকর্ষণহীন বলে মনে হয়। এই সময় এরা এমন ঝুঁকি নেয় যা বয়স্ক বা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ বিবেচনা বা চিন্তা করলে এড়িয়ে চলত। এর ফলে এদের অনেক সময় বেশ বিপদের সম্মুখীনও হতে হ'য়— আবার অনেক সময় কিছুটা অপরাধও এরা করে ফেলে।

[আট] **নীতিবোধের চাহিদা :** কিশোর কিশোরীরা ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি সম্বন্ধে চিন্তা করতে শেখে। তাদের মধ্যে একটা নীতিবোধও জাগ্রত হয়। তাদের সামনে কতকগুলি প্রতিষ্ঠিত আদর্শও থাকে। তারা নিজেদের কাজ এবং সমাজের অন্যান্যদের কাজ এই নীতিবোধ ও আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে। তারা সবকিছু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে দেখে। এই বিশ্লেষণে যদি তারা দেখে—তাদের কৃত কোন কাজ নীতিবোধের বিরোধী হয়ে গেছে, তাহ'লে তারা মনোকষ্ট পায় এবং একটা অপরাধবোধের অনুভূতি তাদের মধ্যে দেখা দেয়।

[নয়] **যৌন তৃপ্তির চাহিদা :** কৈশোরে প্রত্যেকের মধ্যেই একটা যৌনবোধ জাগে। শৈশবে এই যৌনতা নিজের দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু কৈশোরে যৌনবোধ পরিপূর্ণ আকারে প্রকাশিত হয় এবং দেহ-মন যৌন আচরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। তখন ছেলেমেয়েরা প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর চিন্তা করতে ভালোবাসে। সে চায় তার সঙ্গী বা সঙ্গিনীর উপস্থিতি ও সান্নিধ্য। অনেক মনোবিজ্ঞানী বলেন—যৌন চাহিদাই যৌন আচরণমূলক নয়। কিশোর-কিশোরীদের মনে যৌন কৌতূহল থাকে বটে, কিন্তু তা যৌন আচরণমূলক নয়। যৌন-বিষয় ও যৌনরহস্য জানার একটা অত্যুগ্র কৌতূহল এদের মনে জাগে। কিন্তু 'নিষিদ্ধ ফলের' মত যৌন-শিক্ষা এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে 'নিষিদ্ধ কথা'। এ ব্যাপারে সর্বত্র একটা চুপ

চুপ করাব। ছোট থেকেই আমরা শিখিয়ে দিই—যৌন কৌতূহল প্রকাশ করা পাপ। যৌন-বিষয়ক বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অর্জন করে সমাজের সুযোগ্য নাগরিক হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার চাহিদাটিই যৌন-তৃপ্তির চাহিদার আকারে প্রকাশিত হয়।

[দশ] **জীবন-দর্শনের চাহিদা**: কিশোর-কিশোরীদের মনে নৈতিক চাহিদাটি বিকশিত হবার ফলে জীবন-দর্শনের একটি চাহিদাও তাদের মধ্যে দেখা দেয়। তাদের মনে জীবন সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন জাগে। জীবন ও জগতের রহস্যটি সে জানতে চায়। দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের ফলে তার মনে যে সংঘাত বা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তার জন্যই তারা জীবন ও জগতের রহস্যটি উপলব্ধি করতে চায়। তাছাড়া এদের অহং-সত্তাটি (Ego or Self) বিকশিত হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সেন্টিমেন্টও গড়ে উঠেছে। এই অহং-সত্তা ও সেন্টিমেন্টকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে যে সমস্ত প্রবণতা বিকশিত হয়, সেইগুলির পরিতৃপ্তির জন্য তারা নতুন জীবন-দর্শন গড়ে তোলে। প্রত্যেকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে জীবন সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে তোলে।

কৈশোরের সমস্যা (Problems of Adolescents): এতক্ষণ ধরে যে সমস্ত চাহিদার কথা বলা হ'ল, সেগুলি ছাড়াও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আরো কতকগুলি চাহিদা দেখা দেয়। এই সমস্ত চাহিদা স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু ভাবে তৃপ্ত হ'লে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যটিও অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাহিদাগুলি ঠিকমত তৃপ্ত হয় না। তখনই তাদের মধ্যে নানাপ্রকার সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যাগুলি তাদের মানসিক ভারসাম্যটি নষ্ট করে এবং তাদের আচরণ-ধারাটিও ঠিকমত প্রবাহিত হয় না। এই সমস্ত সমস্যার সমাধান খুঁজে না পাওয়ার জন্য তাদের জীবন বিকাশের ধারাটির অগ্রগতি যথেষ্ট পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এখন বিভিন্ন চাহিদার অপূর্ণতার জন্য তাদের মধ্যে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দেয়, সেগুলির কথা আলোচনা করা যাক—

[এক] **স্বাধীনতা ও সক্রিয়তার চাহিদার সমস্যা**: কিশোর-কিশোরীদের মুক্ত স্বাধীনতা ও সক্রিয়তার সঙ্গে সামাজিক রীতি-নীতি, অনুশাসন, বিধি-নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণের একটা সংঘর্ষ দেখা দেয়। তাদের স্বাধীন চিন্তাধারা ও সক্রিয়তাকে বয়স্করা তেমন একটা আমল দিতে চান না। এদের স্বাধীন ভাবে কোন কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয় না। ফলে নিজেদের

ক্ষমতা সম্বন্ধে এরা সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে এবং এদের মনে হীনমন্যতার একটা ভাব (Sense of inferiority) জাগ্রত হয়। কিশোর-কিশোরীরা এই সংঘাত এড়িয়ে চলতে চায়। ফলে কখনও তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখতে চায়, আবার কখনও বা কোন কৌশল অবলম্বন করে।

[দুই] **সামাজিক চাহিদার সমস্যা :** কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে নানাপ্রকার সামাজিক চাহিদা দেখা দেয়। এই চাহিদাগুলি জাগ্রত হবার জন্য এবং তাদের মধ্যে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হবার জন্য তারা বিভিন্ন প্রকার সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে চায়, সামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হতে চায়, কিন্তু সমাজ তাদের এ প্রচেষ্টা ভালো চোখে দেখে না। ফলে কিশোর-কিশোরীরাও সমাজের উপর আস্থা রাখতে পারে না, সমাজকে ভালো চোখে দেখে না-বরং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে। সামাজিক স্বীকৃতিটি সমাজ থেকে না পাওয়ার জন্য তারা অন্য কোথাও সেই স্বীকৃতিটি আদায় করতে চায়। এর থেকে তাদের একটি সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যার জন্য তারা কোন না কোন দলে থেকে কিছু কিছু অসামাজিক আচরণও করে থাকে।

[তিন] **আত্মনির্ভরতার চাহিদার সমস্যা :** কিশোর-কিশোরীরা বিভিন্ন দিকে আত্মনির্ভর হতে চায়। তারা নিজেদের কাজ নিজেরা করতে চায়, নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতে চায়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। এমন কি তারা নিজেদের জন্য বৃত্তি নির্বাচন এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষাক্রমটিও নির্বাচন করতে চায়। কিন্তু তাদের এই চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার কোন মিল থাকে না। তাদের বৃত্তি এবং শিক্ষাক্রম নির্বাচনে মাতাপিতা, অভিভাবক বা শিক্ষকের প্রাধান্যই বেশী। ফলে তার মনে অসন্তুষ্টি বা হতাশার একটা ভাব জাগে। আত্মনির্ভরতার চাহিদাটি তৃপ্ত হয় অন্য কোন বিকল্প আচরণের মাধ্যমে।

[চার] **আত্ম-অভিব্যক্তির চাহিদার সমস্যা :** কিশোর-কিশোরীদের আত্মপ্রকাশের চাহিদাটিও সব সময় যথাযথ ভাবে তৃপ্ত হয় না। এর জন্য গৃহ পরিবেশ, বিদ্যালয় ও সমাজই মূলতঃ দায়ী। সাধ ও সাধ্যের মিল ঘটানো যেন এক দুষ্কর ব্যাপার। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যে সৃজনাত্মক ক্ষমতা আছে, তার যথাযথ বিকাশ ও স্ফুরণের জন্য আমরা চেষ্টা করি না। প্রতি

পথে সামাজিক বাধা-নিষেধের বেড়া দিয়ে তাদের গতিপথ অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়। ছেলেমেয়েরা পাছে বদলোকদের সঙ্গে মেশে, তাই তাদের ঘরের মধ্যে যে সমস্ত সুপ্ত সম্ভাবনা ছিল সেগুলি অন্যভাবে প্রকাশিত হয়। এরা হয়তো এরই জন্য এমন কাজ করে ফেলতে পারে, যা আমরা চিন্তা করতেই পারি না।

[পাঁচ] নিরাপত্তার চাহিদার সমস্যা: ছেলেমেয়েরা বড় হলেও বয়স্করা ভাবেন তারা এখনও সেই ছোট খোকা বা খুকীটিই আছে। তাদের সামান্য ভুল ত্রুটির জন্য তিরস্কার বা প্রহার করতেও বড়রা কুণ্ঠিত হন না কিন্তু এর ফলে তাদের মনোজগতে যে কি বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়, তা বড়রা ভেবে দেখেন না। এই অবস্থায় কিশোর-কিশোরীরা দৈহিক ও মানসিক নিরাপত্তার অভাব বোধ করে এবং বাড়ী থেকে পালিয়ে যাবার একটা অদম্য ইচ্ছা তাদের মনে জাগে। অতিরিক্ত 'সেন্টিমেন্টাল' কিশোর-কিশোরীরা আবার আত্মহত্যার কথাও চিন্তা করে। এদের সামনে বিরাট সমস্যা হ'ল—পরিবেশের সঙ্গে বিশেষতঃ গৃহ পরিবেশের সঙ্গে সার্থক ভাবে সঙ্গতিসাধন করা।

[ছয়] নতুন জ্ঞানের চাহিদার সমস্যা: কৌতূহল ও নতুন জ্ঞান অর্জন করার চাহিদাটি কৈশোরের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই বয়সে ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করতে ভালবাসে, নতুন জ্ঞান আহরণ করতে ভালবাসে, এর জন্য তারা হাতের কাছে যে রকম বই পায়, তাই গোগ্রাসে পড়ে ফেলে। বেশী করে তাদের আকর্ষণ করে রহস্য, উপন্যাস ও এ্যাডভেঞ্চার সিরিজের বই। কিন্তু ভালো-মন্দ বিচার করে তারা পড়ে না বলে অনেক সময় কু-পাঠ্য বইও তারা পড়ে ফেলে এবং আজে বাজে কু-অভ্যাস অর্জন করে ফেলে। নতুন জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে তারা অবাঞ্ছিত জ্ঞান অর্জন করে ফেলে। কাজেই কোন্ বই পড়লে উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব—তা স্থির করা তাদের সামনে এক সমস্যা।

[সাত] দুঃসাহসিকতার চাহিদার সমস্যা: কিশোর কিশোরীরা সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এর জন্য তারা অনেক সময় অনেক দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলে। অবশ্য এই কাজ করার সময় তারা কোনপ্রকার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে না। তারা প্রায়ই ঝোঁকের মাথায় এমন অনেক কাজ করে ফেলে যা পরবর্তী কালে তাদের জীবন বিকাশের ধারাটিকে ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত করে। সমাজে নিছক প্রতিষ্ঠা অর্জনের

জন্য কোনপ্রকার দুঃসাহসিক কাজ না করাই ভালো। তর্ক করে বা বাজী রেখে গাছ থেকে লাফ দেওয়া বা কয়েক কিলো রসগোল্লা খাওয়ার ঘটনা কিশোর কিশোরীদের জীবনেই ঘটে থাকে। অনেক সময় বাধ্য হয়েই তাদের এই জাতীয় কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়। এর ফলে তাদের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এর থেকেই তাদের মনে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

[**আট**] **নীতিবোধের চাহিদার সমস্যা :** কিশোর-কিশোরীদের মনে একটা নৈতিক বোধ জাগ্রত হবার পর তাদের সামনে একটা সমস্যা দেখা দেয়। তারা একটা নীতি-বোধ কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং তাদের সামনে একটা আদর্শও তারা খাড়া করে নেয়। সেই অনুযায়ী একটা সুনির্দিষ্ট ও সুনির্বাচিত আচরণ-ধারার কথা চিন্তা করে নেয়। কিন্তু মুস্কিল হ'ল—তারা বয়স্কদের কাছে যে রকম আচরণ-ধারার কথা শোনে, তাদের আচরণ-ধারাই সেই রকম হয় না। শিক্ষকদের নিকটও একজাতীয় আচরণ তারা দেখতে পায় (do what we say, don't do what we do !)। ফলে এদের মনে মনে একটা সংশয় দেখা দেয়। যাঁদের তারা আদর্শস্থানীয় মনে করত, তাঁরাই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের সম্পর্কে এই ধারণার অপমৃত্যু তাদের ব্যথিত করে, তাদের সামনে একটা সমস্যার সৃষ্টি করে।

[**নয়**] **যৌন তৃপ্তির চাহিদার সমস্যা :** কৈশোরে যৌন চাহিদাকে কেন্দ্র করে নানাপ্রকার সমস্যা দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এদের নানাপ্রকার সমস্যার মূলে—যৌন-চাহিদা ও যৌন কৌতূহলটিই প্রধান। একটা স্বাভাবিক কারণেই কিশোরীরা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। একে অন্যের রহস্য জানতে চায়। কিন্তু তাদের এ ভয়ও রয়েছে—এর জন্য বড়রা হয়তো তাদের তিরস্কার করবেন। অথচ তাদের এই কৌতূহল মেটাতে কেউ এগিয়ে আসে না। এদের নিজেদের দৈহিক পরিবর্তনের জন্যই তো কত প্রশ্ন মনে ভীড় করে। কেন এমনটি হচ্ছে? সদুত্তর না পাওয়ার জন্য ইচ্ছাটিকে শেষ পর্যন্ত এরা অবদমিত করতে বাধ্য হয়। পরিবেশের সঙ্গে সার্থক ভাবে সঙ্গতিসাধন এরা করতে পারে না। সমগ্র যৌনজীবনটি তখন তাদের সামনে মূর্তিমান একটি অভিশাপের মত মনে হয়, এই জীবনের বিরাট সমস্যাগুলি তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে।

[**দশ**] **জীবন-দর্শনের চাহিদার সমস্যা :** কিশোর-কিশোরীদের অহং

সত্তাটি যথেষ্ট বিকশিত হয়েছে, সেটিকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু সেন্টিমেণ্ট গড়ে উঠেছে এবং সর্বোপরি তার নিজস্ব একটি জীবন দর্শন গড়ে উঠেছে। সে কতকগুলি আদর্শকে জীবনের আদর্শ বা লক্ষ্য বলে মেনেও নিয়েছে। কিন্তু তারপরই সংঘর্ষ বাধে। সে যেগুলিকে আদর্শ বলে বেছে নিয়েছিল-বাস্তবে সেগুলি হয়তো ঠিকমত কার্যকরী করা সম্ভব হচ্ছে না। আবার এদের চাহিদা তো আর মাত্র একটি নয়। অনেক সময় তার জীবনদর্শনের পরিপন্থী কিছু চাহিদা পাশাপাশি দেখা দিতে পারে। তখন সে কোন্‌টিকে বর্জন করবে—তা স্থির করতে পারে না। যথাযোগ্য নির্দেশনার অভাবে এটি তার কাছে একটি বিরাট সমস্যার আকারেই দেখা দেয়।

এতক্ষণ আমরা কৈশোরের নানাপ্রকার বৈশিষ্ট্য, চাহিদা ও সমস্যার কথা আলোচনা করলাম। কৈশোরকে কেন ঝড়-ঝঞ্ঝার কাল বলে তাও জানলাম। কিন্তু প্রাকৃতিক ঝড়-ঝঞ্ঝা যেমন ধ্বংসাত্মক, কৈশোর তেমন নয়। বরং কৈশোরে সৃজনমূলক কিছু করার একটা সুস্পষ্ট সম্ভাবনা ও ইঙ্গিত থাকে। কিশোরদের ঠিকমত পরিচালিত করতে পারলে এরা সমাজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। কাজেই এখন এই স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হ'ল—

কিশোরে শিক্ষা-ব্যবস্থা (Education during Adolescence): আমাদের বিদ্যালয়গুলির ছাত্রসমাজের একটা বড় অংশ হ'ল—কিশোর কিশোরীদের নিয়ে গঠিত। সেইজন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা এই সমস্ত ছেলেমেয়েদের কেন্দ্র করে এবং তাদের চাহিদা ও সমস্যাগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে গড়ে তুলতে হবে। কিশোর কিশোরীদের নানা প্রকার পরিবর্তন সম্বন্ধে কোনরূপ বিরূপ ধারণা গড়ে তুললে চলবে না। মনে রাখতে হবে-এটি প্রত্যেকের জীবনে একবার আসবেই। আমরা কেউ কৈশোর অতিক্রম না করে একেবারে বয়স্ক স্তরে উন্নীত হতে পারি না। কৈশোরে স্বাভাবিক বিকাশের ধারাটি যাতে অব্যাহত থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা-ব্যবস্থাকে এমন পরিচালিত করতে হবে যাতে কিশোর-কিশোরীরা নিজেদের সমস্যাগুলির সমাধান নিজেরাই করতে পারে। শিক্ষা যদি এদের বিভিন্ন চাহিদা ও সমস্যার ক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে সাহায্য করতে না পারে তবে সেই শিক্ষা ব্যবস্থা এরা গ্রহণ করতে চাইবে না। Spevis Report,

Hadow Committee Report, Mudaliar Commission Report, Kothary Commission Report-প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শিক্ষাকে কিশোর-কিশোরীদের প্রয়োজন অনুযায়ী সংস্কার করার কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে শিক্ষক, পরিচালকবৃন্দ, সরকার এবং সকল স্তরের শিক্ষাকর্মীকে সবিশেষ যত্নবান হতে হবে।

কিশোর-কিশোরীদের নিয়েই সকলের সমস্যা। মা বাবা দেখছেন তাদের একদিনের ছোট্ট খোকাটি আজ যেন কেমনতর হয়ে যাচ্ছে! শিক্ষক দেখছেন তার বাধ্য ছাত্রটি কেমন যেন অবাধ্য হয়ে উঠেছে। অন্য সবাই দেখছে-শান্ত প্রকৃতির লাজুক ছেলেটি কেমন যেন দুরন্ত-দামাল হয়ে উঠছে! দোষ কার? সে কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। অনেক মা বাবাকে বলতে শুনেছি- আমার ছেলেটি (অবশ্যই কিশোর) এমন অবিবেচকের মত আচরণ করছে যে কি বলব! ঐ বয়সে তো আমরা এ রকম করি নি।" বলতে ইচ্ছে করে ঠিক ঐ রকমটি করেননি, কিন্তু অন্য কোন ভাবে কোন না কোন আচরণ নিশ্চয় করেছেন।" নদীর ওপার থেকে এপারে এসে যে লোকটি দাঁড়িয়েছে তাকে নিশ্চয়ই কোন না কোন ভাবে, হয়তো কোন সেতু ধরে, নয়তো নৌকায় চড়ে, না হলে সাঁতার দিয়েও এ পারে আসতে হয়েছে। কিছু না করে সে এ পারে আসতে পারে নি। আসার সময় কেউ হয়তো বেশ নিরাপদে এসেছে আবার কেউ হয়তো দারুণ কষ্টের মধ্যে এসেছে। নদী পার হবার কিছুদিন পর আমরা সে সমস্ত কথা মনে রাখি না। ঠিক তেমনি কৈশোর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে কি ভাবে আমরা তা অতিক্রম করেছি, তা আর মনে থাকে না। কখনও কখনও চোখের সামনে কোন কিশোরের কীর্তিকলাপ অতীত দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

শিক্ষকরা পরীক্ষাতে পাশ করার জন্য মনোবিজ্ঞান পড়ে কিশোরদের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান অর্জন করেন। অনেকে আবার তাও অর্জন করার আগে শিক্ষকতা শুরু করেন। অনেক শিক্ষক সবে হয়তো কৈশোরের গণ্ডী অতিক্রম করেছেন। এঁরা কিশোদের সমস্যার সম্মুখীন হতে বাধ্য! কিন্তু নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি—কেবলমাত্র বই-এর জ্ঞানের সাহায্যে কিশোরদের দিয়ে কাজকর্ম করা যায় না। নিজস্ব অনুভূতি দিয়ে এদের বুঝতে হবে, সহানুভূতির সঙ্গে এদের সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ ও বিচার করতে হবে। যা ই

হোক্ এদের জীবন বিকাশে সহায়তা করার জন্য ও এদের সমস্যা সমাধানের জন্য কতকগুলি সম্ভাব্য উপায়ের কথা বলা হ'ল। এগুলি অনুসরণ করলে সুফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যেতে পারে।

[এক] কৈশোরে শিক্ষার্থীদের দৈহিক বিকাশ অত্যন্ত দ্রুত ও আকস্মিক ভাবে ঘটে থাকে। এর ফলে তারা একটা অকারণ লজ্জাতে নিজেদের লুকিয়ে রাখতে চায়। তারা বুঝতে পারে না—এ বৃদ্ধি স্বাভাবিক ও অনিবার্য। এ-ক্ষেত্রে শিক্ষক ও মাতাপিতা সকলকে সহানুভূতির সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। ওরা একটুখানি মিষ্টি কথার, একটু স্নেহের কাঙাল। এদের সঙ্গে এমন ভাবে আচরণ করতে হবে—যেন দৈহিক পরিবর্তনগুলো কিছু নয়। ওরা এ সম্বন্ধে যত কম সচেতন হবে, ততই মঙ্গল। দৈহিক পরিবর্তন প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। এই সময় দৈহিক পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত অঙ্গ-সঞ্চালন, খেলাধূলা, ব্যায়াম ও সেইমত পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। তাছাড়া খেলাধূলার মাধ্যমে এরা যেমন ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তেমনি এগুলির মাধ্যমে তাদের আত্ম-অভিব্যক্তির চাহিদাটিও পরিতৃপ্ত হচ্ছে। ছেলেদের জন্য ফুটবল, ভলিবল, কবাডি, হা-ডু-ডু, বক্সিং, কুস্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মেয়েদের জন্যও নানাপ্রকার খেলাধূলার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে অনেক মনোবিজ্ঞানী নানাপ্রকার খেলাধূলার পরিবর্তে নাচের ব্যবস্থা করতে বলেছেন। Staney Hall-এর মতে "Dancing is one of the best expressions and pure play and pure motor need of the youth. Perhaps it is most liberal of all forms of motor education.'

[দুই] কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে স্বাধীন ভাবে কাজ করার একটা প্রণবতা লক্ষ্য করা যায়। তারা চাপিয়ে দেওয়া শাসনের চেয়ে নিজেদের তৈরী আইন-কানুনকে বেশী শ্রদ্ধা করে। এই চাহিদাটির পরিতৃপ্তির জন্য সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। তাদের উপর কিছু কিছু দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিতে হবে—যেমন স্কুলের কোন উৎসবের সংগঠন, ম্যাগাজিন, খেলাধুলা, ভ্রমণ ইত্যাদি পরিচালনা। এতে এদের স্বাধীনতার চাহিদাটি তৃপ্ত হবে, আত্ম-প্রকাশের আকাঙ্ক্ষাটি তৃপ্ত হবে এবং আত্মবিশ্বাসের পরিমাণটিও বাড়বে।

[তিন] কিশোর-কিশোরীদের মনোজগতে-বিশেষতঃ প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে

একটা বিরাট ঝড় বয়ে যায়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী যে জিনিসটির প্রয়োজন—তা হ'ল সহানুভূতি। শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে—যাতে শিক্ষার্থীরা অযথা মানসিক কষ্ট বা আঘাত না পায়। সহানুভূতি এবং ধৈর্যের সঙ্গে তাদের প্রক্ষোভগুলিকে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং সেইমত ব্যবহার করতে হবে। ঐ কথা মনে রাখতে হবে—এই শিক্ষকের সামান্য তিরস্কারই একটা বিপুল প্রাক্ষোভিক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম।

[**চার**] কিশোর-বয়সে কৌতূহল যেমন বাড়ে বিবেচনার ক্ষমতাও তেমনি বাড়ে। প্রথমটির জন্য তারা বেশী করে জানতে চায় এবং দ্বিতীয়টির জন্য তারা সব কিছু বিশ্লেষণ করে দেখে, সমালোচনা করে। এদের ক্রমবর্ধমান কৌতূহল তৃপ্ত করার জন্য শিক্ষককে প্রস্তুত থাকতে হবে। তাদের জ্ঞান-মূলক প্রশ্নাবলীর সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট উত্তর দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের সমালোচনার মনোভাবটিকেও যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে।

[**পাঁচ**] কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা দেবার সময় ব্যক্তিগত পার্থক্যের নীতির কথা মনে রাখতে হবে। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে যদি নিজ নিজ প্রয়োজন, সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষালাভ করতে পারে, তবে তাদের ব্যক্তিগত সার্থকতাবোধটি পরিতৃপ্ত হবে, তা না হ'লে ব্যর্থতার জন্য তাদের আত্মবিশ্বাসটি ক্রমশঃ কমে আসবে। কিশোর-কিশোরীদের বিকাশমান বহুমুখী সম্ভাবনাগুলি বিকশিত করার জন্য বহুমুখী পাঠক্রমের ব্যবস্থা রাখা উচিত। শিক্ষার্থীদের পুস্তক নির্বাচনে শিক্ষকদের যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। তারা যাতে ভালো পুস্তক পাঠে আগ্রহী হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করতে হবে। প্রত্যেকটি কিশোর-কিশোরীকে একখানি করে স্বামীজীর "পত্রগুচ্ছ" পড়তে দেওয়া উচিত।

[**ছয়**] কিশোরদের নৈতিক মূল্যবোধটি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করতে হবে। নৈতিক বোধ থেকেই তারা সুচরিত্রের অধিকারী হতে পারে। নৈতিক শিক্ষার মধ্য দিয়েই যাতে তারা সুচরিত্রের অধিকারী হতে পারে, সে বিষয়ে শিক্ষককে দৃষ্টি দিতে হবে। শিক্ষক নিজে যদি নৈতিক আদর্শের অধিকারী হন, তবে তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যেও নীতিবোধ জাগ্রত করতে পারবেন। শিক্ষার্থীরা যাতে সামাজিক নিন্দা-প্রশংসার অপেক্ষা না করে কেবল নৈতিক আদর্শের অনুপ্রেরণা'তেই আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়, সে দিকে

দৃষ্টি দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে James Ross-এর বক্তব্য হ'ল—"The highest stage of moral conduct is reached when behaviour is directed by ideals rather than by social praise or blames. There are few who dare to follow the light that is in them, regardless of social consequence but these few are the salt of the earth."

[সাত] শিক্ষার্থীদের জীবনের আদর্শ যাতে ঠিকমত গড়ে ওঠে, সে বিষয়ে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। সুচরিত্র তখনই গঠিত হয় যখন প্রকৃত জীবনাদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়। জীবন সম্বন্ধে একটি সুনিশ্চিত, সুপরিচিত, উদার ও গঠনমূলক ধারণা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হবে। জীবনাদর্শটি এমন হবে যাতে বাস্তবের সঙ্গে সংঘাতে সেটি নষ্ট না হয়। শিক্ষার্থীর অহং-সত্তাটি যাতে বিকশিত হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

[আট] কিশোরদের সর্বাত্মক বৃদ্ধি ও বিকাশকে পরিপূর্ণ করার জন্য নানাপ্রকার দলগত কাজকর্মের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এতে তাদের যূথবদ্ধতার প্রবৃত্তিটিও পরিতৃপ্ত হবে। খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাহিত্য-সভা, ভ্রমণ, অভিনয়, বনভোজন ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন মানসিক দিকগুলি যাতে অবাধে প্রকাশিত হতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। দল বাঁধার সময় যাতে তারা কোন খারাপ দল না গড়ে বা খারাপ দলে না মিশে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

[নয়] দলগত স্বার্থটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে নজর দিতে হবে। সে যেন বিদ্যালয় এবং গৃহে তার আগ্রহ ও রুচি অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ পায়, সে ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়ীতেও এদের জন্য গান-বাজনা, বাগান তৈরী করা, ভালো বই পড়া, ছবি আঁকা ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখতে হবে। এতে তারা যেমন মনের খোরাক পাবে, তেমনি অলস চিন্তা ও দিবাস্বপ্নের হাত থেকেও মুক্তি পাবে। তাদের ভবিষ্যৎ-বৃত্তির জন্যও তৈরী করে দিতে হবে।

[দশ] সবশেষে আসে-যৌনশিক্ষার কথা। কিশোরেরা যৌন-বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী ও কৌতূহলী। এই নবজাগ্রত কৌতূহল মেটাবার জন্যই যৌন-শিক্ষার প্রয়োজন। যৌন-চাহিদার মূলে আছে সৃজনী-স্পৃহা। এই সৃজনী

স্পৃহাকে কোন সৃজনাত্মক কাজের মাধ্যমেই প্রকাশিত করতে হবে। যৌন-চাহিদাটির উন্নতিকরণ (Sublimation) করা প্রয়োজন। যৌন-কৌতূহল সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত প্রশ্নোত্তরে কোন ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে নেই। বরং এটা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই অবদমিত যৌন-কৌতূহলই প্রকাশিত হয় অশ্লীল ছবি ও নোংরা ভাষার মাধ্যমে দেওয়ালে দেওয়ালে—বিশেষতঃ প্রস্রাবখানা ও পায়খানাগুলিতে। উপযুক্ত যৌন-শিক্ষার ব্যবস্থা করলে এ জাতীয় ঘটনা ঘটবে না বলেই মনে হয়।

কৈশোর-স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা আলোচনা করা হ'ল। কোন সুনির্দিষ্ট বা বাঁধাধরা নিয়মে কিশোরদের সাহায্য করার কথা উঠে না। যখনই প্রয়োজন হবে, তখনই তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে যেতে হবে। এদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে আচরণ করলেই সুফল পাওয়া যায়। আর একটা কথা। কিশোররা যাতে অলস চিন্তা, কু-চিন্তা বা দিবাস্বপ্নে সময় নষ্ট না করে সেইজন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বহুমুখী কাজকর্মের ব্যবস্থা রাখতে হবে—বিদ্যালয় এবং বাড়ীতেও। মাতাপিতাকেও উদার ভাবে খোলা মনে এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তাদের সঙ্গে তাদের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে। এদের মতামত বা যুক্তিগুলিকেও যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে। কিশোররা যাতে সব রকমের মানসিক সংঘাত এড়িয়ে চলতে পারে, সে দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। সবশেষে Ross-এর একটি মন্তব্য তুলে অধ্যায়টি শেষ করছি—

"The success of such magnificient aspiration depends on more than admission. The promised step-forward will be surely taken. Only sufficient man and woman teachers can be found who will espouse the great cause of nations youth and devote their lives to its service"

॥ উনিশ ॥

মানসিক জীবনের দৈহিক ভিত্তি

(Physical Basis of Mental Life)

আমাদের মনের কাজ কত বিচিত্র! চিন্তা করা, স্মরণ করা, কল্পনা করা, বিচার-বিবেচনা করা, কোন সমস্যার সমাধান করা, কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া—এ সব মনের কাজ। আবার ভালো-লাগা, মন্দ লাগা, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা ইত্যাদি প্রক্ষোভ অনুভব করা—এ সবও মনের কাজ। তেমনি কোন কাজ করতে খুব উৎসাহ আসে, আবার কোন কাজ করতে দারুণ আলস্য আসে, কোনটিতে প্রবল ইচ্ছা বা আসক্তি, আবার অন্যটিতে প্রবল অনিচ্ছা ও অনাসক্তি। এগুলিও মনের কাজ। আবার দেখা, শোনা, ঘ্রাণ নেওয়া, স্বাদ গ্রহণ করা, স্পর্শসুখ অনুভব করা, ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতি বোধ করা, যন্ত্রণা ও আরাম অনুভব করা, কোন্‌টি ঠাণ্ডা বা কোন্‌টি গরম তা উপলব্ধি করা এ সমস্তও মনের কাজ। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি মনের কাজেরই একটা দৈহিক অভিব্যক্তি আছে। বিজ্ঞানীরা বিশেষতঃ শারীরবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, উপরের কাজগুলি মুখ্যতঃ মনের কাজ হলেও তাদের প্রত্যেকটি আমাদের দেহের সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড় ভাবে জড়িত। তাঁরা বলেছেন, সব রকম মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে নিবিড় ভাবে সংযুক্ত আছে **স্নায়ুমণ্ডলী** (Nervous System)-যেটির কেন্দ্র হ'ল আবার **মস্তিষ্ক** (Brain)। বিভিন্ন জাতীয় উন্নততর মানসিক কাজগুলি আমাদের মস্তিষ্কের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যে জীবের মস্তিষ্ক যত উন্নত হবে, তার মানসিক কাজগুলিও তত উন্নত হবে। নিম্ন স্তরের ইতর প্রাণীর চেয়ে মানুষের মস্তিষ্ক উন্নত বলে মানুষও উন্নততর মানসিক ক্ষমতার অধিকারী। আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ইত্যাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের কথা বলে থাকি। এগুলিও নিয়ন্ত্রিত হয় মস্তিষ্কের দ্বারা। কোন ইন্দ্রিয় বা পেশীর সঙ্গে যে স্নায়ুতন্ত্রটি বিশেষতঃ স্নায়ুসূত্রটি সংযুক্ত থাকে, সেটি কোনপ্রকারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সেই ইন্দ্রিয় বা পেশী তার বোধশক্তি ও সক্রিয়তা হারিয়ে ফেলে। এক জাতীয় কোন নার্ভ বা স্নায়ুকেন্দ্র যদি পীড়িত হয়, তবে তার সঙ্গে সংযুক্ত ইন্দ্রিয় বা পেশীর বোধশক্তিটি নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের দেখাটি হ'ল মনের কাজ। কিন্তু দেখতে হলে চোখের

দরকার। যার চোখ নাই, সে দেখতেও পায় না। আবার চোখের সঙ্গে মস্তিষ্ক স্নায়ুর বাঁধনে বাঁধা আছে। এই বাঁধন যদি ছিঁড়ে যায়, তবে চোখ সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টিশক্তিটি হারিয়ে ফেলবে। এইরকম ভাবে প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই মস্তিষ্কের একটা যোগাযোগ আছে। এই যোগসূত্রটি নষ্ট হ'লে ইন্দ্রিয় তার কর্মক্ষমতাটি হারিয়ে ফেলে। মস্তিষ্কের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলির যোগাযোগ উল্টো দিক থেকেও প্রমাণ করা যায়। যদি মস্তিষ্কে অবস্থিত কোন স্নায়ুকেন্দ্রকে কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজিত করা যায় বা হঠাৎ সেটি উত্তেজিত হয়ে পড়ে বাহ্যিক কোন কারণ ছাড়াই, তবে সেই কেন্দ্রের সঙ্গে যে ইন্দ্রিয়টি যুক্ত থাকে, সেটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যে একটা বোধশক্তি জাগ্রত হয় যদিও কোন বাহ্যিক উত্তেজক সেখানে থাকেই-না। এই জন্য হঠাৎ হঠাৎ আমরা চোখের সামনে সর্ষে ফুল দেখি, কানে হঠাৎ হঠাৎ কোন শব্দ শুনি, গা দিয়ে কখনও কখনও ঠাণ্ডা একটা বরফের স্রোত বয়ে যায়।

শরীরের ভেতরে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি আছে, যেমন পাকস্থলী, ফুস্‌ফুস্‌ ইত্যাদি এগুলিও হয় প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে মস্তিষ্কের সঙ্গে সংযুক্ত। আবার রাগ, আনন্দ, ভয় ইত্যাদি কতকগুলি প্রক্ষোভ কমে বা বাড়ে শরীরের ভেতর কতকগুলি গ্রন্থির রস নিঃসরণের জন্য। তাহ'লে বলা যেতে পারে, মনের সব কাজই দেহ-নির্ভর। কাজেই মনের বিভিন্ন কাজ ভালোভাবে জানতে হ'লে দেহের গঠনটি ভালো করে জানতে হবে। আবার দেহের গঠনটি ঠিকমত জানতে হলে জানতে হবে স্নায়ুতন্ত্রের কথা, কারণ এটির দ্বারাই আমাদের সম্পূর্ণ দেহ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

দেহযন্ত্রের ভাগ: আমরা আমাদের দেহযন্ত্রটিকে তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করতে পারি। এগুলি হ'ল—(১) **বিভিন্ন সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়** (Receptors), (২) **পেশী, গ্রন্থি ইত্যাদি** (Muscles, glands etc.) এবং (৩) **মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী** (Brain and the nervous system)। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী দেহের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও পেশীর মধ্যে সংযোগ-স্থাপন ও সমন্বয় সাধন করে বলে এই অংশটিকে বলা হয় **সংযোজক** (Connector)। এই অংশটিকে আবার তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। যথা—(১) **কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডল** (Central nervous system)—যার অংশ হ'ল আবার তিন স্তরে বিভক্ত—**মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড** (Spinal cord), (২) **প্রান্তিক স্নায়ুমণ্ডল** (Peripheral system)—যার অংশ হ'ল

মস্তিষ্ক থেকে বহির্গত এবং সুষুম্নাকাণ্ড থেকে বহির্গত স্নায়ুসূত্রগুলি এবং (৩) **স্বয়ংক্রিয় মণ্ডল** (Autonomic system)। জীবদেহের মূল উপাদান হ'ল **জীবকোষ** (Cell body)। এই জীবকোষের মধ্যে যে কোষটি কেন্দ্র বিন্দুর মত কাজ করে, যেটির সংযোগে ইন্দ্রিয়, পেশী মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডল গঠিত হয়েছে, সেটির নাম হল **নিউরন** (Neuron)। এখন স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করা যাক্—

স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System): প্রাণীর আচরণের অর্থ হ'ল— পারিবেশিক উত্তেজনার উত্তরে দেওয়া তার সাড়া বা প্রতিক্রিয়া। পরিবেশের যে সমস্ত শক্তি আমাদের নিকট থেকে এই সাড়া বা প্রতিক্রিয়াটি আদায় করে নিতে পারে সেগুলিকে বলা হয় **উত্তেজনা বা উদ্দীপক** (Stimulus)। আমরা যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এই উদ্দীপকগুলি থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে থাকি, সেগুলিকে বলা হয়—**গ্রহণেন্দ্রিয়** (Receptor)—ওরা গ্রহণ করে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ইত্যাদি হ'ল গ্রহণেন্দ্রিয়ের উদাহরণ। গ্রহণেন্দ্রিয়গুলি উদ্দীপনাটি পাঠিয়ে দেয় প্রাণীর অভ্যন্তরে এবং সেইটির উত্তরে প্রাণী পেশী, গ্রন্থি, অন্ত্র ইত্যাদির সাহায্যে নানাপ্রকার আচরণ সম্পন্ন করে। এইগুলিকে বলা হয় **কর্মেন্দ্রিয়** (Effectors)—ওরা কাজ করে। কিন্তু উদ্দীপকজাত উত্তেজনা ও প্রাণীর তার উত্তরে দেওয়া সাড়া বা প্রতিক্রিয়া এই দুটির মাঝে গুরুত্বপূর্ণ একটা স্তর আছে। এটিকে বলা হয় **আভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের স্তর**। এই সমন্বয়নটিই আচরণের প্রকৃতি ও তীব্রতা নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই আভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের কাজটি যে যন্ত্রসমষ্টির সাহায্যে সম্পাদিত হয় তাকে বলা হয় **স্নায়ুতন্ত্র**। কোন উদ্দীপকের উত্তরে কি রকম সাড়া দিতে হবে, একাধিক সাড়ার মধ্যে কি ভাবে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যটি স্থির রাখা যাবে, কি ভাবে পারিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলিকে সংগঠিত করা যাবে এই সমস্ত আভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের কাজটি করে স্নায়ুতন্ত্র। স্নায়ুতন্ত্র যত উন্নত হবে —আভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের কাজটিও তত ভাল হবে। প্রাণীর ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রটিও উন্নততর হতে থাকে।

স্নায়ুপথ (Nervous Path): কোন একটি উদ্দীপক প্রাণীর একটি গ্রহণেন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করলে যে পথের মাধ্যমে তার গ্রহণেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় তাকে **স্নায়ু** (Nerve) বলে। এই স্নায়ুপথটি ধরে

অত্যন্ত দ্রুতগতিতে উদ্দীপনাটি গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে কর্মেন্দ্রিয়ে পৌঁছায় এবং প্রাণী আচরণটি সংঘটিত করে। (গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় ১০০ মাইল)। কিন্তু গ্রহণেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় সরাসরি ভাবে সংযুক্ত হয় না। এটিকে পুরাতন টেলিফোন ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। গ্রহণেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের সংযোগ স্থাপনে "এক্সচেঞ্জ অফিসের" কাজ করে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড। স্নায়ুজাত উদ্দীপনা গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে যায় মস্তিষ্কে, মস্তিষ্ক সেটিকে উপযুক্ত স্নায়ুপথ ধরে পাঠায় কর্মেন্দ্রিয়ে। কর্মেন্দ্রিয়ে ওটি এলে তখন ঘটে আচরণ। যে সমস্ত স্নায়ু গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে উত্তেজনাটি মস্তিষ্কে নিয়ে যায় তাদের বলে **সংবেদক বা অন্তর্মুখী স্নায়ু** (Sensory or Afferent Nerves)। আর যারা মস্তিষ্ক থেকে কর্মেন্দ্রিয়ে খবর নিয়ে আসে তাদের বলে **সঞ্চালক বা প্রচেষ্টক বা বহির্মুখী স্নায়ু** (Motor or Efferent Nerves)।

স্নায়ুতন্ত্রের গঠন (Structure)**:** স্নায়ুতন্ত্রের কাজ করার পদ্ধতিটি জানার আগে এটির গঠনটি ভালো ভাবে জানা দরকার। স্নায়ুতন্ত্র বলতে ছোট বড় অসংখ্য স্নায়ুতন্তুর সমষ্টিকে বোঝায়। স্নায়ুতন্তুগুলি আবার মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড এই দুই সমন্বয়নকেন্দ্র থেকে বের হয়ে শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। আগেই বলা হয়েছে স্নায়ুতন্ত্রের এককটির নাম হ'ল **নিউরন** (Neuron)। মানবদেহে আনুমানিক ১০ লক্ষ কোটি নিউরন আছে ভোনাস্তসনের মতে আরো বেশী প্রায় ১২ লক্ষ কোটি। এই নিউরনগুলির পারস্পরিক সমন্বয় সাধনের জন্যই দেহযন্ত্রের সমস্ত কাজ চলে। নিউরনগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম আকৃতির এবং এগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত অংশগুলি থাকে :—

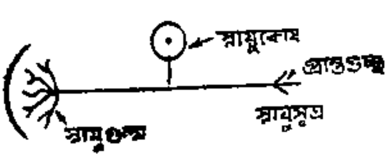

॥ সংবেদক স্নায়ু ॥

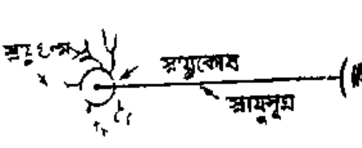

। সঞ্চালক স্নায়ু ॥

[এক] **স্নায়ুকোষ বা কোষদেহ** (Cell body) **:** নিউরনের সর্বাপেক্ষা প্রধান অংশটি হ'ল স্নায়ুকোষ বা কোষদেহ। প্রত্যেক নিউরনে একটি স্নায়ুকোষ থাকবেই এবং এটির সাহায্যেই নিউরন বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করতে পারে। স্নায়ুকোষ থেকেই স্নায়ুসূত্র ও স্নায়ুগুচ্ছ বের হয়। স্নায়ুকোষের ভিতরে থাকে

প্রোটোপ্লাজম যেটি হ'ল প্রাণীর জীবন-শক্তির ধারক ও বাহক (Physical basis of life—Huxley)।

[**দুই**] **স্নায়ুকেন্দ্র** (Nucleus) : প্রত্যেকটি কোষদেহের কেন্দ্রে আবার একটি করে স্নায়ুকেন্দ্র থাকে যেটি স্নায়ুকোষের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে।

[**তিন**] **স্নায়ুসূত্র বা স্নায়ুশাখা** (Axon) : নিউরনগুলির আবার একটি করে শাখা আছে। এগুলি অপেক্ষাকৃত মোটা এবং কখনো কখনো বেশ কয়েক ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। এই শাখাগুলির মধ্য দিয়েই কোষদেহ থেকে উদ্দীপনাটি অন্য কোন নিউরনে প্রবাহিত হয়ে যায়।

[**চার**] **স্নায়ুগুল্ম বা স্নায়ুকেশ** (Dendrites) : স্নায়ুশাখার একপ্রান্তে কতকগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূতার মত শাখা-প্রশাখা বের হয়। এইগুলি অন্য কোন নিউরনের শাখা-প্রশাখার সঙ্গে যুক্ত হয়। স্নায়ুগুল্মগুলি স্নায়ুশাখার চেয়ে ছোট এবং অপেক্ষাকৃত মসৃণ। এগুলি অন্য নিউরন থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে কোষদেহে পাঠায়। উপরের ছবিটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সংবেদক স্নায়ু ও সঞ্চালক স্নায়ুর স্নায়ুকোষ ও স্নায়ুগুল্মগুলি এক রকমের নয়। সংবেদক স্নায়ুর ক্ষেত্রে স্নায়ুকোষটি আছে স্নায়ুর মাঝামাঝি স্থানে, স্নায়ুগুল্মগুলি খুব পরিপুষ্টও নয়। কিন্তু সঞ্চালক স্নায়ুর ক্ষেত্রে স্নায়ুকোষটি স্নায়ুর একপ্রান্তে অবস্থিত ও স্নায়ুগুল্মগুলিও বেশ পরিপুষ্ট।

প্রান্তগুচ্ছ (End Brush) : স্নায়ুসূত্রের একপ্রান্তে কতকগুলি ঝাঁকড়ির মত জিনিস দেখা যায়। এগুলিকে বলা হয় **প্রান্তগুচ্ছ**। স্নায়ুশাখাটির একটি মাথা ভেঙ্গে কতকগুলি সূক্ষ্ম শাখা প্রশাখায় পরিণত হয়। এগুলিই হ'ল প্রান্তগুচ্ছ যেগুলির ভিতর দিয়ে উদ্দীপনা গৃহীত ও প্রেরিত হয়।

নিউরনগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে বললে ভুল বলা হবে। তবে এরা খুব কাছাকাছি থাকে। উপযুক্ত কোন উত্তেজকের সংস্পর্শে এলে যে শক্তি তরঙ্গের উদ্ভব হয়, সেই স্নায়বিক শক্তিতরঙ্গ স্নায়ুগুল্মের দ্বারা প্রবাহিত হয়ে যায় স্নায়ু কোষের দিকে। এইবার স্নায়ুসূত্র সেই উত্তেজনার প্রবাহটিকে স্নায়ুকোষ থেকে বহন করে নিয়ে যায় এবং অপর একটি স্নায়ুর স্নায়ুগুল্মে প্রান্তগুচ্ছের মাধ্যমে সেটিকে সঞ্চারিত করে দেয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে—

স্নায়ুত্রের কাজ হ'ল—স্নায়বিক শক্তি তরঙ্গটিকে স্নায়ু কোষের দিকে নিয়ে যাওয়া, আর স্নায়ুদণ্ডের কাজ হচ্ছে সেই শক্তি তরঙ্গটিকে স্নায়ুকোষ থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া। প্রত্যেক প্রকারের স্নায়ুই অর্থাৎ সংযোজক, সংবেদক বা সঞ্চালক—স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একই ভাবে উত্তেজনাটি এক নিউরন থেকে অন্য নিউরনে প্রবাহিত হতে থাকে।

সন্নিকর্ষ বা স্নায়ুসন্ধি (Synapse): আগেই বলা হয়েছে, একটি স্নায়ুর কখনোই অন্য একটি স্নায়ুর সঙ্গে সরাসরি ভাবে জড়িত থাকে না। অর্থাৎ একটি স্নায়ু আর একটি স্নায়ুকে স্পর্শ করে থাকে না—যদিও তারা খুব কাছাকাছিই থাকে। যে স্থানে একটি স্নায়ুর শেষ হয় এবং অন্য একটি স্নায়ুর

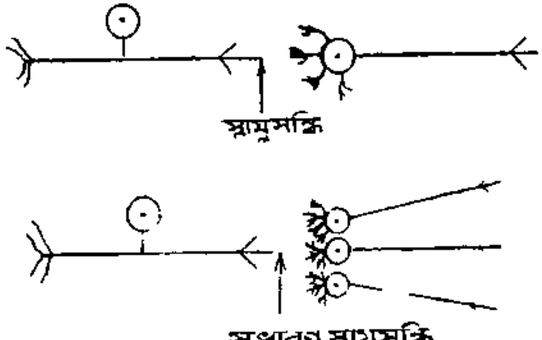

চিত্র—ক

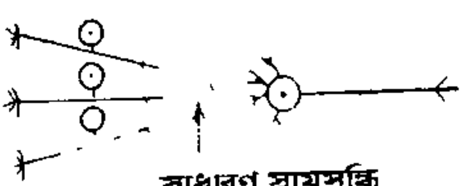

চিত্র—খ

শুরু হয়, সেখানে কিছুটা ফাঁক থাকে। দুটি স্নায়ুর মধ্যবর্তী এই ফাঁক বা ব্যবধানটিকে বলা হয় স্নায়ুসন্ধি। অবশ্য একটি স্নায়ু শেষ হবার পর অন্য যে স্নায়ুটি শুরু হচ্ছে, তা একজাতীয় হ'তে পারে, আবার অন্য জাতীয়ও হতে পারে। অর্থাৎ স্নায়ুসন্ধির উভয় দিকে একজাতীয় অথবা ভিন্ন জাতীয় স্নায়ু- উভয় প্রকার স্নায়ুই থাকতে পারে।

অনেক সময় অনেকগুলি স্নায়ুর মধ্যে মাত্র একটি সাধারণ স্নায়ুসন্ধি দেখা যায়। পূর্ব পৃষ্ঠার 'ক' চিত্রে একটি স্নায়ুর স্নায়ুসূত্র শেষ হবার পর মাত্র একাধিক স্নায়ুর স্নায়ুগুল্ম শুরু হয়েছে। আবার 'খ' চিত্রে অনেকগুলি স্নায়ুর স্নায়ুসূত্র শেষ হবার পর মাত্র একটি স্নায়ুর স্নায়ুগুল্ম শুরু হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু একটা সাধারণ স্নায়ুসন্ধি উদ্ভূত হয়েছে।

উৎপত্তিস্থল থেকে শুরু করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো পর্যন্ত স্নায়বিক শক্তি তরঙ্গটিকে একাধিক স্নায়ুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে হয়। কাজেই ঐ শক্তি তরঙ্গটিকে একাধিক স্নায়ু সন্ধিও অতিক্রম করতে হয়। আমরা যে স্নায়বিক শক্তি অনুভব করি, তার প্রকৃতি খানিকটা রাসায়নিক ও খানিকটা বৈদ্যুতিক শক্তির মত। এই স্নায়বিক শক্তিপ্রবাহ স্নায়ুসন্ধিতে এসে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই প্রকার বাধার নাম সম্বন্ধমূলক বা স্নায়ুসান্ধিক প্রতিরোধ (Synaptic resistance)। কিন্তু কোন শক্তিতরঙ্গ যখন একই স্নায়ু সন্ধির মধ্য দিয়ে বার বার প্রবাহিত হতে থাকে, তখন ঐ স্নায়ু সন্ধিটির বাধাদানের ক্ষমতাটিও কমে যায়। তখন শক্তি তরঙ্গটি সহজেই ঐ স্নায়ু সন্ধিটিকে অতিক্রম করতে পারে। আবার 'খ' চিত্রের মত যখন একই সময়ে একাধিক স্নায়ুসূত্রের মধ্য দিয়ে স্নায়বিক শক্তিতরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে এসে একটিমাত্র সাধারণ স্নায়ুসন্ধির সামনে দাঁড়ায়, তখন ঐ সম্মিলিত শক্তি তরঙ্গের শক্তি একক শক্তি তরঙ্গের তুলনায় বেশী হয় এবং স্নায়ু সন্ধির বাধাটি অতিক্রম করাও সহজ হয়। প্রথম প্রথম সাইকেল করতে বা সাঁতার কাটতে গেলে অসুবিধা হয়, হাত-পা ব্যথা করে, ভুল হয় বেশী। কিন্তু বার বার অভ্যাসের ফলে অসুবিধাগুলি দূরীভূত হয়। প্রথম দিকে সংশ্লিষ্ট স্নায়ুসন্ধিগুলি বেশী বাধা দিত বলে কাজটি সহজে করা যেত না। কিন্তু বার বার কাজটি করার ফলে স্নায়ু সন্ধির বাধা হ্রাস পায় এবং আচরণটি সম্পন্ন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে—অভ্যাস গঠনে স্নায়ুসন্ধির প্রভাব অসীম।

এই স্নায়ুসন্ধিগুলি উদ্দীপনাকে এক পথ থেকে সরিয়ে সম্পূর্ণ অন্য পথেও পরিচালিত করতে পারে। তাছাড়া স্নায়ুসন্ধির আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—উদ্দীপনাটি এক নিউরন থেকে অন্য নিউরনে হয় সম্পূর্ণরূপে প্রবাহিত হবে, নয়তো মোটেই হবে না। এর মাঝামাঝি কোন সম্ভাবনা কিন্তু নেই। তার অর্থ হ'ল এই যে, আংশিক ভাবে অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত কোন উদ্দীপনা কখনও এক

নিউরন থেকে অন্য নিউরনে প্রবাহিত হয় না। এটিকে বলা হয়—**"সম্পূর্ণ বা একেবারে না" তত্ত্ব** (All or None Theory)। আবার 'ক' এবং 'খ' চিত্র থেকে দেখা যায়—একটি নিউরন থেকে উদ্দীপনাটি একাধিক নিউরনে যেমন সঞ্চালিত হতে পারে, তেমনি অনেকগুলি নিউরনের উদ্দীপনা একসঙ্গে একত্রিত হয়ে মাত্র একটি নিউরনেও সঞ্চালিত হতে পারে।

তাৎক্ষণিক সাড়া (Reflex Action) **বা প্রতিবর্ত ক্রিয়া ঃ**

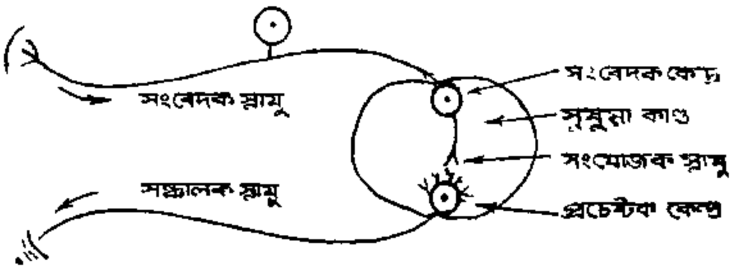

তাৎক্ষণিক সাড়ার সংজ্ঞা Dictionary of Psychology-তে এইভাবে বলা হয়েছে : "The direct and immediate response of an effector (muscle, or, gland) or group of effectors, to the stimulation of a receptor (Sense organ), sometimes employed loosely of any apparently mechanical or automatic response to a stimulus or even to an object."

এমন কতকগুলি উত্তেজক আছে যেগুলির প্রতি স্বাভাবিক ভাবে বলতে গেলে যন্ত্রচালিতের মত সাড়া দেবার ক্ষমতা নিয়েই আমরা জন্মেছি। চোখের উপর জোরালো আলো পড়লে, বা কোন কিছু ঢুকে গেলে বা কেউ চোখের সামনে আঙুল বাড়ালে আমরা সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা বন্ধ করে ফেলি। নাকে কিছু ঢুকলে হাঁচি পায়। পায়ের নীচে কিছু ফুটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে পা সরিয়ে নিই। খুব জোরালো শব্দ শুনলে চমকে উঠি। গরম জিনিসে আচমকা হাত দিয়ে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিই। খাদ্যবস্তুর সংস্পর্শে এলে রসনা রসসিক্ত হয়, আবার খাদ্যকণা শ্বাসনালীতে ঢুকলে বিষম লাগে। এই যে সাড়া দেবার ক্ষমতা—এগুলি কিন্তু অভিজ্ঞতার সাহায্যে অর্জন করতে হয় না। এগুলি আমাদের সহজাত ক্ষমতা। এইগুলি সম্পন্ন করতে আমাদের ইচ্ছাপ্রসূত চেষ্টার কোন রকম প্রয়োজন হয় না। যেখানে

প্রতিক্রিয়াটি উদ্দীপক বা উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে বা সামান্য পরেই দেখা দেয়, এবং যেখানে চিন্তা, বুদ্ধি বা বিবেচনার কোন প্রয়োজন নেই, তাকেই তাৎক্ষণিক সাড়া বা প্রতিবর্ত ক্রিয়া বা reflex action বলে। একটা সহজ উদাহরণ দেওয়া যাক্। ধরা যাক্ আমি একটি বেশ চিত্তাকর্ষক গল্পের বইয়ে ডুবে আছি। এমন সময় একটি মশা এসে আমার পিঠে কামড়াল। যন্ত্রচালিতের মত আমার হাতটি পিঠে গিয়ে মশাটিকে তাড়াবে—বই থেকে মনোযোগ সরবে না, হয়তো মশার কথা জানতেই পারব না। এই তাৎক্ষণিক সাড়া হ'ল আমাদের আচরণের সরলতম রূপ। যে প্রাণী যত নিম্নস্তরের, তার মধ্যে তাৎক্ষণিক সাড়ার সংখ্যা তত বেশী। প্রাণী যত উন্নততর হতে থাকে, ততই তার আচরণ জটিলতর হতে থাকে।

আমাদের বেশীর ভাগ তাৎক্ষণিক সাড়াকে নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের সুষুম্নাকাণ্ডটি। কিন্তু মুখমণ্ডলের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি যে সমস্ত ইন্দ্রিয় আছে, সেগুলির তাৎক্ষণিক সাড়াকে নিয়ন্ত্রিত করে আমাদের **পুরামস্তিষ্ক** (old brain)। তবে একথাটি মনে রাখলে ভাল হয় যে, আমাদের পুরামস্তিষ্কের সঙ্গে চেতনার কোন সম্পর্ক নেই। চেতনা প্রধানত নির্ভর করে নব-মস্তিষ্কের উপর। যেহেতু নবমস্তিষ্কের সঙ্গে তাৎক্ষণিক সাড়াগুলির কোন সম্পর্ক নেই, সেইজন্য এগুলি আমাদের অজ্ঞাতসারেই ঘটে থাকে। তাৎক্ষণিক সাড়া সম্পাদিত হতে হ'লে অন্ততঃ একটি সংবেদক স্নায়ু ও একটি সঞ্চালক স্নায়ুর প্রয়োজন। মশার কামড়ের উদাহরণটিই ধরা যাক্ না কেন। মশার কামড়ের ফলে সেই জায়গায় সংবেদক স্নায়ুতে যে শক্তি তরঙ্গের উদ্ভব হ'ল, সেই তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে সুষুম্নাকাণ্ডের একটি বিশেষ স্থানে এসে পৌছাল। এইবার ঐ তরঙ্গ স্নায়ুসন্ধি অতিক্রম করে সঞ্চালক স্নায়ুর মধ্য দিয়ে হাতের মধ্যবর্তী সংশ্লিষ্ট মাংসপেশীতে এসে পৌছাল। এখন হাতের মাংসপেশীর সংকোচনের ফলে হাতটি উঠে মশাটিকে হয় মেরে ফেলল, নয়তো তাড়িয়ে দিল। গোড়া থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত স্নায়বিক শক্তি তরঙ্গটি যে পথ অতিক্রম করে, সেটা অনেকটা বৃত্তচাপের মত দেখতে বলে সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয় ও পেশী সমেত এই সামগ্রিক পথটিকে বলা হয় **তাৎক্ষণিক সাড়ার চাপ** (Reflex Arc)। এই সংযোগের প্রকৃতিটি পূর্ব নির্ধারিত থাকে বলে এই জাতীয় আচরণে কোন বৈচিত্র্য থাকে না; এটি হয় যান্ত্রিক ও

সুনির্দিষ্ট। হাঁটুর ঠিক নীচে কোন শক্ত জিনিস দিয়ে আঘাত করলে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পা-টি বেগে ঝাঁকানি দিয়ে উঠবে। একে বলে 'হাঁটু-ঝাঁকানি' (Knee Jerk) রিফ্লেক্স। আমাদের শরীরাভ্যন্তরে যে সমস্ত গ্রন্থিরস নিঃসৃত হয়, সেগুলিও একজাতীয় রিফ্লেক্স।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্নায়বিক শক্তিতরঙ্গ সুষুম্নাকাণ্ড বা পুরামস্তিষ্কে পৌঁছাবার আগে অনেকগুলি সংবেদক স্নায়ুর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়; আবার সুষুম্নাকাণ্ড বা পুরামস্তিষ্ক থেকে সংশ্লিষ্ট মাংসপেশীতে আসতে হলে অনেকগুলি সঞ্চালক স্নায়ুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। তা ছাড়া সুষুম্নাকাণ্ড বা পুরামস্তিষ্কে সংবেদক ও সঞ্চালক স্নায়ুগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত হয় না। সংবেদক স্নায়ুর কাজ শেষ হলেই স্নায়বিক শক্তি তরঙ্গটি স্নায়ুসন্ধি অতিক্রম করে সরাসরি ভাবে সঞ্চালক স্নায়ুর মধ্যে সঞ্চালিত হয় না। এদের মাঝখানে আছে সংযোজক স্নায়ু। সংবেদক স্নায়ু শক্তিতরঙ্গটি পাঠাবে সংযোজক স্নায়ুতে। সংযোজক স্নায়ু সেটি আবার পাঠাবে সঞ্চালক স্নায়ুতে।

তাৎক্ষণিক সাড়া সম্বন্ধে আরো একটা কথা। আগেই বলা হয়েছে তাৎক্ষণিক সাড়ার সঙ্গে পুরামস্তিষ্কের সংযোগ আছে বলে সেগুলি প্রায়ই আমাদের অজ্ঞাতসারে ঘটে থাকে। কিন্তু আবার এও দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই আমরা এগুলি সম্বন্ধে সচেতন। চোখে কিছু পড়লে সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করি কিন্তু সে সম্বন্ধে আমরা কি সচেতন হই না? মশায় কামড়ালে মশাটি তাড়াই ঠিকই, কিন্তু সে সম্বন্ধে আমরা কি সচেতন নই? কেন এমন হয়? এর উত্তরে বলতে হচ্ছে—একই সময়ে যখন সংবেদক স্নায়ু থেকে সংযোজক স্নায়ুর মাধ্যমে শক্তি তরঙ্গটি সঞ্চালক স্নায়ুতে প্রবাহিত হচ্ছে, ঠিক তখনই সেই শক্তিতরঙ্গের কিছুটা সংযোজক স্নায়ু দ্বারা বাহিত হয়ে সুষুম্নাকাণ্ড বা পুরামস্তিষ্ক থেকে নবমস্তিষ্কের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে যায়। শক্তি তরঙ্গটি নব মস্তিষ্কে এলেই সেটির সম্বন্ধে আমরা একটা চেতনা অনুভব করি। তবে ঠিক সেই মুহূর্তে যদি আমরা অন্য কোন বিষয়ে গভীর-ভাবে মনোনিবেশ করে থাকে, তবে চেতনাটি হবে অত্যন্ত অস্পষ্ট। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমাদের তাৎক্ষণিক সাড়াগুলি চেতনার উপর নির্ভরশীল না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা সেগুলির সম্পাদনায় ক্ষেত্রে সচেতন হতে পারি। আবার বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সাড়ার উপর

আমাদের চেতনা অজ্ঞভাবেও প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এই জায়গাটি যখন লিখছি, তখন আমার পিঠের উপর একটি মশা এসে বসল। ভাবলাম এটুকু শেষ না করে মশাটিকে তাড়াব না। তেমনি চোখে জোরালো আলো পড়লে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ না করতেও পারি। এখানে যে জিনিসটি তাৎক্ষণিক সাড়াটিকে নিয়ন্ত্রিত করছে সেটি হ'ল আমাদের ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তি আবার নির্ভর করে নবমস্তিষ্কের উপর। যা কিছু সচেতন প্রচেষ্টা, সবই নির্ভর করছে নবমস্তিষ্কের উপর।

স্নায়ুতন্ত্রের বিভাগ (Classification of Nervous System): আমাদের স্নায়ুতন্ত্রটি সুসংবদ্ধ একটি একক হিসাবে কাজ করলেও এর কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী এটিকে প্রধান প্রধান কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন —কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র ও অটোনমিক বা স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র। এগুলির কথা আগেই বলা হয়েছে। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অধীন**। **প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের** মধ্যে পড়ে সেই সকল স্নায়ু যেগুলি মেরুদণ্ড থেকে বের হয়ে দেহের বিভিন্ন জায়গাতে ছড়িয়ে পড়েছে। আর **অটোনমিক স্নায়ুতন্ত্রটি** মস্তিষ্ক থেকে বের হয়ে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদি দেহের ভেতরের যন্ত্রপাতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। এই স্নায়ুতন্ত্রটি বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে প্রক্ষোভ জাগরণ, প্রাক্ষোভিক সক্রিয়তা ইত্যাদির সময়। যে কোন প্রক্ষোভ-মূলক আচরণের পশ্চাতে এই স্নায়ুতন্ত্রটির সক্রিয়তা থাকবেই। এখন মস্তিষ্ক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক—

স্নায়ুতন্ত্রের বিবর্তন: অ্যামিবা, জেলিফিস্ ইত্যাদি কতকগুলি আদিম প্রাণীর মধ্যে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র নেই। এদের দেহে কেবলমাত্র দু'রকমের স্নায়ু আছে—সংবেদক ও সঞ্চালক। কিন্তু সংযোজক স্নায়ু না থাকার জন্য সংবেদক ও সঞ্চালক স্নায়ু প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত থাকে। স্নায়ুগুলি এদের সর্বদেহে সমান ভাবে ছড়িয়ে থাকে। এইজন্য এই সমস্ত প্রাণীর দেহকে লম্বালম্বি বা আড়া-আড়ি ভাবে কতকগুলি খণ্ডে বিভক্ত করলেও বিভিন্ন খণ্ডগুলির ক্রিয়া অব্যাহতই থাকে। এর থেকে বোঝা যায় এদের দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক নেই। একটি অংশ থেকে আর একটি অংশ পৃথক করে নিলেও উভয় অংশই স্বাধীন ভাবে উত্তেজনার প্রতি সাড়া দিতে পারে। এই সব প্রাণীর মধ্যে মাত্র দু'রকমের স্নায়ু থাকার ফলে স্নায়ুসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম,

হওয়ার জন্য এই সব প্রাণীর সাড়ার মধ্যে কোনরকম বৈচিত্র্য বা বিবিধতা থাকে না। এদের সাড়ার সংখ্যা মুষ্টিমেয় ও সুনির্দিষ্ট প্রকৃতির। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের প্রথম সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায় কেঁচো জাতীয় অপেক্ষাকৃত উন্নততর অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে। উপরোক্ত প্রাণীর মত এদের স্নায়ুগুলি একক অবস্থায় থাকে না। কতকগুলি স্নায়ুকোষ একসঙ্গে মিলিত হয়ে মাঝে মাঝে এক একটি স্নায়ুপুঞ্জের (Nerve ganglion) সৃষ্টি হয়। এই স্নায়ুপুঞ্জ সমেত স্নায়ুতন্ত্রটিকে দেখায় একটি মালার মত। নিম্নস্তরে যে সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী থাকে, তাদের ক্ষেত্রে

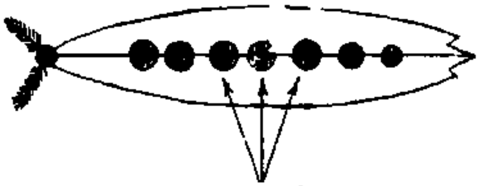

এই স্নায়ুপুঞ্জগুলিই সুষুম্নাকাণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে যায়। একেবারে সামনের দিকে যে স্নায়ুপুঞ্জটি থাকে, সেটি কালক্রমে রূপান্তরিত হয়ে প্রথমে পুরমস্তিষ্ক ও পরে নব মস্তিষ্কে পরিণত হয়েছে। এইভাবেই মস্তিষ্কের উদ্ভব হ'ল। এখন মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

৫। **থ্যালামাস** (Thalamus) : থ্যালামাসটি হ'ল মস্তিষ্কের প্রাচীনতম অংশ। এটিকে আদি মস্তিষ্কও বলা হয়। এর অবস্থান মধ্যমস্তিষ্কের ঠিক উপরে। সংবেদনমূলক উদ্দীপনাগুলিকে মস্তিষ্কের যথাযথ স্থানে পরিচালিত করতে পারে এই থ্যালামাসটিই।

৬। **হাইপোথ্যালামাস্** (Hypothalamus) : এটি অবস্থিত থ্যালামাসটির নীচে ও সেতু-মস্তিষ্কের উপরে। আগে মনে করা হত থ্যালামাসটিই প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া জাগরণের কেন্দ্র কিন্তু আধুনিক কালে ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে হাইপোথ্যালামাসটিই এ জাতীয় প্রতিক্রিয়া জাগরণের কেন্দ্র।

৭। **গুরু বা নবমস্তিষ্ক** (Cerebrum) : আমরা আগেই দেখেছি মস্তিষ্ককে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—গুরুমস্তিষ্ক, লঘুমস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড। বিবর্তনের পথে প্রাণী যত উন্নত হতে থাকে, তার নব মস্তিষ্কের

আয়তন ও গঠনের জটিলতাও তত বেশী হতে থাকে। মানুষের ক্ষেত্রে নব-মস্তিষ্কের আয়তনটি এত বড় হয়ে গেছে যে সেটি পুরামস্তিষ্ককে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। আমাদের খুলির ঠিক নীচেই নবমস্তিষ্কটি অবস্থিত। এর উপরের দিকটা দেখতে ধূসর রঙের। সেই জন্য এই অংশকে বলে ধূসরবস্তু (Grey matter)। এগুলি লক্ষ লক্ষ স্নায়ুকোষের সমষ্টি মাত্র। ধূসরবস্তুর নীচে রয়েছে শ্বেতবস্তু (white matter)। যে সমস্ত স্নায়ুকোষ দিয়ে ধূসর বস্তু গঠিত, সেই সমস্ত স্নায়ুকোষগুলির নিম্নগামী সূত্ররাজির সমন্বয়ে শ্বেতবস্তু গঠিত। ধূসর বস্তুর মধ্যে অজস্র খাঁজ এবং ভাঁজ (Fissures and Folds) দেখা যায়। মস্তিষ্কের সম্মুখ থেকে পিছন পর্যন্ত একটি রেখা মস্তিষ্ককে একটি বড় রকমের খাঁজ দ্বারা দুটি সমান খণ্ডে ভাগ করেছে। কিন্তু এই খণ্ড দুটি বিচ্ছিন্ন নয়।

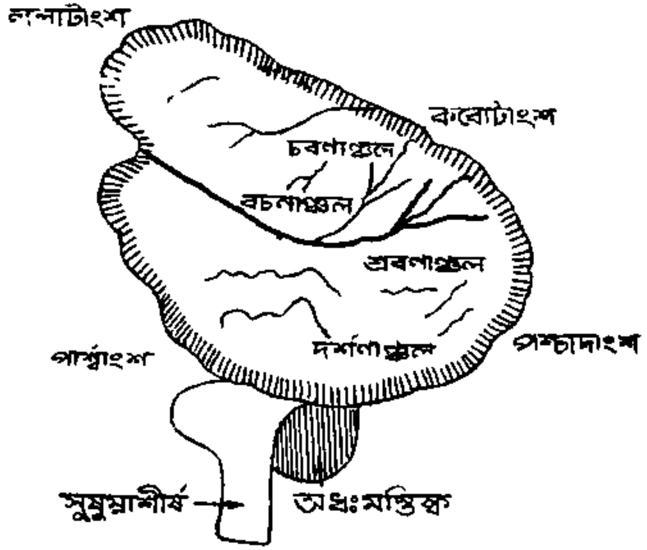

Corpus Callosum নামে একটি যোজক এই খণ্ড দুটিকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। মজার ব্যাপার এই যে নব মস্তিষ্কের দক্ষিণ দিকের খণ্ডটি আমাদের দেহের বাম অংশের ক্রিয়াকলাপকে এবং বামদিকের খণ্ডটি দক্ষিণ অংশের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রত্যেকটি খণ্ডেই আবার দুটি গভীর বিদারণ রেখা দেখা যায়। তাদের বলা হয় রোলাণ্ডোর ফাটল (Fissure of Rolando) এবং সিলভিয়াসের ফাটল (Fissure of Sylvius)। নব মস্তিষ্কের

বাম ও দক্ষিণ খণ্ড প্রত্যেকটি আবার চারটি পিণ্ড (Lobe) বা অংশে বিভক্ত। সম্মুখ দিক থেকে শুরু করে পশ্চাৎ দিকের এই পিণ্ডগুলির নাম হ'ল ললাটাংশ (Frontal lobe), করোটাংশ (Parietal lobe), পশ্চাদংশ (Occipital lobe) এবং পার্শ্বাংশ (Temporal lobe)।

মস্তিষ্কের উপরের তল মসৃণ নয়। কুলকপির ওপরের অংশের মত অমসৃণ ও উঁচু নীচু। তাছাড়া উপরের তলটি বিভিন্ন মাপের বহু খালে (Sulci) বিদীর্ণ ও বেশ আকুঞ্চিত (Convoluted)। এই অনুকুনগুলি ও বিদীর্ণ খাঁজগুলি যত বেশী এবং যত গভীর হয়, ততই ধূসর স্নায়ুপদার্থ বেশী করে থাকবার সম্ভাবনা। এর ফলে মস্তিষ্ক উন্নত হয় বুদ্ধিও তত বেশী হয়। মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে যে সমস্ত সূক্ষ্ম স্নায়ুকোষ ও স্নায়ুসংযোগ আছে সেগুলির উপরই বুদ্ধির স্বল্পতা ও প্রাচুর্য নির্ভর করে। এই সংযোগসূত্রগুলি যত বেশী সংখ্যায় থাকবে এবং বিভিন্ন কেন্দ্রের সংযোগসূত্রগুলি যত জটিল প্রকৃতির হবে, বুদ্ধিও তত বেশী প্রখর হবে এবং তার পরিমাণও বেশী হবে।

পিটার স্যাণ্ডিফোর্ড (Peter Sandiford) স্নায়ুতন্ত্রের যে বিভাগটি দিয়েছেন তা নিম্নরূপ —

1. The Central Nervous System :—

A. The Brain
- Cerebrum
  - R Hemisphere
  - L Hemisphere
    - Frontal lobe, Parietal lobe, Occipital lobe, Temporal lobe, Limbic lobe — All divided into gyri by fissures or sulci.
- Cerebellum — Two Lateral lobes (Cerebellar hemispheres); One Central lobe (Vermis).
- Mid Brain
- Pons
- Medulla oblongata

B. The Spinal Cord

2. The Peripheral Nervous System—

A. Cerebrospinal Nerves { 12 Cranial Nerves; 31 Spinal Nerves.

B. The Autonomic Nervous System { Two Gangliated Cords or trunks; Plexuses; Nerves.

সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal cord) : যে স্নায়ুগুচ্ছটি মস্তিষ্ক থেকে বের হয়ে মেরুদণ্ডের মাঝখান দিয়ে সুষুম্নাপথে নেমে আসে, তাকে বলা হয় সুষুম্নাকাণ্ড। মস্তিষ্ক থেকে স্নায়ুগুলি নেমে এসে মেরুদণ্ডের হাড়ের টুকরো গুলির মধ্য দিয়ে

দেহের সমস্ত পেশী, গ্রন্থি ও অন্যান্য আভ্যন্তরিণ যন্ত্রাদির মধ্যে ছড়িয়ে যায়। সুষুম্নাকাণ্ডকে বলা যায় একটি অলিন্দ পথ যার মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর সঙ্গে দেহের বাকী সমস্ত অংশের সংযোগ সাধিত হয়। সুষুম্নাশীর্ষ থেকে কোমরের হাড় পর্যন্ত এটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ ইঞ্চি। এটির প্রস্থ প্রায় আধ ইঞ্চি। আমাদের মেরুদণ্ডটি যেহেতু ৩১টি হাড়ের টুকরার সমন্বয়ে গঠিত সেইজন্য দুটি হাড়ের টুকরার সন্ধিস্থলের ফাঁক থেকে মেরুদণ্ডের দু'দিকে সুষুম্নাকাণ্ড থেকেও ৩১ জোড়া নার্ভ বা স্নায়ুসূত্র পাখীর পালকের মত ছড়িয়ে আছে। এই ৩১ জোড়ার হিসাবটি এই রকম—

ঊর্ধ্বাংশ থেকে ৫ জোড়া (cervical)
মধ্য সুষুম্নাকাণ্ড থেকে ৭ জোড়া (lumbar)
এবং ঐ অংশেই ১২ জোড়া (dorsal)
নীচের দিকে ৪ জোড়া (sacral)
একেবারে নীচে ৩ জোড়া (coccyn)

প্রাত্যন্তিক বা উপান্ত বা প্রান্তবর্তী স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral nervous system): প্রাত্যন্তিক স্নায়ু হ'ল সেই সমস্ত স্নায়ুতন্তু যেগুলি আমাদের শরীরের বহিরাংশগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে কোন অংশের সংযোগ সাধন করে। এই সমস্ত প্রাত্যন্তিক স্নায়ুগুলকে একত্রে বলা হয় **প্রাত্যন্তিক স্নায়ুতন্ত্র**। এগুলি যে যে স্থান থেকে উৎপন্ন হয়, সেই উৎপত্তি স্থান অনুসারে এদের দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(১) **মস্তিষ্ক ব করোটি স্নায়ু** (cranial nerves) ও (২) **সুষুম্না স্নায়ু** (spinal nerves)।

যে সমস্ত স্নায়ু মস্তিষ্ক থেকে বের হয়ে সোজাসুজি মাথার খুলির ভিতর দিয়ে আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়—যেমন চোখ, নাক, কান ইত্যাদিতে যায়, তাদের বলা হয় **মস্তিষ্ক স্নায়ু**। এগুলি দ্বারা প্রধান বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে দেহের প্রান্তস্থ বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বা 'গ্রাহক' (receptors) এবং পেশী বা সাধন যন্ত্রের (effectors) সংযোগ থাকে। মস্তিষ্ক স্নায়ুগুলির কোন কোনটি কেবল বহির্মুখী (efferent), কোন কোনটি কেবল অন্তর্মুখী (afferent) এবং বাকিগুলি মিশ্র (mixed)। সর্বসমেত মোট ১১ জোড়া মস্তিষ্ক স্নায়ু আছে—

(১) **ঘ্রাণজ স্নায়ু** (olfactory nerves)—অন্তর্মুখী, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত।

(২) চাক্ষুষ স্নায়ু (optic nerves)—অন্তর্মুখী, অক্ষিপটের সঙ্গে যুক্ত।

(৩) চক্ষুঃ সঞ্চালক স্নায়ু (oculo-motor nerves)—বহির্মুখী, অক্ষি-গোলকের সঙ্গে যুক্ত।

(৪) চক্ষুঃ পেশী স্নায়ু (trochlear nerves)—বহির্মুখী, চক্ষুর পেশীর সঙ্গে যুক্ত।

(৫) স্নায়ুত্রয় (trifacial nerves)—মিশ্র, মুখমণ্ডল, জিহ্বা ও চর্বন কার্যের পেশীর সঙ্গে যুক্ত।

(৬) সুষুম্নাশীর্ষক স্নায়ু (abducent)—বহির্মুখী, অক্ষির পেশীর সঙ্গে যুক্ত।

(৭) মুখমণ্ডলের স্নায়ু (facial nerves)—মিশ্র, জিহ্বা ও মুখমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত।

(৮) শ্রোত্রস্নায়ু (auditory nerves)—অন্তর্মুখী, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত।

(৯) রাসন স্নায়ু (glossopharyangeal nerves)—মিশ্র, জিহ্বা ও গলবিল (pharynx) এর সঙ্গে যুক্ত।

(১০) ভ্রাম্যমান স্নায়ু (vagus nerves)—মিশ্র, দেহের বিভিন্ন অংশে পরিব্যাপ্ত।

(১১) সুষুম্না সহায়ক স্নায়ু (spinal accessory nerves)—বহির্মুখী, গ্রীবার সঙ্গে যুক্ত।

(১২) ক্ষুদ্র রাসন স্নায়ু (hypoglossal nerves)—বহির্মুখী, জিহ্বার সহিত যুক্ত।

আবার যে সমস্ত স্নায়ুতন্তু সুষুম্নাকাণ্ড থেকে নির্গত হয়ে আমাদের হাত, পা, শরীরের চামড়া প্রভৃতি অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়, তাদের বলা হয় **সুষুম্না স্নায়ু**। সুষুম্নাকাণ্ড থেকে একত্রিশ জোড়া স্নায়ুতন্তু বের হওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। এগুলি সুষুম্নাস্নায়ুর অন্তর্গত। এগুলির অন্য নাম হল **দৈহিক স্নায়ু** (somatic nerves)

স্বয়ংক্রিয় বা স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic nervous system বা A. N. S.): এই বিশেষ স্নায়ু-মণ্ডলীটি মস্তিষ্ক বা মেরুদণ্ড থেকে বার হয়ে শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থি, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলীর মাংসপেশী, দেহচর্ম প্রভৃতির সঙ্গে

সংযুক্ত। কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে স্নায়বিক উদ্দীপনা বা উত্তেজনা এই স্নায়ুমণ্ডলীটি বেয়ে গ্রন্থি, হৃদযন্ত্র প্রভৃতিতে পৌঁছায় ও সেগুলিকে সক্রিয় করে তোলে। এই স্নায়ুতন্ত্র বহির্মুখী। এই পথে যে শক্তি পরিবাহিত হয়, সেটি গ্রন্থি, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি আভ্যন্তরিণ যন্ত্রের অনৈচ্ছিক পেশীগুলিকে চালিত করে। এই স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে স্বাধীন। আবার যে সমস্ত স্নায়ুকোষের ভিতর দিয়ে স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে উৎপন্ন শক্তি পরিচালিত হয়, সেগুলি মেরুদণ্ডের বাইরে থাকে।

স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের আবার দুটি প্রধান বিভাগ আছে-sympathetic বা সমবেদী এবং parasympathetic বা পরাসমবেদী। সমবেদী বিভাগটি বক্ষোদেশ এবং কটিদেশের স্বতঃক্রিয় স্নায়ু নিয়ে এবং পরাসমবেদী বিভাগটি গ্রীবাদেশ, ত্রিকাস্থি ও অনুত্রিকাস্থি নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে এগুলির সংযোগ আছে। একটি তালিকার সাহায্যে স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে দেহের বিভিন্ন অংশের সংযোগ বুঝানোর চেষ্টা করা হ'ল—

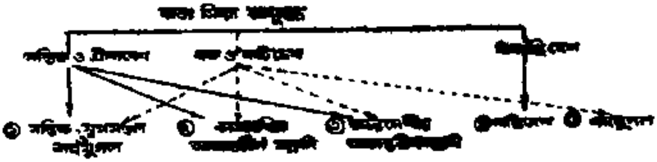

এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, সমবেদী ও পরাসমবেদী বিভাগের সঙ্গে বহুক্ষেত্রেই দেহের একই অংশের সংযোগ আছে। তবে উহাদের **কার্যের বৈশিষ্ট্য কিন্তু এক নয়—সম্পূর্ণ পৃথক**। যেমন—

(১) সমবেদী বিভাগে যে সমস্ত স্নায়ু-গ্রন্থি থাকে, সেগুলি মেরুদণ্ডের কাছাকাছি থাকে। কিন্তু পরাসমবেদী বিভাগের স্নায়ু-গ্রন্থিগুলি ঐ বিভাগ দ্বারা যে সমস্ত পেশী উদ্দীপিত হয়, তাদের কাছাকাছি থাকে।

(২) সমবেদী স্নায়ুতন্ত্র সাধারণতঃ দেহাংশগুলিকে উত্তেজিত করে, অর্থাৎ এই স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা যে শক্তি পরিবাহিত হয় তা **উত্তেজক প্রকৃতির** (excitatory)। পরাসমবেদী বিভাগ কিন্তু সেগুলিকে প্রশমিত করে, অর্থাৎ এই স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা পরিবাহিত শক্তি **নিরোধক** (inhibitory)।

(৩) উত্তেজনা যখন তীব্র হয়, বিশেষতঃ রাগ ও ভয়—এই দু'রকম

প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে সমবেদী বিভাগ কার্যকরী হয়। এই বিভাগটির সক্রিয়তার ফলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বাড়ে, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয়, রক্ত সঞ্চালনের গতি বেড়ে যায় এবং কিড্‌নীতে সঞ্চিত শর্করা মুক্ত হয়ে রক্তে প্রবেশ করে। এর ফলে পরিপাক যন্ত্রের কাযও ব্যাহত হয়। এটি কিন্তু পরীক্ষিত সত্য। ভোজনকালে বিড়াল, কুকুর ইত্যাদি প্রাণীকে কৃত্রিম উপায়ে ক্রুদ্ধ বা ভীত করে X'ray-র সাহায্যে দেখা গেছে যে তাদের পরিপাক ক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। আবার আহারের পরই আত্মহত্যা করেছে এমন ব্যক্তির পোষ্ট-মর্টেম রিপোর্টে দেখা গেছে যে তাদের পরিপাক যন্ত্রের কাজ আত্মহত্যার পূর্বেই বন্ধ হয়েছিল। অনেক মা শিশুদের খাওয়াবার জন্য জুজুবুড়ীর ভয় দেখান বা মারধর করে কাঁদান। কিন্তু এটা খুব খারাপ, কারণ তাতে পরিপাক ক্রিয়াটি বন্ধ না হলেও ব্যাহত হতে পারে। সমবেদী স্নায়ুতন্ত্র সেই সকল গ্রন্থিরস নির্গত করে-যেগুলি শরীরে উত্তেজনা জাগাতে সক্ষম। অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে যে অ্যাড্রেনালিন রস নির্গত হয় তা ব্যক্তিতে উত্তেজনামূলক কাজে উদ্যম ও শক্তি জোগায়। সমবেদী স্নায়ুতন্ত্র অ্যাড্রেনাল গ্রন্থিকে উত্তেজিত করে যায় ফলে যকৃৎ থেকে শর্করা নির্গত হয়। এই শর্করা দেহযন্ত্রের জ্বালানী রূপে ব্যবহৃত হয় এবং দেহে ঘাম দেখা দিতে শুরু করে।

পরাসমবেদী স্নায়ুতন্ত্র কিন্তু উত্তেজনা প্রশমিত করার ক্ষমতা রাখে। মনে যখন আনন্দ বা তৃপ্তির একটা অনুভূতি জাগে বা প্রীতির সঞ্চার হয়, তখন এই বিভাগটি সক্রিয় হয়। কোন মধুর সংগীত শ্রবণে, মনোরম সৌন্দর্য দর্শনে, সুস্বাদু আহার দর্শনে, ঘ্রাণে বা ভোজনে- এই বিভাগটি সক্রিয় হয়। এই বিভাগটি সক্রিয় হলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কমে আসে, শরীরের উত্তাপ অল্প হয়, রক্তপ্রবাহ মন্থর হয়, পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়া স্বচ্ছন্দ ও দ্রুত হয়, পরিপাচন ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় রসক্ষরণ, লালাক্ষরণ, যৌনগ্রন্থির সক্রিয়তা ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়।

(৪) সমবেদী স্নায়ুতন্ত্র উদ্দীপিত হলে আমরা যে সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করি (যেমন, রাগ বা ভয়), সেগুলি সমগ্র দেহ যন্ত্রের কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধন করে এবং দেহকে বিপন্মুক্ত করে। কিন্তু পরাসমবেদী স্নায়ুতন্ত্র বিশেষ বিশেষ কোন অঙ্গের উদ্দেশ্য সাধন করে।

(৫) ক্ষুধামূলক (appetitive) বা বৃদ্ধিমূলক (vegetative) প্রাক্ষোভিক

প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে (যেমন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌন উত্তেজনা ইত্যাদি) পরাসমবেদী বিভাগটি সক্রিয় হয়ে ব্যক্তির মধ্যে একটা তৃপ্তি বা প্রশান্তির ভাব আনে। কিন্তু আকস্মিক (emergency) বা প্রস্তুতিমূলক (preparatory) প্রাক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ার (যেমন রাগ, ভয় ইত্যাদি) ক্ষেত্রে সমবেদী স্নায়ুতন্ত্রটি উদ্দীপিত হয় এবং ব্যক্তির মধ্যে উত্তেজনা বা সক্রিয়তার মাত্রা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

পরিশেষে একটি কথা—সমবেদী স্নায়ুতন্ত্রের কর্মিটি উত্তেজনাধর্মী ও পরাসমবেদী স্নায়ুতন্ত্রের কাজ প্রশমনধর্মী হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সমবেদী স্নায়ুতন্ত্রকেও প্রশমন বা অবদমনের কাজ করতে দেখা যায়।

দেহ ও মনের সম্বন্ধ (Relation between body and mind) : দেহ ও মনের মধ্যে যে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে সে কথা আমরা সকলেই জানি। দেহ অসুস্থ থাকলে মনও ভাল থাকে না, আবার মন খারাপ হ'লে দেহের উপর তার প্রতিফলন পড়ে। আমরা বাইরের জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এবং সেই জগৎ সম্বন্ধে সাড়া বা প্রতিক্রিয়া দিই পেশীসমূহের সাহায্যে। কিন্তু ইন্দ্রিয় ও পেশীই এর কার্যদ্বয়ের জন্য যথেষ্ট নয়। বিভিন্ন স্নায়ুতন্ত্র-প্রধানতঃ প্রধান বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ছাড়া মন নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। স্নায়ুতন্ত্রের যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে দেখা গেছে দেহের সকল অংশের মধ্যে মস্তিষ্কের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশী এবং মনের সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্বন্ধই অতি নিবিড়।

ইন্দ্রিয়গুলি স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যোমে মস্তিষ্কের সঙ্গে সংযুক্ত এবং মস্তিষ্কে উদ্দীপনা না পৌছালে কোন সংবেদন জন্মে না। আবার মস্তিষ্ক থেকে শক্তি উদ্ভূত না হলে পেশীগুলি সক্রিয় হতে পারে না। মানুষের চিন্তনশক্তি ও স্মৃতিশক্তি মস্তিষ্কের সুস্থ অবস্থার উপর নির্ভরশীল। মস্তিষ্কে কোন প্রকার আঘাত লাগলে বা মস্তিষ্কে রক্তবৃদ্ধি বা রক্তাল্পতা ঘটলে চেতনা লুপ্ত হয়, দেহও কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

দেহ ও মনের এই সম্পর্ককে দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক, উভয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বিচার করা হয়েছে। এখানে কেবলমাত্র মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যে আলোচনা করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হ'ল। এ বিষয়ে সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রধানতঃ দুটি মতবাদ গড়ে উঠেছে—(১) ক্রিয়া-

স্নায়বিক-সমান্তরালবাদ (Psycho-physical parallelism) এবং (২) **অন্যোন্যক্রিয়াবাদ বা মিথষ্ক্রিয়াবাদ** (Interactionism).

প্রথম মতবাদটি বলে-স্নায়বিক ক্রিয়া প্রবাহ ও মানসিক ক্রিয়া প্রবাহ সমান্তরাল ভাবেই চলে এবং দ্বিতীয় মতবাদটি বলে দেহ ও মন পরস্পরের উপর ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া করে। কিন্তু দেহ ও মনকে একেবারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন বলে মনে করা উচিত নয়। উহাদের সম্পর্কটি বাহ্য অভিজ্ঞতা থেকে পরিপূর্ণ ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্যাটির প্রকৃতি দার্শনিক। মনোবিদ্যা মূলতঃ অভিজ্ঞতাভিত্তিক। এই জাতীয় মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা যে কোন মতবাদই গ্রহণ করি না কেন, তা কিছু না কিছু অসম্পূর্ণ থাকবেই। সেইজন্য মনোবিদকে আর একটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত—সেটি হ'ল—মনের উদ্দেশ্যমুখিতা বা **বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের প্রতি মনের লক্ষ্য**।

মিথষ্ক্রিয়াবাদ বলে—মন দেহের উপর এবং দেহ মনের উপর প্রতিক্রিয়া করে। তখন এ কথা মনে রাখা উচিত—মন কোন একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেহের মাধ্যমে ক্রিয়া করে এবং দেহ-মনের উপর ক্রিয়ার ফলে যে পরিবর্তনের সৃষ্টি করে মন সেইটির তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করে।

তেমনি সমান্তরবাদ বলে দেহ, ও মন সমান্তরাল ভাবে কাজ করে। তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে দেহের কর্মপদ্ধতি মন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বা স্বাধীন এবং দেহও মনকে বাদ দিয়ে সব সময় কাজ করতে পারে। দেহ মনের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে কাজ করে যায় কারণ ঐ রকম কাজের মাধ্যমেই দেহের দ্বারা মনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

[তুলনীয় : "Psychology and physiology are no longer two parallel sciences, but two accounts of behaviour, the first concrete, the second abstract"—Merleau-Ponty]

মস্তিষ্ক ও মনের সম্পর্ক (Relation between brain and mind): উপরের আলোচনাতে দেহ ও মনের সম্পর্ক প্রসঙ্গে মস্তিষ্কের সঙ্গে মনের সম্পর্কের কিছুটা অবতারণা করা হয়েছে, মন বা মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে মস্তিষ্কের যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সে সম্পর্কে আরো কিছু প্রমাণ ও তথ্য সন্নিবেশিত করা হ'ল—

[এক] মস্তিষ্কই হ'ল শরীরের সমস্ত স্নায়ুর সমন্বয় কেন্দ্র। এই সমন্বয়ের কোন অংশ নষ্ট হয়ে গেলে সেই অংশের অধীনস্থ শরীরের অন্য অংশগুলি কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। একে বলা হয় পক্ষাঘাত। তখন আর সেই পক্ষাঘাত দুষ্ট অংশে কোনো সাড়া বা উত্তেজনা জাগে না। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে বাইরের কোন উত্তেজনা থেকে জ্ঞান পেতে হলে সেটিকে মস্তিষ্ক দিয়ে আসতেই হবে।

[দুই] উত্তেজনার উত্তরে যে সাড়া বা প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয় তার জন্য কিছুটা সময় লাগে (Reaction time)। উত্তেজনাটি মস্তিষ্কে পৌঁছাতে এই সময় লাগে।

[তিন] খুব বেশী মানসিক চিন্তা করলে বা আবেগের বশবর্তী হ'লে মস্তিষ্কে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে মানসিক কাজের সঙ্গে মস্তিষ্কের একটা সম্পর্ক আছে।

[চার] মস্তিষ্কের নার্ভ শুকিয়ে গেলে বা রক্ত-চলাচল ঠিকমত না হ'লে চিন্তা করার ক্ষমতা কমে যায়। মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল হঠাৎ-বন্ধ হয়ে গেলে আমরা চেতনা হারিয়ে ফেলি।

[পাঁচ] মস্তিষ্কে আঘাত লাগলে আমাদের যেমন বিস্মৃতি ঘটে তেমনি আমরা চেতনাও হারিয়ে ফেলি। তখন মানসিক ক্রিয়ার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। আবার অনেক সময় মস্তিষ্কে আঘাতের ফলে লুপ্ত চেতনা বা "হারানো স্মৃতি"টি ফিরেও পাই।

[ছয়] মাথা ধরার অন্যতম কারণ হ'ল অতিরিক্ত মানসিক চিন্তা।

[সাত] শরীর যখন খুব ক্লান্ত বা অবসন্ন হয়ে পড়ে তখন মস্তিষ্কও খুব ক্লান্ত (dull) হয়ে পড়ে। সহজ জিনিসও যেন মাথায় ঢুকতে চায় না। তেমনি মস্তিষ্ক খুব ক্লান্ত হ'লে মনে হয় শরীরও যেন আর চলছে না।

[আট] মস্তিষ্কে আঘাত লাগলে কতকগুলি মানসিক রোগের সৃষ্টি হয়। **Aphasia** বা বাক্‌বিস্মৃতি এই জাতীয় মানসিক রোগ।

[নয়] সবশেষে বলা যায় মস্তিষ্কের ওজনের সঙ্গে (দেহের সঙ্গে আনুপাতিক ওজন) বুদ্ধি তথা মানসিক উৎকর্ষের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

কাজেই এ কথা জোর দিয়েই বলা যেতে পারে-মনের সঙ্গে মস্তিষ্কের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের কাজ (Functions of the different Parts of the N-S) : আমরা স্নায়ুতন্ত্রের যে আলোচনা করেছি—তাতে স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ এই ভাবে দেখান হয়েছে :—

স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System)

- প্রধান
  - সুষুম্নাকাণ্ড
  - মস্তিষ্ক
    - সুষুম্নাশীর্ষক
    - লঘুমস্তিষ্ক
    - মধ্যমস্তিষ্ক
    - গুরুমস্তিষ্ক
- স্বয়ংক্রিয়
  - সমবেদী
  - পরাসমবেদী
- প্রান্তীয়ক
  - মস্তিষ্ক স্নায়ু
  - সুষুম্না স্নায়ু

এখন স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান প্রধান কয়েকটি অংশের কাজ বর্ণনা করা হ'ল—

[এক] **সুষুম্নাকাণ্ডের কাজ** (Functions of the Spinal cord) : সুষুম্নাকাণ্ড দু'ভাবে কাজ করে থাকে—যেমন, এটি প্রতিবর্তক ক্রিয়ার কেন্দ্র (reflex centre), আবার অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী স্নায়ুর পরিবহণ পথ। সুষুম্নাকাণ্ডের প্রধান কাজ হ'ল প্রান্তীয়ক স্নায়ুর মাধ্যমে দেহের অন্যান্য অংশ থেকে যে সমস্ত উত্তেজনা সৃষ্ট হয়, সেগুলিকে মস্তিষ্কে পৌঁছে দেওয়া। সুষুম্নাকাণ্ড নিজেও কিছু কিছু কাজ পরিচালনা করতে পারে। আগেই বলা হয়েছে প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-জনিত কর্মগুলি সবই সুষুম্নাকাণ্ডের অধীন। আবার হাঁটা, চলা, দৌড়ান ইত্যাদি কতকগুলি অভ্যাসমূলক কাজও সুষুম্নাকাণ্ড কর্তৃক পরিচালিত হয়। যে সমস্ত কাজ স্বতঃস্ফূর্ত (automatic) এবং যে সমস্ত কাজ করার জন্য কোন প্রকার মানসিক প্রস্তুতি বা চিন্তার প্রয়োজন হয় না, সেই সমস্ত কাজ সুষুম্নাকাণ্ড কর্তৃক পরিচালিত হয়।

[দুই] **সুষুম্নাশীর্ষের কাজ** (Function of the Medulla oblongata) : সুষুম্না-শীর্ষকে রয়েছে সংবেদক ও সঞ্চালক স্নায়ুগুলির কেন্দ্র। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, সুষুম্না-শীর্ষ উচ্চস্তরের কাজের মধ্যে অনুবন্ধ ও সমন্বয় সাধন করে। এ ছাড়া সুষুম্নাশীর্ষ শ্বাসগ্রহণ ও রক্ত সঞ্চালন-এর কাজেও সহায়তা করে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, যদি কোন জীবের সুষুম্না শীর্ষের নিম্নভাগ কেটে দেওয়া হয়—তা হ'লে তার শ্বাসগ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়, রক্ত চাপ অস্বাভাবিক ভাবে কমে যায় এবং জীব মৃত্যুমুখে পতিত

হয়। ডাঃ হেস্ (Dr. Hess)-এর মতে এটি নিদ্রাকেন্দ্র রূপেও কাজ করে। তিনি একটি বিড়ালের সুষুম্নাশীর্ষকে বিদ্যুৎ দ্বারা উদ্দীপিত করে দেখেছেন যে, বিড়ালটি আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ছে।

[তিন] মধ্যমস্তিষ্কের কাজ (Function of the Mid brain): মধ্যমস্তিষ্কের ভিতর দিয়েই গুরু মস্তিষ্ক স্নায়বিক উত্তেজনা শরীরের অন্যান্য অংশে পাঠায়। এই মধ্য মস্তিষ্কের ভিতর দিয়েই অন্তর্মুখী স্নায়ুর পথটি রচিত হয়েছে। "সুষুম্না-কাণ্ড-থ্যালামাস স্নায়ু পথ (Spino-thalamic tract) এই জাতীয় একটি পথ। আবার "পিরামিড্ স্নায়ু কেন্দ্র" থেকে যে সমস্ত ক্রিয়াবাহী স্নায়ু বের হয়, তারাও মধ্যমস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে মধ্যমস্তিষ্ক দেহভঙ্গী রক্ষণের কাজেও অংশগ্রহণ করে।

[চার] থ্যালামাসের কাজ (Function of the Thalamus)— বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় হতে অন্তর্বাহী স্নায়ুগুলি থ্যালামাসের স্নায়ু কেন্দ্রগুলিতে উপনীত হয় এবং সেখান থেকে আবার নূতন স্নায়ুরাশি গুরু মস্তিষ্কে যায়। সেই হিসেবে অংশগুলিকে সংবেদন কেন্দ্রও বলা যেতে পারে। থ্যালামাসের অন্যান্য বিভাগগুলি ক্রিয়া শক্তির কেন্দ্র বা চেষ্টাধিষ্ঠান (Motor centre)। এইগুলি থেকে উৎপন্ন শক্তি চলে যায় স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রে। প্রক্ষোভ বা আবেগের সময় স্নায়ুতন্ত্রটি উত্তেজিত হয় এবং হাইপোথ্যালামাসটি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এইজন্য হাইপোথ্যালামাসকে 'প্রক্ষোভের কেন্দ্র' বা প্রাক্ষোভিক সমন্বয়নের কেন্দ্র বলা হয়।

[পাঁচ] লঘুমস্তিষ্কের কাজ (Function of the Cerebellum): লঘুমস্তিষ্ক প্রধানতঃ আমাদের শরীরের পেশীগুলিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করে। শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখা, হাঁটা, চলা, সাঁতার কাটা, দৌড়ান, নীচু হয়ে কিছু কুড়িয়ে নেওয়া—এ সবই লঘুমস্তিষ্কের কাজ। লঘুমস্তিষ্কের প্রকৃত কাজ কি তা জানার জন্য শারীরতত্ত্ব বিশারদগণ নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। এই সমস্ত পরীক্ষণে সচরাচর তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়—

(ক) **অপসারণ পদ্ধতি** (Method of ablation): এই পদ্ধতিতে একটি অংশকে অপসারিত করে তার ফলাফল লক্ষ্য করা হয়।

(খ) **উদ্দীপন পদ্ধতি** (Method of Stimulation): এই পদ্ধতিতে একটি অংশকে উদ্দীপিত করে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়।

(গ) **রোগী পরীক্ষা পদ্ধতি** (Clinical method): এই পদ্ধতিতে চিকিৎসাকালে অসুস্থ ব্যক্তির বৈলক্ষণ্যের কারণ অনুসন্ধান করা হয়।

বর্তমান কালে ফ্লোরেন্স (Floucens) ও লুসিয়ানি (Luciani) নানা-প্রকার পরীক্ষা চালান। ফ্লোরেন্স পায়রার এবং লুসিয়ানি কুকুর, বানর ইত্যাদি কতকগুলি স্তন্যপায়ী জীবের লঘুমস্তিষ্ক কেটে বাদ দেন। ফলে পায়রাগুলির উড়া, চলা বা লাফানোর মধ্যে একটা "অসামঞ্জস্য" বা "এলো-মেলো" ভাব দেখা দেয়। লুসিয়ানি যে সমস্ত জীবের লঘুমস্তিষ্ক অপসারণ করেন, তাদের মধ্যে তিন রকমের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল, কর্ষণশক্তির হ্রাস, পেশীসমূহের সতেজতা হ্রাস এবং দেহ-ভঙ্গী রক্ষণে অক্ষমতা। মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, লঘুমস্তিষ্কে আঘাত লাগলে বা কোনপ্রকারে সেটি অসুস্থ হ'লে লুসিয়ানি বর্ণিত ঐ লক্ষণ তিনটি প্রকাশ পায়। এই সমস্ত পরীক্ষণ ও তথ্যের ফলে মনে করা হ'ত যে, দেহের ভঙ্গী ও দেহের অবস্থান রক্ষা করার কেন্দ্র হ'ল লঘুমস্তিষ্ক।

বর্তমান কালে বৈজ্ঞানিকগণ যে সমস্ত পরীক্ষা চালিয়েছেন তার ফলে লঘুমস্তিষ্কের গুরুত্ব যেন বেশ খানিকটা হ্রাস পেয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষণের ফলে মনে হয় লঘুমস্তিষ্ক দেহভঙ্গী এবং সাম্যাবস্থা রক্ষণের একমাত্র কেন্দ্র। দেহভঙ্গী ও সাম্যাবস্থা বজায় রাখার জন্য প্রাথমিক শক্তিটি আসে মস্তিষ্কের অন্য অংশ থেকে কিন্তু ঐ কার্য সুষ্ঠুভাবে করতে এবং সেটি অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে লঘুমস্তিষ্ক। লঘুমস্তিষ্ক আবার ঐচ্ছিক ক্রিয়ার উপরও কিছু প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যে সমস্ত ঐচ্ছিক ক্রিয়া বার বার করার ফলে অভ্যাসে পরিণত হয়, সেগুলির পরিচালনার ভার ক্রমশঃ লঘুমস্তিষ্কের উপর বর্তায়। লঘুমস্তিষ্কের কাজের সঙ্গে মানসিক বোধশক্তির কোন সম্পর্ক আছে কি না, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে লুসিয়ানি, রাসেল ইত্যাদি মনে করেন এক অনির্বচনীয় (Indefinable) উপায়ে সেটি মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

সবশেষে বলা যায়—আধুনিক কিছু কিছু শারীরবিজ্ঞানী মনে করেন যে, যদিও পেশীসঞ্চালনমূলক কাজের সঙ্গে লঘুমস্তিষ্কের সম্পর্ক আছে তা হ'লেও

বিশেষ করে ঐ কাজটির জন্তই তার উদ্ভব হয় নি। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, যেখানে সমগ্র দেহের কোন প্রয়োজন থাকে, সেখানে সুসংবদ্ধ ভাবে কাজ করার জন্ত দেহকে সাহায্য করার ব্যাপারে লঘুমস্তিষ্ক বিশেষ অংশ গ্রহণ করে।

[ছয়] **গুরুমস্তিষ্কের কাজ ও গুরুমস্তিষ্কের আঞ্চলিকতা (Function of the cerebrum and localisation of Brain):** মস্তিষ্কের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল অংশ হ'ল গুরুমস্তিষ্ক। বলতে গেলে এটি হল সব রকম উন্নত স্তরের মানসিক ক্রিয়ার উৎস। আমরা যে বিভিন্ন উদ্দীপক বা উত্তেজনার উত্তরে সচেতন ভাবে সাড়া দিতে পারি তা এই গুরুমস্তিষ্কের জন্তই সম্ভব হয়। গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কথা আগেই বলা হয়েছে। এক একটি অংশ এক এক প্রকার ইন্দ্রিয় ও অঙ্গের কাজ পরিচালিত করে। অর্থাৎ পৃথক পৃথক কাজের জন্ত যেন গুরু মস্তিষ্কের পৃথক পৃথক অংশ সুনির্দিষ্ট করা আছে। বিশেষ কোন কাজের জন্ত গুরুমস্তিষ্কটি সামগ্রিক ভাবে উত্তেজিত হয় না। গুরুমস্তিষ্কের যে অংশ দেখার কাজ করে, সে অংশ শোনার কাজ করে না; আবার যে অংশ শোনার কাজ করে, সে অংশ ঘ্রাণ নেওয়ার কাজ করে না। এইরূপ বিভিন্ন কাজের জন্ত গুরুমস্তিষ্কে বিশেষ বিশেষ অংশ চিহ্নিত করাকে Localisation বলা হয়। এগু'ল সম্বন্ধে পরে বিবেচনা করা হয়েছে।

আমরা আগেই দেখেছি, গুরু মস্তিষ্কের চারটি বিভাগ আছে। যথা—ললাটাংশ বা সম্মুখ ভাগ, করোটাংশ বা মধ্যভাগ, পশ্চাদংশ বা পশ্চাৎভাগ এবং পার্শ্বাংশ বা নিম্নভাগ। মানুষের ক্ষেত্রে অন্তান্ত প্রাণীর তুলনায় সম্মুখ-ভাগটি অধিকতর উন্নত। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিভিন্ন জাতীয় উন্নত প্রকৃতির মানসিক প্রক্রিয়া যেমন চিন্তন, বিচারকরণ, পরিকল্পন ইত্যাদি এই ভাগ থেকে সৃষ্ট হয়। আবার কতকগুলি বিশেষ জাতীয় সংবেদন বা প্রক্ষোভ-মূলক অনুভূতিও এই সম্মুখভাগের কোন অংশ থেকে সৃষ্ট হয় বলেই বিশ্বাস করা হয়। মস্তিষ্কের সম্মুখভাগের সঙ্গে অন্তান্ত অংশের সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করে দিলে ব্যক্তির বিচারকরণ বা পরিকল্পনের ক্ষমতাটি নষ্ট হয়ে যায়। সম্মুখ-ভাগের শেষ দিকটি প্রাণীর ইচ্ছাপ্রসূত দেহসঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত করে।

গুরু মস্তিষ্কের মধ্যভাগটি কতকগুলি অনির্দিষ্ট ও সাধারণ প্রকৃতির সংবেদন এবং স্পর্শ, উত্তাপ, ব্যথা প্রভৃতি সংবেদন সৃষ্ট হবার জন্য দায়ী।

পশ্চাৎভাগটি চক্ষু ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপক গ্রহণ করে ও তার সংব্যাখ্যান করে। অর্থাৎ এটি হ'ল চাক্ষুষ সংবেদনের উৎস।

নিম্নভাগটি হ'ল শ্রাবণ সংবেদনের উৎস। মস্তিষ্কের উপরের আস্তরণটিকে বলা হয় কর্টেক্স (cortex)। মানুষের কর্টেক্স অত্যন্ত জটিল। এর সবগুলি ভাঁজ খুলে ফেললে আয়তন হবে প্রায় ২০০০ বর্গ সেন্টিমিটার। এই কার্টেক্সই হ'ল মস্তিষ্কের সক্রিয়তার আসল কেন্দ্র বা উৎস। মস্তিষ্কের মধ্যভাগ, পশ্চাৎভাগ ও নিম্নভাগের উপরের আস্তরণের একটা বড় অংশকে বলা হয় **অনুষঙ্গ কেন্দ্র** (Association Area)। এই ক্ষেত্রগুলিতে অসংখ্য অনুষঙ্গ বা সঙ্গতিসাধক নিউরণ থাকে। মস্তিষ্কের আস্তরণের সেই অংশটি বিভিন্ন জাতীয় সংবেদন গ্রহণ করে, সেগুলির ব্যাখ্যা করে এবং অতীত ও বর্তমানের অন্যান্য সংবেদনগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে। বিভিন্ন জাতীয় স্মৃতিও এই অংশে সংরক্ষিত হয়ে থাকে।

কর্মক্ষমতার প্রকৃতি অনুযায়ী মস্তিষ্কের স্থানবিভাগগুলি এই জাতীয় হয়ে থাকে—(১) **সংবেদন স্থান** (Sensory area.), (২) **কর্মস্থান বা চেষ্টাধিষ্ঠান** (Motor area) এবং (৩) **সংযোগস্থান** (Association area) বা **নীরব অঞ্চল** (Silent area)।

সংবেদন স্থান : রোলাণ্ডো খাঁজের পশ্চাতে এবং মধ্যভাগের সম্মুখে বিভিন্ন ত্বকজ সংবেদন ও পেশী সংবেদনের কেন্দ্র অবস্থিত। পশ্চাদভাগের পশ্চাদভাগ ও উহার ভিতরের দিকে যে অঞ্চল, সেটি হ'ল দর্শন সংবেদনের অঞ্চল। সিল্‌ভিয়াস্ খাঁজের পাশে আছে শ্রবণ কেন্দ্র। এটির নীচের দিকে হিপোক্যাম্পাল অঞ্চলে রয়েছে ঘ্রাণ ও স্বাদ কেন্দ্র।

কর্মস্থান : রোলাণ্ডো খাঁজের সামনে এবং ললাটাংশের পশ্চাতের অংশটি হ'ল কর্মস্থান বা ক্রিয়াশক্তির কেন্দ্র। এখানে কতকগুলি বৃহদাকার স্নায়ুকেন্দ্র আছে যেগুলি থেকে বহির্মুখী স্নায়ুগুলি বের হয়েছে। গুরু-মস্তিষ্কে বিভিন্ন রকমের পেশী উদ্দীপকের কেন্দ্র এমন ভাবে সাজানো থাকে যে মুখ, জিহ্বা ইত্যাদির সঙ্গে সংযুক্ত কেন্দ্রগুলি কর্মস্থানের নীচের দিকে থাকে এবং পা, হাঁটু, জঙ্ঘা ইত্যাদির সঙ্গে সংযুক্ত কেন্দ্রগুলি ঐ অঞ্চলের উপরে থাকে। অর্থাৎ

ক্ষেত্রে যে নিয়মে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সাজানো থাকে, গুরুমস্তিকে উহাদের চালনাকেন্দ্রগুলি ঠিক বিপরীত নিয়মে সাজানো থাকে।

সংযোগস্থান: কর্মস্থান ও সংবেদন স্থান ছাড়া অপর অংশগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে কোন কাজেই জড়িত থাকে না। এইজন্য এগুলিকে বলা হয় নীরব অঞ্চল। তবে এই নীরব অঞ্চলগুলি অন্যান্য অংশের সহিত নানাভাবে নিউরন দ্বারা সংযুক্ত থাকে। এইজন্য মনে করা হয় যে, এই নীরব অঞ্চল সংহতি সাধন ও সম্বন্ধ করণ কার্যে লিপ্ত থাকে এবং বিভিন্ন সংবেদন ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে ঐক্যবদ্ধ বা সংযুক্ত করে। কর্মস্থান ও সংবেদন স্থানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এত সমস্ত অঞ্চল উত্তেজনার অর্থ খুঁজে বের করতে আমাদের সাহায্য করে বলে এগুলিকে সংযোগস্থানও বলে।

গুরু মস্তিষ্কের বিভিন্ন কার্য সম্বন্ধে যাঁরা পরীক্ষা কার্য চালনা করেন, তাঁদের মধ্যে **গ্যল** (Gall), **স্পুর্ৎস্হাইম** (Spurzheim), **ব্রিকনার** (Brickner), **পেনফিল্ড** (Penfield), **ফ্লোরেন্স** (Flourens), **ফ্রিট্শ** (Fritsch), **ব্রোকা** (Broca), **ল্যাশলে** (Lashley) এবং **ফ্রান্স্** (Frans) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মস্তিষ্কের স্থান নির্ণয়ের বেশীর ভাগ কাজই করেছেন বিখ্যাত জৈনিক বিজ্ঞানী ল্যাশ্লে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে—

- গুরু মস্তিষ্কের যে পৃথক পৃথক অংশ বা বিভাগ আছে এবং এক একটি অংশ যে এক একটি কাজে ব্যাপৃত থাকে, তা অস্বীকার করা যায় না।

- এই বিভিন্ন অংশগুলির কার্যবিভাগ আপেক্ষিক এবং এদের পার্থক্যের পশ্চাতে একটা ঐক্য আছে।

- বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা থাকার জন্য একটি অংশের কোন ক্ষতি হলে অপর কোন অংশ বা সমগ্র গুরু মস্তিষ্কটি উহার বিকল্প হিসাবে কাজ করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ গুরু মস্তিষ্কের কার্যপদ্ধতি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মন্ত্রিসভার কার্যের মতই। মস্তিষ্কের এই বৈশিষ্ট্যটিকে বলা হয় **সমকর্মক্ষমতা** (Equipotentiality)।

মস্তিষ্কের আঞ্চলিকতা (Localisation of Brain): সচরাচর গুরু মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চল আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি ও পেশীর সঞ্চালনকে নিয়ন্ত্রিত করে। চক্ষুর উত্তেজনার জন্য যে স্নায়বিক শক্তি সৃষ্টি হয়, সেই শক্তি তরঙ্গ স্নায়ুপথ বেয়ে গুরু মস্তিষ্কের দর্শনাঞ্চলে উপনীত হয়।

তখনই আমরা দেখতে পাই। তেমনি শ্রবণাঞ্চল শুনতে, চরণাঞ্চল চলতে এবং বচনাঞ্চল বলতে সাহায্য করে। এই রকম প্রত্যেকটি অঞ্চলকে ঘিরে আবার আছে এক একটি সংযোগাঞ্চল (Association Area)। দর্শনাঞ্চলকে ঘিরে যে সংযোগাঞ্চল রয়েছে, তার কাজ হ'ল দর্শন সম্বন্ধীয় অনুভূতিগুলিকে সমন্বিত করে সেটিকে আমাদের নিকট অর্থময় করে তোলা। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। ধরা যাক্, কেউ আমার সামনে একটা ছবি ধরল। এই ছবিটি থেকে আলোকপ্রবাহ আমার চোখে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়বে। ফলে চোখের মধ্যে যে স্নায়বিক শক্তি উজ্জীবিত হবে স্নায়ুপথ ধরে সেই শক্তি-তরঙ্গ গিয়ে পৌঁছাবে নবম মস্তিষ্কের দর্শনাঞ্চলে। তখন আমার দেখার অনুভূতি হবে। কিন্তু নিছক দেখার অনুভূতি আর ছবি দেখা এক জিনিস নয়। অন্য যে কোন অনুভূতির সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাবে দেখার অনুভূতি একটি বিশেষ ধরনের অনুভূতি যা শোনার, স্পর্শ করার, ঘ্রাণ নেওয়ার, স্বাদের, আনন্দের বা যন্ত্রণার অনুভূতি থেকে পৃথক। কিন্তু যখন আমি ছবিটি দেখছি তখন শুধু অনুভূতিই যে হচ্ছে, তা নয়; একটি ছবি দেখার অনুভূতি হচ্ছে। যা দেখছি, সেটি যে একটি ছবিই—হয়তো এমন ছবি, যা আগে দেখেছি, বা যা'র ছবি তাকে আগে দেখেছি—ইত্যাদি যে সমস্ত অনুভূতি হয় তা কিন্তু নিয়ন্ত্রিত হয় দর্শনাঞ্চলকে ঘিরে যে সংযোগাঞ্চল আছে—তার দ্বারা। এইরকম ঘটনা অন্যান্য অনুভূতির ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে।

অবশ্য গুরু মস্তিষ্কে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের সন্নিহিত সংযোগাঞ্চলগুলি ছাড়াও আরো অনেক এমন সংযোগাঞ্চল আছে যেগুলি নির্দিষ্ট কোন অনুভূতি বা অঙ্গসঞ্চালনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত নয়। এই জাতীয় সংযোগাঞ্চলকে বলা হয় **সাধারণ সংযোগাঞ্চল** (Unspecialised Association area)। এগুলির কার্যকারিতা, আমাদের জীবনে অপরিসীম। এগুলিই আমাদের চিন্তা, যুক্তি, বিচারকরণ, কল্পন, দূরদৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি, সংকল্প, সংযম প্রভৃতি উচ্চতর মানসিক ক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। মানব মস্তিষ্কে এইরকম অসংখ্য সাধারণ সংযোগাঞ্চল আছে বলেই আমরা উচ্চতর ও উন্নততর মানসিক শক্তির অধিকারী হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছি।

॥ কুড়ি ॥

গ্রন্থিতন্ত্র ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি

(Glandular System and Endocrine glands)

[Gland : "An organ in the body the function of which is to produce a specific substance or specific substances, exercising an important influence in the bodily economy—a very heterogeneous group, but falling into two main divisions—duct glands and ductless or endocrine glands"—*Dictionary of Psychology.*

"A balance of male hormones steers development in the direction of masculinity, a balance of female hormones steers it towards feminivity"—*Woodworth.*

The active materials of these secretions (Ductless glands) are powerful druglike substances, which because, they affect other organs of the body situated at a distance from the gland have been called chemical messengers (hormones or autocoids). The action may be excitatory or inhibitory, and frequently affects other endocrine glands."—*Peter Sandiford.*]

বাইরের বিভিন্ন উদ্দীপক আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে আমাদের মধ্যে নানাপ্রকার উদ্দীপনা প্রেরণ করে। আমাদের শরীর সেই উদ্দীপনাতে সাড়া দেয় নানা বিচিত্র যন্ত্রপাতির সাহায্যে। আমাদের পেশীগুলি হ'ল শরীরের কর্মসম্পাদন করার ভৃত্যস্বরূপ। আমরা যে সমস্ত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে এই সাড়া বা প্রতিক্রিয়াটি দিয়ে থাকি, সেগুলিকে বলা হয় কর্মেন্দ্রিয় (effectors)। এই রকম এক জাতীয় কর্মেন্দ্রিয় হ'ল গ্রন্থি (glands)।

আমাদের শরীরের ভিতরে অনেকগুলি গ্রন্থি আছে। এদের কাজগুলি আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই না। তবে এই সমস্ত গ্রন্থি দু'রকমের হতে পারে—সচ্ছিদ্র (ductile) ও নিশ্ছিদ্র (ductless)। সচ্ছিদ্র বা

সনালী গ্রন্থিগুলির মধ্যে নলের মত গঠন থাকে এবং ঐ সমস্ত নল বেয়ে গ্রন্থিরস শরীরের নানা জায়গাতে পড়ে। লালাগ্রন্থি, পাচকগ্রন্থি, যকৃৎ, মূত্রগ্রন্থি, ঘর্মগ্রন্থি, অশ্রুগ্রন্থি ইত্যাদি এই জাতীয় গ্রন্থির উদাহরণ। এগুলির সরু নল বেয়ে গ্রন্থিরস নির্গত হয়ে শরীরের প্রয়োজনীয় অনেক কাজ সম্পন্ন করে থাকে। আবার কতকগুলি গ্রন্থির সঙ্গে কোন নল বা নালিকা সংযুক্ত থাকে না। এগুলি থেকে যে রস নির্গত হয়, সেটি একেবারে রক্তের মধ্যে মিশে গিয়ে অত্যন্ত দ্রুতবেগে সমস্ত দেহে সঞ্চালিত হয়ে যায়। নিশ্ছিদ্র বা নালিকাবিহীন এই সমস্ত গ্রন্থি থেকে যে রস নিঃসৃত হয় তাকে বলা হয় হর্মোণ (Hormones)। এই সমস্ত নালিকাবিহীন গ্রন্থিগুলির ক্ষরণ আভ্যন্তরিণ বলে এদের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিও (Endocrine glands) বলা হয়। গ্রন্থিগুলি হতে নিঃসৃত হর্মোণ বিভিন্ন আভ্যন্তরিণ যন্ত্রকে প্রভাবিত করে বলে এগুলিকে রাসায়নিক সংবাদবাহক বা Chemical messengersও বলা হয়। হর্মোণ কথাটির ইংরাজী অর্থ হল activiser। হর্মোণগুলি দেহের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়ে ব্যক্তিত্বের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এইজন্য এই হর্মোণগুলিকে ব্যক্তিত্বের উপাদান হিসেবও ধরা হয়ে থাকে।

এই সমস্ত অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান গ্রন্থি হ'ল— থাইরয়েড (Thyroid), প্যারা থাইরয়েড (Parathyroids), থাইমাস (Thymus), এ্যাড্রিনাল (Adrenal), পিটুইটারী (Pituitary), পিনিয়াল (Pineal) এবং যৌন গ্রন্থি (Gonads)। এগুলি ছাড়াও দুটি সনালী গ্রন্থি আবার অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে থাকে। এ দুটি হ'ল যকৃত (liver) ও প্যানক্রিয়াস (pancreas)। এর কয়েকটি কোষ—যেগুলিকে বলা হয় "Islet cells of Langerhans"। এই সকল গ্রন্থির অতিরিক্ত নিঃসরণ (hyperfunction) বা স্বল্প নিঃসরণের (hypo function) ফলাফল, সুস্থ ব্যক্তির দেহে হর্মোণ ইন্‌জেকশানের ফল, কোন ব্যক্তির দেহে অন্য জনের বা অন্য জীবের দেহ হইতে কোন গ্রন্থি লইয়া তাহা গ্রথিত করার (grafting) ফল এবং সুস্থ ব্যক্তির দেহ হইতে কোন গ্রন্থি কাটিয়া বাদ দিয়া তাহার ফল লক্ষ্য করিয়া ঐ সমস্ত গ্রন্থির কার্য সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে তুলতে পারা সম্ভব।

এখন কতকগুলি প্রধান প্রধান অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হ'ল—

[এক] **পিটুইটারী গ্রন্থি** (Pituitary gland): সমস্ত অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির মধ্যে পিটুইটারি গ্রন্থি হ'ল সর্বপ্রধান কারণ এটি অন্যান্য গ্রন্থিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। এইজন্য একে 'মুখ্য গ্রন্থি' বা master gland বলা হয়। এটি মাথার পাশের দিকের খুলির ভিতরে ঠিক মধ্য মস্তিষ্কের উপরে অবস্থিত। অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে চক্ষু স্নায়ুর পারস্পরিক কর্তন স্থলের (Optic Chiasma) পশ্চাতে এটি অবস্থিত। এই গ্রন্থি থেকে একাধিক শক্তিশালী রসক্ষরণ হয়—যেগুলি অন্যান্য গ্রন্থির কাজগুলিকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।

এই গ্রন্থির দুটি ভাগ—**সম্মুখ ভাগ** (anterior) ও **পশ্চাৎভাগ** (posterior)। এই দুটি ভাগের কাজও কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির। এখন এক একটি ভাগের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক—

সম্মুখভাগ : এই ভাগটি মানবদেহের অস্থিসমূহের বর্ধনে সাহায্য করে এবং দৈহিক কোন বিপাকের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই অংশ থেকে যে হর্মোণ নিঃসৃত হয়, কৃত্রিম উপায়ে তা জীবদেহে ইন্‌জেকশান দিয়ে দেখা গেছে এতে জীবদেহ খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এর থেকে অনুমান করা হয় যে, এই গ্রন্থি থেকে অধিক মাত্রায় হর্মোণ নিঃসৃত হ'লে শরীর অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যাকে বলা হয় **অসুর তুল্যতা** (gigantism)। আধুনিক কালে একজন এই রকম অসুর বা দৈত্যের কথা শোনা গিয়েছিল, যাঁর নাম ছিল—প্যাট্রিক কট্টার ও' ব্রিয়েন (Patrick Cotter o' Brien)। ইনি ছিলেন আয়ার্ল্যাণ্ডের লোক এবং এর দৈর্ঘ্য ছিল ৮ ফিট ১ ইঞ্চি। ১৮০৬ সালে ইনি মারা গেলে এর জন্য যে কফিন দরকার হয়েছিল তার দৈর্ঘ্য ৯ ফিট ৩ ইঞ্চি। আবার এই গ্রন্থির সম্মুখ ভাগের হর্মোণের অতি নিঃসরণের জন্য ব্যক্তি দীর্ঘ হস্ত, দীর্ঘ পদ, দীর্ঘ নাসা ইত্যাদি অসংগত ও অসমঞ্জস দৈহিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। একে বলা হয় **দীর্ঘাঙ্গতা** (acromegaly)। এদের হাত-পা ইত্যাদি আকারে অস্বাভাবিক বড় হলেও এরা প্রায়ই দুর্বল হয়।

আবার ঠিক এর উল্টো দিকটিও রয়েছে। পিটুইটারী গ্রন্থির সম্মুখ অংশ থেকে হর্মোণ যদি অল্প পরিমাণে নিঃসৃত হতে থাকে, তবে ব্যক্তির দেহের

গঠন বাড়ে না। এদের দেহ খর্ব, গোলাকার ও বামনাকৃতি-বিশিষ্ট হয়। এদের বলা হয় মিজেট (Midget)। মিজেটদের দেহের গঠন না বাড়লেও বুদ্ধির বিকাশ তেমন ব্যাহত হয় না।

এ ছাড়া পিটুইটারীর সম্মুখ ভাগের অংশ হতে নির্গত হর্মোণ থাইরয়েড, অ্যাড্রিনালের বহিরাংশ (adrenal cortex) ও যৌন গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে। এ ছাড়া এই অংশ থেকে নিঃসৃত হর্মোণ ACTH অ্যাড্রিনালের বহিরাংশকে উত্তেজিত করার ফলে cortisone নামে আর একপ্রকার শক্তিশালী হার্মোণ নিঃসৃত হয় যেটির অভাব ঘটলে যৌনাকাঙ্ক্ষা হ্রাস পায় এবং শরীরের সতেজতা ব্যাহত হয়। কেউ কেউ এজন্য এটিকে endocrinological switchboard বলেও আখ্যা দিয়ে থাকেন। এত ছোট একটি গ্রন্থির কেবলমাত্র একটি অংশ থেকে এত কাজ হতে পারে এ কথা ভাবলেও অবাক হতে হয়। অনেক দেহ-বিজ্ঞানী এর জন্য মনে করেন, এই গ্রন্থটি অন্যান্য গ্রন্থিকে সক্রিয় ভাবে প্রভাবিত করে না, করে পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে।

পশ্চাৎ ভাগ : এই গ্রন্থির পশ্চাৎভাগ থেকে দু'ধরনের হর্মোণ নিঃসৃত হয়। একটি হর্মোণ ক্রিয়া করে পাকস্থলী, বিশেষতঃ জরায়ুর মসৃণ পেশীগুলির উপর। এই হর্মোণ পেশী সংকোচনে সহায়তা করে এবং প্রসব বেদনা বাড়িয়ে সন্তান প্রসবে সহায়তা করার জন্য এই হর্মোণ থেকে প্রস্তুত ইনজেকশান প্রসূতিকে দেওয়া হয়ে থাকে। অন্য হর্মোণটি প্রস্রাব বৃদ্ধির সহায়ক (diuretic) এবং দুগ্ধক্ষরা গ্রন্থির (mammary glands) উপরও এটি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। মোটামুটি ভাবে এই অংশের কাজগুলি হ'ল—

১। অন্যান্য গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করা।

২। অনৈচ্ছিক পেশীর (non-voluntary) কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৩। যৌনশক্তিকে প্রভাবিত করা।

৪। দেহের গতিভঙ্গী ও চলন (gaits and movement) নিয়ন্ত্রণ করা।

[দুই] পিনিয়াল গ্রন্থি (Pineal gland) : পিনিয়াল হ'ল একটি ছোট গ্রন্থি যেটি মস্তিষ্কের পিছনদিকে লঘুমস্তিষ্কের খুব নিকটে অবস্থিত। পিনিয়াল গ্রন্থি নিঃসৃত হর্মোণ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য এখনও জানা যায় নি। তবে মনে করা হয় পুরুষের পুরুষত্ব ও নারীর নারীত্ব—এই গ্রন্থি নিঃসৃত

হর্মোণের উপর নির্ভর করে। এই গ্রন্থির জন্যই পুরুষ ও নারীর কণ্ঠস্বরের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়। তাছাড়া দৃষ্টিশক্তির উপরও এই গ্রন্থির যথেষ্ট প্রভাব আছে।

[তিন] **থাইরয়েড গ্রন্থি** (Thyroid gland) : এই গ্রন্থিটি গলদেশে শ্বাসনালীর সম্মুখে ঘাড়ের নীচে কণ্ঠার (Adam's apple) কাছে অবস্থিত। এটি দু'ভাগে বিভক্ত। স্বরযন্ত্র (Larynx)-এর দু'দিকে এক একটি ভাগে এটি বিভক্ত। এটি দেখতে অনেকটা ডানামেলা প্রজাপতির মত। এর থেকে যে হর্মোণ নিঃসৃত হয় তাকে বলা হয় থাইরক্সিন্ (Thyroxin)। এর রাসায়নিক উপাদান হ'ল—কার্বণ, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও আয়োডিন। গ্রন্থিটি বহু রক্তবহা নাড়ী ও স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সমবেদী বিভাগটির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। মানব-আচরণের উপর এই গ্রন্থিটির ক্ষরিত হর্মোণের প্রভাব অপরিসীম। সমস্ত দেহকে এটি নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এটির সুস্থ ও স্বাভাবিক ক্রিয়ার উপরই সমস্ত দেহ ও মনের স্বাভাবিক ও সুষম বিকাশ নির্ভর করে।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে যদি এই গ্রন্থি অপর্যাপ্ত ভাবে কাজ করে (hypofunction) তা' হ'লে এক প্রকার রোগ দেখা দেয় যার নাম হ'ল **মিক্সিডিমা** (Myxoedema)। এই রোগের লক্ষণ হ'ল—

সমগ্র দেহে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে অত্যধিক মাত্রায় চর্বি জমান, শিশুসুলভ আচরণ করা, আত্মসংযম হারিয়ে ফেলা, চর্ম শুষ্ক ও খস্‌খসে হয়ে যাওয়া, চুল উঠে যাওয়া, হাত পা কিছু কিছু ফুলে যাওয়া, কর্মে বিমুখতা, আলস্য-ভাব ও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া।

শিশুদের ক্ষেত্রে এটির অপর্যাপ্ত ক্রিয়ার ফলে তাদের মধ্যে যে রোগটি দেখা দেয়, তার নাম হ'ল **ক্রেটিনিজম** (cretinism)। এর লক্ষণ হ'ল—

শিশুর দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে তাকে খর্বাকৃতি করা, গায়ের চামড়া শুকনো, খস্‌খসে ও কর্কশ হয়ে যাওয়া, মুখমণ্ডল পাণ্ডুর বা বিবর্ণ হয়ে যাওয়া, শরীরের অন্যান্য প্রত্যঙ্গ ক্ষীণকায় হলেও উদরদেশ অত্যন্ত স্ফীত হয়ে যাওয়া, গুরু মস্তিষ্কের কোষগুলির পরিপুষ্টির অভাবের জন্য বুদ্ধির বিকাশ বন্ধ হওয়া।

এই সব ক্ষেত্রে রোগীকে থাইরয়েড খাওয়ালে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়।

এখন শুকনো থাইরয়েড চূর্ণ বা নির্যাস পাওয়া যায়। যে সব অঞ্চলে জল বা মাটিতে আয়োডিনের অভাব থাকে, সেখানে থাইরয়েড চূর্ণ বা নির্যাস লবণের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে এই গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হর্মোণের অভাব থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়।

আবার যদি এই গ্রন্থি থেকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী হর্মোণ নিঃসৃত হয়, তা হ'লে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা যায়—

ব্যক্তির শরীরে রাসায়নিক ক্রিয়া অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ব্যক্তি অতিমাত্রায় উদ্বেগাকুল, চঞ্চল ও খিটখিটে মেজাজের হয়ে যায়, বয়সের অনুপাতে দেহ দীর্ঘ হ'য়ে যায় যদিও বুদ্ধির অতিরিক্ত বিকাশ ঘটে না, ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে ক্ষুধা অত্যন্ত বেড়ে যায়।

থাইরয়েডের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্ম গলগণ্ড হ'তে পারে। এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বলে exopthalmic goitre এবং সেই রোগটির নাম হ'ল Grave's disease.

এই গ্রন্থিটি স্বাভাবিক ভাবে কাজ করলে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, কর্মঠ ও আবেগপ্রবণ হয়। তাছাড়া সে আশাবাদী হয় ও কাজ করার একটা প্রেরণা অনুভব করে। মানসিক শক্তি, বিশেষতঃ বুদ্ধি যথাযথ ভাবে বিকশিত হয়। কাজেই বলা যায় ব্যক্তির মধ্যে অতিরিক্ত কর্মক্ষমতা বা অল্প কর্মদক্ষতার জন্ম থাইরয়েড গ্রন্থি বহুলাংশে দায়ী।

[চার] **প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি** (Parathyroid gland): এই গ্রন্থি সংখ্যায় চারটি এবং দেখতে ঠিক মটরদানার মত। এগুলি থাইরয়েডের মধ্যে গ্রথিত থাকে। কিন্তু এদের কাজ থাইরয়েডের কাজের ঠিক বিপরীত। থাইরয়েড হতে নিঃসৃত হর্মোণ যেমন ব্যক্তির মধ্যে উত্তেজনা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে, প্যারাথাইরয়েড হতে নিঃসৃত হর্মোণ (Parathormone) বর্তমান ব্যক্তির কর্মক্ষমতা ও উত্তেজনা হ্রাস বা ব্যাহত করে। সুতরাং বলা যায় প্যারাথাইরয়েড নিঃসৃত হর্মোণ উত্তেজক তো নয়ই বরং নিরোধক। থাইরয়েডের অতিরিক্ত ক্রিয়াকে সংযত করাই যেন প্যারাথাইরয়েডের কাজ। এই গ্রন্থির রস নিঃসরণের অভাব হ'লে শরীরে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ খুব কমে যায় এবং অস্থি, দন্ত ইত্যাদির স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়।

[পাঁচ] **থাইমাস গ্রন্থি** (Thymus gland): এই গ্রন্থিটি

থাইরয়েডের নীচে বক্ষোদেশে অবস্থিত। কিন্তু এই গ্রন্থি শৈশবে ক্রিয়াশীল থাকে, শিশুর জন্মের পর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং দ্বিতীয় বৎসর থেকে ধীরে ধীরে কমতে কমতে পরিণত বয়সে আর কোন চিহ্নই থাকে না। এই গ্রন্থির ক্রিয়া সম্বন্ধে খুব বেশী একটা কিছু জানা যায়নি। তবে দেখা গেছে, শৈশবে থাইমাসটি কেটে বাদ দিলে অস্থিগুলির স্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং শিশু রিকেট্‌ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। অনেকে মনে করেন, এই গ্রন্থিজাত হর্মোণ যৌন আকাঙ্ক্ষাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। সবশেষে একথা বলা যেতে পারে—কৈশোরে বা বয়ঃসন্ধির পূর্বে এই গ্রন্থি দৈহিক বর্ধনে সহায়তা করে এবং বয়ঃসন্ধির পরেও যদি এটি ক্রিয়াশীল থাকে, তাহ'লে দৈহিক বর্ধন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

[ছয়] **অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি** (Adrenal gland) : এই গ্রন্থিটির অন্য নাম হ'ল সুপ্রারেনাল গ্রন্থি (Suprarenal gland)। এই গ্রন্থি দুটি এবং এরা মূত্রাশয়ের (Kidney) উপরে অবস্থিত। এই গ্রন্থিরও আবার দুটি ভাগ—বাইরের অংশ ও ভিতরের অংশ। দুটি দিকের গঠনে যেমন তফাৎ আছে কাজেই তেমনি। বাইরের অংশকে বলে **অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স** (Adrenal cortex), আর ভিতরের অংশকে বলে **অ্যাড্রিনাল মেডুলা** (Adrenal Medulla)। দুটি অংশ থেকে দু'রকম হর্মোণ নিঃসৃত হয়। অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে নির্গত হর্মোণকে বলে **কর্টিন** (Cortin) আর অ্যাড্রিনাল মেডুলার হর্মোণকে বলে **অ্যাড্রিনিন বা অ্যাড্রেনালিন)** (Adrenin বা adrenalin)। এখন এই দুটি হর্মোণের কাজ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্।

কার্টিনের কাজ : কার্টিনের কাজটিও সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে জানা গেছে কার্টিনের সঙ্গে **পুরুষোচিত অপ্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির** বিশেষ সম্পর্ক আছে। এর ক্রিয়ার ফলেই বক্ষোদেশে, অধরে, গণ্ডদেশে রোমোদ্গম হয় এবং পুরুষালী ভাবটি দেখা দেয়। পুরুষের ক্ষেত্রে কর্টিনের নিঃসরণ কম হ'লে গোঁফ দাড়ি হয় না এবং একটা নারীসুলভ ভাব পরিলক্ষিত হয়। বাহ্য-আকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আচরণ ও কণ্ঠস্বরেরও পরিবর্তন হয়। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকের মধ্যে এই নিঃসরণ অধিক হ'লে তাদের মধ্যে একটা পুরুষালী ভাব দেখা দেয়, স্ত্রীসুলভ কমনীয়তার অভাব ঘটে এবং

শ্মশ্রু ও গুম্ফরেখাও দেখা দেয়। তাছাড়া কণ্ঠস্বরও হয়ে যায় বেশ কর্কশ ও গম্ভীর।

কর্টিনের জন্য আমরা কঠোর পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করতে পারি। কার্টিনের জন্যই অবসন্ন স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র পুনরায় সতেজ হয়ে উঠতে পারে (capacity to restore fatigued autonomic fibres)।

অ্যাড্রিনিলের কাজ : অ্যাড্রিনিনের ক্রিয়া কিন্তু অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এটি হ'ল উত্তেজক প্রকৃতির। এই হর্মোণের নিঃসরণ বেশী হ'লে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, শ্বাসক্রিয়ার গতি দ্রুততর হয়, পেশীর ক্লান্তি কম হয় এবং যকৃত থেকে শর্করা (sugar) নির্গত হয়ে রক্তে মিশে। অ্যাড্রিনিন স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সমবেদী শাখাটিকে উত্তেজিত ও উদ্দীপিত করে এবং তার ফলে তীব্র আবেগের সময় যে সমস্ত লক্ষণ দেখা দেয়, সেই জাতীয় লক্ষণ প্রকাশিত হয়। শর্করা (sugar) হ'ল দেহ-যন্ত্রের জ্বালানী বা ইন্ধন (fuel) স্বরূপ। অ্যাড্রিনিন সেই শর্করাকে যকৃত থেকে মুক্ত করে পেশীর দুর্বলতা রোধ করে এবং দেহকে প্রক্ষোভজনিত কষ্ট সহ্য করার মত শক্তি জোগায়। **এইজন্য** অধ্যাপক ক্যানন (Cannon) বলেছেন—অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি হ'ল—The gland of the fighting man and of the arrant coward, **কারণ** অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে বা খুব ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতে যে শক্তির প্রয়োজন তা সৃষ্টি করতে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি সাহায্য করে।

এই গ্রন্থির অবনতি ঘটলে শারীরিক দুর্বলতা ঘটে বিশেষ করে পেশী-গুলির কার্যক্ষমতা বহুলাংশে নষ্ট হয়ে যায়। হৃদযন্ত্র ও পরিপাক-যন্ত্রের ক্রিয়াতে ব্যাঘাত ঘটে এবং গায়ের চামড়া তামাটে বা ব্রোঞ্জের রঙ-এর মত হয়ে যায়। এক কথায় বলা যায় অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি দেহযন্ত্রকে কর্মক্ষম ও সক্রিয় রাখে এবং ব্যক্তি-বিশেষের আবেগ-প্রবণতা ও অপ্রধান পুরুষসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলিকে (Secondary male Sexual characteristics) বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

[সাত] **যৌনগ্রন্থি** (Gonads বা Sex-glands): এই গ্রন্থি জননেন্দ্রিয়েরই একটা অঙ্গ। পুরুষের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থি থেকে শুক্র আর স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে ডিম্বাণু নিঃসৃত হয়। এই গ্রন্থির হর্মোণ থেকে দেহের সাধারণ গঠন ও বাহ্যিক আচরণ নির্ধারিত হয়।

যৌন-গ্রন্থিতে দু'ধরনের কোষ থাকে—অন্তঃক্ষরা (interstitial cell) এবং বাহ্যক্ষরা (seminiferous cell)। পুং অন্তঃক্ষরা কোষ থেকে দুটি হর্মোণ নিঃসৃত হয়—অ্যানড্রোটিন বা অ্যানড্রোজেন (androtin বা androgen) এবং টেস্টোস্টেরোন (testosterone)। শেষোক্তটি দেহ সংগঠক। দেখা গেছে এটি প্রয়োগ করে কয়েক জাতীয় অসুস্থতার যেমন ধমনীসংক্রান্ত পীড়া নিরাময় করা সম্ভব। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে হর্মোণ দুটির নাম হ'ল—ইস্ট্রিন (Estrin) ও প্রোজেস্টিন (Progestin)।

উপযুক্ত যৌন হর্মোণই পুরুষের ক্ষেত্রে পুরুষত্ব (masculinity) এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে নারীত্ব (femininity) প্রকাশে সহায়তা করে। যৌন হর্মোণের পরিমাণ কমে গেছে বা যৌন-গ্রন্থিটি কোন প্রকারে অপসারিত হ'লে দেহের সাধারণ বৃদ্ধি ও গঠন ব্যাহত হয়। বয়ঃসন্ধিকালে পুরুষের পুরুষোচিত দেহ-বৈশিষ্ট্য ও স্ত্রীলোকের স্ত্রী-জনোচিত দেহ-বৈশিষ্ট্য ঠিকমত ফুটে ওঠে না। তাছাড়া এর জন্য অন্য আরো কয়েকটি গ্রন্থি—যেমন থাইরয়েড, পিটুইটারী বা থাইমাসের কাজও বেশ কিছুটা ব্যাহত হয়। আবার এই জাতীয় হর্মোণের নিঃসরণ অধিক হলে যৌনবৈশিষ্ট্যগুলি অতি মাত্রায় প্রকট হয়ে ওঠে। নিম্নস্তরের প্রাণীদের ক্ষেত্রে যৌনক্রিয়া ও যৌনাকাঙ্ক্ষা যৌনগ্রন্থি হতে নির্গত হর্মোণের প্রভাবেই ঘটে থাকে। মানুষও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে মানুষ বুদ্ধি, সামাজিক বোধ ও রীতিনীতি ইত্যাদির মুখোশ যোড়কে সেগুলিকে আচ্ছাদিত ও শোভন করেছে মাত্র। যৌন হর্মোণ যে কেবলমাত্র যৌবন আবির্ভাবের উপযুক্ত যৌনবৈশিষ্ট্যগুলিকেই প্রকাশে সহায়তা করে তা নয়, দৈহিক গঠনেও সহায়তা করে। অনেকে মনে করেন স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে মাতৃত্বের প্রবল বাসনা এই হর্মোণ থেকেই জাগ্রত ও উদ্দীপিত হয়। যাই হোক্ এই যৌন হর্মোণগুলিই পুরুষত্ব বা স্ত্রীত্ব প্রকাশের সহায়ক এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

সর্বশেষ সিদ্ধান্ত : এই আলোচনা থেকে দেখা গেল, বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির হর্মোণ দেহের রাসায়নিক ক্রিয়া ও গঠনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং সেগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য নির্ধারণ করে। কতকগুলি গ্রন্থি যেমন—থাইরয়েড, পিটুইটারী ও যৌনগ্রন্থির কর্মক্ষমতা ব্যাহত হলে বাহ্যিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন বা প্রতি যোজনের ক্ষমতা

অভ্যস্ত হয়ে যায়। দেহের সাধারণ দৈনন্দিন কাজে যে শক্তির প্রয়োজন তা জোগায় থাইরয়েড গ্রন্থি, আর বিপদাবস্থাতে (emergency situation) বিশেষ শক্তি জোগায় অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি যে সমস্ত বিষয়ের উপর সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করে সেগুলি হ'ল—পেশীমূলক সঞ্চালন দেহের সাধারণ শক্তির সাম্যতা, সাধারণধর্মী প্রেষণা, আবেগ প্রবণতা, বুদ্ধিশক্তি, যৌনবাসনা, আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি, কাজে উৎসাহ উদ্দীপনা, বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার মত মনোবল এবং দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করার মত শক্তি ও ক্ষমতা। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির হর্মোণকে ব্যক্তিত্বের অন্যতম দৈহিক উপাদান বলা যায়। এই সমস্ত হর্মোণ ব্যক্তির বুদ্ধি, অনুভূতি, যৌনতা ও যৌনজীবন এবং সামগ্রিক ব্যক্তিসত্তাকে প্রভাবিত করে বলে বিভিন্ন জাতীয় মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ ভালোভাবে উপলব্ধি করার জন্য এগুলি সম্পর্কে একটা কার্যকরী ধারণা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। বলতে গেলে এগুলিই হ'ল আমাদের মানবজীবনের দৈহিক ভিত্তি।

॥ একুশ ॥

মানব-চাহিদা

(Human-needs)

[স্নাতকস্তরে 'শিক্ষা' বিষয়ের জন্য বিশেষভাবে লিখিত]

[Need :—A condition marked by the feeling of lack or want of something or of requiring the performance of some action.—*Dictionary of Psychology.*

A need is the absence of something desired, required or useful for man's well being. It may be defined in terms of stresses, strains and movement in all enclosed rational field. —*C. E. Ragsdale.*

A need then exists as a state of tension which leads a person towards activities which will relieve tension —*Symond*].

আমাদের আচরণধারা কত বিচিত্র, কত জটিল! বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমরা বিভিন্ন ভাবে আচরণ করে থাকি। শুধু মানুষ কেন, প্রত্যেক প্রাণীই কোন না কোন প্রকারের আচরণ করে থাকে এবং মূলতঃ তা করতে হয় পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধনের উদ্দেশ্যে। নবজাত শিশু জন্মের পরই আচরণ শুরু করে। কিন্তু তার বিভিন্ন দিকের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আচরণ-ধারাটিও পরিবর্তিত হতে থাকে। সে নিত্য নূতন আচরণ-ধারা শিখে। পুরাতন পদ্ধতি বাদ দেয়, নতুন আচরণ পদ্ধতি আয়ত্ত বা অর্জন করে। কিন্তু প্রশ্ন জাগতে পারে—কেন বা কিসের চাপে সে এই সমস্ত নতুন আচরণ শিখে থাকে? এক কথায় উত্তর হ'ল—শিশুর বহুমুখী চাহিদাগুলিই তার আচরণের প্রকৃত উৎস। চাহিদা কথাটির আসল অর্থ হ'ল অভাব বোধ। প্রাণীর মধ্যে যখনই কোন বিশেষ বস্তুর অভাববোধটি জাগ্রত হয়—তখনই সেই বস্তুটির প্রতি তার একটা চাহিদা বোধের সৃষ্টি হয়। আমরা অনেক জিনিসই পেতে চাই। জীবনধারণের জন্যও বহু জিনিস আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয়। এসব জিনিসের অভাববোধও চাহিদা। খিদের সময় আমার খাদ্যের চাহিদা

দেখা দেয়, তেষ্টা পেলে জলের, বিপদে পড়লে নিরাপত্তার। যে বস্তুটির অভাবের জন্য চাহিদাটি দেখা গিয়েছিল, সেই বস্তুটি পেয়ে গেলে কিন্তু চাহিদাটি আর থাকে না। কারণ তখন অভাববোধটি আর থাকছে না। এই চাহিদার জাগরণ ও অভাববোধের তৃপ্তি অর্থাৎ চাহিদার তৃপ্তি—এই দুটির মধ্যে আবার কয়েকটি স্তর বা সোপান থাকে। সেগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল—

প্রাণীর মধ্যে কোন একটি বিশেষ চাহিদা দেখা দিলে তার মধ্যে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতির (Mental tension) সৃষ্টি হয়। এই অস্বস্তিকর অনুভূতিটিই প্রাণীকে অধিকতর সক্রিয় করে তোলে। অর্থাৎ এই অনুভূতির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য প্রাণী বহুমুখী উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আচরণ শুরু করে। চাহিদাটি যত অতৃপ্ত থাকে, অস্বস্তিকর অনুভূতির মাত্রা ততই বাড়তে থাকে, আর প্রাণীও বিভিন্ন প্রকৃতির আচরণের মাধ্যমে অনুভূতিটি এড়াতে চায় অর্থাৎ অভাববোধ সৃষ্টি হয়েছে যে বস্তুটির জন্য, সেটি পেয়ে চাহিদাটি পরিতৃপ্ত করতে চায়। স্বাভাবিক অবস্থাতে মানবদেহের বিভিন্ন অংশে একটা সাম্যাবস্থা বিরাজ করে। শরীরতত্ত্বের ভাষায় তাকে বলে দেহসাম্য (Homoeostatis)। কিন্তু প্রাণীর মধ্যে কোন চাহিদা জাগলে এই সাম্যাবস্থাটি নষ্ট হয়ে যায় আর প্রাণীও সেই সাম্যাবস্থাটি পুনরায় ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালিয়েই যায়। অভাবের বস্তুটি পাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীর চাহিদার তৃপ্তি ঘটে, প্রচেষ্টার অবসান ঘটে এবং সাম্যাবস্থাটিও ফিরে আসে। মনোবিজ্ঞানীরা প্রাণীর আচরণ-ধারাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—(১) প্রাণীর **চাহিদা**, (২) **লক্ষ্য** বা **উদ্দেশ্য** এবং (৩) উদ্দেশ্য সাধন বা লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে **বাধা**। বাধাটি থাকে চাহিদা ও লক্ষ্যের মাঝে। প্রাণীর মধ্যে চাহিদা জাগলে সে বাধাটিকে অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়। এই বাধার জন্যেই অস্বস্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি হয়। বাধা যত শক্তিশালী হবে—অস্বস্তি তত বেশী হবে, প্রচেষ্টাও তত জোরালো হবে। আবার সব চাহিদা একজাতীয় হয় না। **প্রাণীর আচরণ-ধারা নির্ভর করে চাহিদার শক্তি ও গতির উপর।** একটা খুব সহজ উদাহরণ দিই। ক্ষুধা সব প্রাণীরই একটা মৌলিক চাহিদা। এটি হচ্ছে খাদ্যের অভাববোধ। একদিন আমার পোষা কুকুরটি যখন বেশ ক্ষুধার্ত, তখন তাকে দেখিয়েই তার

খাবারটি একটা উঁচু পাচিলের উপর রেখে দিলাম। সে খাবারটি পাবার জন্ত দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি, লাফালাফি ইত্যাদি নানাপ্রকার আচরণ শুরু করল। তার অস্বস্তিকর অনুভূতিটি বোঝা গেল তার এলোমেলো আচরণ, চীৎকার, পা ছোড়া ইত্যাদির মাধ্যমে। এটা বেশ কিছুক্ষণ চলার পর খাবারটি নামিয়ে রাখা হ'ল। সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার উপর। খাওয়া হয়ে গেলে তার আগেকার বদমেজাজের বদলে শান্ত মেজাজটি আবার ফিরে এল। এখানে বাধা হ'ল ঐ উঁচু পাচিলটি। লক্ষ্য হ'ল খাদ্য বা আরো সঠিক ভাবে বললে—খাবারটি খাওয়া। প্রাণীর সমস্ত আচরণই এইভাবে ঘটে ব'লে আমরা বলতে পারি—চাহিদাগুলিই প্রাণীর কাজ বা আচরণের পশ্চাতে প্রেরণাশক্তি যোগায় এবং এগুলিই হ'ল প্রাণীর আচরণের উৎস।

আগেই বলা হয়েছে—চাহিদাগুলি সব একরকম হয় না। আবার চাহিদাগুলি যে পরিস্থিতি বা পরিবেশে অবস্থিত, সেগুলিও একজাতীয় হয় না। সচরাচর এই পরিস্থিতিগুলিতে **ধনাত্মক যোগ্যতা** (Positiue Valence) ও **ঋণাত্মক যোগ্যতা** (Negative Valence)-বিশিষ্ট—এই দুভাবে ভাগ করা হয়। এই অনুসারে প্রাণীর আচরণ তিনভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। যেমন—

(১) প্রাণী যখন পরিস্থিতিটিকে চাহিদা পূরণের অনুকূল বলে মনে করে অর্থাৎ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতিটি ধনাত্মক যোগ্যতা-বিশিষ্ট হয়, তখন প্রাণী সোজাসুজি পরিস্থিতির দিকে বস্তুমুখী আচরণ করে। হঠাৎ পরিস্থিতিটির দিকে এগিয়ে যায়।

(২) প্রাণী যখন পরিস্থিতিটিকে চাহিদা পূরণের প্রতিকূল বলে মনে করে অর্থাৎ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতিটি ঋণাত্মক যোগ্যতা বিশিষ্ট হয়, তখন প্রাণী পরিস্থিতির বিপরীত দিকে আচরণ করে। অর্থাৎ পরিস্থিতি থেকে দূরে সরে যেতে চায়।

(৩) যখন একই পরিবেশে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক উভয় প্রকার উপাদানই বর্তমান থাকে, তখন প্রাণী সে দুটির মধ্যে পার্থক্য করে ঋণাত্মক উপাদানটি বাদ দেয় ও ধনাত্মকটিকে নির্বাচন করে সেই পরিস্থিতির অনুকূলে আচরণ করে।

একই নিয়ম বা সূত্র ধরে যে কোন জটিল পরিস্থিতিতে মানব আচরণের

গতি প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা সম্ভব। চাহিদাটি তৃপ্ত করার জন্য আচরণের গতি হবে সব সময় গুণাত্মক বোধ্যতার অনুকূলে। মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন আচরণের পটভূমিতে মানব চাহিদার চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল :—(১) মানব আচরণের প্রয়োজন বা তাগিদ নির্ণীত ও নিয়ন্ত্রিত হয় চাহিদার শক্তির দ্বারা। চাহিদা যত শক্তিশালী বা তীব্র হবে, আচরণ প্রবণতাও তত জোরালো হবে। (২) চাহিদাটি দীর্ঘস্থায়ী হ'লে, অর্থাৎ অভাবটি অনেকক্ষণ অতৃপ্ত থাকলে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি সৃষ্ট হয় এবং তা ক্রমশঃই তীব্রতর হতে থাকে। (৩) চাহিদাটি পরিতৃপ্ত করার জন্য ব্যক্তির আচরণ উদ্দেশ্যমুখী হয়। (৪) ব্যক্তি লক্ষ্যে পৌছালেই অর্থাৎ তার চাহিদাটি তৃপ্ত হলেই অস্বস্তিকর অবস্থার অবসান ঘটে এবং ব্যক্তি তার দেহ-মনের সাম্য ফিরে পায়।

মানব-চাহিদার প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ (Nature and classifications of Human Needs) : চাহিদা বলতে কি বুঝায় এবং তার প্রকৃতি কি, তা জানার পর মনোবিজ্ঞানীরা স্বাভাবিক ও সঙ্গত কারণে এদের সংখ্যার প্রতি আকৃষ্ট ও মনোযোগী হয়েছেন। মানুষের মৌলিক চাহিদা কতগুলি? এ বিষয়ে বিভিন্ন মনোবিদ বিভিন্ন তালিকা প্রস্তুত করেছেন। মারে (Murray) মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলির একটা মস্ত বড় তালিকা দিয়েছেন, আর সে তালিকাটি ম্যাকডুগালের সহজাত প্রবৃত্তির তালিকার চেয়েও বড়। W. I. Thomas একটি রিপোর্টে মানুষের চারটি মৌলিক চাহিদার কথা বলেছেন (fundamental needs)—

১। নূতন অভিজ্ঞতা ও বিপজ্জনক কাজের চাহিদা

২। নিরাপত্তার চাহিদা

৩। সক্রিয় সহযোগিতার চাহিদা এবং

৪। আত্মস্বীকৃতির চাহিদা।

যাই হোক আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য মানব চাহিদাকে **প্রধানতঃ দুটি ভাগে** ভাগ করব। **প্রথমতঃ** মুখ্য বা দৈহিক চাহিদা (Primary or organic needs) এবং **দ্বিতীয়তঃ** গৌণ বা মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা (Subsidiary or psychological needs)।

জৈবিক চাহিদা : ক্ষুধা বা জৈবিক চাহিদা হ'ল সেই সমস্ত চাহিদা যেগুলির পরিতৃপ্তি না হলে প্রাণী বেঁচে বা টিকে থাকতে পারে না। জীবনটাই হল রণক্ষেত্র। এখানে প্রত্যেকেই পৃথিবীর বুকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে। দৈহিক চাহিদাগুলি প্রাণীর দেহগত অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য মেটাতে হয়। এটিকে অনেকে দৈহিক নিরাপত্তার চাহিদাও বলেন। কিন্তু জৈবিক চাহিদা বললে অর্থটি আরো ব্যাপক হয়। এই চাহিদাগুলি মূলতঃ দেহের নানা যন্ত্রের অভাব বা প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য দেখা দিয়ে থাকে। সাধারণতঃ **অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও বংশবিস্তার**—এই জাতীয় চাহিদা। বাঁচবার জন্য চাই অন্ন; প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে প্রতিযোজন করার জন্য চাই বস্ত্র ও বাসস্থান। বংশবিস্তার করার জন্য প্রয়োজন **যৌন চাহিদার**। নিম্নস্তরের প্রাণীর কথা বাদ দিলে বলা যায়-মানুষের ক্ষেত্রে যৌন চাহিদা কেবলমাত্র তার যৌন আকাঙ্ক্ষাটি পরিতৃপ্ত করার উদ্দেশ্যে জাগ্রত হয় না। মানুষ চায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে তার বংশধরদের মধ্য দিয়ে। কাজেই তার ক্ষেত্রে যৌনচাহিদার উদ্দেশ্য হল বংশবিস্তার। জৈবিক চাহিদা-গুলি মোটামুটি সর্বজনীন এবং এইজন্যই এর থেকে সঞ্জাত আচরণগুলিতে সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রায় একরকম। দৈহিক চাহিদার মধ্যে জল, বাতাস, আলো, তাপমাত্রা, বিশ্রাম, নিদ্রা প্রভৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। Bhatia ও Craig, Elements of Psychology and Mental Hygiene গ্রন্থে নিম্নলিখিত জৈবিক চাহিদা (Biological needs)-র কথা উল্লেখ করেছেন —(১) ক্ষুধা বা অন্নের চাহিদা, (২) তৃষ্ণা বা পানীয়ের চাহিদা, (৩) যৌন চাহিদা, (৪) অক্সিজেন বা বায়ুর জন্য ক্ষুধার (air hunger) চাহিদা, (৫) নিদ্রা ও বিশ্রামের চাহিদা, (৬) যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার চাহিদা (৭) অঙ্গ-সঞ্চালন ও গমনাগমনের চাহিদা (৮) পরিহার বা নিষ্কাশন করার চাহিদা (elimination)। জৈবিক বা দৈহিক চাহিদার মধ্যে কেউ কেউ আবার উত্তম খাদ্য, সুমিষ্ট সংগীত, সুন্দর জিনিসপত্র বা আমাদের ইন্দ্রিয়ের সুখানুভূতি জাগায় এমন বস্তুকেও বুঝিয়ে থাকেন। সংক্ষেপে বলা যায়, যে সমস্ত জিনিসের জন্য আমাদের গ্রহণেন্দ্রিয়গুলি উন্মুখ থাকে এবং যাদের উপর আমাদের জীবনের নিরাপত্তা নির্ভর করে—সেইগুলিই জৈবিক চাহিদা।

গৌণ বা মনস্তত্ত্বমূলক চাহিদা : এই সমস্ত চাহিদা জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় নয়। নিম্নস্তরের প্রাণীর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য হ'ল এই যে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের বেঁচে থাকাটা নিছক দেহগত। অর্থাৎ দৈহিক অভাব মেটানোই তাদের প্রধান কাজ। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বাঁচাটা দু' রকমের। এক—দেহগত, অন্যটি সমাজগত। গৌণ চাহিদাগুলি হ'ল সমাজজীবনে অভাববোধ। শিশু জন্মের পর যে সমস্ত আচরণ করে, সেগুলি প্রধানতঃ জৈবিক চাহিদা কর্তৃক পরিচালিত হয়। কিন্তু যত সে বড় হয়, ততই সে সমাজের সঙ্গে অধিকতর পরিচিত হয় এবং তার মধ্যে সামাজিক অভাববোধ জাগতে হয়। ক্রমে ক্রমে জৈবিক চাহিদার চেয়ে সামাজিক চাহিদাগুলি তার নিকট অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। পরে এই সামাজিক চাহিদাগুলিই তার আচরণ পরিচালনা করে থাকে। সমাজের সঙ্গে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা অভিযোজনের প্রচেষ্টার ফলে এই জাতীয় চাহিদার সৃষ্টি হয়। আত্মস্বীকৃতি, যূথবদ্ধতা, প্রভুত্ব বিস্তার ইত্যাদি এই জাতীয় চাহিদা।

মানুষের মনস্তত্ত্বমূলক চাহিদাগুলির অন্য নাম হ'ল সামাজিক চাহিদা। এগুলি সংখ্যাতে অজস্র, ক্রমবর্ধমান ও নিত্য পরিবর্তনশীল, এগুলির প্রকৃতি পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। অবশ্য সাধারণ সভ্য মানুষের সমাজে শিক্ষা, কৃষ্টি, সভ্যতা ইত্যাদির সমতার জন্য পরিবেশ একেবারে এক না হলেও প্রায় একই। সেইজন্য দেখা গেছে, বিভিন্ন সভ্য দেশে মানুষের চাহিদাগুলি মোটামুটি এক ধরনেরই হয়ে থাকে। সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় চাহিদা দেখা যায়। এই চাহিদাগুলি সম্বন্ধে নীচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে—

[এক] **দৈহিক নিরাপত্তার চাহিদা** (Need for Physical Security) **:** মানুষের প্রাথমিক চাহিদাই হ'ল তার দৈহিক নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করে। দেহকে সুস্থ, সবল ও বিপদমুক্ত করার জন্য আমরা যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন অনুভব করি, সেগুলির অভাববোধটিই হ'ল দৈহিক নিরাপত্তার চাহিদা। এর জন্য মানুষ নানা প্রকার আচরণ সম্পাদিত করে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। এ ছাড়া জল, বায়ু, আলো, তাপ, পোশাক-পরিচ্ছদ, নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, হাসপাতাল, ওষুধ-পত্র ইত্যাদি এই চাহিদাটির অন্তর্গত।

[দুই] **আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্যের চাহিদা** (Need for Comfort) : এই চাহিদা থেকে যে সমস্ত আচরণ সৃষ্ট হয়, সেগুলি হ'ল আর্থিক সঙ্গতি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, দারিদ্র্য থেকে দূরে থাকা, ব্যথা-বেদনার হাত এড়ানো, শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে অস্বাস্থ্যকর ও কষ্টকর এমন সব বস্তুকে এড়িয়ে যাওয়া, জীবিকার সন্ধান করা, অর্থ ইত্যাদি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখা ইত্যাদি।

[তিন] **সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা** (Need for Social Security : ব্যক্তিমাত্রই সমাজে বাস করে। কিন্তু প্রত্যেকেই সেই সমাজে তার নিজস্ব একটি স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে চায় ও একটা স্বীকৃতি আদায় করে নিতে চায়। এ ছাড়া সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ অন্যদের সঙ্গ থেকেও নির্জনতা পরিহার করতে চায়। সমাজে প্রত্যেকেই নিজের নিজের **অধিকারবোধ** সম্বন্ধেও সচেতন। সমাজ যাতে ব্যক্তিকে স্বীকৃতি দেয় তার জন্য ব্যক্তি সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত আচরণগুলি সম্পন্ন করে ও অননুমোদিত আচরণগুলি পরিহার করে। সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদার মধ্যে **যূথবদ্ধতা, অন্যের উপর প্রভুত্ব করা, সহযোগিতা, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা** ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

[চার] **আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা** (Need for Status or Recognition) : প্রত্যেক মানুষ চায় অন্যের নিকট থেকে তার নিজের সম্বন্ধে একটা মূল্য আদায় করে নিতে। নিজের মূল্যের অন্যের নিকট স্বীকৃতি পাওয়াটা একটা মৌলিক চাহিদা। এর জন্য আমরা আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও উন্নততর করার চেষ্টা করি। শিশু ভালো করে পড়াশুনা করে, খেলোয়াড় ভালো করে খেলার চেষ্টা করে, অভিনেতা ভালো করে অভিনয় করার চেষ্টা করে, শিক্ষক শিক্ষাদানে আরও যত্নবান হন। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য আমরা পারদর্শিতা দেখানোর চেষ্টা করি। রাজনৈতিক নেতা, জননেতা, সমন্বনায়ক, সমাজসেবী প্রত্যেকের আচরণ-ধারা এই বিশেষ চাহিদা কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। অবশ্য এই চাহিদাকে আরও বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বিশেষধর্মী চাহিদার সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, **ক্ষমতার চাহিদা, সম্মানের চাহিদা, মর্যাদার চাহিদা, অনুমোদন ও সমর্থনের চাহিদা** ইত্যাদি। এই চাহিদাটি অভিব্যক্ত হয় আত্মসম্মানবোধের মাধ্যমে এবং চাহিদাটি পরিতৃপ্ত হ'লে ব্যক্তি একটা আত্মসন্তুষ্টি বা আত্মশ্লাঘা লাভ করে।

[পাঁচ] **প্রভুত্ব করার বা আয়ত্ত করার চাহিদা** (Need for Mastery): মানুষ চায় প্রভুত্ব করতে, সব কিছুকে নিজের আয়ত্তে আনতে, সব কিছু অধিকার করতে। সৃষ্টির আদিম কাল থেকে চলে আসছে এই প্রভুত্ব বিস্তার করার প্রচেষ্টা। অবশ্য অতীতের মানুষ মানুষ বা ইতর প্রাণীকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করত; কিন্তু বর্তমানের মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছুকে নিজের করায়ত্ত করতে চায়। এই চাহিদা থেকেই সৃষ্ট হয়েছে—**স্ব-নির্ভরতার চাহিদা, সাফল্যের চাহিদা, অজানাকে জানার চাহিদা**, অবশ্য এই সবের মূলে কিন্তু একটি চাহিদাই রয়েছে—**আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা**। এই চাহিদাই ব্যক্তিকে জীবনে উন্নত তর পথের সন্ধান দেয়, তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে।

[ছয়] **নূতনত্বের চাহিদা** (Need for Novelty): মানুষ বৈচিত্র্যের অভিলাষী। প্রত্যেক মানুষই চায় পরিতৃপ্তি। কিন্তু মানব মনের বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন একটি চাহিদা পরিতৃপ্ত হলেই সে যেমন পুরাতন বস্তুটির প্রতি আর তেমন আগ্রহ দেখায় না, ঠিক তখনি আবার অন্য একটি নূতন চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং সে তখন নূতন জিনিস পাবার জন্য আগ্রহী হয়। এই নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। নতুন দেশ দেখা, নতুন বই পড়া, নতুন জামা-কাপড়, গয়না-পত্র, নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ ইত্যাদি জাতীয় যে কোন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন এই চাহিদাটির অন্তর্ভুক্ত।

[সাত] **সক্রিয়তার চাহিদা** (Need for Activiiy): প্রাণীর প্রাণের লক্ষণই হ'ল সক্রিয়তা। প্রাণীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জীবনীশক্তি নিহিত থাকে। সবটাই তো আর বেঁচে থাকায় জন্য খরচ হয় না। যে শক্তি অবশিষ্ট থাকে, তা বায়িত হয় নানা কাজ কর্মের মধ্য দিয়ে। মানুষের ক্ষেত্রে এই সক্রিয়তার চাহিদা থেকেই সৃষ্ট হয়েছে শিল্পকলা, কারুকার্য, ভাস্কর্য, সংগীত, সাহিত্য, অভিনয়, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ, উৎসব, ভ্রমণ প্রভৃতি। শিশুদের মধ্যেও এই সক্রিয়তার প্রকাশ অত্যন্ত বেশী এবং সেইজন্য বর্তমান শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় এই চাহিদাকে সৃজনমূলক পথে নিয়ে গিয়ে তাদের সৃজনীশক্তিটিকে সুষ্ঠুভাবে বিকশিত করার চেষ্টা করা হয়।

[আট] **স্বাধীনতার চাহিদা** (Need for Freedom): মানুষ চায় নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে, স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করতে,

স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে। এটিই হ'ল তার স্বাধীনতার মৌলিক চাহিদা; এর জন্য সে চায় বাধা-বন্ধন, নিয়ম-কানুন, শাসন-শৃঙ্খলা ভেঙে ফেলতে, তার থেকে দূরে সরে যেতে। "কারার লৌহ-কপাট ভেঙে ফেলে লোপাট" করার ইচ্ছেটি এই চাহিদার অভিব্যক্তি নয় কি? শিশুও তার কাজে স্বাধীনতা চায়। কিন্তু আমাদের প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় না—না বাড়ীতে, না বিদ্যালয়ে। যে গৃহে বা বিদ্যালয়ে শাসনব্যবস্থা কঠোর, স্বাধীনতা প্রায় নিশ্চিহ্ন এমন পরিবেশ থেকে শিশু পালিয়ে বাঁচতে চায়—তার বিরুদ্ধে জেহাদ্ ঘোষণা করে। তাকে কিছু স্বাধীনতা অবশ্যই দিতে হবে। অন্যের সাহায্য না নিয়েও নতুন জিনিস তৈরী করা, নতুন চিন্তা করা, নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা এ সবই এই চাহিদার অভিব্যক্তি।

[নয়] **প্রাক্ষোভিক নিরাপত্তার চাহিদা** (Need for Emotional Security) : একজন মানুষ আর একজনের নিকট এমন মানসিক প্রতিক্রিয়া কি প্রত্যাশা করে যেগুলির জন্য সে নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারে। পারস্পরিক ভাবের আদানপ্রদান প্রত্যেকেরই কাম্য। স্নেহ, ভালোবাসা, আত্মীয়তা-বোধ এগুলির কাঙাল আমরা সকলেই। আমরা অন্যের নিকট হতে সেই মনোভাবের আশা করি যা আমাদের ভয়ের হাত থেকে রক্ষা করে অভয় দান করবে, অথবা ও অন্যায় আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করবে, দুশ্চিন্তা এড়াতে সাহায্য করবে। এক কথায় আমাদের প্রাক্ষোভিক নিরাপত্তা বহন করে একটা প্রক্ষোভমূলক পরিতৃপ্তি বহন করবে। বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী বা সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সহানুভূতি, সহযোগিতা, সুমিষ্ট ও সদয় ব্যবহার প্রভৃতি এই চাহিদাটিকে পরিতৃপ্ত করে।

[দশ] **যৌন তৃপ্তির চাহিদা** (Need for Sexual Satisfaction) : এটি প্রধানতঃ একটি জৈবিক চাহিদা এবং যৌন উত্তেজনার পরিতৃপ্তিই এর লক্ষ্য। যৌনমূলক সমস্ত আচরণই এই চাহিদা থেকে জন্মায়। তবে মানুষের পক্ষে জন্ম বিস্তার ও বংশরক্ষার চাহিদাটিকেও এই চাহিদার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই চাহিদা থেকে বয়স্কদের মধ্যে যে সমস্ত আচরণ দেখা যায় তা হ'ল—প্রেম (কাম), পূর্বরাগ, বিবাহ, দাম্পত্য জীবনযাপন, সন্তান উৎপাদন ইত্যাদি। শিশুদের ক্ষেত্রে এই চাহিদাটি যৌন কৌতূহল ও যৌনমূলক প্রশ্নের আকারে প্রকাশিত হয়।

শিক্ষা ও চাহিদা (Education and Needs) :

মানুষের চাহিদার সীমা নেই। মূলগত দিক থেকে শ্রেণীবিভাগ ক'রে মাত্র কয়েক জাতীয় চাহিদার কথাই উপরে আলোচিত হয়েছে। তবে ঐ চাহিদাগুলিও সম্পূর্ণ পৃথক বা বায়ু নিরোধক কক্ষে অবস্থিত নয়। কোন বিশেষ চাহিদা যে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত বলে অন্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই একথা জোর করে বলা যায় না। মানুষের ক্ষেত্রে চাহিদাগুলি একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। এগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক করাও সম্ভব নয়। আবার সব চাহিদা সব সময় প্রকাশিতও হয় না। কিছু কিছু চাহিদা জীবনের বিশেষ সময়ে দেখা দেয়; প্রয়োজন শেষ করে আবার মিলিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী **মাসলো** (Maslow) বলেছেন—যতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত তীব্র চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যগুলোকে দেখা যায়। আবার **লিউইন** (Lewin) বলেছেন—সামাজিক উপাদানগুলিই চাহিদা নির্ণয় করে দেয় এবং সামাজিক পরিবেশের চাপেই এগুলি পরিবর্তিত ও অবরুদ্ধ পর্যন্ত হতে পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে চাহিদা পরিবর্তনশীল।

যাই হোক এই চাহিদাগুলিই কিন্তু আচরণের মূল উৎস এবং চাহিদা পরিতৃপ্ত হলে তবেই আচরণের বিরতি ঘটে। শিশুর কোন চাহিদা যদি অতৃপ্ত থেকে যায় তবে চাহিদাজনিত যে অস্বস্তিকর উত্তেজনাটি তার মধ্যে সৃষ্ট হয়েছিল, সেটি কমে না, বরং বেড়ে যায়। ফলে চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য শিশু আরো নানা-প্রকার আচরণ শুরু করবে। শিশু যে সমস্ত আচরণের সঙ্গে পরিচিত ও অভ্যস্ত, সেগুলির মাধ্যমে চাহিদার পরিতৃপ্ত না হলে সে নতুন, অনভ্যস্ত, অপরিচিত ও বিচিত্র আচরণ শুরু করে। এগুলি প্রায়ই অদ্ভুত ও অবাঞ্ছনীয় হয়। কিন্তু শিশু না জেনেই এরকম আচরণ করে। সে চায় চাহিদার পরিতৃপ্তি অর্থাৎ অস্বস্তিকর উত্তেজনার হাত থেকে বাঁচতে। পিতামাতা বা শিক্ষক-শিক্ষিকা কিন্তু এই আচরণগুলির যথার্থ কারণ খুঁজে বের করতে চেষ্টা না করে ধরে নেন শিশু নিছক দুষ্টামীর জন্য খামখেয়ালবশতঃ এই সমস্ত আচরণ করছে এবং এঁদের চোখে এই সমস্ত শিশু **সমস্যামূলক শিশু** (Problem Children) হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। এ কথা কিন্তু সত্য, সমস্যামূলক আচরণগুলি এ ভাবেই সৃষ্ট হয়ে থাকে। স্বাভাবিক পথে চাহিদাটি তৃপ্ত না হলে শিশুকে অস্বাভাবিক পথটি ধরতেই হয়। ফলে তার মধ্যে অবাঞ্ছিত ও অস্বাভাবিক

আচরণ-ধারা দেখা দেয়। এইজন্য সমস্যামূলক আচরণগুলিকে **পরিপূরক বা সমপূরক আচরণ** (compensatory) বলা হয়ে থাকে। শিশু যখন প্রকৃত লক্ষ্যে আর পৌঁছুতে পারে না তখনই সে একটা বিকল্প লক্ষ্য (Substituted goal) স্থির করে নেয় এবং ঐ বিকল্প লক্ষ্যে পৌঁছানোর মধ্যেই তার চাহিদাটি পরিতৃপ্ত করতে চায়। পরিবেশের সঙ্গে শিশু তখন ঠিকভাবে খাপ খাওয়াতে পারে না এবং সঙ্গতিবিধানের এই অক্ষমতাকেই বলা হয় অসঙ্গতি (Maladjustment) আর ঐ শিশুকে বলা হয় **অপসঙ্গতিপূর্ণ শিশু** (Maladjusted Child)। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ধরা যাক, একটি শিশু স্কুল পরিবেশে আত্মস্বীকৃতি লাভ করতে চায়। পড়াশুনাতে ভালো ফল দেখানো এর সবচেয়ে সহজ পথ। এখন কোন কারণে শিশুটি পড়াশুনার মাধ্যমে আত্মস্বীকৃতি লাভ করতে পারল না। তখন সে বিকল্প পথ—যেমন খেলাধূলা, নাটক, অভিনয়, আবৃত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে সহপাঠীদের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করবে। তাতেও সফল না হলে ক্লাসে গোলমাল করে, ক্লাস থেকে পালিয়ে সহপাঠিদের মারধর করে—মিথ্যা কথা বলে, চুরি করে স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করবে। সোজা পথে সে স্বীকৃতি যে আদায় করতে পারে নি, বাঁকা পথে তা আদায়ের জন্য সে চেষ্টা করবে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, সহজ ও স্বাভাবিক পথে শিশুর চাহিদার পরিতৃপ্তি তার ব্যক্তিসত্তা গঠনের সহায়ক। এই জন্য আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের নির্দেশ হ'ল—শিশুর চাহিদাগুলিকে স্বাভাবিক পথে পরিতৃপ্ত করে তার মানসিক স্বাস্থ্যটি অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। এই নির্দেশ থেকেই বর্তমান যুগের **চাহিদা কেন্দ্রিক শিক্ষার** (Need centred education) উদ্ভব ও প্রসার ঘটেছে।

এক্ষেত্রে শিক্ষক ও পিতামাতা উভয়েরই কিছু করণীয় আছে। শিশুর চাহিদাগুলি যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যে সমস্ত চাহিদার স্বাভাবিক ভাবে পরিতৃপ্তিদান সম্ভব নয় সেখানে বাঞ্ছিত সম্পূরক আচরণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এর জন্য বিদ্যালয়ে বিভিন্ন জাতীয় সহপাঠক্রমিক কার্যসূচীর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

শিক্ষার জন্য এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে যাতে শিশুর চাহিদাগুলি যথাসম্ভব পরিতৃপ্ত করা যায়। এই পরিবেশে যেন শিশুর সামাজিক চাহিদা, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, প্রাক্ষোভিক নিরাপত্তার চাহিদা ইত্যাদির

পরিতৃপ্তির পথে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়। মনে রাখতে হবে, শিশুর আত্মস্বীকৃতির চাহিদার পরিতৃপ্তির উপর তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তা নির্ভর করে। এই জন্য পড়াশুনা ছাড়াও শিশুর অন্যান্য গুণ বা দক্ষতাকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

শিশুর মধ্যে কোন অপসঙ্গতি বা সমস্যামূলক আচরণ দেখা দিলে তার লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা করলে চলবে না। কোন না কোন চাহিদার অতৃপ্তির জন্যই এ জাতীয় সমস্যামূলক আচরণ দেখা দেয়। অতএব ঐ জাতীয় আচরণের চিকিৎসা করতে হলে প্রথমে তার অতৃপ্ত চাহিদাটির খোঁজ খবর নিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হলে শিশু-পরিচালনাগারের (Child guidance Clinic) সাহায্য নিতে হবে।

শিশুর মধ্যে কি কি চাহিদা আছে তা জেনে নিয়ে সেই মত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে চাহিদাগুলি স্বাভাবিক ভাবে পরিতৃপ্ত হবার সুযোগ পেতে পারে। সে জন্য শিক্ষক একটি উপযুক্ত ও অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলবেন।

পরিবর্তনশীল ব্যক্তি-জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদাগুলিও পরিবর্তিত হয়। শিক্ষককে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে যথোপযুক্ত যত্ন ও দায়িত্ব সহকারে পরিবর্তিত চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষককে মনে রাখতে হবে—শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র চাহিদার পরিতৃপ্তিই নয়। শিক্ষার ফলে যাতে শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত চাহিদার সৃষ্টি হয়, সেদিকেও শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে।

শিক্ষক শিশুর প্রাক্ষোভিক চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এ ব্যাপারে শিক্ষকের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাঁকেই শিশুদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে। তারা যেন অসহায়বোধ না করে, সে দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে শিশুদের 'loco parents'। কাজেই স্নেহ-প্রীতি, ভালোবাসা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষক শিশুর প্রক্ষোভমূলক চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত করবেন। তিনি প্রমাণ করবেন তিনি ছাত্রদের শিক্ষকই নন—বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শকও (Friend, Philosopher and Guide)

ব্যক্তির পরিমাপ
ও
আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষা
(Assessment of Individuals and New type Objective Tests)

• [স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা বিষয়ের জন্ত বিশেষভাবে লিখিত]

আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষার সবচেয়ে বড় স্থবিধা হ'ল যে অভীক্ষাগুলি নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ। পরীক্ষক বা পরীক্ষার্থীর ব্যক্তি-সাপেক্ষতা (Subjectivity) থেকে তা মুক্ত। এইজন্ত তা নির্ভরশীল। প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর হয়, এবং তা আগের থেকে স্থির করাই থাকে। সেইজন্ত নম্বরদান যথাযথভাবে করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, এই জাতীয় প্রশ্ন তৈরী করতে সময় একটু বেশী লাগে ঠিকই, কিন্তু ছাত্রদের উত্তরদানে এবং পরীক্ষকের নম্বর দানে সময় এবং পরিশ্রম অনেক কম লাগে। তৃতীয়তঃ, সমগ্র পাঠ্য বই-এর উপর ব্যাপকভাবে প্রশ্ন করা যায় বলে শিক্ষার্থী কয়েকটি ব'ছাই করা প্রশ্নের জবাব মুখস্থ করে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হবার জন্ত সচেষ্ট হয় না। চতুর্থতঃ, অভিজ্ঞ পরীক্ষক ছাড়াও যে কেহ উত্তর পত্রগুলি পরীক্ষা ক'রে সঠিক নম্বর দিতে পারেন।

ব্যক্তির পরিমাপ ঃ মানব সভ্যতার প্রভাত-কাল থেকেই ব্যক্তির বিভিন্ন গুণ পরিমাপ করার বা ব্যক্তিগত পার্থক্য নির্ধারণ করার জন্ত কোন না কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হ'ত। এই সমস্ত পদ্ধতি যে সব সময় যুক্তিযুক্ত হ'ত তা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পরিমাপ করার নানাপ্রকার পদ্ধতি ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে তা হ'ল 'পরিমাপ' বলতে কি বুঝি? সাধারণতঃ পরিমাপ বলতে আমরা কোন বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করা বা অন্ত বস্তুর তুলনায় ঐ বস্তুটি ছোট না বড় তা নির্ণয় করি। এক কথায় পরিমাপ হ'ল তুলনামূলক বিচার। পরিমাপের ঐ সংজ্ঞাটি কোন বস্তু বা বিষয় পরিমাপ করার সময়ও প্রয়োগ করা যেতে পারে। এক মিটার কাপড় বা বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয় করতে হলে আমরা এইভাবে পরিমাণটিই নির্ধারণ করে থাকি। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিমাপের এককগুলি ভিন্ন ভিন্ন হয়।

থর্নডাইকের মতে, "Anything that exists at all, exists in some quantity, and anything that exists in quantity is capable of being measured." অর্থাৎ যার অস্তিত্ব আছে, তার পরিমাণও আছে। এই পরিমাণযুক্ত অস্তিত্বেরই পরিমাপ করা সম্ভব। অন্যান্য বস্তুর পরিমাপের সঙ্গে ব্যক্তির পরিমাপের একটা পার্থক্য আছে। ব্যক্তির পরিমাপের ক্ষেত্রে অধিকতর দক্ষতা, সাবধানতা, সূক্ষ্ম কৌশল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এবং ব্যক্তির বিশেষ গুণটি পরিমাপ করতে হবে, সেইটি সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ব্যক্তির পরিমাপকে আমরা প্রধানতঃ চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি। ভাগগুলি হল—

(১) কৃতিত্বের পরিমাপ (Achievement or Attainment)

(২) প্রবণতা পরিমাপ (Aptitude)

(৩) আগ্রহ পরিমাপ (Interest)

(৪) ব্যক্তিত্ব পরিমাপ (Personality)

(৫) বুদ্ধি পরিমাপ (Intelligence)

পরিমাপ পরীক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা (Different types of tests): পরীক্ষার বিভিন্ন শ্রেণীর একটা তালিকা দেওয়া হ'ল—

পরীক্ষা
- লিখিত
  - রচনাধর্মী
  - বিষয়াত্মক (নতুন ধরনের অভীক্ষা বা আদর্শীকৃত অভীক্ষা) [এর অনেক জাতীয় উদাহরণ আছে]
- মৌখিক

অন্যান্য বিভাগগুলি হ'ল :—

যোগ্যতাবৃদ্ধির পরীক্ষা	অন্তর্ভুক্ত (Internal) পরীক্ষা
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা	বহির্ভুক্ত (External or Public) পরীক্ষা

এ ছাড়া বিভিন্ন জাতীয় পরীক্ষার উদাহরণ বিভিন্ন অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে

পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য (Purpose of Examination): পরীক্ষার উদ্দেশ্য বহুমুখী। ডঃ মহীউদ্দীনের ভাষায়—The examiners examine for examination's sake·······and are naviely taken to serve all possible purposes. একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্—

S. F. বা H. S. পরীক্ষার উদ্দেশ্য:

১। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা।

২। সাধারণ শিক্ষার একটি বিশেষ স্তর অতিক্রম করা।

৩। বিভিন্ন জাতীয় কর্মপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার লাভ করা।

৪। বৃত্তির (Scholarship) জন্ম ছাত্র নির্বাচন করা।

৫। শিক্ষক, শিক্ষায়তন তথা পদ্ধতির উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করা।

Yokam এবং Simpson পরীক্ষার পঁয়ত্রিশ প্রকার উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। কতকগুলি উদ্দেশ্যের উল্লেখ করা হ'ল—

(১) ছাত্রের দক্ষতা ও অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করা।

(২) ছাত্রের শিক্ষকতা সম্বন্ধীয় দক্ষতার পরিমাপ করা।

(৩) শিক্ষণ-পদ্ধতি এবং বিদ্যালয়ের দক্ষতা বা ক্ষমতা পরিমাপ করা।

(৪) ছাত্রের বিশেষ কতকগুলি গুণ পরিমাপ করা।

(৫) শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রেরণার উৎসরূপে কাজ করা (উদ্বোধক)।

(৬) ছাত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া।

(৭) ছাত্রের বিশেষ বিষয়ে দুর্বলতা নির্ণয় করা।

(৮) বিদ্যালয়ের সংগঠন কাজে সাহায্য করা।

(৯) ছাত্রের সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধির পরিমাপ করা।

(১০) শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দেওয়া ইত্যাদি।

রচনামূলক পরীক্ষার সুবিধা-অসুবিধা: রচনামূলক পরীক্ষার সুবিধা অসুবিধা উভয়ই আছে। Sims তাঁর "The Essay Examination is a Projective Technique" গ্রন্থে রচনামূলক পরীক্ষা সম্বন্ধে বলেন—

(i) The examinee is permitted freedom of response in answering the question.

(ii) There is no single answer to the question which can be regarded as correct and complete, even by experts.

(ii) Answers of the question are characterised by different degrees of quality or merit.

সুবিধা : রচনামূলক পরীক্ষায় সুবিধাগুলির কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল :—

(১) শিক্ষার্থীর অধীত জ্ঞানের সহজে পরিমাপ করা যায়।

(২) শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে তার দৃষ্টিভঙ্গী ও মত প্রকাশ করতে পারে।

(৩) শিক্ষার্থীর ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান, রচনাশৈলী ভাবপ্রকাশের ভঙ্গী ইত্যাদি রচনামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বিচার করা যায়।

(৪) শিক্ষার্থী যুক্তি ও বিচার-শক্তির প্রয়োগ করতে পারে।

(৫) শিক্ষার কতকগুলি ব্যাপক ও বিস্তৃত ফলাফল এই পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা সম্ভব

অসুবিধা :

(১) পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) নেই।

(২) পরীক্ষার যথার্থতাও (Validity) নেই।

(৩) ফলাফলের বিচারটা ব্যক্তি সাপেক্ষ (Subjective)।

(৪) প্রয়োগশীলতার (Administrability) অভাব আছে।

(৫) সময় বেশী লাগে বলে পরিমিতত্তার (Economy) অভাব আছে।

(৬) পরীক্ষার কোন সঠিক নাম (Worm) নেই।

(৭) ছাত্ররা পরীক্ষাতে পাশ করাটাকেই বড় করে দেখে।

(৮) যুক্তি অপেক্ষা স্মৃতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(৯) শিক্ষার্থীর প্রকৃত জ্ঞানের পরিসর পরিমাপ না করে এই পরীক্ষা কেবল খণ্ডিত অংশের (Tit-bits of knowledge) পরিমাপ করে।

(১০) শিক্ষার্থীর সারা বছরের সামগ্রিক পারদর্শিতার উপর কোনপ্রকার গুরুত্ব আরোপ করা হয় না।

(১১) ছাত্রদের মধ্যে একটা অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে।

(১২) শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের পরিমাপ করা যায় না।

(১৩) শিক্ষা পদ্ধতির উপায় হিসাবে না বিচার করে উদ্দেশ্য হিসাবে বিচার করা হয়।

(১৪) বিভিন্ন শিক্ষার্থীর ফলাফলের তুলনা করা সম্ভব হয় না।

আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষা (New-Type Objective Test) : আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষার সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল যে অভীক্ষাগুলি

নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ। পরীক্ষক বা পরীক্ষার্থীর ব্যক্তি-সাপেক্ষতা (Subjectivity) থেকে তা মুক্ত। এইজন্য তা নির্ভরশীল। প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর হয় এবং তা আগের থেকে স্থির করাই থাকে। সেইজন্য নম্বরদান যথাযথ ভাবে করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, এই জাতীয় প্রশ্ন তৈরী করতে সময় একটু বেশী লাগে ঠিকই, কিন্তু ছাত্রদের উত্তরদানে এবং পরীক্ষকের নম্বরদানে সময় এবং পরিশ্রম অনেক কম লাগে। তৃতীয়তঃ, সমগ্র পাঠ্য বই-এর উপর ব্যাপক ভাবে প্রশ্ন করা যায় বলে শিক্ষার্থী মাত্র কয়েকটি বাছাই করা প্রশ্নের জবাব মুখস্থ করে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হবার জন্য সচেষ্ট হয় না। চতুর্থতঃ, অভিজ্ঞ পরীক্ষক ছাড়াও যে কেহ উত্তর পত্রগুলি সঠিকভাবে পরীক্ষা ক'রে সঠিক নম্বর দিতে পারেন।

আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষাগুলিকে সাধারণতঃ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (Short Answer)-মূলক অভীক্ষা বলা হয়। এই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরমূলক অভীক্ষাকে আবার কতকগুলি ভাগে ভাগ করা যায়। পরপৃষ্ঠায় এর একটি তালিকা দেওয়া হ'ল—

এবার সংক্ষেপে এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্—

(ক) সহজ মনে করা (Simple Recall) :

(১) প্রশ্ন ধরনের (Question from) : চিঠি লেখার সময় প্রথমেই যদি "প্রিয় মহাশয়" বলে সম্বোধন করা হয়, তবে তার পর কি যতিচিহ্ন বসবে ?

(উত্তর————)

(২) বিবৃতি ধরনের (Statement) : দু'টি সংখ্যার যোগফল ১০ এবং উহাদের বর্গের অন্তরফল ২৮ হ'লে বড় সংখ্যাটি কত ? (উত্তর———)

(৩) "উদ্দীপক শব্দ" বা Phrase জাতীয় :—

—: বৈজ্ঞানিকদের নাম :—	—: বিখ্যাত অবদান :—
(ক) নিউটন—	(ক) ………………
(খ) আইনস্টাইন—	(খ) ………………
(গ) জগদীশ বসু—	(গ) ………………

(খ) সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা Completion) :

গীতাঞ্জলির রচয়িতা হলেন———যার জন্য তিনি———লাভ করেন।
(১) (২)

(১)————
(২)————

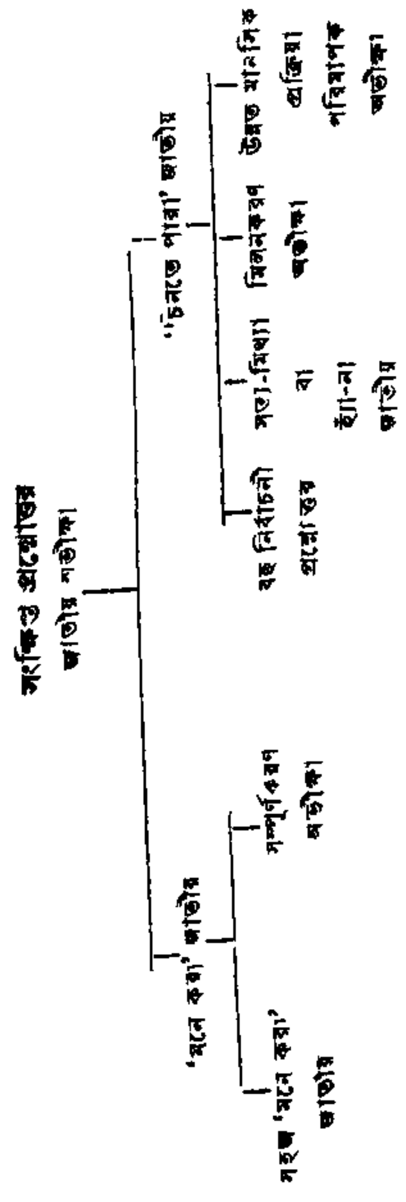
সংক্ষিপ্ত প্রত্যুত্তর জাতীয় অভীক্ষা
'চিনতে পারা' জাতীয়
বহু নির্বাচনী প্রশ্নোত্তর
সত্য-মিথ্যা বা হ্যাঁ-না জাতীয়
মিলনকরণ অভীক্ষা
উন্নত মানসিক প্রক্রিয়া পরিমাপক অভীক্ষা
'মনে করা' জাতীয়
সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা
সহজ 'মনে করা' জাতীয়

(গ) **বহু-নির্বাচনী প্রশ্নোত্তর** (Multiple Choice) :

(১) ভারতে নোবেল পুরস্কার পান গান্ধীজী/রবীন্দ্রনাথ/দাদাভাই নৌরজী/জগদীশ বসু।

(২) ষড়ভুজ হ'ল ছয়টি বাহু বিশিষ্ট ক্ষেত্র/বৃদ্ধা ডাইনী/ মণ্ডল/সমাবেশ।

(৩) সিপাহী বিদ্রোহ হয় ১৮২৫/১৮৬২/১৮৫৭/১৮৫৬ সালে।

(ঘ) **সত্য-মিথ্যা জাতীয়** (True-False) :

(১) জলের চেয়ে বরফ হাল্কা…… ……সত্য/মিথ্যা।

(২) ভারতবর্ষ ১৯৪৫ সালে স্বাধীন হয়……সত্য/মিথ্যা।

(ঙ) **হ্যাঁ-না (Yes-No) জাতীয় :**

(১) গঙ্গা নদী ভারতের সবচেয়ে বড় নদী——হ্যাঁ/না।

(২) জল সব সময় নীচু থেকে উঁচুতে যায়——হ্যাঁ/না।

(চ) **মিলন-করণ অভীক্ষা** (Matching Type) :

(ঠিক মত সাজানো)

১। রবীন্দ্রনাথ	১। বিখ্যাত নর্তক
২। পি. সি. সরকার	২। ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী
৩। উদয়শংকর	৩। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক
৪। শরৎচন্দ্র	৪। বিখ্যাত শিল্পী
৫। গোষ্ঠ পাল	৫। বিশ্বকবি
৬। জওহরলাল	৬। বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়
৭। অবনীন্দ্রনাথ	৭। সুবিখ্যাত যাদুকর

(ছ) **উন্নত মানসিক প্রক্রিয়া-পরিমাপক অভীক্ষা** (**Tests of higher mental processes)** :

এই অভীক্ষাতে সাধারণতঃ কোন প্রদত্ত তথ্যের সংব্যাখ্যান করতে হয় এবং যে নতুন জ্ঞান অর্জিত হ'ল তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে হয়। এ জাতীয় অভীক্ষা বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান, দক্ষতা, ধারণা, উপলব্ধি, প্রয়োগ ক্ষমতা, রসবোধ, মনোভাব, আগ্রহ প্রভৃতি পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়।

(জ) **উপমান অভীক্ষা** (Analogy Test) :

(১) আলোর সঙ্গে অন্ধকারের যে সম্পর্ক, সুখের সঙ্গে——সে সম্পর্ক।

(২) পিতার সঙ্গে পুত্রের যে সম্বন্ধ, শিক্ষকের সঙ্গে——সে সম্পর্ক।

(খ) শ্রেণীকরণ অভীক্ষা (Classification of Similarity Test)

(যেটি সমশ্রেণীভুক্ত নয়, সেটি বাদ দিতে হবে)

(১) কলিকাতা, দিল্লী, হিমালয়, বোম্বাই।

(২) বই, খাতা, মোটর গাড়ী, পেনসিল।

॥ বিষয়াত্মক পরীক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচনের কতকগুলি নিয়ম ॥

বিষয়াত্মক পরীক্ষা পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন। বিষয়বস্তুগুলি কি ভাবে গঠিত হবে, সে বিষয়ে কোন মৌলিক নীতি এখনও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। বলা যেতে পারে বিষয়াত্মক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরীর কোন বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম এখনও গড়ে ওঠেনি। কিন্তু তা হলেও অভিজ্ঞতা থেকে যে সমস্ত নিয়ম আপনাআপনি গড়ে উঠেছে, সেগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল—

১। প্রশ্নের ভাষা যেন সরল ও সহজবোধ্য হয়।

২। পাঠ্যপুস্তক থেকে বক্তব্যগুলিকে যেন আক্ষরিক ভাবে (verbatim) উদ্ধৃত না করা হয়।

৩। বিতর্কমূলক বিষয় প্রশ্ন পত্রে না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

৪। পূর্ববর্তী প্রশ্ন যেন পরবর্তী প্রশ্নের উত্তরদানে কোন সংকেত না জানায়।

৫। প্রশ্নগুলি যেন পরস্পর নির্ভরশীল না হয়।

৬। প্রশ্নপত্রে সঠিক জবাব যেন এলোমেলো ধরনের না হয়।

৭। প্রশ্নপত্রে কৌশল বা চাতুর্যের সাহায্য নিয়ে যেন ছাত্রদের ঠকান না হয়।

৮। প্রশ্নের ভাষা যেন দ্ব্যর্থক না হয়।

৯। অতি সাধারণ বিষয় থেকে যেন প্রশ্ন করা না হয়।

॥ বিষয়াত্মক প্রশ্নের সুবিধা-অসুবিধা ॥

সুবিধা ঃ বিষয়াত্মক পরীক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল যে তা নৈর্ব্যক্তিক বা বস্তুনিষ্ঠ। অর্থাৎ পরীক্ষকের বা পরীক্ষার্থীর ব্যক্তি সাপেক্ষতা এ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। প্রশ্নের জবাব একটিই হতে পারে বলে নম্বরদান পদ্ধতিও সহজ ও নির্ভুল। এ জাতীয় অভীক্ষার প্রয়োগে সময় ও পরিশ্রম অনেক কম লাগে। সমগ্র পাঠ্যপুস্তক থেকে প্রশ্ন নির্বাচন করা হয় বলে ছাত্র কে।শমাত্র

কয়েকটি বাছাই করা প্রশ্ন মুখস্থ করে পরীক্ষায় বসতে সাহস করে না। নম্বরদান পদ্ধতি এত সহজ যে অভিজ্ঞ পরীক্ষক ছাড়াও যে কেউ নির্ভুলভাবে নম্বর দিতে পারে।

অসুবিধা : এই জাতীয় পরীক্ষাতে কেবলমাত্র তথ্যগত জ্ঞানের পরীক্ষা করা হয়। ভাব, ভাষা, প্রকাশভঙ্গী বা রচনাশৈলীর উপর কোন প্রকার গুরুত্ব দেওয়া হয় না। প্রশ্নপত্রগুলি বেশ বড় হয় বলে ব্যয় অত্যন্ত বেশী হয়। প্রশ্নগুলিও অভিজ্ঞ লোক বা বিশেষজ্ঞ ছাড়া তৈরী করা সম্ভব হয় না। এই পরীক্ষা প্রয়োগ করা অত্যন্ত কঠিন। এ ব্যাপারেও দক্ষ ও কুশলী পরীক্ষকের প্রয়োজন। এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় শিক্ষার্থী স্বাধীন ভাবে তার মতামত বা ভাবপ্রকাশ করতে পারে না। এ জাতীয় অভীক্ষাতে শিক্ষার্থীর জ্ঞান সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া শিক্ষার্থী অনুমানের উপরও অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করে থাকে। এ প্রসঙ্গে Sandiford বলেন : The examiner cannot say where knowledge stops and guessing begins. এ জাতীয় অভীক্ষায় পরীক্ষার্থীর বুদ্ধি চর্চার বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয় না। বিষয়াত্মক অভীক্ষার ফলাফলের ব্যাখ্যা বা তুলনা করা সম্ভব হয় না। এর জন্য **আদর্শায়িত অভীক্ষার (Standardised Test)** প্রয়োজন। এই জাতীয় অভীক্ষার প্রয়োগে সময় কম লাগে ঠিকই, কিন্তু প্রশ্নপত্র রচনাতে সময় অনেক বেশী লাগে।

সিদ্ধান্ত : অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এ জাতীয় অভীক্ষা প্রচলিত রচনাধর্মী অভীক্ষার চেয়ে অনেক ভাল। এই জাতীয় অভীক্ষা গতানুগতিক অভীক্ষার চেয়ে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য, যথার্থ ও বস্তুনিষ্ঠ। রচনাধর্মী অভীক্ষা অত্যন্ত বেশীমাত্রায় ব্যক্তিসাপেক্ষ। কিন্তু বিষয়াত্মক অভীক্ষা ঐ দোষ থেকে মুক্ত। এই জাতীয় অভীক্ষার প্রভাব রচনাধর্মী অভীক্ষাতেও লক্ষ্য করা যায় এবং তার ফলে রচনাধর্মী অভীক্ষার যথেষ্ট উন্নতিও সাধিত হয়েছে। কাজেই গতানুগতিক পদ্ধতির পরিবর্তে এ জাতীয় অভীক্ষার সাহায্যে পরীক্ষা গ্রহণ করলে পরিমাপ বা মূল্যায়ন যে আরো ভাল হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর এর ফলে গতানুগতিক পরীক্ষাপদ্ধতির একটা সংস্কার সাধনও করা সম্ভব।

॥ পরিসংখ্যান ॥

ফ্রিকোয়েন্সী ডিস্ট্রিবিউশ্যান

(Frequency Distribution)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিমাপ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। প্রায় প্রতি মুহূর্তেই আমাদের পরিমাপের সাহায্য নিতে হয়। আমরা বিভিন্ন ব্যক্তির উচ্চতা বা ওজন নির্ণয় করি, বিভিন্ন বস্তু, স্থান বা কালের মাপ গ্রহণ করি। কিন্তু সবক্ষেত্রেই পরিমাপের একক এক হয় না। কখনও প্রয়োজন গজ, ফুট, ইঞ্চি বা মিটার, সেন্টিমিটারের; কখনও ব্যবহার করি কিলোগ্রাম বা লিটার। আবার বুদ্ধি, ক্ষমতা প্রভৃতিও আমাদের পরিমাপের বিষয়বস্তু হয়।

সারি বিন্যাস (Rank order): বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কে বেশী লম্বা, কে কম লম্বা বা কতকগুলি বস্তুর মধ্যে কোন্‌টি বেশী ভারী, কোন্‌টি কম ভারী, এ ধরনের পরিমাপ করাটাও আমাদের প্রায়ই দরকার হয়। এর সবচেয়ে সহজ উপায় হ'ল পরিমাপের বস্তুগুলিকে বিশেষ কোন গুণ বা ধর্ম অনুযায়ী পর পর **সারিতে (rank)** সাজিয়ে ফেলা। কোন স্কুলের একটি শ্রেণীর ছাত্রদের উচ্চতা বা পরীক্ষার ফল অনুযায়ী পর পর সাজিয়ে বলতে পারি কে প্রথম স্থান, কে দ্বিতীয় স্থান বা কে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। এতে কোন একটি বিশেষ দলের মধ্যে কোন একটি বিশেষ গুণের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির সারিতে স্থানটি (Rank order) কোথায় তাই বোঝা যায়। এটি সম্পূর্ণ তুলনা সাপেক্ষ বা Relative। এই স্থান দিয়ে ব্যক্তির আসল উচ্চতা (absolute বা একক উচ্চতা) বা অন্য কোন পরিমাপ (যেমন দৈর্ঘ্য বা পরীক্ষার ফল) বোঝা যায় না।

স্কোর (Score): ব্যক্তির পরিমাপকে অঙ্কের সাহায্যে প্রকাশ করলে তাকে ব্যক্তির স্কোর বলা হয়। স্কোর বিভিন্ন প্রকারের হ'তে পারে। ব্যক্তির উচ্চতা, মাসিক বেতন, পরীক্ষার ফলাফল, বুদ্ধ্যঙ্ক ইত্যাদি স্কোরের সাহায্যে

করা হয়। ব্যক্তির যে সমস্ত ধর্ম, গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনশীল, সেগুলিকেই আমরা স্কোর দিয়ে প্রকাশ করতে পারি। সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যগুলিকে স্কোর দিয়ে প্রকাশ করা যায় না।

স্কেল (Scale) : স্কোর বা নম্বরগুলিকে যখন কোন unit (একক) বা খাপ ঠিক করে পর পর খাপে খাপে সাজানো হয় তখন তাকে **স্কেল** বলা হয়। স্কেলের সংখ্যাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সমান দূরত্ব বজায় রাখে। কোন একটি স্কেলের পরপর দু'টি সংখ্যার বিয়োগ ফলই হ'ল সেই স্কেলের একক বা unit।

সাধারণতঃ প্রত্যেক স্কেলের দু'টি বৈশিষ্ট্য থাকে। প্রথম স্কেলের সংখ্যাগুলির দূরত্ব জ্ঞাপন করে একটি নির্দিষ্ট একক। দ্বিতীয় স্কেলটি শুরু হয় Zero point থেকে।

কিন্তু মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাতত্ত্বে যে সমস্ত স্কেল ব্যবহার করা হয়, তাতে unit সমান হলেও স্কেলটি Zero point থেকে শুরু হয় না। 30" স্কোরটিকে 15" স্কোরের দ্বিগুণ বলা যেতে পারে। কিন্তু 60 বুদ্ধ্যঙ্ককে 120 বুদ্ধ্যঙ্কের অর্ধেক বলতে পারি না। স্কেলের সাহায্যে কোন বস্তুর কোন একটি বিশেষ গুণ মাপ করা সম্ভব।

অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন সারি (Variables-continuous and discrete series) : যে সকল গুণ বা ক্ষমতাকে আমরা স্কোর দিয়ে প্রকাশ করি, সেগুলিকে বলা হয় variable। এই variable-কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, অবিচ্ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন সারি। অবিচ্ছিন্ন সারির ক্ষেত্রে দুটি স্কোরের মধ্যে যে বিচ্ছেদ বা বিরতি, প্রয়োজন হ'লে সেটিকে আরো ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায়। যেমন 4 টাকা, 5 টাকা, 6 টাকা এই সারিতে আমরা 4 টাকা বা 5 টাকা এবং 6 টাকার মধ্যে ক্ষুদ্রতর অংশ কল্পনা করতে পারি। ফলে 4·10, 4·50, 4·75 বা 5·20, 5·25, 5·60 এরকম সংখ্যাও আমরা পেতে পারি, কিন্তু বিচ্ছিন্ন সারির ক্ষেত্রে দুটি স্কোরের মধ্যে যে ব্যবধান, তাকে আর ক্ষুদ্রতর কোন অংশে প্রকাশ করা যায় না। যেমন, 4টি মানুষ, 5টি মানুষ, 6টি মানুষ। এই সারিতে 4 এবং 5 বা 5 এবং 6টি মানুষের মধ্যে কোন বিভাজন চলে না। বাস্তবক্ষেত্রে 4·5 বা 5·7টি মানুষ হয় না।

অবিচ্ছিন্ন সারিকে একটি সরল রেখা হিসেবে কল্পনা করলে এই সারির স্কোরগুলির তাৎপর্য বোঝা সহজ হয়। অবিচ্ছিন্ন সারির স্কেলে পর পর দুটির

মধ্যে যে ব্যবধান বা পার্থক্য দেখা যায়, সেটি প্রকৃতপক্ষে কোন শূন্যস্থান নয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—

ধরা যাক একটি স্কোর হ'ল—150, এ ক্ষেত্রে প্রকৃত স্কোর ধরতে হবে 149·5 থেকে 150·5 পর্যন্ত। স্কোরকে ধরতে হবে 150·5 থেকে 151·5 পর্যন্ত। এখানে 150-এর নিম্নসীমা হচ্ছে 149·5 এবং উচ্চসীমা হচ্ছে 150·5।

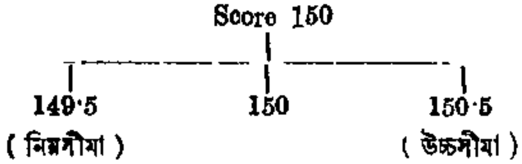

এর আর একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। 150 স্কোরের অর্থ হ'ল 150 থেকে 151 পর্যন্ত যে কোন মান যেমন 150·1 150·2, 150·3 ইত্যাদি কিন্তু 151 নয়। এই হিসেবে 150·5 হ'ল 150 থেকে 151 পর্যন্ত দূরত্বের মধ্যবিন্দু।

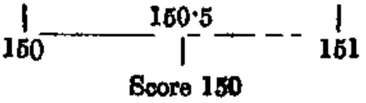

Frequency Distribution : ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে স্কোরগুলিকে তাদের ফ্রিকোয়েন্সী বা কতবার এসেছে তার সংখ্যা অনুযায়ী সাজানো হয়। এই বণ্টনে একটি বিশেষ স্কোর কতজনে পেয়েছে বা কোন একটি নির্দিষ্ট ব্যবধানের মধ্যে একটি স্কোর কতবার এসেছে, তারই হিসেব থাকে। এর জন্য প্রথমেই স্কোরগুলি সাজিয়ে নেওয়া দরকার। কোন একটি নিয়ম অনুযায়ী সাজিয়ে না নিলে স্কোরগুলির কোন তাৎপর্যই থাকে না। সাধারণতঃ তিন ভাবে স্কোরগুলিকে সাজানো হয়।

প্রথমতঃ, Range বা বিস্তৃতি : বিস্তৃতি বলতে বোঝায় স্কোরগুলি কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। সারির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্কোরের মধ্যে যে পার্থক্য তাকেই বিস্তৃতি বলে।

দ্বিতীয়তঃ, Class Interval বা শ্রেণী-ব্যবধান : সারির স্কোরগুলিকে যখন নির্দিষ্ট দূরত্ব অনুযায়ী ছোট ছোট দলে ভাগ করে সাজানো হয় তখন এই দূরত্বকে শ্রেণী ব্যবধান বলে।

তৃতীয়তঃ, Graphical Representation বা লেখচিত্র : গ্রাফ বা লেখচিত্রের সাহায্যে শ্রেণীবদ্ধ স্কোরকে প্রকাশ করা হয়। সাধারণতঃ চার প্রকার গ্রাফের সাহায্যে ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্ট্রিবিউশ্যানকে প্রকাশ করা হয়। সেগুলি হ'ল,—ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন, হিস্টোগ্রাম, কিউম্যুলেটিভ, ফ্রিকোয়েন্সী গ্রাফ এবং কিউম্যুলেটিভ্ পার্সেন্টেজ কার্ভ বা ওজাইভ্।

॥ নীচে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের একটা উদাহরণ দেওয়া হল ॥

একটি পরীক্ষায় 50 জন ছাত্রের স্কোর

অবিন্যস্ত ভাবে (ungrouped)

185	166	176	145	166	191	177	164	171	174
147	178	176	[]142	170	158	171	167	180	178
178	148	168	187	181	172	165	169	173	184
175	156	158	187	156	172	162	193	173	183
‡197	181	151	161	153	172	162	179	188	179

‡ সর্বোচ্চ স্কোর [] সর্বনিম্ন স্কোর।

Range হ'ল (197 – 142) বা 55।

Class Interval : সাধারণতঃ এমন interval নেওয়া হয়, যাতে দল বা শ্রেণীর সংখ্যা কুড়ির বেশী বা দশের কম না হয়। সচরাচর 3, 5 ও 10 একক ধরে ধাপের বিস্তার ঠিক করা হয়। Rangeকে ধাপদূরত্ব দিয়ে ভাগ করলে ধাপ সংখ্যা পাওয়া যায়। এখানে Class interval যদি 5 ধরা যায়, তবে ধাপ (Class) হয় 55÷5=11টি। গ্রাফ্ কাগজে প্লট করার সুবিধার জন্য একটি শ্রেণী বেশী নিতে হয়। অতএব মোট শ্রেণীর সংখ্যা হ'ল 11+1 =12টি। এইভাবে শ্রেণীর সংখ্যা নির্ণয় করার সূত্র হ'ল—

$$\frac{\text{Range}}{\text{Class Interval}} + 1$$

॥ শ্রেণী বা দল সাজাবার নিয়ম ॥

স্কোরগুলির সবচেয়ে ছোটটি হ'ল 142. প্রথম শ্রেণীটি 142–147 করে সাজানো চলত। কিন্তু অঙ্ক করার সুবিধার জন্য 140 থেকে শুরু করা হ'ল। শ্রেণীতে সাজাবার তিনটি নিয়ম আছে।

A	B	C
140—145	139·5—144·5	140—144
145—150	144·5—149·5	145—149
ইত্যাদি	ইত্যাদি	ইত্যাদি।

A পদ্ধতিতে 140—145 দলের অর্থ হ'ল—139·5 থেকে শুরু করে 144·5 পর্যন্ত সমস্ত স্কোর ঐ দলের মধ্যে পড়বে। B পদ্ধতিতে ঐ একই দলের উচ্চসীমা ও নিম্নসীমা দেখিয়ে লেখা হয়েছে। C পদ্ধতিতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলেও এটি A পদ্ধতির থেকে সহজ, যদিও B পদ্ধতির মতো নিখুঁত নয়। Scoreগুলি সাজাবার সময় সাধারণতঃ C পদ্ধতি মেনে চলা হয়। A পদ্ধতির অসুবিধা হ'ল—145 স্কোরটিকে 140—145 এই শ্রেণীতে ভুল করে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। B পদ্ধতিতে বার বার ·5 লেখা বিরক্তিকর। সেই কারণে C পদ্ধতিতে শ্রেণী ভাগ করে সাজানো সহজ। তবে একথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে 140—144 এর অর্থ হচ্ছে 139·5 থেকে 144·5 পর্যন্ত। ফ্রিকোয়েন্সী বন্টন হিসেবে করার প্রথম ধাপ হ'ল স্কোরগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দলে সাজিয়ে নেওয়া।

দ্বিতীয় ধাপে, শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দু (Midpoint) নির্ণয় করা হয়। কোন একটি শ্রেণীর প্রতিনিধিমূলক মান হিসেবে ঐ শ্রেণীর মধ্যবিন্দুকেই গ্রহণ করা হয়। যে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত স্কোরগুলির প্রত্যেকটির মান ঐ শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর সমান বলে ধরে নেওয়া হয়। মধ্যবিন্দু নির্ণয় করার সহজ সূত্র হচ্ছে—

$$\text{মধ্যবিন্দু} = \text{শ্রেণীর নিম্নপ্রান্ত} + \frac{\text{ঊর্ধ্বপ্রান্ত} - \text{নিম্নপ্রান্ত}}{2}$$

এই সূত্র অনুযায়ী 140 – 144 এই শ্রেণীর মধ্যবিন্দু হ'ল—

$$139{\cdot}5 + \frac{144{\cdot}5 - 139{\cdot}5}{2}$$

$$= 139{\cdot}5 + \tfrac{5}{2} = 139{\cdot}5 + 2{\cdot}5 = 142$$

তৃতীয় ধাপে, কোন্ শ্রেণীতে প্রত্যেকটি স্কোর পড়েছে, সেটা একটি করে দাগ দিয়ে (Tally) স্থির করা হয়। ঐ দাগগুলির সংখ্যা গুণে সেই সংখ্যাকে frequency (f) রূপে প্রকাশ করা হয়। এই Frequency দেখে

কোন্ সারিতে কতকগুলি করে স্কোর আছে, তা জানা যায়। Frequency-গুলির যোগফল থেকে বণ্টনের মোট সংখ্যা (Number বা N) পাওয়া যায়।

চতুর্থ ধাপে, গ্রাফ্ কাগজে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনটি নির্দিষ্ট ভাবে প্লট করা হয়।

এখন পূর্বোক্ত 50টি স্কোরকে Frequency distribution বা Table-এ সাজানো যাক্—

শ্রেণী X)	মধ্যবিন্দু (Mid point)	Tallies	Frequencies (f)
195—199	197	/	1
190—194	192	//	2
185—189	187	////	4
180—184	182	~~////~~	5
175—179	177	~~////~~ ///	8
170—174	172	~~////~~ ~~////~~	10
165—169	167	~~////~~ /	6
160—164	162	////	4
155—159	157	////	4
150—154	152	//	2
145—149	147	///	3
140—144	142	/	1
			N=50

প্রথম স্কোরটি হ'ল 185, এই স্কোরটি (185—189) শ্রেণীর অন্তর্গত বলে ঐ শ্রেণীর পাশে একটি tally দেওয়া হ'ল। তেমনি দ্বিতীয় স্কোর 147, শ্রেণী (145-149)-র অন্তর্গত বলে ঐ শ্রেণীর পাশে একটি tally দেওয়া হ'ল। এইভাবে যখন সমস্ত স্কোরের জন্য tally দেওয়া শেষ হয়, তখন এক একটি শ্রেণীর tally-গুলি যোগ করা হয়। Tally-এর যোগফলকে ঐ শ্রেণীর frequency বলা হয়।

ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের চিত্র (বহুভুজ ও হিস্টোগ্রাম বা আয়তলেখ): অবিন্যস্ত স্কোরগুলিকে ফ্রিকোয়েন্সী অনুযায়ী শ্রেণী ব্যবধানে সাজিয়ে যে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন গঠন করা হয়, তাকে নানা উপায়ে ছবির সাহায্যে

প্রকাশ করা যায়। এই রকম একটি সুপ্রাচীন পদ্ধতি হ'ল ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন বা বহুভুজ এবং হিস্টোগ্রাম বা আয়তরেখ অঙ্কন করা।

Frequency Polygon :

যে কোন গ্রাফ্ আঁকার সময় দুটি অক্ষরেখা নিতে হয় X এবং Y। X-অক্ষরেখাটি হ'ল অধঃরেখা এবং Y অক্ষরেখাটি হ'ল লম্বরেখা। Frequency polygon আঁকার সময় X অক্ষরেখার উপর শ্রেণীব্যবধানগুলি পর পর বসাতে হয়। তবে, অক্ষরেখার দুটি প্রান্তে প্রকৃত শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা থেকে আরো দুটি বেশী শ্রেণীব্যবধান ধরে বসাতে হবে, যদিও ঐ শ্রেণীব্যবধানে কোন স্কোর থাকে না। Y অক্ষরেখাতে ফ্রিকোয়েন্সীগুলি বসাতে হয়। Y অক্ষরেখার উচ্চতা ও শ্রেণীর একক স্থির করার সময় একটি নিয়ম মনে রাখতে হবে। X অক্ষরেখার প্রসারের 75% বা ¾ অংশ হবে Y অক্ষরেখার উচ্চতা। এই 75% নিয়ম মেনে চললে লেখচিত্রটি একটি সুষম আকার ধারণ করে। Y অক্ষরেখার প্রসার X অক্ষরেখা থেকে বেশী হ'লে বহুভুজটি হবে অতিরিক্ত উঁচু আর কম হলে তা হবে অত্যন্ত নীচু বা চ্যাপ্টা।

একক ঠিক করার পর X ও Y অক্ষরেখাতে যথাক্রমে শ্রেণীব্যবধান ও ফ্রিকোয়েন্সী বসাতে হবে। X অক্ষরেখাতে শ্রেণীব্যবধানগুলি বসাবার সময় মনে রাখতে হবে যে সেখানে প্রকৃত প্রান্তসীমা বসাতে হবে। অর্থাৎ 140-144 শ্রেণীকে নিম্নপ্রান্ত ও উচ্চপ্রান্ত দেখিয়ে 139·5—144·5 হিসেবে বসাতে হবে। এরপর Y অক্ষরেখাতে ফ্রিকোয়েন্সীগুলি বসাতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি শ্রেণী ব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সী বসাতে হবে সেই শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দুর উপর। যেমন, 140—144 বা 139·5—144·5 শ্রেণীর f=1 ; ঐ শ্রেণীর মধ্যবিন্দু 142-এর উপর লম্বাভাবে Y অক্ষরেখার এক একক দূরে একটি বিন্দু বসাতে হবে। অর্থাৎ এই চিত্রে প্রতিটি শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দুকে ঐ শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থচক বিন্দু বলে ধরে নেওয়া হয় এবং ঐ মধ্যবিন্দুর উপর অঙ্কিত লম্বরেখাতেই ফ্রিকোয়েন্সীর বিন্দুটি বসাতে হয়। সব বিন্দুগুলি যখন বসানো হয়ে যায়, তখন যে শ্রেণীতে কোন frequency নেই, সেই শ্রেণীর মধ্যবিন্দু থেকে শুরু করে প্রত্যেক বিন্দুর সঙ্গে সরলরেখা টেনে যোগ করে শেষ

যে শ্রেণীতে কোন ফ্রিকোয়েন্সী নেই, তার মধ্যবিন্দুতে গিয়ে চিত্রটি শেষ করলেই সেটি একটি frequency polygon হবে।

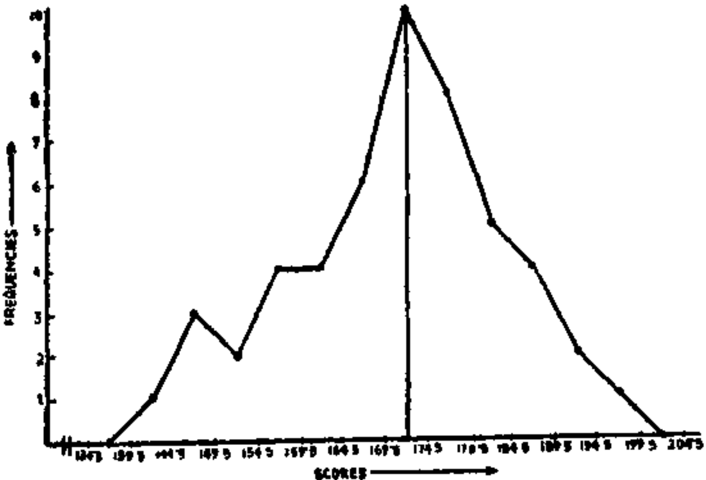

চিত্র-৮, ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন

Frequency Polygon (১)

এই বহুভুজ অনেক সময় বড় উঁচুনীচু হয়। তাকে মসৃণ করার (Smoothing) একটি সূত্র আছে। প্রতি শ্রেণীতে যে frequency আছে, তার সঙ্গে তার ঠিক উপরের ও নীচের শ্রেণীর frequency যোগ করে যোগফলকে তিন দিয়ে ভাগ করতে হবে। যেমন, 170—174 এই শ্রেণী ব্যবধানের Smoothed frequency হবে $\frac{8+10+6}{3}$ বা 8। এভাবে প্রত্যেক শ্রেণীর Smoothed 'f' বের করে বিন্দুগুলি বসিয়ে পূর্বের মত যোগ করলেই মসৃণ বহুভুজ পাওয়া যাবে। আর একটি নিয়মে শ্রেণী ব্যবধানের f-এর দ্বিগুণের সঙ্গে উপরের ও নীচের f গুলি যোগ করে যোগফলকে চার দিয়ে ভাগ করা হয়। এক্ষেত্রে,

170—174 শ্রেণীর Smoothed 'f' হবে $\frac{8+20+6}{4}$ বা 8·5।

Histogram :

হিস্টোগ্রাম বা আয়তলেখ ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের আর একটি চিত্ররূপ। বহুভুজে আমরা প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর উপর ফ্রিকোয়েন্সী বসিয়ে থাকি।

অর্থাৎ সমস্ত শ্রেণীটি কেবলমাত্র মধ্যবিন্দুর সাহায্যে উপস্থাপিত করা হয়। কিন্তু হিস্টোগ্রামে সমস্ত শ্রেণীব্যবধানটি একটি আয়তক্ষেত্রের সাহায্যে দেখান হয়। হিস্টোগ্রামের নীচের রেখাটি শ্রেণীর দূরত্ব নির্দেশ করে এবং উচ্চতা ঐ শ্রেণীর ফ্রিকোয়েন্সী নির্দেশ করে। শ্রেণীগুলির দূরত্ব সমান থাকে বলে আয়তক্ষেত্রগুলির প্রস্থ সমান হয়; কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সী এক হয় না বলে তাদের উচ্চতা ভিন্ন হয়।

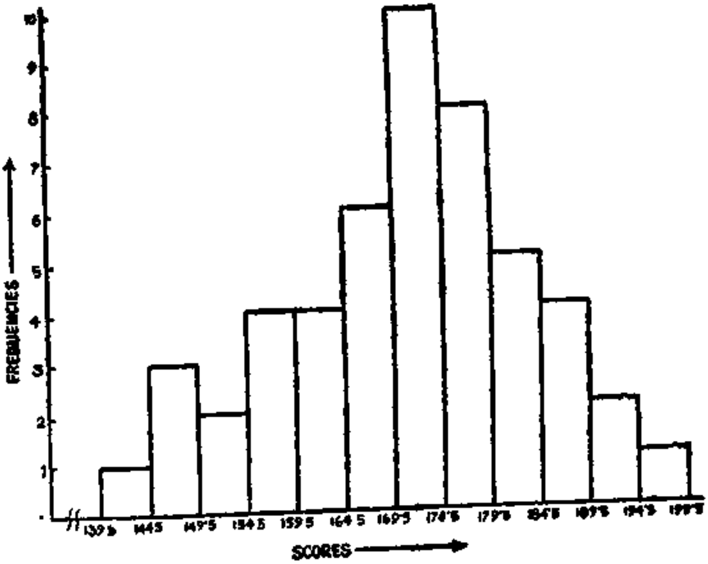

হিস্টোগ্রাম আঁকার নিয়ম বহুভুজ আঁকার নিয়মের মতোই; এখানেও 75% নিয়ম মেনে চলতে হবে। এখানেও X অক্ষরেখাতে শ্রেণী ব্যবধানগুলি বসানো হয়। শ্রেণীর নিম্নপ্রান্ত ও উচ্চপ্রান্ত বসানোই যুক্তিযুক্ত। তারপর প্রতি শ্রেণীর ফ্রিকোয়েন্সী ঐ শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দুর উপর না বসিয়ে শ্রেণীর নিম্ন ও উচ্চপ্রান্তের উপর Y অক্ষরেখার একক অনুযায়ী দুটি বিন্দু বসিয়ে একটি আয়তক্ষেত্র আঁকতে হবে। এইভাবে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের উপর নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সী অনুযায়ী একটি ক'রে আয়তক্ষেত্র আঁকলেই সম্পূর্ণ হিস্টোগ্রামটি পাওয়া যাবে।

অনেক সময় প্রত্যেকটি আয়তক্ষেত্রের বাহু X অক্ষরেখা পর্যন্ত নামিয়ে না আনলেও চলে। শুধু এক প্রান্তসীমা থেকে অপর প্রান্তসীমা পর্যন্ত সরলরেখা টেনে যোগ করে পরবর্তী প্রান্ত সীমার frequency পর্যন্ত আবার লম্ব টেনে যোগ করলেই পূর্ণ হিস্টোগ্রামটি পাওয়া যাবে।

একই অক্ষরেখার উপর একই বা বিভিন্ন বণ্টনের দুটি বহুভুজ, দুটি হিস্টোগ্রাম বা একটি বহুভুজ অপর একটি হিস্টোগ্রাম আঁকা যায়। সাধারণতঃ তুলনামূলক বিচার করার ক্ষেত্রে একসঙ্গে হিস্টোগ্রাম আঁকা হয়।

অবশ্য বহুভুজ ও হিস্টোগ্রামের মধ্যে তুলনামূলক বিচার ঠিক করা যায় না। উভয়ের স্বতন্ত্র মূল্য আছে। তবে হিস্টোগ্রামে প্রত্যেকটি শ্রেণী-ব্যবধানের ক্ষেত্র পূর্ণভাবে আয়তক্ষেত্রের সাহায্যে দেখান হয় বলে এটি বহুভুজ থেকে অপেক্ষাকৃত নির্ভুল। কিন্তু যে সমস্ত ক্ষেত্রে একই অক্ষরেখার উপর দুটি বণ্টনের প্রকৃতির তুলনা করতে হয়, সে ক্ষেত্রে বহুভুজ অনেক বেশী সুবিধাজনক। হিস্টোগ্রামে শ্রেণী ব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সীর অনুপাতের নিখুঁত ধারণা পাওয়া যায়।

॥ দুই ॥

কেন্দ্রীয় প্রবণতা
(Central Tendency)

কতকগুলি অবিন্যস্ত স্কোরকে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে সাজানোর পর তাদের কেন্দ্রীয় প্রবণতা বা মাঝামাঝি ঝোঁকের মাপ নির্ণয় করা হয়। এই কেন্দ্রীয় প্রবণতা হ'ল এমন একটি মাপ যেটি সমস্ত স্কোরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। এটা ধরে নেওয়া হয় যে, বিভিন্ন স্কোরের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও যখন তারা একটি বণ্টনের অন্তর্গত হয় তখন তাদের বণ্টনের মাঝামাঝি জায়গাতে (কেন্দ্র) যাবার একটা প্রবণতা থাকে। এটিই কেন্দ্রীয় প্রবণতা। এক কেন্দ্রীয় প্রবণতার সাহায্যে স্কোরগুলির বা যে পরীক্ষার স্কোর, তার একটা সামগ্রিক অথচ সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। আবার দুই বা ততোধিক দলের একটা তুলনামূলক বিচার এই কেন্দ্রীয় প্রবণতার সাহায্যে করা চলে। সাধারণতঃ এই কেন্দ্রীয় প্রবণতার মাপ তিন ভাবে নির্ধারিত হ'য়ে থাকে—(১) **Arithmetic Mean** বা গড় (২) **Median** বা মধ্যক এবং (৩) **Mode** বা সর্বোচ্চ শীর্ষ।

১। **মিন বা গড় নির্ণয়ের নিয়ম:** কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের পদ্ধতিগুলির মধ্যে মিন-ই সবচেয়ে বেশী প্রচলিত। কতকগুলি সংখ্যা বা স্কোরের মিন বার করার পদ্ধতি হ'ল, ঐ সংখ্যা বা স্কোরগুলি সব যোগ করে যতগুলি সংখ্যা বা স্কোর আছে, তার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা। এর সূত্র হ'ল—

$$M=\frac{\Sigma X}{N}$$

[এখানে M = মিন্, X = স্কোর, N = স্কোরের মোট সংখ্যা, Σ X = স্কোরগুলির যোগফল]

কিন্তু যখন ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে স্কোরগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত হ'য়ে সাজানো থাকে, তখন মিন নির্ণয় করার সূত্র হ'ল—

$$M=\frac{\Sigma fX}{N}$$

[এখানে Σ মানে যোগফল, f মানে ফ্রিকোয়েন্সী, X মানে প্রত্যেক শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দু এবং N মানে স্কোরের মোট সংখ্যা]

উদাহরণ ১। প্রথম অধ্যায়ে 50টি স্কোরের ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের মিন নির্ণয়।

শ্রেণী-ব্যবধান	মধ্যবিন্দু (X)	f		fX.
195-199	197	1		197
190-194	192	2		384
185-189	187	4		748
180-184	182	5		910
175-179	177	8	↓ 20	1416
170-174	172	10		1720
165-169	167	6	↑ 20	1002
160-164	162	4		648
155 159	157	4		628
150-154	152	2		304
145-149	147	3		441
140-144	142	1		142
		N=50		8542

$$\text{Mean}=\frac{8542}{50}=170{\cdot}80$$

মিডিয়ান নির্ণয়ের নিয়ম : অবিন্যস্ত স্কোরগুলিকে ছোট থেকে বড় এই হিসেবে সাজিয়ে নিলে এই সারির ঠিক মাঝখানে যে স্কোরটি থাকে, তাই হ'ল মিডিয়ান বা মধ্যক। যেমন 7, 10, 8, 12, 9, 11 এবং 7—এই সাতটি স্কোরের মিডিয়ান—9 ; তা নির্ণয় করা হয় এইভাবে—7, 7, 8, (9) 10, 11, 12.

বিজোড় সংখ্যা-সম্পন্ন সারিতে মিডিয়ান সহজেই নির্ণয় করা যায়। কিন্তু জোড় সংখ্যা-সম্পন্ন সারিতে ঠিক মাঝখানের স্কোর অর্থাৎ মধ্যবিন্দুটি গঠন করে নিতে হয়। যেমন, 7, 8, 9, $\underset{\uparrow}{9{\cdot}5}$ 10, 11, 12-এর মিডিয়ান হবে 9 এবং 10-এর ঠিক মাঝখানের স্কোরটি। অর্থাৎ $\frac{9+10}{2}=9{\cdot}5$

অবিন্যস্ত স্কোরের মিডিয়ান নির্ণয় করার সূত্র হ'ল—

মিডিয়ান $=\frac{(N+1)}{2}$-তম স্কোরটি-যেখানে N হ'ল সারির মোট স্কোরের সংখ্যা। প্রথম ক্ষেত্রে মিডিয়ান $=\frac{7+1}{2}$-তম বা 4র্থ স্কোরটি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে

তা হ'ল $\frac{6+1}{2}$-তম বা 3·5-তম স্কোরটি। 3·5-তম স্কোর হ'ল 3য় ও 4র্থ স্কোরের মিন বা গড়।

ফ্রিকোয়েন্সী বন্টনে বিন্যস্ত স্কোর সমূহের মিডিয়ান বার করার সূত্র হ'ল—

$$\text{মিডিয়ান বা Mdn} = L + i\left(\frac{\frac{N}{2} - F}{fm}\right)$$

[এখানে L = যে শ্রেণী ব্যবধানে মিডিয়ান আছে, তার নিম্নসীমা।

$\frac{N}{2}$ = মোট স্কোর বা ফ্রিকোয়েন্সীর অর্ধেক।

F = L-এর নীচে যত শ্রেণী ব্যবধান আছে তাদের স্কোরের মোট সংখ্যা।

fm = যে শ্রেণী ব্যবধানে মিডিয়ান আছে, সেই শ্রেণীর স্কোর বা ফ্রিকোয়েন্সীর সংখ্যা।

i = শ্রেণী-ব্যবধানের দৈর্ঘ্য।

মিডিয়ান বার করতে হ'লে প্রথমেই $\frac{N}{2}$ বার করতে হবে। তারপর বন্টনের নীচ থেকে ফ্রিকোয়েন্সীগুলি ক্রমান্বয়ে যোগ করে যেতে হবে যতক্ষণ না $\frac{N}{2}$ পাওয়া যায়। এই সময় দেখতে হবে কোন্ শ্রেণী ব্যবধানে $\frac{N}{2}$ সংখ্যক স্কোর শেষ হচ্ছে। কারণ, সেই শ্রেণীব্যবধানেই মিডিয়ানটি থাকবে। এই শ্রেণীব্যবধানের নিম্নপ্রান্তটি হ'ল L। এই ব্যবধানের নীচের স্কোরগুলির ফ্রিকোয়েন্সীর যোগফলই হ'ল F আর যে ব্যবধানে L ধরা হ'ল সেই ব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সী হ'ল fm.। সবগুলি স্থির করা হয়ে গেলে সূত্র প্রয়োগ করে মিডিয়ান নির্ণয় করা হয়।

উদাহরণ ২। উদাহরণ ১-এর N ছিল 50.

$$\text{অতএব } \frac{N}{2} = \frac{50}{2} = 25.$$

140-144 স্কোরের f ছিল 1, ঐখান থেকে f গুলি উপরের দিকে ক্রমান্বয়ে যোগ করে যেতে হবে। দেখা গেল 1+3+2+4+4+6 যোগ করলে 20 হচ্ছে। কিন্তু তার পরেই 170-174 শ্রেণীতে f হচ্ছে 10 ; এই 10-এর সঙ্গে 20 যোগ করলেই আমাদের $\frac{N}{2}$ অর্থাৎ 25 সংখ্যক স্কোর শেষ হচ্ছে। অতএব মিডিয়ান আছে 170-174 এই শ্রেণী ব্যবধানে।

এই শ্রেণীর নিম্ন প্রান্ত হ'ল 169·50। F হ'ল 20 আর fm হ'ল 10, i হ'ল 5 ; তাহ'লে Mdn হ'ল $= 169{\cdot}50 + 5\,\frac{(25-20)}{10}$

$$= 169{\cdot}50 + \frac{5\times 5}{10} = 169{\cdot}50 + 2{\cdot}50 = 172{\cdot}00$$

মোড নির্ণয়ের নিয়ম : অবিন্যস্ত সারিতে "crude" বা "empirical" মোড হ'ল সেই স্কোরটি যেটি সবচেয়ে বেশী বার এসেছে। যেমন 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 12, 13 এই সারিতে 13 স্কোরটি সবচেয়ে বেশী বার এসেছে। সুতরাং এখানে crude mode হচ্ছে 13 কিন্তু স্কোরগুলি যখন শ্রেণীতে সাজানো থাকে, তখন যে শ্রেণীর ফ্রিকোয়েন্সী সবচেয়ে বেশী, সেই শ্রেণীর মধ্যবিন্দুকে crude mode ধরা হয়। উদাহরণ ১ থেকে দেখা যায় ঐ বণ্টনে সর্বোচ্চ ফ্রিকোয়েন্সী 10, অতএব ঐ বণ্টনের Crude mode হ'ল 170-174 শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দু বা 172.

কোন ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের True mode বলতে বোঝায় সেই বিন্দুটি যেখানে স্কোরের বণ্টনে সব চেয়ে বেশী পরিমাণে স্কোর কেন্দ্রীভূত হয়েছে। True এবং Crude mode-র পার্থক্য এই যে, True মোড বলতে যে কোন ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের সর্বোচ্চ শিখরটিকে বোঝায়। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে Crude mode প্রায় True mode-এর কাছাকাছি আসে। তবে Crude mode হ'ল শীর্ষক বা শিখরটি সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণা আর True mode হ'ল সূক্ষ্ম গণনা।

True mode নির্ণয়ের সূত্র হ'ল, Mode = 3mdn − 2 mean.

উদাহরণ-১ থেকে mean = 170·80, median = 172·00 ;

অতএব, mode $= 3\times 172{\cdot}00 - 2\times 170{\cdot}80$

$= 516{\cdot}00 - 341{\cdot}60 = 174{\cdot}40$

মিন নির্ণয়ের সংক্ষিপ্ত পন্থা (Short method of mean calculation) : ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে যখন স্কোরের সংখ্যা বেশী হয়, তখন একটি সংক্ষিপ্ত উপায়ে মিন নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে পরিশ্রমও কম, সময়ও বেশী লাগে না। এই পদ্ধতিতে মাঝামাঝি স্থানে একটি কল্পিত মিন ধরে নিয়ে পরে অঙ্ক কষে এই ধারণার ভুল ত্রুটির (কম বেশী) সংশোধন ক'রে নেওয়া হয়।

যে শ্রেণীতে ফ্রিকোয়েন্সী সবচেয়ে বেশী, সেই শ্রেণীর মধ্যবিন্দুকে

Assumed Mean (AM) ধরে নেওয়া হয়। ১নং উদাহরণ অবলম্বনে সহজ উপায়ে মিন নির্ণয় করে দেখানো হ'ল—

শ্রেণীব্যবধান X	মধ্যবিন্দু (Mid Pt)	f	x′	fx′
195—199	197.	1	+5	+5
190—194	192	2	+4	+8
185—189	187	4	+3	+12
180—184	182	5	+2	+10
175—179	177	8	+1	+8
				+43
170—174	172	10	0	0
165—169	167	6	−1	−6
160—164	162	4	−2	−8
155—159	157	4	−3	−12
150—154	152	2	−4	−8
145—149	147	3	−5	−15
140—144	142	1	−6	−6
				−55
		N = 50		Σ fx′ = −12

এখানে A M হ'ল 172 কারণ 170—174 এই শ্রেণীব্যবধানের f সবচেয়ে বেশী। সংক্ষিপ্ত উপায়ে মিন নির্ণয়ের সূত্র হ'ল—

$$\text{Mean} = \text{Am} + \text{Ci}.$$

[AM = কল্পিত গড়, = 172

$$C = \text{Correction} = \frac{\Sigma fx'}{N} = \frac{-12}{50} = -\cdot24$$

i = শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবর্তী দূরত্ব = 5]

$\therefore$ Mean = 172 − ·24 × 5 = 172 − 1·20 = 170·80

x′ নির্ণয় করার পদ্ধতি : যে শ্রেণী ব্যবধানে AM থাকে, সেই শ্রেণীর মধ্যবিন্দু থেকে অপর শ্রেণীর মধ্যবিন্দুগুলির দূরত্ব (deviations) এককের মানদণ্ডে লিখে যেতে হয়। প্রতিক্ষেত্রে Mid pt. থেকে AM বাদ দিলেই x′ পাওয়া যাবে। ওপরের দিকে এই দূরত্ব ক্রমপর্যায়ে বেড়ে চলে এবং নীচের দিকে ক্রমপর্যায়ে কমে আসে। ঊর্ধ্বগতির দূরত্বকে Positive এবং নিম্নগতির দূরত্বকে Negative চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়। x′ প্রথমে যত পাওয়া

যায়, সাধারণ উৎপাদক যা সচরাচর 'i' এর সমান দিয়ে ভাগ করে এককটি পাওয়া যায়।

fx′ নির্ণয় : প্রতিটি শ্রেণীব্যবধানের f-কে প্রতি x′ দিয়ে গুণ করলে fx′ পাওয়া যায়। fx′ এর কিছুটা অংশ Positive, কিছুটা Negative। এদের যোগফল অর্থাৎ Σ fx′কে N দিয়ে ভাগ করে C বা Correction পাওয়া যাবে।

॥ কখন কোন্‌টি ব্যবহার করতে হবে ॥

মিন ব্যবহার করতে হয়—

(১) যখন ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনটি প্রায় নর্ম্যাল বা স্বাভাবিক হয়।

(২) যখন আমরা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য একটি কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ চাই। মিন, মিডিয়ান ও Mode-এই তিনটি কেন্দ্রীয় প্রবণতার মধ্যে মিনই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং নির্ভুল।

(৩) যখন পরে অন্যান্য পরিমাপ (যেমন S D বা আদর্শ বিচ্যুতি, সহসম্বন্ধ) জানা প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। আরো বহু পরিমাপ মিন-এর উপর নির্ভরশীল।

(৪) যখন আমরা প্রত্যেকটি স্কোরের ওজন একই বলে ধরে নিই। মিন নির্ণয় করার সময় প্রত্যেকটি স্কোরের সমান ওজন আছে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে।

মিডিয়ান ব্যবহার করতে হয়—

(১) যখন বণ্টনটির ঠিক মধ্যবিন্দুটি (৫০% স্থান) জানা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

(২) যখন বণ্টনটিতে চরম স্কোর থাকে অর্থাৎ বণ্টনটি 'স্কুড্' থাকে।

(৩) যখন আমরা জানতে চাই যে, বণ্টনের মধ্যে ক্ষেত্রগুলি উপরের অর্ধে আছে না নীচের অর্ধে আছে।

(৪) যখন অসম্পূর্ণ বণ্টনের জন্য মিন নির্ণয় করা যায় না।

(৫) যখন দীর্ঘ গণনা বা হিসেব করার সময়ের অভাব থাকে।

মোড ব্যবহার করতে হয়—

(১) যখন সবচেয়ে তাড়াতাড়ি নির্ণয় করা যায় এমন একটি কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপের দরকার হয়।

(২) যখন কেন্দ্রীয় প্রবণতার একটা সাধারণ বা চলতি পরিমাপ হলেই কাজ চলে যায়।

(৩) যখন আমরা জানতে চাই কোন্ স্কোরটি (বা দৃষ্টান্ত, ফ্যাশন, পোশাক-পরিচ্ছেদ) বণ্টনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বার দেখা গেছে।

॥ তিন ॥

বিষমতার পরিমাপ

(Measures of Variability)

আগেকার অধ্যায়ে আমরা গড় (Average) নির্ণয় করতে শিখেছি। কিন্তু কোন দলের গড় নির্ণয় করার পর দেখা যেতে পারে সেই দলের কোন একজন লোকের নম্বর হয় তো গড় নম্বরের সঙ্গে এক হচ্ছে না কিছুটা পৃথক হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে গড় বা কেন্দ্রীয় প্রবণতা জানা থাকলেই বিভিন্ন ব্যক্তির নম্বরের বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে জানা যায় না।

একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝান যাক্। ধরা যাক 50টি ছেলেকে ও 50টি মেয়েকে অঙ্কের একটি অভীক্ষা দেওয়া হ'ল। ছেলেদের নম্বরের মিন হ'ল—34·6 আর মেয়েদের 34·5। এখানে মিনের দিক থেকে ছেলে ও মেয়েদের স্কোরের পার্থক্য খুবই কম, নেই বললেও চলে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, ছেলেদের স্কোর 15 থেকে শুরু করে 51 পর্যন্ত আর মেয়েদের স্কোর 19 থেকে 45 পর্যন্ত বিস্তৃত। এদিক দিয়ে স্কোরগুলির মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে বলতে হবে। ছেলেদের স্কোরগুলির দূরত্ব (51 – 15) বা 36 আর মেয়েদের (45 – 19) বা 26। এর থেকে বোঝা যাবে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের নম্বরের বিস্তৃতি অনেক বেশী। পরিসংখ্যানের হিসেবে বলতে গেলে ছেলেদের স্কোর মেয়েদের স্কোরের চেয়ে বেশী বৈষম্যপূর্ণ বা Variable. বিষমতা বা Variability কথাটির অর্থ হ'ল স্কোরগুলির তাদের কেন্দ্রীয় প্রবণতার চারিদিকের বিস্তৃতি। দলটি যদি সমগুণ সম্পন্ন বা সমজাতীয় বস্তু বা ব্যক্তি দিয়ে গঠিত হয়, তবে তাদের বিষমতার পরিমাণ কম হয়। কিন্তু দলের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে যত বেশী পার্থক্য থাকবে, তাদের বিষমতার পরিমাণও তত বাড়বে।

বিষমতা সচরাচর চার প্রকারে প্রকাশ করা হয়। যথা—(১) রেঞ্জ (Range), (২) মিন বিচ্যুতি (Mean Deviation, M D বা A D), (৩) সমক বা আদর্শ বিচ্যুতি (Standard Deviation বা S D) এবং (৪) চতুর্থাংশ বিচ্যুতি (Quartile Deviation বা Q D).

[এক] রেঞ্জ (Range) : রেঞ্জ হ'ল স্কোরগুলি কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে তার মাপ। কোন একটি বণ্টনের বৃহত্তম স্কোর থেকে ক্ষুদ্রতম স্কোরটি বাদ দিলে রেঞ্জ পাওয়া যায়। এর সাহায্যে দু'টি দল কি ভাবে ছড়িয়ে আছে তার একটা

তুলনামূলক পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা আগেই দেখেছি যে, দুটি দলের N এবং Mean এক হ'লেও বিস্তৃতির দিক দিয়ে যথেষ্ট পার্থক্য থাকতে পারে। নীচের ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে A গ্রুপের Range হ'ল (80 – 20) = 60 আর B গ্রুপের (60 – 40) = 20। কিন্তু দুটি গ্রুপেরই মোট সংখ্যা (N) এবং Mean (=50) সমান। অথচ A গ্রুপ, B গ্রুপ অপেক্ষা বেশী বিস্তৃত তবে N যখন অল্প হয় এবং বণ্টনের মাঝে মাঝে যদি লম্বা ফাঁক থাকে, তখন বিষমতা নির্ণয়ে রেঞ্জকে প্রকৃষ্ট মাপ হিসেবে গ্রহণ করা চলে না।

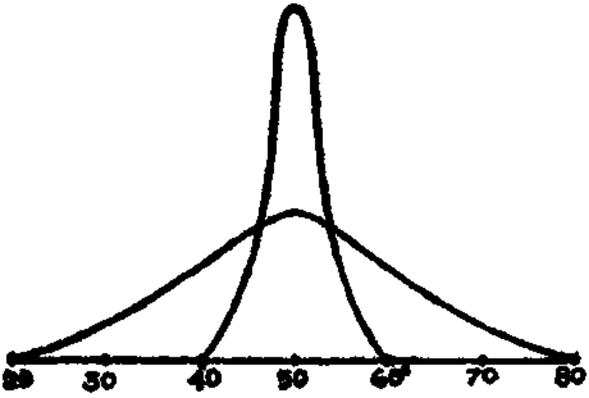

[দুই] মিন বিচ্যুতি বা গড় বিচ্যুতি (M D or A D) : কোন বণ্টনের কেন্দ্রীয়-প্রবণতা (সাধারণতঃ মিন, কখনও কখনও মিডিয়ান ও মোড) থেকে তার প্রত্যেকটি স্কোরের যে বিচ্যুতি ; সেই বিচ্যুতি সমূহের গড় বা মিনকেই গড় বিচ্যুতি বলা হয়। গড় বিচ্যুতি নির্ণয় করার সময় বিচ্যুতিগুলির ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চিহ্নগুলি ধরা হয়। সব সময় বিচ্যুতিগুলির ধনমূলক মান (absolute value) ধরে নিয়ে তাদের মিন নির্ণয় করা হয়।

উদাহরণ দিয়ে বোঝান হচ্ছে—

যদি বণ্টনটি অবিন্যস্ত (ungrouped) থাকে, তবে প্রথমে মিন থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতি বার করতে হবে। X যদি স্কোরটি হয় আর M যদি মিন হয় তবে বিচ্যুতি বা X = X – M। অবশ্য বিয়োগফলের '+' ও '–' চিহ্ন অগ্রাহ্য হয়। এখন X-এর যোগফলকে N দিয়ে ভাগ করলেই M D বা A D বার হবে।

5টি স্কোর আছে, 6, 8, 10, 12, 14, এবং তাদের M D নির্ণয় করতে হবে। এখন স্কোরগুলির মিন হ'ল 10 ; মিন থেকে প্রতি স্কোরের বিচ্যুতি হ'ল :

6 − 10 = −4, 8 − 10 = −2, 10 − 10 = 0, 12 − 10 = 2, এবং 14 − 10 = 4. ঋণাত্মক চিহ্ন বাদ দিয়ে বিচ্যুতিগুলির যোগফল হ'ল 4+2+0+2+4 বা 12; অতএব M D হ'ল 12÷5 বা 2·40। তাহ'লে অবিন্যস্ত স্কোরের M D নির্ণয় করার সূত্র হ'ল—

$MD = \frac{\Sigma |x|}{N}$ Σ = যোগফল, Σ |x| = বিচ্যুতিগুলির চিহ্ন নিরপেক্ষ যোগফল এবং N হ'ল স্কোরের মোট সংখ্যা।

॥ বিন্যস্ত বণ্টনের M D নির্ণয় ॥

উদাহরণ 1.

×	Mid pt.	f.	x.	fx
195—199	197	1	26 20	26·20
190—194	192	2	21·20	42·40
185—189	187	4	16 20	64·80
180—184	182	5	11·20	56 00
175—179	177	8	6·20	49 60
170—174	172	10	1·20	12 00
165 - 169	167	6	—3 80	—22 80
160—164	162	4	—8 80	—35·20
155—159	157	4	—13 80	—55·20
150—154	152	2	—18·80	—37 60
145—149	147	3	—23·80	—71·40
140—144	142	1	—28 80	—28·80
		N=50		502·00

। Σ fx। বা Σ । fx।

$$MD = \frac{\Sigma |fx|}{N} = \frac{502}{50} = 10 \cdot 04$$

নির্ণয় করার নিয়ম: স্কোরগুলি শ্রেণীতে সাজানো থাকে বলে মিন থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতি নির্ণয় করা যায় না। তাই মিন থেকে প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি বা দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। উপরের উদাহরণের অঙ্কটির মিন

হ'ল 170·80। x সারি নির্ণয় করা হয়েছে শ্রেণীর মধ্যবিন্দু থেকে 170·80 বিয়োগ করে (Mid point—mean)। তারপর প্রতিটি বিচ্যুতিকে (xকে) সেই শ্রেণীর f দিয়ে গুণ করে fx সারি নির্ণয় করা হয়েছে। fx সারিতে নীচের দিকে যদিও ঋণাত্মক সংখ্যা পাওয়া গেছে, তবুও fx-এর যোগফল (Σ fx) নির্ণয় করার সময় 'চিহ্ন মূলক' সমস্তা বাদ দেওয়া হয়েছে। চিহ্ন-নিরপেক্ষ fx-এর যোগফলকে N দিয়ে ভাগ করতেই MD বের হল। এর সূত্র হ'ল—

$$MD = \frac{\Sigma |fx|}{N}$$

[তিন] **সমক বা আদর্শ বিচ্যুতি (SD) :** পরিসংখ্যান তত্ত্বে MD অপেক্ষা SD-এর ব্যবহারই বহুল প্রচারিত। এটিও MD-এর মত একটি দলের মিন থেকে স্কোরগুলির বিচ্যুতির একরকম গড়। AD বা MD নির্ণয়ে গাণিতিক চিহ্ন বাদ দেওয়া হয়। ফলে এই পরিমাপটি কিছু ত্রুটিপূর্ণ হবেই। কিন্তু SD-নির্ণয় করার সময় চিহ্নগুলি ধরা হয়। এই গাণিতিক চিহ্নের অসুবিধা দূর করার জন্য বিচ্যুতিগুলিকে (x-গুলিকে) বর্গ করে নেওয়া হয়। এর ফলে বিচ্যুতিগুলির সবগুলিই ধনাত্মক হয়। এইগুলি যোগ করে যোগফলকে মোট সংখ্যা (N) দিয়ে ভাগ করা হয়। তারপর এই ভাগফলের বর্গমূল (square root) বার করা হয় এবং তার ফলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তাকেই আদর্শ বিচ্যুতি বা SD বলে। SDকে সাধারণতঃ σ (সিগমা) নামক একটি গ্রীক অক্ষরের সাহায্যে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়।

● মিন থেকে নম্বরগুলির দূরত্বের বর্গ নির্ণয় করে গড় বার করলে Variance পাওয়া যায়। Variance-এর বর্গমূল নির্ণয় করলেই SD পাওয়া যায়।

॥ অবিন্যস্ত স্কোরের S D নির্ণয় ॥

ধরা যাক, 6, 8, 10, 12 এবং 14 এই 5টি স্কোরের SD নির্ণয় করতে হবে। প্রথমেই স্কোরগুলির মিন নির্ণয় করতে হবে। তারপর প্রত্যেকটি স্কোর থেকে মিনের বিচ্যুতি নির্ণয় করতে হবে (x)। এরপর বিচ্যুতির বর্গ নির্ণয় করতে হবে (x^2)। বর্গফলগুলিকে যোগ করতে হবে (Σx^2)। ঐ যোগফলকে স্কোরের মোট সংখ্যা বা N দিয়ে ভাগ করতে হবে। ঐ ভাগফলের বর্গমূল নির্ণয় করলেই S D বা σ বার হয়ে যাবে।

উদাহরণ।

X	x=(X−M).	x^2
6	−4	16
8	−2	4
0	0	0
12	2	4
14	4	16

$$S.D=\sqrt{\frac{\Sigma x^2}{N}}=\sqrt{\frac{40}{5}}=\sqrt{8}=2\ 83.$$

Mean = 100·C0 $\Sigma x^2=40$

॥ শ্রেণীবদ্ধ স্কোরের SD নির্ণয় ॥

(ক) যখন অল্প-সংখ্যক স্কোর থাকে—

উদাহরণ।

X	f	fx	fx	fx^2 (= fx.x)
17	2	3 8	7·6	28 88
15	1	1 8	1 8	3·24
13	3	—·2	—·5	—·12
11	4	—2·2	—8 8	—19 36
	N = 10			$\Sigma fx^2=51·60$

$$\text{Mean}=13·2\quad SD=\sqrt{\frac{\Sigma fx^2}{N}}=\sqrt{\frac{51·60}{10}}=\sqrt{5\ 16}=2\ 27$$

(খ) যখন স্কোরের সংখ্যা অনেক বেশী থাকে, তখন অন্য এক পদ্ধতিতে σ নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দু থেকে মিনের বিচ্যুতি বার করে নিতে হয়। এই পদ্ধতিতে SD নির্ণয় করার সূত্র হ'ল—

$$SD=i\sqrt{\frac{\Sigma fx'^2}{N}-c^2}\ *$$

* The formula for σ by the Short Method is $\sigma=i\sqrt{\frac{\Sigma fx'^2}{N}-c^2}$ in which $\Sigma fx'^2$ is the Sum of Squared deviations in units of class interval, taken from the assumed mean. C^2 is the Squared correction in untis' of class interval, and i is the class interval.

[Garrett—Statistics in Psychology & Education Pp. 52 53]

একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক্—[Short Method]

X	Midpt.	f	x′	fx′	fx′²
195—199	197	1	5	5	25
190—194	192	2	4	8	32
185—189	187	4		12	36
180—184	182	5	2	10	20
175—179	177	8	1	8(+43)	8
170—174	172	10	0	0	0
165—169	167	6	—1	—6	6
160—164	162	4	—2	—8	16
155—159	157	4	—3	—12	36
150—154	152	2	—4	—8	32
145—149	147	3	—5	—15	75
140—144	142	1	—6	—6(—55)	36
		N = 50.		Σ fx′ = −12	Σ fx′² = 322

[fx^1 সারি পর্যন্ত মিন নির্ণয় করার পদ্ধতির মত]

এখানে AM = 172·00 i = 50. N = 50

Mean = 170 80 $\Sigma fx'^2 = 322$ C = correction (মিন নির্ণয় করার সময় যে c ছিল তাই)

$$\frac{\Sigma fx^1}{N} = \frac{-12}{50} = -\,240$$

$$c^2 = \cdot 05\cdot 76$$

$$6 = 5\sqrt{\frac{322}{50} - \cdot 0576}$$

$$= 5\sqrt{6\cdot 44 - 0577}$$

$$= 5\sqrt{6\cdot 3824}$$

$$= 5 \times 2\cdot 525 = 12\cdot 63$$

কল্পিত গড় থেকে বিচ্যুতি না ধরে যদি আসল গড় (Arithmetic mean) থেকে বিচ্যুতি ধরা হয়, তবে SD নির্ণয়ে অনেক অসুবিধা হয়। এরকম ক্ষেত্রে প্রায়ই হিসেবগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ হয় এবং দশমিক স্থানবিশিষ্ট রাশি থাকে। এটিকে **Long Method** বলা হয়। তবে এই পদ্ধতি অপেক্ষা **Short method** সহজ।

॥ **Long Method**-এর উদাহরণ ॥

X	mid pt	f	x	fx	fx²
195—199	197	1	26·20	26·20	686·44
190—194	192	2	21 20	42 40	898 88
185—189	187	4	16 20	64 80	1049 76
180—184	182	5	11·20	56·00	627·20
175—179	177	8	6 20	49 60	307·52
170—174	172	10	1 20	12 00	14 40
165—169	167	6	— 3 80	—22 80	86·64
160—164	162	4	— 8·80	—35 20	309·76
155—159	157	4	—13·80	—55·20	761 76
150—154	152	2	—18·80	—37 60	706·88
145—149	147	3	—23 80	—71·40	1699 32
140—144	142	1	—28 80	—28 80	829·44
		N=50		502 00	7978·00

Mean = 170 80

$$SD = \sqrt{\frac{\Sigma fx^2}{N}} = \sqrt{\frac{7978}{50}} = 12{\cdot}63$$

এ ছাড়া কাঁচা নম্বর থেকে σ বা S D বার করবার আর একটি পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতিতে স্কোরগুলিকে ক্রমানুসারে সাজাবার কোন দরকার হয় না। **Assumed Mean O** (zero)-তে ধরা হয়। সেই ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ও স্কোর একই থাকে। C=M—O=M. এই পদ্ধতিতে S D নির্ণয় করবার সূত্র হল—

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma x^2}{N} - M^2}$$

আবার M-এর বদলে $\frac{\Sigma x}{N}$ বসালে সূত্রটি দাঁড়ায় $\sqrt{\frac{\Sigma x^2}{N}-\left(\frac{\Sigma x}{N}\right)^2}$

$$=\sqrt{\frac{N\Sigma x^2-(\Sigma x)^2}{N}}$$

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—

Scores (X)	x (or X)	x'^2 (or X^2)
18	18	324
25	25	625
21	21	441
19	19	361
27	27	729
31	31	961
22	22	484
25	25	625
28	28	784
20	20	400
236	236	5734

$$AM=0.$$

$$M=\frac{236}{10}=23{\cdot}6 \quad N=10.$$

$$C=23{\cdot}6-0$$

$$=23{\cdot}6$$

$$C^2-556{\cdot}96=M^2$$

$$\therefore \sigma=\sqrt{\frac{5734}{10}-556{\cdot}96.}$$

$$=\sqrt{16{\cdot}44.}$$

$$=4{\cdot}05.$$

[চার] চতুর্থাংশ বিচ্যুতি(Q) : কোন একটি বন্টনের স্কোরগুলিকে চারভাগে ভাগ করলে আমরা এক-চতুর্থাংশ স্কোর পাই (এই রকম প্রথম চতুর্থাংশকে বলা

হয় 25th শতাংশ (Percentile) বা Q_1 বা First Quartile। এই বিন্দুর নীচে স্কোর সমূহের 25% আছে। দ্বিতীয় চতুর্থাংশ হ'ল Q_2 বা Median; তিন-চতুর্থাংশ হ'ল 75th Percentile বা Q_3 (Third Quartile) যার নীচে শতকরা 75টি স্কোর আছে। চতুর্থাংশ বিচ্যুতি হ'ল প্রথম চতুর্থাংশ (Q_1) ও তিন-চতুর্থাংশ (Q_3) এর মধ্যবর্তী বিন্দু। এর সূত্র হ'ল—

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

Q_1 ও Q_3 বার করবার সময় যে উপায়ে Median বার করা হয়, সেই উপায়ই অবলম্বন করা হয়। তবে Median নির্ণয় করবার সময় $\frac{N}{2}$ ধরা হয় কারণ Median নম্বরের ক্ষেত্রে 50তম Percentile। Q_1 নির্ণয় করার সময় $\frac{N}{4}$ গণনা করতে হয় এবং Q_3 নির্ণয় করার সময় $\frac{3N}{4}$ গণনা করতে হয়।

Q_1 নির্ণয়ের সূত্র হ'ল $Q_1 = 1 + \dfrac{\frac{N}{4} - \text{cum } f_1}{fq} \times i$

Q_3 নির্ণয়ের সূত্র হ'ল $Q_3 = 1 + \dfrac{\frac{3N}{4} - \text{cum } f_1}{fq} \times i$

এখানে 1 = যে ধাপে নির্দিষ্ট Quartile পড়ে, তার নিম্ন সীমা।

f_1 = যে ধাপে উক্ত Quartile পড়ে, তার পূর্বের ধাপগুলি f-এর সমষ্টি।

fq = যে ধাপে Quartile পড়ে সে ধাপের f

i = শ্রেণী-ব্যবধান।

কেন্দ্রীয় প্রবণতার অধ্যায়ে ১নং উদাহরণে

$$\frac{N}{4} = 12{\cdot}50 \qquad \frac{3N}{4} = 37{\cdot}50.$$

$$\therefore Q_1 = 159{\cdot}50 + 5\left(\frac{1250 - 10}{4}\right)$$

$$=159{\cdot}50+\frac{5\times 2{\cdot}50}{4}=159{\cdot}50+\frac{12{\cdot}50}{4}=159\ 50+3{\cdot}12$$

$$=162{\cdot}62.$$

$$Q_3=174{\cdot}50+5\frac{(37{\cdot}50-30)}{8}=174{\cdot}50+\frac{5\times 7{\cdot}50}{8}=174{\cdot}50+\frac{37.50}{8}$$

$$174{\cdot}50+4{\cdot}69=179{\cdot}19$$

$$\therefore\ Q=\frac{Q_3-Q_1}{2}=\frac{176{\cdot}19-192{\cdot}62}{2}=\frac{16\ 57}{2}=8\ 28$$

বিস্তৃতির সহগ (Co-efficient of Variation V) : স্কোর বণ্টনের নম্বরগুলির যে একক σ বা Q কেও সেই এককে প্রকাশ করা হয়। দু'টি বণ্টনের **Mean** যদি একই বা প্রায় একই হয়, তবে ঐ বণ্টন দুটির σ দেখে দল দুটির বিস্তৃতির তুলনা করা হয়। কিন্তু যদি M বিভিন্ন হয়, কিংবা একটি বণ্টনের M ও σ যে একক, অন্যটির M ও σ সেই একক থেকে ভিন্ন তখন দল দু'টির বিস্তৃতির তুলনা করা হয় Co-efficient of Variation বা V দ্বারা। V-এর কিন্তু কোন একক থাকে না। V নির্ণয় করার সূত্র হ'ল—

$$V=\frac{100\sigma}{M}$$

প্রাকৃতিক পরিমাণ ইত্যাদি তুলনা করার সময় V ব্যবহার করা যেতে পারে। **Ratio** স্কেল দুই রকম অবস্থায় হতে পারে—(১) যখন দু'টি দলের M এবং σ-এর একক বিভিন্ন এবং (২) যখন দুটি দলের M এবং σ-এর একক একই কিন্তু Mean বিভিন্ন।

॥ কখন কোনটি ব্যবহার করতে হবে ॥

রেঞ্জ ব্যবহার করতে হয়—

[এক] যখন স্কোরগুলি এত কম বা বেশী ছড়ানো থাকে যে অন্য কোন বিষমতা পরিমাপ করার প্রয়োজন হয় না।

[দুই] যখন স্কোরগুলির কতদূর ছড়ানো আছে, কেবলমাত্র তা জানারই প্রয়োজন হয় না।

[তিন] যখন দ্রুততম বিষমতার পরিমাপটি জানা প্রয়োজন হয়।

Q ব্যবহার করতে হয় :

[এক] যখন মিডিয়ানটি কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ দেয়।

[দুই] যখন বণ্টনটি বেশ ছড়ানো থাকে বা প্রান্তে এমন সব নম্বর থাকে যা ϭকে অযথা প্রভাবান্বিত করে।

[তিন] যখন বণ্টনটির মাঝের 50%-এর খবর জানা প্রয়োজন হয়।

A D ব্যবহার করতে হয় :

[এক] যখন সকল নম্বরের সব বিস্তৃতির পরিমাপ জানা প্রয়োজন হয়।

[দুই] যখন বিচ্যুতির মাত্রা অত্যন্ত বেশী বা কম এই উভয় প্রকার স্কোরই থাকে এবং বিচ্যুতির গড়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অথবা বলা যেতে পারে যখন প্রান্তীয় বিস্তৃতি ϭকে প্রভাবান্বিত করে।

S D ব্যবহার করতে হয় :

[এক] যখন বিষমতার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরিমাপটি জানা প্রয়োজন হয়।

[দুই] যখন প্রান্তীয় বিস্তৃতিগুলি বিষমতার উপর আনুপাতিক ভাবে বেশী প্রভাব বিস্তার করে।

[তিন] যখন সহ-পরিবর্তনের মান এবং পরিসংখ্যানের অন্যান্য তথ্য নির্ণয় প্রয়োজন হয়।

॥ বিষমতার পরিমাপগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ ॥

স্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রে (Normal distribution) বিভিন্ন বিষমতার মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়। সেগুলির সূত্র হ'ল—

$$Q = \cdot 845 \qquad AD = \cdot 6740\sigma.$$

$$AD = 1\cdot 183 \qquad Q = \cdot 798\sigma.$$

$$\sigma = 1\cdot 483 \qquad Q = 1\cdot 253\ AD.$$

॥ সমষ্টিগত (Combined) মিন এবং S D নির্ণয় করার সূত্র।

$$M\ comb = \frac{N_1M_1 + N_2M_2 + \cdots\cdots N_nM_n}{N_1 + N_2 + \cdots M_n}.$$

[যখন M_1, M_2 ইত্যাদি বিভিন্ন দলের মিন এবং
N_1, N_2 ইত্যাদি সেই সেই দলের f-এর যোগফল]

$$\sigma\ comb = \sqrt{\frac{N_1(\sigma_1^2 + d_1^2) + N_2(\sigma_2^2 + d_2^2)}{N}}$$

যখন σ_1 = প্রথম দলের SD.

σ_2 = দ্বিতীয় দলে SD.

$d_1 = (M_2 - M\ comb)$

$d_2 = (M_2 - M\ comb)$

$N = N_1 + N_2 + \cdots$

ক্রমসমষ্টিমূলক বা কিউম্যুলেটিভ বণ্টন ও অন্যান্য চিত্রমূলক পদ্ধতি

(Cumulative Distribution & other Graphic Methods)

কোন একটি ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনকে কিভাবে হিস্টোগ্রাম বা ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনের সাহায্যে রেখাচিত্রে ফেলা যায়, আমরা আগেই সে বিষয়ে আলোচনা করেছি। ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনকে আরো বিভিন্ন ভাবে চিত্রায়িত করা সম্ভব। এর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে একটি হ'ল ক্রমসমষ্টিমূলক বণ্টনের রেখাচিত্র বা Cumulative Frequency Graph। এই গ্রাফের বিশেষত্ব হ'ল এতে বণ্টনের ফ্রিকোয়েন্সীগুলিকে পর পর যোগ করে যেতে হয়। যখন পরিমাপক স্কেলের কোন বিন্দুর ঠিক নীচে কতগুলি স্কোর আছে, তার সমষ্টিকে জানার প্রয়োজন হয়, তখন এই পদ্ধতিটি অবলম্বন করা হয়।

কোন একটি বণ্টনের ফ্রিকোয়েন্সীগুলিকে কিভাবে ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সীতে নিয়ে যাওয়া হয়, তার একটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল—

উদা. 1.

শ্রেণী ব্যবধান X		ফ্রিকোয়েন্সী f		ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী Cum f
195—199	...	1	...	50
190—194	...	2	...	49
185—189	...	4	...	47
180—184	...	5	..	43
175—179	..	8	...	38
170—174	...	10	...	30
165—169	...	6	...	20
160—164	...	4	...	14
155—159	...	4	...	10
150—154	...	2	...	6
145—149	...	3	...	4
140—144	...	1	...	1
		N=50		

ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী নির্ণয় করার সময় ফ্রিকোয়েন্সীগুলিকে নীচে থেকে উপর দিকে পর পর যোগ করে যেতে হয়। প্রথম শ্রেণীব্যবধানের cf হ'ল 1, দ্বিতীয়ের 1+3, তৃতীয়ের 1+3+2 ইত্যাদি। এইভাবে সর্বোচ্চ শ্রেণীব্যবধানের cf দাঁড়াল 50 (N-এর সমান)।

এখন বণ্টনটির শ্রেণীব্যবধানগুলি X অক্ষে এবং ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সীগুলিকে Y অক্ষে বসালে ইংরেজী S-এর মতো একটি রেখাচিত্র পাওয়া যাবে। একেই বলে কিউম্যুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সী গ্রাফ। এই রেখাচিত্র আঁকবার সময় বহুভুজ আঁকবার প্রায় সব নিয়মগুলিই মেনে চলতে হয়। কিন্তু বহুভুজে ফ্রিকোয়েন্সীটি বসানো হ'ত সেই শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুর উপর; এই লেখাচিত্রে Cum f বসাতে হয় ঐ শ্রেণীব্যবধানের উর্ধ্ব সীমার (upper-limit) উপর। রেখাটি X অক্ষরেখা স্পর্শ করার জন্য প্রথম শ্রেণীব্যবধানের নিম্ন প্রান্তসীমার O জোর ধরে শুরু করতে হবে এবং রেখাটি শেষ হবে সর্বশেষ শ্রেণীব্যবধানের উচ্চ প্রান্তসীমায়।

ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা রেখাচিত্র বা ওজাইভ (Cumulative percentage curve or Ogive)

ক্রমসমষ্টিমূলক রেখাচিত্রের সঙ্গে ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা রেখাচিত্রের পার্থক্য এই যে এখানে ফ্রিকোয়েন্সীগুলি পর পর যোগ করার পরও প্রত্যেক

ফ্রিকোয়েন্সীকে (Cum) N-এর শতকরা হিসেবে প্রকাশ করা হয়। রেখাচিত্র আঁকবার সময় Y-অক্ষরেখাতে N-এর শতকরা ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সীগুলিই বসান হয়। একটা উদাহরণ দেওয়া হ'ল :—

উদা. ২।

Score বা x	f.	Cum f.	Cum Percent f.
195—199	1	50	100
190—194	2	49	98
185—189	4	47	94
180—184	5	43	86
175—179	8	38	76
170—174	10	30	60
165—169	6	20	40
160—164	4	14	28
155—159	4	10	20
150—154	2	6	12
145—149	3	4	8
140—144	1	1	2

এখানে শেষ স্তম্ভে Cum f গুলিকে N-এর শতকরা হিসেবে দেখান হয়েছে। প্রত্যেক Cum f কে N দিয়ে ভাগ করে শতকরাতে পরিণত করলেই Cum. percent f পাওয়া যায়। 140—144 এই শ্রেণীব্যবধানের Cum f হ'ল 1, N হ'ল 50, তাহ'লে Cum% f হবে $\frac{1}{50} \times 100$ বা 2%।

এর সহজ উপায় হ'ল প্রথমে Rate বা হার নির্ণয় করা। Rate হ'ল $\frac{1}{N}$, প্রত্যেক Cum f কে ঐ rate দিয়ে গুণ করে তারপর 100 দিয়ে গুণ করে নিলেই Cum percent f পাওয়া যাবে।

ওজাইভ অঙ্কন : পরপৃষ্ঠার তালিকার সাহায্যে একটি ওজাইভ আঁকা হ'ল।

উদা. 3.

Score.	f		Cum f		Cum Percent f
74·5—79·5	1	···	125	···	100·0
69·5—74·4	3	···	124	···	99·2
64·5—69·5	6	···	121	···	96·8
59·5—64·5	12	···	115	···	92·0
54·5—65·5	20	···	103	···	82·4
49·5—54·5	36	···	83	···	66·4
44·5—49·5	20	···	47	···	37·6
39·5—44·5	15	···	27	···	21·6
34·5—39·5	7	···	12	···	9·0
29·5—34·5	4	···	6	···	4·8
24·5—29·5	2	···	2	···	1·6

বণ্টনটিতে N ছিল 125 ; Rate $= \frac{1}{N} = \frac{1}{125} =$ ·008. Cum f গুলিকে

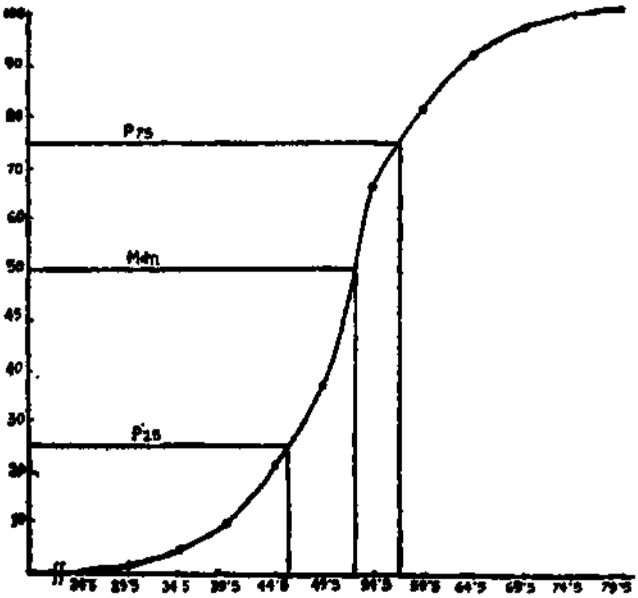

প্রথমে Rate দিয়ে ও পরে 100 দিয়ে গুণ করে Cum percent f গুলি পাওয়া গেল। X অক্ষরেখাতে শ্রেণীব্যবধানগুলি বসানো হ'ল। Y অক্ষরেখাতে

বসানো হ'ল Cum Percent f-গুলি। তবে 75% নিয়ম মেনে চলতে হবে এবং Cum Percent f-গুলি বসাতে হবে সেই শ্রেণীব্যবধানের উচ্চ প্রান্তসীমার উপর। এইভাবে বসিয়ে পূর্ব পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটি পাওয়া গেল।

॥ শতাংশ বিন্দু (Percentiles) ॥

কোন বণ্টনে মিডিয়ান হচ্ছে সেই বিন্দুটি যেটি সমগ্র স্কোরের ঠিক মাঝা-মাঝি 50% স্থানে পড়ে। আবার এ ভাবেও বলা চলে যে মিডিয়ান এমন একটি বিন্দু যার নীচে শতকরা 55 জন পরীক্ষার্থী বিদ্যমান। যেমনি Q_1 এবং একটি Q_3 বণ্টনের এমন দুটি বিন্দু যাদের নীচে যথাক্রমে 25% এবং 75% পরীক্ষার্থী বিদ্যমান। যে ভাবে মিডিয়ান এবং Quartiles নির্ণয় করা হয়, ঠিক সেই ভাবেই স্কোরের 10%, 15%, 46%, 85% অর্থাৎ যে কোন শতাংশ বিন্দু বা Percentiles নির্ণয় করা চলে। এই শতাংশ বিন্দুকে Pp চিহ্ন দ্বারা বোঝান হয়, এখানে P হ'ল বণ্টনের যে শতকরা চাওয়া হচ্ছে সেটি। "Percentiles are points in a continuous distribution below which lie given percentages of N." P_{10}-এর অর্থ হ'ল স্কোরের নীচের 10% স্কোর, P_{78} মানে ঐ স্কোরের নীচে 78% স্কোর। তাহ'লে শতাংশ হিসেবে মিডিয়ান হবে P_{50}, Q_1 হবে P_{25} এবং Q_3 হবে P_{75}। P_0 হ'ল প্রথম শ্রেণীব্যবধানের নিম্ন প্রান্তসীমা, এবং P_{100} হ'ল শেষ শ্রেণীব্যবধানের সর্বোচ্চ সীমা। এই দুই সীমাকে বলা হয় Limiting points. মিডিয়ান বার করার পদ্ধতি অনুযায়ী শতাংশ বিন্দু বার করা চলে। সূত্রটি হ'ল—

$$Pp = l + \left(\frac{PN - F}{fp}\right) x i$$

এখানে p হ'ল বণ্টনের যে শতাংশ জানতে চাওয়া হয়—

l হ'ল যে শ্রেণীব্যবধানে Pp আছে, তার নিম্ন প্রান্তসীমা—

PN হ'ল Pp হিসেব করতে হলে N-এর যে অংশ পর্যন্ত গুণতে হবে (নীচ থেকে)।

F হ'ল l-এর নিম্নবর্তী সকল শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্গত স্কোর

fp হ'ল যে শ্রেণীব্যবধানে Pp পড়ে, সেই শ্রেণীর স্কোর

i হ'ল শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য।

শতাংশ বিন্দু নির্ণয় করার একটি উদাহরণ দেওয়া হল :

উদা. 4.

Scores	f		Cum f.		Percentiles
195—199	1	...	50	...	$P_{100}=199.5$
190—194	2	...	49	...	$P_{90}=187.0$
185—189	4	...	47	...	$P_{80}=181.5$
180—184	5	...	43	...	$P_{70}=177.6$
175—179	8	...	38	...	$P_{60}=174.5$
170—174	10	...	30	...	$P_{50}=172.0$
165—169	6	...	20	...	$P_{40}=169.5$
160—164	4	...	14	...	$P_{30}=165.3$
155—159	4	...	10	...	$P_{20}=159.5$
150—154	2	...	6	...	$P_{10}=152.0$
145—149	3	...	4	...	$P_{0}=139.5$
140—144	1	...	1		
N=50					

50 এর 10%=5. $P_{10}=149.5+\frac{(5-4)}{2}\times 5=152.0.$

50 এর 20%=10. $P_{20}=159\ +5\frac{(10-10)}{4}\times 5=159.5.$

50 এর 30%=15. $P_{30}=164.5+\frac{(15-14)}{6}\times 5=165.3.$

50 এর 40%=20. $P_{40}=169.5+\frac{(20-20)}{10}\times 5=169.5.$

50 এর 50%=25. $P_{50}=169.5+\frac{(25-20)}{10}\times 5=172.0.$

বিজ্ঞান্

50 এর 60%=30. $P_{60}=174.5+\frac{(30-30)}{8}\times 5=174.5.$

50 এর 70%=35. $P_{80}=174.5+\frac{(35-30)}{8}\times 5=177.6.$

50 এর 80%=40. $P_{70}=179.5+\frac{(40-38)}{5}\times 5=181.5.$

50 এর 90%=45. $P_{90}=184.5+\frac{(45-43)}{4}\times 5=187.0.$

॥ শতাংশ সারি (Percentile Rank বা P R) ॥

আমরা আগেই দেখেছি যে, শতাংশ বিন্দু বা percentile-এর অর্থ হ'ল বণ্টনের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বিন্দু যার নীচে মোট স্কোর বা N-এর কোন বিশেষ শতাংশ পড়ে। যেমন P_{25}-এর অর্থ হ'ল বণ্টনের মধ্যে সেই বিন্দু যার নীচে মোট স্কোরের 25% থাকে। এইরূপ শতাংশ হিসেবে সারিতে ব্যক্তির একটি বিশেষ স্থান আছে। অর্থাৎ ব্যক্তির নিজস্ব স্কোর অনুযায়ী বণ্টনের মধ্যে তার একটি বিশেষ স্থান আছে। এই বিশেষ স্থানটিকে ঐ বণ্টনের মধ্যে ব্যক্তির সারি বা Rank বলা যায়। এই সারিটিকে শতকরা রূপে প্রকাশ করা হয় বলে একে পার্সেন্টাইল র‍্যাঙ্ক বা শতাংশ সারি বলা হয়। শতাংশ বিন্দু ও শতাংশ সারি কিন্তু এক নয়। এই দুটি নির্ণয় করার পদ্ধতিও এক নয়। শতাংশ বিন্দু হিসেব করতে গেলে N-এর কোন শতাংশ (ধরা যাক্ 65%) নিয়ে হিসেব শুরু করা হ'ল। তার নীচ থেকে Cum f হিসেব করে যে বিন্দুতে ঐ শতাংশ পাওয়া যাবে, সেখানেই ঐ শতাংশ বিন্দু বা P_{65} পাওয়া যাবে।

কিন্তু শতাংশ সারি নির্ণয় করার পদ্ধতি ঠিক বিপরীত। এখানে কোন ব্যক্তির একটি স্কোর নিয়ে শুরু করে তার নীচের যে শতাংশ আছে, তা নির্ণয় করা হয়। ধরা যাক্ 4 নং উদাহরণে যে ব্যক্তির স্কোর 163, তার PR বা শতাংশ সারি নির্ণয় করতে হবে। স্কোরটি 160—164 শ্রেণী ব্যবধানে পড়েছে। এই শ্রেণীর নিম্ন প্রান্তসীমা 159·5 পর্যন্ত 10টি স্কোর আছে এবং এই শ্রেণীতে আছে 4টি। এই 4 কে শ্রেণী দূরত্ব (i) অর্থাৎ 5 দিয়ে ভাগ করলে ঐ শ্রেণীর প্রত্যেক এককের স্কোর হয় 4÷5 বা ·8 ; যে শ্রেণীব্যবধানে স্কোর 163 অবস্থিত, তার নিম্নপ্রান্তসীমা 159·5 থেকে তার দূরত্ব হ'ল 163—159·5 বা 3·5 স্কোর একক। তা'হলে 159·5 থেকে 163-এর স্কোর দূরত্ব হ'ল 3·5×·8 বা 2·8। 159·4 এর নীচে মোট স্কোর 10 এর সঙ্গে 2·8 যোগ করে হ'ল 12·8, আর এটিই হ'ল 163 স্কোরের নীচে N-এর অংশ। কিন্তু ঐ উদাহরণে N ছিল 50 ; অতএব শতকরা হিসেবে N-এর ঐ বিশেষ অংশ হয় 25·6। সুতরাং 163 এই স্কোরের শতাংশ সারি বা P R হ'ল 26। এইভাবে যে কোন স্কোরের P R নির্ণয় করা চলে।

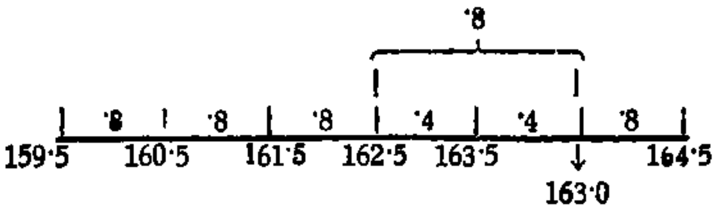

এ ছাড়া ক্রমসমষ্টিমূলক বন্টন ও শতাংশ বিন্দুর তালিকা থেকে আমরা একেবারেই শতাংশ সারি বা PR হিসেব করতে পারি। এই হিসেবগুলি সম্পূর্ণ নিখুঁত না হ'লেও প্রায় নির্ভুল হবে। উদাহরণ চার থেকে বলা যেতে পারে 152 স্কোরের PR হবে 10, 172 স্কোরের 50 এবং 187 স্কোরের 90। ফ্রিকোয়েন্সী বন্টন থেকে সরাসরি PR বলা সম্ভব হয় কারণ শতাংশ বিন্দুগুলি শ্রেণীব্যবধানগুলির প্রতিনিধিত্ব করে বলেই ধরে নেওয়া হয়। এইভাবে 160 এর PR হবে মোটামুটি ভাবে 20, 165 স্কোরের 30, 170 এর 40, 175-এর 60, 178-এর 70, 182-এর 80। এই PRগুলি সম্পূর্ণ ঠিক না হ'লেও মোটামুটি ভাবে সত্য।

॥ শ্রেণীবদ্ধ তালিকা বা তথ্য থেকে PR নির্ণয় ॥

অনেক সময় বিভিন্ন ব্যক্তিকে কোন একটা গুণ, (যেমন, সামাজিকতা, উদ্ভাবনীশক্তি বা সকল কাজে আগ্রহ) অনুযায়ী পর পর সাজানো যায় (যেমন ১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদি)। এই সারিতে স্থানগুলি (Rank Order) শতাংশ-সারিতে পরিবর্তিত করে তাকে স্কোর হিসেবে ব্যবহার করা চলে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্ঃ পনর জন বিক্রেতাকে তাদের বিক্রয় করার ক্ষমতা অনুযায়ী সাজান হ'ল। এখানে যিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন, তাঁর PR হবে 97, যিনি পঞ্চম স্থান অধিকার করেছেন তাঁর PR হবে 70, আর যিনি সর্বনিম্ন স্থান অধিকার করেছেন, তাঁর PR হবে। PR নির্ণয়ের সূত্র হ'ল—

$$PR = 10C - \frac{(100\,R - 50)}{N}$$

এখানে R হ'ল সারিতে ব্যক্তির স্থান। সারির সর্বোচ্চ স্থান হ'ল। অতএব প্রথম স্থান যিনি অধিকার করেছেন তাঁর P R হ'ল—

$$100 - \frac{100 \times 5 - 50}{15} \text{ বা } 97.$$

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, যেহেতু শতাংশ সারি কোন স্কেলের এককের মধ্যবিন্দুতে পড়ে সেইজন্য PR কখনও 0 বা 100 হয় না।

ওজাইভ থেকেও সরাসরি শতাংশ বিন্দু (Percentiles) এবং শতাংশ সারি (Percentile ranks) হিসেব করা যায়। প্রথমেই শতাংশ বিন্দু নির্ণয় করার উপায় পর্যালোচনা করা যাক্। ধরা যাক্ P_{71} বার করতে হবে। উদাহরণ 3 থেকে দেখা যাচ্ছে P_{71} আছে 66·4% এবং 82% এর মধ্যে। 66·4% যে শ্রেণীব্যবধানে আছে, তার উচ্চ প্রান্তসীমা হ'ল 54·5 এবং 82·4% যে শ্রেণীব্যবধানে আছে, তার উচ্চ প্রান্তসীমা হ'ল 59·5। তা'হলে 82·4% —66·4% বা 16%এর জন্য আছে 59·5—54·5 বা 50 স্কোর। P_{71} আছে 66·4% থেকে 4·6% দূরে; সুতরাং 16% এর জন্য যদি 5·0 বিন্দু থাকে, তবে 4·6% এর জন্য থাকে $\frac{4 \cdot 6 \times 5}{16} = 1 \cdot 4$, সুতরাং P_{71} হ'ল—

$$54 \cdot 5 + 1 \cdot 4 = 55\ 9.$$

আবার অনেক সময় Cum percent f-এর স্তম্ভ থেকে শতাংশ বিন্দু সরাসরিও নির্ণয় করা যায়। যেমন পঞ্চম শতাংশ বিন্দুটি মোটামুটি হ'ল 34·5 (cum percent f 4·8, উচ্চ প্রান্তসীমা 34·5), P_{22} হ'ল মোটামুটি ভাবে 44·5, P_{88} হ'ল 49·5, P_{92} হ'ল ঠিক 64 5।

ওজাইভ থেকে যে ভাবে শতাংশ বিন্দু নির্ণয় করা হ'ল তার পদ্ধতি হ'ল—

বন্টনের 66·4%···54·5 পর্যন্ত

71%——→————→55·9

(প্রদত্ত) বন্টনের 824% ·····59·5 পর্যন্ত

16% 4·0 $71\% - 66 \cdot 4\% = 4 \cdot 6\%$

অতএব, $\frac{46}{16 \cdot 0} = \frac{x}{5}$ or $x = \frac{4 \cdot 6}{1 \cdot 69} \times 5 = 1 \cdot 4$ (x is the distance of the 71st Percentile from 54·5)

শতাংশ সারিও Cum percent f-এর স্তম্ভ থেকে সোজাসুজি বার করা যায়। ধরা যাক্ স্কোর 43-এর শতাংশ সারি বার করতে হবে। এই স্তম্ভে পাই

যে স্কোরের 9·6% আছে 39·5 এর নীচে 5 স্কোর 43 হ'ল 39·5 দূরে। 39·5 থেকে 44·5 পর্যন্ত ব্যবধানের দূরত্ব 5 এককের। এই দূরত্ব বণ্টনের 21·6%—9·6% বা 12% বোঝায়। সুতরাং 39·5 থেকে 43 স্কোরের দূরত্বের শতাংশ হ'ল $\frac{3·5 \times 12}{5}$ বা 8·4%। অতএব স্কোর 43 এর নীচে শতকরা ব্যক্তি সংখ্যা হ'ল 9·6% + 8·4% = 18%। সুতরাং 43 স্কোরের P R হ'ল—18.

বণ্টনের 9·6%……39·5 পর্যন্ত

18%←————←————Score 43

বণ্টনের $\frac{21·6\%}{12·0\%} = \frac{44·5}{3}$ পর্যন্ত

$$43 - 39·5 = 3·5.$$

অতএব $\frac{3·5}{5·0} \times 12\% + 9·6\% =$ P R of score 43.

ওজাইভ থেকেও শতাংশ বিন্দু ও শতাংশ সারি সরাসরি সহজেই বার করা

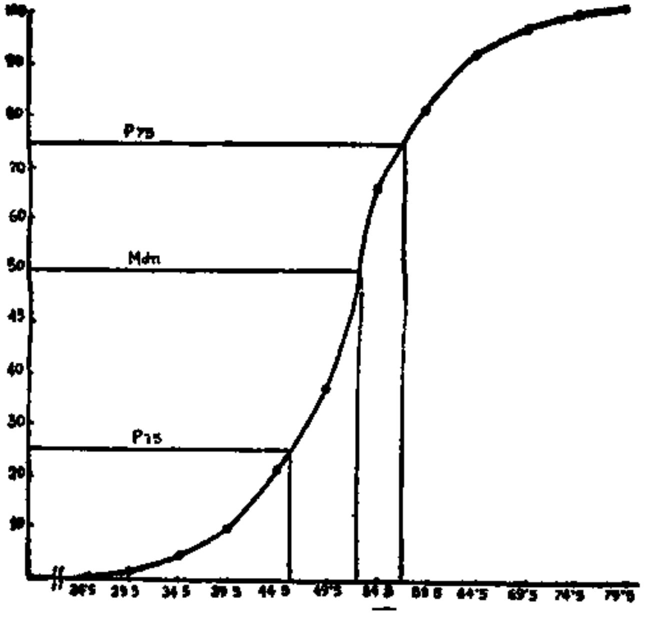

যায়। ওজাইভ থেকে P_{50} বা মিডিয়ান বার করতে হ'লে Y অক্ষরেখার 50 ফ্রিকোয়েন্সী থেকে X অক্ষরেখার সমান্তরাল করে একটি করে রেখা টানতে হবে।

এই রেখা ওজাইভকে যেখানে ছেদ করে সেই বিন্দু থেকে X অক্ষরেখার উপর একটি লম্ব টানতে হবে। যে বিন্দুতে লম্বটি X অক্ষরেখার সঙ্গে মিলিত হবে সেখানেই মিডিয়ান পাওয়া যাবে।

এইভাবে মিডিয়ান হ'ল 51·5, P_{25} বা Q_1 হ'ল 45·56 এবং P_{75} বা Q_3 হ'ল 57·19. অপর পক্ষে যে কোন স্কোরের P R বার করতে হ'লে অনুরূপ ভাবে X অক্ষরেখা থেকে উলটো ভাবে শুরু করে Y অক্ষরেখা পর্যন্ত পৌছাতে হবে। ওজাইভ থেকে যে শতাংশ বিন্দু পাওয়া যায়, তা সম্পূর্ণ নির্ভুল না হলেও মোটামুটি নির্ভরযোগ্য।

॥ ওজাইভের ব্যবহার ॥

'ওজাইভের ব্যবহারকে আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমতঃ, এর সাহায্যে আমরা পার্সেন্টাইল ও পার্সেন্টাইল র‍্যাঙ্ক (PR) বার করতে পারি। খুব সহজেই এই দুটি নির্ণয় করা যায় বলে অনেক সময় ও শ্রম বাঁচে।

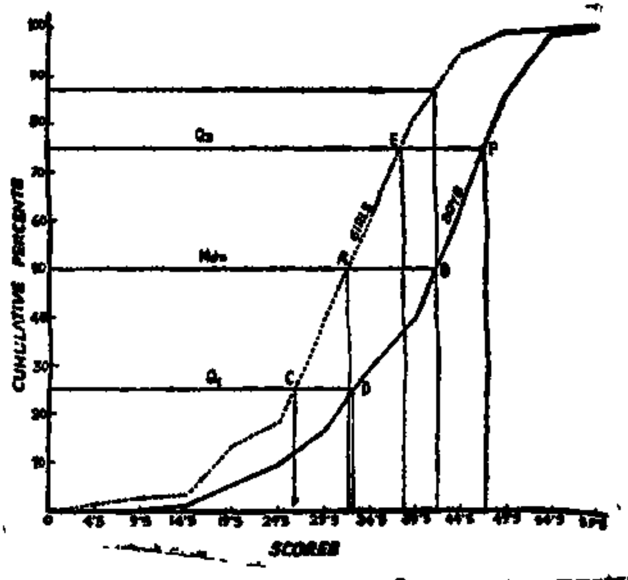

দ্বিতীয়তঃ, দুটি বিভিন্ন দলের উপর একই পরীক্ষার ফলাফল তুলনামূলক-ভাবে বিচার করতে হলে একই অক্ষরেখার উপর দুটি ওজাইভ এঁকে তা দেখান যায়। নীচে একটি উদাহরণে 200 বালক ও 200 বালিকার একই পরীক্ষার ফলাফল দেখিয়ে দুটি ওজাইভ আঁকা হয়েছে।

এখন এই ওজাইভ দু'টি থেকে আমরা দু'দলের সম্বন্ধে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। এর থেকে দেখা যাচ্ছে ছেলেদের স্কোর মেয়েদের স্কোরের চেয়ে সব দিক দিয়ে বেশী। এই দু'দলের স্কোরের পার্থক্যের পরিমাণ বোঝা যাবে ওজাইভ দুটির মধ্যে বিভিন্ন বিন্দুর দূরত্বের দ্বারা। ওজাইভ দুটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বালিকাদের প্রায় শতকরা 88 জন বালকদের মিডিয়ানের নীচে আছে। কিন্তু বালকদের মধ্যে শতকরা প্রায় 76 জন আছে বালিকাদের মিডিয়ানের উপরে। স্কেলের উপরের দিকে বা নীচের দিকে পার্থক্য অপেক্ষাকৃত কম। বন্টনটির দু' চারটি বিন্দু নিয়ে পরীক্ষা করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। মেয়েদের বন্টনের মিডিয়ান হ'ল 32 ছেলেদের 42 ; এই দূরত্বটি জানানো হয়েছে A B রেখার সাহায্যে। তেমনি বন্টন দুটির Q_1 ও Q_3 দুটির মধ্যে দূরত্বকে জানানো হয়েছে যথাক্রমে CD ও E F রেখার সাহায্যে।

তৃতীয়তঃ, ওজাইভ থেকে পার্সেন্টাইল নর্ম (Percentile norm) বা শতাংশ মান নির্ণয় করা যায়। নর্ম হ'ল কোন একটি দলবিশেষের কাজের প্রতীক নমুনা বা কৃতিত্বের প্রতিনিধিমূলক পরিমাপ (Typical Performance)। সাধারণতঃ মিন বা মিডিয়ানের সাহায্যে একটি দলের কাজকে আমরা বুঝি। সেক্ষেত্রে ঐ মিন বা মিডিয়ান হ'ল দলের নর্মের প্রতীক। কিন্তু অনেক সময় অন্যান্য শতাংশ বিন্দুর নর্মও হিসেব করা চলে এবং শিক্ষা-ক্ষেত্রে একই ব্যক্তির বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল তুলনা করার সময় পার্সেন্টাইল নর্মের ব্যবহারই অধিক প্রচলিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাক্‌, একটি ছেলে অঙ্কের অভীক্ষায় পেল 63 আর ইংরেজীর অভীক্ষায় 143। কেবল স্কোর গুলি দেখে কোন্‌ অভীক্ষায় সে বেশী ভালো ফল করেছে, তা বলা যাবে না। কিন্তু যদি P R নির্ণয় করে দেখা যায় যে, 63-র P R 52 আর 143-এর P R 68, তখন আমরা বলতে পারি যে, অঙ্কে তার কৃতিত্ব মোটামুটি ; কিন্তু ইংরেজীতে তার কৃতিত্ব বেশ ভালো। অঙ্কে তার নীচে আছে 52% সহপাঠী কিন্তু ইংরেজীতে তার নীচে আছে 68%।

॥ অন্যান্য রেখাচিত্র ॥

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের ফলে যে সমস্ত মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলিকে চিত্রের আকারে সাজাতে পারলে সেগুলি বোঝার পক্ষে

খুবই সুবিধা হয়। মনোবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞানে বিভিন্ন প্রকার চিত্রের ব্যবহার দেখা যায়। এগুলির মধ্যে রেখাচিত্র (Line Graph), বার চিত্র (Bar Graph), পাই চিত্র (Pie-Diagram), ফ্রিকোয়েন্সী বহুভুজ (Frequency Polygon), হিস্টোগ্রাম বা স্তম্ভচিত্র (Histogram বা Column Graph)-ই প্রধান। এগুলির মধ্যে শেষের দুটি চিত্রের কথা আগেই আলোচনা হয়েছে। বাকীগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হ'ল :—

রেখাচিত্র (Line Graph) :

নীচের ছবিটিতে আট থেকে আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের যুক্তিগত স্মৃতির (logical memory) পরিবর্তনের (বিকাশমূলক) দুটি রেখাচিত্র পাশাপাশি একই অক্ষরেখায় আঁকা হ'ল। X অক্ষরেখাতে বয়স এবং Y অক্ষরেখাতে স্মৃতির বিষয় দেখান হয়েছে। বিভিন্ন বয়সের বালক-বালিকার স্মৃতিশক্তির বিকাশ হয়েছে প্রায় সমান্তরাল লাইন গ্রাফের সাহায্যে। গ্রাফ থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় পনর বৎসর বয়সে উভয় দলেরই স্মৃতিশক্তি সবচেয়ে বেশী ; তারপর কিছু কম। প্রাপ্তবয়স্ক সীমাতে আবার একটু ঊর্ধ্বগতি দেখা যায়। দু'টি দলের মধ্যে কিন্তু বরাবর একটু পার্থক্য থেকেই গেছে। তা হ'ল মেয়েদের স্মৃতির রেখাটি বরাবরই ছেলেদের চেয়ে ভালো। আরো অনেক ক্ষেত্রে (যেমন Learning বা Practice Curve Trial and Error Curve ইত্যাদি)-এ জাতীয় গ্রাফের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

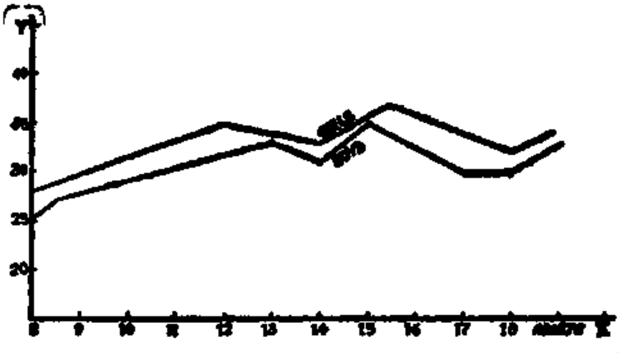

বার চিত্র (Bar Graph) : দুই বা ততোধিক দলের মধ্যে একই বৈশিষ্ট্য কিভাবে দেখা যায়, তার তুলনামূলক বিচার করতে হ'লে বার চিত্র ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ। পরের পৃষ্ঠায় একটি বার গ্রাফের ছবি দেওয়া হ'ল—

শহর	সেই শহরের অধিবাসী (স্বাভাবিক) (শতকরা)	বিদেশী (শতকরা)	অন্যান্য (শতকরা)
১ম	65	30	05
২য়	60	20	20
৩য়	50	10	40

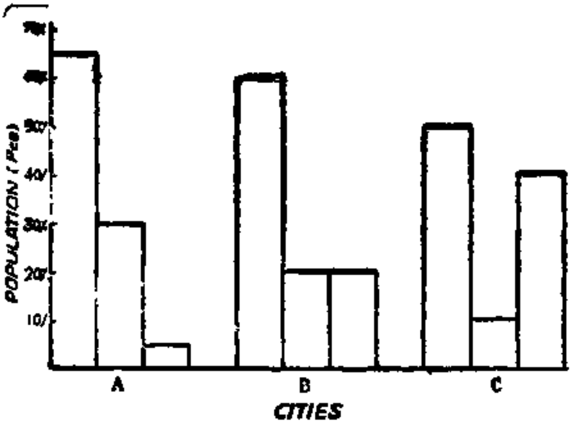

পাইচিত্র (Pie-Graph): কোন একটি পরিমাপের ফলে যে ফলাফল বা

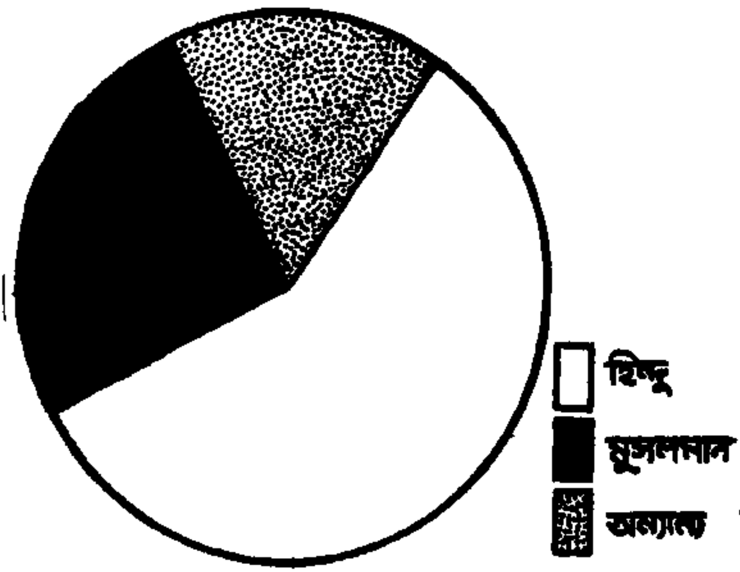

তথ্য পাওয়া যায়, তাকে বৃত্তের আকারে প্রকাশ করলে যে ছবি পাওয়া যায়,

তাকে পাই-চিত্র বলে। 'পাই' শব্দটির অর্থ হ'ল গোলাকৃতি পিঠে। ছবিটি বৃত্তের আকারে হয়। বৃত্তটির কেন্দ্রের চারধারে কোণের সমষ্টি হ'ল 360°। বৃত্তের অন্তর্গত ক্ষেত্রটিকে 360টি কোণে ভাগ করা যায়। এইবার মোট সংখ্যাকে যদি ঐ বৃত্তের অন্তর্গত ক্ষেত্রের সমান বলে ধরা যায়, তবে প্রত্যেকটি স্কোর বা সংখ্যাকে এই 360°-এর অংশরূপে বিভক্ত করা যায়। মনে করা যাক্ একটি শহরের অধিবাসীদের 60% হিন্দু, 25% মুসলমান এবং 15% অন্যান্য। এগুলি পাই-চিত্রে প্রকাশ করতে হ'লে আগে ঠিক করতে হবে 60% বৃত্তের কতটা অংশ আবৃত করবে, 25% কতটা এবং 15% কতটা। 100% যদি 360°-এর সমান হয়, তবে 60% হবে 216°-এর, 25% হবে 90°-এর এবং 15% হবে 54°-র সমান। চিত্রটি পূর্ব পৃষ্ঠায় দেওয়া হ'ল। পাই-চিত্র, সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং একবার দেখেই কম বেশী বা ভালো মন্দের একটা ধারণা খুব সহজেই করা যায়। কোণগুলি চাঁদার সাহায্যে মাপ করে নিলে ছবিটি নির্ভুল হয়।

স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র
(Normal Probability or Gaussian Curve)

মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, মানুষের মধ্যে যে গুণাবলী আছে তা প্রায় প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে, তবে কারো কম আবার কারো বা বেশী। বহুসংখ্যক লোকের উপর কোন অভীক্ষা প্রয়োগ করলে যদি তাদের বয়স, শিক্ষা, পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ এক ধরনের হয়, তবে ঐ অভীক্ষার ফলাফল একটি normal distribution-এর আকার ধারণ করবে। দেখা যাবে অধিকাংশ লোকই লেখচিত্রের মাঝখানের জায়গাটি দখল করেছে। বুদ্ধির অভীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় অল্পসংখ্যক থাকে বেশী বুদ্ধিমানের দলে এবং অধিকাংশই থাকে মাঝামাঝি বুদ্ধিমানের দলে। এই লেখচিত্রের আকার অনেকটা উপুড় করা ঘণ্টার মত (inverted bell)। মাঝখানটা উচু, দু'পাশ ক্রমশঃ নীচু হয়ে অক্ষরেখার নিকটবর্তী হবে (মিশে যাবে না)। এর অর্থ হ'ল—নীচু স্কোরগুলি থাকে বামদিকের প্রান্তে এবং তাদের সংখ্যা খুব কম। ক্রমশঃ যত মধ্যভাগের দিকে এগোতে থাকে, স্কোরগুলি তত আয়তনে বাড়তে থাকে এবং তাদের সংখ্যাও বেশী হ'তে থাকে। চিত্রটির ঠিক মাঝখানে ও তার আশে পাশে থাকে মাঝারী আয়তনের স্কোরগুলি আর তাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হয় বলেই ছবিটির মাঝখানটি উচু ও ফোলা হয়। তার পরের স্কোরগুলি আয়তনে আরো বাড়তে থাকে কিন্তু তাদের সংখ্যা কম। ডানদিকের শেষপ্রান্তে সর্বোচ্চ স্কোরগুলি থাকে এবং সেগুলি বাঁদিকের সর্বনিম্ন স্কোরগুলির মতই সংখ্যাতে বেশ কম।

অনেক ক্ষেত্রেই পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ত্রুটির জন্ত কিংবা যথেষ্ট-সংখ্যক অভীক্ষার্থীর উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ না করার জন্ত ফলাফলের লেখচিত্রটি ঠিক ঘণ্টাকৃতি হয় না। এই জাতীয় আকৃতিবিশিষ্ট বণ্টনের একটা আদর্শ চিত্ররূপ আছে যেটির সঙ্গে সমস্ত অভীক্ষালব্ধ চিত্রের আকৃতিগত মিল থাকবে, যদিও পুরোপুরি মিল নেই। একেই স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্র (normal distri-

bution curve) বা স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্র (normal probability curve) বলে। নীচে এর একটি চিত্র দেওয়া হ'ল—

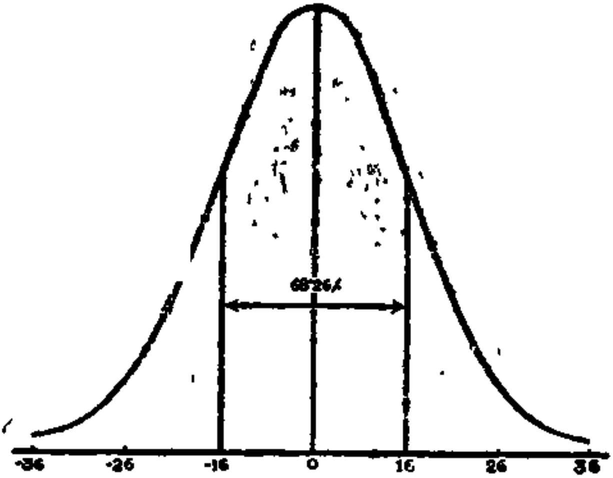

চিত্রটির অধঃরেখা (base line) হ'ল X অক্ষরেখা। X অক্ষরেখার ঠিক মধ্যবিন্দুটিই হচ্ছে মিন। স্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রে মিন, মিডিয়ান ও মোড তিনটিই এক বিন্দুতে থাকবে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ তিনটি অভিন্ন। স্বাভাবিক বণ্টন ছাড়া অন্যান্য বণ্টনের ক্ষেত্রে মিন, মিডিয়ান এবং মোড বিভিন্ন হবে। স্বাভাবিক বণ্টনে মিনের উপর একটি লম্ব টানলে বণ্টনটি সমান দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। অর্থাৎ ঐ লম্বের ডানদিকে এবং বামদিকে 50% করে স্কোর থাকবে।

স্বাভাবিক বণ্টনের সূত্রটি হ'ল—

$$Y = \frac{N}{\sigma\sqrt{2\pi}} \quad e^{\frac{-x^2}{2\sigma^2}}$$

যেখানে y হ'ল ফ্রিকোয়েন্সী; (x অক্ষের উপর বণ্টনটির দৈর্ঘ্য)।

x হ'ল X অক্ষরেখার স্কোর (মিন থেকে বিচ্যুতি)

বাকীগুলি সব ধ্রুবক (constant)।

যেমন N হ'ল ঘটনার সংখ্যা।

σ = S.D.

π = 3.1416

e=2.7183 (base of the Napierian System of logarithms).

N এবং σ জানা থাকলে ঐ সূত্রের সাহায্যে x-এর ফ্রিকোয়েন্সী বা y জানা যায় ; অর্থাৎ একটি স্কোর কতলোকে পেয়েছে এবং দু'টি স্কোরের মধ্যে কত শতাংশ লোক আছে, তাও জানা যায়।

॥ সম্ভাবনার মৌলিক নীতি ॥

স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্রকে স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্রও বলা হয় কারণ স্বাভাবিক বণ্টনের সঙ্গে 'সম্ভাবনা' বা Laws of chance-এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান আর এই সম্বন্ধকেই অঙ্কের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। একই ধরনের ঘটনার মধ্যে বিশেষ একটি ঘটনা যতবার ঘটবে বলে আশা বা প্রত্যাশা করা যায় তাকেই ঐ ঘটনাটির সম্ভাবনা বলে। একটি মুদ্রা যদি টস্ করা যায়, তবে হয় তার হেড, না হয় টেল্ উপরের দিকে পড়বে এবং পড়ার সম্ভাবনা উভয়েরই সমান। এই 'পড়ার' বা ঘটনার সম্ভাবনাই হ'ল Probability ratio। এই ratio দুটি সীমার মধ্যে আবদ্ধ ·00 (অর্থাৎ একবারও না ঘটবার সম্ভাবনা) থেকে 1·00 (প্রত্যেকবার ঘটবার সম্ভাবনা) পর্যন্ত। মুদ্রাটি যদি দশ বার টস্ করা হয়, তবে সেটি দশবারই মাটিতে পড়বে এবং হয় হেড্ না হয় টেল্ উপড়ে পড়বে, যদিও উভয় সম্ভাবনাই সমান। অনুপাতের হিসেবে হেড্ পড়ার সম্ভাবনা $\frac{1}{2}$ এবং টেল্ পড়ার সম্ভাবনা $\frac{1}{2}$। যদি দু'টি মুদ্রা A ও B একসঙ্গে টস্ করা যায় তবে মুদ্রাগুলি চার ভাবে মাটিতে পড়তে পারে। সম্ভাবনাগুলি হ'তে পারে—

1.	2.	3.	4.
A B	A B	A B	A B
H+H	H+T	H+H	T+T
($\frac{1}{4}$)	($\frac{1}{4}$)	($\frac{1}{4}$)	($\frac{1}{4}$)

Probability ratio-কে Binomial Expression $(p+q)^n$ এই আঙ্কিক সূত্রে প্রকাশ করা হয়। p হ'ল একটি ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা। q হচ্ছে ঘটনাটি না ঘটবার সম্ভাবনা। এভাবে আমরা ধরতে পারি p হ'ল হেড, q হ'ল টেল্ আর n হ'ল মুদ্রার সংখ্যা। ২টি মুদ্রা নিয়ে টস্ করলে সূত্রটি

দাঁড়ায় $(p+q)^2=p^2+2pq+q^2$. । আবার হেড-এর বদলে H ও টেল্-এর বদলে T ধরলে expressionটি হয়—

$(H+T)^2=H^2+2HT+T^2$. । ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় =

$1\,H^2$ = 4 বারের মধ্যে একবার দুটি মুদ্রারই হেড্ পড়ার সম্ভাবনা (Ratio $=\frac{1}{4}$)

2HT = 4 বারের মধ্যে একটি মুদ্রার হেড ও অপরটির টেল্ পড়ার সম্ভাবনা দু'বার। (Ratio $\frac{2}{4}$ বা $\frac{1}{2}$)

$1\,T^2$ = 4 বারের মধ্যে একবার দু'টি মুদ্রারই টেল্ পড়াব সম্ভাবনা।(Ratio $\frac{1}{4}$).

মোট 4. $\frac{1}{4}+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=1$.

॥ স্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রফল ॥

স্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রে গাণিতিক মিনকেই X অক্ষরেখা তথা বণ্টনের কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করা হয়। এই কেন্দ্র থেকে আরম্ভ করে X অক্ষরেখাটিকে কয়েকটি সমান ভাগে ভাগ করা হয় এবং ডানদিক ও বাঁদিকের স্কোরগুলির জন্য + বা − চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ মিন্ থেকে ডানদিকে তিনটি ও বাঁদিকে তিনটি মোট ছয়টি সমান ভাগে অক্ষরেখাটিকে বিভক্ত করা হয় এবং ভাগগুলিকে σ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই হিসেবে সমস্ত বণ্টনটি $M\pm3\sigma$-এর মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু বণ্টনের ক্ষেত্রফল সব জায়গায় সমান নয়। অর্থাৎ স্কোরের সংখ্যা সব জায়গাতে এক নয়। ডানদিকের σ গুলি + এবং বাঁদিকের σ গুলি − ধরে বিভিন্ন স্থানে বণ্টনটির ক্ষেত্রফলের একটা তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল।

$M+1\sigma$-র মধ্যে = 34.13% স্কোর ; $M-1\sigma$-র মধ্যে = 34.13% স্কোর ; $M\pm\sigma$-র মধ্যে = 68·26%

$M+2\sigma$-র মধ্যে = 47·72% স্কোর ; $M-2\sigma$-র মধ্যে = 47·72% স্কোর ; $M\pm2\sigma$-র মধ্যে = 95·44%

$M+3\sigma$-র মধ্যে = 49·87% স্কোর ; $M-3\sigma$-র মধ্যে = 49·87% স্কোর ; $M\pm3\sigma$-র মধ্যে = 99·74%

এইভাবে দেখা যায় প্রায় সমস্ত স্কোরই -3σ থেকে $+3\sigma$'র সীমার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। এর বাইরে যারা আছে তাদের সংখ্যা খুবই কম।

আবার σ-র বদলে Q দ্বারা দূরত্ব প্রকাশ করা যায়। স্বাভাবিক বণ্টনে Qকে Probable Error বা P E বলা হয়। P E এবং σ-র মধ্যে সম্বন্ধ হ'ল—

$$P\,E = {}'6745\sigma$$

$$\sigma = 1'982 \times P\,E.$$

এর থেকে দেখা যাচ্ছে σ প্রায় সব সময়ই P E অপেক্ষা 50°/o বেশী। Garrett-এর Statistics In Psychology And Education শীর্ষক বই-এর Table A থেকে দেখা যায় M ± P E-র মধ্যে মাঝের 50°/o M ± 2P E-র মধ্যে মাঝের 82'26°/o, M ± 3 PE-র মধ্যে মাঝের 97'°/o এবং M ± 4P E-র মধ্যে মাঝের 99'30 লোক বিদ্যমান।

স্বাভাবিক থেকে বিচ্যুতি : স্বাভাবিক বণ্টনের মিন, মিডিয়ান এবং মোড একই বিন্দুতে পড়ে বলে বণ্টনটি সুসমঞ্জস হয়। কিন্তু যখন মিন, মিডিয়ান ও মোড ভিন্ন ভিন্ন জায়গাতে অবস্থিত হয়, তখন বণ্টনটি অসমঞ্জস হয়। এই অসমঞ্জসতা দু'রকমের হয়—তির্যকতা (skewness) এবং কার্টোসিস (kurtosis).

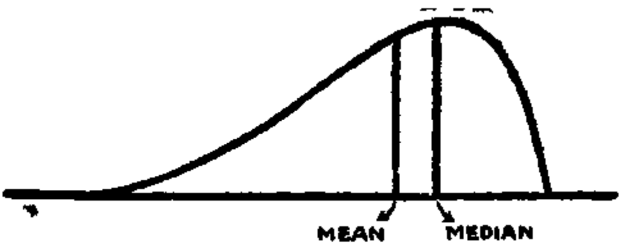

NEGATIVE SKEWNESS : TO THE LEFT.

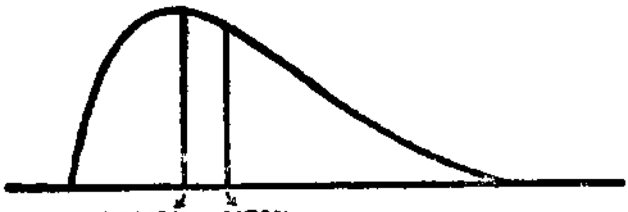

POSITIVE SKEWNESS : TO THE RIGHT.

তির্যকতা : যদি অধিকাংশ স্কোর বণ্টনের কোন একদিকে বেশী ভীড় করে, তাহলে মিন, মিডিয়ান ও মোড বিভিন্ন স্থানে পড়বে এবং বণ্টনটি একপাশে

হেলে পড়ে বা skewed হয়ে যায়। Skewness আবার দু'শ্রেণীর হতে পারে, ঋণাত্মক (negative) ও ধনাত্মক (positive)। যে বণ্টনের ঢালু দিক লেখ-চিত্রের ডানদিকে নেমে যায়, তাকে ধনাত্মক তির্যকতা-বিশিষ্ট বণ্টন বলা হয়। এ বণ্টনের বাঁদিকে স্কোরগুলি সমবেত হয়। আর যদি বণ্টনের ঢালু দিক লেখাচিত্রের বামদিকে নেমে যায়, তবে সেই বণ্টনটির তির্যকতা হয়ে ঋণাত্মক। এজাতীয় বণ্টনে স্কোরগুলি ডানদিকে সমবেত হয়।

ঋণাত্মক তির্যকতার ক্ষেত্রে প্রথমে মিন, তারপর মিডিয়ান থাকে ; আর ধনাত্মক তির্যকতার ক্ষেত্রে প্রথমে মিডিয়ান, পরে মিন থাকে।

Skewness পরিমাণ করার সূত্র হ'ল—

$$SK = \frac{3(\text{mean}-\text{median})}{\sigma}$$

percentile-এর সাহায্যেও skewness নির্ণয় করা যায়। তার সূত্র হ'ল—

$$SK = \frac{P_{90}+P_{10}}{2} - P_{50}.$$

একাধিক বণ্টনের skewness তুলনা করার সময় একই সূত্রের সাহায্যে skewness নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়। বণ্টনটি যতো স্বাভাবিকের কাছাকাছি হয়, skewness ততই O'র কাছাকাছি হয়।

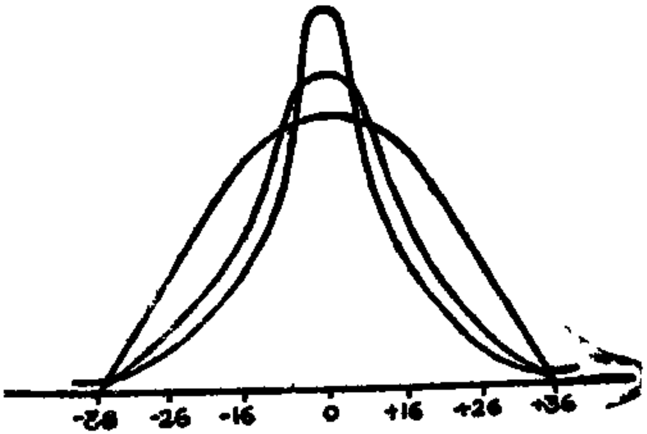

কার্টোসিস : কার্টোসিস-এর অর্থ হ'ল একটি স্বাভাবিক বণ্টনের সঙ্গে তুলনায় অন্য একটি বণ্টন কতটা চ্যাপ্টা (flat) বা উঁচু (peaked) তার একটি

মাপ। যদি স্বাভাবিকের তুলনায় বেশী উঁচু হয় তবে সেই বণ্টনকে বলা হয় Leptokurtic ; স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী চ্যাপ্টা বা নীচু হ'লে তাকে বলে Platykurtic। স্বাভাবিক বণ্টনকে বলা হয় Mesokurtic। পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রে একসঙ্গে তিন প্রকারের কার্টোসিসের উদাহরণ দেওয়া হ'ল। বণ্টন তিনটির মিন কিন্তু একই।

Kurtosis নির্ণয়ের সূত্র হ'ল, $Ku = \frac{Q}{P_{90} - P_{10}}$

স্বাভাবিক বণ্টনের Ku হ'ল, $Ku = \frac{.6745}{[1.28 - (-1.28)]}$ বা ·263

যদি Ku ·263-এর বেশী হয় তবে বণ্টনটি Platykurtic হবে। আর যদি Ku ·263 থেকে কম হয়, তবে বণ্টনটি হবে Leptokurtic।

তির্যকতার তাৎপর্য : ফ্রিকোয়েন্সীর বণ্টন যে সব সময়ই স্বাভাবিক হবে এমন কোন স্থিরতা নেই। যে কোন ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন তার উপযুক্ত স্বাভাবিক লেখচিত্রের (best fitting normal curve) উপর ফেলে তার সঙ্গে তুলনা করা চলে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনটির স্বাভাবিক বণ্টন থেকে কিছুটা পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য যদি তির্যকতার পার্থক্য হয়, তবে তার তাৎপর্য অনেকখানি। এর কারণও অবশ্য একাধিক হতে পারে।

প্রথমতঃ, বাছাই এর একটি কারণ হতে পারে। জনসংখ্যা (Sample) অল্প হ'লে তাদের উপর প্রযুক্ত অভীক্ষার ফল স্বাভাবিক বণ্টন না দেখাতেও পারে। আবার কেবলমাত্র বুদ্ধিমান বা কেবলমাত্র অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়ের উপর পৃথক পৃথক ভাবে অভীক্ষা প্রয়োগ করলে তার ফলাফলও স্বাভাবিক বণ্টনে নাও পড়তে পারে। জনসংখ্যা বেশী হলে এবং Random Sampling-এর নীতি অনুসরণ করলে লেখচিত্রের স্বাভাবিক হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

এ ছাড়া অভীক্ষাটি যদি খুব সহজ বা খুব কঠিন হয়, তবে বণ্টনটি স্বাভাবিক হবে না।

তৃতীয়তঃ, যে বৈশিষ্ট্য, গুণ বা ক্ষমতার পরিমাপ করতে হবে, সেটি যদি জন-সাধারণে normally বিস্তৃত না থাকে তবে বণ্টনটিও স্বাভাবিক হবে না। টস্ করার মুদ্রাটির ওজন যদি একদিকে বেশী হ'ত, তবে হেড্ বা টেল্ পড়ার সম্ভাবনা ব্যাহত হ'ত।

এ ছাড়াও অভীক্ষাটির নির্দেশনা, প্রয়োগ-কৌশল, সময়, মূল্যায়ন প্রভৃতি বিভিন্ন কারণের জন্য অস্বাভাবিক বণ্টন হতে পারে।

অস্বাভাবিক বণ্টন : যে সমস্ত ক্ষেত্রে বণ্টনে স্বাভাবিক, সেখানে কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি সম্ভাবনার যৌগ-নীতি মেনে চলে। কিন্তু কোন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যদি কোন একটি উপাদান অত্যন্ত শক্তিশালী হয়, তা'হলে তার উপস্থিতি সম্ভাবনার যৌগিক নীতি মেনে চলবে না। এ সমস্ত ক্ষেত্রে বণ্টনটি একটা অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করবে।

অস্বাভাবিক বণ্টন সাধারণতঃ 'J' টাইপ ও 'U' টাইপের হয়। মুদ্রা টস্ করার সময় যদি তুলনাতে কেবলমাত্র হেড্ বা কেবল মাত্র টেল্ পড়ার সম্ভাবনা বেশী হয়, তবে বণ্টনটি হবে 'J' টাইপের। এমন অনেক রোগ আছে, যা কেবলমাত্র বুড়ো বয়সে হয়, শিশুদের হয় না। এ রকম রোগের বণ্টনটি হবে 'J' টাইপের। আবার এমন কোন রোগ যদি থাকে, যা কেবল শিশুদের ও বুড়োদের হয়, অন্য বয়সে হয় না, সেই রোগের বনটনটি হবে 'U' আকৃতির।

স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের প্রয়োগ : বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের প্রয়োগ করা হয়। এখন বিশেষ বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্রে লেখচিত্রের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল। ধ'রে নেওয়া হচ্ছে বণ্টনটি হয় স্বাভাবিক অথবা স্বাভাবিকের খুব কাছাকাছি।

(ক) কোন স্বাভাবিক বণ্টনে প্রদত্ত সীমার মধ্যে শতকরা কতজন লোক আছে তার হিসেব নির্ণয় করা—

উদা. 1. ধরা যাক্ কোন বণ্টনের মান হ'ল 12 আর সিগ্মা হল 4; বণ্টনটি যদি স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে (i) 8 এবং 16-র মধ্যে শতকরা কতগুলি লোক আছে। (ii) 18-এর উপরে শতকরা কতজন লোক আছে? (iii) 6-এর নীচে শতকরা কতজন লোক আছে?

(i) 16 নম্বরটি আসলে 15·5—16·5-এর মধ্যবিন্দু। বণ্টনটির মান 12 বলে 16 নম্বর হ'ল মান থেকে 4 পয়েন্ট উপরে এবং 8 নম্বর হ'ল 4 পয়েন্ট নীচে। সিগ্মা দিয়ে ভাগ করলে বলা যায় 16 হ'ল মিন থেকে 1σ উপরে এবং 8 হ'ল 1σ নীচে। মিন এবং $\pm 1\sigma$-র মধ্যে 68·26% ঘটনা ঘটে। সুতরাং বলা যেতে পারে, 8 এবং 16-এর মধ্যে শতকরা 68·26 (বা 68 জন) জন লোক আছে।

(ii) 18 নম্বরের উচ্চ সীমা হ'ল 18·5 : এই নম্বরটি মিন থেকে 6·5 বা $1\cdot625\sigma$ উপরে। মিন এবং $1\cdot625\sigma$-র মধ্যে 44·79% ঘটনা ঘটে। অতএব 18-এর উপরে শতকরা 50—44·79 বা 5·21 জন (5 জন) লোক আছে। [বন্টনটি মিনের উপরে 50% এবং নীচে 50%]

(iii) 6 নম্বরের নিম্নসীমা হ'ল 5·5 ; এই নম্বরটি মিনের $1\cdot625\sigma$ নীচে $\left(\frac{5\cdot5-12}{4}\right)$। মিন এবং—$1\cdot625\sigma$-র মধ্যেও শতকরা 44·79 ঘটনা ঘটে। অতএব 6-এর নীচে শতকরা 50−44·79 বা 5·21 জন (5 জন) লোক আছে।

[বিঃ দ্রঃ—কোন নম্বরের উপরের হিসেবে উচ্চসীমা এবং নীচের হিসেবে নম্বরটির নিম্নসীমা ধরতে হয়]

উদা. 2. কোন স্বাভাবিক বন্টনে মিন=29·75 এবং সিগ্মা=6·75 হ'লে 22 এবং 26 এর মধ্যে শতকরা কতজন থাকবে ? কোন একটি নম্বরের 22 এবং 26-এর মধ্যে থাকার সম্ভাবনা কত ?

$$22-29\cdot75=-7\cdot75.$$

$$\sigma \text{ distance}=\frac{-7\cdot75}{6\cdot75}=-1\cdot15\ \sigma$$

$$26-29\cdot75=-3\cdot75$$

$$\sigma \text{ distance}=\frac{-3\cdot75}{6\cdot75}=-\cdot56\ \sigma$$

Mean,—$1\cdot15\ \sigma$-র মধ্যে ঘটনা হ'ল : 37·49%

Mean,— $\cdot56\ \sigma$-র মধ্যে ঘটনা হ'ল : 21·23%

বিয়োগ করলে $-1\cdot15\ \sigma$ ও $-\cdot56\ \sigma$ র মধ্যে, অর্থাৎ 22 ও 26-র মধ্যে ঘটনার সংখ্যা হল : 16·26%

কোন একটি নম্বরের 22 এবং 26-র মধ্যে থাকার সম্ভাবনা হ'ল 100 তে 16।

(খ) স্বাভাবিক বন্টনে প্রদত্ত শতকরা ঘটনা বা লোকসংখ্যার সাহায্যে কোন নম্বরের সীমা নির্ণয় করা—

উদা. 3. কোন স্বাভাবিক বন্টনের মিন হ'ল 16 আর সিগ্মা হল 4 ; মানের 75% ঘটনা কোন্ কোন্ সীমার মধ্যে অবস্থিত ?

মানের 75% ঘটনা মিনের 37·5% উপরে এবং 37·5% নীচে। তালিকা থেকে দেখা যায় মিন এবং +1·15 σ এর মধ্যে 37·5% এবং মিন ও −1·15 σ মধ্যে নীচের 37·5% ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ মিন এবং ± 1·15 σ-র মধ্যে মানের 75% ঘটনা ঘটে। কিন্তু $\sigma = 4$ বলা আছে। অতএব সীমা হ'ল—

$$\text{Mean} \pm 1{\cdot}15 \times 4$$
$$\text{or} \quad 16 \pm 4{\cdot}60$$
$$\text{or} \quad 11{\cdot}40 \text{ এবং } 20{\cdot}60$$

(গ) অভীক্ষার প্রশ্নে, সমস্যা ইত্যাদির আপেক্ষিক কাঠিন্য মাত্রা নির্ণয় করা এবং ক্রম অনুসারে সাজান—

উদা. 4. প্রথম প্রশ্নে 10%, দ্বিতীয় প্রশ্নে 20% এবং তৃতীয় প্রশ্নে 30% ছাত্র সঠিক উত্তর দিয়েছে। প্রশ্নগুলির আপেক্ষিক কাঠিন্য মাত্রা কত?

লেখচিত্রে প্রতিটি প্রশ্নের এলাকা সাজাতে হবে। প্রথম প্রশ্নের এলাকাটি এমন হবে যে সমগ্র ক্ষেত্রফলের 10% কোন একটি বিন্দুর উপরে থাকবে এবং 90% নীচে থাকবে। স্বাভাবিক বন্টনের উচ্চ 10% ঘটনার 40% থাকবে এর নিম্নসীমা ও মিনের মধ্যে। তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে মিন এবং 1·28σ-র মধ্যে 39·97% ঘটনা থাকে। অতএব প্রথম প্রশ্নের এলাকা মিন থেকে 1·28 σ দূরে শুরু হচ্ছে এবং এর কাঠিন্য মাত্রা হ'ল 1·28.

দ্বিতীয় প্রশ্নের এলাকা শুরু হচ্ছে মিন থেকে ·84 σ দূরে। (50% − 20% = 30% Mean + ·84 σ-র মধ্যে 29·95% ঘটনা থাকে)। কাঠিন্য মাত্রা ·84.

তৃতীয় প্রশ্নের এলাকা শুরু মিন থেকে ·52 σ দূরে। অতএব কাঠিন্য মাত্রা ·52.

এখন নীচের মত তালিকাভুক্ত করলে দেখা যাবে—

প্রশ্ন	উত্তীর্ণ	σ মান বা কাঠিন্য	পার্থক্য
1	10%	1·28	–(প্রথম প্রশ্ন)
2	20%	·84	·44 (1−2)
3	30%	·52	·32 (2−3)

(ঘ) কোন গুণ বা ক্ষমতা যদি স্বাভাবিক ভাবে বণ্টিত থাকে, তবে কোন দলকে নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী কয়েকটি ছোট ছোট দলে ভাগ করা যায়।

উদা, 5. ধরা যাক্ কোন শ্রেণীতে 100 জন ছাত্র আছে। এদেরকে ক্ষমতা অনুযায়ী 5টি দলে ভাগ করতে হবে।

ধরা যাক্ যে গুণের জন্য এদেরকে ভাগ করা হচ্ছে, সেটি স্বাভাবিক ভাবে বণ্টিত গোটা স্বাভাবিক বণ্টনের লেখচিত্রের X অক্ষে 6σ দৈর্ঘ্য বিদ্যমান। দল হবে 5টি। অতএব প্রতি ভাগে $\frac{6\sigma}{5}$ বা $1{\cdot}2\,\sigma$ করে পড়বে। মাঝখানের $1{\cdot}2\,\sigma$ কে মিন এর দু'পাশের $\cdot6\,\sigma$ করে লেখা হ'ল। ছবি আঁকার এরকম হবে :—

$-3\sigma \quad -1{\cdot}8\,\sigma \quad -{\cdot}6\,\sigma \quad$ Mean $\cdot6\,\sigma \quad 1{\cdot}8\,\sigma \quad 3\sigma$

ডানদিক থেকে নাম দিলে $1{\cdot}8\,\sigma$ থেকে $3\,\sigma$ পর্যন্ত A, $\cdot6\,\sigma$ থেকে $1{\cdot}8\,\sigma$ পর্যন্ত B. $-{\cdot}6\,\sigma$ থেকে $\cdot6\,\sigma$ পর্যন্ত C, $-{\cdot}6\,\sigma$ থেকে $-1{\cdot}8\,\sigma$ পর্যন্ত D এবং $-1{\cdot}8\,\sigma$ থেকে $-3\,\sigma$ পর্যন্ত E দল। তালিকা থেকে প্রতি দলের ছাত্রসংখ্যা নির্ণয় করা হয় এই ভাবে—

A দল : Mean, $+3\,\sigma$ র মধ্যে 49·86°/ₒ ঘটনা
Mean, $+1{\cdot}8\,\sigma$-র মধ্যে 46·41°/ₒ ঘটনা

বিয়োগ করে, $1{\cdot}8\,\sigma$ থেকে 3σ-র মধ্যে : 3·45°/ₒ ঘটনা

অনুরূপে B দলে 23·84°/ₒ, C দলে 45·14°/ₒ, D দলে 23·84°/ₒ এবং E দলে 3·45°/ₒ ঘটনা। ভগ্নাংশ বাদ দিলে—

	দল				
	A	B	C	D	E
শতকরা হিসাব :	3·5	23·84	45·14	23·84	3·5
প্রতি দলের ছাত্র সংখ্যা (100 জনে)	3 or 4	24	45	24	4 or 3

সহ-পরিবর্তন

(Correlation)

যে ছেলে ইংরেজীতে বেশ পাকা, সে কি অঙ্কেও সেইরকম পাকা হয়? যে খেলাধূলাতে বেশ ওস্তাদ, সে কি পড়াশুনাতেও তেমনি? আমাদের সামনে এ জাতীয় প্রশ্ন প্রায়ই উপস্থিত হয়। প্রকৃতপক্ষে অনেক সময় দুটি গুণের মধ্যে এমন একটা সম্বন্ধ থাকে যেটি জানতে পারলে এক বিষয়ে পারদর্শিতা থেকে অপর বিষয়ে কতটা দক্ষতা আশা করা যাবে, সে সম্বন্ধে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয়। দুটি বিভিন্ন বস্তু, ঘটনা বা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যদি এমন কোন সম্পর্ক থাকে যাতে একটির মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা দিলে অন্যটির মধ্যেও পরিবর্তন দেখা যায়, তখন সেই জাতীয় ঘটনাকে বলা হয় সহ-পরিবর্তন। এই সহ-পরিবর্তন তিন প্রকারের হতে পারে। যথা—(১) সমমুখী বা ধনাত্মক (Positive) (2) বিপরীত বা ঋণাত্মক (Negative) এবং প্রভাবশূন্য (Indifferent)। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক্—

(১) দেহের উত্তাপ বাড়লে থার্মোমিটারের পারার উচ্চতা বাড়ে, দেহের উত্তাপ কমলে পারার উচ্চতাও কমে যায়; এখানে দুটি জিনিসের মধ্যে একটি বাড়লে অপরটিও বাড়ছে। এ হ'ল ধনাত্মক সহ-পরিবর্তন।

(২) চাপ বাড়লে আয়তন কমে চাপ কমালে আয়তন বাড়ে। এ হ'ল ঋণাত্মক সহ-পরিবর্তন। এখানে দুটি জিনিসের মধ্যে একটি বাড়লে অপরটি কমে।

(৩) আমার বাড়ীর ফুলগাছটিতে ফুল ফুটুক আর নাই ফুটুক কলেজের ক্লাস ঠিক নিয়ম মত চলবেই। এখানে দুটি জিনিসের মধ্যে একটিতে পরিবর্তন ঘটলেও অন্যটির মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটে না। এ হ'ল প্রভাবশূন্যতার সম্পর্ক।

সহগাঙ্ক (Co-efficient of Correlation): একটির মধ্যে কোন-প্রকার পরিবর্তন দেখা দিলে অপরটির মধ্যে যে পরিবর্তন সঙ্গে সঙ্গে হয়, সেই সহ-পরিবর্তনের মানকে সহগাঙ্ক বলে। এটি দুটি সম্পর্কের বা পরিবর্তনের

একটি অনুপাত। যতটা সম্পর্ক থাকে, সেই সম্পর্কের পরিমাণকে সহগাঙ্ক বা অনুবন্ধ সহগ বলে। যদি দুটির মধ্যে বাড়ার অনুপাতটি সমান হয়, তবে তাদের সহ-পরিবর্তনকে **সম্পূর্ণ বা Perfect সহ-পরিবর্তন** বলা হয়। যখন এই অনুপাতটি অসমান হয়, তখন সহ-পরিবর্তনকে বলা হয় **অসম্পূর্ণ বা Imperfect**।

যখন দুটি বিভিন্ন দলের স্কোরের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে, আর সেই সম্বন্ধকে একটি সরলরেখার সাহায্যে প্রকাশ করা সম্ভব হয়, তখন সেই সম্বন্ধকে বলা হয় **Product Moment Co-efficient of Correlation**। এই সম্বন্ধকে 'r' এই অক্ষরটির সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। এই 'r' সব সময় +1·00 থেকে −1·00 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যখন P= 1·00 হয় তখন বুঝতে হয় দুটি দলের মধ্যে পূর্ণ সহ-পরিবর্তনের সম্বন্ধ আছে। বৃত্তের পরিধির সঙ্গে তার ব্যাসের অনুপাত সব সময় 3·1416 ; এর কোন পরিবর্তন হয় না। এখানে r হচ্ছে সম্পূর্ণ বা 1·00 আবার যে বাংলাতে সবসময় প্রথম স্থান অধিকার করে, সে যদি অঙ্কে সব সময় সর্বশেষ স্থানটি অধিকার করে, তাহ'লে বুঝতে হবে, এক্ষেত্রে 'r' হচ্ছে পূর্ণ কিন্তু ঋণাত্মক বা—1·00; যেখানে উভয় দলের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকে না, সেখানে 'r' হ'ল ·00.

তা'হলে দেখা যাচ্ছে, সহ-পরিবর্তনের মান +1·00 থেকে −1·00, এই দুই চরম প্রান্তের মধ্যে যে কোন একটি স্থানে থাকতে পারে এবং তার পরিমাণ ও প্রকৃতি বিভিন্ন হতে পারে সহ-পরিবর্তনের মানটি কি জাতীয় (কম, বেশী বা মাঝারী) তা জানার সুবিধার জন্য নিম্নরূপ কয়েকটি বিভাগের সৃষ্টি করা হয়। যখন 'r' এর মান ±·00 থেকে ±·20-র মধ্যে থাকে তখন সহ-পরিবর্তন উদাসীন (Indifferent)।

„	'r'	„	„	±·20	„	±·40র	„	„	„	„	খুব কম (Slight)
„	'r'	„	„	±·40	„	±·70র	„	„	„	„	উল্লেখযোগ্য (Marked)
„	'r'	„	„	±·79	„	±1·00র	„	„	„	„	উচ্চ ও অত্যন্ত উচ্চ (High)

॥ সহ-পরিবর্তনের মান বা 'r' নির্ণয় ॥

সহ-পরিবর্তনের মান বা r নির্ণয় করার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রচলিত পদ্ধতিটি হ'ল—Product-Moment পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে 'r' বলতে আমরা বুঝি দুটি স্কোর গুচ্ছের মধ্যে এমন একটি পারস্পরিক সম্বন্ধ যে একটির পরিবর্তন হ'লে অপরটির পরিবর্তন হবে এবং এই সহ-পরিবর্তনকে একটি সরল রেখার সাহায্যে চিত্রায়িত করা যায়—যে সরলরেখার সীমা হচ্ছে—1·00 থেকে আরম্ভ করে ·00 হয়ে + 1·00 পর্যন্ত।

Product Moment পদ্ধতিতে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। সেগুলি হ'ল—

(১) প্রথমে অভীক্ষার্থীর প্রতিটি স্কোরের মিন্-বিচ্যুতি বার করতে হয়। প্রত্যেক অভীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে দুটি করে স্কোর থাকে বলে প্রত্যেক অভীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে দু'টি করে মিন্-বিচ্যুতি পাওয়া যায়। এই দুটিকে x ও y দ্বারা সূচিত করা হয়।

(২) মিন-বিচ্যুতিগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে গুণ করে xy পাওয়া যায়। এর যোগফলকে বলে Σxy.

(৩) স্কোরগুলির Standard deviation বা σ বার করতে হয়।

(৪) প্রত্যেক মিন-বিচ্যুতিকে তার সিগ্‌মা দিয়ে ভাগ করে Standard Score বার নিতে হয়। (এটা করা হয় মিন বিচ্যুতিগুলির এককের পার্থক্যের জন্য)

(৫) দুই দলের Standard Score-এর পরস্পর গুণফলকে যোগ করলে পাওয়া যাবে $\Sigma\left(\frac{x}{\sigma_x}\cdot\frac{y}{\sigma_y}\right)$। একে N দিয়ে ভাগ করলে যে অনুপাত পাওয়া যাবে, তা হ'ল Product Moment Co-efficient of Correlation বা r.

[মিন বিচ্যুতির যোগফলকে N দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায়, তাকে বলে Moment। X এবং Y এই দুটি মিন-বিচ্যুতিকে পরস্পর গুণ করে তার যোগফলকে N দিয়ে ভাগ করা হয় বলে 'Product moment' কথাটি ব্যবহার করা হয়।]

এবার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—

উদা. I.

পাঁচজন কলেজের ছাত্রের উচ্চতা ও ওজনের মাপ হ'ল—

Product Moment-এর সূত্রটি এই ভাবেও প্রকাশ করা যায়—

$$\frac{\Sigma xy}{N.\sigma x.\sigma y}$$ এই অনুপাতটিকে 'r' বা Pearson r বলা হয় অধ্যাপক Karl Pearson-এর নামানুসারে।

Scatter Diagram বা Scattergram :

যখন N-এর সংখ্যা খুব বেশী থাকে, তখন একটি diagram বা তালিকাতে সমস্ত data সাজিয়ে নিয়ে তারপর assumed mean থেকে বিচ্যুতি হিসেব করে নিলে 'r' বার করা সহজ হয়। একেই বলা হয় Scatter diagram বা Scattergram। নীচে 120 জন কলেজ ছাত্রের একটি Scatter diagram আঁকা হল—

ওজন (পাউণ্ডে) X- Variable.

উচ্চতা (ইঞ্চিতে) Y- Variable.	100–109	110–119	120–129	130–139	140–149	150–159	160–169	170–179	fy
72–73								1 /	1.
70–71			1 /	3 ///	3 ///	4 ////	2 //	3 ///	16.
68–69			4 ////	11 ////// ////// /	6 ///// /	3 ///	2 //	2 //	28.
66–67		2 //	9 //// ////	11 //// //////	8 //// ////	2 //	1 /		33.
64–65	1 /	5 /////	7 //// ///	10 ///// /////	3 ///				26.
62–63	1 /	2 //	7 ///// //	1 /	2 //				13.
60–61	1 /	1 /		1 /					3.
fx→	3	10	28	37	22	9	5	6	120

এই চিত্র বা চার্টের বাম দিকে নীচু থেকে উপরে উচ্চতার বন্টন ও শ্রেণী ব্যবধান দেখান হয়েছে। চার্টের উপরে বাম থেকে ডাইনে ওজনের বন্টন ও

শ্রেণী ব্যবধান দেখান হয়েছে। এর পর ট্যালি দিয়ে ফ্রিকোয়েন্সী নির্ণয় করতে হয়। যেমন, যে ছাত্রের ওজন 150 পাউণ্ড ও উচ্চতা 69 ইঞ্চি তার স্থান ওজনের হিসেবে বাম দিক থেকে ষষ্ঠ ঘরে (150 – 159)। উচ্চতা হিসেবে তার স্থান

ছাত্র উচ্চতা (ইঞ্চিতে), ওজন (পাউণ্ডে)

	X	Y	x	y	x^2	y^2	xy	$\frac{x}{\sigma x}$	$\frac{y}{\sigma y}$	$\frac{x}{\sigma y} \cdot \frac{y}{\sigma y}$
A	72	170	3	0	9	0	0	1·34	·00	·00
B	69	165	0	—5	0	25	0	·00	—·37	·00
C	66	150	—3	—20	9	400	60	—1·34	—1·46	1·96
D	70	180	1	10	1	100	10	·45	·73	·33
E	68	185	—1	15	1	225	—15	—·45	1·10	—·49
					$\Sigma x^2 = 20$	$\Sigma y^2 = 750$		$\Sigma xy = 55$		1·80

Mx = 69 ইঞ্চি। $\sigma x = \sqrt{\frac{\Sigma x^2}{N-1}} = \sqrt{\frac{20}{4}} = \sqrt{5} = \sqrt{2·24}$ ইঃ

My = 170 পাউণ্ড। $\sigma y = \sqrt{\frac{\Sigma y^2}{N-1}} = \sqrt{\frac{750}{4}} = \sqrt{187·5} = 13·69$ পাঃ

$$\therefore r = \frac{\Sigma \left(\frac{x}{\sigma x} \frac{y}{\sigma y}\right)}{N} = \frac{180}{5} = ·36$$

উপর হ'তে তৃতীয় ঘরে (68—69)। অতএব ট্যালি পড়বে ষষ্ঠ স্তম্ভের তৃতীয় ঘরে। সব ট্যালিগুলি দেওয়া হয়ে গেলে ওজন ও উচ্চতা অনুযায়ী প্রত্যেক স্তম্ভের Total নির্ণয় করতে হয়। fx হ'ল ওজন অনুযায়ী প্রত্যেক স্তম্ভের যোগফল কিন্তু সব সময় একই হবে এবং তা Grand Total বা N-এর সমান হবে।

॥ Scattergram থেকে 'r' নির্ণয় করা ॥

Scattergram-এর সাহায্যে 'r' নির্ণয় করতে হ'লে কতকগুলি স্তর অতিক্রম করতে হবে। সেগুলি নীচে দেওয়া হ'ল—

(১) প্রথমে উপরের চার্টের মত একটি Correlation table তৈরী করতে হবে।

(২) উচ্চতা ও ওজনের বণ্টনের Assumed mean নির্ণয় করতে হবে এবং যে শ্রেণীতে ঐ Assumed mean থাকবে, সেই শ্রেণীতে দু'বার রেখা টেনে শ্রেণীটিকে আলাদা করে দিতে হবে।

(৩) Am থেকে মিন-বিচ্যুতি হিসেব করে x', y' সারি বার করে তারপর fx', fx'², fy', fy'² সারি বার করতে হবে। প্রত্যেক সারির যোগফলও নির্ণয় করতে হবে।

(৪) Am-এর Correction নির্ণয় করতে হবে। এজন্য Cx (Fx থেকে) এবং Cy (Fy থেকে) বার করতে হবে।

(৫) Standard deviation σ_x এবং σ_y বার করতে হবে।

(৬) Σx'y' সারি নির্ণয় করতে হবে। x' এবং y' এর গুণফল'+'বা'—' হ'তে পারে বলে দুটি সারিতে গুণ করে তারপর যোগফল নির্ণয় করতে হয়। কিভাবে Σx'y' নির্ণয় করতে হবে তা চার্টের মধ্যে বিশেষ চিহ্নের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হ'ল।

(৭) Checks :—xΣ'y' এর সত্যতা যাচাই করে দেখতে হ'লে বিচ্যুতির গুণফল এবং সারির বদলে স্তম্ভ অনুযায়ী যোগ করে দেখতে হয়। চার্টটির নীচে তীরচিহ্ন দিয়ে Checkগুলি দেখানো হয়েছে। আর দু'টি Check হ'ল—Fx' হবে Σx এর সমান এবং Fy' হবে Σy' এর সমান।

(৮) সব হিসেব হয়ে গেলে নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে 'r' নির্ণয় করা হয়—

$$r = \frac{\frac{\Sigma x'y'}{N} - Cx\ Cy.}{\sigma x.\ \sigma y}$$

॥ **Product-Moment পদ্ধতির আরো কয়েকটি উদাহরণ** ॥

1. x এবং y, দুটি বন্টনের মিন থেকে বিচ্যুতি ধরে r নির্ণয় করা :—

$$\left[\text{সূত্র : } r = \frac{\Sigma xy}{N.\ \sigma x.\sigma y} \text{ বা } \frac{\Sigma xy}{\sqrt{\Sigma x^2 \times y^2}} \right]$$

উদাহরণ।

X	Y	x	y	x²	y²	xy
50	22	−12·5	−8·4	156·25	70·56	105·00
54	25	— 8·5	−5·4	72·25	29·16	45·90
56	34	− 6·5	3·6	42·25	12·96	—23·40
59	28	− 3·5	−2·4	12·25	5·76	8·40
60	26	− 2·5	−4·4	6·25	19·36	11·00
62	30	− ·5	− ·4	·25	·16	·20
61	32	− 1·5	1·6	2·25	2·56	−2·40
65	30	2·5	− ·4	6·25	·16	− 1·00
67	28	4·5	−2·4	20·25	5·76	−10·80
71	34	8·5	3·6	72·25	12·96	30·60
71	36	8·5	5·6	72·25	31·36	47·60
74	40	11·5	9·6	132·25	92·16	110·40
750	365			595·00	282·92	321·50
				(Σx^2)	(Σy^2)	(Σxy)

$$Mx = \frac{750}{12} \quad My = \frac{365}{12}$$

$$= 62{\cdot}5 \qquad = 30{\cdot}4$$

$$\therefore \quad r = \frac{\Sigma xy}{\sqrt{\Sigma x^2 \times \Sigma y^2}} = \frac{321{\cdot}50}{\sqrt{595 \times 282{\cdot}92}} = {\cdot}78.$$

2. কল্পিত বিন থেকে বিচ্যুতি ধরে r নির্ণয়

উদাহরণ।

X	Y	x′	y′	x'^2	y'^2	x′y′
50	22	−10	−8	100	64	80
54	25	− 6	−5	36	25	30
56	34	− 4	4	16	16	−16
	28	− 1	−2	1	4	2
60	26	0	−4	0	16	0
62	30	2	0	4	0	0
61	32	1	2	1	4	2
65	30	5	0	25	0	0
67	28	7	−2	49	4	−14
71	34	11	4	121	16	44
71	36	11	6	121	36	66
74	40	14	10	196	100	140
750	365			670	285	334
				($\Sigma x'^2$)	($\Sigma y'^2$)	($\Sigma x'y'$)

Assumed mean

$AMx = 60{\cdot}0$ $\qquad AMy = 30{\cdot}0$

Actual Mean $= 62{\cdot}5$ $\qquad My = 30{\cdot}4$

$Cx = 2{\cdot}5$ $\qquad Cy = {\cdot}4$

$C^2x = 6{\cdot}25$ $\qquad C^2y = {\cdot}16$

$$r = \frac{\frac{\Sigma x'y'}{N} - CxCy}{\sigma'x \cdot \sigma'y}$$

$$\sigma'x = \sqrt{\frac{670}{12} - 6{\cdot}25}$$

$$= 7{\cdot}04$$

$$\sigma'y = \sqrt{\frac{285}{12} - {\cdot}16} \quad \therefore \quad r = \frac{\frac{334}{12} - 100}{7{\cdot}04 \times 4{\cdot}86}$$

$$= 4{\cdot}86 \qquad\qquad = {\cdot}78.$$

এতক্ষণ আমরা দুইটি চলক বা পরিবর্তনশীল রাশির (variable) অনুবন্ধ সহগ নির্ণয় করলাম। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞানে কতকগুলি মান আছে যেগুলির সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। ব্যক্তিত্ব, বিচারকরণ, ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন মানসিক গুণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এগুলির পদ বা Rank অনুযায়ী সাজানো সম্ভব। এই সমস্ত ক্ষেত্রে Product-Moment পদ্ধতি একেবারে ব্যবহার করা চলে না। সেক্ষেত্রে কি ভাবে অনুবন্ধ সহগ নির্ণয় করা যায়, তা আলোচনা করা হ'ল।

সারি পার্থক্যের পদ্ধতি (Rank-Difference Method): কোন একটি শ্রেণীর ছাত্রদের একটি বিষয়ে পরীক্ষা করে তার ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্রদিগকে ১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদি স্থানে বসানো সম্ভব। এই নম্বর বা স্কোর অনুযায়ী ছাত্রদের সাজিয়ে নিয়ে তাদের দু'টি স্কোরের সারি পার্থক্য থেকেও সহ-সম্বন্ধ বা সহ-পরিবর্তনের মান নির্ণয় করা সম্ভব। তাকে δ (রো) বলা হয়। এই পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে 'রো' নির্ণয় করা সম্ভব, কিন্তু পদ্ধতিটি Product-Moment পদ্ধতির মত অতটা নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু একটি কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। M যখন 25 বা তার চেয়ে কম হয়, তখনই এই পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত, অন্যত্র নয়। বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী Spearman এই পদ্ধতির আবিষ্কর্তা।

পদ্ধতিটিতে দু'টি স্কোর-গুচ্ছ থাকে। প্রথমে প্রথম স্কোর-গুচ্ছ অনুযায়ী ছাত্রদের সারি বিন্যাস করা হয়। যে ছাত্র সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে, তার সারি বা Rank হবে 1, তার পরের স্কোরটি যে ছাত্রের, তার Rank হবে 2, এইভাবে স্কোরের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ সর্ব নিম্ন স্কোর পর্যন্ত সারি বা Rank নির্ণয় করে যেতে হবে। যদি দুজন ছাত্র একই নম্বর বা স্কোর পায়, তবে তাদের প্রত্যেককে দুটি সারির ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে রাখা হয়। যেমন, হয়তো দেখা গেল যে, দু'জন ছাত্র ষষ্ঠ স্থান অধিকার করছে। তখন একজনকে 6th. ও অপর জনকে 7th. ধরে নিয়ে প্রত্যেককে তার মধ্যবর্তী স্থান $\frac{6+7}{2}$ তম বা 6·5th স্থানে রাখা হয়। যখন তিনজন ছাত্র একই স্কোর পায়, তখনও প্রত্যেকের সারি হয় পর পর তিনটি সারির মধ্যবর্তী স্থান। উদাহরণস্বরূপ যদি তিনজন ছাত্রের স্কোর হিসেবে স্থান হয় 9th. তবে প্রত্যেকের সারি বা Rank হবে $\frac{9+10+11}{3}$th. বা 10th.

এইভাবে দু'টি বিভিন্ন স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রেই অভীক্ষার্থীর সারি (R) নির্ণয় করা হয়। তারপর প্রত্যেক অভীক্ষার্থীর সারি দু'টির পার্থক্য D) নির্ণয় করা হয়। প্রথম সারির স্কোর যদি দ্বিতীয় স্কোরের চেয়ে বড় হয়, তবে D হবে ধনাত্মক। বিপরীত ক্ষেত্রে D হবে ঋণাত্মক। D সারিতে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মানগুলির যোগফল O হবে। এইবার প্রত্যেক D কে বর্গ করে D^2 নির্ণয় করা হয়। D^2-এর যোগফলকে ΣD^2 দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সব শেষে নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে δ নির্ণয় করা হয়—

$$\delta = 1 - \frac{6\Sigma D^2}{N(N^2 1)}.$$

এইবার একটি উদাহরণের সাহায্যে δ নির্ণয় করা যাক—

উদা. 3.

(1) ছাত্র	(2) Test A	(3) Test B	(4) Test A'র সারি	(5) Test B'র সারি	(6) D=(RA—RB)	(7) D^2
তরুণ	22	30	9·5	4	5·5	30·25
তুষার	40	24	4	8·5	—4·5	20·25
প্রদীপ	45	31	2	2·6	0·5	0·25
অসিত	34	26	6·5	6·5	0	0
সুধীর	31	22	8	10	— 2	4
প্রবীর	22	29	9 5	5	4·5	20·25
দিলীপ	58	31	1	2·5	—1·5	2 25
অশোক	36	⅃6	5	6·5	—1·5	2·52
স্বপন	34	24	6·5	8·5	—2	4
বিদ্যুত	43	3	1	1	2	4

N=10 $0 \Sigma D^2 = 87·50$

এখানে $N = 10$, $\Sigma D^2 = 87·50$

$$\therefore \quad \delta = 1 - \frac{6 \times 87·50}{10·(100·1)}$$

$$1 - \frac{525}{10 \times 99} = ·47 \text{ (app)}.$$

উদা. 4

গুণ বা Trait.	বিচারক (x)	বিচারক (y)		D		D²
(1)	(2)	(3)		+	—	
A	2	1	—	1		1
B	1	2	—		1	1
C	4	5	—		1	1
D	3	6	—		3	9
E	6	4	—	2		4
F	5	3	—	2		4
N=6						$\Sigma D^2 = 20.$

$$\rho = 1 - \frac{6 \times 20}{6(36-1)} = 1 - \frac{6 \times 20}{6 \times 30} = \cdot 43$$

Biserial Correlation : সারি-পার্থক্যের পদ্ধতিতে আমরা এমন দু'টি গুণের মধ্যে সহ-সম্বন্ধ নির্ণয় করেছি যে গুণগুলিকে সাংখ্যমানে প্রকাশ করা সম্ভব নয় ; কিন্তু গুণগুলিকে সাজানো সম্ভব। কিন্তু যখন এমনি দুটি গুণের মধ্যে সহ-সম্বন্ধ নির্ণয় করতে হয় যার একটিকে সাংখ্যমানে প্রকাশ করা যায় কিন্তু অপরটিকে যায় না তখন তাদের মধ্যে যে সহ-সম্বন্ধ তাকেই Biserial Correlation বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে 1.Q ও সামাজিক সঙ্গতিসাধন এই দুটির মধ্যে সহ-সম্বন্ধ নির্ণয় করতে হবে। এখানে 1.Q সংখ্যার সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু অপর গুণটিকে যায় না। এরকম ক্ষেত্রে Biserial r (সংক্ষেপে r bis) নির্ণয় করতে হয়।

r bis নির্ণয় করার নিয়ম

উদা. 5. কোন একটি পরীক্ষাতে 145 জন ছাত্রের স্কোর এবং পরীক্ষার আগে বিশেষ শিক্ষণ-প্রাপ্ত ও শিক্ষণ-বিহীন ছাত্রদের f দেওয়া হ'ল। শেষের স্তম্ভে f দুটির যোগফল।

1 Scores.	2 Trained.	3 Un-trained.	Total.	
85—89	5	6	11	$M_T = 71·35$ (145 জনের মিন নম্বর)
80—84	2	16	18	$\sigma_t = 8·80$ (স্কোরগুলির S D)
75—79	6	19	25	$M_P = 77·00$ (Trained দলের মিন)
70—74	6	27	33	$M_Q = 70·39$ (Untrained দলের মিন)
65—69	1	19	20	$p = ·145$ (Trained দলের অনুপাত)
60—64	0	21	21	$q = ·855$ (Untrained দলের অনুপাত)
55—59	1	16	17	$u = ·228$ (যে বিন্দুতে ·145 এবং ·855 স্বাভাবিক বণ্টনে বিভক্ত সেই বিন্দুর উপর দণ্ডায়মান y-অক্ষের উচ্চতা)
	$N_1 = 21$	$N_2 = 124$	$N = 145$	

rbis এর সূত্র হল :
$$= \frac{Mp - Mq}{\sigma T} \times \frac{pq}{u}$$
$$= \frac{77·00 - 70·39}{8·80} \times \frac{(·145 \times ·855)}{·228}$$
$$= ·41$$

Point Biserial r : এমন অনেক অভীক্ষা আছে যার দু'টি উত্তর হতে পারে, যেমন সত্য-মিথ্যা, কৃতকার্য-অকৃতকার্য হ্যাঁ-না, পছন্দ-অপছন্দ, ইত্যাদি যেখানে উত্তর ঠিক হ'লে পূর্ণ নম্বর ও ভুল হলে O দেওয়া হয়। এখানে Point biserial r নির্ণয় করতে হয়। Product Moment r-ই হ'ল Point-biserial r। এই Point-biserial r যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তা হ'ল—কোন একটি চলককে Variable, দুই ভাগে ভাগ করলে অবিচ্ছিন্ন থেকে তারা দু'টি বিভিন্ন জায়গাতে সমবেত হয়। উদাহরণ, ছেলে-মেয়ে, পুরুষ-মহিলা ইত্যাদি।

এর সূত্র হল :—

$$rpb's = \frac{M_P - M_Q}{\sigma} \cdot \sqrt{pq}$$

অভীক্ষার স্কেল নির্ণয়

শিক্ষা এবং মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরীক্ষণের ফলে যে সমস্ত পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, সেগুলিকে স্বাভাবিক বণ্টনের বক্ররেখার উপর ভিত্তি করে স্কেলের আকারে সাজানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। স্কেল কি, তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। স্কেল এমন একটি অবিচ্ছিন্ন সরলরেখা যার উপর স্কোরগুলিকে "ছোট থেকে বড়" এই হিসেবে পর পর সাজিয়ে নেওয়া হয়। আবার অনেক সময় কাঠিন্য বা অন্য কোন গুণের ক্রমানুসারেও স্কেলটি সাজানো হ'তে পারে। সচরাচর স্কেলের এককগুলি সমদূরত্ব সম্পন্ন হয় এবং অপরিবর্তিত থাকে। বিভিন্ন স্কেলের একক কিন্তু এক হয় না। অনেক ক্ষেত্রে সুবিধামত একক ধরে নিতে হয়।

পূর্বের অধ্যায়গুলিতে আমরা যে সমস্ত নম্বর নিয়ে আলোচনা করেছি, সেগুলি ছিল কাঁচা নম্বর (Raw score)। ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে স্কেলের এককগুলির কোন পরিবর্তন হয়নি সত্য, কিন্তু গুণ বা ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এককগুলিরও পরিবর্তন হয়েছে। 40 ও 50 নম্বরের মধ্যে যে ব্যবধান, ঠিক সেই ব্যবধান কিন্তু 80 ও 90 নম্বরের মধ্যে পাওয়া যাবে না। কোন একটি গুণ বা ক্ষমতার মাত্রায় পার্থক্য বিভিন্ন স্তরে কখনও সমান হয় না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কাঁচা নম্বরগুলি কোন কাজেই আসে না। এ ছাড়া কাঁচা নম্বরগুলির সাহায্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচার করা যায় না। এই সমস্ত কারণের জন্যই মনোবিজ্ঞানীরা এমন সমস্ত স্কেলের প্রচলন করেছেন যার সাহায্যে বিভিন্ন পরিমাপের মিন, বিস্তৃতি বা শ্রেণীগুচ্ছের তুলনা করা সম্ভব। এই জাতীয় স্কেলের তিনটি প্রধান স্কেল হ'ল —(1) Standard Score Scale. (2) T-Scale এবং (3) Percentile Scale.

Standard Score Scale : কেবল মাত্র মিন্-এর সাহায্যে দুটি বিভিন্ন বিষয়ের বা দুই জন ছাত্রের বিভিন্ন বিষয়ের ফলের তুলনা করা সম্ভব হয় না। এ জাতীয় ক্ষেত্রে standard score-এর স্কেলটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে standard score ব্যাখ্যা করা হচ্ছে—

ধরা যাক্ একটি অভীক্ষার মিন্ হ'ল 125 আর σ হ'ল 24। এখন যদি কোন ছাত্র ঐ অভীক্ষাটিতে 149 পায়, তবে তার মিন্ বিচ্যুতি হ'ল

149—125 বা 24। এখন এই মিন্ বিচ্যুতিকে যদি অভীক্ষাটির $\delta(=24$, দিয়ে ভাগ করা হয়; σ স্কোর হবে $\frac{24}{24}$ বা 1·00। তেমনি অপর একজন ছাত্র যদি 113 পায়, তবে তার মিন বিচ্যুতি হবে 113—125 বা −12 এবং σ স্কোর হবে $\frac{-12}{24}$ বা −·5।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে মিন্ থেকে কোন স্কোরের বিচ্যুতিকে ঐ জাতীয় σ মাধ্যমে যখন ব্যাখ্যা করা হয়, তখনই তাকে σ score, Z-score, বা Reduced Score বলা হয়।

Standard-Score Scale-এর মিন্ সব সময়ই O এবং a=1·00 হবে। σ-এর কোন ভগ্নাংশকে এই স্কেলের একক হিসেবে নেওয়া হয়। যেহেতু বণ্টনের প্রায় অর্ধেক স্কোর থাকে মিনের উপরে আর বাকী অর্ধেক নীচে সেইজন্য σ স্কোরের প্রায় অর্ধেক হবে ধনাত্মক বা যোগ চিহ্ন সম্পন্ন আর বাকী অর্ধেক হবে ঋণাত্মক বা বিয়োগ চিহ্ন-সম্পন্ন। তা ছাড়া σ স্কোরগুলি প্রায়ই ছোট ছোট দর্শমিক ভগ্নাংশের রূপে থাকে বলে সেইগুলির সাহায্যে যোগ-বিয়োগের কাজ করতে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। এইজন্য σ-স্কোরগুলিকে নতুন এক ধরনের বণ্টনে নিয়ে যাওয়া হয়। নতুন বণ্টনে মিন্ ও σ এমন ভাবে ঠিক করা হয় যাতে সমস্ত স্কোরগুলিই ধনাত্মক হয় এবং যোগ বিয়োগের সুবিধা হয়। এই ধরনের স্কোরকে বলা হয় আদর্শ স্কোর।

কাঁচা স্কোরকে আদর্শ স্কোরে নিয়ে গেলে বণ্টনটির চেহারায় কোন পরিবর্তন হয় না। যার পরিবর্তন হয় তা হ'ল মিন্ ও সিগ্‌মা। কাঁচা নম্বরকে আদর্শ স্কোরে পরিবর্তিত করার সূত্র হল —

$$\frac{X^1 - M^1}{\delta^1} = \frac{X - M}{\delta} \text{ বা}$$

$$X^1 = \frac{\delta^1}{\sigma}(X - M) + M^1$$

[যখন X = প্রদত্ত বণ্টনের একটি স্কোর (কাঁচা বা সাধারণ)। X^1 = নতুন বণ্টনের আদর্শ স্কোর। M = প্রদত্ত বণ্টনের মিন। M^1 = নতুন বণ্টনের মিন। σ = কাঁচা স্কোরের S D। σ^1 = আদর্শ স্কোরের S D।]

এই সূত্র প্রয়োগ করে যে কোন বণ্টনের কাঁচা স্কোরকে আদর্শ স্কোরে পরিণত করতে পারা যায়। একটা উদাহরণ দেওয়া হ'ল—

উদা. ।

কোন একটি বণ্টনে মিন=86 এবং সিগ্মা=15 ; রবির স্কেল হ'ল 91 আর রীতার 83 ; এই দু'টি কাঁচা স্কোরকে এমন একটি বণ্টনের আদর্শ স্কোরে নিয়ে যেতে হবে যার মিন হ'ল 500 আর সিগ্মা হ'ল 100.

সূত্র অনুযায়ী ; $X^1 = \frac{100}{15}(X-86)+500$

X-এর পরিবর্তে রবির স্কোর 91 বসালে আমরা পাচ্ছি

$$X^1 = \frac{100}{15}(91-86)+500 = 533.$$

আবার X-এর পরিবর্তে রীতার স্কোর 83 বসালে

$$X^1 = \frac{100}{15}(83-86)+500 = 480.$$

রবি ও রীতার কাঁচা স্কোর দুটিকে যে কোন পৃথক মিন ও সিগ্মা সম্পন্ন বণ্টনের আদর্শ স্কোরে পরিবর্তিত করা সম্ভব। আদর্শ স্কোরে পরিবর্তিত করার জন্য যে মিন্ ও সিগ্মা প্রয়োজন তা বিশেষ বিশেষ অভীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট থাকলেও পৃথক পৃথক অভীক্ষার জন্য বিভিন্ন। যেমন আদর্শ স্কোরে রূপান্বিত করার জন্য A G G T এর মিন ও সিগ্মা ধরা হয় যথাক্রমে 100 ও 20 ; Wechsler-Bellevue অভীক্ষাতে 10 এবং 3 এবং Graduate Record Examination-এ 500 এবং 100।

একজন অভীক্ষার্থীর দুই বা তার বেশী অভীক্ষাতে প্রাপ্ত বিভিন্ন স্কোরগুলির মধ্যে সাধারণতঃ কোন তুলনা করা চলে না কারণ অভীক্ষাগুলির একক সব সময় এক থাকে না। কোন একজন অভীক্ষার্থীর বুদ্ধির অভীক্ষাতে পাওয়া 162 নম্বর আর শিক্ষাগত অভীক্ষাতে পাওয়া 126 নম্বরের মধ্যে সাধারণতঃ কোন তুলনা করা চলে না। কিন্তু বিভিন্ন অভীক্ষার ফলকে যখন একই বণ্টনের আদর্শ স্কোরে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তাদের মধ্যে তুলনা করা সম্ভব। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, উভয় ক্ষেত্রেই বণ্টনের আকৃতি যদি এক প্রকারের হয়, তবেই তুলনা করা সম্ভব। তবে আমার কথা এই যে, শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানে যে সব গুণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরীক্ষণ করা হয় সেগুলির বণ্টন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক (ঘণ্টাকৃতি)। সেইজন্য কোন অসুবিধা হয় না।

T-Scale : আদর্শ স্কোর ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্ত অসুবিধা দূর করার জন্য আর একটি স্কেল

ব্যবহার করা হয়। তার নাম T-Scale। আদর্শ স্কোরকে স্বাভাবিক বণ্টনের পরিপ্রেক্ষিতে যখন বিচার করা হয় তখন তাকে T-Scale বলা হয়। এই স্কোরটি প্রথম প্রবর্তিত করেন William A Mc Call। T-Scale প্রথম ব্যবহার করা হয় 12 বৎসর বয়স্ক 500 জন ছাত্র-ছাত্রীর পঠন অভীক্ষার ফলের উপর। পরে বিভিন্ন অভীক্ষার ফলের উপরও সেই স্কেলটি প্রয়োগ করা হয়।

আমরা আগেই বলেছি, আদর্শ স্কোরকে স্বাভাবিক বণ্টনে পরিবর্তিত বা স্থানান্তরিত করলে T-Score পাওয়া যায়। T-Scale-এর মিন্ = 50, আর সিগ্‌মা = 10। আদর্শ স্কোরের মিন্ ও সিগমা ছিল যথাক্রমে 0 এবং 1; এখন এই মিনকে যদি স্বাভাবিক বণ্টনের মিন থেকে বাম দিকে 56 একক দূরে সরানো যায়, তাহ'লে zero-point চলে যায়—56তে এবং স্কেলটি—5σ হইতে $+5\sigma$ এর বদলে c_σ হইতে 10 পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। T-Scale এর মিন = 50; কাজেই এই 50 পাওয়ার σকে 10 দিয়ে গুণ করতে হবে।

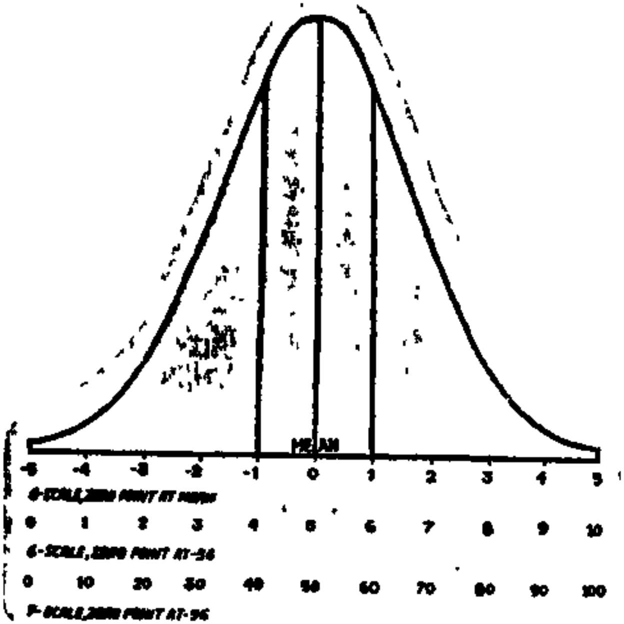

সেক্ষেত্রে Zero Point—5σতেই থাকবে কিন্তু স্কেলটির বিভাগগুলি হয়ে যাচ্ছে 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 এবং 100। উপরের চিত্রের সাহায্যে ব্যাপারটি বোঝানো হ'ল।

T-Scale এর সীমা হ'ল 0 থেকে 100 পর্যন্ত এবং একক বা T হ'ল

1, মিন 50। যেহেতু $\sigma=10$, সুতরাং T হবে σর ·1 বা 1_σ। T-Scale এর নিম্ন সীমা ও উচ্চ সীমা যথাক্রমে -5_σ এবং $+5_\sigma$ হ'লেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই T-Score-গুলি 15 থেকে 85-র মধ্যে অর্থাৎ—$3·5_\sigma$ থেকে $+35_\sigma$ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

T-Scale নির্ণয় করার পদ্ধতি : কিছু সংখ্যক কাঁচা স্কোরকে কিভাবে T-Scale-এ পরিবর্তিত করা যায়, তা একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হ'ল। পদ্ধতিটির বিভিন্ন স্তর আছে এবং সেই স্তরগুলি হল—

[এক] প্রথমে অনেক বেশী প্রতিভূ প্রশ্ন নিয়ে একটি প্রশ্নগুচ্ছ তৈরী করতে হবে। ঐ প্রশ্নগুচ্ছে প্রশ্নগুলি সোজা থেকে কঠিন এই নিয়মে সাজানো থাকবে। যে বিশেষ শ্রেণীর জন্য প্রশ্নটি তৈরী করা হচ্ছে, সেই শ্রেণীর প্রতিভূ দলের উপর প্রশ্নগুচ্ছটি প্রয়োগ করতে হয়।

[দুই] প্রতিটি প্রশ্নে শতকরা কতজন কৃতকার্য হয়েছে, তা নির্ণয় করতে হবে। তার উপর ভিত্তি ক'রেই প্রশ্নগুলিকে কাঠিন্যের ক্রমানুসারে সাজানো হয়।

[তিন] নতুন ভাবে সাজানোর পর প্রশ্নগুচ্ছটি প্রতিভূ দলের উপর প্রয়োগ করা হয়। এবার মোট অভীক্ষার ফলটি লিপিবদ্ধ করতে হয়। এইবার এই ফলটিকে নীচের উপায়ে T-Scale এ পরিবর্তিত করা হয়।

(1) Test Score.	(2) f	(3) Cum f	(4) Cum f below Score + ½ on Given scores	(5) Col (4) in %'s	(6) T-Scores (Table G হইতে)
10	1	62	61·5	99·2	74
9	4	61	59	95·2	67
8	6	57	54	87·1	61
7	10	51	46	74·2	56
6	8	41	37	59·7	52
5	13	33	26·5	42·7	48
4	18	20	11	17·7	41
3	2	2	1	1·6	29
	N = 62				

উপরের টেবিলে 1নং স্তম্ভে অভীক্ষার নম্বর এবং 2নং স্তম্ভে ঐ নম্বর পেয়েছে এই রকম পরীক্ষার্থীর সংখ্যা লেখা হয়েছে। দুই জন অভীক্ষার্থী পেয়েছে 3 নম্বর, 18 জন 4 নম্বর, 13 জন 5 নম্বর ইত্যাদি। 3নং স্তম্ভে ফ্রিকোয়েন্সী-গুলিকে নীচ দিক থেকে পর্যায়ক্রমে যোগ করা হয়েছে (Cum f)। 4 নং স্তম্ভে নম্বরের নীচের Cum f-এর সঙ্গে প্রদত্ত নম্বরের f-এর অর্ধেক যোগ করে সেই যোগফলটি রাখা হয়েছে। যেমন, একেবারে নীচের ধাপের নীচে কোন Cum f নেই, অর্থাৎ 0 এবং ঐ ধাপের f-এর অর্ধেক হ'ল 1 ; অতএব 4নং স্তম্ভে লিখতে হবে $0+\frac{2}{2}$ বা 1। তার উপরের ধাপে হবে $2+\frac{18}{2}$ বা 2+9 বা 11 ইত্যাদি। সবচেয়ে উপরের ধাপে হবে $61+\frac{1}{2}$ বা 61·5, 5নং স্তম্ভে 4নং স্তম্ভের হিসেবগুলিকে শতকরা হিসেবে পরিবর্তিত করা হয়েছে। তার হিসেব হ'ল এই রকম। যখন N=62 তখন 4নং স্তম্ভের সর্বোচ্চ ধাপের হিসেব যদি 61·5 হয়, তবে N=100 হ'লে ঐ হিসেব কত হবে? 6নং স্তম্ভে G Table-এর সহায়তায় শতকরা নম্বরের হিসেব অনুযায়ী স্বাভাবিক বণ্টনের হিসেব নির্ণয় করা হয়। এটি হ'ল T-Score। মনে রাখতে হবে G Table ব্যবহার করার সময় 5নং স্তম্ভের শতকরা হিসেবগুলির আসন্ন মান অনেক ক্ষেত্রেই ধরে নিতে হবে।

T-Score নির্ণয় করার পদ্ধতি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, T-Scaleটিই হ'ল কাঁচা নম্বরের Percentile Rank। কোন অভীক্ষাতে কোন একজন ছাত্রের P R যদি 82 হয়, তবে তার T-Score হবে 59 (Table G)। অর্থাৎ 59 নম্বরের নীচে স্বাভাবিক বণ্টনের 82% আছে।

আধুনিক কালে শিক্ষা ও মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে T-Scale অত্যন্ত অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষার ফলাফলকে T-scale এর মধ্যে তুলনা করা হয়। স্বাভাবিক বণ্টনের ভিত্তিতে 100 এককের মধ্যে স্কেলটি থাকে বলে এর উপযোগিতাও বহুল। কাঁচা স্কোরের বণ্টন স্বাভাবিক না হ'লেও T-scale-এর উপর তার প্রভাব পড়ে না। T-scale-এ পরিবর্তিত করার সময় সকল বণ্টনই স্বাভাবিক বণ্টনে রূপান্তরিত হয়। কাঁচা স্কোরের বণ্টনটি যখন সঠিক ভাবে স্বাভাবিক হয়, তখন আদর্শ স্কোর ও T-score একেবারে একই হয়। সকল দিক বিচার করে দেখতে গেলে বলতে হয় T-score কিন্তু আদর্শ স্কোরের তুলনায় অনেক বেশী উপযোগী।

Percentile Scale : Percentile Rank বা P R-এর কথা আমরা

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। P R হ'ল 100 জন ছাত্রের স্কেলে কোন একজন ছাত্রেরঅবস্থান। P R থেকে আমরা সেই নম্বরের নীচে শতকরা কতজন ছাত্র থাকে, তাও জানতে পারি। কোন একজন ছাত্রের কয়েকটি অভীক্ষার ফলাফলকে P R এর সাহায্যে তুলনা করা যায়। P R বিভিন্ন অভীক্ষার ফলাফলের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সম্বন্ধে একটা আপেক্ষিক ধারণা দিতে সক্ষম। এ ছাড়া P R অত্যন্ত সহজে নির্ণয় করা যায় এবং অত্যন্ত সহজে বোধগম্যও হয়। এই সমস্ত কারণের জন্য এই স্কেলটির প্রচলন খুব বেশী।

P R-এর ক্ষেত্রে 10 ও 20 P R-এর পার্থক্যটি 50 ও 60 P R-এর পার্থক্যের সমান বলে ধরে নেওয়া হয়। অর্থাৎ স্কেলটির সকল জায়গাতেই সারির পার্থক্য সমান বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সব সময় তা হয় না। শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন অনেক গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলির বিস্তৃতি স্বাভাবিক বণ্টনের নিয়মানুযায়ী। স্বাভাবিক বণ্টন বা প্রায় স্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রে স্কেলের একক এক হতে পারে না। বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্রে Porcentile Scaleটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

T. E CEN
ES
ALL

বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা সমাধানের সূত্র

১। মিন নির্ণয়

যখন শ্রেণীভুক্ত থাকে না— $M=\frac{\Sigma X}{N}$

যখন শ্রেণীভুক্ত থাকে— $M=\frac{\Sigma fX}{N}$ (X হ'ল শ্রেণীর মধ্যবিন্দু)

সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে মিন নির্ণয় করা যায় Am+ci পদ্ধতিতে। কয়েকটি দলের মিন সংযুক্ত করলে নতুন মিন (Combined Mean) পাওয়া যাবে—

$$M_{comb}=\frac{N_1M_1+N_2M_2+\cdots\cdots+N_nM_n}{N_1+N_2+\cdots N_n}$$ সূত্রের সাহায্যে।

২। মিডিয়ান নির্ণয়

যখন শ্রেণীভুক্ত থাকে না, তখন $Mdn=\frac{N+I}{2}$ তম পদটি।

যখন শ্রেণীভুক্ত থাকে, তখন $Mdn=L+\left(\frac{\frac{N}{2}-F}{fm}\right)\times i$.

যখন বণ্টনে ফাঁক (gap) থাকে, তখন কি ভাবে Madian নির্ণয় হবে?

উদাহরণ।

Scores	f	
20—21	2	
18—19	1	
16—17	0	
14—15	0	
12—13	2	10—13
10—11	0	
8— 9	0	6—9
6— 7	2	
4— 5	1	
2— 3	1	
0— 1	1	
	N=10.	

$\frac{N}{2}=5.$

$\frac{N}{2}=5$ হওয়াতে নীচের থেকে গণনা করে গেলে 6—7 দলে 5 পাওয়া যাচ্ছে। এতে মিডিয়ান হয় 8–9 দলের ঠিক নিম্নসীমা বা 7·5; আবার উপর থেকে গণনা করলে মিডিয়ান হয় 12–13 দলের ঠিক নিম্নসীমা বা 11·5. এই পার্থক্যের কারণ হ'ল 6–7 দল ও 12–13 দলের মধ্যে ফাঁক

থাকা। এই অসুবিধা দূর করার জন্য এই দুইটি দলের একটিকে উপরের দলে এবং অন্যটিকে নীচের দলে বিভক্ত ক'রে দু'টি নতুন দলের সৃষ্টি করা হ'ল। 6–7 দলের সঙ্গে 8–9 দলটি সংযুক্ত করে 6–9 দল এবং 12–13 দলের সঙ্গে 10–11 দল সংযুক্ত করে 10–13 দলটি সৃষ্টি করা হ'ল। এদের প্রত্যেকের f-এর সংখ্যা 2. এখন চারটি দলের বদলে দুটি দল পাওয়া গেল। এখন মিডিয়ান হবে—$9.5+\frac{0}{2}\times2=9.5$। এতে নীচের থেকে উপরে বা উপর থেকে নীচে যে দিকেই গণনা করা যাক মিডিয়ান একই থাকবে।

অনেক সময় কতকগুলি স্কোর শ্রেণীভুক্ত করতে এইভাবে দল স্থির করা হয়,

50 and above বা 50+, কিংবা 30 and below বা 30–

কিংবা D. N. C (did not complete),

প্রথম ক্ষেত্রে স্কোরগুলির উচ্চসীমা এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নিম্নসীমা জানা যায় না। তৃতীয় ক্ষেত্রে 'f' জানা যায় না। এতে মিডিয়ান নির্ণয় করাতে কোন অসুবিধা হয় না কারণ এতে প্রতি স্কোরকে একটি ফ্রিকোয়েন্সী বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া প্রথম ও শেষ দলের মিডিয়ান নির্ণয় করার সময় সীমা না জানলেও চলে। যেখানে $\frac{n}{2}$ থাকবে তার সীমা জানা প্রয়োজন। ঐরূপ বণ্টনের কিন্তু মিন নির্ণয় করা যায় না। মিন নির্ণয় করার সময় প্রতিটি স্কোর এবং প্রতি দলের মধ্যবিন্দু জানা প্রয়োজন।

৩। **মোড নির্ণয়ঃ** যখন শ্রেণীভুক্ত থাকে না তখন যে নম্বরটি বার বার আসে। যখন শ্রেণীভুক্ত থাকে তখন যে দলে বেশীসংখ্যক f থাকে, সেই দলের মধ্যবিন্দু। এটি কিন্তু Crude Mode.

Empirical Mode হ'ল 3 × Mdn – 2 × Mean

বা Mean – 3 (Mean – Median).

৪। **রেঞ্জ নির্ণয়ঃ** যখন শ্রেণীভুক্ত থাকে না তখন রেঞ্জ হ'ল Highest Score—Lowest Score. যখন শ্রেণীভুক্ত থাকে, তখন রেঞ্জ হ'ল সর্বোচ্চ ধাপের মধ্যবিন্দু ও সর্ব নিম্ন ধাপের মধ্যবিন্দুর পার্থক্য।

উদাহরণ। সর্বোচ্চ ধাপঃ 195–199 (মধ্যবিন্দু 197) এবং সর্বনিম্ন ধাপ 140–144 (মধ্যবিন্দু 142) হলে রেঞ্জ হ'ল 197 – 142 বা 55.

৫। গড় বিচ্যুতি নির্ণয় :

যখন শ্রেণীভুক্ত থাকে না, তখন গড় বিচ্যুতি হ'ল $\frac{\Sigma|x|}{N}$

যখন শ্রেণীভুক্ত থাকে তখন $\frac{\Sigma|fX|}{N}$

৬। আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় :

যখন শ্রেণীভুক্ত থাকে না, তখন $\sqrt{\frac{\Sigma x^2}{N}}$

যখন শ্রেণীভুক্ত থাকে, তখন $\sqrt{\frac{\Sigma fx^2}{N}}$

সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে, $i\sqrt{\frac{\Sigma fx'^2}{N} - c^2}$

মূল স্কোরের সাহায্য নির্ণয় করা হয় $\sqrt{\frac{\Sigma x^2}{N} - M^2}$

মূল স্কোরের সঙ্গে কোন স্কোর যোগ করলে বা মূল স্কোরকে অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে আদর্শ বিচ্যুতির পরিবর্তনের উদাহরণ।

মূল স্কোর

X	x	x^2
5	−2	4
6	−1	1
7	0	0
8	1	1
9	2	4
35		10

$\text{Mean} = \frac{35}{5} = 7$

$\therefore \text{S.D} = \sqrt{\frac{10}{5}} = 1{\cdot}41$

মূল স্কোর

X+5	x	x^2
10	−2	4
11	−1	1
12	0	0
13	1	1
14	2	4
60		10

$\text{Mean} = \frac{60}{5} = 12$

$\text{S.D} = \sqrt{\frac{10}{5}} = 1{\cdot}41$

মূল স্কোর

X×10	x	x^2
50	−20	400
60	−10	100
70	0	0
80	−10	100
90	−20	400
350		1000

$\text{Mean} = \frac{350}{5} = 70$ $\quad$ $\text{S.D} = \sqrt{\frac{1000}{5}} = \sqrt{200} = 14{\cdot}14$

Sheppard's correction grouping error

$$\sigma c=\sqrt{\sigma^2-\frac{i^2}{12}}=\sqrt{\sigma^2-\cdot083i^2}$$

যখন σ = বণ্টনটির আদর্শ বিচ্যুতি ; i = শ্রেণী ব্যবধান

কতকগুলি বণ্টনের সংযুক্ত আদর্শ বিচ্যুতি

$$\sigma \text{ comb}=\frac{\sqrt{N_1(\sigma_1^2+d_1^2)+N_2(\sigma_2^2+d_2)^2}}{N}$$

যখন σ_1 = প্রথম বণ্টনের S. D. ; σ_2 = দ্বিতীয় বণ্টনের S. D. ; $d_1=(M_1-M \text{ comb})$; $d_2=(M_2-M \text{ comb})$; $N=N_1+N_2$.

উদাহরণ।

	N	M	SD
প্রথম বণ্টন	25	80	15
দ্বিতীয় বণ্টন	75	70	25

$$M \text{ comb}=\frac{25\times80+75\times70}{25+75}=72\cdot50.$$

$$d_1=80-72\cdot50=7\cdot50 \qquad d_1^2=56\cdot25$$

$$d_2=70-72\cdot50=-2\cdot50 \quad d_2^2=6\cdot25$$

$$\therefore \quad \sigma \text{ comb}=\frac{\sqrt{25(225+56\cdot25)+75(625+6\cdot25)}}{100}$$

$$=23\cdot32.$$

৭। চতুর্থাংশ বিচ্যুতি

প্রথম চতুর্থাংশ $\quad Q_1=1+i\dfrac{\left(\frac{N}{4}-\text{cum } f_1\right)}{fq}$

তৃতীয় চতুর্থাংশ $\quad Q_3=1+i\dfrac{\left(\frac{3N}{4}-\text{cum } f_1\right)}{fq}$

চতুর্থাংশ বিচ্যুতি $\quad Q=\dfrac{Q_3-Q_1}{2}$

৮। বিস্তৃতির সহগ $V=\dfrac{100\sigma}{2}$

৯। শতাংশ বিন্দু $Pp=1+\dfrac{(pN-F)}{fp}xi.$

১০। শতাংশ সারি $PR = 100 - \frac{(100\ R - 50)}{N}$

১১। তির্যকতা $Sk = 3(\text{mean} - \text{median})$.

বা $\frac{P_{90} + P_{10}}{2} - P_{50}$.

১২। কার্টোসিস $Ku = \frac{Q}{(P_{90} - P_{10})}$

১৩। স্বাভাবিক বণ্টনের সমীকরণ $Y. = \frac{N}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\frac{-x^2}{2\sigma^2}}$

১৪। স্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রফল = মোটামুটি 10,000

বৈশিষ্ট্য ঃ ১। বণ্টনের লেখচিত্র X অক্ষকে অনন্তে স্পর্শ করে। (Asymtotic curve).

২। x = 0 হ'লে y-এর উচ্চতা সবচেয়ে বড় হয় ; x = ∝ হ'লে y-এর মান সবচেয়ে কম হয়।

৩। Mean, Median এবং Mode একই বিন্দুতে অবস্থিত।

৪। লেখচিত্রটি মিনের দু'পাশে সমান ভাবে বিস্তৃত।

৫। লেখচিত্রটি দেখতে একটি উপুড় করা ঘন্টার মত।

৬। লেখচিত্রটি শুরু হয় ডানদিকে।

৭। এটি প্রথমে convex, তারপর concave, পরে plateau. ডানদিকে নামার সময় প্রথমে concave পরে convex.

৮। মিন-এর বামদিকে যে বিন্দুতে লেখচিত্রটি convex থেকে concave হয়, এবং ডানদিকে যে বিন্দুতে concave থেকে convex হয়, সেই বিন্দুগুলিকে Point of Inflection বলে।

৯। Point of Inflection থেকে X অক্ষের উপর Mean-এর দু'পাশে দুটি লম্ব টানলে সেগুলি Mean থেকে $\pm\sigma$ দূরত্বে X অক্ষকে ছেদ করে।

১০। লেখচিত্রে M±σর মধ্যে কোন বন্টনের মাঝের 68·26%

M+2σর মধ্যে 95·44% এবং

M+3σর মধ্যে 99·74% লোক থাকে।

১১। লেখচিত্রের তির্যকতা হ'ল 0 এবং কার্টোসিস ·263.

১৫। ওজাইভ ব্যবহার না করে Overlapping নির্ণয় করা

আমরা দেখেছি, যখন দুটি বিভিন্ন বণ্টন দেওয়া থাকে তখন একটি আর একটিকে কতটা আবৃত করেছে—ওজাইভের সাহায্যে তা নির্ণয় করা যায়। কিন্তু ওজাইভ ব্যবহার না করেও সরাসরি তা নির্ণয় করা যায়।

উদাহরণ।

Boys		Girls	
Scores	f	Scores	f
27·5—31·5	15	31·5—35·5	20
23·5—27·5	68	27·5—31·5	35
19·5—23·5	128	23·5—27·5	73
15·5—19·5	79	19·5—23·5	68
11·5—15·5	10	15·5—19·5	41
		11·5—15·5	13
	N=300		N=250
	N/2=150		N/2=125

শতকরা কতজন বালক, বালিকাদের মিডিয়ানের উপরে আছে? বালিকাদের মিডিয়ান হ'ল 23·66. সমস্যাটি হ'ল 23·66 এর চেয়ে বেশী নম্বর শতকরা কতজন বালক পেয়েছে? দেখা যাচ্ছে 23·5 এর নীচে আছে 128+79+10 বা 217 জন বালক। 23·5—27·5 দলে 4টি স্কোর আছে এবং f হ'ল 68; 23·66 নম্বরটি 23·5 থেকে মাত্র ·16 দূরে। কিন্তু f-এর জন্য আসল দূরত্ব হবে $\cdot16\times\frac{68}{4}=2\cdot72$। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে 23·66 এর নীচে

বালকদের সংখ্যা 217+2·72 বা 219·72। N=300, অতএব 23·66-এর উপরে বালকদের সংখ্যা 300−219·72=80·28

অতএব শতকরা হিসেব হ'ল $\frac{80·28}{3}$ বা, 26·76, বা, 27

১৬। সহগাঙ্ক (সহ-পরিবর্তনের)

$$\text{As ratio}: \quad r=\frac{\Sigma\left(\frac{x}{\sigma x}\cdot\frac{y}{\sigma y}\right)}{N}$$

$$\text{Product Moment}: \quad r=\frac{\Sigma xy}{N.\sigma x.\sigma y}.$$

$$\text{Scatter Diagram}: \quad r=\frac{\frac{\Sigma x^1y^1}{N}-CxCy}{\sigma^1x.\ \sigma^1y}.$$

$$\text{Deviations taken from Mean}: \quad r=\frac{\Sigma xy}{\sqrt{\Sigma x^2\times\Sigma y^2}}$$

Deviations taken from Assumed Mean same as Scatter Diagram.

$$\text{Rank Difference} = 1-\frac{6\Sigma D^2}{N(N^2-1)}$$

১৭। **Standard Errors of Measurements :** বিভিন্ন কারণের জন্য আমরা মিন, মিডিয়ান, মোড বা অন্যান্য ষ্ট্যাটিষ্টিকগুলিকে সব সময় এবং সবক্ষেত্রে অভ্রান্ত বলতে পারি না। এক ক্ষেত্রের মাপ অন্যক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। আবার এক দলের ক্ষেত্রে যে পরিমাপটি পাওয়া গেল অন্যদলের ক্ষেত্রে সেই পরিমাপটি পাওয়া যাবে এমন নিশ্চয়তা নেই। পরিমাপগুলি সব সময় আপেক্ষিক কিন্তু তার মধ্যেই সেটি কতটা নিখুঁত বা কতটা খাঁটি তা জানার জন্যই পরিমাপের আদর্শ প্রমাদ নির্ণয় করা হয়। বিভিন্ন পরিমাপের ক্ষেত্রে তা কিভাবে নির্ণয় করা হয় তার কতকগুলি সূত্র দেওয়া হ'ল।

মিনের ক্ষেত্রে :

$$SEm=\frac{S.D.}{\sqrt{N}} \quad \text{যখন} \quad S.D.=\sqrt{\frac{\Sigma x^2}{(N-1)}}$$

মিডিয়ানের ক্ষেত্রে :

$$SEmdn=\frac{1.253\sigma}{\sqrt{N}} \quad \text{বা} \quad \frac{1.858\sigma}{\sqrt{N}}$$

আদর্শ বিচ্যুতির ক্ষেত্রে :

$$SEsd=\frac{.71\,\sigma}{\sqrt{N}}$$

চতুর্থাংশ বিচ্যুতির ক্ষেত্রে :

$$SEq=\frac{.786\,\sigma}{\sqrt{N}} \quad \text{বা} \quad \frac{1.17\,\sigma}{\sqrt{N}}$$

শতকরা হিসাবের ক্ষেত্রে :

$$SE\%=\sqrt{\frac{PQ}{N}} \quad \text{যখন } P=\text{ঘটনার শতকরা হিসাব}$$

$$Q=(1-Q)\,;\ N=\text{সংখ্যা}.$$

সহ-সম্বন্ধের ক্ষেত্রে :

$$SEr=\frac{(1-r^2)}{\sqrt{N}}$$

১৮। আদর্শ স্কোর :

$$X'=\frac{\sigma'}{\sigma}(X-M)+M'.$$

$$\text{সিগ্‌মা স্কোর}=\frac{X-M.}{\sigma}$$

এবার T-Score ও আদর্শ স্কোরের তুলনা করা হ'ল (উদাহরণের সাহায্যে)

Test Score.	f	T-Score.	Standard Score. (M=50, SD=10).
3	2	29	34
4	18	41	40
5	13	48	46
6	8	52	52
7	10	56	57
8	6	61	63
9	4	67	69
10	1	74	75
	N=62		

Mean=5·73

SD=1·72

Standard Score-এ পরিবর্তিত করার সূত্র—

$$\frac{X-5{\cdot}73}{1{\cdot}72}=\frac{X^1-50}{10}$$

$$\therefore\ X^1=\frac{10X}{1{\cdot}72}-\frac{57{\cdot}3}{1{\cdot}72}+50$$

$$=5{\cdot}81X-33{\cdot}3+50=5{\cdot}81X+16{\cdot}7$$

॥ পরিসংখ্যান ॥

ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশ্যান

(FREQUENCY DISTRIBUTION)

Questions and Answers

Questions :

1. Write the exact upper and lower limits of the following Scores :

72, 18, 185, 322, 1, 97.

2. Write down (a) the exact lower and upper limits of the following class intervals and (b) the midpoint of each interval :

45—47	155—159	157·5—162·5	0—9
1—4	80 upto 90	13—14.	16—29

3. Tabulate the following 25 Scores into two frequency distributions using (1) an interval of three and (2) an interval of 5 units. Begin the first interval with 60.

61	83	70	81	72
67	71	76	78	67
84	63	76	65	77
69	72	82	86	75
64	72	67	73	72

4. Tabulate the following 100 Scores into three frequency distributions, using intervals of 3, 5, and 10 units. Let the first interval begin with 45.

68	46	74	78	103	73	82	73	85	81
78	78	65	75	90	86	86	75	103	84
76	92	73	70	79	82	83	85	81	81
58	86	72	84	81	71	63	74	78	83
95	88	91	98	83	94	56	95	98	92
94	50	83	93	76	75	75	110	71	72
96	70	74	99	89	73	105	98	78	96
80	102	87	85	93	90	86	72	96	85
86	101	90	73	85	84	76	83	81	85
78	82	103	86	87	95	89	92	80	90

5. Plot a Frequency Polygon of the 100 Scores in (4) using an interval of 10 Score units. Superimpose a histogram upon the Freqnency Polygon using the same axes.

6. Plot Frequency Polygons for the two distributions of 25 Scores found in (3) using intervals of 3 and 5 Score units. Smooth the Second distribution and plot the Smoothed 'f's and the original scores on the same axes.

Answers :

71·5 to 72·5 } 72 to 75 ; 17·5 to 18·5 } 18 to 19 ; 184·5 to 185·5 } 185 to 186 ; 321·5 to 322 5 } 322 to 323

0·5 to 1·5 } 1 to 1 ; 96·5 to 97·5 } 97 to 98

2.

	Midpoint
44·5 to 47·5	46·0
·5 to 4·5	2·5
154·5 to 159·5	157·0
79·5 to 89·5	84·5
157·5 to 162·5	160·0
12·5 to 14·5	13·5
—·5 to 9·5	4·5
25·5 to 29·5	27·5

কেন্দ্রীয় প্রবণতা

(CENTRAL TENDENCY)

Questions :

1. Calculate the mean, median and mode for the following frequency distributions. Use the short method in computing the Mean.

(a)

Scores	f
70—71	2
68—69	2
66—67	3
64—65	4
62—63	6
60—61	7
58—59	5
56—57	4
54—55	3
52—53	2
50—51	1
	N = 39.

(b)

Scores	f
85—89	1
80—84	4
75—79	5
70—74	7
65—69	6
60—64	3
55—59	2
50—54	2
	N = 30

(c)

Scores	f
100—109	5
90— 99	9
80— 89	14
70— 79	19
60— 69	21
50— 59	30
40— 49	25
30— 39	15
20— 29	10
10— 19	8
0— 9	6
	N = 162

Answers :

1.

(a) Mean = 60·76, Median = 60·79, Mode = 60·35

(b) Mean = 70·33, Median = 70·93, Mode = 72·13

(c) Mean = 55·43, Median = 55·71, Mode = 54·66

বিষমতার পরিমাপ

(MEASURES OF VARIABILITY)

Questions :

1. Find out the A D and S D of the following scores— 52, 50, 56. 68, 65, 62, 57, 70.

2. In sample X (N=150), M=120 and σ=20 in sample Y (M=75), M=126 and σ=22. What are the Mean and S D of X and Y when combined into one distribution of 225 cases ?

3. Find out the A D, Q and S D of the trequency distributions in Q. No 1. of Central Tendency.

4. Calculate the Co-efficients of Variation for the following traits :—

	Trait.	Unit of Measurement	Group	M.	σ
1.	Length of Head.	mms.	802 males	190·52	5·90
2.	Body Weight.	Pounds.	868445 males	141·54	17·82
3.	Tapping Speed.	m of 5 trials 30″ each.	68 adults male & female	195·91	26·83
4.	Memory Span.	No. repeated correctly.	263 males.	6·60	1·13
5.	General Intelligence.	Points Scores.	1101 adults.	153·3	23·6

Rank these traits in order for relative variability.

Judged by their V'S which trait is the most Variable ?

Answers :

1. A D=6·25 SD=6·91 2. M=122·0 SD=20·88 3. (a) Q=3·37 SD=5·99 (b) Q=6·04 SD=9·00

(c) Q=16·41 SD=34·13 4. V'S in order are 3·10, 12·59, 13·63, 17·12 15·39. Ranked for relative variability from most to test :—Memory Span ; General Intelligence ; Tapping Speed ; Weight ; Head Length. Lost two traits have true Zeros.

ক্রমসমষ্টিমূলক বা কিউম্যুলেটিভ বণ্টন
ও
অন্যান্য চিত্রমূলক পদ্ধতি
(CUMULATIVE DISTRIBUTION & OTHER GRAPHIC METHODS)

Questions :

1. The following distributions represent the achievement of two groups, A and B upon a memory test.

(a) Plot cumulative frequency graphs of group A's and of group B's scores, observing the 75% rule.

(b) Plot Ogives of the two distributions A and B upon the same axes.

(c) Determine P_{30}, P_{60} and P_{90} graphically from each of the Ogives and compare graphically determined with calculated values.

(d) What is the PR of score 55 in group A's distribution ? In group B's distribution ?

(e) A percentile rank of 70 in group A corresponds to what percentile rank in gronp B ?

(f) What percent of group A exceeds the median of group B ?

Scores.	Group A.	Group B.
79—83	6	8
74—78	7	8
69—73	8	9
64—68	10	16
59—53	12	20
54—58	15	18
49—53	23	19
44—48	16	11

Scores.	Group A.	Group
39—43	10	13
34—38	12	8
29—33	6	7
24—28	3	2
	N=128	N=139

2. (a) Twenty children are put in order of merit for Scores on a learning test, compute the PR for each child.

(b) If 60 children are put in order of merit for grades in history, what are the PR'S of the 1st, 10th, 45th, 60th ?

3. In the operation of a School system in a certain city 70°/₀ of the money spent goes for instruction, 12°/₀ for operation and maintenance and 18°/₀ for auxiliary agencies fixed charges and incidentals. Construct a pie diagram to show the relations of these expenditures.

Answers :

	Group—A		Group—B		
	Ogive	Cal	Ogival	Cal	1. (d) 58 ; 47
1. (c)	P_{30}46·0	45·81	48·5	48·69	(e) 62.
	P_{60}56·0	55·77	59·75	59·85	(f) 39—40%o
	P_{90}74·0	73·64	75·0	74·81	Group A exceed the median of Group B

2. (a) PR'S in order are :—97·5, 92·5, 87·5, 82·5, 77·5, 72·5, 67·6, 62·5, 57·5, 52·5, 47·5, 42·5 37·5, 32·5, 27·5, 22·5, 17·5, 12·5, 7·5, 2·5.

2. (b) PR's are : 1st 99·17, 10th—87·17, 45th—25·83, 60th—·83.

স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র

(NORMAL PROBABILITY OR GAUSSION CURVE)

Questions.

1. In two throws of a coin, what is the probability of throwing at least one head ?

2. What is the probability of throwing exactly one head in three throws of a coin ?

3. What percentage of a normal distribution is included between--

(a) M and $\pm 1\sigma$

(b) M and $+2\sigma$

(c) 2σ and -2σ.

4. Compute measures of Skewness and of Kurtosis for the first two distributions in questions of Central Tendency.

5. In a sample of 1000 cases, the meen of a certain test is 14.40 and Sigma is 2·50. Assuming normality of the distribution,

(a) How many individuals Score between 12 and 16 ?

(b) How many Score above 18 ? below 8 ?

(c) What are the chances that any individual selected at random will Score above 15 ?

Answers :

1. 3/4. 2. 3/8.

3. M and $\pm 1\sigma = 68{\cdot}26\%$
M and $\pm 2\sigma = 47{\cdot}72\%$
2σ and $-2\sigma = 95{\cdot}44\%$

	Skewness	Kurtosis
4. (a)	− ·018, − ·28	·238
(b)	− ·20, − ·43	·241

5. (a) 570, (b) 50, 3 (c) 33 in 100

সহ-পরিবর্তন

(CORRELATION)

Questions.

1. Find the co-efficient of Correlation between the following Set of Scores by using—(1) The Product Moment Method and (2) the Rank Difference Method.

(a)

x	y
22	11
8	5
19	6
32	8
13	2
24	5
22	4
35	1
18	7
13	10

(b)

x	y
2	10
20	4
25	11
14	6
11	2
2	9
38	17
16	6
14	4
23	25

(c)

x	y
50	22
54	25
56	34
59	28
60	26
62	30
61	32
65	30
67	28
71	36
74	40

(d)

A	B
15	40
18	42
22	50
17	45
19	4[illegible]
20	46
16	41
21	41

(e)

A	B
56	45
42	48
30	25
42	48
28	28
24	37
32	40
42	58
54	54
42	44

(f)

A	B
29	49
50	55
76	43
40	38
32	56
61	45
56	67
17	44
61	48

Answers :

1. (a) – ·16 (b) ·47 (c) ·78
(d) ·64 (e) ·75 (f) – ·22

অভীক্ষার স্কেল নির্ণয়

Questions :

1. The fifth-grade norms for a reading examination are Mean = 60 and SD = 10 ; for an arithmetic examination, Mean = 26 and SD = 4. A boy Scores 55 on the reading and 24 on the arithmetic Test. Compare his σ-scores. Also compare his standard scores in a distribution with M of 100 and SD of 20.

2. Calculate T-scores of the given data :—

Scores	f
81	2
80	4
79	6
78	20
77	24
76	28
75	40
74	36
73	24
72	12
71	4
	N = 200

3. Calculate T-scores for the midpoints of the class intervals in the following distribution :

Scores	f.
30—34	8
25—29	12
20—24	20
14—19	15
10—14	15
5— 9	5
	75

4. Five problems are passed by 18%, 35%, 50%, 66% and 88% respectively, of a large unselected group. If the zero point of ability in this test is taken to be at -3σ, what is the σ value of each problem as measured from this point ?

Answers :

1. Both the scores are same.

   Reading = 90, Arithmetic = 90

2.

Scores.	f.	Percent below given score Plus one-half reaching.	T. Score
81.	2	99·5	76
80.	4	98·0	71
	N = 200		

   T. Scores : 76, 71, 67, 62, 58, 54, 49, 44, 39, 34, 27

3. T. Scores : 66, 59, 53, 47, 40, 32.

4. In order : 3·92, 3·67, 3·00, 2·59, 1·82.